মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র

নবম খণ্ড

S.L = 7344.
REFERENCE

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

গ্রন্থস্বত্ব শ্রীমতী কমলা বন্দ্যোপাধ্যায় ও
তাঁর উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক সংরক্ষিত

BCSC Public Library
11th Fin. Com No 1757
11th Fin. Com. M.R. No 6947

সম্পাদকমণ্ডলী

শ্রীঅলোক রায়
শ্রীঅরুণকুমার বসু
শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ
শ্রীসরোজমোহন মিত্র
শ্রীমতী মালিনী ভট্টাচার্য
শ্রীমতী সুমিতা চক্রবর্তী
শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায

প্রচ্ছদ

শ্রীপৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

মূল্য : ১৬০ টাকা

ISBN 81-86908-66-8 (Set)
ISBN 81-7751-058-4

প্রকাশক

সচিব, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলকাতা-৭০০ ০২০

মুদ্রাকর

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১২

সূচি : নবম খণ্ড

চিত্রপরিচয়

নিবেদন

বাংলা সাহিত্যের এক অলোকসামান্য পুরুষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আটচল্লিশ বছরের অকাল নির্মালিত জীবন ও আটাশ বছরের সৃষ্টিকালের মধ্যে তিনি রেখে গেছেন বিপুল দান হিসেবে ৩৯টি উপন্যাস, ২৬০-এর কিছুবেশি ছোটোগল্প এবং বেশকিছু কবিতা, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও ছোটোদের উপযোগী রচনা। মৃত্যুর চারদশক পরেও এই ব্যতিক্রমী ও বিস্ময়সৃষ্টিকারী লেখক আমাদের সাহিত্যে ও মননে অনিবার্যভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে আছেন। স্রষ্টা মাত্রেই কিছু পরিমাণে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র। কিন্তু মানিকের স্বাতন্ত্র্য ও গভীরতার রহস্যভেদ ও অনুসন্ধান আজও বোধ করি অসমাপ্ত। কল্লোলের কুলবর্ধন বলে তাকে দাবি করা হলেও তার সাহিত্যে অভিবিক্ত যা ছিল তা হল অতিআধুনিকের প্রতিবাদ থেকে নাস্তিক্যের বিদ্রোহে উত্তরণ। যুগ ব্যাধি তাঁর সাহিত্য শরীরের আয়তক্ষেত্রে নির্মম নিরাভরণ অথচ রহস্যময় রূপে ছড়িয়ে আছে। পারিবারিক আনুকূল্যের মসৃণজীবনের পথ ত্যাগ করে শুধুই সাহিত্যের জন্য যে অনিশ্চিত জীবন তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন দুরারোগ্য ব্যাধি দারিদ্র্য সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ঘাত প্রতিঘাত সত্ত্বেও তার কক্ষপথের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের কেন্দ্রে ছিল সাহিত্যসাধনা। সমাজ অর্থনীতি রাজনীতি সংলগ্ন যে বাঙালি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবন, তার ইতিবৃত্ত রচনায় মানিক সাহিত্য অপরিহার্য।

এই ঐতিহাসিক দায়িত্ববোধেই পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যসমগ্র প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছে। পাঠক মনের সামনে থেকেও দৃষ্টির অগোচরে থেকে যাবে তার রচনাবলি—এ কাম্য নয়। মানিক সাহিত্যের সামগ্রিক সংকলন আজও অসম্পূর্ণ। মানিক সাহিত্যচর্চা, বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে গবেষণা বেশকিছু হলেও মানিকের যাবতীয় রচনার সুসম্পাদিত পাঠ থেকে পাঠকসমাজ বঞ্চিতই রয়েছেন। এর আগে গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড সাধ্যমতো একপ্রস্থ রচনাবলি প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু দীর্ঘদিন তা বাজারলভ্য ছিল না। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং লেখক পরিবার ও গ্রন্থালয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সমগ্র মানিক রচনাবলি নতুন করে প্রকাশের পথে বাধা দূর হয়েছে। সকল পক্ষের ঐকমত্যে এই দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে বাংলা আকাদেমির উপর। কাজটি সহজসাধ্য নয়।

লেখকের ভগ্নস্বাস্থ্য গৃহিণীপনার অভাব, বারবার বাসস্থান পরিবর্তন প্রথম যুগের প্রকাশকদের অন্যমনস্কতা ইত্যাদি কারণে যাবতীয় পাণ্ডুলিপি, প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ইত্যাদি সংগ্রহ করা সহজ নয়। তবে শ্রীযুগান্তর চক্রবর্তী 'অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ডায়েরি ও চিঠিপত্র' গ্রন্থ প্রকাশ করে প্রামাণ্য তথ্যসংগ্রহের কাজ অনেকটাই সহজ করে দিয়েছেন। লেখকের পরিবারের পক্ষ থেকে দুর্লভ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি আকাদেমির অভিলেখাগারে প্রদান করার ফলেও কিছু কিছু পাঠনির্ণয়ে অভাবনীয় সুবিধা ঘটেছে। কাজে হাত দিয়ে দেখা যাচ্ছে কিছু রচনা এখনও অসংকলিত রয়েছে বহু তথ্য সন্ধান করতে হচ্ছে, বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ, বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদ গ্রন্থাকার প্রকাশের সময় লেখকের সংশোধন পরিমার্জন পরিবর্তন ইত্যাদি পর্যালোচনা করে কৌতূহল উদ্রেককারী বহু বিষয় পাওয়া যাচ্ছে। বাংলা আকাদেমি এই দুরূহ অথচ একান্ত প্রয়োজনীয় কাজটি সম্পাদনের জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করেছে এবং তাঁদের তত্ত্বাবধানে যথাসম্ভব প্রথম প্রকাশের ক্রম অনুসারে দশখণ্ডে এই রচনাসমগ্র প্রকাশে ব্রতী হয়েছে।

মানিক-পরিবারের সর্বাঙ্গীণ সহায়তায় এবং সম্পাদকমণ্ডলীর শ্রম ও দক্ষতায় মানিক সাহিত্যের এক আদর্শ পাঠ পাঠকসমাজের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। বহু নতুন তথ্য, দুষ্প্রাপ্য দলিল এবং লেখকের বিভিন্ন সময়ের স্বল্পপরিচিত ছবি, পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ রচনাসমগ্রের আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে সহায়ক হয়েছে। গ্রন্থপরিচয় ও পরিশিষ্ট অংশ এই রচনাবলির অন্যতম সম্পদ বানানের সমতাবিধানের প্রয়োজনে বাংলা আকাদেমির বানানবিধি এবং যুক্তাক্ষরের স্বচ্ছতা-প্রয়াস অনুসৃত হয়েছে। প্রকাশনসৌষ্ঠব ও সম্পাদনার উন্নতমান অক্ষুণ্ণ রেখে দাম যথাসম্ভব পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের সহায়তার ফলেই এটা সম্ভব হল। এই প্রকল্প রূপায়ণের সঙ্গে যাঁরা জড়িত রয়েছেন তাঁদের সকলের কাছেই বাংলা আকাদেমি কৃতজ্ঞ। প্রথম আটটি খণ্ড প্রকাশের পরে সমস্ত মহল থেকেই প্রশংসা পাওয়া গেছে। নবম খণ্ডও প্রকাশিত হল সময়সূচি রক্ষা করেই। ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক প্রচেষ্টাও করা হয়েছে।

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়
সচিব

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রধান সচিব
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
সংস্কৃতি অধিকর্তা
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

শ্রীমতী কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুগান্তর চক্রবর্তী
শ্রীসুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী
শ্রীঅশোক উপাধ্যায়
শ্রীঅংশু শূর
শ্রীনিমাই ঘোষ

তথ্যসংগ্রহে সহায়তা

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
বরানগর পিপলস লাইব্রেরি
বয়েজ ওন লাইব্রেরি
ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড ক্লাব লাইব্রেরি
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
রিজার্ভ ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন
হিরণ লাইব্রেরি
কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণাকেন্দ্র
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
বালিগঞ্জ ইনস্টিটিউট
শ্রীপ্রভাতকুমার দাস
শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদার
শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায়
শ্রীসিদ্ধার্থ ঘোষ
শ্রীঅঙ্কন দত্ত

সম্পাদনা সহায়তা

শ্রীনৃপেন্দ্র সাহা
শ্রীশ্যামল মৈত্র
শ্রীমুক্তিরাম মাইতি
শ্রীমতী মহুয়া বসু
শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীঅমলকুমার রায়
শ্রীনন্দদুলাল সেনগুপ্ত
শ্রীপারিজাতবিকাশ মজুমদার

জন্ম ১৯ মে ১৯০৮ মৃত্যু ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬

ফেরিওলা

ফেরিওলা প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

গত দু-তিনবছর ধরে গল্পগুলি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা কিন্তু গল্পগুলির মধ্যে সমসাময়িক সামাজিক জীবনের মূলসূত্রেব একটা যোগাযোগ আছে বলেই আমার বিশ্বাস।

আমি সেইভাবেই গল্পগুলি বাছাই করেছি। অবশ্য এ বিচার পাঠক-পাঠিকা এবং সমালোচকের। আমি কেবল এই সংকলনটিব জন্য গল্প বাছাই করার নীতির কথাটা উল্লেখ করলাম।

লেখক

বৈশাখ, ১৩৬০

ফেরিওলা

বর্ষাকালটা ফেরিওলাদের অভিশাপ।

পুলিশ জ্বালায় বারোমাস। দুমাসে বর্ষা হয়রানির একশেষ করে। পথে ঘুরে ঘুরে যাদের জীবিকা কুড়িয়ে বেড়ানো তাদের প্রায় পথে বসিয়ে দেয়।

না ঘুরলে পয়সা নেই ফেরিওলার। তার মানেই কোনোমতে পেট চালানোরও বরাদ্দ নেই।

আকাশ পরিষ্কার দেখেই জীবন বেরিয়েছিল। ঘণ্টাখানেক ঘুরতে না ঘুরতে বৃষ্টি নেমে এসেছে।

পুরানো জীর্ণ বাড়িটার ঢাকা বারান্দায় আশ্রয় নিয়ে মনে মনে সে বর্ষাকে অভিশাপ দেয়।

কিন্তু দেহটা যেন সায় দিতে রাজি হয় না। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করার সুযোগটাকে সাগ্রহে বরণ করতে চায়। দিন দিন যেন আরও বেশি বেশি দুর্বল মনে হচ্ছে শরীরটা।

বর্ষা বাদ সেধেছে রোজগারে, খাওয়া আরও কমে গেছে আপনা থেকে, সেই জন্য কী ?

এক কাঁধের শাড়ি চাদর আর অন্য কাঁধের গামছাগুলির ওজন খুব বেশি নয়। ভারী হওয়ার মতো বেশি মাল সে কোথায় পাবে ? এই সেদিন পর্যন্ত শুধু গামছাই ফেরি করত, কয়েক মাস যাবত কিছু শাড়ি আর বিছানার চাদর নিয়ে বেরোয়।

তবু এইটুকু ওজন কাঁধে নিয়ে ঘণ্টাখানেক ঘুরেই যেন গায়ের জোর ফুরিয়ে আসে, হাঁটতে রীতিমতো কষ্ট হয়। শাড়ি চাদর গামছা চাই বলে হাঁক দিতে যেন দমে কুলোয় না, বুকে লাগে, কাশি আসে।

শাড়ি আছে ?

পাশের দরজার একটা পাট খুলে দাঁড়িয়েছে ছ-সাতবছরের হাফপ্যান্ট-পরা একটি মেয়ে। কিন্তু জিজ্ঞাসাটা তার নয়। দরজার আড়াল থেকে মেয়েলি গলায় প্রশ্নটা এসেছে।

শাড়ি আছে মা। নেবেন ?

কই দেখি।

একদিকে মিশকালো অপরদিকে টুকটুকে লালপাড়ওলা মিহি শাড়িটা জীবন ছোটো মেয়েটির হাতে তুলে দেয়। তার সাধারণ মোটা তাঁতের শাড়ির মধ্যে এখানাই সব চেয়ে সেরা এবং সব চেয়ে দামি কাপড়। আজ প্রায় দশ বারোদিন কাপড়টা নিয়ে ঘুরছে, বিক্রি হয়নি। দাম শুনে সবাই ফিরিয়ে দেয়। দরদস্তুর পর্যন্ত করে না।

এখানেও তাই ঘটে। দাম শোনার পর ফিরে আসে কাপড়টা।

কম দামের নেই ?

তিন-চারখানা রঙিন তাঁতের শাড়ি মেয়েটির হাতে ভিতরে যায় আসে, আসল দরদস্তুর শুরু হয় লালপাড়, ফিকে সবুজ জমির শাড়িখানা নিয়ে, জিনিসটার গুণকীর্তন করতে করতে জীবন দশ টাকা থেকে নামে, অপর পক্ষ চার টাকা থেকে অল্পে অল্পে ওঠে। রফা হয় ছ-টাকায়।

দর করতে পাকা হয়ে উঠেছে মেয়েরা। ফেরিওলাকে একেবারে অর্ধেকের চেয়ে কম দাম বলে বসতে পুরুষের সংকোচ হয়, মেয়েদের একবার ভাবতেও হয় না।

একটি টাকা আর সিকি দুয়ানিতে মিলিয়ে মেয়েটি দুটি টাকা তুলে দেয় জীবনের হাতে।

বাকিটা দুদিন পরে নিয়ো।

ধারে তো দিতে পারব না মা। সামান্য কারবার, দাম ফেলে রাখলে পোষায় না মা।

বাকিতে মাল দিতে হয় জীবনকে। দুপুরবেলা ঘরের মেয়েদের সঙ্গে বেচাকেনা, মেয়েদের হাতে শুধু টাকা না থাকার জন্যই নয়, টাকা থাকলেও অনেক সময় কর্তাকে দিয়ে কেনাটা আগে মঞ্জুর করিয়ে নেবার জন্যও বাকিতে নেওয়া দরকার হয়। মঞ্জুর না হলে যাতে ফিরিয়ে দেওয়া চলে পরদিন।

অচেনা বাড়ি অচেনা মানুষ হলেও এটা মেনে নিতেই হয় ফেরিওলাকে। দুয়ারের কাছে বসে ঘরসংসার যেটুকু দেখা যায় দেখে আর সামনে এসে যে মানুষটা জিনিস পছন্দ করে কেনে তার বেশভূষা চালচলন থেকে ফেরিওলা আঁচ করে নিতে পারে ধারে মাল রেখে যাওয়া নিরাপদ কি না।

কিন্তু এভাবে ফেরিওলাব সামনে বেরোতে লজ্জা করাটা রহস্যজনক অস্বাভাবিক ব্যাপার। ফেরিওলাকে মেয়েরা লজ্জাও করে না, ভয়ও করে না।

এ অবস্থায় টাকা বাকি রাখা যায় না। কাল-পরশু এসে হয়তো শুনবে, কই, এ বাড়িতে কেউ তো কাপড় রাখেনি তোমার কাছে ! কাকে তুমি কাপড় দিয়েছিলে, কে রেখেছে তোমার কাপড় ?

ভেতর থেকে মেয়েলি গলায় আবার মিনতি মেশানো উপরোধ আসে, দুদিন বাদে এলেই ঠিক পেয়ে যাবে।

বাকি দিতে পারব না মা।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাটে। তারপর দরজার দুটি পাট খুলে এসে দাঁড়ায় শ্যামবর্ণা একটি বউ। লালপাড় ফিকে সবুজ জমির নতুন শাড়িটাই সে পরেছে।

করুণ কণ্ঠে বলে, মা বলে ডেকেছ, বাকি না রেখে গিয়ে পারবে না বাবা। গা থেকে খুলে নিতে হবে। তোমার সামনে আসতে পারিনি, তোমার কাপড়টি পরে তবে এলাম।

এ জুলুমের প্রতিকার নেই। আধঘণ্টা পরে বৃষ্টি ধরলে জীবন বিরস মুখে পথে নেমে যায়। শহরতলির শহরে আর গেঁয়ো পথে ধীরে ধীরে হাঁটে আর মাঝে মাঝে হাঁক দেয়। শহর আর গ্রাম শহরতলিতে একাকাব হয়ে যায়নি এখনও, পাশাপাশি ঘেষাঘেষি হয়ে এসেছে। এখানে ওখানে শুধু মিশে গেছে খানিকটা। শুধু একটা ইটের প্রাচীরের ব্যবধান হলেও পানাপুকুরটা খাপ খায়নি নতুন ঝকঝকে সিনেমা হলটার সঙ্গে।

কত রকমারি জিনিসের কত ফেরিওলা যে পথে নেমেছে এই শহরতলির। কিন্তু জীবন জানে তার হাঁক শুনলে ছিটকাপড় শায়া ব্লাউজওলার হাঁক শুনলে, সব চেয়ে বেশি উৎসুক মুখ উঁকি দেয় জানালা দিয়ে,' তারাই আকর্ষণ করে সব চেয়ে বেশি লুব্ধদৃষ্টি।

সন্ধ্যার আগে শ্রান্ত অবসন্ন দেহে জীবন শহরতলির সীমান্তে তার ঘরের দিকে পা বাড়ায়। অ্যালুমিনিয়ামের বাসনের ঝাঁকা মাথায় একজন এগিয়ে আসছিল তারই মতো শ্রান্ত পায়ে ; দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করে, শাড়ির কেমন দাম ভাই ?

তেরো-চোদ্দো জোড়া হবে।

তেরো-চোদ্দো !

এগারো টাকাব নীচে নেই।

সে নীরবে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়।

বীণা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, কীরকম হল ?

সুবিধে নয়।

প্রায় ছেঁড়া ন্যাকড়া হয়ে গেছে বীণার কাপড়টা। ঘরে সে এটাই পরে। চৈতন্যবাবুর বাড়ি খাটতে যাওয়ার জন্য একমাত্র সম্বল একখানি আস্ত কাপড় সে সযত্নে তুলে রাখে। আপিসে যাওয়ার জন্য

ওদিকের ঘরের অঘোরের মতো একটি ধুতি, একটি পাঞ্জাবি আর একটি গেঞ্জির সেটটি প্রাণপণে বাঁচিয়ে চলার মতো। টেনেটুনে যতদিন চালানো যায়।

গামছা আর শাড়ি চাদরের বোঝা নামিয়ে জীবন চৌকিতে সটান শুয়ে পড়লে, বীণা ভূমিকা শুরু করে দেয়, শুনলে তো তুমি রাগ করবে, কিন্তু কী করব বলো উপায় ছিল না—অ্যালুমিনিয়ামের একটা হাঁড়ি কিনেছি ফেরিওলার কাছে।

একটু থেমে বলে, আগের হাঁড়িটা ফুটো হয়ে গেছে ক-দিন। তোমার রকম সকম দেখে আমি বারু বলতে ভরসা পাইনি। ভাত তো রাঁধতে হবে, পিন্তি ? মাটির হাঁড়িটাতে চাল রাখতাম, ক-দিন সেটাতে ফুটিয়েছি। আজ সকালে সেটাও ফেঁসে গেছে।

জীবন কিছু বলে কিনা শোনার জন্য খানিকটা থেমে আবার বলে, একটু চালাকি করে বাকিতে রেখেছি। ওইটুকু হাঁড়ি, তার দাম সাত সিকে। দরদস্তুর করে পাঁচ সিকেয় রাজি করালাম। তা পাঁচ সিকে পয়সাই বা দিই কোত্থেকে ? বললাম, ফুটোফাটা আছে কিনা দেখে কাল দাম দেব। কিছুতে বাকিতে দেবে না। কী করি ? উনুনটা ধরেনি তখনও ভালো করে। হাঁড়িটা চটপট মেজে জল আর চাল দিয়ে ধোয়ার মধ্যেই চাপিয়ে দিলাম। ভেতরে ডেকে এনে দেখালাম। বললাম কী করি বলো, উনুনে চাপিয়ে দিয়েছি, ধারে না দিলে উনুন থেকে নামিয়ে নিয়ে যেতে হয়। গজর গজর করতে করতে চলে গেল।

নতুন হাঁড়িতে ভাত রান্না হয়েছে। ভাতে কি একটু নতুনত্ব লাগবে ? বোঁটকা গন্ধটা একটু কেটে যাবে, ঠান্ডা হয়ে আসতে আসতে কড়কড়ে হয়ে যাবে না ?

অবসাদ কল্পনাতেও কেমন ছেলেমানুষি রং লাগিয়ে দেয়। বাচ্চা দুটোর সঙ্গে বসে ট্যাড়স চচ্চড়ি আর ডাল দিয়ে ভাত খেয়ে জীবন ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে মুষলধারে বৃষ্টি।

শেষরাত্রে নেমেছে। টুপটাপ জল পড়ে পড়ে ঘরের ভিতরটা অর্ধেক ভেসে গিয়েছে। ছাদটা একটু কাত হয়ে আছে একদিকে। কে জানে এভাবেই তৈরি হয়েছিল কিনা অথবা এটা প্রাচীনত্বের ফল। ধ্বসে পড়ুক আর যাই হোক, ভাগ্যে ছাদটা একটু কাত করা। পাশে জল চুইয়ে এলেও সরাসরি ঝরে না পড়ে ছাদ বেয়ে খানিকটা গড়িয়ে গিয়ে ঝরে- তাই চৌকিটা রক্ষা পায়।

রক্ষা পায় ছেঁড়া তোশক বালিশ জামাকাপড়ের সঙ্গে নতুন শাড়ি চাদর গামছা—আর বাচ্চা দুটো।

জীবন ভেবেছিল খুব ভোরে বেরিয়ে পড়বে মাল নিয়ে সরাসরি গিয়ে বউটির স্বামীকে পাকড়াও করে কাপড়ের বাকি দামটা আদায় করে ছাড়বে।

কিন্তু সবদিক দিয়ে শত্রুতাই যদি না করবে তবে আর বর্ষাকাল কীসের !

কে জানে সারাদিনে আজ এ বৃষ্টি ধরবে কি না ?

বীণা গোমড়া মুখে বলে, এর মধ্যে কী করে কাজে যাই ? কামাই করলে গিন্নি আবার খেপে যায় !

বীণার গায়ের রং শ্যাম, হাজায় হাজায় হাত আর পায়ের আঙুলগুলো সাদা হয়ে গেছে। দেখলে মনে হয় হাতে পায়ে বুঝি মরণ দশার পচন ধরেছে।

জীবন বলে, গিন্নি খেপে যান যাবেন, বর্ষা হলে মানুষ করবে কী ?

চৌকিতে গুছিয়ে রাখা নতুন শাড়িগুলির দিকে চেয়ে বীণা বলে, তুমি তো বলে খালাস, গিন্নি এদিকে এবার পুজোয় কাপড় না দেবার ফিকিরে আছে। পরশু একবেলা কামাই করলাম, তাতেই শাসিয়ে দিয়েছে—কামাই করলে পুজোর কাপড় পাবে না বাছা, বলে রাখলাম।

না দেয় না দেবে। আমরা ভিখিরি নই।

ভিখিরি কীসের ? সব ঝি পায়। সারাবছর কাজ করলেই দুখানা কাপড় দিতে হবে।

জীবন মৃদু হেসে বলে, এ তো আগের নিয়ম গো, এবার ক-জনে পায় দেখো। নিয়ম বলে কিছু আছে দেশে ? নইলে লেখাপড়া শিখে গামছা ফিরি করি, তোমায় ঝি-গিরি করতে হয় ?

বীণা নিশ্বাস ফেলে বলে, জানো, মাগি টের পেয়েছে তুমি আমায় অন্য বাড়ি খাটতে দেবে না। নইলে এত তেজ দেখাতে সাহস পেত না। অন্য ঝি-রা কথায় কথায় কাজ ছাড়ছে, আজ এ বাড়ি কাল ও বাড়ি করছে।

মূক আবেদনের ভঙ্গিতে বীণা চেয়ে থাকে। কিন্তু জীবনের কাছ থেকে কোনো সাড়াশব্দ মেলে না। অন্য ঝিদের মতো এ বাড়ি ও বাড়ি কাজ করে বেড়াবার অনুমতি সে বীণাকে দিতে পারবে না। ঘরের কাছে হারাধনবাবুর বাড়ি, বুড়ো হারাধন ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষ নেই। বউকে এখানে কাজ করতে দিতে হয়েছে তাই যথেষ্ট। তাকে পুরোপুরি ঝি বানিয়ে আর কাজ নেই।

অঘোরের আট বছরের ছেলে ভোলা এসে বলে, বাবা একটা বড়ো গামছা চাইল। মাসকাবারে দাম দেবে।

ধারে দিতে পারব না।

ভোলা ফিরে যায়। আবার এসে গামছার দামটা জিজ্ঞাসা করে যায়। তারপর কোমরে ছেঁড়া বিছানার চাদর জড়িয়ে অঘোর নিজেই আসে।

বলে, জানো হে জীবন, বঙ্কুর দোকানে চিরকাল বাকিতে গামছা কিনেছি। আজ বিপাকে পড়ে তোমার কাছে নগদ দামে কিনতে হল। গামছা পর্যন্ত চুরি যায়, অ্যাঁ ? তাও এক মাসের ওপর ব্যবহার করেছি ?

চুরি গেছে ?

তবে কী ? কাজে যাবার একটি কাপড় সম্বল, গামছা পরে নাইতে যাই। কে মেরে দিয়েছে কে জানে ! আমার গামছা ব্যবহার করে তোরও যেন গেঁটে বাত হয় বাবা ! ভাবলাম দুত্তেরি, ন্যাংটো হয়েই নাইতে যাই ! তা কেমন লজ্জা করতে লাগল !

অঘোর ফোকলা মুখে হ্যা হ্যা করে হাসে।

আপনার লুঙ্গিটা কী হল ?

সেটাও চুরিই গেছে বলতে পার। ঘরের মানুষ চুরি করেছে এই যা তফাত। লুঙ্গিটা কী জান ভায়া, ইস্তিরির লজ্জা নিবারণ করছে। ভালো একটা শাড়ি তোলা ছিল, বড্ড পাতলা, সেইটে পরতে হল—তা, বলে কিনা লজ্জা করে। তোমার লুঙ্গিটা দাও, শায়ার মতো পরব। এক মেয়ে পার করেছিস, আরেক মেয়ের বিয়ের বয়স হল, তোর অত লজ্জা কীসের ? ও সব পাট চুকিয়ে দিলেই হয় ! তা লজ্জাবতীরা মরলেও কী তা বুঝবে ?

অঘোর আবার শব্দ করে হাসে। জীবনের শাড়ি ক-টার দিকে চেয়ে থেকে বলে, বাকি দিলে একটা শাড়ি নিতাম। তা, বাকি তো তুমি দেবে না ভায়া !

জীবন খানিক চুপ করে থেকে প্রশ্ন করে, আপিস থেকে ফিরে পরবেন কী ?

গিন্নি যদি লুঙ্গিটা ফেরত দেন, সেটা পরব। নইলে তোমার এই গামছা। ততক্ষণে শুকিয়ে যাবে।

অঘোর চলে গেলে বীণা শুধোয়, ঘরে বসে কত রোজগার হল ?

রোজগার কোথায় হল ? এক বাড়িতে থাকি, পড়তা দামেই দিতে হল।

অ কপাল ! আমি ভাবলাম ঘরে বসে বউনি হল, বিষ্টিটা আজ ধরলে হয়। আজ বেরোলে সব মাল বিকিয়ে যাবে।

জলের ফোটা বাঁচিয়ে উনানটা পাতা হয়েছে। পুঁইশাক কুটতে বসে নিজের গা-টা একেবারে বাঁচাতে পারেনি, টপটপ করে বাঁ কাঁধে জল পড়েছে।

এ বেলা শুধু পুঁইশাকের চচ্চড়ি। বাড়িতে ডাল নেই একদানা। হাত একেবারে শূন্য নয় জীবনের। ক-দিনের মাল বেচার টাকা বাকসে জমা আছে। টাকা আছে কিন্তু ডাল ও তরকারি এমনভাবে একটু বেশি কেনার উপায় নেই যাতে আকাশ ভেঙে বর্ষা নামলে একটা বেলা চলে যায়। ওই টাকায় মাল কিনতে হবে।

টাকা আছে খরচ করা যায় না। এ অবস্থায় এ যে কা অসহ্য সংযম মানুষের, জীবন ছাড়া কে বুঝবে!

দুপুরে বৃষ্টি থামে। মেঘ সরে গিয়ে বেরিয়ে আসে নীল আকাশ। রোদ ওঠে কড়া।

জীবন বেরোবার জন্য তৈরি হয়। বীণা বলে, ভাতের হাঁড়ির দামটা রেখে যাও। আজ দাম না পেলে গাল দিয়ে যাবে।

হাঁড়ির দামটা তার হাতে দেবার সময় জীবন ভাবে, সে ও যদি বাকি টাকার জন্য গাল দিতে পারত ওই বউটিকে!

কাঁধে পসরা চাপিয়ে সে বেরিয়ে যাবে অঘোরকে জামা পরে ঘর থেকে বার হতে দেখে জিজ্ঞাসা করে, আপিস যাননি দাদা ?

যা বিষ্টি, কী করে যাই বল ?

অঘোরের তবে ভালো আপিস, বৃষ্টির দোহাই মানে!

কোন দিকে যাবেন ?

আপিসেই যাচ্ছি।

ফেরিওলাকে পাড়া বদলাতে হয় রোজ। একদিন যে পাড়াটা চষে, ক দিন বাদ দিয়ে তবে আবার সে পাড়ায় আসতে হয়।

সকাল থেকে বৃষ্টির কৃপায় বিশ্রাম পেয়েছে, জীবন পা চালিয়ে দেয় দূরের সব চেয়ে ঘনবদ্ধ পাড়ার দিকে। ওখান থেকে বাজার খানিকটা কাছে হয়, কিন্তু সে জন্য কিছু আসে যায় না। মেয়েরা কাপড় গামছা কিনতে দোকানে যায় বটে আজকাল, এ এলাকার মেয়েরা কমই যায়।

বসতি খুব ঘন, গাদাগাদি করা মধ্যবিত্তের অনেকগুলি অন্তঃপুর।

হাঁক শুনে এক দোতলা বাড়ি থেকে জীবনকে ডেকে চার পাঁচটি মেয়েবউ কাপড় দেখছে, বাইরে আরেকজনের হাঁক শোনা যায় ছিটকাপড় —শায়া ব্লাউজ চাই। তাকেও ডেকে আনে মেয়েরা। কাঁধে ছিটের থান আর পিঠে শায়া ব্লাউজ ফ্রকের পুঁটলি নিয়ে আপিসের কেরানি অঘোরকে ফেরিওলাদের দুপুরবেলার আসরে নামতে দেখে জীবন হাঁ করে চেয়ে থাকে।

অঘোর হেসে বলে, অবাক হয়ে গেছ ভায়া বলবখন সব বলবখন।

দুজনেরই বিক্রি হয়। জীবনের লাল কালো পাড়ের শাড়িটা কিনে নেয় মাঝবয়সি একটি বউ, ভালোই লাভ থাকে জীবনের। অঘোর বেচে দুটি ব্লাউজ। তার রকম সকম দেখে বেশ বোঝা যায়, আজকেই সে হঠাৎ ফিরি করতে নামেনি। সে-ও পাকা ফেরিওলা।

একসাথে পথে নেমে অঘোর বলে, ক মাস চাকরি গেছে। চাকরি জোটে না, কী করি, ভাবলাম তোমার রাস্তাই ধরি। বসে খেলে চলবে কেন ?

তা গোপন করেছেন কেন ? ফিরি করেন বলতে লজ্জা হয় নাকি দাদা ?

লজ্জা না কচুপোড়া। যার পেট চলে না তার আবার লজ্জা ! কী জান, মেয়েটার একটা সম্বন্ধ ঠিক হয়ে আছে। শ্রাবণের শেষ তারিখে বিয়ে। আপিসে কাজ করি জেনে মেয়েটাকে পছন্দ করেছে, জামা ফিরি করি শুনলে যদি পিছিয়ে যায় ? এই ভয়ে ফাঁস করিনি কিছু। যাবার সময় বন্ধুর দোকানে মালপত্র রেখে যাব, ঘরে নিই না। তুমি যেন আবার পাঁচজনের কাছে ফাঁস করে দিয়ো না ভায়া।

জেনেও কী তা করতে পারি দাদা ?

ভদ্দরলোক সেজে থেকেই মেয়েটাকে পার কবি, তারপর দেখা যাবে। মেয়ের শ্বশুরবাড়ির সামনে গিয়ে ছিটকাপড় শায়া ব্লাউজ হাঁকব।

দাঁড়িয়ে গল্প করার সময় নেই। দুজনেই দুদিকে পা চালায়।

আরেকটা দিন শেষ হয়ে আসে। বর্ষাকালের আধখানা বৃষ্টিহীন দিন।

ঘরের দিকে পা বাড়ায় জীবন। শ্রান্তিতে শরীর ভেঙে এলেও একটু ঘুরপথ ধরে খানিকটা বেশি হাঁটতে হলেও অবসন্ন শরীরে সেই বউটির বাড়িতে একবার সে তাগিদ দিয়ে যাবে।

ওব স্বামী যদি কাজ থেকে ফিরে থাকে তবে তো কথাই নেই।

বারান্দার মাঝামাঝি বাড়ির প্রধান দরজাটা খোলাই ছিল। বারান্দায় বসে সিগারেট টানছিল খালি গায়ে পাজামা পরা একটি যুবক।

পাশের দিকের বন্ধ দরজাটা দেখিয়ে জীবন বলে, এ ঘরের বাবু আছেন ?

সে উদাসভাবে বলে, আছে বোধ হয়। ডেকে দ্যাখো।

কড়া নাড়তে দরজা খুলে উঁকি দেয় সেই ছোটো মেয়েটি।

তোমার বাবা ঘরে আছেন খুকি ?

বাবা তো বেরোয়নি। বাবার জ্বর।

ভেতর থেকে পুরুষের গলা শোনা যায়, কে বে রাধি ?

সেই কাপড়ওলাটা।

গায়ে একটা জীর্ণ শতরঞ্জি জড়িয়ে ভেতরের মানুষটা জীবনের সামনে এসে দাঁড়ায়। অ্যালুমিনিয়ামের বাসনের সেই ফিরিওলাকে রক্তবর্ণ চোখ নিয়ে সামনে দাঁড়াতে দেখে নিজের পাওনা টাকাটার বদলে প্রথমেই জীবনের মনে আসে এই কথা যে লোকটার খুব জ্বর, কয়েক দিনের মধ্যে বীণার কাছে হাঁড়ির দামটা সে চাইতে যেতে পারবে না।

সংঘাত

বিন্দের মা তার খড়ের ঘরের সামনের সরু বারান্দাটুকুর ঘেরা দিকে তাদের আশ্রয় দিয়েছিল।

ঘরে ঢুকবার দরজা বারান্দার মাঝামাঝি, তার এদিকের অংশটা ঘেরা, ওদিকটা ফাঁকা। চালাটা বারান্দার উপরে নেমে এসেছে, কোমর বাঁকিয়ে নিচু হয়ে বারান্দায় উঠতে হয়।

তিন হাত চওড়া ও হাত পাঁচেক লম্বা হবে ঘেরা অংশটুকু বারান্দার—তার ভাড়া দুটাকা। বাচ্চাটাকে ধরে তারা তিনটি মোটে প্রাণী, তাদের নড়তে চড়তে কষ্ট হয়।

বিন্দের মা তাদের আশ্রয় দিয়ে বলেছিল, এখন এমনি থাকো। কাজকর্ম জুটিয়ে নাও, তারপর দুটাকা ভাড়া দিয়ো। মাসে দুটাকার বেশি চাইব না আমি।

গাছতলা ছাড়া গতি ছিল না তখন তাদের। কত ভালো লেগেছিল বিন্দের মা-র কথাগুলি !

দুবাড়িতে বিন্দের মা শৈলর কাজ জুটিয়ে দিয়েছে। কত ভালো মানুষ মনে হয়েছে তাকে !

মাসকাবারে বেতন পেয়ে আজ এই আঁধার ঘুপচিটুকুর জন্যে দুটো টাকা দিতে কিন্তু গাটা চড়চড় করে শৈলর। ছেলে কোলে দুবাড়িতে খেটে কত কষ্টে রোজগার করা কটা টাকা !

জীবনে নিজে খেটে প্রথম রোজগার।

মাখনের এখনও কাজ জোটেনি। এই সামান্য টাকা থেকে ঘরভাড়া দিলে তারা খাবে কী ?

শৈল বলে, মানুষটা একটা কাম জুটাইয়া নিক, তারপর থেইকা ভাড়া নিয়ো। কয়টা টাকা পাইছি, ভাড়া দিলে থাকব কী ?

বিন্দের মা গালে হাত দিয়ে বলে, কাজ না জুটিয়ে দিলে ও টাকাও পেতি ? দুটো টাকা ভাড়া দেবে তার বায়না কত !

চাষির মেয়ে শৈল ফোঁস করে ওঠে, বায়না কীসের ? ভাড়া দিমু না কইছি ! দাও, টাকা মিটাইয়া দাও।

মাইনে এনে মাখনের হাতে তুলে দিতে হয়েছে শৈলকে। সে স্বামী, তারও মালিক, তার রোজগারেরও মালিক। টাকা হাতে নিয়ে গুনে দেখে চোখ পাকিয়ে মাখন বলেছিল, টাকা লুকাইছস ? বড়ো দালানে বারো টাকা না ? বাইর কর তিন টাকা।

মরণ আমার ! কবে কামে লাগছি খেয়াল আছে ?

তা বটে। ও বাড়িতে পুরো মাসের মাইনে শৈলর পাবার কথা নয় !

মাখন দুটো একটাকার নোট ছুড়ে দেয় বিন্দের মা-র দিকে, নোট দুটো ফরফর করে উড়ে মাটিতে পড়ে।

কুড়িয়ে নিয়ে চোখ পাকিয়ে তাঁদের দিকে তাকায় বিন্দের মা। পেট ভরে খেতে জোটে না, দয়া করে থাকতে দিয়েছি, তেজ কত। তবু যদি মিনসের নিজের রোজগার হত, বউয়ের ঝি-গিরির টাকায় ঘরে বসে না খেত।

চাল ঝাড়ার বাড়তি কাজ করে শৈল কিছু খুদ এনেছে। মাখন বলে, খুদ থুইয়া দে। এক সের চাল আর কিছু মাছ নিয়া আসি। কতকাল মাছ খাই না।

আলাপাথারি খরচ কইরো না।

কাইল পরশু ওই ঘরের বেতন পাবি না ?

সারাডা মাস চালান লাগবো না ?

মাখন নির্বিচারে হেসে বলে, তুই ভাবছস কী ? আমি কাম করুম না ? খাইটা খামু, ডর কীসের !

শৈলের একখানা শাড়ি দুখণ্ড করে সে লুঙির মতো পরে। কাঁধে ময়লা দুর্গন্ধ গামছা। শৈলব মোটে একখানি কাপড় সম্বল, সারাদিন পরে, লোকের বাড়ি কাজ করে, রাঁধে বাড়ে—সবই করে। রাত্রে শোবার আগে গা ধুয়ে ছেঁড়া ন্যাকড়া গায়ে জড়িয়ে কাপড়খানা কেচে মেলে দেয়।

মাটির একটা হাঁড়ি আর ছোটো একটি কড়াই ছাড়া বাসনপত্র কিছুই নেই। একটা উনান পর্যন্ত নেই। কাজ সেরে এসে বিন্দের মা-র রান্না শেষ হলে তার উনানে ভাত বা খুদ সিদ্ধ করে নিতে হয়। কিছু কয়লা ধার হয়েছে।

আর কিছু হোক বা না হোক চলনসই একটা ঘর, দুটো বাসন, নিজেদের একটা উনান – পেটের চিন্তাই সবার উপরে উঠে আছে। পূজার সময় দুবাড়ি থেকে সে দুখানা শাড়ি পাবে—সে পর্যন্ত নয় এভাবেই চালিয়ে যাবে কোনোমতে। কিন্তু কী দুরন্ত কী ভয়ানক এই পেটের খিদে !

বিন্দের মা এত ক-টি ভাত খায় ভাজা ব্যঞ্জন দিয়ে আর হাঁ করে শহরে নবাগতদের দুটি কাঁচা লংকা দিয়ে এককাঁড়ি ভাত কোঁত কোঁত করে গিলে ফেলার কসরত চেয়ে দ্যাখে !

রেশনের চাল আনে—দুদিনে তিনবার চারবার করে খেয়ে শেষ করে দেয় ! আটা কোনখান দিয়ে কীভাবে শেষ হয়ে যায় টের পায় না। তারপর চলে এ বেলা আধপেটা, ও বেলা সিকি-পেটা সে বেলা উপোস—চাল ধার করার চেষ্টা এবং শৈলর বাড়তি কাজ করে আনা খুদটুকু দিয়ে কোনো রকমে দিন কাটানো।

বিন্দের মা অন্যদের কাছে বলে, ছি ছি রাম রাম। মাগো মা, এমন পেটুক, এমন বেহিসেবি ! আর কী নোংরা বাবা, মদ্দমাগি কেউ কী ঘাট করে কাপড় ছাড়বে ? ছাড়বে কী, থাকলে তো ছাড়বে। সম্বল তো ওই পরনের ন্যাকড়াটুকু।

হাড্ডিসার পেট মোটা পাঁচ বছরের বাচ্চাটা এখনও মাই খায়। ওকে ছাড়া একদণ্ডে জগৎ অন্ধকার হয়ে আসে শৈলর, তবুও ওর জন্যই প্রাণ তার অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ওকে নিয়ে কাজে যেতে হয়, ঘর ধোয়া বাসন মাজা উনান নিকানো সব কাজ করতে করতে সর্বদা ওকে সমালাতে হয়। খাওয়া-দাওয়ার সময় দূরে দাঁড়িয়ে নজর দিলে, ঘরে গেলে, বাড়ির মানুষ বিরক্ত হয়, গজগজ করে।

কড়া সুরে বলে, ওকে রেখে আসতে পার না ? বড়ো নোংরা বাছা তোমার ছেলে। গায়ে প্যাঁচড়া, কানে ঘা,—ছেলেপিলের না ছোঁয়াচ লাগে।

মাখনের কাজ নেই কিন্তু বাচ্চাটাকে রাখতে সে রাজি নয়। বলে, তর পোলারে নিয়া থাকুম, কামের খোঁজে যামু না ?

বাড়ি ফিরে শৈল দ্যাখে সে চিত হয়ে কাঁথায় শুয়ে আছে। শোনে বাড়ির বাইরেও সে যায়নি একবারও।

ঝগড়া করলে মাখন মুখ খিচিয়ে বলে, হ, বুঝছি সব, তোর মতলব খারাপ। ক্যান পোলারে নিয়া কেউ কাম করে না ? সুবিধা হয় না বুঝি পিরিত করনের ?

পিরিতের একটা অশ্রাব্য বিশেষণের মুখে আগুন জ্বেলে দিয়ে বাচ্চাটাকে দড়াম করে ফেলে শৈল মুখ খোলে। বিন্দের মা কান পেতে শোনে। অনেক কটুকথা শৈল বলে কিন্তু মাখন যে বসে বসে তার রোজগার খাচ্ছে এ কথাটা একবার একটু ইঙ্গিতেও উল্লেখ করে না !

মাখন বলে যে জানে ; সে সব জানে। বিন্দের মা-ই তাকে বলে দিয়েছে খোকাকে তার সঙ্গে দিয়ে কাজে পাঠাতে, একলা তাকে কাজে যেতে বারণ করেছে।

বিন্দের মা সামনে এসে বলে, ও কথা তোকে কখন বললাম রে মুখপোড়া ? ভালো চাইলে উনি মন্দ বোঝেন ! আমি বললাম মায়ের ছেলে মায়ের সাথে থাকবে, কাজে যাক বা সে চুলোয় যাক—মরদ মানষের কী ছেলে আগলে ঘরে বসে থাকলে চলে ? কাজ খুঁজতে মন নেই, মোর নামে উলটো গাইছেন !

মাখন চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে থাকে।

বিন্দের মা খনখনিয়ে বলে, চোখ রাঙাচ্ছে। আরে আমার ব্যাটাছেলে ! বউয়ের রোজগার বসে খায়, লজ্জাও নেই।

শৈল যে খোঁচাটা কখনও দেয় না, মাখনকে সেই খোঁচা দিয়ে বিন্দের মা যেন স্বস্তি পায়।

মাখন ফিরে আসে—চাল নিয়ে, তরকারি নিয়ে, শিশিভরা তেল নিয়ে—দেড়পো গলদা চিংড়ি নিয়ে।

ক্ষণেকের জন্য লোভাতুর দৃষ্টিতে চেয়ে শৈল চাঙা হয়ে ওঠে, তারপর বিমর্ষ বিরস মুখে মাই ছাড়িয়ে ছেলেটাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়।

কয় টাকার সওদা করছ ?

তা দিয়া তর কাম কী ?

বিন্দের মা একবার উঁকি দিতে এসে গালে হাত দিয়ে ফিরে যায়। তার রান্না শেষ হলে তোলা উনানটি বারান্দায় এনে দুটি কয়লা দিয়ে গোমড়া মুখে শৈল নিজের রান্না শুরু করে—এতটুকু উৎসাহ আছে মনে হয় না।

আমি যদি আজ ভাত খাইছি, তরে কী কইলাম !

মাখন সজোরে নিজের উরুতে চাপড় মারে !

শৈল মাছ ভাজতে ভাজতে মুখ ফিরিয়ে একগাল হেসে বলে, না খাইলা, আমি একাই খাইয়া শেষ করুম—খোকা আর আমি। কতকাল পরে আইজ ইচা মাছ খামু !

সুতরাং রান্না হলে মাখন গোগ্রাসে এক থালা ভাত খায় ঝিঙা কুমড়ার তরকারি আর গলদা চিংড়ির ঝোল দিয়ে। মোড়ে বিন্দের মনোহারি মুদিখানা পান বিড়ি সিগারেট বেচার মিশ্রিত দোকান থেকে চোদ্দো আনা সের দরে কেনা দেড় সের চাল—চাল বেশ ভালো। শৈল অর্ধেক চালের ভাত রেঁধেছিল, তবু মাখন আর ছেলেকে খাইয়ে, তার পেট মনের মতো ভরল না।

শৈল এক রকম চাইতে না চাইতে দুবাড়িতে ঠিকে ঝির কাজ পেয়ে গেছে। বাচ্চাটা না থাকলে এবং ইচ্ছা করলে আরও এক বাড়িতে কাজ সে জোটাতে পারে অল্প চেষ্টাতেই। অনেক ঝি তিন বাড়িতে ঠিকে কাজ করে।

দেখা যায়, মাখনের কাজ জোটানো অত সহজ নয় !

কোন কাজ জুটিয়ে নেবে তাই তার ঠিক নেই।

চাষা মানুষ, চাষ করা ছাড়া কোনো কাজ জানে না।

চাষির মেয়ে চাষির বউ বলেই শৈল ঘরকন্নার কাজে পাকা—বাসন মাজা, মশলা বাটা, নিকানো, পোছান, উনান সাজানো, কয়লা ভাঙার মে:' দৈনন্দিন সাধারণ সাংসারিক কাজে তো বটেই, ভদ্রঘরের অধিকাংশ মেয়েবউ যে কাজ একেবারেই জানে না অথচ আজ রেশনের ধুলো কাঁকড় মেশানো চাল আর গমকে কাজ না জানলে খাওয়াব যোগ্য করা যায় না—যেমন, কুলো দিয়ে ঝেড়ে নেওয়া—সে কাজেও !

শৈল দুবাড়িতে নিয়মিত বাসন মাজা-টাজার কাজ করে—চার-পাঁচবাড়ির গিন্নিরা তাকে ডাকিয়ে তার সুবিধা আর অবসর অনুসারে তাকে দিয়ে কুলো চালিয়ে কয়লার গুঁড়ো গোবর আর মাটি মেশান গুল তৈরি করিয়ে, চাল বা নগদ পয়সা মজুরি দেন।

কেউ কেউ বলে, কাজটা করে দিয়ে এ বেলা খাবি এখানে।

অর্থাৎ একবেলা খাওয়াটাই মজুরি।

বড়ো খিদে শৈলর। মাছ ডাল ভাজা তরকারি আশা করে সে মহোৎসাহে কাজ করে দেয়। বাবুরা ভালোমন্দ কত রকম খায় ঠিক ঠিকানা আছে কী!

খেতে বসে সে টের পায়, বাবুদেরও খাওয়া দাওয়ার বড়ো দুর্দশা!

যাই হোক, ভালো জিনিস না পাক, খানিকটা ডাল আর খানিকটা তরকারি দিয়ে সপুত্র পেট ভরানোর মতো ভাত তো সে পায়। খিদে কী অত বাছ বিচার পছন্দ অপছন্দ জানে, না মানে। নুন কাঁচালংকা দিয়ে পেট-ভরা ভাত পেলে সে বর্তে যায়!

ঝঞ্ঝাট বাধায় মাখন।

তেড়ে বলে, এত দেরি ক্যান? কোন কাম কইরা আইলি তুই যে এত দেরি হইল?

কিরা কথা কও? ঘরের মাইনষেরে খাওয়াইয়া তবে আমারে দিছে না?

দুপুরে বিন্দের মা শৈলকে ডাকে। বলে, আয় হাড়হাবাতে বোকা মেয়ে, চুল বেঁধে দি। খেটে মরবি বলে চুলটাও বাধবি নে? কী কুক্ষণে যে তোকে দেখে মোর মায়া বসেছিল রে —

কামে যামু না?

যাবি, যাবি। সাত তাড়াতাড়ি কাজে যেতে অত তড়বড়াস নে। দেরি টেরি করে যাবি মাঝে মধ্যে। আরে মাগি, মন দিয়ে টাইম মতো যত খাটবি তত পেয়ে বসবে যে, এটা বুঝিসনে! না খাটিয়ে কেউ তোকে একটা বাড়তি পয়সা দেয়? বাসিভাত নর্দমায় ফেলে দেবে, তবু তোকে দেবে না। দিয়েছে কেউ?

ক্যান দিব না? দয়ামায়া নাই মাইনষের? তিনতলা বাড়ির মাঝের তলার উনি

ফরসা মোটা সুন্দরী মাগিটা?

হ। উনি আমারে ডাইকা নিয়া আলাপ করেন, কোনো কাম করান না। গা হাত পা টিপা দেই, ঘামাচি মারি, উচা পেটটারে দইলা মইলা দেই—

বিন্দের মা মুচকে মুচকে হাসে।

বলে, না লো ছুড়ি ফরসা মোটা সুন্দরী বউটা তোকে মোটেই খাটায় না। আধঘণ্টা একঘণ্টা তোকে দিয়ে শুধু গা টেপায় পা টেপায় ঘামাচি মারিয়ে নেয়। একটু আদর চেয়ে নেয় তোর কাছে। তারপর আদর করে গলার হারটি খুলে তোর গলায় পরিয়ে দেয়। দেয় তো?

তা না দিক, শৈলর ছেলেকে দু-একটা লজেন্স চকোলেট তো দেয়। শৈলকে দু চারআনা পয়সা তো দেয়। ভরসা তো দেয় যে রাতদিন খাওয়া পরার চাকরি নিয়ে থাকতে চাইলেই শৈলকে সে রাখবে। কিন্তু উপায় কী, মাখনের জন্য তো সেটা হবার নয়।

মা গো মা! আর পারি নে তোর সাথে!—শৈলর জটবাঁধা রুক্ষ চুল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বিন্দের মা, মেয়ে বউ রোগে দুর্ভিক্ষে মারা যাওয়ার খবর পেয়ে উতলা হওয়ার মতো ব্যাকুলভাবে বলে, গাঁ থেকে তোরা এমন হাবাগোবা এসেছিস, মাইরি বিশ্বেস হয় না মেয়েলোক এমনই গোরু ছাগলের মতো বোকা হয়। তোর রোজগারে খাচ্ছে মানুষটা, উঠতে বসতে তোকেই লাথিগুতো মারছে, তবু তুই আটা-সেঁটার মতো লটকে রয়েছিস ওটার সাথে।

শৈল মাথা সরিয়ে নেয়। বলে, জট ছাড়াইয়া কাম নাই, বড়ো লাগে। চুল বাঁধুম আনে সুদিন আইলে।

আর এসেছে তোর সুদিন, যা বোকা তুই। সব হাতে তুলে দিস কেন, টাকা পয়সা কিছু লুকিয়ে রাখতে পারিস না?

কই লুকামু? টের পাইলে মাইরা ফেলাইব!

তুই করবি রোজগার, তোকেই মেরে ফেলবে ? থাকিস কেন অমন লোকের সঙ্গে ?

রাম রাম, অমন কথা কইয়ো না। তেমন মানুষ না আমি।

মাখন বেশ খানিকটা বেহিসাবি, বেপরোয়া এবং রগচটা মানুষ। সেই সঙ্গে স্বার্থপর। এ সমস্তই সহ্য হত শৈলর। যা হাতে পায় বেশি বেশি খেয়ে শেষ করে দিয়ে দুরবস্থার সীমা রাখে না বটে কিন্তু ভালোমন্দ জিনিসও সে একা খায় না, বেশি বেশি খাদ্য শুধু নিজের পেটেই চালান দেয় না। তাদের সঙ্গেই যে ভালো খায়, কষ্টও ভোগ করে সমানভাবে।

কিন্তু দিন দিন অসহ্য হয়ে উঠছে তার সন্দেহ করা রোগটা। যুক্তি-তর্ক কিছুই সে বোঝে না। যদুব মা একবাড়িতে খাটে কাজে গিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরতে পাবে, তবু তার কথা তুলে কুটিল বাঁকা চোখে চেয়ে প্রায়ই সে জানতে চায় কী এমন কাজ শৈল করে, তার কেন ফিরতে দেরি হয় ?

রেশন আনার পয়সা নেই। বিন্দের মা-র পরামর্শে মাখন নিজেই তাকে মাইনের দুটো টাকা আগাম চেয়ে আনতে বলে, শৈল টাকা এনে দিলে সেই বলে, চাওনমাত্র টাকা দেয়, বাবুর লগে খুব খাতির না ?

কাজ খোঁজার নামে বেবিয়ে গিয়ে আচমকা মাখন ফিরে আসে !

তাড়াতাড়ি ফিবা আইলা ?

আইলাম। ক্যান অসুবিধা হইছে নাকি তর ? কেউ আসব নাকি ?

একদিন একটু উৎসাহেব সঙ্গে কাজের খোঁজে যায় তো তিন দিন ঘর ছেড়ে বেরোবার নাম করে না। শৈল জানতে পারে, সে কাজে গেলে মাখন বেবোয় এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে, কাজ সেবে তাব ঘরে ফেবার সময় ফিরে আসে।

শৈল অনুযোগ দিলে, কাজের খোঁজে না গিয়ে ঘবে বসে থাকার জন্য ঝগড়া করলে, মাখন বেগে আগুন হয়ে ওঠে ! কেন, তাকে ঘর থেকে তাড়াবার এত আগ্রহ কেন ? কাজে গিয়ে কার সাথে কী বজ্জাতি কবে কে জানে, তাকে তাড়িয়ে ঘরেও বজ্জাতির সাধ ?

তুই আবও টাকা পাস। কোথায় লুকাইয়া রাখছস ক আমারে।

প্রচণ্ড ঝগড়া বেঁধে যায়। মাখন ধাক্কা দিয়ে শৈলকে ফেলে দেয়। শৈল বসে বসে চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদে।

বিন্দেব মা কুটিল হিসেবি চোখে তাদের কলহ লক্ষ করে যায়।

বউ আব বাচ্চা দুজনের কান্না অসহ্য ঠেকায় বাচ্চাটার গালে একটা চড় বসিয়ে মাখন বেরিয়ে যায়। বিন্দের মা এসে কাছে বসে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে বলে, কী পাষণ্ড বজ্জাত মানুষ মাগো ! এমন করে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে, এইটুকু বাচ্চার গালে অত জোরে চড় বসালে ! তোকেও বলি বাছা, কেন এত সহ্য কবিস ? যত সইবি, তত বেড়ে যাবে। আমি হলে বাপু লাথি মেরে খেদিয়ে দিতাম। নিজে তুই রোজগার কবিস তোর ভাবনা কী ?

শৈল চোখ মুছতে মুছতে বলে, আমি যামু গিয়া।

বিন্দের মা খুশি হয়ে বলে, তাই যা। আমি তোকে ঘর ঠিক করে দেব।

শৈল কাজে যাবার আগেই মাখন ফিরে আসে। কীভাবে কোথা থেকে বিড়ি জোগাড় করে এনেছে সেই জানে, গোমড়া মুখে বসে জ্বলন্ত বিড়িটা টেনে শেষ করেই আরেকটা বিড়ি ধরায় !

শৈল কাজে গেলে বিন্দের মা মাখনের কাছে গভীর আপশোশ জানিয়ে বলে এ হল কলিকাল কী করবে বলো তুমি। ইদিকে তোমার কাজ নেই, উদিকে ছুঁড়ি পেয়েছে পয়সা-কামানোর সোয়াদ। শুধু বাসন মাজার পয়সায় কী মন উঠবে ওর ? তোমার সাধ্যি আছে ওকে ঠেকিয়ে রাখবে ! আজ বাদে কাল দেখবে কার সঙ্গে ভেগেছে।

খুন কইরা ফেলুম।

বিন্দের মা মুখ বেঁকিয়ে ভেংচি দিলে বলে, খুন কইরা ফেলুম ! আরে আমার মরদ রে ! অতই সস্তা যদি হত খুন করা, গন্ডা গন্ডা মাগি খুন হয়ে যেত। বোকাহাবা কোথাকার। এটা বুঝি তোর সেই পাড়াগাঁ পেয়েছিস যে খুশি হলে খুন করবি ? এ হল বাবা খাস কলকাতা শহর। কোথায় তলিয়ে যাবে মানুষের ভিড়ে এ জীবনে আর খোঁজ পাবি ভেবেছিস !

গুম খেয়ে রক্তবর্ণ চোখ মেলে মাখন বসে থাকে। নিজের অসহায় নিরুপায় অবস্থাটা সে মর্মে মর্মে অনুভব করছে টের পেতে বিন্দের মা-র বাকি থাকে না। সে গুজগাজ, ফিসফাস করে মাখনকে বোঝাতে থাকে সংসারের হালচাল, নিয়মনীতি !

তার মতে খুব সোজা নীতি। মাখনের মতো অবস্থায় যে পড়েছে তার কাছে অতি সুবোধ্য। পয়সা রোজগার করতে বেরিয়েছে যে মেয়েছেলে বাসন মাজা ছাড়াও অন্য উপায়ে বাড়তি রোজগার সে করবেই করবে। শ্রীভগবানেরও সাধ্য নেই তাকে ঠেকিয়ে রাখে। এভাবে চললে দুদিন বাদে শৈল তাকে ছেড়ে যাবেই, তার অন্যথা নেই। তার চেয়ে শৈলও হাতে থাকে, তার বাড়তি রোজগারও হয়, সেটা ভোগও করতে পারে মাখন, এ ব্যবস্থা কি ভালো নয় সব দিক দিয়ে ?

মাখন চুপচাপ শুনে যায়, কিছু বলে না। তার মুখ আর চোখের চাউনি দেখে বিন্দের মা-ই হঠাৎ একসময় থেমে যায়। কে জানে কীরকম মতিগতি এ সব গোঁয়ার রাগী মানুষের ! রাগ সামলাতে না পেরে হাতের কাছে পেয়ে তাকেই হয়তো মেরে বসবে !

শৈল রেহাই পাবার উপায় খোঁজে।

যেমন তেমন উপায় নয় সদুপায়। যাতে মাথা বিগড়ানো মানুষটার হাত থেকে সে রেহাই পাবে অথচ সন্দেহের জ্বালায় জ্বললেও মানুষটার মধ্যে সেটা আগুনের মতো দাউদাউ করে জ্বলে উঠবার কারণ ঘটবে না। কোনো ভদ্রপরিবারে খাওয়া-পরা দিনরাত্রির কাজ পেলেই সব চেয়ে ভালো হয়।

শৈল এ রকম কাজ খোঁজে। কিন্তু কোলে তার ছেলে, তাকে কেউ ওভাবে রাখতে চায় না। তিনতলা বাড়ির ফরসা মোটা গিন্নি বলে, ছেলে না থাকলে আমিই তো তোকে রাখতাম। ছেলের ঝঞ্ঝাট কে পোয়াবে বাবা।

আমারে রাখেন। পোলারে দিদিমার কাছে থুইয়া আসুম।

বেশ, পয়লা থেকে কাজে লাগিস।

বাচ্চাটাকে ছেড়ে থাকতে মরে যাবে শৈল, কিন্তু উপায় কী। মাখনের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, এর সঙ্গে আর বাস করা যায় না। শৈলর মা প্রথমে এদিকেই ঝির কাজ আরম্ভ করেছিল, কলে কাজ পেয়ে উঠে গেছে। কলের কাজে উপায় বেশি। তার কাছে ছেলেকে রেখে এলে মাঝে মধ্যে শুধু গিয়ে দেখে আসা চলবে। কিন্তু উপায় কী ! মাসকাবারের আর মাত্র কটা দিন বাকি।

সেদিন ঠিকে কাজ সেরে ঘরে ফিরে দ্যাখে, তাদের কাঁথাকানি হাঁড়িকড়াই ও পাশের চালার ছোটো একটি ঘরে সবানো হয়ে গেছে। এই নিচু চালার খুদে খুদে ঘরগুলিও বিন্দের মা ভাড়া দেয়। এই ছোটো ঘরখানাই খালি ছিল।

বিন্দের মা একগাল হেসে বলে, তোর কপাল ফিরেছে লো। আমার ছেলে তোর মিনসেকে একটা কাজ জুটিয়ে দিয়েছে।

মাখন ঘরে ছিল না। সকালবেলা বিন্দের সঙ্গে কারখানার কাজে ভর্তি হতে গেছে।

শৈলর মুখে হাসি ফোটে না। কাজ পেয়েছে, নিজে খেটে রোজগার করবে কিন্তু মতিগতি কী বদলাবে মানুষটার, মেজাজ নরম হবে ? সারাদিন বাইরে থাকবে মাখন, সন্দেহের বিষে আরও সে জর্জরিত হবে। এ পোড়া শহরে এসে কপাল তার পুড়েছে চিরদিনের জন্য।

বিন্দের মা বলে, সুদিন এসেছে, আয় তেল দিয়ে চুল বেঁধে দি।

চুল বাঁইধা কাম নাই। ঘরের ভাড়া নিবা কত ?

যা দিবি তাই নেব। তোরা কি আমার পর ?

কী করে হঠাৎ তারা এত বেশি আপন হয়ে গেল বিন্দের মা র শৈল বুঝতে পারে না ? বুঝেই বা কী হবে? আর মোটে কটা দিন সে এখানে থাকবে।

বিকালে শ্রান্ত মাখন ফিরে আসে। লংকা দিয়ে জল দেওয়া ভাত খায়। কথাবার্তা বিশেষ বলে না। শৈলও চুপ করে থাকে।

খানিক পরে মাখন ব্যঙ্গের সুরে জিজ্ঞাসা করে, মহারানি কিছু জিগান না যে ?

কী জিগামু ?

মাখন গুম খেয়ে থাকে।

বিন্দের মা মাখনকে আড়ালে ডেকে বলে, আমি তো বাপু পারলাম না। তুমি বলে দাও, চুলে একটু তেল দিক, সাবান-টাবান মেখে একটু সাফ-সুরুত হোক ?

বলব।

পরদিন খুব সকালে কাজে বেরোবার আগেই বিন্দের দোকান থেকে তেল আর সাবান এনে দিয়ে মাখন চোখ পাকিয়ে বলে, চুলে তেল দিবি, সাবান মাইখা চান করবি। ভূত সাইজা থাকলে ভালো হইব না কইলাম।

শৈল চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে থাকে।

ব্যাপারটা কী কও তো শুনি ?

ব্যাপার আবার কী ? ব্যাপার কিছু না।

কাজে লেগেই অদ্ভুতভাবে বদলে গিয়েছে মাখন। মেজাজ বদলায়নি, বরং আরও রুক্ষ হয়েছে, কথায় কথায় চটে উঠে গাল দেয়, মারতে আসে। যতক্ষণ ঘরে থাকে গুম খেয়ে থাকে, মাঝে মাঝে তীব্র বিদ্বেষের দৃষ্টিতে শৈলর দিকে তাকায়। কিন্তু সন্দেহ করে না, একেবারেই না। ছুটির দিন এক বাড়িতে গুল দিয়ে ফিরতে অনেক বেলা হল, মাখন একবার জিজ্ঞাসাও করল না তার দেরি কেন। এক অজানা আতঙ্কে শৈলর বুক কেঁপে ওঠে।

এ ঘরে উঠে আসার দিন চারেক পরে একদিন সন্ধ্যার পর বিন্দের মা মাখনকে ডেকে বলে, এই কাপড়খানা পরিয়ে পাঠিয়ে দাও। দিনের বেলা দেখে গেছে, পছন্দ হয়েছে। এই নাও তোমার ভাগের টাকা।

মাখন এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে, আইজ যাইবো না, হাঙ্গামা করব। আর কিছু না থাক, মাগির তেজ আছে ষোলোআনা। আর কয়দিন যাক বুঝাইয়া রাজি করামু।

বিন্দের মা বলে, আ-মরণ ! এর আর বোঝানোর কী আছে ? গোলমাল করে দুঘা লাগিয়ে দিবি।

তুমি বুঝবা না। বড়ো তেজ মাগির।

মাসের শেষ তারিখ। পরদিন শৈল নতুন কাজে লাগবে। ভোরে উঠেই ছেলেকে মা-র কাছে রেখে আসতে যাবে। ফরসা মোটা গিন্নিকে বলা আছে প্রথম দিনটা কাজে লাগতে দেরি হবে। রাত্রে শৈল ভাবে, আজ মাখনকে জানাবে, না একেবারে সকালে জানিয়ে বিদায় নেবে।

এখন জানালে যদি হাঙ্গামা করে ?

মাখন জিজ্ঞাসা করে, এ পাশ ও পাশ করস যে ? ঘুম আসে না ?

না।

মাখন খানিক চুপ করে থাকে ! তারপর শৈলকে কাছে টেনে বলে, শোন, কাইল আমরা অন্য ঘরে উইঠা যামু।

ক্যান ? এখানে থাকুম না। বিন্দের মা বড়ো পাজি বজ্জাত মানুষ।

যতই তার পক্ষ টানুক আর তাকে সুখী করার জন্য ব্যস্ত হয়ে নানাপরামর্শ দিক, শৈলর কী আর জানতে বাকি ছিল যে বিন্দের মা পাজি বজ্জাত মানুষ। তার সঙ্গে হঠাৎ মাখনের খাতির জমতে দেখে আর তাকে তেল সাবান মাখিয়ে ভালো কাপড় পরাবার ঝোঁক চাপতে দেখে এটাও শৈল আঁচ করেছিল যে তাকে ফাঁসাবার একটা চক্রান্ত চলছে তলে তলে।

কিন্তু মাখনের দিকটা সে বুঝে উঠতে পারছিল না কোনোমতেই। বিন্দের মা-র খারাপ মতলব থাক, মাখন নিশ্চয় জেনে বুঝে তার মতলবে সায় দেয়নি, বিন্দের মা নিশ্চয় তাকে ভুলিয়ে ফাঁদে ফেলেছে।

নইলে তাকে মিথ্যা সন্দেহ করেই যে মানুষটার এত জ্বালা সে কখনও জেনে শুনে বিন্দের মা-র বজ্জাতিতে সায় দিতে পারে ?

মাখনের কথা শুনে ভয়-ভাবনার একটা পাহাড় যেন নেমে যায়, হালকা হয়ে যায় শৈলর দেহমন। সে ভাবে মাখন তবে ধরে ফেলেছে বিন্দের মা-র আসল মতলব !

আর যখন ভাবে, ভাগ্যে শৈল টের পায়নি মরিয়া হয়ে বিন্দের মা-র পরামর্শে কী কাজ করতে যাচ্ছিল। ভাগ্যে বিগড়ানো মাথাটা তার ঠিক হতে আরম্ভ করেছিল একটা কাজ পেয়েই, দশজনের সঙ্গে খাটতে শুরু করেই !

শৈল বলে, কাল থেইকা আমি খাওয়া-পরার কামে লাগুম—রাতদিন থাকুম।

ক্যান ?

সন্দেহ করবা, মারবা—তোমার লগে থাকুম না।

মাখন খানিক ভেবেচিন্তে বলে, হ, ঠিক কইছস। আমার মাথাটা বিগড়াইয়া গেছিল। ক্যান এমন হইল কিছুই বুঝলাম না। আর সন্দেহ করুম না।

করবা না ?

না। তর গা ছুঁইয়া কইলাম।

সুতরাং শৈলর আর ফরসা মোটা গিন্নির বাড়ি কাজ নেওয়া হয় না। অন্যপাড়ায় একটা ঘর নিয়ে তারা দুবাড়িতে ঠিকে কাজ করে। সকালে রান্না হয় না, রাত্রে জল ঢালা ভাত খেয়ে মাখন কলে খাটতে যায়।

মাখনের বিগড়ানো মাথাটা কীসে সারল সে নিজেও বোঝে না, শৈলও বোঝে না। রাজি হয়ে গিয়েও মাখনের মাথাটা কেন বিগড়ে গেল এটা বোঝে না বিন্দে আর বিন্দের মা।

না বুঝলেও নেমকহারাম বজ্জাতটাকে কাজ জুটিয়ে দেওয়ার জন্য মায়-পোয়ে আপশোশ করে।

সতী

রাস্তার ধারে একটা লোক মরে পড়ে আছে।

আগের দিন পাড়ায় কেউ তাকে মরার আয়োজন করতে দ্যাখেনি। তীর্থগামিনী পিসিকে হাওড়া স্টেশনে গাড়িতে তুলে দিয়ে প্রায় রাত এগারোটার সময় নরেশ বোধ হয় শেষ বাসেই রাস্তায় প্রায় ওখানটাতেই নেমেছিল।

সে নাকি পাড়ার চেনা ঘেয়ো কুকুরটাকে ঠিক ওইখানে থাবায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে দেখেছিল। তাকে বাস থেকে নামতে দেখে কুকুরটা অতিকষ্টে উঠে এসে দাঁড়িয়ে লেজ নেড়েছিল। নরেশের বড়ো ভয় হয়েছিল, কুকুরটা পাছে কামড়ে দেয়।

কাজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে রাত এগারোটার আগে লোকটা ঘেয়ো কুকুরটার জায়গা বেদখল করে চিত হয়ে শুয়ে মরেনি। শেয়াল কুকুর ছাড়া রাত্রিবেলায় কেউ তাকে মরতেও দ্যাখেনি।

ভোরে উঠে দেখা গেল। রাত্রে কোথা থেকে এসে এইখানে শুয়ে মরেছে। কাউকে না জানিয়ে চুপিচুপি—একা। জগতে এতটুকু অশান্তি সৃষ্টি না করে।

কোমরে একফালি ন্যাকড়া জড়ানো। মরেও লজ্জা বজায় রেখেছে অথবা বলা যায়, লজ্জা বজায় রেখে মরেছে '

দেহটা অত্যধিক শীর্ণ শুকনো, যাকে বলে কঙ্কালসার। মাথায় একরাশি ধুলোয় মলিন রুক্ষ চুল, মুখে ইঞ্চিখানেক গোঁপ-দাড়ি গজিয়েছে। ভাব দেখে অনুমান করা যায় যে লোকটা এককালে চুলও ছাঁটত, দাড়ি গোঁপও কামাত, দু তিনমাস সেটা বাদ গেছে। গলায় সুতো দিয়ে ঝোলানো আস্ত সুপারির মতো কালো কাঠের সুন্দর বৈষ্ণবী খোলের মাদুলিরূপী নিদানটি পাঁজরের উপর পড়ে আছে। বাঁ হাতের কনুইয়ে তিনটি মাদুলি, মানুষকে যা রোগ দুঃখ বিপদ-আপদ থেকে ত্রাণ করে। গরিবকে বড়োলোকও করে !

ভূতনাথ বলে, রোগে মরেছে, মনে হয় না। রোগে এমন চেহারা হলে আর উঠে আসতে হত না, যেখানে শুয়েছিল সেখানেই মরত।

অভয় বলে, রোগে না মরলেও রোগেই মরেছে। যা ভাবছ তা চলবে না। এ দেশে বাবা না খেয়ে কারও মরা বারণ। আমেরিকার গম আসছে, দু-চারমন এসেও গেছে।

বিমল বলে, না খেয়ে কেউ মরেও না। যে-ই মরুক মরবার আগে হার্টফেল করে মরে। হার্টফেল করে মরা ছাড়া গতি নেই মানুষের, কে বা বলবে স্টার্ভেশন।

শচীন বলে, না বলাই উচিত। দেশের একটা মানসম্মান আছে তো ? অন্য দেশে শুনলে ভাববে কী ?

নরেশ ছেলেমানুষ, একটু ভাবপ্রবণ। কেউ মরেছে শুনলেই তার কষ্ট হয়, নিজের চোখে মরণ দেখলে তো কথাই নেই। সে বিরস বিষণ্ন মুখে বলে, খুন-টুন হয়নি তো ?

খুন হয়েছে বইকী। নইলে জোয়ান বয়সে মানুষটা মরে ?

ছোরা-টোরা মেরে নয়, না ? তাহলে রক্ত পড়ত। বিষ-টিষ খাইয়েছে ?

আরে বোকা, বিষ হোক যাই হোক, কিছু খেতে পেলে কি মরত ?

অল্পে অল্পে বেলা বাড়ে।

রেশন আনা বাজার করা ওষুধ কেনা ছাড়াও হাজারটা কাজে মানুষ এদিক ওদিক যায় আসে। রাস্তায় লোক চলাচল বাড়ে, বাস লরি মোটর গাড়ির হর্নের আওয়াজ অবিরাম হয়ে ওঠে, লোকে চোখ তুলে মৃতদেহটার দিকে তাকায়, কেউ একটু দাঁড়ায়, কাছাকাছি কয়েকজন যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের প্রশ্ন করে। কেউ তাকাতে তাকাতেই চলে যায়।

সময় নেই, উপায় নেই, স্পৃহা নেই। একমুহূর্ত দাঁড়ালে হয়তো ফসকে যাবে আজও লাইনে দাঁড়িয়ে কয়েক ঘণ্টা ধন্না দিয়ে জরুরি দরকারি জিনিসটা পাওয়া, হয়তো লেট হয়ে যাবে কাজে। অর্ধপুষ্ট অপুষ্ট শরীরে আর টানা যায় না বাঁচাব লড়াই, খিদেয় ক্লান্তিতে ঘোলাটে মনের আকাশে দুর্ভাবনার মেঘে ঢেকে গেছে সব কৌতূহল আর শ্মশান-বৈরাগ্যের ব্যথা বোধ, খেদের অবিরাম বিদ্যুৎ ঝলকানিতে জ্বলে গেছে চাক্ষুষ মরণকেও খাতির করার সাধ।

না, সত্যিকারের মরণকে নয়। সে মরণকে তুচ্ছ করার সাধ থাকলেও সাধ্য কই।

ওরা হল ব্যস্ত বিব্রত কাজের মানুষ, এই দুর্দিনে সংসারের জোয়ালে জুড়ে দেওয়া মানুষ।

কাজ নেই বলে বিব্রত বিপন্ন মানুষও কী কম ! ভিড় তাই জমে। মুখে আহা বলে খুব কম লোকেই ! হৃদয়গুলি উদাসীন হয়ে গেছে বলে নয়। এ রকম মরণ দেখে সহানুভূতি কি আর থাকে ? অসহানুভূতিই একটা গভীর বিরাগের রূপ নিয়ে ভেতরটা ঘুঁটে দেয়।

রেশনের দোকানে আজ অসম্ভব ভিড়। নতুন হপ্তা আজ শুরু হল। রেশন নিয়ে গেলে তবে অনেকের বাড়িতে আজ হাঁড়ি চড়বে।

নইলে পাঁচ সিকে সের চাল কেনা, নয়তো উপোস দেওয়া। মাসের এই শেষ হপ্তায় রেশন ছাড়া ক-জনেরই গত্যন্তর আছে ?

ঘড়ি আর ভিড়ের দিকে তাকালে ভরসা কমে আসে। মড়াটার জন্যই যথাস্থানে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করতে দেরি হয়ে গেছে দীননাথ আর অভয়ের। মানুষটা এসে মরেছে একেবারে বাড়ির সামনে।

ভাত খেয়ে আজ আপিস যাওয়া ঘটবে কী অভয় ?

দেখা যাক।

লাইন দিতে হয় না, দোকানের টেবিলে কার্ডগুলিই পরপর ঘাড়ে চেপে লাইন দেওয়ার প্রতীক হয়ে স্তূপ হয়েছে। রেশনকার্ডে অদৃশ্য নাড়ির সুতোয় এঁটে বাঁধা মানুষগুলি এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করতে পারে।

তবে, নিরুপায় হয়ে শুধু জটলা করাই সার। আশ্বিনের সকালের উজ্জ্বল মধুর আকাশ-বাতাস, প্রাণ কেন শারদোৎসবের ছোঁয়াচ আঁচ করতে পারে না কে জানে !

দেখা যায়, ছেলে কোলে একটি বউ এগিয়ে আসছে ক্লান্ত মন্থর পায়ে। খানিক এগিয়ে থেমে দাঁড়িয়ে কী যেন বলছে পথের ধারের দোকান অথবা বাড়ির মানুষকে। পরনের কাপড়খানা দেখে তফাত থেকে ভিখারিনি মনে হয় না।

রেশনের দোকানের সামনে এলে দেখা যায়, ছেঁড়া আর ময়লা হলেও পরনে তার তাঁতের রঙিন শাড়ি। বিবর্ণ বিশীর্ণ মুখে কোটরে-বসা চোখ, তেলের অভাবে একরাশি ঘন চুল জট বাঁধছে। শুকিয়ে আমসি বনে গেছে কোলের বছর দেড়েকের উলঙ্গ ছেলেটা, যেন নেশার ঘোরে ঢুলুঢুলু চোখে চেয়ে আছে বড়ো মানুষদের ভিড়টার দিকে।

পৃথিবীতে নবাগত শিশু। খিদে পেলেই চেঁচিয়ে চারিদিক মাত করা অধিকার সে যেন ত্যাগ করেছে—খিদেয় খিদেয় ঝিমিয়ে গিয়ে খিদের নেশায় ধুঁকবার অধিকার পেয়ে !

এদিকে একটা মানুষকে দেখেছ বাবুরা ? পাগলের মতো দেখতে ? কোমরে একটা কানি জড়িয়েছে, খুব চুলদাড়ি হয়েছে ? দেখেছ, মোর সোয়ামিকে ?

স্বামী আর সিঁদুর কিনা একাকার সবার চেতনায় তাই প্রথমেই স্বামীদের মনে হয় যে বউটার কপালে আর সিঁথিতে যা লেপা আছে তা আসল সিঁদুর নয়, দেখলেই বোঝা যায় যে জল দিয়ে শানে পোড়া ইট ঘষে সিঁদুব বানিয়েছে---এই সিঁদুর সিঁথিতে যতটা পারে গাদা করে চাপিয়েছে, কপালের ফোঁটাটা করেছে মস্ত। তাকালেই যেন লোকে বুঝতে পারে যে সে বউ—গেরস্ত ঘরের বউ।

ভূতনাথ ভাবে, হায় রে, শহরে বিজ্ঞানের এত চোখ ঝলসানো বিজ্ঞাপন, শহরে এসে তোকে ইটের গুঁড়ো দিয়ে নিজের গায়ে এই বিজ্ঞাপন আঁটতে হয় !

একজন বলে, কোন দিকে গেছে, স্বামীকে কোথায় খুঁজে বেড়াবে ?

এদিকে কাছে কোথা আছে। না খেয়ে ধুঁকছে মানুষটা, দূরে কোথা যাবে বাবু ? যাবার সাধ্যি পাবে কোথা ?

সে-ও ধুঁকতে ধুঁকতেই কথা বলে, প্রাণহীন স্তিমিত চোখে তাকায়।

তোমার ঘর কোথা ?

সে অনেক দূব গাঁয়ে। মানুষটারে দ্যাখোনি বাবু কেউ ?

ভূতনাথ বলে, এগিয়ে দ্যাখো তো, জলের কলটাব কাছে, সাদা বাড়ির সামনে। ও বকম একজন শুয়ে আছে দেখলাম যেন।

শুয়ে আছে, না বাবু ?

শুয়ে আছে না বসে আছে কী করে বলব বলো ?

মরে যায়নি ? শুধু শুয়ে আছে ? না বাবু ?

নরেশের সর্বাঙ্গে কাঁটা দেয।

কাঁদো কাঁদো মুখে সে বলে, তুমি আমার সাথে এসো। ও বোধ হয় অন্য লোক।

নরেশদের বাড়িটা পড়বে আগে—মড়ার কাছে পৌঁছবার আগে। পাশেব একটা গলির মধ্যে ঢুকেই তাদের বাড়ি।

নরেশ ভাবে, আগে বাড়িতে নিয়ে একে কিছু খেতে দেবে কী? বাচ্চাটাকে একটু দুধ সে খাওয়াবেই। সে জন্য বাড়ির লোকেব সঙ্গে মারামারি করতে হলে মাবামারি করবে।

কোনো প্রশ্ন করে না কেন বউটা ? তার স্বামীব মতো একজন রাস্তার ধাবে শুয়ে আছে শুনেও ব্যাকুল হয় না কেন ? লোকটা যদি সত্যি এর স্বামী হয়, মরে গেছে দেখে কীভাবে হাহাকার করে কেঁদে উঠবে, কীভাবে কপালে হাত দিয়ে বসে পড়বে নয় আছড়ে পড়বে—সেই মর্মান্তিক নাটকের কথা ভেবে তাব নিজের বুকটা যে ধড়ফড় করছে !

কিন্তু দাঁড়িয়ে দেখতে হবে শুনতে হবে সব। পালিয়ে গেলে চলবে না। কাঁদাকাটার পালা চুকলে কী নাম কোথা থেকে এসেছে কীভাবে কী ঘটেছে সব বিবরণ জেনে নিতে হবে।

গলির মোড়ে পৌঁছে নরেশ বলে, বাচ্চাটাকে একটু দুধ খাইয়ে নেবে এসো।

আগে দেখে আসি। শুয়ে আছে, না ? ঘুমিয়ে আছে ?

ধীরে ধীরে পা টেনে টেনে সে হাঁটে। তফাত থেকে দেহটার পড়ে থাকার রকম আর খানিক সরে দাঁড়িয়ে ভিড়ের মানুষগুলির জটলা করতে দেখেও সে একটু জোরে হাঁটে না।

মানুষের শুয়ে থাকা, ঘুমিয়ে থাকা আর মরে পড়ে থাকা যেন সমান হয়ে গেছে তার কাছে।

সিধুর দোকানের সামনে রোয়াকে একজন পুলিশ উবু হয়ে বসে আছে। মৃতদেহটা সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

কাছে এসে দাঁড়ায় বউটি। একদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। নিস্পৃহভাবে বলে, মরে গেছে, না ?

হ্যাঁ। তোমার স্বামী নয় ?

বউটি মাথা হেলিয়ে জানায় মড়াটা তারই স্বামী।

নরেশ থ বনে থাকে। এ কেমন বউ, অ্যাঁ ? রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ তো ? না, মৃত স্বামীর টানে— ? পা শিরশির করে নবেশের !

হঠাৎ চোখের সামনে শূন্যে মিলিয়ে না গিয়ে সকালবেলার তাজা রোদে দেহের ছায়া ফেলে তাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নরেশ সবে একটু স্বস্তি বোধ করতে আরম্ভ করেছে, হঠাৎ যেন প্রাণ পায় বউটি। বাচ্চাটার দুপা ধরে শূন্যে তুলে প্রাণপণে রাস্তায় আছাড় মারে। মাথার খুলি চূর্ণ হয়ে যায়। তারপর নিজে ঝাঁপিয়ে পড়ে চলন্ত বাসটার সামনে।

প্রমাণ হয়, কপালে আর সিঁথিতে অত করে ইটের গুড়োর সিঁদুর লাগালেও বউটি সেকালের স্ট্যান্ডার্ডের খাঁটি সতী নয়, তাহলে বাসের সামনে ঝাঁপ দিতে হত না, মৃত স্বামীকে দেখে আপনা হতেই প্রাণপাখি তার বেরিয়ে যেত। না খেয়ে না খেয়ে মরমর অবস্থাতে আপনা থেকে মরে যাওয়ার বদলে মরতে কিনা দরকার হল চলন্ত বাসের।

লেভেল ক্রসিং

দুর্ঘটনায় গাড়িটা জখম হয়। অল্পের জন্য বেঁচে যায় ভূপেন, তার মেয়ে ললনা এবং ড্রাইভার কেশব। খানিকক্ষণ কেউ কথা বলতে পারে না।

ললনা থরথর করে কাঁপে।

রুমালে চশমা মুছে, মুখ মুছে ভূপেন জিজ্ঞাসা করে, এটা কীবকম ব্যাপাব হল কেশব ? তুমি তো কাঁচা ড্রাইভার নও ?

কেশব বলে, সেই জন্যই বোধ হয় প্রাণে বেঁচে গেলাম আজ !

কেশবের নিজের তবে কোনো দোষ নেই ! তার অবহেলা বা বিচ্যুতির ফলে দুর্ঘটনা ঘটেনি ! নইলে গাড়িটা এভাবে জখম করিয়েও সে এমন ঝাঁঝের সঙ্গে কথা কইতে পারে ?

ললনা ঢোক গিলে বলে কী জন্য হল এ বকম ?

স্টিয়াবি" বিগড়ে গেল হঠাৎ।

তাই নাকি ? ও !

আস্তে গাড়ি চালাই বলে রাগ করেন। জোরে চালালে আজ তিনজনে না মরলেও জখম হতাম। আমার মন বলছিল হঠাৎ গাড়ি বিগড়ে যাবে। একটা পুরানো রদ্দি মাল...

ললনা ভূপেনকে বলে, খুব তো বিশ্বাস করেছিলে সলিলবাবুকে ? বন্ধুর ছেলে কী কখনও ঠকাতে পারে !

ভূপেন আপশোশ করে বলে, না, মানুষকে সত্যি বিশ্বাস নেই।

ভদ্রঘবের শিক্ষিত স্মার্ট ছেলে...

আপশোশ করে লাভ নেই। ভূপেন জরুরি কাজে বেরিয়েছে, যথাসময়ে যথাস্থানে তাকে গিয়ে পৌঁছতেই হবে। ললনা বেরিয়েছে সিনেমা দেখার জন্য, বাস্তায় তাকে সিনেমা হাউসটার সামনে নামিয়ে দেবার কথা। সিনেমা দেখাটা অবশ্য জরুরি কোনো কাজ নয়।

ললনা বলে, তুমি ট্যাক্সি করে চলে যাও বাবা। আমি বাড়ি ফিবে যাব। গাড়ির ব্যবস্থা আমরা করছি।

ভূপেন চলে গেলে ললনা বলে, আপনি তাহলে আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন ?

নিজের প্রাণ বাঁচাতে।

গাড়ির ব্যবস্থা করার দায় কেশবের ঘাড়ে চাপিয়ে ললনা অনায়াসেই বাড়ি চলে যেতে পারত কিন্তু তখন গাড়িতে বসে সে কেশবের সঙ্গে কথা বলে।

তার নিজের সম্পর্কে, তার আপনজনদের সম্পর্কে ললনার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানাবিবরণ জানবার কৌতূহল গোড়ার দিকে বড়োই বিব্রত করত কেশবকে। মনে মনে বিরক্ত হত, রেগেও যেত।

ক্রমে ক্রমে সে টের পেয়েছে ললনার দোষ নেই। তার মধ্যে এ কৌতূহল সৃষ্টি করেছে সে নিজেই। বড়োলোকের একেলে স্মার্ট মেয়ে হোক, লেখাপড়া আর গান দুয়েই দখল থাক, শিক্ষিত মার্জিত নরনারীর আসর জমিয়ে দেবার বিশেষ ক্ষমতা থাক, তার যে একটা হৃদয় আছে সেটা অস্বীকার করলে চলবে কেন !

বাড়ির মাইনে-করা ড্রাইভার হলেও জোয়ান মানুষটার অদ্ভুত ধর-টানের মানে জানবাব কৌতূহল সে হৃদয়ে জাগতে পারে বইকী।

সারাদিন ডিউটি দিয়ে কেশব প্রায় রোজ রাত্রেই গ্রাম্য শহরতলিতে তার পুরানো ভাঙাচোরা নোংরা বাড়িতে ফিরে যায়।

শহরের শৌখিন এলাকায় ভূপেনের আধুনিক ফ্যাশানের নূতন রং-করা বড়ো বাড়ি। গ্যারেজের লাগাও ড্রাইভারের থাকবার ঘরটি ছোটো হলেও খোলামেলা ঝকঝকে তকতকে। প্রতিবছর বাড়িটির আগাগোড়া চুন ফেরানো রং লাগানো হয়, কেশবের জন্য বরাদ্দ ঘরটিও বাদ যায় না।

স্টেশন পেরিয়ে সেই কতদূরে বোসপাড়া, সেখানে ইট-বার-করা নোনায়-ধরা সেকেলে দালানের ছোটো ছোটো ঘর, আলকাতরা-মাখানো ছোটো ছোটো জানালা দিয়ে ভালো আলো বাতাস খেলে না, ঘরের ভিতরটাও ভাঙাচোরা জিনিসপত্রে বোঝাই।

ও রকম একটা ঘরে রাত কাটাতে কষ্ট করে বাড়ি ফিরে যাওয়ার বদলে এখানে থাকলে রাত্রের খাওয়াটাও কেশব পায়।

বাড়ির সেই একঘেয়ে শাক চচ্চড়ি কুচো-চিংড়ির বদলে বড়োলোকের বাড়ির আধুনিক রুচিকর পুষ্টিকর সুখাদ্য। কিন্তু দেখা যায়, পরিচ্ছন্ন ঘর ও সুখাদ্যের চেয়ে বাড়ির টানটাই কেশবের ঢের বেশি জোরালো।

রাত বেশি না হলে স্টেশন পর্যন্ত ট্রাম-বাস পাওয়া যায়। কিন্তু স্টেশনের পাশ দিয়ে লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে গেলে আর ও সব বালাই নেই।

বোসপাড়া পর্যন্ত প্রায় এক মাইল রাস্তা তাকে হাঁটতে হয়। সেখানে ছোটোবড়ো নতুন পাকা বাড়ি আছে, বৈদ্যুতিক আলো আছে, সাজানো মনোহারি দোকান ও লন্ড্রি, হেয়ার-কাটিং সেলুন এ সবও আছে, কিন্তু আছে অপ্রধান হয়ে। প্রাধান্য সেখানে জরাজীর্ণ কাঁচা পাকা বাড়ির, গেঁয়ো বাঁশঝাড় ডোবা-পুকুরের সঙ্গে মেশানো শহুরে বস্তি খাটাল আর কাঁচা নর্দমার।

বাগানবাড়ি আছে দুচারটা। কিছু লোকের ছোটোখাটো বাসভবনের লাগাও একরত্তি বাগানেও শখের সুগন্ধি ফুল কিছু কিছু ফোটে। কিন্তু ফুলের গন্ধ হটিয়ে দুর্গন্ধই জাহির করে রাখে নিজেকে।

তাছাড়া আছে মশা আর মাছি। দুয়েরই অখণ্ড প্রতাপ।

তবু কেশবের ফিরে যাওয়া চাই !

বিশেষ কারণে রাত বেশি হয়ে গেলে ট্রাম-বাস মেলে না, কেশব হেঁটেই রওনা দেয়। ললনাদের বাড়ি থেকে স্টেশনও প্রায় আধমাইল রাস্তা।

ফিরে আসতে হয় খুব ভোরে। অনিমেষের তিয়াত্তর বছরের বুড়ি মা কে রোজ সকালে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যেতে হয়।

কেশব বিয়ে করেনি।

অর্থাৎ আলোয় ঝলমল খোলামেলা পরিচ্ছন্ন এলাকায় সুন্দর বাড়িতে এমন সুবিধাজনক একটি ঘর থাকতে, ভালো খাওয়া পাওনা থাকতে, নিজের বাড়িতে আপনজনের মধ্যে শুধু কয়েক ঘণ্টা ঘুমোনোর জন্য ফিরে যাওয়া !

তার কী কোনো মানে হয় ?

সেকেলে গেঁয়ো স্বভাবের একগাদা আপনজন। মা-বোন মাসি-পিসি ভাই ভাজদের যে সংসারে নিজে সে প্রায় পরের মতো হয়ে গেলেও যারা আজও তার আপনজন।

জখম গাড়িটাকে টেনে গ্যারেজে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হলে ললনা বলে, চলুন না দুজনে সিনেমায় যাই ? গাড়িটা যখন নেই, আমি গাড়ির মালিকের মেয়ে আর আপনি ড্রাইভার এ তফাতটাও এখন ভুলে যাওয়া যেতে পারে।

বোঝা যায়, এটা তার ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ বলে-বসা প্রস্তাব নয়। এতক্ষণ তাকে জেরা করে করে আলাপ চালিয়ে যাবার সময় কথাটা মনে মনে নাড়াচাড়া করছিল।

কেশব আমতা আমতা করে বলে, ছুটি যখন পেয়ে গেলাম, বাড়ি ফিরব ভাবছিলাম।

ললনা আহত হয় না, রাগও করে না, আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকায়।

বলে, আমি শিগগির একদিন যাব আপনার বাড়িতে, দেখে আসব কী আছে সেখানে, বাড়ি যেতে আপনি এত পাগল কেন! সিনেমা দেখে বাড়ি গেলে চলে না?

সিনেমা দেখতে আমার বিশ্রী লাগে।

বিশ্রী সিনেমা দেখতে যান বলে। বন্ধুরা কত টানাটানি করে আমি ও সব সস্তা সিনেমায় কখনও যাই দেখেছেন?

কেশব ম্লান মুখে একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, একটা সত্যি কথা বললে বিশ্বাস করবেন? আমার কীরকম অস্থির অস্থির করছে মাথার মধ্যে যন্ত্রণা হচ্ছে।

ললনার মুখ বিবর্ণ দেখায়।

আপনার কি কোনো অসুখ আছে? আপনার চেহারা দেখে তো

কোনো অসুখ নেই। ডাক্তার তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করেছে কোনো খুঁত খুঁজে পায়নি। কষ্ট যেটা হয় সেটাও অদ্ভুত। মাথা ঘোরা নয়, এমনই যন্ত্রণা নয়, ভেতর থেকে কী যেন চাপ দেয়। আমার এখন কী মনে হচ্ছে জানেন? কোথাও ছুটে পালাই।

ললনা ম্লানমুখে বলে, তাহলে বাড়িই যান।

কেশব চুপচাপ দাঁড়িয়ে একটু ভাবে।

হঠাৎ বলে, আচ্ছা চলুন তো সিনেমাতেই যাই আপনার সঙ্গে দেখি কষ্টটা কমে কি না। প্রশ্রয় না দিয়ে এটাকে জয় করবার চেষ্টা করা যাক।

খুব বেশি কষ্ট হলে

দেখি কী হয়।

দুজনে সিনেমায় যায়।

হাফ টাইম পর্যন্ত কোনো রকমে অপেক্ষা করে কেশব বলে, আমি আর পারছি না।

ললনা বলে থাক। আমিও আর দেখব না, ভালো লাগছে না। ব. আপনার আসবার দরকার হবে না।

তারপর বলে, আমি ট্যাক্সিতে বাড়ি ফিরব, সে পর্যন্ত আমার সঙ্গেই আসুন।

তখন সন্ধ্যা উতরে গেছে। ভূপেনের আলোয় ঝলমল বাড়িটার সামনে নেমে কেশব আরেকবার জিজ্ঞাসা করে, কাল তাহলে না এলে চলবে?

ললনা বলে, কাল এসে কী করবেন? এবার নিজেরা দেখে শুনে একটা নতুন গাড়ি কিনতে হবে। পরশুর আগে বাবার সময় হবে না।

ললনা এমনইভাবে কথা কয় যেন কেশবের মতো তারও . . ভিতরে কিছু চাপ দিচ্ছে।

কেশব ট্রামে স্টেশন পর্যন্ত যায়। স্টেশনের পাশে লেভেল ক্রসিংটা পার হলেই শহরতলির একেবারে অন্যরকম চেহারা।

রেলপথটা আলোয় ঝলমল বড়ো বড়ো অট্টালিকার শহর আর নোংরা পুরানো জীর্ণ ঘরবাড়ি আধো অন্ধকার শহরতলিকে পৃথক করে রেখেছে। এ পারে সীমা কর্পোরেশনের, ও পারে আরম্ভ মিউনিসিপ্যালিটির।

দুপুরে একপশলা বৃষ্টি হয়েছিল। ধুলো আর গোবরে রাস্তাটা প্যাঁচপ্যাঁচ করছে। এখানে ওখানে গর্ত, সেগুলিতে জলের বদলে জমেছে পাতলা তরল কাদা।

তবু কী ভিড় মানুষের!

শুধু ময়লা জামাকাপড়-পরা বা অর্ধ উলঙ্গ গরিব মানুষের ভিড় নয়। ফিটফাট বেশধারী বাবু মানুষ, স্যুটপরা সাহেব মানুষ এবং ভালো শাড়িপরা ভদ্রমহিলাও এই পথে হাঁটছে, দুপাশের দোকানে কেনাকাটা করছে। খানিক এগিয়েই সিনেমা। শো চলছে, ভিতরটা বোঝাই, তবু বাইরে গিজগিজ করছে সব বয়সের ভদ্রাভদ্র মেয়েপুরুষ।

পরের শো-র টিকিটের প্রয়োজনে এত আগে এসে ধন্না দিয়েছে।

চেনা মানুষ শুধায়, আজ সকাল সকাল?

কেশব বলে, ছুটি পেয়ে গেলাম।

অফিস করা শ্রান্ত চেনা মানুষ মন্তব্য করে, তোমার তো ভাই আরামের চাকরি ! পরের মোটরে চেপে বেড়াও, খেয়ে-দেয়ে খাটিয়ায় শুয়ে নাক ডাকাও।

কেশব মুখ বাঁকায়।

করে দেখলে আরাম টের পাওয়া যায়। বাবু হুকুম দেবে, জোরসে চালাও। জোরসে চালিয়ে মানুষ চাপা দিয়ে তুমি শালা মার খাও আর জেলে যাও। কত আরাম !

এগোতে এগোতে আরও কমে আসে রাস্তার আলোর জোর, দোকানপাটের দেখা মেলে দূরে দূরে, বাড়িগুলির গ্রাম্যতা আর জীর্ণতা বেড়ে যায়। এবড়ো-খেবড়ো খোয়ায় তৈরি এই প্রধান রাস্তা থেকে দুপাশে পাড়ার মধ্যে ঢুকে গেছে ইটের গলিগুলি। বাগদিপাড়ার ফাঁকা জায়গায় বাজারটা খাঁ-খাঁ করছে দেখা যায়। এখানে সকালে একবেলা বাজার বসে।

বোসপাড়ার মোড়ে বিবর্ণ থামটার মাথায় টিমটিম করে জ্বলছে একটা অল্প পাওয়ারের বাল্ব। এ যেন বাঁশঝাড় ডোবা-পুকুর এলাকার মানুষগুলিকে জানিয়ে দেওয়া বৈদ্যুতিক আলো জ্বললেই কী এসপ্ল্যানেডের মতো আলোয় ঝলমল করে ?—এটাও বৈদ্যুতিক বাতি, এদিকে তাকিয়ে ঘরের ডিবরি আর লণ্ঠন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকো।

সন্ধ্যাদীপ জ্বালো ভেজাল তেল দিয়ে, ছেঁড়া ন্যাকড়ার সলতে পাকিয়ে। সে আলোতে শান্তি আছে, স্নিগ্ধতা আছে ! এটা তো নিছক কাচের খেলনার আলো।

কেশব একটু দাঁড়ায়। এখন মনে হয়, কত দূরে যেন ভেসে এসেছে লেভেল ক্রসিংয়ের ও পারে ললনাদের শহর, মন থেকে যেন প্রায় মুছে গেছে চোখ-ঝলসানো আলো, শহরের জমকালো রূপ আর গাড়ি ও মানুষের কলরব।

সে-ও ওই ধোঁকাবাজিতে বিশ্বাস করে—সভ্য জগতের সভ্য জীবনের কোলাহল থেকে দূরে পালিয়ে শান্তি ও স্নিগ্ধতা খোঁজার ধোঁকাবাজিতে। নইলে ললনার অত আগ্রহ সত্ত্বেও সিনেমা শো-টা শেষ পর্যন্ত না দেখে কীসের আকর্ষণে সে ছুটে এল এই আধা-অন্ধকার ডোবার সোঁদা দুর্গন্ধে ভারী বাতাসের গেঁয়ো এলাকায় ?

শরতের মনোহারি ও মুদিখানা মেশানো দোকানের বাল্বটা জোরালো আলোই দেয়। কেশব দোকানে দুপয়সার নস্য কিনতে যায়।

নস্য দিয়ে শরৎ তার হাতে একটা ঠোঙা দেয়, বলে, গুড়টা বাড়িতে পৌঁছে দেবে ? ছোঁড়াছুঁড়িগুলি কী মিষ্টিটাই খেতে পারে !

প্রৌঢ় শরতের মুখে একটা শান্ত নিরুত্তেজ ভাব, জীবনে তার যেন কোনো রসকষ নেই। স্থানীয় স্কুলে বাংলা পড়ায় আর এই দোকানটা চালায়, নীরস একঘেয়ে হয়ে গেছে তার জীবনের লড়াই।

শরতের দোকানের পাশ দিয়ে কেশব দক্ষিণ দিকে বোসপাড়ার রাস্তায় ঢোকে। বোসপাড়ায় ছাড়া ছাড়া থোক থোক ঘন বসতি। কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি হয়তো আট-দশটি বাড়ি, তার পরে খানিকটা ফাঁকা মাঠ পুকুর বাগান ঝোপ জঙ্গল।

বড়ো বড়ো বাড়িগুলি আর নতুন যে বাড়ি উঠেছে সেগুলিই কেবল পুরানো বাড়ির কোনো একটা কোণে না ঘেঁষে কমবেশি তফাতে তফাতে দাঁড়িয়ে আছে।

শহরে এখন রাত বেশি হয়নি। আলো নিভিয়ে বোসপাড়া ঘুমিয়ে না পড়লেও অনেকটা নিঝুম হয়ে এসেছে, রাস্তায় লোক খুব কম। মাঝে মাঝে কোনো দাওয়ায় বসেছে কয়েকজনের আড্ডা, কোনো বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে ছেলেমেয়ের চেঁচিয়ে পড়া, মুখস্থ করা, দু-একটা বাড়িতে আবার কিন্তু রেডিয়ো বাজছে।

প্রকাণ্ড বটগাছটার লাগাও সাদা চুনকাম করা চৌকো একতলা বাড়িটা আবছা আঁধারে বড়োই রহস্যময় দেখায়, সংলগ্ন আটচালা দুটো সে রহস্যকে আরও ঘনীভূত করেছে। ভিতরে আলো জ্বলছে, মানুষের গলার আওয়াজ বাইরে ভেসে আসছে, নাকে এসে লাগছে রান্নাঘরের সম্বরার গন্ধ। তবু তারাভরা নীলাকাশ যেমন প্রকাশ্য হয়েও রহস্যময়, বৈশাখী গুমোট সন্ধ্যায় নিথব জমকালো বটগাছটা যেমন জীবন্ত হয়েও মৃতের মতো ভয়ের রহস্যে ঘেরা, তেমনই সাধাবণ ইটের বাড়িটির ছায়াচ্ছন্ন শুভ্রতা যেন ছায়ালোকের প্রতীকের মতো রহস্যানুভূতিকে নাড়া দেয়।

দালানটার ভিতরে ছোটো একটু উঠান আছে। এদিকে বেড়ায় ঘেবা বাগান। মাচা আছে তিনটি, লাউ কুমড়ো আর উচ্ছে গাছের। কয়েকটা জবাগাছে ফুলও ফোটে।

বান্না হয় দালানের একটু তফাতে কাঁচা চালাঘরে।

দালানের ভিতরে না গিয়ে বাগান দিয়ে রান্নাঘরে যাওয়া যায়।

মায়া উনানে তরকারি চাপিয়ে শরতের ছেলে গণেশের গায়েব ঘামাচি মাবছিল, কেশবকে দেখে তার মুখে একটু অদ্ভুত রকম শান্ত আর মিষ্টি হাসি ফোটে।

কেশব বলে, শরৎদা গুড় পাঠিয়েছে।

গুড়ের ঠোঙাটা বেখে মায়া গণেশের চিবুকে চুমু খেয়ে বলে, এবাব পড়বে যাও তো মানিক। আব পাহারা দিতে হবে না।

দালান কাছেই, মানুষ কথা বললে শোনা যায় কিন্তু সন্ধ্যার প' [illegible]লাঘরে একা রাঁধতে মায়ার ভয় করে। একজনকে তার সঙ্গে থাকতে হয়।

চালার এপাশে কাছাকাছি আর বাড়ি নেই, গাছপালা জঙ্গল আর পুকুব। তার ওদিকে কেশবের বাড়ি।

কেশব তামাশা করে বলে, সন্ধ্যারাতে এত ভয় ?

মায়া বলে, ভয় করবে না ? ওই আঁধার জঙ্গল, গণেশ ছিল তবু গা-টা ছমছম করছিল।

বছরখানেক আগেও ডিবরি জ্বলত এ ঘরে, আজকাল শালের খুঁটির গায়ে বসানো ল্যাম্প আলো দেয়।

মায়া বলে, মুখ শুকনো দেখছি ? খুব খাটিয়েছে বুঝি আ[illegible] ?

না, সারা দুপুর ঘুমিয়েছি।

তবে ?

একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি।

ল্যাম্পের রঙিন আলোয় ঠিক বোঝা যায় না কী রকম পাংশু বিবর্ণ হয়ে গেছে মায়ার মুখ। চোখে পলক নেই আর ঠোঁট ফাঁক হয়ে আছে দেখে অনুমান করা যায় সে কী রকম ভড়কে গেছে।

মায়া রূপসি কিনা ব[illegible] কঠিন। তবে তেল-চকচকে একরাশি কালো চুলে ঘেরা শ্যামল রঙের মুখখানায় তার লাবণ্য ঢলঢল করছে। সস্তা তাঁতেব শাড়িটাই যেন তাকে ভালো মানিয়েছে।

কেশব হেসে বলে, কী হল ?

মায়া ঢোক গেলে।

চাপা সুরে বলে, ওই আবার কালী আসছে। দুদণ্ড ভালো করে কথা কইবার উপায় নেই।

শরতের মেয়ে কালীর বয়স বছর এগারো, এই বয়সেই সে ইজের ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। ডুরে শাড়ির আঁচল লুটিয়ে বেণি দুলিয়ে এসে কেশবের দিকে বাঁকা চোখে চেয়ে সে মায়ার কাছে আবদার জানায়, খিদে পায় না, ঘুম পায় না মাসিমা ? কত রাঁধবে তুমি ?

মায়া ঝংকার দিয়ে বলে, রান্না বাকি আছে নাকি আমার ? এবার তরকারি নামাব। ডেকে আন গে সবাইকে, ঠাঁই করে নিয়ে বোস। লণ্ঠন আনিস।

ভাইবোনদের ডেকে আনতে কালী দালানের মধ্যে অদৃশ্য হতেই মায়া চট করে কাছে এসে বলে, বুকটা ঢিপঢিপ করছে। এ কাজ ছাড়তে হবে তোমাকে। কী হয়েছিল সব যতক্ষণ না শুনছি বুকের কাঁপুনি যাবে না। এক কাজ করো, জামাকাপড় ছেড়ে এসে দালানে সবাইকে বলবে ঘটনা কী হয়েছিল, আমিও শুনব। কালী ছুঁড়ি দেখে গেল, বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা কইলে দিদি আবার ঝাড়বে।

কেশব বাগান দিয়ে ঘুরে রান্নাঘরে এসেছিল এবার সে দালানে ভিতর দিয়ে ফিরে যায়।

দালানের ভিতরে বারান্দায় শরতের বড়োছেলে রঞ্জন পড়ছিল, কেশবকে দেখে সে বলে, কেশবদা কোন দিক দিয়ে এলে ?

কেশব বলে, শরৎদা ঠোঙায় গুড় দিয়েছিল, রান্নাঘরে মায়াকে দিয়ে এলাম।

ঘর থেকে অবলা জিজ্ঞাসা করে, কেশব নাকি ? বসবে না ?

অবলার হয়েছে পক্ষাঘাত। আজ বছর তিনেক দিবারাত্রি তার বিছানায় শুয়ে কাটছে। সেটাই বোনকে আনিয়ে কাছে রাখার কারণ, তার আধ-ডজন ছেলেমেয়ের সংসারটা মায়াকে দেখাশোনা করতে হয়।

কেশব বলে, আজ একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটে মরছিলাম প্রায়। জামাকাপড় ছেড়ে এসে বলছি ব্যাপার।

কেশবের বাড়িতে অনেক লোক। তার বিধবা মা, তিন ভাই, দুটি বোন, মেজোভায়ের বউ, তার দুটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে, একজন পিসি ও তার ছেলে।

ছোটো ছোটো কুঠরি আছে অনেকগুলি। কেশব একা একখানা ঘর দখল করলেও ঘরের জন্য অসুবিধা হয় না। তবে কেশবের সেজোভাই প্রণব এবং পিসির ছেলে ভোলার বিয়ে হলে ঘরের টানাটানি পড়বে।

পিসি পারলে রাত পোহালেই ছেলের বিয়ে দেয়। কেশবের ভয়ে কিছু করতে পারে না। কে জানে কীরকম বিবেচনা কেশবের ! ব্যাটাছেলে তো রোজগার করবেই একদিন— চাকরি পেয়ে হোক, ফিরিওলাগিরি কুলিগিরি করেই হোক। পাকাঘরে দুধে-ভাতে কিংবা কুঁড়েতে আধপেটা শাকভাত খেয়ে জীবন কাটাবে, যেমন অদৃষ্টে আছে।

কিন্তু বয়স গেলে যে বিয়ে করার সুখটাই নষ্ট হয়ে গেল জীবনে ? দুদিনের জন্য হলেও এই তো বয়স বিয়ের, আসল রস আর আনন্দ পাবার।

জীবনটাই তো অস্থায়ী মানুষের।

কেশবের নিজের ফসকে গেছে কিনা, অন্যের জীবনে এ রস আর আনন্দের কোনো দাম তার কাছে নেই।

শহর থেকে এটা-ওটা আনার ফরমাস ছিল দু-তিনজনের। বিমলা জিজ্ঞাসা করে, খালি হাতে এলি, পাটি আনিসনি তো ?

কেশব বলে, না। আমি বলে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মরছিলাম—

মাগো ! বলিস কী রে ? ভগবান দীনবন্ধু !

ফরমাশি জিনিস না আমার জন্য যারা অনুযোগ দেবাব জন্য উদ্যত হয়েছিল তারা একেবারে চুপ করে যায়।

সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণ জানিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে কেশব পুকুরে গিয়ে স্নান করে আসে। তাড়াতাড়ি না যাওযাই ভালো। আধ-ডজন ছেলেমেয়েকে খেতে বসিয়েছে, ওরা খেয়ে না উঠলে মায়া এসে শুনতে পাবে না তার দুর্ঘটনার কাহিনি।

অনেকটা দেরি করে গিয়ে সে দেখতে পায়ে শরৎ ইতিমধ্যে দোকান বন্ধ করে বাড়ি এসেছে।

সে বলে, অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে নাকি শুনলাম ? তুমি যে বাড়ি সুদ্ধ আমাদেব ভাবিয়ে রেখে গেলে।

মাদুর পেতে তাকে বসতে দেওয়া হয়।

ঘর থেকে অবলা বলে, একটু জোরে জোবে বলো কেশব। তোরা কেউ টু শব্দটি করবি না।

কেশব দুর্ঘটনার কথা বলে যায়, শরতের চার বছরের ছেলেটাকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে মায়া কাছে বসে শোনে।

লণ্ঠনের আলোয বিবর্ণ মুখ দিয়ে অস্ফুট ভয়ের আওয়াজ বাব হয়।

তার কাহিনি বলা শেষ হলে অবলা বলে, তবু ভাগ্যি !

মায়া [illegible] . [illegible]ব, হাত-পা জখম হতে পারে, প্রাণ যেতে পারে, এমন কাজ না কবলেই হয় !

কাজ না করলে খাব কী ?

আর কী কাজ নেই জগতে ?

যে কাজ জানি সেটাই করছি। অ্যাকসিডেন্ট হয় বলে লোকে মোটব হাঁকাবে না ?

এত দরদ এত সহানুভূতি নিজের বাড়িতে এবং এই পরেব বাড়িতেও ! তবু যেন আব প্রাণটা ভবতে চায় না কেশবেব। কেমন বিস্বাদ হয়ে যায় সব কিছু।

বাড়ি যাওয়ার সময় যেন ওজন আরও বেড়ে গেছে মনে হয় বিষাদ ও অবসাদেব। আরও নিঝুম হয়ে গেছে বোসপাড়া, ঘরে ঘরে জীবনকে গুটিয়ে নিয়েছে মানুষ। কীসেব টানে সে ছুটে এসেছিল ব্যাকুল হয়ে ? এত শান্ত ও রিক্ত চারিদিকের জীবন এখানে ' এই বিষাদ আর অবসাদ নিয়ে সহজে ঘুম আসবে না, ভোঁতা রাত্রি জেগে শুনবে ঝিঁঝির ডাক।

খেযে উঠে কেশব নিজের ঘরে যায়। ঘবেবটি ছাড়া বাড়ির অন্য আলো এবং শবতেব বাড়ির আলো প্রায় একসময়েই নিভে যায়।

আলো হযতো জ্বালা আছে কোনো কোনো বাড়িব ঘবে কিন্তু সে আলো জ্বলছে অন্য প্রয়োজনে, তাব মতো ঘুম আসে না বলে অগত্যা কিছু পড়ার জন্য আলো জ্বালিয়েছে ক-জন ?

জঙ্গালের দিকের জানালাব বাইবে থেকে মাযাব চাপা গলাব কথা শুনে কেশব চমকে যায় !

শুনছ ? একটা কথা শোনো ?

মায়া ? তুমি ?

আলোটা নিভিয়ে দাও।

কেশব আলো নিভিয়ে জানলার কাছে সরে । [illegible]যে জিজ্ঞাসা করে, তুমি এই জঙ্গল দিয়ে একা এলে ?

কী করব ? তুমি তো রাত থাকতে উঠে কাজে চলে যাবে।

কাল আমার ছুটি। তোমার ভয় করল না ?

করল বইকী। বড়ো ভয় দিয়ে ছোট্ট ভয় ঠেকিয়ে চলে এলাম। কেশব একটু ভেবে বলে, ঘরে আসবে ? না আমি বাইরে যাব ? মায়া বলে, তুমি যা বলো।

থাক, আমিই আসছি। কে কোন ঘর থেকে দেখে ফেলবে ঠিক নেই। আমায় যেতে দেখলে ভাববে ঘাটে যাচ্ছি।

খিড়কি খুলে কেশব বেরিয়ে যায় ! কিছু তফাতে সরে গিয়ে তেঁতুলগাছটার তলায় গাঢ় অন্ধকারে তারা দাঁড়ায়।

কী ব্যাপার মায়া ?

আমি থাকতে পারলাম না। আমার দম আটকে আসছিল। আমায় কথা দাও এ কাজ তুমি ছেড়ে দেবে।

টের পাওয়া যায় মায়া কাঁদছে।

কেশব নিশ্বাস ফেলে বলে, তুমি এত অস্থির হচ্ছ কেন ? গাড়ি মেরামত হতে গেছে, কাল দিনটা আমার তো ছুটি।

কান্না থামিয়ে মায়া বলে, ও !

তারপর উদ্‌বেগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বিরক্ত হলে মনে হচ্ছে ?

পাগল। তুমি আমাকে অবাক করে দিয়েছ। চলো তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি।

আবছা ভোরে কেশব পুকুরে গিয়ে নেয়ে উঠে ঘাটে দাঁড়িয়ে পা মুছছে, মায়া একটা গ্লাস হাতে করে এসে বলে, চট করে চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলো।

গ্লাসে একপোর বেশি দুধ।

এ আবার কী ব্যাপার ?

যে গাইটা বিইয়েছিল, আজ থেকে তার দুধ খাওয়া হবে। রোজ খানিকটা টাটকা দুধ খেতে হবে তোমায়।

কেশব বলে, সে তো বুঝলাম, কিন্তু দুধ কম পড়লে বাড়িতে কী বলবে ?

মায়া হেসে বলে, কত খেয়াল রাখছে বাড়ির লোক। গাইটাও তো দুইতে হবে আমাকেই। খেয়ে নাও, কে কোথা থেকে দেখবে।

অগত্যা দুধের গ্লাসে কেশবকে চুমুক দিতে হয়। বাচ্চা বাছুর, দুধ খুব পাতলা। কিন্তু ঠিক সে জন্য যেন নয়। মায়ার এই গায়ে পড়ে দরদ করার জন্যই যেন তার লুকিয়ে আনা দুধটা বিশেষ রকম বিস্বাদ লাগে কেশবের কাছে।

এত ভোরে নাইছ কেন ?

শহরে যাব।

আজ না তোমার ছুটি ?

অন্য কাজে যাব।

এটা বানানো কথা। কেশবের কাজ কিছুই নেই।

ভিতরটা অস্থির হয়ে উঠেছে শহরে যাবার জন্য তাই কেশবকে যেতে হবে। সে অনুভব করে ভিতরে কী যেন প্রচণ্ডভাবে চাপ দিচ্ছে, মনে হচ্ছে পাগলের মতো ছুটে চলে যায় লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে শহরের দিকে। কর্মব্যস্ত শহরের কলরব কানে না এলে, দামি ফুলের বাগান ও লনের ধারে গ্যারেজের পাশে তার পরিচ্ছন্ন ঘরখানায় বসে বাড়ির ভিতর থেকে ললনার গানের সুর ভেসে আসা না শুনলে তার যেন দম আটকে যাবে।

কিন্তু কেশব জানে, সারাদিন পর আবার সে পাগল হয়ে উঠবে আলোকোজ্জ্বল শহর থেকে এই অন্ধকার বোসপাড়ায় ফিরে আসার জন্য। লেভেল ক্রসিংয়ের দুটি দিক পালা করে তাকে কাছে টানবে আর দূরে ঠেলে দেবে।

ধাত

একটা নতুন বাড়ি উঠছে শহরতলিতে। খাস শহরে স্থানাভাব হলেও আনাচে-কানাচে এবং শহরের আশেপাশে বাড়ি তো উঠছে কতই। কাঠা তিনেক জমিতে ছোটোখাটো এই দোতলা বাড়িটা কিন্তু উঠছে আমাদের গল্পের জন্য।

বাড়িটা উঠছে তরুণী অমলার, বিনোদেব টাকায়। নিজের আপিসে প্রায় বিনা খাটুনিতে একটা চাকরি তাকে বিনোদ দিয়েছে। কিন্তু অমলা জানে রূপ যৌবন আজ আছে কাল নেই। বিনোদের আপিসের চাকরি আরও অনিশ্চিত, বিনোদ যখন খুশি যাকে খুশি বিদায় করে। তার চাকরি করার ছ-মাসের মধ্যে তিনজনকে সে ছাঁটাই করেছে, তাব মধ্যে দুজন পুরানো লোক।

অথচ এদিকে একটা মুখোশ আছে প্রেমের, নগদ টাকা নেওয়া যায় না। মুখোশটা তারা দুজনেই বজায় রেখেছে নিজের নিজের সুবিধাব জন্য। বাড়ি নেওয়া যায় ! অন্য লোকের এত বাড়ি তৈরি ক'রে দিয়ে দিয়ে বিনোদ ফেঁপে যাচ্ছে, তাকে একটা ছোটোখাটো বাড়িই করে দিক। সকলকে নিয়ে মাথা গুজবার স্থায়ী একটা ঠাঁই, নিশ্বাস ফেলে ফেলে মাসে মাসে ভাড়া-গোনা থেকে রেহাই।

ভিতের পর গাঁথনি শুরু হয়ে গেছে। রাজমিস্ত্রি খাটছে দুজন, সাদেক আর পণ্ডিত। সাদেক পাকা রাজমিস্ত্রি, এটাই তার বংশগত পেশা। বিনোদের ফার্মের সে বাঁধা লোক. এ রকম ছুটকো বাড়ি গাঁথার কাজে বিনোদ তাকে সাধারণত লাগায় না, কিন্তু অমলার কথা ভিন্ন।

ভালো মালমশলা আর ভালো মিস্ত্রি দিয়ে বাড়িটা না করে দিলে অমলা অভিমানেব ছলনায় ঝঞ্ঝাট বাড়াবে।

পণ্ডিত ক-বছর আগেও মজুর খাটত। মশলা মেশাবার কাজে সে ছিল ওস্তাদ। যুদ্ধের পর বেড়ে গেছে বাড়ি করার হিড়িক। যুদ্ধেব সময়কার কাঁচা পয়সা এবং ঘুষ ও চোরাবাজারের পয়সার নামে বেনামিতে বাড়ির রূপ নেবার ঝোঁকের সঙ্গে যোগ হয়েছে পাকিস্তান থেকে ব্যাবসা গুটিয়ে ভিটেমাটি বেচে চলে আসা মানুষগুলির সবার আগে একটা ভিটের ব্যবস্থা করাব ঝোঁক।

বাড়ির জন্য এমনই প্রাণে খাঁ-খাঁ করে এদের যে তৈরি বাড়ি কিনতে পেলে যেন বর্তে যায়। বিনোদের মতো মানুষেরা এটা কাজে লাগাতে কসুর করেনি। সে একাই ওচা মাল আর পচা মশলা দিয়ে চটপট যেমন তেমন করে গেঁথে তোলা বাড়ি বেচে ও রকম সাতজন বাড়ি-পাগল মানুষেব সম্বলে মোটা ভাগ বসিয়েছে।

ওই বাড়িগুলি গাঁথবার সময় বড়োই সে বিরক্ত হয়েছিল সাদেকের উপর।

তোমায় বারবার বলছি অত নিখুঁত কাজে আমার দরকার নেই, স্পিড বাড়িয়ে দাও, চটপট তুলে দাও—কিছুতে তুমি কথা শুনবে না !

ও রকম কাজ করতে শিখিনি বাবু। যেমন শিখেছি, তেমনই কাজ করছি।

পাকাপোক্ত বাড়িও গেঁথে দিতে হয় হিসেবি পাকা লোকের শ্যেনদৃষ্টির সামনে, সাদেককে তাই বিনোদ ছাড়তে পারেনি।

রাজমিস্ত্রির ওই চাহিদার সময় মোটামুটি কাজ শিখেই পণ্ডিত হয়েছিল রাজমিস্ত্রি। সাদেকের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারলেও কাজ পণ্ডিত ঠিকমতোই করে যায়। সাদেকের চেয়ে সে বরং তাড়াতাড়ি কাজ এগিয়ে দিতে পারে, যদিও গাঁথনি হয় একটু কম মজবুত।

পণ্ডিত তার আসল নাম নয়। পাণ্ডিত্য বা পণ্ডিতেব বংশে জন্মানোর জন্য তার এ নাম হয়নি। পণ্ডিতদের মতোই সব বিষয়ে সব প্রশ্নের যেমন হোক একটা মানে করে দেয় বলে কে একজন তামাশা করে তাকে পণ্ডিত বলে ডাকতে শুরু করেছিল, সকলের কাছে তার এখন এটাই নাম দাঁড়িয়ে গেছে।

এখনও ভারা বাঁধার দরকাব হয়নি, দেয়াল এখনও কোমরের নীচে। নীচে দাঁড়িয়েই মশলা ঢেলে ইট সাজানো যায়। ভগলু বালতি করে জল এনে ইট ভিজিয়ে দেয়, জগদেও মশলা মেখে কড়াইতে ভরে। মাথায় করে ইট আর মশলাব কড়াই নিয়ে টিকিন মিস্ত্রিদের জোগান দেয়। ছোকরা রাখাল খাটে ফুটফাট ফরমাশ।

এদের টাইমের কাজ। রতন আর জগন্নাথ সকাল সকাল এসে ইট ভেঙে ছোটোবড়ো খোয়া করতে লেগে যায়—সারাদিন তাদের হাতুড়ি দিয়ে ইট ভাঙা চলে, রোদ চড়লে খোয়ার স্তূপে একটা শিক ঢুকিয়ে মাথাব উপর ছাতি বেঁধে নেয়। তাদের চুক্তির কাজ। কয়েকদিন খোয়া ভাঙার পব একফুট উঁচু আর চারকোনা করে সাজিয়ে দেবে, মাপজোখ হবার পর স্কোয়ারফুট হিসাবে মজুবি পাবে।

হরে-দরে টাইমের মজুরদের সমানই দাঁড়ায় তাদের মজুবি।

টিকিনের মাথায় রাশীকৃত চুলের মস্ত খোঁপা, হাতে মোটা মোটা রুপার বালা এবং সাবাদেহে নানাপ্যাটার্নের উলকির নকশাকাটা।

টিকিন পণ্ডিতেব সঙ্গে থাকে। এই বয়সেব যুবতি মেয়ের পক্ষে একজন পুরুষেব সঙ্গে থাকাই নিয়ম। একা থাকতে চাইলে তার মানে দাঁড়াবে যে সে দশটা পুরুষেব সঙ্গে বজ্জাতি কবাব স্বাধীনতা চায়, বেশ্যা হয়ে যেতে চায়। তা সে খুশি হলে হতে পাবে কিন্তু যথানিয়মে দেহের দোকান খুলতে হবে, দশজনেব সঙ্গে খেটে খাওযার সম্মান বজায় রাখা চলবে না। আরও দশটা মেয়ে তো খেটে খাচ্ছে, বাচ্চা-কাচ্চার ঝামেলা পোযাচ্ছে, তাদের সাথে থেকে তাদের মরদদেব সঙ্গে খেলা করার অধিকারও টিকিনের থাকলে চলবে কেন ? নিয়ম তো থাকা চাই সংসারে। একজন পুরুষেব সঙ্গে থাকলে সে তাকে সামলে বাখবে, বেইমানি কঁবতে দেবে না।

একজনের সাথে বনিবনা না হলে ছাড়াছাড়ি হবে, আবেকজনের কাছে যাবে। কিন্তু তাকে থাকতেই হবে একজন পুরুষের সঙ্গে।

পণ্ডিত অবশ্য তাকে খাটতে না দিয়ে পুষতে পারে—বউয়ের মতো। বিয়ে করা বউটা বেঁচে থাকলে সে যেমন আর খাটতে যেত না, ঘবে বেখে তাকে পুষতে হত। স্বামী স্ত্রীতে খাটা অবশ্য নিষিদ্ধ নয় মোটেই। ভগলু জগদেও বতন জগন্নাথ সকলেব বউ ঘব ছেড়ে খাটতে যায়, কেউ টাইমেব কেউ ঠিকাকাজে।

কিন্তু পণ্ডিতের হল রাজমিস্ত্রির রোজগার, তার বিয়ে-করা বউ বাইরে খাটতে যেতে রাজি হবে না, বউকে খাটাবার অধিকাবও তার নেই।

এবং ঠিক এই জন্যই টিকিনকেও সে জোব করে বলতে পারে না যে তোর খাটতে গিয়ে কাজ নেই, আমি তোকে ঘরে রেখে পুষব।

টিকিন নিজেই রাজি হবে না।

স্বেচ্ছায় সে পণ্ডিতের সঙ্গে আছে। অন্য পুরুষ নিয়ে বেইমানি করা ছাড়া, পণ্ডিতের বেশি রোজগারে ভাগ বসানোর জন্য খানিকটা বাধ্যবাধকতা ছাড়া, খুশিমতো চলাফেরার অধিকার, যখন ইচ্ছা পণ্ডিতকে ছেড়ে যাবাব অধিকার পুরোমাত্রায় বজায় আছে।

শাস্ত্রমতে আইনমতে বা প্রথামতে বিয়ে-করা বউ ঘরে বসে খেলেও তার কতগুলি বিশেষ অধিকার থাকে। পোষা হয়ে থাকলে কিন্তু টিকিন বিয়ে-করা বউয়ের এই বিশেষ অধিকারগুলিও পাবে

না, নিজের বিশেষ অধিকারগুলিও হারাবে। পণ্ডিতকে যখন খুশি ছেড়ে যাবার অধিকার পর্যন্ত সে জাঁকিয়ে বসবে।

ছাড়তে চাইলেই পণ্ডিত বলবে, অ্যাদ্দিন যে পুষেছি, সেটা শোধ দিয়ে যাবি।

তবু জোর করে যেতে চাইলে পণ্ডিত যদি তার বালা থেকে গায়ের কাপড় পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে ঘাড়ে ধরে রাস্তায় ঠেলে দেয়, লোকে তাকে দোষ দেবে না।

বলবে, ঠিক করেছে। এতদিন ঘাড় ভেঙে খেয়ে পরে আরামে থেকে আজ মাগি বেইমানি করছে।

বউকে টাইমে খাটতে পাঠায় যে ভগলু, সে ও হয়তো রেগে গিয়ে থুতুর সঙ্গে মুখের খইনিটা পর্যন্ত ফেলে দিয়ে বলবে, তেরা শরম নেহি লাগতা ? কুত্তা সে ভি নীচা হো গিয়া ?

সবাই সায় দেবে তার কথায়। সবাই জেনে যাবে মানুষের সব চেয়ে বড়ো দোষটা আছে টিকিনের মধ্যে, সে নিমকহারামি করে।

সাপের মতো যে তাকে পোষে তারেও সে সুযোগ পেলে দংশায়।

কাজের তদারক করে আর দিনান্তে মিস্ত্রি মজুর মজুরনির মজুরি মিটিয়ে দেয় কার্তিক। বিনোদের কী রকম এক বোনের ছেলে, একটা পা তার একটু বাঁকা, চেরা ঠোঁটের জন্য পান রাঙা বড়ো বড়ো দাঁতগুলি সর্বদা বেরিয়ে থাকে। সম্পর্কের হিসাবেই সে বিনোদের আশ্রয়ে থাকে কিন্তু বিনোদ কাউকে বিনামূল্যে আশ্রয় দেওয়ার মানুষ মোটেই নয়,--খাওয়া পরা মাথা গুঁজে থাকার ভাড়া সব কিছুর অনেক বেশি দাম কার্তিককে খাটিয়ে তুলে নেয়।

খানিক তফাতের আমগাছটার ছায়ায় বসে সে তাদের কাজ দ্যাখে বিড়ি টানে ঝিমোয়, কুকারের বাটিতে আনা রুটি তরকারি খেয়ে লম্বা ঘুম দেয়, আজ এ বাড়ি কাল ও বাড়ি থেকে খবরের কাগজ চেয়ে এনে পড়ে।

কাজের ফাঁকে টিকিন গিয়ে আবদার জানায়, একঠো বিড়ি হোবে বাবু ?

কার্তিক তাকে একটা বিড়ি দিয়ে জিজ্ঞাসা করে তোমাদের ঝগড়া হচ্ছিল কেন ?

ঝগড়া ? ঝগড়া কেনে হোবে ? পণ্ডিতের সাথমে কথা বলছি

তুমি পণ্ডিতের বউ না ?

টিকিন খিলখিলিয়ে হাসে। দেখা যায় কার্তিকের পান রাঙা দাঁতগুলির চেয়ে ঢের বেশি ঘন গাঢ় রং টিকিনের দাঁতে। মিশিতে কুচকুচে কালো হয়ে আছে দাঁতগুলি। ঠিক যেন সাজানো কালো দুসারি মুক্তা।

টিকিন টের পায় কার্তিক তার মুখ দেখবে না দেহের গড়ন দেখবে ঠিক করতে পারছে না। সে কাছাকাছি চোখের সামনে এলেই কার্তিক এ রকম করে, ঠিক যন্ত্রের মতো বাঁধা নিয়মে খানিক মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে নেবে। কিন্তু কাচুমাচু করে না তার শান্ত বিষণ্ণ উদাস ভাবটাও ঘোচে না। সে শুধু যেন একটু অবাক হয়ে গেছে। বড়ো ভালো ছোকরা, গাছতলায় বসে তাদের কাজ দেখে, শেষবেলায় কাজের শেষে যার যা পাওনা মিটিয়ে দেয়—বাসভাড়া বিড়ি সিগ্রেট ক্যাশবাবুর সেলামি তার নিজের সেলামি এ সব কোনো বাবদে দুটো পয়সাও সে কোনোদিন কাটে না কারও মজুরি থেকে।

পণ্ডিত ধীরে ধীরে সুর করে যে পুঁথি পড়ে, সেই পুঁথিতে যে জোয়ানবয়সি ঋষির ছেলের কথা আছে কার্তিক যেন চালচলনে ভাবেসাবে সেই রকম—শুধু চেহারা তার বিচ্ছিরি।

বিড়ি ধরিয়ে টিকিন বলে, রোজ নাই মিলেছে। আজ মিলবে তো ঠিক ?

কার্তিক নোংরা ন্যাকড়ার নস্য দেওয়া নাক ঝেড়ে বলে, আমি কি রোজ দেবার মালিক ? আজ সঙ্গে টাকা দিয়ে দেয়নি, পিয়োন দিয়ে টাকা পাঠিয়ে দেবে বলেছে। টাকা এলে পেয়ে যাবে।

দুরোজ তো পিয়োন না এল ? আজ যদি নাই আসে ? ই কীরকম মজা হল বাবু !

কার্তিক কোনো কথা না বলে শুধু মুখ বাঁকায়। মুখ বাঁকালে মুখটা আরও কুৎসিত দেখায়।

টিকিন গজরগজর করতে করতে ফিরে যায়। জীর্ণ পুরানো যে বাড়িটার পাশে নতুন বাড়িটা উঠছে তার চুনবালি খসা দেওয়ালটার ছায়ায় হাঁটু মুড়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে আরাম করে বসে আঁচলে বাঁধা শুকনো পান আর তামাক পাতা মুখে ছেড়ে দেয়।

সাদেক হেঁকে বলে, ইটা ল'ও, জলদি—

পণ্ডিত বলে, আরে হেই, মশলা ?

টিকিন হাই তুলে ভগলুকে বলে, পিয়োন রুপেয়া লিয়ে আসবে তবে আজ রোজ মিলবে ভগলু !

সাদেক বলে, রোজ আলবাত মিলেগা। ইটা লাও।

কিন্তু টিকিনের ধাতের সঙ্গে যেন কাপে মেলানো মরদগুলির ধাত।

পণ্ডিত হাই তুলে বলে, পানি পিয়েগা, পিয়াস জানাতা।

বলে দেড় হাত উঁচু নতুন গাঁথা দেওয়ালের মায়া কাটিয়েই সে টিকিনের পাশে জীর্ণ পুরানো দেয়াল ঘেঁষে বসে চোখ বোজে।

বালতির জলে হাত-পা ধুতে ধুতে ভগলু ভাঙা গলায় গান গেয়ে উঠবার চেষ্টা করে।

জগদেও বলে, বহুত আচ্ছা ওস্তাদজি !

সমতল চৌকোণ করে সাজানো খোয়ার স্তূপের খানিক তফাতে রতন জগন্নাথ ছোটো খোয়া ভাঙছিল—কাজ যদি ঠিকমতো চলে, দেয়াল গেঁথে উঠে ছাদ গাঁথার প্রয়োজন খুব বেশি দূর ভবিষ্যৎ নয়। টিকিন সাদেক পণ্ডিতদের মতো তাদেরও হাত যেন শিথিল হয়ে আসে।

তারাও উঠে গিয়ে বসে পড়ে দেওয়ালের ছায়াতে। ডিবা থেকে বিড়ি বার করে রতন সাদেককে একটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, মেচিস হ্যায় ?

সাদেক দেশলাই জ্বালে। একটা কাঠিতে বিড়ি ধরে পাঁচটা !

খেদের সঙ্গে সাদেক বলে, বড়া লুচ্চা বেইমান বিনোদবাবু। খালি মতলব, খালি মতলব !

তাদের দিকে তাকিয়েই যেন এতক্ষণে কার্তিকের ঘুম পেয়ে যায়। মাথার নীচে হাত রেখে সে সটান চিত হয়ে শুয়ে পড়ে !

সূর্য মাথার উপর থেকে পশ্চিমে ঢলে পড়ে অনেকটা। আকাশে রুপার চাক্‌তির মতো লেপটে আছে চাঁদ, একটা দিকে একটুখানি কাটা। টিকিন একটা কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বসে মরদগুলিকে।

সূর্য কেবল দিনের বেলা আকাশের অধিকার পায় চাঁদ কেন রাতেও ওঠে দিনেও ওঠে ?

পণ্ডিত সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতের মতোই ব্যাখ্যা করে বলে, চাঁদ সূরযকা বহু এই সিধা বাত তুম জানতা নেহি ? দিনভর খাটকে রাতমে সূরয নিদ যাতা, রাত ভোর মজা লুটতা মেরে চাঁদ বিবি। দিনমে আকাশ পর উঠকে দেখাতা যে মায় খাঁটি হ্যায় সূরয দেওকা সাচ্চী পত্নী হ্যায়।

টিকিন খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

সেই হাসির সঙ্গে বড়োই বেসুরো বড়োই বেমানান ঠেকে অমলার ধমকের সুরে উদবেগ কাতর প্রশ্ন তোমরা কাজ করছ না কেন ?

টিকিন বলে, দিন মজুরকো রোজ না মিলনেসে কেইস্যা খাটেগা মাইজি ? হাওয়া খায়েগা ?

মাইজি ! অমলা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে টিকিনের দিকে তাকায়। একবারের বেশি দুবার তাকাতে হয় না, দেখলেই টের পাওয়া যায় টিকিনের ছেলেপিলে হবে তিন কী বড়োজোর চার মাসের মধ্যে।

কিন্তু তার তো মোটে তিন মাস অনেক হিসাব করে দেখেছে, তিন মাসের বেশি তার হতেই পারে না—তাকে দেখে কি টের পাওয়া যায় সে ও মা হবে ? নইলে মাইজি বলে কেন !

অমলা তীক্ষ্ণস্বরে ডাকে, কার্তিক !

কার্তিক ধড়মড় করে উঠে আসে।

এদের রোজ দিচ্ছ না কেন ?

ক্যাশবাবু টাকা না দিলে আমি কী করব ? বলেছে পাঠিয়ে দেবে।

অমলা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কালকের চেয়ে আজ আরও বেশি শুকনো দেখাচ্ছে তার মুখ। কাল ছিল না, আজ যেন কালিও পড়েছে চোখের কোণে।

এই গরমে পাঞ্জাবির উপর ভাজ করা সাদা চাদর কাঁধে মাঝবয়সি মোটাসোটা ভদ্রলোকটিকে সাথে নিয়ে স্বয়ং বিনোদ গাড়ি নিয়ে হাজির হলে অমলার কালি পড়া চোখে আগুনের ঝিলিক খেলে যায় কিন্তু মুখে কথা সরে না।

এই লোকটিকে কয়েক দিন ধরে বিনোদের কাছে যাতায়াত করতে দেখেছে। আজ ওকে সাথে নিয়ে এখানে আসতে দেখে অমলার বুঝতে বাকি থাকে না।

একটা দাঁও পেয়েছে বিনোদ। তৈরি বাড়ি তার হাতে নেই একটাও, অমলার জন্য এ বাড়িটা তবু খানিকটা তৈরি হয়ে আছে !

তাকে দেখে বিনোদ বিরক্ত হয়ে বলে তুমি এখানে কী করছ ?

অমলা নিশ্বাস ফেলে ঢোক গেলে।

এমনিই এসেছিলাম।

আধঘণ্টা পরে অমলা আর কার্তিক বিনোদের সঙ্গে গাড়িতে ' 'ন যায়, চাদর দিয়ে মুখের ঘাম মুছে ভদ্রলোক তাদের বলে তোমরা বইসা রইছ ক্যান ? কাম কর ' না ?

সাদেক বলে, দু রোজের মজুরি মেলেনি।

ততক্ষণে কোথায় কতদূরে চলে গেছে বিনোদের গাড়ি তবু দাঁত মুখ খিঁচিয়ে সেইদিকে চেয়ে ভদ্রলোক বলে, হারামজাদা ডাকাইত ! মজুরি পর্যন্ত বাকি থুইছে !

তারপর মুখ ফিরিয়ে আবার চাদর দিয়ে মুখের ঘাম মুছে ভদ্রলোক বলে, কাম কর, আমি তোমাগো মজুরি দিমু।

পেটের সাত মাসের সন্তানের ভার সামলে উঠতে গিয়ে পণ্ডিতের মুখের দিকে চেয়ে মিশমিশে কালো দাঁত বার করে টিকিন হাসে।

ঠাঁই নাই ঠাঁই চাই

দেবানন্দ প্রথমে তাদের দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে কিছুতেই রাজি হতে চাযনি।

তার নিজের ঘাড়ের বোঝাটাই কম নয়। রোগা দুর্বল স্ত্রী, একটি বিবাহিত ও একটি কুমারী মেয়ে, দুটি অল্পবয়সি ছেলে এবং একটি শিশু নাতি। যে অবস্থায় যেভাবে এদের নিয়ে বিদেশ-যাত্রা, তার ওপর একজন বিধবা ও তার বয়স্কা মেয়েকে সাথে নিতে সত্যই তার সাহস হয়নি।

শোভার মা জোর দিয়ে বলেছিল, আপনার কোনো দায়িত্ব নাই। আমাগো খালি সাথে নিবেন। আমি টিকিট কাটুম, ভিড় ঠেইলা আপনাগো লগে রেল স্টিমারে উঠুম।

তা কী হয় ?

হইব না ক্যান ? আপনারা না গেলে মাইয়াব হাত ধইরা রওনা দিতাম না ?

না, বোঝা হয়ে তাদের ঘাড়ে চাপতে চায না শোভা ও শোভার মা। পথে কোনো সাহায্য বা সহায়তারই দাবি তারা তুলবে না। কথাটা শুধু এই যে, দুটি মেয়েলোক পুরুষ অভিভাবক ছাডা একলা চলেছে এটা টের পেলেই চোর-ছ্যাঁচড় বজ্জাতরা বড়ো বেশি পিছনে লাগে। দেবানন্দেব সঙ্গে গেলে এই দুর্ভোগ থেকে তারা রেহাই পাবে।

তখন দেবানন্দ তার আসল দুর্ভাবনা ব্যক্ত করেছিল। বলেছিল সাথে নয় গেলেন। কলকাতা পৌঁছাইয়া কই যাইবেন ? সংবাদ শুনি, শহরের ফুটপাতে তিল ধাবণের ঠাঁই নাই। আমি নিজে কই যামু কী করুম জানি না। আপনারে নিয়া বিপদ বাড়ামু ?

আমাগো ঠাঁই আছে।

শোভার মা নাকি কলকাতায় ছোটোখাটো একখানা বাড়ির অর্ধাংশের মালিক। বাড়িটা হয়েছিল শোভার বাবা আর জ্যাঠামশাই ঘনশ্যামের নামে। দেশের জমিজমা ঘরবাড়ি দেখার জন্য শোভাব বাবা দেশেই থেকেছে বরাবর, জ্যাঠা থেকেছে কলকাতার বাড়িতে। মাঝে মাঝে কয়েক দিনেব জন্য কলকাতা বেড়াতে গিয়ে তারা ও বাড়িতে বাসও করেছে কয়েকবার।

তবে শোভার বাবা মাবা যাওয়ার পর গত ছ-সাতবছব শোভার জ্যাঠাও তাদের খোঁজখবব নেয়নি, তারাও অভিমান করে নিজেদের কোনো খবর দেয়নি শোভার জ্যাঠাকে।

কিন্তু এখন তো আর অভিমান করে বসে থাকার উপায় নেই। বয়স্থা মেয়েকে নিয়ে কলকাতা যেতেই হবে।

ঘনশ্যামকে চিঠি দিয়েছিল। জবাবে ঘনশ্যাম তাদেব যেতে বারণ করেছে। ভয় দেখিয়ে লিখেছে যে, বারণ না শুনে গেলে তারা বিপদে পড়বে। কিন্তু—তা তো আর হয় না। ঘনশ্যাম তাদের খেতে দিক বা না দিক—বাড়িতে মাথা গুঁজতে না দিয়ে তো পারবে না ! পেটের ব্যবস্থা কী হয় না হয় সেটা পরে দেখা যাবে।

দেবানন্দের দুর্ভাবনা ও আপত্তি তখন হ্রাস পেয়েছিল, ওদের যখন মাথা গুঁজবার ঠাঁই আছে, একেবারে একটা বাড়ির অর্ধাংশের মালিকানা-স্বত্বে, তখন আর ওদের সঙ্গে নিতে বিশেষ ভাবনার কী আছে ?

হয়তো ওদের বাড়ির অংশে দু-চারদিনের জন্য তারাও আশ্রয় পেতে পারে।

তাছাড়া শোভার মা তেমন দুর্বলা নয়—শোভাও বুঝি নয়। প্রতিবেশিনী হিসাবে শোভার মা দেবানন্দের সামাজিক অভিভাবকত্ব ঘোষণা করেছে দশজনের কাছে—কিন্তু নিজেও কখনও তার কাছে ঘেঁষেনি বা তাকে কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। সামাজিক অভিভাবকের সঙ্গে পরামর্শের দরকার হলে

ববাবব মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে তাব কাছাবি ঘবে এসেছে, সকালবেলা, সে যখন সবকাব গোমস্তা আব পাঁচজন প্রজাকে নিয়ে বিষয়কর্মে ব্যস্ত। ঘোমটা টেনে খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে শোভাকে মাঝখানে মধ্যস্থ বেখে শোভাব মা তাব সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে।

গোড়াব দিকে বিবেকেব উপবোধে মাত্র দু একবাব অভিভাবকেব দাযিত্ব জাহিব কবতে বাড়ি বয়ে খবব নিতে গিয়েছিল। শোভা পর্যন্ত সামনে আসেনি। দবজা একটু ফাঁক কবে শুধু মুখখানা বাব কবে বলেছিল, কষ্ট কইবা আপনাব আসনেব কাম কী? আমাগো দবকাব পড়ল আমবা কমু গিযা।

অত্যন্ত অপমান বোধ হয়েছিল দেবানন্দেব।

তোমাগো যাওনেব বা কিছু কওনেব দবকাব নাই।

দবজাব ফাকে দেখা গিয়েছিল শোভাব মুখ। সে মুখে কথা জুগিয়েছিল কানেব পিছনে শোভাব মা ব মুখ। বোধ হয় দুবাব তিনবাব শুনবাব পব শোভাব মুখে মুখস্থ কথা বলেছিল আপনে বোঝেন না। আপনে আইলে লোকে বদনাম দিব।

তাতে আবও অপমান বোধ হয়েছিল দেবানন্দেব।

কিন্তু অপমান বোধ বাধ্য হয়েছিল শ্রদ্ধায় স্বীকৃতি দিয়ে তলিয়ে যেতে। শোভাব এক মামা এসে হয়েছিল হাজিব। বোনেব এবং ভাগনিব অভিভাবক হবে জমিজমা ঘব পুকুবেব মালিক হবে।

দেবানন্দেব কাছাবি ঘবে একটা সামাজিক ব্যাপাবেব ছুতায বাজনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনাব জন্য জনদশেক স্থানীয বিশিষ্ট লোক জমায়েত হয়েছিল—মেয়েকে সামনে ধবে শোভাব মা সেইখানে হাজিব।

শোভাব মুখ দিয়ে নয, শোভাকে সামনে বেখে নিজেব মুখে স্পষ্টভাষায জানিয়েছিল যে সে বিপদেব প্রতিকাব চাইতে এসেছে। দেবানন্দকে বাপ ধবে নিয়ে সে পুবুষ অভিভাবক ছাড়াই মেয়েকে মানুষ কবছে, সব কাজ কাববাব দেখাশোনা বিলি ব্যবস্থা কবে আসছে। হঠাৎ একজন আত্মীযতাব অজুহাতে এসে তাব ঘব দুযাব দখল কবে তাদেব পথে বসাবাব চেষ্টা কববে, এটা সে ববদাস্ত কববে না।

একজন বলেছিল, কেডা আইছে গো—গোবর্ধন? সে না শোভাব মামা?

বুড়ো হবিনাবাযণ চমকে উঠে বলেছিল, মাযেব পেটেব ভাই না তোমাব?

ভাই? একযুগ বইনেব খবব নেয নাই সে ও ভাই? চোবডাকাতে বাতে সিঁদ কাটে, হানা দেয। বইনেব কেউ নাই জাইনা দিনদুপুবে দশজনেবে জানান দিযা ভাই হইযা বইনেব সব লুটবাব আইছে। সে ও ভাই? ভাই দিযা আমাব কাম নাই মাইযাব কাম নাই মামা দিযা। যাইতে কই যায না। আপনাবা বিহিত কবেন।

বিহিত তাদেব কবতে হয়েছিল শোভাব মামাকে ভাগিয়ে দিয়ে। দেবানন্দ টেব পেয়েছিল, শোভাব মা ব বুকেব পাটা শক্তই আছে।

শিযালদহ নেমে চাবিদিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ তাবা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বিববণ আগেই শুনেছিল, কিন্তু এত মানুষ এইটুকু জাযগায এভাবে গাদাগাদি কবে দিনবাত কাটাতে পাবে চোখে দেখাব আগে এটা কল্পনা কবা সম্ভব ছিল না। মনে হয, ক টা পিঁজবাপোলীয হাসপাতাল যেন গড়ে তুলেছে জগতেব পবিত্যক্ত মানুষ– কচিশিশু থেকে শেষ বযসেব মেয়েপুবুষ।

পৃথিবীতে এত অনটন ঘটেছে স্থানেব?

শোভাব মা বলে, বাবা, আপনাবা কই গিযা উঠবেন?

দেবানন্দ বলে, তোমাগো আগে পৌঁছাইযা দিযা আসি –ফিবা আইসা ঠাঁই খোঁজনেব চেষ্টা কবুম।

মনুষ্যত্বের এই পিঁজরাপোলে সকলকে বসিয়ে রেখে দেবানন্দ তাদের পৌঁছে দিতে যাবে—এই সহজ কথাটা যেন শোভার মা বুঝতে পারে না। সে একটু ব্যাকুল দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে দেবানন্দের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। পথের বাস্তবটা ঘণ্টাকয়েক সময়ের মধ্যেই দেবানন্দের কাছে তার বহু যুগের ঘোমটার আড়াল প্রায় ঘুচিয়ে দিয়েছে।

শোভা বলে, মা ? আমরা দুইখান ঘর পামু না ?

শোভার মা চিন্তিত মুখে বলে, সেই কথাই তো ভাবি। দুইখান ক্যান, একখান ঘর পামু সঠিক জাইনা কী চুপ কইরা আছিস ভাবস ? যে চিঠি লিখছে তোর জ্যাঠা—

শোভা বলে, দিব না কও ? আমাদের ভাগের ঘর দিব না ক্যান ? জোর কইরা দখল করুম।

শোভার ছেলেমানুষি তেজে যেন তার মার সম্বিত ফিরে আসে। তার মফস্বলের তেজ ও দৃঢ়তা অনভ্যস্ত অচিন্তিত অবস্থায় এসে পড়ে খানিকটা ঝিমিয়ে গিয়েছিল। সে আর দ্বিধা করে না, দেবানন্দকে বলে, আপনারাও আসেন আমাগো লগে। যে কয়দিন বাসা খুইজা না পান, মাথা গুইজা থাকবেন।

তা কি হয় ?

হয়। মা-বইন বাপ-ভাই আপনাগো ফেইলা আমি গিয়া ঘরে উঠুম ? আমি আপনার অমন মাইয়া না।

দেবানন্দের বড়োমেয়ে মায়া ছলছল চোখে চেয়ে বলে, বাবা আবার তোমারে সঙ্গে নিতে ডরাইছিল !

তার ছোটোবোন ছায়া শোভার দিকে চেয়ে একটু হাসে। আগে তাদের জানাশোনা ছিল, পথের কষ্টকর গা-ঘেঁষাঘেঁষি ঘনিষ্ঠতায় তারা সখীতে পরিণত হয়ে গেছে।

শোভার মা বলে, আমি তো ডরাই। ভাসুর যা চিঠি লিখছে—রওনা দিতে বারণ কইরা। বিষম নাকি বিপদ হইব। তা মরার বাড়া বিপদ কী ?

দেবানন্দ বলে, তোমরা আইসা ভাগ বসাইবা তাই বারণ করছে। ভয় দেখাইয়া যদি ঠেকান যায়।

শোভার মা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে : চিঠির ধরণ তেমন না। ওই কুমতলব থাকলে বানাইয়া দশটা অজুহাত দিত, লিখত যে এই এই ব্যাপার হইছে কাজেই তোমরা আইসো না। কোনো কারণ না, কেমন যেন দিশাহারাভাবে লিখছে চিঠিখান। মনে লাগে, কিছু ঘটছে।

একটা গাড়ি ভাড়া করে তারা রওনা দেয়।

বাড়িটা শহরের এক ঘিঞ্জি নোংরা প্রান্তে।

কলকাতায় বাড়ি করার আসল দরকারটা ছিল ঘনশ্যামেরই, শহরেই তার স্থায়ী বসবাস। একটু বুদ্ধি খাটিয়ে ভাগাভাগিতে বাড়ি করার প্রস্তাব সে-ই করেছিল শোভার বাবার কাছে—ওরা দেশেই থাকবে বরাবর, মাঝে মাঝে কেবল কিছুদিনের জন্য বেড়াতে আসবে, বাড়িটা এক রকম সে-ই সপরিবারে ভোগ-দখল করবে।

সমস্ত নগদ সঞ্চয় দিয়ে এবং জমি বেচে শোভার বাবা নিজের ভাগের টাকা দিয়েছিল, কলকাতা শহরে একটা বাড়ির অংশ থাকবে শুধু এইটুকুর জন্য।

আর আজ বিপদে পড়ে সেই ভাইয়ের বউ আর মেয়ে কলকাতা আসতে চাইলে ঘনশ্যাম বিপদের ভয় দেখিয়ে তাদের আসতে নিষেধ করে।

গলির মধ্যে গাড়ি ঢুকবে না। গলির মুখে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেবানন্দ আর শোভার মা গলিতে ঢোকে।

ছোটো দোতলা বাড়িটার সদরের কড়া নাড়তে অল্পবয়সি কালো একটি ছেলে দরজা খোলে। —শোভার মা-র সে অচেনা !

কাকে চান ?

দেবানন্দ বলে, ঘনশ্যামবাবুরে ডাইকা দাও।

ছেলেটি বলে, ঘনশ্যামবাবু ? তিনি তো এখানে থাকেন না।

শোভার মা বলে, কী কথা কও থাকেন না ? তার বাড়ি না এটা ? ছেলেটি মাথা নেড়ে বলে, না। এটা আমাদের বাড়ি, কিনে নিয়েছি। দেবানন্দ আর শোভার মা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

কতদিন কিনা নিছ ?

আর বছর।

শোভার মা হতভম্ব হয়ে থাকে। দেবানন্দ হিসাবি-বিষয়ী মানুষ, এইটুকু ছেলের সঙ্গে আলাপ করে লাভ নেই বুঝে বলে, খোকা তোমার বাবারে ডাইকা দিবা ?

আমার বাবা নেই। এটা মামার বাড়ি।

মামা বাড়ি আছেন ? ওনারেই ডাইকা দাও।

খানিক পরে ভুঁড়িওলা প্রৌঢ়বয়সি কৃষ্ণদাস বাইরে এলে দেবানন্দ জিজ্ঞাসা করে, আপনে এই বাড়ি কিনছেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনারা কী চান ?

আমি ঘনশ্যামবাবুর দ্যাশের লোক। ইনি তার ভায়ের বউ।

কৃষ্ণদাস বলে, তা আপনারাই আসবেন জানিয়ে কার্ড লিখেছিলেন ? চিঠিটা আমি তো সঙ্গে সঙ্গে ঘনশ্যামবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি ! উনি আপনাদেব ঠিকানা জানাননি ?

দুজনেই তারা স্বস্তি বোধ করে। বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে থাক, ঘনশ্যামেব পাত্তা অন্তত পাওয়া যাবে !

দেবানন্দ বলে, চিঠি লিখেছেন কিন্তু ঠিকানা দিতে ভুলে গেছেন।

প্রকাণ্ড একটা হাঁ করে হাই তুলে কৃষ্ণদাস বলে ভুলে হয়তো যাননি, ইচ্ছা করেই ঠিকানা জানাননি। মানুষটার বড়ো দুরবস্থা।

ঘনশ্যামের দুরবস্থার বিবরণ শুনতে শুনতে দেবানন্দ ও শোভার মা আবাব মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

কাজ নেই। রোজগার নেই। রোগে ভুগছে। দেনায় বিকিয়ে গেছে এই বাড়ি। ঘনশ্যামকেও উদ্‌বাস্তু হতে হয়েছে। ওইখানে উঠে গেছেন--হাত বাড়িয়ে আঙুলের সংকেতে কৃষ্ণদাস গলির আরও ভিতরের দিকে বাঁকের ও পাশে খোলার চালাগুলি দেখিয়ে দেয়। দুটো পাকা বাড়ির ফাঁকে দু-তিনটে খোলার চালাই শুধু দেখা যাচ্ছিল।

শোভার মা সেদিকে পা বাড়াতেই দেবানন্দ বলে, রও, রও। গাড়িটারে ছাইড়া দিয়া আসি। বেশি দেরি হইলে ব্যাটা তিনগুণ ভাড়া আদায় করব।

রাস্তার শুধু একদিকে দু-হাত চওড়া ফুটপাত, তার গা ঘেঁষে উপরে মাথা তুলেছে শীর্ণ রুগ্‌ণ অজানা গাছটা।

ওই গাছের তলে ফুটপাতে জিনিসপত্র নামিয়ে সকলকে বসিয়ে গাড়ির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে দেবানন্দ আর শোভার মা আবার গলিতে ঢোকে।

খোলার বাড়ি খোলার ঘর হলেই নোংরা হয় না। খোলার ঘরের গরিব বাসিন্দারাও ঝাঁট দিয়ে লেপে পুঁছে ঘর-দুয়ার সাফ রাখতে জানে—এ রকম সাফ রাখাটা প্রায় শুচিবাইয়ের পর্যায়ে উঠে যায়। কিন্তু খোলার ঘরের সামান্য আশ্রয়েও এমন গিজগিজে ভিড় জমেছে মানুষের যে সাফসুবুত রাখার চেষ্টা অসম্ভব হয়ে গেছে।

মানুষ জাতীয় জীবের খাটালে পরিণত হয়েছে বাড়িগুলি।

দুর্গন্ধে অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠে আসবে, আজও যাদের অন্নপ্রাশন হয়।

দুজনের কোনোরকমে থাকবার মতো আঁধারে একটা স্যাঁতসেঁতে ঘর।

সেই ঘরে ঠাঁই জুটেছে ঘনশ্যামের পরিবারের ছোটোবড়ো মোট আটজন মানুষের। এক কোণে ঘনশ্যাম পড়েছিল চাদর মুড়ি দিয়ে। ঘনশ্যাম অথবা তার কঙ্কাল চেনাই মুশকিল।

শোভার মা-কে দেখে ঘনশ্যাম কাতরাতে কাতরাতে বলে, বারণ করলাম, তবু আইলা ? এখন সামলাও।

দুজনকে বসতে দেওয়া হয় দুটুকরো তক্তায়। বোঝা যায়, তক্তার টুকরো দুটো সংগ্রহ করে আনা—ছেলেমেয়েদের দ্বারা। কাছেই কোথাও কংক্রিটের গাঁথনি উঠছে বোধ হয়।

আমাগো যে জানান নাই ?

জানাব ভাবছিলাম। তোমাগো কী অবস্থা কে জানে। তাবপর চিঠি পাইলাম, বারণ কইরা লিখলাম আইসো না। এখন মজা বোঝ।

শোভার মা মফস্বলের তেজে ফোঁস করে ওঠে, মজা কীসের ? এত বড়ো পৃথিবীতে মাথা গোঁজনের ঠাঁই পামু না ? ঠাঁই আদায় কইরা নিমু।

চুরি চামারি

লোকেশ মাইনে পেল চার তারিখে। রাত্রে তার ঘরে চুরি হয়ে গেল।

সেদিনও আপিস থেকে বাড়ি ফিরতে লোকেশের রাত ন টা বেজে গিয়েছে। কোথাও আড্ডা দিতে সিনেমা দেখতে বা নিজের জরুরি কাজ সারতে গিয়ে নয়, সোজা আপিস থেকে বাড়ি ফিরতেই দেরি।

ছোটো বেসরকারি আপিস— যদিও আধা সরকারিভাবে সরকারের সঙ্গে যোগ আছে। লোক খাটে কম—যত লোকের খাটা দরকার তার চেয়েও কম।

এমনিতেই দু একঘণ্টা বেশি খাটিয়ে নেয় ওভারটাইম না দিয়েই, মাসকাবারে ক দিন আটটা সাড়ে আটটা পর্যন্ত আপিসে থাকতে হয়। খুব সোজা কৌশল, বেতন দেবার সুনিশ্চিত আশ্বাস দিয়েও সময়মতো বেতন না দিয়ে আটকে রেখে খাটিয়ে নেওয়া।

এবং এমনই তাদের প্রচণ্ড প্রয়োজন মাসকাবারি বেতনটার যে আশায় আশায় রাত আটটা নটা পর্যন্ত কাজ করে যায়।

মাইনে অঘোর দেবে, না দিয়ে উপায় নেই। আজ দিয়েও তো দিতে পারে ?

অঘোর বলে, বসে থাকবেন না, বসে থাকবেন না। মাইনে পান খেটে খান—এ ভাবটা ভুলতে চেষ্টা করুন। ও রকম ভাববে কারখানার কুলিরা। মনে রাখবেন, বড়ো মন্দার বাজার। আপিস টিকে থাকলে তবেই আপনারা টিকে রইলেন আপিসের উন্নতি হলে তবেই আপনাদের উন্নতি।

তারা গুজগাজ ফোঁসফাঁস করে। চাপা গলায় কেউ গর্জে ওঠে, দুত্তেরি তোর—

ক্ষোভ বুকে নিয়ে তবু কাজ করে যায়। কৌশলটা খাটছে না দেখলে অঘোর হয়তো চটে গিয়ে আরও বেতন গোনা একদিন পিছিয়ে দেবে শোধ নিতে।

কদাচিৎ পয়লা দোসরা তারিখেও বেতন মিটিয়ে দেয়। যে তারিখেই মাইনে পাক তারা সই করে পয়লা তারিখে পেয়েছে বলে।

উদবেগ চেপে রেখে ছবি প্রশ্ন করে পেলে আজ ?

পেয়েছি।

নোট ক টা ছবির হাতে দিয়ে সে জামাকাপড় ছাড়তে থাকে।

মুখ-হাত ধোয়া হতে না হতে ঘরের বাইরে বাড়িওলা সুরেনের গলা শোনা যায়— আছেন নাকি লোকেশবাবু ?

লোকেশ ঘরের ভেতর থেকেই বলে, আছি মশায়, আছি। এত অস্থির হন কেন ? সারাদিন খেটেখুটে এলাম, সকালে দিলে হত না ?

দেয়ারটা দিলেই চুকে যায়।

ছবি বলে, দিয়ে দাও চুকে যাক।

সুরেনকে ঘরখানার ভাড়া দিয়ে রশিদ নিয়ে খেতে বসে ক্ষুব্ধ লোকেশ বলে, কই আমরা তো পাওনা টাকা এভাবে আদায় করতে পারি না ? প্রত্যেক মাসে মাইনে দিতে টান বাহানা করবে, বেশি বেশি খাটিয়ে নেবে।

খাটেন কেন ? জোর করে বলতে পারেন না পয়লা তারিখে মাইনে চাই, বেশিক্ষণ খাটালে পয়সা চাই ?

বুটি চিবোতে চিবোতে লোকেশ একটু ঝাঁঝালো হাসি হেসে বলে, আপনি কী বুঝবেন বলুন ? কম লোক, ইউনিয়ন-ফিউনিয়ন নেই, যে তেড়িবেড়ি করবে তাকে দেবে খেদিয়ে। আমরা কী বলাবলি করি না ভেবেছেন যে এ সব অন্যায় আর সইব না ? কিন্তু ওই বলাবলিই সার হয়। একজনকে এগিয়ে হাল ধরতে হবে তো ? যে এগোবে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বরখাস্ত করবে। ব্যাটা এক নম্বর চামার।

ছবি গোমড়া মুখে বলে, সত্যি। যা দিনকাল, এর মধ্যে চাকরি-বাকরি চলে গেলে—

সে যেন শিউরে ওঠে।

রাত্রে দুজনেই তারা খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোয়। কাল দোকানের ধার দুধের দাম এ সব মিটিয়ে দেওয়া যাবে। রেশন আসবে, অনেকদিন পরে আধপো মাছ এনে স্বাদে গন্ধে ভাত খাবে। ছবির জন্য শাড়ি একখানা চোখ-কান বুজে কিনে ফেলা হবে কি না সেটাও ঠিক করে ফেলা যাবে।

ঘুমের মধ্যে রাত্রে চুরি হয়ে যায়।

তারা টেরও পায় না।

ভোরে অন্য লোকের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে দ্যাখে এই ব্যাপার !

পাড়াতেই দু-তিন ঘরে চুরি হয়ে গেছে কিছুদিনের মধ্যে, তাদের ঘরে চুরি হওয়াটা মোটেই আশ্চর্য ব্যাপার নয়। কিন্তু জানালার বাঁকানো শিক, খোলা দরজা আর তাদের যথাসর্বস্বের শূন্যস্থান দেখেও যেন তাদের বিশ্বাস হতে চায় না যে সত্যসত্যই তাদের ঘরে চুরি হয়ে গেছে।

কেবল দুটি মানুষ বলেই সামান্য মাইনেতে তাদের একখানা ভাড়াটে ঘরে মুখ গুঁজে কোনোরকমে চলে যায়, তাদের ঘরে চুরি ! পাড়াতেই তো কত পয়সাওলা লোক আছে, এ বাড়ির দোতলাতেই বাস করে বাড়িওলা সুরেন—ওদের বাদ দিয়ে তাদের ঘরে হানা দেবার জন্য এত হাঙ্গামা করার তো কোনো মানেই হয় না !

তারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

লোক জড়ো হয়েছে, জিজ্ঞাসা মন্তব্য আর এখন তাদের কী করা কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া চলছে, নিঃশব্দে তলার কাঠ কেটে চোরেরা কী করে এত মোটা শিক বাঁকিয়ে দিল তাই নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ ও জল্পনা-কল্পনা চলছে—কিন্তু লোকেশ আর ছবির কাছে কিছুতেই যেন ঠিকমতো গুরুতর হয়ে উঠতে পারছে না ব্যাপারটা।

সুরেন বলে, দেখলেন তো মশায় ? ভাগ্যে ভাড়াটা আদায় করে নিয়ে গেছলাম, নইলে ওই টাকাটাও গচ্ছা যেত আপনার।

শুনে লোকেশের যেন হাসিই পায়।

যার এক রকম সর্বস্ব চুরি হয়ে গেছে, ভাড়ার ওই ক-টা টাকা বেঁচে গেছে বলে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা !

এই কথাটা উল্লেখ করে ছবিও পরে বলেছিল, আমার কানপাশা যে বাঁধা দিয়েছিলে সেটাও তাহলে আমাদের ভাগ্যি বলতে হবে !

ঘরে ছিল একটি ট্রাংক, একটি চামড়ার সুটকেস একটি হাতবাক্‌সো, তাকে সাজানো কিছু বাড়তি বাসন আর আলনায় সাজানো জামাকাপড়। এ সব কিছুই চোরেরা রেখে যায়নি !

নিত্য ব্যবহারের অর্থাৎ গায়ের গহনা আর রান্না-খাওয়ার বাসনগুলি আছে। আটগাছা চুড়ির মধ্যে চারগাছা আছে, হাতে, গলায় হারটা আছে আর কানে দুল। অন্য ভাড়াটের সঙ্গে সিঁড়ির নীচেকার ছোট্ট ঘরটিতে তাদের রান্না হয়, ও ঘরে থাকায় মাজা-বাসন ক-টা রয়ে গেছে।

আর সমস্ত কিছুই চোবে নিয়েছে। সোনা রুপার গয়না ও উপহার দ্রব্য, বিয়েতে এবং অন্যভাবে পাওয়া সমস্ত দামি জামাকাপড়— সাধারণ ভালো জামাকাপড় ক-টা পর্যন্ত !

আলনাটা পর্যন্ত খালি করে নিয়ে গেছে ?

এটাই যেন সকালে তাদের পীড়ন করে সব চেয়ে বেশি !

পরনের লুঙ্গি আর একটা ছেঁড়া পাঞ্জাবি ছাড়া কিছুই নেই লোকেশের যে পরে আপিস যাবে।

লুঙ্গি আর ছেঁড়া পাঞ্জাবিটা পরে বেরিয়ে রাস্তায় যে জামাকাপড় কিনে নেবে তারও উপায় নেই, সারা ঘর হাঁতড়ে বেড়ালে দুটো তামার পয়সা মিলবে কিনা সন্দেহ !

পয়সাকড়ি সব ওই হাতবাক্‌সোটায় থাকত।

তারপব আছে পেটের ব্যাপার। রেশন আনলে, বাজার করলে তবে খাওয়া জুটবে !

ছবিব মুখে সত্যই একঝলক হাসি ফোটে। চোবেবা যেন তাদেব জন্য একটা ভারী মজার অবস্থার সৃষ্টি করে গেছে।

খাওয়া তো পরের কথা। একদানা চিনি নেই যে তোমায় এক কাপ চা করে দেব !

এতক্ষণ বড়োই চিন্তাক্লিষ্ট দেখাচ্ছিল লোকেশের মুখ, ছবির কথা বলার ভঙ্গিতে তার মুখেও হাসি ফোটে।

ক-টা টাকা ধারের চেষ্টা দেখি। তারপর যা হয় হবে।

ছবির মুখের ভাব শক্ত হয়ে যায়।

কার কাছে ধাব চাইবে ? সেদিন যারা দশটা টাকা দিল না, কানপাশা দুটো বাঁধা দিতে হল, আবার তাদের কাছে হাত পাততে যাবে ?

লোকেশ বলে, তা নয়, তখন মাসের শেষ, কারও হাতে সামান্য টাকাও ছিল না। নইলে কী রমেশবাবু, তিলকবাবু ক-দিনের জন্যে দশটা টাকা দিত না ? এমন বিপদ ঘটল, আজ যার কাছে চাইব সে ই দেবে।

ছবি ধীবে ধীরে মাথা নাড়ে।

ক-দিনের জন্য তো ধার নেবে, ক-দিন বাদে শোধ দেবে কোখে‌ ? সারা মাস চালাবে কী দিয়ে ?

লোকেশ গোমড়া মুখে বলে, সে যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। উপায় কী ?

থাক, তোমাব আর আবোল-তাবোল ব্যবস্থা করে কাজ নেই। আমি ব্যবস্থা করছি—

বেশ খানিকটা মরিয়া বেপরোয়া মনে হয় ছবিকে। চোরেরা যেন ঘব খালি করে নিয়ে যাবার সঙ্গে তার মনেব ভয়-ভাবনাগুলিও চুরি করে নিয়ে গেছে।

আজ আপিস না গেলে হয় না ?

মাইনে পেয়েই কামাই করাটা...

সমস্ত সমস্যা যেন মীমাংসা কবে ফেলেছে এমনইভাবে ছবি বলে, তাহলে এক কাজ করো। বেলা হয়ে গেছে, রেশন এনে সাড়ে আটটায় ’য়ে বেরোতে পারবে না। দোকানে চা খেয়ে ওই বুড়ির কাছ থেকে আধসের চাল আর দোকানে ডিম-টিম যা পার এনে দাও—

এবার লোকেশ চটে যায়।

চা খেতে, চাল ডিম আনতে পয়সা লাগবে না ?

পয়সা আমি দিচ্ছি !

বিয়ের কমদামি খাটের বিছানার তলায় ডান হাতটা প্রায় সমস্তখানি ঢুকিয়ে দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে ছবি বার করে আনে আস্ত একটা পাঁচ টাকার নোট !

বলে, ছ-সাতমাস আগে পাঁচ টাকা হিসেবে মেলেনি মনে আছে ? হারিয়ে যায়নি, আমি চুরি করেছিলাম।

তারপর একটু উদ্‌বেগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, চলবে তো ? দুমড়ে মুচড়ে গেছে।

লোকেশ বলে, চলবে। একশোবার চলবে। তোমার জন্য চা আনব না ?

আমি মনোদির সাথে খাবখন। এমন বিপদে পড়েও টাকা চালডাল ধার চাইছি না—এতখানি দয়ার বদলে এক কাপ চা না খাওয়ালে চলবে কেন।

লোকেশ তবু ইতস্তত করে।

ছবি তাগিদ নিয়ে বলে, দাঁড়িয়ে রইলে যে ? বেলা বাড়ছে না ?

সব তো বুঝলাম। আমি আপিস যাব কী পরে ?

সে ব্যবস্থা করছি। শুধু চা খাব না, মনোদির কাছে রবীনবাবুর একখানা ধুতি ধার করব। পরশু তরশু লন্ড্রিতে আর্জেন্ট ধুইয়ে ফেরত দিলেই চলবে।

লোকেশ তবু ইতস্তত করে। সে তো বুঝলাম। কিন্তু তারপর কী করব ?

ওর জবাব সেই এককথা। কী আবার করবে, আপিস যাবার সময় নিয়ে যাবে।

লোকেশদের আপিসে সেদিন কাজে বড়োই ব্যাঘাত ঘটে। কাজ আরম্ভই হয় ঘণ্টাখানেক দেরিতে।

সবাই এসে পৌঁছে গেলে লোকেশ সকলকে বলে, টুল-ফুল নিয়ে সবাই জড়ো হয়ে বসুন দিকি একসাথে। ভীষণ জরুরি কথা আছে।

তার মুখ দেখে আর কথা শুনে সবাই একটু হকচকিয়ে যায় বটে কিন্তু তাকে ঘিরে বসে সকলেই।

কোনো রকম ভূমিকা না করে লোকেশ জোরের সঙ্গে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, আমরা কী কুকুর বিড়াল, যত ইচ্ছা খাটিয়ে নেবে, সকাল ন-টায় শুরু করিয়ে রাত ন-টায় ছুটি দেবে ? সময়মতো মাইনে দেবে না ?

একজন বলতে যায়, তোমার বাড়িতে নাকি চুরি হয়েছে শুনলাম ?

লোকেশ বলে, ঘর খালি করে সব নিয়ে গেছে।

সে গল্প পরে বলছি। এখন কাজের কথা শুনুন। আমরা চুপচাপ মেনে নিই বলে আরও পেয়ে বসেছে ! আজ আমরা সাফ জানিয়ে দেব যে আমরা আপিস আইনের বাঁধা-টাইমের বেশি খাটব না, খাটালে ওভারটাইম দিতে হবে। ঠিক তারিখে মাইনে দিতে হবে আমাদের।

সকলে নির্বাক হয়ে থাকে।

লোকেশ শান্তভাবেই বলে, ভয় পাবেন না। যা বলার আমিই বলব অঘোরবাবুকে, আমিই সকলের হয়ে ঝগড়া করব। আপনারা শুধু আমার পিছনে থাকবেন। যদি ক্ষতি করে আমার করবে, আপনাদের কিছু করবে না।

তবে বাড়ির চুরির ব্যাপারটা জানতে চেয়েছিল প্রৌঢ়বয়সি যতীন। সে সঙ্গে সঙ্গে জোর দিয়ে বলে তোমার একলার ক্ষতি করবে মানে ? আমরা তা মানব কেন ?

এক ঘণ্টা আলোচনার পর যে যার জায়গায় গিয়ে বসে। কিন্তু কাজে কারও মন বসে না। অঘোর আরও দেরিতে আসবে, কিন্তু খবর তার কানে পৌঁছুবে। নিশ্চয় ডেকে পাঠাবে লোকেশকে।

তারপর কী নাটক আরম্ভ হবে কে জানে ছা-পোষা চাকরি-সর্বস্ব তাদের আপিস-জীবনে ?

অঘোর যথাসময়ে আসে। নিজের ঘরে বসে। কাজ করার বদলে সকলে এক ঘণ্টা জটলা করেছে, খাস ও একমাত্র বেয়ারা বেচুর কাছে এ খবরও নিশ্চয় সে শোনে। কিন্তু সারাদিন কেটে যায়, লোকেশকে সে ডাকে না।

আপিসের মুষ্টিমেয় মানুষ ক-টার বিদ্রোহের খবর যে সে পেয়েছে সেটা টের পাওয়া যায় একটিবারও তার আপিস ঘরে না আসায়। রোজ সে তিন-চারবার টহল দিয়ে যায়।

ক্রমে ক্রমে সকলে এটাও টের পায় যে অঘোর প্রতীক্ষা করছে। তারা নিজে থেকে কী করে না দেখে সে কিছুই করবে না !

পাঁচটা বাজতেই সকলে কাজ বন্ধ করে উঠে দাঁড়ায়। লোকেশ বেচুকে ডেকে বলে, বল গে যাও, আমবা যাচ্ছি !

মিনিট পাঁচেক পবে অঘোর নিজেব ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শান্ত কিন্তু গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা কবে, কী ব্যাপার ?

অবুঝ ছেলেরা দুষ্টামি করে বাযনা ধবেছে। সে পিতার মতো শুনতে চায় তাদের নালিশ ! শুনে নিশ্চয় স্নেহময় কিন্তু তাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক পিতার মতোই বিচার করবে।

লোকেশও শান্ত গম্ভীরভাবে তাদের নালিশ জানায়, তাবা অতঃপর কী করবে স্থির করেছে তাও জানায।

অঘোর উদাস-উদাবভাবে বলে, বেশ তো। তোমরা চাকবি করার সরকারি আইনমতো চাকরি করতে চাইলে আমি কি না বলতে পারি ? আমি কি আইন ভেঙে গায়ের জোরে তোমাদের বেশি খাটিযেছি ? ও সব আইন-টাইনের কথা খেয়ালও ছিল না আমাব। আমরা মিলেমিশে কাজ করছি, মানিয়ে চলছি, ব্যাস।

লোকেশের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ বেখে বলে, তোমরা যে ঘবোয়া ব্যবস্থাটা পছন্দ করছ না আমাকে জানালেই হত। হঠাৎ এ বকম গন্ডগোল করাব কোনো মানে হয ?

নিজেব আপিসেব উপরেই যেন বিতৃষ্ণা এসেছে এমনিভাবে নাক-মুখ সিঁটকোতে সিঁটকোতে অঘোর সকলের আগে বেরিয়ে গিয়ে গাড়িতে ওঠে।

একটা মস্ত যুদ্ধে যেন জয়লাভ করেছে, প্রকাণ্ড অনিয়ম থেকে বেহাই পেয়েছে, এমনইভাবেই সকলে কলবব করে, সমবয়সি দু-একজন পিঠ চাপড়ে দেয় লোকেশেব।

প্রৌঢ় যতীন বলে, আজকেই শেষ হয়ে গেল ভাবছ নাকি তোমরা ? আমরা গুটিসুটি মেরে পিছনে দাঁড়িয়ে রইলাম, লোকেশ বেচারা এগিয়ে গিয়ে ঝগড়া করল—ব্যাস অমনি সব ঠিক হযে গেল। বেকাযদায় পড়ে মেনে নিয়েছে তাই। শোধ না তুলে ছাড়বে ভেবেছ ?

সবাই চিন্তিত হয়ে বাড়ি ফেরে।

গতরাত্রে চুরি হযে গেছে—গযনাগাঁটি মালপত্র। আজ ভোবরাত্রেও যে চোব আসবে কে তা জানত !

ছবির আব সব গেছে। অল্পদামি বিয়ের খাটে লোকেশের পাশে শুয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমানোর অধিকারটা বজায় ছিল।

শেষরাত্রে প্রকাশ্যভাবে ভ্যান চালিয়ে চোর এসে তার বাহুবন্ধন থেকে চুরি করে নিয়ে যায় লোকেশকে। আটক আইনের জোরে।

দায়িক

অলুক্ষুনে সন্তান ?

নইলে প্রায় এগারোটি মাস মায়ের পেট দখল করে থেকে এমন অসময়ে ভূমিষ্ঠ হয়, অসময়েব এই বাদলা আর হাড়-কাঁপানি শীত শুরু হবার পর ?

মেয়েটাকে মারবার জন্যই কি দেবতাদের ইঙ্গিতে প্রকৃতির এই নিয়মভাঙা খাপছাড়া আচরণ ?

কে জানে !

একটা ছেলেকে মারবার জন্য দেবতারা ব্যস্ত হয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটাবে, এটা ভাবতেও আবার মনটা খুঁতখুঁত করে গোবিন্দের।

কেন তবে তার প্রথম সন্তানের নিশ্চিত মরণ এভাবে ঘনিয়ে আসবে ?

ক্রমে ক্রমে শীতের এখন বিদায় নেবার পালা। এলোমেলো উলটো-পালটা বাতাস বইবে কখনও উত্তর কখনও দক্ষিণ থেকে, রাতে কাঁথাকাপড় দরকার হলেও দিনের বেলায় ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব খালি-গা জুড়িয়ে দেবে। তার বদলে বলা নেই কওয়া নেই শুরু হয়েছে টিপটিপ বৃষ্টির সঙ্গে কনকনে উত্তুরে হাওয়া !

কী দাপট শীতের।

হোগলার একরত্তি আঁতুড়ঘর। গোয়ালের পাশে ছিটালের গা ঘেঁষে তোলা। ভিতের লেপা-পোঁছার বালাই নেই, মানুষের জন্মলাভের মতো নোংরা অস্থায়ী ব্যাপারটার জন্য অত হাঙ্গামা কে করে ? মাটিটা শুধু একটু চেঁছে দেওয়া হয়েছে কোদাল দিয়ে।

সস্তা পুরানো হোগলার চালাটা তুলে ভিতরে দুটি খড় বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। খড়ের উপর বস্তা-কাটা পুরানো ছেঁড়া একটা চট।

মোটে একটা মাসের ব্যাপার। মাস কাটলেই আঁতুড় উঠবে, স্নান করে শুদ্ধ হয়ে ছেলে নিয়ে রেবতী ঘরে উঠতে পাবে। তখন ফেলে দেওয়া হবে হোগলার চালা।

চিরকালের এই রীতি।

তার বাপদাদারাও এমনি চালার ঘরে জন্মেছে, তার নিজের বেলাও অন্য কোনো ব্যবস্থা হয়নি।

অনেক পুরুষ ধরে অনেকে যেমন জন্মেছে তেমনই অনেকে অবশ্য মরেও গেছে এই আঁতুড়ে।

তা তো মরবেই। জন্ম আর মৃত্যু নিয়ে সংসার—শুধু জন্ম নিয়ে তো নয়।

মেয়েটা বাঁচবে আশা করতে ভরসা হয় না। রেবতীও বাঁচবে কি না সন্দেহ। বাদলা ধরার বা শীত কমার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বেড়ার চারিদিকে মাটির আল তুলে দিয়ে গোবিন্দ ভিতরে জল গড়িয়ে যাওয়া ঠেকিয়েছে, কিন্তু হোগলার ফাঁক দিয়ে জলের ছাঁট যাওয়া বন্ধ করা যায়নি।

দাওয়ায় বসে গোবিন্দ আকাশ-পাতাল ভাবে, রেবতীর ক্ষীণকণ্ঠ কানে এলেও কিছুক্ষণ সাড়া দেয় না। তারপর ধীরে ধীরে উঠে মানপাতাটা তুলে মাথায় দিয়ে আঁতুড়ের কাছে যায়। আঁতুড়ের হোগলার উপরে চাপাবার জন্যই সে কয়েকটা মানপাতা কেটে এনেছিল।

রেবতী শীতে কাঁপছিল কিন্তু কথা বলতে গিয়ে গলা তার কেঁপে যায়। ভয়েই বলে, সেঁক তো দিলাম, আওয়াজ দিচ্ছে না যে ? আরেকটু আগুন করে দাও।

দিচ্ছি।

সে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ দুদিনের বাচ্চাটার দিকে চেয়ে থাকে। শরীরটা কাথায় ঢাকা, মুখটা শুধু দেখা যায়। শ্যামবর্ণ শিশুর মুখের চামড়াটা যেন খানিকটা লাল হয়ে কালচে মেরে গেছে মনে হয়।

রেবতী ক্ষীণগলায় আবার বলে, ছাট লেগে ভিজে যাচ্ছি। হাড়ের তেজ নেই ? ভেতর থেকে কাঁপছে। হাত-পাগুলো অবশ লাগছে।

গোবিন্দ নীরবে শোনে।

দাওয়ায় ফিরে যাবার উপক্রম করতেই রসুইঘর থেকে মা ডেকে বলে আবার ভেতরে ঢুকলি কেন রে ? যা, ডুব দিয়ে আয় পুকুর থেকে—

তুমি একটু আগুন করে দাও দিকি।

বলে গোবিন্দ গটগট করে দাওয়ায় উঠতেই রসুইঘরে মা আর মাসি পিসি চেচামেচি জুড়ে দেয়, ঘর থেকে গগন বেরিয়ে এসে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে আহা হাহা এত বড়ো ধেড়ে মানুষটা, তোর কী বুদ্ধি বিবেচনা—আঁতুড় ঘেঁটে সেই কাপড়ে ঘরে ঢুকছিস ?

ঘরে ঢুকছি না।

গোবিন্দ ব্যাজার হয়ে দাওয়ায় উবু হয়ে বসে পড়ে।

গগন বলে, দাওয়ায় উঠলি কী বলে ?

গোবিন্দ কথা কয় না। বাড়ির মানুষেরা অনেকক্ষণ গজরগজর করে, বারবার গোবিন্দকে অন্তত ঘাটে গিয়ে কাপড়টা কেচে আসবার জন্য বলা হয়— কখনও মিনতি করে, কখনও রাগ দেখিয়ে।

শেষে গোবিন্দ বলে, আমার আর কাপড় নেই।

গগন বলে, আমার কাপড়টা দিচ্ছি তুই ঘাটে যা দিকি। ঘরদোর অশুচি করলে তোর ছেলে বউয়েরই অকল্যাণ আগে হবে, এই সিদে কথাটা বুঝিস নে তুই ?

গোবিন্দ অগত্যা ঘাটে গিয়ে ডুব দিয়ে আসে বাড়ির মানুষের চাপ বা পাপের ভয়েই ঠিক নয়। তার নিজের মনটাও খুঁতখুঁত করছিল। সে ঘাটে যেতেই অন্নদা তাড়াতাড়ি সমস্ত দাওয়াটা গোবর জলে লেপে দেয়।

ডোবাপুকুরে ডুব দিয়ে এসে রেবতীর একটা পুরানো ছেঁড়া শাড়ি দু'ভাঁজ করে কোমরে জড়িয়ে ভিজে কাপড়টা দাওয়ায় টান করে মেলে দিয়ে গোবিন্দ দাওয়াতেই উবু হয়ে বসে আকাশ পাতাল ভাবে।

গগন পরনের কাপড়খানা ছেড়ে দিতে চাইলেও সে কাপড় পরা যায় না। গগনকে তাহলে গামছা পরতে হয়। গায়ে একটা কুর্তা আছে বটে কিন্তু এই ঠান্ডায় আধভেজা গামছা পরে থাকলে বুড়ো গগনকে নির্ঘাত বিছানা নিতে হবে।

এবং সম্ভবত বিছানা থেকেই তাকে চালান করতে হবে শ্মশানে।

ছেঁড়া শাড়িটা দিয়ে বাচ্চাটাকে আরেকটু ঢেকে দেবার কথা ভাবছিল। এখন বাধ্য হয়ে নিজের কোমরেই সেটা জড়াতে হয়।

বাড়ির চারিদিকে এককালে বেড়া ছিল, বছরখানেক হয় ভেঙে পড়েছে। গগনের মেটেপথ থেকে ঘরের দাওয়ায় বসা মানুষেরও বুক পর্যন্ত নজরে পড়ে।

জলে-কাদায় পিছল পথে জুতো হাতে নিয়ে আঙুল টিপে টিপে চলতে চলতে নরেন দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে, খবর কী গোবিন্দ ?

গোবিন্দ উঠে গিয়ে বলে, আর খবর, খবর আমার চোদ্দোপুরুষের পিন্ডি।

অল্পক্ষণের জন্য বৃষ্টিটা একটু ধরেছিল, ভাঙা ছাতিটা ছিল নরেনের বগলে। তবে বৃষ্টি একেবারে বন্ধ হবে সে আশা নেই। আকাশ দেখেই টের পাওয়া যায় খানিক বাদে আবার নামবে।

হোগলার চালাটার দিকে চেয়ে নরেন জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছে ?

এখনও টিকে আছে। বাচ্চাটা বোধ হয় ও বেলাই যাবে, ওর মা-টার হয়তো বা আরও দু-চার দিন লাগতে পারে।

নরেন গম্ভীর হয়ে বলে, তবু হাত-পা গুটিয়ে দাওয়ায় বসে আছ ? মানুষ খুন করলে পাপ হয় জানো না ? ঘরে নিলে যদি পাপ হয়, সেটা অনেক ছোটো পাপ।

গোবিন্দ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, হা ! পাপের কথা ভাবছে কে ? মন নয় একটু খুঁতখুঁত করবে, সাতপুরুষের নিয়ম ভাঙা হল। সে জন্য আটকে আছে নাকি ! ঘবে নিলে বাড়ির সবাই হাউমাউ করে উঠবে না ?

করুক হাউমাউ। তোমার ছেলেবউ তো বাঁচবে।

গোবিন্দ করুণভাবে একটু হাসবার চেষ্টা করে। রোজ আপিস যাচ্ছ, মাসকাবারে বেতন গুনছ। বেকারের দশা কী বুঝবে ? ঘরবাড়ি বুড়ো বাপের, বাপেব ঘাড়ে খাই। সোজা বলবে, ম্লেচ্ছ অনাচাবী পাষণ্ড, বেরো আমার বাড়ি থেকে, দূর হয়ে যা।

নরেন সঙ্গে সঙ্গে বলে, বলুক না ? পরে নয় বেরিয়েই যাবে, আজ তো ওদের বাঁচাও ! গায়ের জোরে তো ওরা পারবে না তোমার সঙ্গে ? গায়ের জোরে ঘরে নিয়ে যাও। কয়লা কাঠ না থাকে, ঘরের খুঁটি ভেঙে আগুন করে সেঁক দাও। এটুকু যদি না কর, আমি তোমাকে খুনি বলব। বলে বেড়াব, তুমিই নিজের বউছেলেকে খুন করেছ !

নরেন আর দাঁড়ায় না। আটটার গাড়ি ধরতে না পারলে অফিসে লেট হয়ে যাবে। সেটা কম বিপদের কথা নয়, তবু আরও কিছুক্ষণ দাঁড়ালে যদি কিছু লাভ থাকত তবে না হয় আজ লেটই করত। গোবিন্দকেও তো সে জানে। বাড়িব লোক হাউমাউ করবে এটা বাজে অজুহাত, আসল বাধা গোবিন্দের নিজের মনে।

নিজের মন থেকেই সে সায় পাচ্ছে না। নইলে বাড়ির লোকের অসন্তোষের খাতিরে কেউ চোখের সামনে বউছেলেকে মরে যেতে দিতে পারে—ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে একটু আড়াল আর আগুনের তাপের ব্যবস্থা করলেই দুজনে বেঁচে যাবে যখন জানা আছে ?

এদিকে গোবিন্দ গালে হাত দিয়ে বসে নিজের মনে বলে, এতই যেন সহজ !

মুখে বলা আর কাজে করা।

ওদের ঘরে তুলবার চেষ্টা করলেই যে কী কাণ্ড শুরু হবে নরেন তার কী জানবে ? সে তার গায়ের জোরটাই দেখছে, গায়ের জোরটাই যেন সব।

গায়ের জোরে যেন তাকে ঠেকাবার চেষ্টা করা হবে আর জোরে না পারলে হার মেনে শুধু চেঁচামেচি করে তাকে দূর হয়ে যেতে বলেই সবাই ক্ষান্ত থাকবে।

হঠাৎ সত্যিকারের উন্মাদ হয়ে যাবে বুড়ো বাপটা, বুক চাপড়ে চেঁচিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ে জলে-কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে তো বা মেরেই ফেলবে নিজেকে।

মা ঘরের কোনার সিঁদুর মাখানো পটটার সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে একটানা আর্তনাদ করে যাবে এবং খুব সম্ভব একফাঁকে এই শীত-বাদলার মধ্যে এক কাপড়ে বেরিয়ে চলে যাবে যেদিকে দুচোখ যায়।

অন্যেরা কী করবে সে হিসাব নয় নাই ধরল। মা-বাপের কথাটা না ভাবলে চলে কী করে ?

গোবিন্দ অসহায়ের মতো চেয়ে থাকে। মনে হয়, সে যেন জাঁতাকলে পড়েছে, যে জাঁতাকলে মানুষের ভেতরটা পিষে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। নরেন কী করে বুঝবে চোখের সামনে ছেলেবউকে

অত্যাচারের হাতে মরতে দিয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হলে মুহূর্তগুলি কেমন করাতের দাঁতের মতো হয়ে ওঠে, সময় কীভাবে প্রাণটাকে ধীবে ধীরে চিরে চিরে দিয়ে যেতে থাকে।

কাঠের উনানের কিছু জ্বলন্ত কয়লা একটা সরায় নিয়ে গামছা পরে অন্নদা আঁতুড়ে যায়—বেরিয়ে ঘাটে গিয়ে ডুব দিয়ে এসে রান্নাঘরে ঢুকবে।

একটু পরেই অন্নদা বেবিয়ে আসে, গোবিন্দেব ছোটোপিসিকে ডেকে আঁতুড়ে পাঠিয়ে দেয়।

ঘাটে যাবার বদলে ছেলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে বলে, ভাবিস কেন ? ভগবানকে ডাক।

ভগবান তো সবই করছেন।

ও কথা বলতে নেই বাবা !

একটু ইতস্তত করে অন্নদা আবার বলে, টিন জোগাড় হয় না ?

কোথা পাব ?

একটু দাঁড়িয়ে নিজের মনে কী যেন ভাবে অন্নদা, তারপর ঘাটে গিয়ে স্নান করে গামছা কেচে শুদ্ধ হয়ে না এসেই ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢোকে !

গোবিন্দ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

তার সঙ্গে কথা কইতে কইতে মা কী ভুলে গেছে তার সদ্য সদ্য আঁতুড় থেকে বেরিয়ে আসার কথা ?

খানিক আগে তাকে আঁতুড় থেকে বেরিয়ে শুধু দাওয়ায় উঠতে দেখে চেঁচামেচি জুড়েছিল, ঘাটে গিয়ে ডুব দিয়ে আসতে বাধ্য করেছিল, আর নিজের বেলা সব ভুলে গিয়ে সোজা ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল !

কী আজব ব্যাপার।

তারপর ভিতরে গগনের সঙ্গে তাকে নিচুগলায় কথা বলতে শুনে গোবিন্দেব প্রাণটা ছলাত করে ওঠে।

শেষ হয়ে গেছে ? আঁতুড়ের মৃত্যুর ধাক্কায় মা-র খেয়াল নেই ওখান থেকে বেরিয়ে স্নান না করে ঘরে ঢোকা চলে না ?

বাচ্চাটা ? না, বউটা ?

উঠে গিয়ে দেখে আসবে সে শক্তি যেন গোবিন্দ পায় না। বসে বসে সে একটা কথাই বার-বার মনে এনে সে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করে যে চিৎকার কবে চেঁচিয়ে কেঁদে না উঠে মরণকে এমন চুপচাপ বরণ করার মানুষ তো তার মা নয় !

বাচ্চাটা শেষ হয়ে গিয়ে থাকলেও এতক্ষণে মা-র কান্নার আওয়াজে চারিপাশের অনেক বাড়িতেই জানাজানি হয়ে যেত, এ বাড়িতে মৃত্যুর পদার্পণ ঘটেছে।

খানিক পরে গগন আর অন্নদা দাওয়ায় বেরিয়ে আসে।

গগন জিজ্ঞাসা করে, একটা কিছু ব্যবস্থার কথা ভেবে পাচ্ছ না ?

গোবিন্দ বলে, কী আর ব্যবস্থা করব ?

গগন আপশোশ করে বলে, হাতে একটা পয়সা নেই যে কিছু করি। পাঁচজনের কাছে ধার জমে আছে, আবার গিয়ে চাইলে কেউ দেবে না। কপাল রে !

অন্নদা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

গোবিন্দ নীরবে দুজনের ভাব লক্ষ করে।

তার মনে হয় শুধু এই কথাগুলি বলার জন্য ঘরের মধ্যে পরামর্শ করে তারা যেন দাওয়ায় আসেনি, এটা নিছক ভূমিকা, তাদের আরও কিছু বলার আছে এবং সেটাই আসল বক্তব্য।

গগন বলতে যায়, আমি ভাবছিলাম কী—

অন্নদা তাড়াতাড়ি যোগ দেয়, মাথা ঠান্ডা করে শুনিস বাবা, কথাটা, একটু বিবেচনা করে দেখিস। এমন ঝপ করে খেপে যাস, তোকে কিছু বলতেই ভয় হয়।

গোবিন্দ ধীরে বলে, কী বলছ শুনি না?

গগন বলে, বউমাকে ওখান থেকে সরাতে হয়, বাচ্চাটা তেমন নড়াচড়া করছে না।

অন্নদা বলে, এমনি কড়া শীত হলে ভাবনা ছিল না, বাদলটা নামায় হয়েছে মুশকিল।

গোবিন্দ নীরবে প্রতীক্ষা করে।

সে টের পায় তার কাছে হঠাৎ কথাটা পাড়তে গগনও সাহস পাচ্ছে না, ইতস্তত করছে। গোবিন্দ আশ্চর্য হয়ে ভাবে যে ঘরের মধ্যে এতটুকু সময় একটু পরামর্শ করেই কী এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা তারা ঠিক করে ফেলেছে যা তাকে বলতে গিয়ে এতখানি ভূমিকা দরকার হয়, এতবার ঠেকে গিয়ে গগনকে ঢোঁক গিলতে হয়?

দুজনে চুপ করে আছে দেখে গোবিন্দ শান্তভাবে বলে, কী বলছিলে বলো না?

কথাটা শেষ পর্যন্ত বলে ফ্যালে অন্নদাই।

বলে, আমরা বউমাদের ঘরে আনব ঠিক করেছি, তুই কিছু বলতে পারবি না।

গগন তাড়াতাড়ি বলে, ওখান থেকে না সরালে বাঁচবে না।

গোবিন্দ হতবাক হয়ে থাকে।

তার বউ ও বাচ্চাটাকে ঘরে আনার প্রস্তাবে সে সম্মতি দিতে পারছে না ধরে নিয়েই যেন গগন তাকে বুঝিয়ে বলে, এমন কিছু দোষ হবে না। একটা কোনা সাফ করে পুরনো তক্তপোশটা পেতে দিলেই হবে, পরে নয় ফেলেই দেব ওটা। আঁতুড় উঠলে ঠাকুরমশায়কে ডেকে ঘরটা সুদ্ধ করে নেয়া, একটা প্রাচিত্তির করা—ফুরিয়ে গেল। এতে আপত্তি করার কী আছে?

অন্নদা হঠাৎ যেন ছেলের ওপর বিষম চটে যায়। চেঁচিয়ে জোর দিয়ে বলে, না তোর মানা শুনব না আমরা, ছেলের ঘরের প্রথম নাতি—

তার গলার কথা আটকে যায়।

গোবিন্দের মনে হয় ভেতর থেকে যেন প্রচণ্ড একটা হাসির বেগই ঠেলে উঠেছে, কিন্তু হাসি তার আসে না।

কোনো রকমে সে উচ্চারণ করে, আনো ঘরে।

অন্নদা তারই অনুমতির জন্যই যেন কোনো রকমে ধৈর্য ধরেছিল, আঁতুড়ে ছুটে যায়। আগুনের মালসা হাতে নিয়ে একটা ন্যাকড়ার পুটলি বুকে করে এসে ঘরে ঢোকে।

গোবিন্দের চমক ভাঙে অন্নদার ডাকেই।

পাঁজাকোলা করে তুই বউমাকে তুলে নিয়ে আয় বাবা। উঠে আসতে পারবে না।

মহাকর্কট বটিকা

ঘুষঘুষে জ্বব ছিল। খুকখুক কাশি।

তাব ওপব গলা দিয়ে উঠল দু-ফোঁটা বক্ত।

তাজা লালবক্ত।

আবও কী লক্ষণ দবকাব হয় ব্যাপাব বুঝতে এব পবেও কী মানুষ খানিকটা হয়তো মেশানো আশাও কবতে পাবে যে জ্বব কাশি আব বক্ত ওঠাটা সে বকম ভয়ানক কিছু নয়, নাও হতে পাবে?

এতটুকু বক্ত। একটু আঙুল কাটলে এব চেয়ে বত বেশি বক্ত পড়ে। হাবাণ স্থিবদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মৃত্যুব এই সংক্ষিপ্ত লাল পবোয়ানাব দিকে।

বলে, আব ভাবনা নেই। এবাব সব ফিনিস।

ছাইবর্ণ হয়ে গেছে লতাব মুখ। শুধু হাত পা নয়, ভেতবটাও তাব থবথব কবে কাঁপছে। সেই সঙ্গে দুলছে সংসাব পৃথিবী। কিন্তু তবু আশা সে ছাড়বে না। মনে হচ্ছে দুঃখ দুর্দশা ভবা সমস্ত অতীত জীবনটা যেন গভীব কালো হতাশাব বূপ নিয়ে অন্ধকাব কবে দিয়েছে ভবিষ্যৎ, তাবও আব বাঁচাব জন্য লড়াই কবাব মানে থাকল না।

না না, হয়তো কিছুই নয়। ডাক্তাব না দেখিয়ে কিছু বলা যায়? পবীক্ষা না কবিয়ে?

ডাক্তাব অবশ্য দেখাবো। এক্স বে ফটোও তোলা হবে। কিন্তু সেটা প্রমাণেব জন্য নয়। কতদূব এগিয়েছে বোগটা, কী অবস্থা, বুঝবাব জন্য।

মৃত্যু যেন এখনই ঘনিয়ে আসছে এমনি হতাশা হাবাণেব চোখে।

লতা একবাব চোখ বোজে। জোব চাই বুকে বল চাই। এভাবে কাঁপলে, সবাঙ্গ অবশ হয়ে এলে চলবে কেন? সেও যদি হাল ছেড়ে দেয়, সবনাশ ঠেকাবাব চেষ্টাও যে হবে না।

চোখ মেলে সে কথা বলে। নিজেব কথাগুলি নিজেব কানে তাব লাগে অন্য কাবও কথাব মতো।

যদিই বা হয়ে থাকে, চিকিৎসা কবলে সেবে যাবে। আজকাল কত ভালো চিকিৎসা বেবিয়েছে, বেশিব ভাগ সেবে যায়। নন্দবাবুব ছেলেটা সেবে ওঠেনি?

হাবাণ আব কিছু বলে না।

এ বোগ সাবিয়ে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকাব আশা সে ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু লতাকে কাবু কবে লাভ নেই।

বাড়িওলা নন্দবাবুব ছেলে। মাছ, মাংস দুধ, ঘি, সন্দেশ খেয়ে আব অজস্র বিশ্রামেব সুযোগ ভোগ কবেও তাব এ বোগ হয়েছিল কেন কে জানে। বোধ হয় নানা বিকৃত খেয়ালে শবীবটাকে কাবু কবেছিল বলে। মৃত্যুব পবোয়ানা পাওয়ামাত্র ভড়কে গিয়ে আত্মসমর্পণ কবেছিল নন্দবাবুব অজস্র পয়সা খবচ কবা ওষুধ পথ্য আলো বাতাস বিশ্রামেব চিকিৎসায়।

ছ-মাসে সে শুধু সেবেই ওঠেনি, দিব্যি নাদুসনুদুস চেহাবা বাগিয়েছে। স্বাস্থ্য যেন পুষ্টিবসে বসস্থ হয়ে উথলে পড়েছে তাব সর্বাঙ্গে।

কিন্তু কম খেয়ে বেশি খেটে সে বাঁধিয়েছে বোগ—নিজে বাঁচাব জন্য আব আপনজনকে বাঁচানোব জন্য শবীবকে পুষ্টি না দিয়ে ক্ষয়, একটানা ক্ষয় কবে এসেছে শক্তি আব স্বাস্থ্য। কী দিয়ে এখন সে লড়বে এ বোগেব সঙ্গে? সুস্থ দেহ নিয়ে যা ঠেকানো যায়নি, এসে চেপে ধবে কাবু কবাব পব অসুস্থ দেহ নিয়ে সেটাকে দূব কবাব বাড়তি ক্ষমতা সে কোথায় পাবে?

আর হয় না। এবার শুধু দিন গোনা।

শচীনের সব জানাশোনা আছে। তাকে বলতে সে পরীক্ষার ব্যবস্থা করে দেয়। সেই সঙ্গে তাদের সাবধান করে দেয় যে বাড়ির অন্য ভাড়াটেরা যেন কিছু জানতে না পায়।

বুক পরীক্ষার ফল জানা যায়। চিকিৎসার বিস্তারিত বিধানও পাওয়া যায়।

ডাক্তারের কাছ থেকে লতা নিজে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেয়। শুধু কী করতে হবে জেনে নেওয়া নয়, যতটা পারে বুঝেও নেয়, কীসে কী হয় আর কেন হয়, কোন ব্যবস্থার গুরুত্ব কতখানি।

না খাটলে যার পেট চলে না তার কী রাজসিক রোগ !

দামি ওষুধ চাই, দামি পথ্য চাই, সূর্যের আলো চাই, মুক্তবায়ু চাই, আরামে বিশ্রাম চাই, আর চাই আনন্দ, আশ্বাস ও আত্মবিশ্বাস।

ঘিঞ্জি পাড়ায় গলির মধ্যে পুরানো বাড়ির আধা-অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে একখানা ঘর, দুবেলা নিজেদের এবং আরও অনেকের উনানের ধোঁয়া ঘর ছেড়ে যেন যেতে চায় না। এই ঘরে যাদের বাস, দুটি বাচ্চার জন্য যাদের শুধু একপোয়া দুধ বরাদ্দ, মাসের গোড়ার দিকে মোট দুটো-চারটে দিন যারা মাছের স্বাদ পায়, অভাব ও দুর্ভাবনায় জ্বরজ্বর হয়ে যাদের মাস কাবার হয়, তাদের আজ এত সব বাড়তি ব্যবস্থা দরকার।

একটা অদ্ভুত হাসি মুখে ফুটিয়ে হারাণ বলে, বাদ দাও। এত ব্যবস্থাও হয়েছে, আমার রোগও সেরেছে। অনর্থক কতগুলি টাকা নষ্ট হবে।

কোমরে আঁচল জড়িয়ে ক্ষীণাঙ্গী লতা সোজা হয়ে দাঁড়ায়, ধমক দিয়ে বলে, দ্যাখো তুমি রোগী মানুষ, তোমার অত বাহাদুরি কেন ? তুমি চুপ করে থাকো। আমাকেও তুমি ভড়কে দিচ্ছ !

তুমি আর কী করবে বলো ?

চেষ্টা তো করব ?

না। মিছে চেষ্টা করে লাভ নেই। যেটুকু সম্বল আছে তাতে এ রোগ সারে না। এ সেন্টিমেন্টের ব্যাপার নয় লতা, জেনেশুনে সম্বলটুকু খুইয়ে তুমি পথে বসতে পাবে না। সামান্য একটু চান্স থাকলেও বরং কথা ছিল।

লতা আবার ধমক দেয়, চুপ করবে তুমি ? কে বললে তোমার চান্স নেই ? রোগ বাধিয়ে এখন কর্তালি করতে এসো না। আমায় বুঝেশুনে ব্যবস্থা করতে দাও। মাথা ঠান্ডা রেখে আমায় সব করতে হবে, আমার মাথা গুলিয়ে দিয়ো না।

মাথা উঁচু করে সে আবার বলে, তেমন মেয়ে পেয়েছ নাকি আমায়, চেষ্টা না করেই হাল ছেড়ে দেব ?

মুখে যাই বলুক হারাণ, মৃতদেহে সে যেন একটু প্রাণ পায়।

লতা বলে, আপিস থেকে লোন-টোন যে বাবদে যতটা পারো ব্যবস্থা করবে। লম্বা ছুটির দরখাস্ত করবে।

ছুটি ? ছুটি নিলে মাইনে পাব না।

জানি। সে ভাবনা তোমার নয়। আপিসেও খাটবে, অসুখও সারবে, না ?

আগে চাই টাকা, তারপর অন্য কথা। যেখানে যেভাবে যতটুকু পাওয়া সম্ভব, লতা টাকা কুড়োতে আরম্ভ করে। বাপ গরিব, টাকা দেবার সাধ্য নেই, লতা বাচ্চা দুটিকে মার কাছে রেখে আসে। ওদের খরচটা বাঁচবে, ওরাও ছোঁয়াচ থেকে বাঁচবে, সে নির্ঝঞ্ঝাটে লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে রোগটার বিরুদ্ধে।

গয়না থেকে শুরু করে যা কিছু বেচা সম্ভব সব সে বেচে দেয়। আত্মীয়স্বজন যার কাছে যতটুকু সাহায্য বা ঋণ পাওয়া সম্ভব আদায় করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়।

কাঁদাকাটা করা থেকে হাতে পায়ে ধরা, একেবারে নাছোড়বাঁদির মতো এঁটে থেকে জীবন অতিষ্ঠ করে তোলা ইত্যাদি যত রকম উপায় আছে আত্মীয়বন্ধুর কাছে সাহায্য আদায়ের, তার কোনোটাই সে বাদ দেয় না। মান অপমানের বোধটা একেবারে ছাঁটাই করে সে যেন চারিদিকে আক্রমণ চালায়।

শচীন বলে দিয়েছিল, অন্য ভাড়াটেরা যেন হারাণের অসুখ টের না পায়। কিন্তু সর্বস্বপণ করে চিকিৎসা আরম্ভ করে দেবার পরেও কী আর এই মহারোগ গোপন করা যায়!

লতা টের পায়, বাড়ির অন্য বাসিন্দারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। একবাড়িতে থেকেও যতদূর সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে চলার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

পাশের ঘরে থাকে হেমেন। তার স্ত্রী রমার সঙ্গে এতদিন খুব ভাব ছিল লতার।

সেদিন তার ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই রমা মুখ কালো করে বলে, উনি বলছিলেন, তোমার কারও ঘরে না যাওয়াই উচিত।

আমি খুব সাবধান থাকি। ওষুধ দিয়ে হাত ধোয়া, কাপড় ছাড়া

তবু বলা তো যায় না!

লতা নীরবে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, বেশ, এ জন্মে আর ঢুকবো না তোমার ঘরে।

অন্য ভাড়াটেরা গিয়ে চাপ দেয় বাড়িওলা নন্দকে। নন্দ এসে বলে, দেখুন, আপনাদের অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত। আপনারা না গেলে অন্য সবাই চলে যাবেন বলেছেন।

লতা বলে, আমরা চলে যেতেই চাচ্ছি। একটু আলো বাতাসওলা ঘর খুঁজছি—পেলেই উঠে যাব। আপনারা দিন না খোঁজ করে?

নন্দ বলে, এ কী একটা কথা হল? মনের মতো ঘর না পেলে আপনারা যাবেন না, এতগুলি লোকের অসুবিধা করবেন? দু চারটা দিন দেখে আমি কিন্তু বাধ্য হয়ে—

বাধ্য হয়ে সে যে কী করবে না বললেও বোঝা যায়। অন্য সব ভাড়াটেরা তার পক্ষে, কাজেই তার জোর বেড়েছে।

লতা ভয় পায় সত্যই কিন্তু বাইরে তেজ দেখিয়ে বলে, সে আপনি যা পারেন করবেন। ঘর না পেলে রোগা মানুষটাকে নিয়ে আমি রাস্তায় নামব নাকি? নিয়মমতো ভাড়া গুনছি না?

শচীন একটা মীমাংসা করে দেয়। বলে, দেখুন, বাবাকে বলে ছাদে আমি একটা শেড তুলে দিচ্ছি। যতদিন ঘর না পান ওইখানেই আপনারা থাকুন? তাছাড়া, অন্য বাড়িতে ঘরভাড়া নিলেও এই ব্যাপার ঘটবে। একেবারে সেপারেট একখানা ঘর পাওয়া মুশকিলের কথা।

লতা চোখ তুলে তাকায়। শচীন তার দিকেই চেয়ে আছে। চোখের লোভটুকু বোধ হয় নিছক অভ্যাস। কারণ তার সহানুভূতি যে খাঁটি তাতে সন্দেহ নেই।

সে বলে, তাই দিন। আমার আলো বাতাসের সমস্যাও মিটবে।

ভাড়াটেরা এ ব্যবস্থা মেনে নেয়। কারণ শচীন বলেছে যে ছাদে জলের ব্যবস্থাও সে করে দেবে, লতাকে জলের জন্য নীচে এসে সকলকে ছোঁয়াছুঁয়ি করতে হবে না। সকলের কাছ থেকে প্রায় পৃথক হয়েই থাকবে লতারা।

লতার জলের সৌভাগ্যে কারও কারও মনে বেশ ঈর্ষাও জাগে।

কয়েক দিন পরে জিনিসপত্র নিয়ে হারাণ ও লতা খোলা ছাদে টিনের চালের অস্থায়ী ঘরখানায় উঠে যায়।

হেমেন শচীনকে জিজ্ঞাসা করে, সারবে ?

শচীন বলে, সব নির্ভর করছে চিকিৎসা চালিয়ে যাবার ওপর। অনেকদিন টানতে হবে। বিষম খরচ।

হেমেন বলে, তা হচ্ছে। ভদ্রলোক সত্যি ভাগ্যবান—এমন চালাক চতুর স্ত্রী পেয়েছিলেন। রমা বলে, আগে মোটেই এ রকম ছিল না। হারাণবাবুর অসুখটা ধরা পড়বার পর কেমন অদ্ভুত রকম পালটে গেছে।

রীতিমতো বিস্ময়ের সঙ্গেই সকলে এটা লক্ষ করেছিল। সমস্ত দায়িত্ব লতা একা নিয়েছে, একা সব পালন করে চলেছে। বাইরে গিয়ে ওষুধ-পথ্য কিনে আনা থেকে হারাণের সেবাশুশ্রূষা সব কিছু দায়িত্ব। চিকিৎসা আর আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাগুলি যে সত্যই কী রাজসিক ব্যাপার সেটা কারও অজানা নেই। মেয়েরা কৌতূহলের বশে একে একে সকলেই লতার কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছে কী দিয়ে কী হয় এবং কীসে কী লাগে।

লতা কিছুই গোপন করেনি।

বরং যারা গোড়ায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বাড়ি থেকে তাদের তাড়াতে ব্যাকুল হয়েছিল, জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যে তাদের যে সমবেদনা প্রকাশ পায় তাতে সে খুশিই হয়।

কিন্তু লোকের মনে প্রশ্ন জাগে, কতদিন এভাবে চালাবে লতা ?

কী করে চালাবে ?

তার অবস্থাও তো কারও অজানা নয় !

তাই মাস দুই পরে লতার মুখে দুশ্চিন্তার কালচে ছায়া পড়েছে দেখে রমা হেমেনকে বলে, আর বুঝি টানতে পারছে না বেচারা।

হেমেন বলে, কী করে টানবে ? এ তো জানা কথাই।

অনেকক্ষণ ইতস্তত করে সেদিন প্রথম রমা ছাদে যায়—স্নান করার আগে যায়—নীচে নেমেই সাবান মেখে নেয়ে সব ছোঁয়াছুঁয়ি ধুয়ে ফেলবে।

রমা বলে, কী করে খরচ চালাচ্ছ ?

লতা বলে, যা ছিল ফুরিয়ে এল, এবার কিছু করতে হবে।

কী করবে ?

দেখা যাক। একটা উপায় করতেই হবে।

রমা দারুণ অস্বস্তির সঙ্গে ভাবে কে জানে কী উপায়ের কথা ভাবছে লতা। নিরুপায় মেয়েমানুষ, ভেবে সে কী উপায় বার করবে !

কয়েক দিন পরে বাড়ির সকলে লক্ষ করে যে সকালে ঘরের রান্নাবান্না কাজকর্ম সেরে সাড়ে-দশটা এগারোটার সময় লতা বেরিয়ে যায়।

ফিরে আসে সন্ধ্যার সময়।

কী ব্যাপার ?

রমাই তাকে জিজ্ঞাসা করে সকলের আগে।

লতা বলে, একটা কাজ পেয়েছি।

কী কাজ ?

লতা একটু ইতস্তত করে বলে, একজনের বাড়িতে নার্সিংয়ের কাজ।

এরপর বেশি সে আর কিছু বলে না।

দিন যায়। একটা লেডিজ ব্যাগ হাতে লতা রোজ নিয়মমতো বেরিয়ে গিয়ে ফিরে আসে। হারাণের চিকিৎসা পুরো দমে চলে। ধীরে ধীরে তার শরীরে অস্বাস্থ্যের ক্লিষ্ট ছাপ কেটে গিয়ে স্বাস্থ্যের জ্যোতি ফিরে আসতে থাকে।

সকলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে নার্সিংয়ের কাজ ? জীবনে প্রথম রুগ্ণ স্বামীর সেবা আরম্ভ করেই কী এমন ট্রেইনড নার্স হয়ে গেল যে তাকে এত টাকা মাইনে দিয়ে লোকে রেখেছে, হারাণের চিকিৎসার বিরাট খরচ যাতে চালানো যায় ?

হেমেন রমাকে বলে, তুমিও যেমন, ওই কথা বিশ্বাস করলে। বয়স আছে, চেহারাটা মন্দ নয়—

তাই কী ? স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে নিজেকে এইভাবে বলি দিতে হয়েছে লতাকে ?

রমা নিশ্বাস ফেলে।

শচীনও ভাবছিল, ব্যাপারটা কী ?

লতার মুখে যখন দুশ্চিন্তার কালো ছাপ পড়েছিল, একদিন কয়েকখানা নোট পকেটে নিয়ে শচীন বিকেলের দিকে তার কাছে গিয়েছিল। হারাণ তখন বেড়াতে গেছে।

বলেছিল, দেখুন, আমিও এ রোগে মরতে বসেছিলাম। আমার কাছে টাকা নিলে কোনো দোষ নেই।

লতা বলেছিল, আপনি অনেক করেছেন। আমি চিরজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। টাকার দরকার নেই।

তবু শচীন নড়ে না দেখে লতা বলেছিল, টাকা দিয়ে কেনার মানুষ আমি নই শচীনবাবু।

শচীনের রাগ হয়েছিল খুব। তারপর আর কোনো খবর নেয়নি। পথে মুখোমুখি হলেও যেচে কথা বলেনি।

কিন্তু সেদিন বিকালের দিকে এমনভাবেই তাকে মুখোমুখি হতে হল লতার যে রাগ নিয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সাধ্য তার হল না।

জনাকীর্ণ রাজপথ। তারই ধারে ফুটপাতে কম্বল বিছিয়ে লতা বসে আছে। তার পিছনে দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা মস্ত একটা বিজ্ঞাপন।

যক্ষ্মা নিবারণী মহাকর্কট বটিকা।

এই বটিকায় আমার স্বামীর যক্ষ্মা সারিয়াছে।

সপ্তাহে একটি বটিকা সেবনে যক্ষ্মার ভয় থাকে না।

প্রতি বটিকা--এক আনা।

কত পয়সা কতদিকে যায়—সপ্তাহে এক আনা খরচে মহারোগ ঠেকান।

শচীন একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। লতা একটু হাসে।

তখন আপিস ছুটি হয়েছে। বিক্রির সময়। খানিক তফাতে শচীন অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকে।

সন্ধ্যার খানিক আগে লতা উঠে বিজ্ঞাপনটি ভাঁজ করে, কম্বলটি তুলে গুটিয়ে নেয়, ব্যাগটি হাতে করে এগিয়ে ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়ায়।

শচীন কাছে গিয়ে বলে, এতে সত্যিসত্যি চলছে আপনার ?

লতা বলে, চলছে বইকী। হাতে কিছু পয়সাও জমেছে। আশ্চর্য হচ্ছেন কেন ? যে দেশে কাশি হলে ফাঁসির আতঙ্ক জাগে, সে দেশে এক আনা খরচ করে লোকে নিশ্চিন্ত হতে চাইবে না ?

শচীন বুঝতে পারে, লতা ফাঁসি বলতে টিবি-র কথাই বলছে।

আর না কান্না

কান্না গল্পের সাত বছরের ছিচকাঁদুনে মেয়েটা মাইরি আমায় অবাক করেছে। যেমন মা-বাবা, তেমনই মেয়ে। শুধু কান্না আর কান্না।

যত চাও রুটি খাও শুনে কোথায় খুশিতে ডগমগ হবে, ভাববে যাকগে, আজকে পেটটা আমার ভরবেই ভরবে—তা নয়। একমুঠো ভাতের জন্য কান্না। রেশনেব চালের ভাত ! রুটি এমনি চিবোলে মিঠে লাগে, একটু গুড় পেলে মাখিয়ে নিলে হয়ে যায় একেবারে পাটিসাপটা পিঠে। রুটি খেয়ে পেট ভরে জল খাও, তার কাছে নাকি ভাত খাওয়ার পেট ভরা ! ছিটেফোঁটা ডাল, এইটুকু তরকারি, তাই দিয়ে ছিরি আছে নাকি ভাত খাওয়ার ?

প্রাণটা ভাত চেয়ে চোঁ চোঁ করে, বইকী ভেতো মনিষ্যির। বড়োদের আরও বেশি করে। কিন্তু ভাতের থালা সামনে নিয়ে বসলে প্রাণটা যে আবার লাগসই পরিমাণে ভালো তরকারি মাছ চায় মশাই ! শুধু ডাল হোক, শুধু একটা তবকারি হোক, তাই দিয়ে এক দিস্তে রুটি মেবে দেওয়া যায় (যেন এক দিস্তে রুটি গরিবদের মেরে দিতে দিচ্ছে দুর্ভিক্ষ-পোষক সদাশয় কংগ্রেস সরকাব)। রুটি স্রেফ ভুলিয়ে দেয় মাছের শোক। বাটিভরা ডাল নেই, ভাজা নেই (তেল লাগে !) চচ্চড়ি, শুক্ত, মরিচ ঝোল, ডালনা-ফালনার যে কোনো একটা যদি থাকে তো দু-গেরাসের বেশি ভাত মাখার মতো নেই, নাকে একটু আঁশটে গন্ধ নেই, —সারাদিন হাড়ভাঙা খাটনি খেটে রাত এগারোটায় হয় কাদার মতো গলা গলা আর নয়তো কড়কড়ে শক্ত ভাত খেতে পেয়ে কে যে সুখে একদম গদগদ হয় বাংলায় ?

ঠান্ডা বরফ ভাত !

সেটা ভুললে চলবে না। রান্না হয় সন্ধ্যায়—গুদাম-পচা সরকারি চালের বোঁটকা গন্ধেই বুঝি ন্যাকা মেয়ের ভাতের জন্য কান্না বাড়ে ! কর্তাকে গরম গরম ভাত দিয়ে খুশি করতে যে গিন্নি রাত এগারোটা পর্যন্ত উনানে কয়লা পোড়াবে, তাদের বাঁচিয়ে রাখতে যে কর্তাব্যক্তিটা সকাল আটটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত খেটে মরে সে মানুষটা গিন্নির সাথে কাব্যি করবে না, মারবে এক চাঁটি।

গা-ঘেঁষা ঘর। যতীনের একগন্ডা ছেলেমেয়ে আবদার তোলে শুনতে পাই, এ বেলা রুটি করো মা, রুটি করো। করো না রুটি ? আটা কম তো কম করে করো না ! ভাতের সঙ্গে একটা-দুটো করে খাব।

বাবারে বাবা, কী রুটিই তোরা খেতে পারিস !

একটা করে দিয়ো ?

দাঁড়া দেখি হিসেব করে।

হিসাব ছাড়া পথ নেই। সব বিষয়ে সব কিছুর গোনা-গাঁথা ওজন করা হিসাব দিয়ে কোনোমতে দিন গুজরান। আটার পরিমাণ দেখে অবলা তার জীর্ণ পুরানো সেলাই করা ব্লাউজটা গা থেকে খুলে ফেলে দিতে দিতে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

না, এ বেলা রুটি হবে না।

শুধু এ বেলা নয়, এ হপ্তার বাকি ক-টা দিন আর রুটি পাবে না কেউ, ভাতের সঙ্গে দুখানা একখানাও নয়। সকাল আটটায় বেরিয়ে রাত এগারোটায় ফিরবে যে মানুষটা, ক-দিন তার বাইরে খাবার জন্য রুটি করে দিতেই এ আটাটুকু লেগে যাবে। বাইরে কিনে খেতে বড্ড খরচ।

তবু আবদারের কলরব ওঠে—ছোটো দুজনের। তারা এখনও ভাব-জগতের মায়া একেবারে কাটিয়ে উঠে বাস্তব জগতের কঠোরতা সম্পূর্ণ মানতে পারেনি, এখনও বুকে আশা নিয়েই আবদার করে। তবে এক ধমকে তারা থেমে যায়।

সাত বছরের মেজোমেয়েটা ফোঁস করে ওঠে, তুমি সব বাবার জন্যে রেখে দেবে। আমরা ভেসে এসেছি ? বাবা বলে কত কিছু কিনে খায়—

তার গালে একটা চড় পড়ে সশব্দে।

চড়চাপড় এই মেয়েটাই খায়। ওর স্বাস্থ্যটাই ভালো, খিদেও বেশি—ওই বেশি খাইখাই করে। অন্য তিনজনেই রোগা দুর্বল—দশ বছরের বড়োমেয়েটা তো প্যাঁকাটির মতো দেখতে। ওদের গায়ে হাত তুলতে ভরসা হয় না—হয়তো মরেই যাবে, খিদেয কাতর বাপের চড় খেয়ে চাষির যে ছেলেটার মরে যাবার খবর খবরের কাগজে বেরিয়েছে, তার মতো।

অন্য তিনজনকে বশে আনতে অনেক সময় শাসন জোটে একা ওই সাত বছরের মেজোমেয়েটার।

রোগা ক্ষীণজীবী বড়োমেয়েটা দু-চারখানা বাসন মাজে, ঘটিতে করে জল তোলে, ঘর ঝাঁট দেয়, দোকানে যায়। পুতুল খেলা ফেলে মেজোবোন দিদির সাথে হাত লাগায়। পুতুল খেলার চেয়ে তার ভালো লাগে টুকটাক সংসারের কাজ করাব খেলা।

সে দিদির কাজ করে, মা-র কাজ নয়। মা-ব সঙ্গে তার বিবাদ। সে মিনতি করে বলে, দিদি, আমায় দে না বাটিটা মাজি।

মা বাটিটা এগিয়ে দিতে বললে সে শুনতে পায় না। ধমক দিয়ে হুকুম করলে অনিচ্ছার সঙ্গে ওঠে, পুতুলকে বলে যায়, বোস বাছা একটু, পরে খেতে দেব। রাক্ষুসি ডাকছে।

আটটা বাজবার আগেই ঝিমিয়ে নেতিয়ে আসে চারজন। সেটাও মেজাজ বিগড়ে দেয় অবলার, কিন্তু বেচারিরা করবে কী ? খাদ্যে মেটে ক্ষয়ের পূরণ আর পুষ্টির প্রয়োজন ঘুম তাই ঘনিয়ে আসে আরও বেশি ক্ষয় ঠেকাতে। এ বিষয়ে প্রকৃতি ছেড়ে কথা কয় না কাউকে। ওই তেতলা বাড়ির ভুঁড়িওলা মালিক ঘনশ্যামবাবু : সাতজন ভাড়াটের কাছে লোকটা মাসে বাড়িভাড়াই পায় চারশো টাকার মতো—অনিদ্রা রোগ খুব বেশি বেড়ে গেলে মাঝে মাঝে তাকেও মাছ মাংস মিঠাই মন্ডা একেবারে বাদ দিয়ে উপোস করতে হয় ! অতিপুষ্ট শরীরটা তার যথারীতি পুষ্টি না পেয়ে আপসে একটু ঘুম এনে দিয়ে নিদ্রাহীনতার অসহ্য কষ্টে তাকে পাগল হতে দেয় না।

চারজনে একসঙ্গে খেতে বসে। তার মানে চারজনকেই একসঙ্গে বসানো হয়, একসঙ্গে চুকিয়ে দিলেই হাঙ্গামা চুকে যায়।

অবলারও সহ্যর সীমা আছে তো।

আমি আলু পাইনি মা !

আমায় ডাঁটা দিলে না যে ?

এট্টুখানি ডাল দাও মা, শুধু এট্টুখানি !

পেট ভরেনি !

আমারও ভরেনি !

খা। খা। খা। আমার হাড়মাস চিবিয়ে খা তোরা।

রোগা বড়োমেয়েটা চুপচাপ খায়। এবার সে তার ক্ষীণকণ্ঠে যতদূর পারে চড়িয়ে বলে, তুমি যেন কেমন করো মা। রুটি দিলে না একখানা, আরেক হাতা করে ভাত দাও না আমাদের ? খিদের চোটে রাতে ওরা কাঁদলে ফের মারবে তো ?

ঘরে বসে মেয়েটাকে যেন চোখের সামনে দেখতে পায়। একটু বাঁকা মেরুদণ্ডটা সে সোজা করেছে। শীর্ণ মুখে যেটুকু ক্ষোভের স্ফুরণ হয়েছে, খাঁটি দরদির চোখ ছাড়া নজরেই পড়বে না। ছোটো

ছোটো চোখ, সে চোখে ভর্ৎসনার ঝিলিক দেখে কালো হরিণ চোখের কথা ভুলে গিয়ে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ নতুন প্রতিবাদের কবিতা লিখতেন।

তোমরা সব চেটেপুটে খাবে, আমরা উপোস দেব ? দ্যাখ তো হাঁড়িতে ভাত আছে কতটুকু ? তোদের জন্যে দুবেলা হাঁড়ি ঠেলছি, আমি খাব না ? সারাদিন হাড়ভাঙা খাটছে, সে মানুষটা খাবে না ?

মা-কে কৈফিয়ত দিতে হয় ছেলেমেয়ের কাছে, প্রচার করতে হয় যে মা হওয়া কী মুখের কথা। বাপ হওয়া কী সহজ কাজ ! মায়ের কত ত্যাগ, বাপের কত ত্যাগ, তাতেই মুগ্ধ সন্তুষ্ট থাকা উচিত সন্তানের।

মেজোমেয়েটা ছ্যাঁচোড়। সভ্যতা-ভব্যতা-ভদ্রতা কিছু শেখেনি সাত বছর বয়সে। সে ফ্যাঁস করে ওঠে, ইস ! তোমরা খাবে না-খাবে আমাদের কী ? আরও ভাত রাঁধনি কেন ? তোমরা খাও না যত খুশি, আমরা না করেছি ? আমাদের খালি মারবে, আমাদের খালি পেট ভরে খেতে দেবে না !

হে রাত আটটার তারায়-ভরা আকাশ, একবার বিদীর্ণ হও। কোটি বজ্রের গর্জনে ফেটে চৌচির হয়ে যাও। আমার বাংলার ছেলেমেয়েরা আজ খিদেয় কাতর হয়ে একখানা রুটির জন্য, একমুঠো ভাতের জন্য সংগ্রাম শুরু করেছে নিরুপায় মায়ের সঙ্গে !

রাত সাড়ে-দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরে জামাকাপড় ছেড়ে যতীন দুদণ্ডের জন্য আমার ঘরে বসে। আড্ডা দিতে নয়—সারাদিন যা করেছে তার একেবারে বিপরীত কাজ আহার এবং নিদ্রার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে। যে খাটে সে জানে যে খাটুনি শেষ করেই খিদের চোটে দিশেহারা হয়ে খেতে নেই।

তাতে অসুখ হয়। শোষণের স্তর থেকে একেবারে পোষণের স্তরে আছাড় খেয়ে পড়লে সামঞ্জস্য ঠুনকো কাঁচের মতো ভেঙে চৌচির হয়ে যায়।

আমার দেওয়া বিড়িটা ধরায়। টানতে গিয়ে কাশে। গায়ে বাতাস লাগায়। হাঁফ ছাড়ে। দেহ মনের টান করা তন্ত্রী আর স্ক্রুগুলি ঢিল করে দেয়। আমার চোখের সামনে দুদণ্ডে জীবন্ত মানুষটা ঝিমিয়ে নেতিয়ে আসে ! এও বাঁচার লড়ায়ের কৌশল। সকাল থেকে চলেছে সক্রিয় লড়াই—এখনকার লড়াই নিষ্ক্রিয় বিরামের। চিন্তা ভয় ক্ষোভ দুঃখ স্নেহ-মমতা আনন্দ উদ্দীপনা ন্যাকামি কোনো অজুহাতেই আর একবিন্দু বাড়তি শক্তিক্ষয় করা নয়।

খেতে বসেই টের পায় নিজের ভাগ কমিয়ে অমলা তার পাতে ভাত বেশি দিয়েছে। দুটো রসগোল্লা নয়, পেটে খিদে নিয়ে পেট ভরবে না জেনে দুমুঠো ভাত বেশি দেওয়া। এ ত্যাগের আগের দিনের মূল্য দেবার সাধটা মনের কোণে একবার উঁকি দিয়ে যায় বইকী, দরদ দেখিয়ে বলতে ইচ্ছে হয় বইকী যে তুমি আমায় রাক্ষস বানাবে !

কিন্তু সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে নিছক আগের দিনের জের টানার জন্যেই ন্যাকামি করা কি পোষায় মানুষের ?

খেতে শুরু করে খাঁটি দরদ দেখিয়ে বলে, তুমিও বসে যাও ? মিছে রাত করবে কেন ?

হ্যাঁ, আমিও বসি।

ফাঁকা আদর আর মিছে চোখে জল আসার চেয়ে কত মনোরম এই বোঝাপড়া। ভোরে উঠে উনান ধরাতে হবে অবলাকে, রাতের আবছা-আঁধার বজায় থাকা ভোরে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে তাকে বিশ্রাম করতে বলাটাই সব চেয়ে সুমিষ্ট আদর।

অবশ্য অবস্থাটা এ রকম বলে।

তারা শোয়। তাদের চোখে গাঢ় ঘুম ঘনিয়ে আসে। ঘুমোতে কেন, শ্বাস উঠে মরতেও দু-চার মিনিট সময় লাগে মানুষের। সেই ফাঁকে মেজোমেয়েটা উঠে চলে যায় রান্নাঘরে।

খিদের আগুনে পুড়ে গিয়েছে তার ঘুম। অন্ধকারে কোথায় গেল, কী করতে গেল মেয়েটা ? অবলাই ওঠে গায়ের জোরে। বলে, মাগো, আর তো পারি নে !

বুটি পায়নি মেজোমেয়েটা। অন্ধকারে আটা নিয়ে সে জলে গুলে খাচ্ছে। খানিক ছড়িয়েছে মেঝেতে।

এঁটো হাতাটা তুলে নিয়ে অবলা প্রাণপণে বসিয়ে দেয় তার পিঠে। আর্তকান্নায় চিরে যায় রাত্রির অন্ধকার।

হট্টগোলে চমকে জেগে কেঁদে উঠেই কান্না থামায় ক্ষীণজীবী রোগা বড়োমেয়েটা।

রান্নাঘরে গিয়ে দ্যাখে কী, বোনটি তার আকাশ-চেরা গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে আটার হাঁড়িটা কাত করে ফেলে হাত-পা ছুঁড়ে তছনছ করে উড়িয়ে দিচ্ছে আটাগুলি, বাবা তার দাঁড়িয়ে আছে পুতুলের মতো, মা হাতাটা উঁচু করেছে মেয়েকে আরেক ঘা বসিয়ে দেবার জন্য।

রোগা মেয়েটা দুহাতে হাতাটা চেপে ধরে কেড়ে ছিনিয়ে নেয়। যাকে মারবার জন্য হাতা উঁচু করা, হাতা-ধরা হাত দুটো তারই মায়ের, তাই রোগা কাঠি মেয়েটার ক্ষীণ শক্তিটুকুই হাতাটা কেড়ে নেবার পক্ষে যথেষ্ট হয়। সপ্তমে তোলা তীক্ষ্ণ বাঁশির আওয়াজে বলে, পেতলের হাতা দিয়ে মারলে যে মরে যাবে মা ?

ও ! বড়ো যে দরদি আমার।

বলে রোগা মেয়েটার গালে চড় কষিয়ে দেবার জন্য অবলা হাত তুলেছে, যতীন তার হাতটা চেপে ধরে।

কী করছ ?

অবলা ঠান্ডা হয়ে বলে, আর সয় না, এবার আমি মরব !

মেয়ে বলে, মরবে তো নিজে নিজে মরো না ? আমাদের মারছ কেন ?

মরব না সস্তায়

বলে কিনা, চুলোয় যাক তোমার ঘরসংসার ! আমি এত খেটে খেটে মরতে পারব না।

দুজনেই বলে, যখন-তখন—যে যাকে যখন বলার একটা সুযোগ বা অজুহাত পায়। পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চুলোয় পাঠাবার জন্যই যেন এতকাল ধরে গায়ের রক্ত জল করে তারা দুজনে সংসারটা গড়ে তুলেছে, টিকিয়ে রেখেছে।

রেশন হয়তো না আনলেই নয়।

হৃষিকেশ বলে, সংসার টানার জন্য খাটব গাধার মতো, আবার রেশন আনতে বাজার করতেও ছুটতে হবে আমাকেই ? ছেলেরা যেতে পারে না ? কোথাকার নবাব এসেছে ?

মোহিনী বলে, আমার হয়েছে সবদিকে জ্বালা। দুদিন বাদে ওদের পরীক্ষা নেই ? রাত জেগে জেগে কী চেহারা হয়েছে দেখতে পাওনা ? রেশন আনার কথা বলতে গেলে খেঁকিয়ে উঠবে।

হৃষিকেশ বলে, মেয়ে দুটোকে পাঠাও। বাপের ঘাড়ে গিলবে আর মুটোবে, রেশনটা নিয়ে আসুক।

মোহিনী ঝংকার দিয়ে বলে, হ্যাঁ, ওই ধুমসো দুটো মেয়ে ভিড়ের মধ্যে যাবে রেশনের জন্য ধন্না দিতে ! কাণ্ডজ্ঞানও হারিয়েছ নাকি তুমি ?

চুলোয় যাক তোমার ঘরসংসার, আমি এত খেটে খেটে মরতে পারব না !

বলে গজরগজর করতে করতে হৃষিকেশ টাকা আর থলি হাতে নিয়ে রেশন আনতে যায়।

স্কুল-কলেজ আপিসের তাড়ায় বিব্রত মোহিনী রান্নাঘর থেকে বড়োমেয়েকে ডেকে বলে, শুভা, চট করে মশলাটা বেটে দে আমায়। একহাতে কত করব ?

শুভা মিনতি জানিয়ে বলে, বাবার কাছে পড়াটা একটু বুঝে নিচ্ছি মা। বাবা তো এখুনি আবার বাজারে চলে যাবে। কলেজে দেবে না, মাস্টার রাখবে না, নিজে নিজে পড়ে কেউ প্রাইভেটে পাস করতে পারে ? কী রেটে ফেল করছে দেখছ তো ?

মোহিনী দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো শিলটা পেতে ধুতে ধুতে ঝংকার দিয়ে বলে, একটা ঠিকে ঝি পর্যন্ত রাখবে না। চুলোয় যাক তোমার ঘরসংসার, এত খেটে খেটে আমি মরতে পারব না।

শুভা উঠে এসে বলে, দাও, বেটে দিচ্ছি। কাজ নেই আমার পরীক্ষা পাস করে।

মোহিনী ধমক দিয়ে বলে, তুই পড়বি যা তো হারামজাদি। কলেজে দেয় না, মাস্টার রাখে না, বই কিনতে কত টাকা লেগেছে হিসাব রাখিস ?

পুলক পড়া ফেলে লাফিয়ে উঠে আসে। মায়ের কাছে হাত দুটি জোড় করে থিয়েটারি ঢংয়ে বলে, ফেল কী আমরা ইচ্ছা করে হই মা ? আমাদের ফেল করাচ্ছে জানো না ? বাংলাদেশের ছেলেরা কী হঠাৎ বোকাহাঁদা হয়ে গেছে ? পরীক্ষা দিয়ে সত্তর-পঁচাত্তর পার্সেন্ট ফেল করে ?

এত বড়ো ছেলের এই অস্বাভাবিক ছেলেমানুষি ঢংটুকুই কী সয় মা মোহিনীর ? ক্ষোভ বিদ্বেষ রাগ আর নালিশ দিয়ে একটা উগ্র প্রতিবাদের মতোই যে নিজেকে খাড়া রাখে সে ছেলের একটু ছ্যাবলামির আঘাতেই যেন ঝিমিয়ে নেতিয়ে যায়, গা এলিয়ে দিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চোখ বোজে !

ভাইবোন দুজনেই ভড়কে যায়।

শুভা ঝেঁঝে ওঠে পুলকের উপর,—তোমায় ডেকেছিলাম মুরুব্বিয়ানা করতে ? যাও না নিজের ফেলের পড়া করো না গিয়ে।

এই সরু প্যাসেজটুকু দিয়ে সকলের আনাগোনা। শিল-ধোয়া জলে পায়ে পায়ে আনা ধুলোময়লার কাদার মধ্যে বসে পড়ে মা-কে দুহাতে বুকে জড়িয়ে শুভা বলে, অমন কোরো না মা ! আমরা কী আগের মতো বোকাহাবা স্বার্থপর আছি, তোমার কষ্ট বুঝব না ? কী করি বলো—

চোখ মেলে মেয়ের কোল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে একটু বিহ্বলের মতন মোহিনী বলে, মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। কী হয়েছিল রে ? কী বলছিস তোরা ?

পরক্ষণে সে যেন খেপে যায়। গলা ফাটিয়ে বলে, তুই যে হারামজাদি কাচা কাপড়টা পরে জলকাদার মধ্যে বসে পড়লি ? কে আবার কাচবে তোব কাপড় ? সাবান সোডা কে জোগাবে ?

বলতে বলতে সে আবার চোখ বুজে সে-ই জলকাদার মধ্যেই গা এলিয়ে দেয়।

ডাক্তার আনতেই হয়। সে-ও আবার পেশাদার ডাক্তার !

অভয় দিয়ে বলে, ক-মাস পারফেক্ট রেস্ট দিতে হবে। আমি একটা ভিটামিন টনিক লিখে দিচ্ছি, সেটা খাবেন। রোজ অন্তত আধসের দুধ চাই। তাব বেশি হজম হবে না তাই বিলাতি কোনো পার্সিয়ালি ডাইজেস্টেড মিল্কফুড—

পুলক বলে, বাবা দুটো টাকা দিয়ে ওঁকে যেতে বলো।

মোহিনীর মাথায় ধার করা আইসব্যাগটা চেপে ধরে রেখে শুভা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। রায়বাবুদের বাড়ির সামনে মোটরটা দাঁড়িয়ে আছে, ভিতরের সিটে বসে সিগারেট টানছে ড্রাইভার করালী। সিগারেট টানতে টানতে দু-একবার উৎসুক চোখ তুলে জানলার দিকে তাকাচ্ছে।

ঘরের মধ্যে তাকে ভালো দেখতে পাচ্ছে না, আলো বড়ো কম ঢোকে ঘরে, বাতাসের মতোই।

জানালায় গিয়ে যদি সে দাঁড়ায়, করালীব উৎসুক চোখ ক্ষুধাতুর হয়ে উঠবে।

শুধু চোখ। এমনিতে মুখে তার সর্বদাই একটা নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত ভাব। রায়বাবুদের বাড়ির মেয়েদের কাছে শুভা শুনেছে করালীর কেউ নেই, যা রোজগাব করে সব নিজের জন্য খবচ হয়।

আমাদের মতো গন্ধতেল সাবান মাখে, জানিস ? প্রথম ভাবতাম চুরি করে বুঝি। তারপর দেখা গেল, না, বাবু নিজের পয়সাতেই কেনে। ঘরভাড়া লাগে না, খাওয়াখরচ লাগে না...

সিগারেট ফেলে দিয়ে করালী চিত হয়ে শুয়ে পড়ে। বেলা দশটা বাজে, দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে রায়বাবু এসে গাড়িতে উঠবে,—কিন্তু শুভা জানে, তারই মধ্যে করালী একটু ঘুমিয়ে নিতে পারবে। সে লক্ষ করেছে ফাঁক পেলে যখন ইচ্ছা করালী ঘুমিয়ে নিতে পারে।

ঠিক তাই।

কবালী শুয়ে পড়ার পাঁচ মিনিট পরে রাযবাবু বেরিয়ে আসে, কবালীর ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তুলতে হয়।

নিজের সিটে বসে গাড়ির স্টার্ট দিয়ে আরেকবার সে উৎসুক চোখে জানালার দিকে তাকায়।

শুভা ভাবে, যদি সম্ভব হত সঙ্গত হত তার সঙ্গে করালীর কথা বলা, তাকে তার মনের কামনা জানানো ! যদি সম্ভব হত, সঙ্গত হত করালীকে তার জানানো যে তার মনের ইচ্ছায় তারও সায় আছে। অনায়াসে করালী কোনো আত্মীয়কে দিয়ে প্রস্তাব পাঠাতে পারত তার বাবার কাছে, তারপর শুভ হোক অশুভ হোক কোনো একলগ্নে বাবার ঘাড় থেকে তার দায় নামত আর তাদের দুজনেরই সাধ আর সমস্যা মিটে যেত।

একার আয় একা ভোগ করার বদলে তার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে কত খুশি আর কৃতার্থ হত করালী।

রায়বাবুদের পেট-মোটা বিড়ালটা অনেকক্ষণ থেকে ঘরের আনাচে-কানাচে শুঁকে বেড়াচ্ছিল। এ বাড়িতে আঁশটে গন্ধ পাওয়া যায় কদাচিৎ, দুধ রাখা হয় নামমাত্র, কে জানে বড়োলোকের বাড়ির

পোষা আদুরে বিড়াল এ বাড়িতে এসেছে কেন। মাছ দুধ এঁটোকাঁটার লোভে পরের বাড়ি যাবার কোনোই দরকার তো ওর নেই !

বিড়ালটা লাফ দিয়ে তাকে উঠে সেখান থেকে পুরানো ভাঙা আলমারিটার উপরে উঠে যেতে দেখে শুভা বুঝতে পারে, বাচ্চা পাড়ার জন্য সে নিরাপদ স্থান খুঁজছে।

গতবার ওর বাচ্চাগুলিকে রায়বাবুরা মেরে ফেলেছিল। কিন্তু একটা বিড়াল কী করে টের পেল যে এত ছ্যাঁকা পোড়া খেয়েও তাদের প্রাণটা কোমল রয়ে গেছে, তার বাচ্চাগুলিকে মারবার মতো নিষ্ঠুর তারা হতে পারবে না ?

বাইরে কড়া নড়তে শুভা জিজ্ঞাসা করে, কে ?

বলে, আমি রায়বাবুদের রাঁধুনি। ওদেব বিড়ালটাকে খুঁজছি।

শুভা অবাক হয়ে যায়—রায়বাবুদের নতুন রাঁধুনির এমন চেনা গলা !

উঠে গিয়ে দরজা খুলে সে হাঁ করে চেয়ে থাকে।

সুরমা বলে, তোমাদের বাড়ি নাকি এটা ?

শুভার গলায় কথা জড়িয়ে যায়, কোনোমতে সে বলে, ভেতরে আসুন দিদিমণি, বিড়ালটা এসেছে।

কতদিন আর হবে, সুরমার কাছে স্কুলে বাংলা পড়ত। সব দিদিমনির চেয়ে তারই বোধ হয় মেজাজ ছিল কড়া আর ধমক ছিল বেশি। সিঁথিতে সবু করে সিঁদুর দিয়ে চওড়া পাড় শাড়ি পবে স্কুলে আসত।

আজ তার পরনে থান, সে রাঁধুনিগিরি করছে রায়বাবুদের বাড়ি।

ভিতরে গিয়ে মাথায় আইসব্যাগ বসানো মোহিনীকে দেখে সুরমা বলে, তোমাব মা বুঝি ? কী অসুখ ?

শুভা বলে, না খেয়ে খাটুনি চিন্তাভাবনা—মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু দিদিমনি আপনি রান্নার কাজ নিলেন কেন ?

এ প্রশ্ন যে উঠবে এবং জবাবও একটা দিতে হবে সে তো জানা কথাই। তবে পাড়ার লোকেব রাঁধুনি হিসাবে বাড়ির দরজায় তাকে হাজির হতে দেখে যে বকম থতোমতো খেয়ে গিয়েছিল তাতে এত শিগগির এমন স্পষ্টভাবে সে প্রশ্নটা করে বসবে, সুরমা সেটা ভাবতেও পারেনি।

সে-ই বরং ভাবছিল কীভাবে কথাটা তুলে এককালের ছাত্রীকে সংক্ষেপে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়া যায়।

সুরমা ধীরে ধীরে বলে আর বলো কেন, স্কুল থেকে বিদায় কবে দিলে। আরেক জায়গায় কাজ জোটাব তবে তো ? কিন্তু ছেলেপুলে নিয়ে খাই কী ! বসে থাকলে কী আমাদের চলে ? ওদেব রাঁধুনিটা পাড়ায় থাকে, কাজ ছেড়ে দেবে শুনে ভাবলাম আমিই ঢুকে পড়ি। আমার পেটটা তো চলবে, মাস গেলে ক-টা টাকা তো পাব। দুবেলা রাঁধি, দুপুরবেলা কাজের খোঁজে বেরোই।

শুভা বারবার তার পরনের ধুতিটার দিকে তাকাচ্ছে খেয়াল করে সুরমা একটু হাসে।

বলে, না, বিধবা হইনি, উনি বেঁচেই আছেন। বসে খাচ্ছেন বলে বাগ করে বিধবার বেশও ধরিনি। রাঁধুনিটা বললে কী এরা সধবা লোক রাখে না, সধবার নাকি অনেক ঝঞ্ঝাট। বিধবারা অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। তাই বিধবা সাজলাম।

শুভা জিজ্ঞাসা করে, মন খুঁতখুঁত করল না ?

সুরমা অবজ্ঞার সঙ্গে একটু মুখ বাঁকিয়ে যেন মনের খুঁতখুতানি উড়িয়ে দিয়েই বলে, গোড়ায় একটু করেছিল, তারপর ভাবলাম, কী হয় ওতে ? একটু সিঁদুর না দিলে আর শাড়ির বদলে ধুতি পরলেই যদি স্বামীর অকল্যাণ হত—

কথা সে শেষ করে না, আলমারির উপর থেকে বিড়ালটাকে নামিয়ে নিয়ে বলে, না যাই এবার। উনান কামাই যাচ্ছে। একটা বিড়ালের জন্য কী মায়া। অনেকক্ষণ দেখা নেই কোথায় গেল- - এ বাড়ি ও বাড়ি একটু খুঁজে এসো। রাঁধুনিকে ওরা একেবারে মানুষ ভাবে না। আগে ভাবতাম বড়োলোক সেক্রেটারির কাছে টিচাররাই বোধ হয় মানুষ নয়, এখন দেখছি গরিব হলেই মানুষ থাকে না। খানিকক্ষণ বেড়ালের দেখা নেই—অমনি হুকুম, খুঁজে নিয়ে এসো।

কী ঝাঁঝ সুরমার কথায় ! শুভা টের পায় সুরমার গরম মেজাজটা পরিণত হয়েছে ঝাঁঝে। তার মা-র মেজাজের সঙ্গে খানিকটা যেন মিল ছিল বাড়ির ছেলেপুলে আর স্কুলের মেয়েদের ঝঞ্ঝাটে তার কষে যাওয়া মেজাজের।

এক বাড়িতে

বিলাসময়ের স্ত্রী সুরবালা শুনে বলে, না, আত্মীয়বন্ধুর সঙ্গে দেনা-পাওনার সম্পর্ক করতে নেই, বড়ো মুশকিল হয়। বাইরের লোকের সঙ্গে সোজাসুজি কারবার, যা বলবার স্পষ্ট বলতে পারবে। আত্মীয় বন্ধুর কাছে চক্ষুলজ্জায় মুখ ফুটবে না, বন্ধুকে ভাড়াটে করে বাড়িতে এনে কাজ নেই।

বড়ো মুশকিলে পড়েছে বেচারা—

পড়ুক। অমন কত লাখ লাখ লোক ঢের বেশি মুশকিলে পড়েছে। বন্ধুকে অন্য বাড়ি খুঁজে দাও, নিজের বাড়িতে ও ঝঞ্ঝাট ঢুকিয়ে কাজ নেই।

বিলাসময়ও যে কথাটা এদিক থেকে বিবেচনা করেনি তা নয়। সুধীর অনেকদিনের বন্ধু - গলায় গলায় ভাব। সেলামির কোনো প্রশ্নই ওঠে না কিন্তু ওকে ঘর দুখানা ভাড়া দিয়ে একপয়সা আগাম নেওয়া যাবে না, সময়মতো ভাড়া না দিলে দাবড়ানি দেওয়া যাবে না, উঠতে বসতে সব বিষয়ে বন্ধুত্বের মর্যাদা রেখে চলতে হবে।

কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধু বলেই আবার মুশকিল—রেহাই পাওয়া যায় কীসে ? সুধীর এত করে বলছে, এখন তাকে না দিয়ে অন্য কাউকে ঘর দুখানা কোন অজুহাতে দেওয়া চলবে ?

সে তাই চিন্তিতভাবে বলে, ও কী সহজে ছাড়বে ?

সুরবালা তাকে বুদ্ধি বাতলিয়ে দেয়। বলে, এক কাজ করো। যা দিনকাল পড়েছে, বন্ধু বলেই তো টাকাপয়সার ব্যাপারে খাতির করা চলবে না ? খুব চড়া ভাড়া চেয়ে বসো সত্তর কী আশি টাকা। আর আগাম চাও পাঁচশো। বলবে যে একজন আগাম দিয়ে এই ভাড়ায় আসতে চায়। বন্ধু নিজেই ছাড়বে—ভাবতে হবে না !

এ মন্দ যুক্তি নয়। পাঁচশো টাকা আগাম দেবার সাধ্য যদিই বা হয় ধার করে গয়নাগাঁটি বন্ধক দিয়ে—মাসে দুখানা ঘরের জন্য আশি টাকা ভাড়া দেবার ক্ষমতা সুধীরের নেই। চরম চাহিদার এই বাজারেও ঘর দুখানার চল্লিশ টাকার বেশি ভাড়া হয় না—সাধ্য থাকলেও সুধীর ডবল ভাড়া দিয়ে রাজি হবে কেন ?

ভাগ্যে এখনও ভাড়ার কথা কিছু হয়নি সুধীরের সঙ্গে। সে শুধু দাবি জানিয়ে রেখেছে যে, ঘর দুখানা সে-ই ভাড়া নেবে। অন্য কাউকে যেন দেওয়া না হয়। কীভাবে বন্ধুর কাছে আগাম আর ভাড়ার কথাটা পাড়বে মনে মনে বিলাসময় তাই আওড়াতে থাকে।

পরদিনই সুধীর কথাটা পাকা করতে আসে। দু-তিনমাস তার মুখে দুশ্চিন্তার বাড়তি একটা কালো ছাপ পড়েছিল আজ দেখেই বোঝা যায় মুখ থেকে সে মেঘটা কেটে গেছে।

দেখে, বিলাসময় বড়োই অস্বস্তি বোধ করে।

ঘর দুখানা সে পাবেই এটা নিশ্চিত জেনে বন্ধু একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে ! তা, তাদের বন্ধুত্বের হিসাব ধরলে সুধীরের নিশ্চিন্ত হওয়া আশ্চর্য নয়। আর নিশ্চিন্ত হয়ে তার মুখে যে অনেকদিন পরে হাসি ফুটবে সেটাও আশ্চর্য নয়। কী অবস্থায় যে তার দিন কাটছে বিলাসময় তা ভালোভাবেই সব কিছু জানে।

কীভাবে এ অবস্থায় এসে পড়েছে সে ইতিহাসও তার অজানা নয়। জন্ম থেকে তার কলকাতায় বসবাস, পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের জন্ম সংক্রান্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামার ধাক্কা লেগেছে তারও গায়ে। তার দাদা ভালো চাকরি করে, একখানা বাড়ি করেছে। অবশ্য স্ত্রীর নামে, নইলে সাহস করে ভাইকে একখানা

ঘরে থাকতে দেবার মতো উদারতাটা দেখিয়ে ফেলার ভুলটা করত কী না সন্দেহ। হঠাৎ পাকিস্তান থেকে উৎখাত হয়ে এসেছে তার শ্বশুরবাড়ির সকলে আর ছেলেপুলে নিয়ে তার বড়ো মেয়ে ও জামাই।

বাড়ি থেকে সুধীরকে সে এক রকম তাড়িয়ে দিয়েছে। সুধীরের মেয়েটির সন্তান সম্ভাবনা সত্ত্বেও। হয়তো নিরুপায় হয়ে অগত্যাই ভাইকে এ অবস্থায় এভাবে তাড়িয়ে দিয়েছে,—নইলে শেষের দিকে ব্যবহার খারাপ হয়ে এলেও একখানা ঘরে ভাইকে সপরিবারে মাথা গুঁজে থাকতে দিতে আরও কিছুকাল হয়তো তার আপত্তি হত না।

শ্যামবাজারে বোনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল সুধীর -যে ক'টা দিন নিজের একটা আস্তানা খুঁজে নিতে না পারে। দুখানা ঘরে বোনের মস্ত সংসার -তার মধ্যে আসন্নপ্রসবা মেয়েটি সমেত সুধীর মাথা গুঁজে আছে আজ প্রায় তিন মাস। তার ওপর স্ত্রীরও তার অসুখ।

বোন, ভগিনীপতি আর ভাগনে-ভাগনির মুখ গোমড়া। ভালো করে কেন কেউ এক রকম তাদের সঙ্গে কথাই কয় না। শুধু গজরগজর করে।

সুধীর প্রথম কথাই বলে মারাত্মক : ঘর দুটো যখন ভাড়াই দেবে—কাল-পরশু থেকে দিয়ে দাও। আজ মাসের তেইশে মিছে আর পয়লা পর্যন্ত ভোগাবে কেন ! একেবারে পাগল হয়ে যেতে বসেছি।

বিলাসময় চেষ্টা করেও মুখের ভাব বা গলার স্বর স্বাভাবিক রাখতে পারে না। রীতিমতো গম্ভীর হয়ে বলে, তোমাকে একটা কথা বলি। তোমার আমার মধ্যে ঢাকঢাক গুড়গুড় কিছু নেই—আমাদের সে সম্পর্ক নয়।

সুধীর ভড়কে গিয়ে বলে, এ যে বিষম রকম ভূমিকা করে বসলে ! ব্যাপার কী ভাই ?

ব্যাপার কিছু নয়। তোমায় শুধু খোলাখুলি একটা কথা বলছি। ভাড়া-টাড়ার ব্যাপারে আমি কিন্তু কোনো রকম কনসেশন দিতে পারব না। অন্যের কাছে যা পাব তোমাকেও তাই দিতে হবে।

সুধীর স্বস্তি পেয়ে বলে, তাই বলো ! এই কথা ? অন্যে যা দেবে আমিও নিশ্চয় তাই দেব। আমি চেয়েছি কনসেশন ? আমিও ভাবছিলাম তোমায় স্পষ্ট বলে দেব, এ সব বিষয়ে যেন কোনো রকম সংকোচ কোরো না। লেনদেনের ব্যাপারে বন্ধুত্ব টানতে নেই—সাফ স্পষ্টকথা। ঘর পাচ্ছি তাই ঢের, তোমার আর্থিক ক্ষতি করব কেন ভাই।

বিলাসময় স্ত্রীকে স্মরণ করে আন্তরিক নিশ্বাস ফেলে বলে, দিনকাল বুঝতেই পারছ। তাছাড়া এ শুধু আমার নিজের ব্যাপার নয়—উনিও একজন কর্তাব্যক্তি।

সুধীর হেসে বলে, আমাকে কর্তা চেনাচ্ছ নাকি ? আমার বাড়িতে কর্তাব্যক্তি নেই ?

সে তখনও ধারণা করতে পারেনি বিলাসময় দুখানা ঘরের জন্যে কী অসম্ভব দাবি করে বসবে। বন্ধুর প্রস্তাব শুনে হাসি মিলিয়ে তার মুখ খানিকটা হাঁ হয়ে যায়। বিস্ময় আর অবিশ্বাস তাকে বলায় : ঠাট্টা করছ ?

না ভাই, ঠাট্টা নয়। এর কমে পারব না। কালকেই একজন আমায় টাকাটা হাতে গুঁজে দিয়ে রসিদপত্র লিখে ফেলবার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল।

পাঁচশো টাকা আগাম ? আশি টাকা ভাড়া

সুধীরের বিস্ময় আর অবিশ্বাস যেন কিছুতেই কাটতে চায় না।

বিলাসময় তার মুখের দিকে না তাকিয়ে অন্যদিকে চেয়ে বলে, তুমি হয়তো ভাবছ, আমিও দলে ভিড়েছি, চামার হয়ে পড়েছি। কিন্তু কী করি বলো ? অন্যের কাছে যা পাব, তোমার বেলা কমাতে পারব না। টাকার চিন্তায় পাগল হতে বসেছি। তোমার পোষাবে না জানি, আমি বরং তোমায় কম ভাড়ার ঘর খুঁজে দেব।

সুধীরের মুখে অদ্ভুত এক ধরনের একটু হাসি ফোটে।

তিন মাসে খুঁজে দিতে পারলে না, আর কবে খুঁজে দেবে ?

বিলাসময় কথা কয় না।

সুধীর একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। মনের ভাবের প্রতিফলনে তার মুখে যেন ঘন কালো মেঘ আর চড়া রোদের খেলা চলতে থাকে। সকলের জীবনে চারিদিক থেকে কী ভয়ংকর কী বীভৎস সব অন্যায় আর অনিয়মের আবির্ভাব ঘটেছে। দিন দিন যেন ভয়াবহ হয়ে ওঠার রেটটা চড়ছে জীবনযাপনের। যুদ্ধ থেমে গিয়ে ইংরাজ চলে গিয়ে কংগ্রেস রাজা হয়েছে বলে কী এত স্বপ্নাতীত অঘটন অনিয়মও সম্ভব হতে পারে ?

সুধীর বলে, ঘর খুঁজে দেবে বলছ, কিন্তু এই যদি ঘরভাড়ার বাজারদর হয়, কম ভাড়ায় ঘর তুমিই বা কোথায় খুঁজে পাবে ?

দেখব চেষ্টা করে।

দু-চার-দশবছর লেগে যাবে।

বিলাসময় আবার চুপ করে থাকে।

সুধীর বলে যাক গে, কী আর করা যাবে। এর মধ্যে খবর পেয়ে একজন যখন পাঁচশো টাকা আগাম দিয়ে ওই ভাড়ার ঘর দুটো ভাড়া নিতে পীড়াপীড়ি করছে, ঘরভাড়ার বাজারদরটা এই রকম দাঁড়িয়েছে নিশ্চয়।

বিলাসময় বেশ খানিকটা শঙ্কিত হয়ে বন্ধুর কথা শোনে। সুধীর সত্য তার অসম্ভব দাবি মেনে নেবে নাকি !

সুধীর আরও মিনিটখানেক ভেবে বলে, বেশ, আমি রাজি। তুমি যা চাইছ তাই দেব।

পারবে ?

পারব—কষ্ট হবে। দিনকালটাই দুঃখকষ্টের—উপায় কী ! আমি কিন্তু পরশুই আসব ভাই। এ ক-দিনের জন্য অর্ধেক মাসের ভাড়া দেব কিন্তু। পুরো মাসের দেব না আগেই বলে রাখছি।

সুরবালা আড়াল থেকে কান পেতে সব কথাই শুনছিল। খানিক পরে সে চা আর শিঙাড়া নিয়ে ঘরে ঢোকে।

এসে বাইরের ঘরেই বসে রইলেন ? অন্তত একটা খবর তো দিতে হয় !

খবর পেয়েছেন সে তো দেখতেই পাচ্ছি—খাবার এসে গেছে। দুদিন বাদে স্থায়ীভাবে ভেতরে ঢুকছি, সবাইকে নিয়ে। জ্বালাতনের একশেষ হবেন।

জ্বালাতন হতেই তো চাই !

বিলাসময় মুখের দিকে চেয়ে—সুরবালা যেন আড়াল থেকে কিছুই শোনেনি কিছুই জানে না এইভাবে বলে, কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেল ?

হ্যাঁ। ও রাজি হয়েছে। পরশু দিন আসবে বলছে।

সুরবালা বলে, বেশ তো ভালোই। কাল সন্ধ্যায় তাহলে লেখাপড়াটা করে ফেলুন ? না পরশু সকালে আসবেন ?

সুধীর শিঙাড়া চিবোতে চিবোতে বলে, কাল সন্ধ্যাবেলাই আসব। পরশু আসব সবাইকে নিয়ে।

সুধীর আর বড়োছেলে বিষ্ণুর গায়ের জোরের উপর নির্ভর করে গাড়ি থেকে নেমে টলতে টলতে বাড়ির ভিতরে যাওয়ার সময় অলকাকে দেখেই টের পাওয়া যায় গত সন্ধ্যায় সুধীর কোথা থেকে কীভাবে সংগ্রহ করে এনে পাঁচশো টাকা আগাম দিয়ে ঘরভাড়ার চুক্তিপত্র সই করেছিল। অলকার গা খালি। সুরবালার ঠিকা ঝির নাকে কানে আর হাতে যেটুকু সোনা আছে, অলকার গায়ে সেটুকুও নেই। সোনা-বাঁধানো একটি লোহা পর্যন্ত নয়। শুধু কপালে সিঁদুর আর হাতে শাঁখা।

পাঁচশো টাকা আগাম দিয়ে আশি টাকা মাসিক ভাড়ায় যে মানুষটা ঘরভাড়া করে তার বউ যখন স্বর্ণচিহ্নলেশহীনা হয়ে ভাড়াকরা ঘরে ঢোকে তখন কী আব অনুমান করতে কষ্ট হয় যে মেয়ের বিয়ে দিয়ে গয়নাগাঁটি যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাই দিয়ে ঘরভাড়া আগামের টাকাটা সংগ্রহ করা হয়েছে।

পুষ্প নিজেই গাড়ি থেকে নামে খুব সাবধানে। আজকেই কোনো একসময় তার প্রসববেদনা শুরু হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

সুববালার মেয়ে বিনতা পুষ্পব সমবয়সি বিয়ের আগে দুজনের গলায় গলায় ভাব ছিল। বিয়ের পর দুজনের দেখা হয়েছে কদাচিৎ—বছরে দু-একবার।

তবু কুমারী জীবনের সখিত্ব কী শেষ হয় বিয়েব পর কয়েক বছরের অদর্শনে ? বিনতার ছেলেপিলে হয়নি এখনও, সে শুধু বেড়াতে এসেছে বাপেব বাড়ি,—উৎসুক আগ্রহে সে এগিয়ে যায়, পুষ্পকে বলে, া বেশ, বিয়ে তো সবারই হয়, এর মধ্যে এমন কাণ্ড করেছিস ?

পুষ্প ভারী মুখে নিস্পৃহভাবে সংক্ষেপে বলে, কাণ্ড আবার কী ? তুই নিশ্চয় ঠেকিয়েছিস ?

হায়, সখিত্ব শেষ হয়ে গেছে তাদের। কোনো স্বার্থেব কোনো টানাটানি থাকে না বলে যে ছেলেমানুষি সখিত্ব জমাযেত থাকে আজীবন—একযুগ পরে ঘটনাচক্রে কয়েক ঘণ্টার জন্যে দেখা হলে দুটি ধর্ষিতা নিপীড়িতা মনেও আবার ছেলেমানুষি বৃপকরসের আমেজ লাগে—সেই সখিত্ব তাদের তিতো হয়ে গেছে।

কেন হয়েছে সে তো জানা কথাই।

প্রথম কাজ বিছানা পেতে অলকাকে শুইয়ে দেওয়া, তারপর ঘবসংসার গুছানো। সুববালা অলকাব কাছে গিয়ে দাড়ায়।

রোজ জ্বর আসে নাকি ?

রোজ।

অলকা খুকখুক করে কাশে। শঙ্কিত চিন্তিত দৃষ্টিতে সুববালা চেয়ে থাকে। কে জানে এ কী রোগ বাড়িতে ঢোকানো হল ? বেশি মেলামেশা ঘেঁষাঘেঁষি চলবে না।

ছেলেমেয়েদের সুরবালা সাবধান করে দেয়।

এক বাড়িতে সপরিবারে দুটি বন্ধু— বাড়িওলা ও ভাড়াটে সম্পক। ক-দিন আগেও বাস্তায় দেখা হলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে কখন ঘণ্টা কাবার হয়ে গেছে টের পাওয়া যায়নি, আজ এত কাছাকাছি এসেও দু-চারমিনিটেব বেশি আলাপ হয় না—তাও আবার ছাড়াছাড়া ভাসাভাসা আলাপ ! সময় আছে ঢের—হঠাৎ যেন বক্তব্য ফুরিয়ে গেছে উভয় পক্ষের ! দূরে দূরে দুটি ভিন্ন বাড়িতে থাকার সময় যেমন নিজের নিজের ভাবনা নিয়ে তারা মশগুল থাকত, সেই দূরত্বই যেন এসেছে এক বাড়িতে পার্টিশনের দু-পাশের মধ্যে !

পার্টিশন শুধু ঘর দুখানার জন্য। সদর দরজা এক, কল বাথরুম এক, বারান্দার একটু অংশ ঘিরে তৈরি নতুন রান্নাঘর ও সুরবালার রান্নাঘরে যাওয়া-আসা একই বারান্দা দিয়ে।

দূরত্বটা তাই স্পষ্ট অনুভব করা যায়—প্রত্যেকে অনুভব করে : কাছে আসার বাস্তবতাটা বাতিল করার কৃত্রিম বিশ্রী দূরত্ব।

মাসকাবারে সুধীর অর্ধেক মাসের ভাড়া দিতে গেলে বিলাসময় বলে, থাকগে, এ ক-টা দিনের ভাড়া দিতে হবে না। একেবারে সামনের মাস থেকে দিয়ো।

তা কী হয় ! কথা যা হয়েছে সেটা শুনতে হবে বইকী !

মাসের মাঝামাঝি পুষ্প তিন দিন দারুণ কষ্ট পেয়ে একটি ছেলে বিয়োয়. বাচ্চাটা মারা যায় পরদিন। বাচ্চাটা মারা যাওয়ায় কেউ বিশেষ দুঃখিত হয়েছে মনে হয় না, বরং আরও একটা দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য একটু স্বস্তিই যেন সকলে বোধ করে—পুষ্প পর্যন্ত।

ছেলেপিলে হয়ে মারা গেলে শুধু চুকেবুকে যায় হাঙ্গামা. মায়েব পর্যন্ত আপশোশ হয না, অবস্থার ফের এমনও করে দিতে পারে এই সব স্নেহাতুরাদের ? পেটের দায়ে ছেলেমেয়ে বেচে দেবার কাহিনি আজও এই দুর্ভিক্ষের দেশে শোনা যায়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে বাপ-মা ব তো এই হিসাবটাও থাকে যে অন্যের হয়ে যাক, ছেলেমেয়ে তো উপোস দিয়ে মরার বদলে বাঁচবে।

কোনো হাসপাতালে বেড খালি পাওয়া যায়নি। অন্য প্রসবাগারে দেওয়া যেত—কিন্তু বেডের ভাড়া আর আনুষঙ্গিক খরচ বড়ো বেশি। বাড়িতে ভালো ডাক্তার আনা যেত ; কিন্তু ভালো ডাক্তারের ভাড়া বড়ো চড়া। সাধারণ যে ডাক্তার সুধীর এনেছিল সে-ও পুষ্পব কষ্টভোগ কমাতে পাবত, বাচ্চাটাকে হয়তো বাঁচাতে পারত কিন্তু...এখানেও সেই এক্ই কিন্তু—সে জন্য যে চিকিৎসা দবকার ছিল তার জন্য খরচ দরকার ছিল অত্যধিক।

জামাইকে টাকা পাঠাতে জরুরি তার করেছিল। ছাঁটাই-বেকার জামাই এসেছিল খালি হাতে—সব চুকেবুকে যাওয়ার পর জামাইকে তার ফিরে যাবার গাড়িভাড়া দিতে হয়েছে।

সকলেই প্রায় নির্বিকারভাবে হিসাব-কষা স্বস্তির সঙ্গে বাচ্চাটার মবণকে স্বীকার করেছে, সুধীব পারেনি। এই তার প্রথম নাতি বলে নয়, ও সব শখ আর সুখের হিসাব তার চুকে গেছে। সে ছাড়া বাড়ির কেউ জানে না যে চেষ্টা করলে—টাকা খরচ করলে—বাচ্চাটাকে বাঁচানো যেত। সেই শুধু জানে। সেই শুধু জানে যে, মেয়েটার তিনটি দিনরাত্রি ঘরে অমন বীভৎস যন্ত্রণাভোগও প্রয়োজন ছিল না।

মেয়েটার জন্যই এক রকম মরিয়া হয়ে দুটি ঘরের জন্য সে পাঁচশো টাকা জোগাড় করেছে, দেড়শো-দুশো টাকার জন্যে সেই মেয়েটাকে ঠিকমতো প্রসব করানো গেল না।

সুধীরের বুকটা তাই জ্বলে যায়—আপশোশে ক্রোধে ক্ষোভে ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় !

তবু শান্ত নির্বিকারভাবেই সে মাসকাবারে দুশো টাকা বেতন থেকে আশি টাকা বিলাসময়ের হাতে গুনে দেয়, স্ট্যাম্প আঁটা রসিদ গ্রহণ করে।

তারপর একদিন হঠাৎ স্তম্ভিত বিস্ময়ের সঙ্গে বিলাসময় ও সুরবালা টের পায় সুধীর তাদের কিছু না জানিয়েই ঘর দুখানার ন্যায্য ভাড়া ঠিক করে দেবার জন্যে রেন্ট-কনট্রোলারের কাছে দরখাস্ত করেছে।

ভাড়া নির্দিষ্ট হয় চল্লিশ টাকা। যে আশি টাকা সুধীর দিয়েছে তার অর্ধেক টাকা পরবর্তী মাসের অগ্রিম ভাড়া হিসেবে ধরা হয়।

সব চুকেবুকে যাবার পর সদর দরজায় খিল লাগিয়ে ভেতরে এসে বিলাসময় আকাশে গলা তুলে চিৎকার করে বলে এত বড়ো বজ্জাত তুমি ! বন্ধু সেজে বন্ধুর সঙ্গে এই ব্যবহার ! এই মতলব ঠিক করে তুমি ঘরভাড়া নিয়েছিলে ? বেরোও তুমি আমার বাড়ি থেকে তোমার আগাম টাকা, ভাড়ার টাকা পাই পয়সাটি পর্যন্ত ফিরিয়ে দিচ্ছি, বেরিয়ে গিয়ে রেহাই দাও আমায় !

সুরবালা তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচায় : বন্ধুর বেশে এ কোন সর্বনেশে শনি ঘরে ঢুকেছে গো !

ঘর দুখানা থেকে কোনো জবাব আসে না। শুধু শোনা যায় সুধীর বিষ্ণুকে ধমকাচ্ছে চুপ করে থাক। কথাটি বলবি না।

বিলাসময় ধৈর্য হারিয়ে গাল দিয়ে বলে, হারামজাদা, জুয়াচোর বজ্জাত! বেরো তুই আমার বাড়ি থেকে। তোদের আমি ঘাড়ে ধরে লাথি মেরে বাড়ি থেকে তাড়াব।

বিষ্ণু কলেজে পড়ে। তার আহত তীব্রকণ্ঠ শোনা যায় চুপচাপ গালাগালি শুনবে বাবা?

জবাবে সুধীরের দৃঢ়কণ্ঠ শোনা যায় দিক না গালাগালি। ছোটোলোক মানুষ আর কুকুর ঘেউ ঘেউ করে। আমাদের কী বয়ে গেল? পুলিশ ডেকেও তো আমাদের তুলতে পারবে না। তুই চুপ করে বসে থাক।

চুপচাপ গাল শুনব!

বিষ্ণুর কথা প্রায় আর্তনাদের মতো শোনায়।

বিলাসময় গর্জন করে বলে, এই শুয়ার বেরোলি ঘর থেকে?

তীরবেগে বিষ্ণু ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বিলাসময়ের সামনে রুখে দাঁড়িয়ে বলে, শুয়ার বলছেন কাকে?

সুরবালা আতকে উঠে স্বামীর গায়ের গেঞ্জি টেনে ধরে বলে, থাক থাক, চুপ করো। পরে বিহিত হবে।

বিলাসময় বিষ্ণুর গালে একটা চাপড় বসিয়ে দেয়। বলে, শুয়ার বলছি তোর বজ্জাত জুয়াচোর বাপকে।

সেটা উভয়পক্ষের কমন বারান্দা। বারান্দার এ প্রান্তে সুধীরদের জন্য সংক্ষেপে ঘেরা রান্নাঘর পুষ্প সেখানে চালকুমড়োর তরকারি রেঁধে কুচি করে কাটা চোকলা দিয়ে ছেঁচকি বাঁধতে বাঁধতে খুন্তি হাতে বেরিয়ে এসে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বিষ্ণু তার হাতের সেই সস্তা চিলতে খুন্তিটা কেড়ে নিয়ে বিলাসময়ের ঘাড়ে খাঁড়ার মতো কোপ মারে। খুন্তির ঘায়ে মানুষের গায়ের চামড়ার চলটা পর্যন্ত তোলা যায় না দেখে সে বোধ হয় খেপে যায়।

বারান্দার এদিকে শেষ প্রান্তের দেয়াল ঘেঁষে বিলাসময়ের কয়লা রাখা হয়। এক একখানি আস্ত ইট দিয়ে ঘেরোয়া কয়লা গুদামটির সীমা প্রাচীর করা হয়েছে। বিষ্ণু অবশ্য অনায়াসে ওই আলগা ইট তুলে নিয়ে বিলাসময়কে মারতে পারত।

তার বদলে সে কয়লারই একটা সাত আটসেরি চাপড়া তুলে নিয়ে বিলাসময়ের মাথায় প্রাণপণে ঠুকে দেয়। আগের দিন বিকেলে বিলাসময়ের দুমন কয়লা এসেছিল। দুমন কয়লায় তার তেরো দিন চলে। বিলাসময় কাত হয়ে পড়ে যায়। মনে হয় সে যেন সুরবালার কোলেই ঢলে পড়েছে।

তার ফাটা মাথা দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসে।

আরোগ্য

আরোগ্য দ্বিতীয় সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

এক

মেয়েটি ফুটপাতের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল।

বেশভূষা থেকে দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে টের পাওয়া যায় খাঁটি শহুরে মেয়ে। অর্থাৎ নতুন আমদানি নয়, শহরে বসবাস চলাফেরা তার ধাতস্থ হয়ে গেছে। যার সহজ একটা মানে এই যে খুব বেশি রকম অন্যমনস্ক হয়ে থাকলেও শহরের রাজপথে চলার সময় তার অবচেতনা আপনা থেকেই কতগুলি সতর্কতা পালন কবায়।

নিচু দরজাওলা বাড়ির মানুষের যেমন কয়েকবার মাথায় ঠোক্কর খাবার পর ঠিক সময়ে মাথাটা নিচু করা স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায়, বারবার খেয়াল রাখার দরকার থাকে না।

অথচ বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে মেয়েটি করে কী, হঠাৎ কোনোদিকে না তাকিয়ে বাস্তায় নেমে সোজা কয়েক পা এগিয়ে যায়। স্কুল-কলেজ-আপিস যাবার সময় রাজপথে দ্রুতগামী গাড়ির যে দুমুখী স্রোতটা পাশাপাশি বয়ে চলে তারই কাছের স্রোতটার মধ্যে!

বিজ্ঞান অবশ্য নিখুঁতভাবে জটিলভাবে বলে দিতে পারে কেন এ রকম ঘটে। নিচু দরজাটার কাছে হাজারবার আপনা থেকে মাথাটা নত হলেও কেন একদিন হঠাৎ অভ্যস্ত মাথাটা ঠোক্কর খেয়ে বসে, বছবের পর বছর দুদিকে তাকিয়ে ফুটপাত থেকে রাস্তায় নামাটা ধাতে দাঁড়িয়ে গেলেও কেন সেই মানুষটাই একদিন হঠাৎ এভাবে চলন্ত গাড়ির স্রোতের মধ্যে নেমে যায়।

কিন্তু কাহিনিটা বলছি কেশব ড্রাইভারের। মেযেটির কাজের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উহ্য থাক। মেয়েটিকে দ্বিতীয়বার আমাদের কাহিনিতে দেখা যাবে না।

মস্ত সেলুন গাড়িটা সোজাসুজি মেয়েটিকে চাপা দিয়ে সাংঘাতিক রকম আহত করতে পারত, একেবারে মেরেও ফেলতে পারত। কারও কিছু বলার থাকত না। পিছনে গাড়ি, পাশে গাড়ি, ফুটপাতে মানুষের ভিড়। এ অবস্থায় আত্মহত্যা করার জন্য কেউ যদি এভাবে চলন্ত গাড়ির ঠিক সামনে এসে দাঁড়ায়, প্রাণপণে ব্রেক কষেও গাড়ি থামাবার সময় বা ফাঁক না রাখে তাকে চাপা দেবার অধিকার নিশ্চয সে গাড়ির চালকের আছে।

কিন্তু গাড়িও কিনা মানুষ চালায় এবং জগতে এত সমারোহের সঙ্গে ছোটো এবং বিরাট স্কেলে মানুষ মারা হয়ে থাকলেও মানুষকে বাঁচাতে চাওয়াটাই ধাত কিনা মানুষের, দুর্ঘটনাটা তাই হয়ে যায় একটু অন্য রকম।

দুর্ঘটনা ঠেকাবার উপায় ছিল না। সেলুন গাড়িটার বেঁটে যে কালো রঙের ড্রাইভারটি গাড়ির এবং নিজের খানিকটা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে মেয়েটিকে প্রাণে বাঁচিয়ে দেয়।

দাঁতে দাঁত চেপে প্রাণপণে ব্রেক কষার সঙ্গে সে গাড়িটা ডাইনে ঘুরিয়ে দেয়। গাড়ির ধাক্কায় মেয়েটি ছিটকে পড়ে ফুটপাতের দিকে। গাড়িটা গিয়ে ধাক্কা মারে চলন্ত ট্রামটার গায়ে।

অদ্ভুত একটা টানা আর্তনাদের মতো আওয়াজ ওঠে একসঙ্গে অনেকগুলি গাড়ি ব্রেক কষার ফলে।

সেলুন গাড়িটার পিছনে আসছিল পুরোনো লম্বাটে আকারের একটি গাড়ি। ব্রেক কষেও সেটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে সেলুন গাড়িটার উপরে। ফলে পিছনের সিটের ডানদিকের কোণ ঘেঁষে যে প্রৌঢ় বয়সি ভদ্রলোকটি বসেছিল, চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে সে পাশের সুন্দরী তরুণীটির কোলে ঢলে পড়ে—সিনেমার চমকপ্রদ ঘটনার মধ্যে আসল রসালো দৃশ্যটির মতোই !

সব গাড়ি থেমে যায়। দেখতে দেখতে প্রকাণ্ড এক লোকারণ্য সেখানে জমাট বেঁধে ওঠে।

কী বিরাট ছন্দে কী রকম আশ্চর্য মসৃণ গতিতে শহরের এই একটি রাজপথে জীবনের স্রোত বয়ে চলছিল, কী বিচিত্রভাবে তাতে মেশানো ছিল নানা বিভেদ আর সামঞ্জস্য, ব্যাহত হয়ে থেমে যেতে সেটা যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আগে ছিল নানা আওয়াজের মেশাল দেওয়া একটানা গুঞ্জনধ্বনি, এখন তার চেয়ে জোরালো হয়ে ওঠে শুধু মুখর মানুষের মিলিত কলরব।

কত অল্প সময়ের মধ্যেই যে আবার ঠিক আগেকার অবস্থায় ফিরে যায় রাজপথটা।

দুর্ঘটনা গুরুতর নয়। একজনও মরেনি, হাসপাতালে পরে কারও মরবার সম্ভাবনাও নেই।

কয়েকজন আহত হয়েছে আর কমবেশি জখম হয়েছে খানচারেক গাড়ি। বেশি চোট লেগেছে সেলুন গাড়িটাব ড্রাইভার আর যে মেয়েটি দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে তার---তবে তাদের আঘাতও তেমন মারাত্মক কিছু নয়। সেলুন গাড়িটার পিছনের সিটের ভদ্রলোকের মাথার পিছন দিকটা দেখতে দেখতে ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে, একখানা হাত গেছে মচকে।

অ্যাম্বুলেন্স এসে পড়ার আগেই পুলিশ ভিড়কে একপাশে ঠেলে দিয়ে রাস্তার ওপাশ দিয়ে গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা চালু করে দেয়।

অ্যাম্বুলেন্স এসে আহত মানুষ ক-জনকে নিয়ে যায় হাসপাতালে। বেশি জখম সেলুন গাড়িটার সামনের দিকটা শিকলে বেঁধে শূন্যে ঝুলিয়ে পিছনের দু চাকায় গড়িয়ে টেনে সরিয়ে যাওয়া হয়।

তারপরেই দেখা যায় পথেও যেমন চলেছিল, তেমনই চলছে গাড়ি ও মানুষের দুমুখী ধাবা। দাঁড়িয়ে থাকে কেবল সেলুনটার উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল যে লম্বাটে বড়ো গাড়িটা।

এই গাড়িটা চালাচ্ছিল আমাদের কেশব।

কেশব ফুটপাতে নেমে গিয়েছিল আর গাড়িতে ওঠেনি। তার নাকি মাথা ঘুরছে। ললনা নিজেই গাড়িটা ধারে সরিয়ে এনে রেখেছে। তারপর কেটে গেছে কয়েক মিনিট। কেশব ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানে আর ঘনঘন ঢোঁক গিলবার চেষ্টা করে।

ললনা বলে, আপনার কী হল কেশববাবু ? দাঁড়িয়ে রইলেন যে ?

কেশব বলে, আমার এখনও মাথা ঘুরছে। চালাতে পারব না।

গীতা বলে, বাঃ বেশ ! ওদিকে স্কুলে যে দেরি হয়ে যাবে আমার ?

মাইনে করা ড্রাইভারেরও যে একটা মাথা আছে এবং বিশেষ অবস্থায় সে মাথাটা ঘুরতেও পারে, এটা ললনা স্বীকার করে নেয়।

বলে, গাড়িতে এসে বসুন, আমিই চালাচ্ছি।

মন্দ্রা তার হাত চেপে ধরে বলে, না ভাই ! কাজ নেই !

আরও কয়েক মিনিট সময় তারা কেশবকে দেয়। ড্রাইভারেরও মাথা ঘোরা গা কেমন করার অধিকার আছে বলেই শুধু নয়। কেশবের কাছে তারা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতাবোধ করছিল।

কেশব তাদের আশ্চর্য রকম বাঁচিয়ে দিয়েছে।

গাড়িটা আরও বেশি রকম জখম হওয়া এবং তাদের বেশি আঘাত লাগা উচিত ছিল, বিশেষ করে কেশবের। কেশবের মতো পাকা ড্রাইভার না হলে এত অল্পের উপর দিয়ে রেহাই পাওয়ার আশা সত্যই কম ছিল।

কে জানে কীভাবে মাথা ঠান্ডা রেখেছিল কেশব ! এতক্ষণ এই কথাই তারা বলাবলি করছিল নিজেদের মধ্যে। সামনের গাড়িটার সঙ্গে ধাক্কা লাগবেই জেনে সেটা এড়াবার চেষ্টায় সে দিশেহারা হয়ে বিপদ ঘটায়নি। পাশ কাটাবার চেষ্টা করলেই সেলুনটার উপরে গিয়ে পড়তে হত কোনাকুনি ভাবে। ফলটা হত ঢের বেশি খারাপ। তাই, পাশ কাটাবাব বদলে আরও সোজাসুজি সেলুন গাড়ির উপরে গিয়ে পড়বার জন্যই সে উলটো দিকে চাকা একটু ঘুরিয়ে দিয়েছে।

এত সব ভাবলেন কখন ?

কেশবের মুখে ছিল একটা অদ্ভুত খমথমে ভাব। চাউনিটা যেন ভোঁতা হয়ে গেছে।

ঢোঁক গিলে সে বলেছিল, ভাবিনি তো। মনে হল এ রকম করলে—

কথাটা সে শেষ করেনি।

ঝাঁকি তাদেরও লেগেছে, বাইরেও লেগেছে ভেতরেও লেগেছে। একটু সময়ও লেগেছে সামলে উঠতে।

কিন্তু পাকা ড্রাইভার কেশবের হল কী? এমনি তার মাথা ঘুরছে যে গাড়িই চালাতে পারবে না ! আবার একটা সিগারেট ধরাল যে !

ললনার গাড়িতে চেপে গীতা স্কুলে পড়াতে যায়। ধৈর্যচ্যুতি ঘটায় সে এবার প্রায় মালিকের মতোই ধমক দিয়ে কেশবকে বলে, ছেলেমানুষি করবেন না। চোট লাগেনি কিছু না, গাড়ি চালাতে পারবেন না কেন ?

কেশব গলাটা সাফ করে বলে, কী রকম যেন লাগছে আমার।

গীতা জোর দিয়ে হুকুমের সুরে বলে, গাড়িতে এসে স্টার্ট দিন, সব ঠিক হয়ে যাবে। জোরে চালাবেন, আমার দেরি হয়ে গেছে।

তবু কেশব ইতস্তত করে।

শোভনা মিনতি করে তাকে বলে, আপনিই চালান কেশববাবু। ললনা শেষকালে সত্যি সত্যি অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়ে আমাদের মারবে !

ধীরে ধীরে অনিচ্ছুক পদে কেশব নিজের জায়গায় বসে গাড়িতে স্টার্ট দেয়। গাড়িটা একটু আস্তেই চলে প্রথমে। খানকয়েক গাড়ি পিছন থেকে হর্ন বাজিয়ে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলে যায়।

তারপর আপনা থেকেই যেন স্পিড বেড়ে যায়। একটা ফাঁক পেয়ে কেশব দুখানা বাস আর চারখানা প্রাইভেট গাড়িকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়।

শোভনা বলে, মাথা ঘুরছে বলছিলেন, একটু আস্তেই চালান না ?

কেশব নিশ্চিন্তভাবে বলে, না, ঠিক হয়ে গেছে।

কে জানে কী রকম মাথাঘোরা গা কেমন-করা তার, গাড়ি চালাবার আগে পর্যন্ত কাবু করে রাখে, চালাতে শুরু করলেই সব ঠিক হয়ে যায়।

গীতার চাকরির দায়, প্রাণের ভয়ের চেয়ে যে দায় বড়ো। সে বলে, যত জোরেই চালান, আজ লেট হয়ে গেলাম।

স্কুলের কাছাকাছি নির্দিষ্ট স্থানে গাড়ি থামতেই গীতা তাড়াতাড়ি নেমে যায়।

বাড়ি থেকে গাড়িতে ললনা রওনা দেয় একা, পথে একে-একে তিনজনকে তুলে নেয়।

মন্দ্রা ও শোভনা ললনার ক্লাসফ্রেন্ড। গীতা তাদের চেয়ে সাত-আটবছর বয়সে বড়ো হবে। মন্দ্রাকে তুলে নিতে খানিক ঘুরে তার বাড়ির দরজায় গাড়ি নিয়ে যেতে হয়। মেয়েটা এমনিতে খুব নিরীহ সাদাসিদে আর সরল কিন্তু ভয়ানক অভিমানিনী।

গীতা আর শোভনা সময়মতো বাড়ি থেকে একটু হেঁটে এসে বড়ো রাস্তায় ফুটপাতে নির্দিষ্ট স্থানে গাড়ির প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে।

স্কুলের সব চেয়ে নিকটবর্তী পয়েন্টে গীতাকে নামিয়ে দিয়ে তারা চলে যায়।

সপ্তাহে দুদিন গীতাকে স্কুলে যেতে এবং অন্য দুদিন স্কুল থেকে ফিরতে বাসের পয়সা খরচ করতে হয়। দুদিন এদের ক্লাস থাকে এত দেরিতে এবং অন্য দুদিন ক্লাস শেষ হয় স্কুল ছুটি হবার এত আগে যে গীতাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া অথবা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় না।

বাধ্যবাধকতা কিছুই নেই, একটা আস্ত গাড়িতে একলা কলেজ যাতায়াত করতে ললনার ভালো লাগে না বলে সে নিজেই উদ্যোগী হয়ে ব্যবস্থাটা চালু করেছে।

নিছক খেয়াল বা শখ নয়, বিচার-বিবেচনাও আছে এ ব্যবস্থার পিছনে।

গীতা ও শোভনার দুবেলা যাতায়াতের খরচ বেঁচে যাওয়াটা গণনীয় ব্যাপার। কিন্তু মন্দ্রার বেলা সে প্রশ্নই আসে না—যদিও তার বাবার মোটরগাড়ি নেই।

ট্রাম-বাসে যাতায়াতের কষ্ট বাঁচানোটাই হয়েছে তাদের হিসাবে সব চেয়ে বড়ো কথা। ওই দুর্ভোগের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই তারা বিশেষভাবে ললনার কাছে কৃতজ্ঞতাবোধ করে।

কতটুকু সময়ের জন্যই বা তারা গাড়িতে একত্র হয় ! সেইটুকু সময়ের মধ্যেই তাদের কথাবার্তা তর্কবিতর্কের ভিতর থেকে নতুন দিনের মেয়েলি মনের এলোমেলো টুকরো টুকরো পরিচয় বেরিয়ে আসে। কেশব আশ্চর্য হয়ে বিব্রত হয়ে শোনে।

কত বিষয়ে কী স্পিডেই যে ওরা কথা চালায় ! গোড়ায় কেশব বেশির ভাগ কথা বুঝতেই পারত না, মনে হত ঠিক যেন পাখির কিচিরমিচির। শুধু শুনতে শুনতেই ভাষাটা তার আয়ত্ত হয়নি। ললনারা যে সব কাগজ আর মাসিক পড়ে, অবসর কাটাতে সেগুলি পড়েও ওদের ভাষা বুঝতে তার অনেক সাহায্য হয়েছে।

অন্তত তার গাড়িটা সম্পর্কে এরা সময়-নিষ্ঠা অর্জন করেছে অদ্ভুত রকম। গাড়ি নিয়ে সে নির্দিষ্ট স্থানে আগে পৌঁছেছে এটা ঘটে কদাচিৎ ! যখন ঘটে তখনও গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে বিরক্ত হয়ে উঠবার সুযোগ পাওয়া যায় না। অল্পক্ষণের মধ্যেই দ্রুতপদে গাড়ির দিকে হেঁটে আসতে দেখা যায় গীতা ও শোভনাকে।

মন্দ্রাও ঘড়ি ধরে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করে। বাড়ির দরজায় গাড়ি দাঁড়াতে না দাঁড়াতে প্রতিদিন তাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়।

একদিনও তাকে ভেতর থেকে বলে পাঠাতে হয়নি যে একটু দাঁড়াও, বেরিয়ে এসে বিব্রতভাবে কৈফিয়ত দিতে হয়নি কেন দেরি হল।

কেশব ভাবত, বিনা পয়সায় গাড়ি চড়বার লোভে গীতা আর শোভনা নিশ্চয় অনেকক্ষণ আগে থেকে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে।

কয়েকবার সে দুজনকে ভদ্রতা করে জিজ্ঞাসা করেছে, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন ?

গীতা হাতে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে এবং শোভনা না তাকিয়ে প্রায় একই রকম জবাব দিয়েছে· না, এইমাত্র এসেছি, দু-একমিনিট।

শোভনার হাতে ঘড়ি বাঁধা নেই এটা কেশব লক্ষ করেছে।

ললনাদের কলেজে নামিয়ে দিয়ে আরেকটা দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করে কেশব।

সামান্য দুর্ঘটনা। বাস থেকে যাত্রী নামতে নামতে বাস ছেড়ে দেয়, একজন বুড়োমানুষ নামতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে। ব্যথা পায়, এখানে-ওখানে ছড়ে গিয়ে সামান্য রক্তপাতও ঘটে। তার বেশি কিছু নয়।

বুড়ো কিন্তু এমন আর্তনাদ করে আর রাস্তার লোক ধরে তুললে বাসের ড্রাইভারকে এমনভাবে গলা ফাটিয়ে গালাগালি দিতে থাকে যে সঙ্গে সঙ্গে ভিড় জমে যায়।

বাসটাকেও দাঁড়াতে হয়।

পথের মানুষরাই দাঁড় করিয়ে দেয়। চালককে টেনে নামিয়ে আনে।

দোষটা কিন্তু বুড়োর নিজের। তাকে দেখে আর তার চেঁচামেচি শুনেই টের পাওয়া যায় যে গাঁয়ের লোক। বাস থেকে নামতে জানলে আছাড় খাওয়ার কোনো কারণ ছিল না।

চেঁচামেচি করে ওঠায় চালককে মারতে উদ্যত ক্রুদ্ধ জনতাকে উদ্দেশ্য করে বাসের কন্ডাক্টার চিৎকার করে সে কথা জানায়।

কিন্তু একা তার চেষ্টায় ড্রাইভার রেহাই পেত না ! বাসের কয়েকজন যাত্রীও তাকে সমর্থন করে জনতার বেপরোয়া উত্তম-মধ্যমের হাত থেকে এ যাত্রা ড্রাইভার বেঁচে যায়।

বাস চলে যায়। বুড়োও গজরগজর করতে করতে একটু খুঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করে। ভিড় ছড়িয়ে যায়।

কিন্তু দেহটা আবার অবশ মনে হয় কেশবের। চাবি টিপে গাড়িতে স্টার্ট দেবার শক্তিও সে যেন খুঁজে পায় না।

অন্ধ যুক্তিহীন জনতা ! সেলুন গাড়ির সেই প্রৌঢ় লোকটির আঘাত গুরুতর হলে কিংবা একেবারে মরে গেলে তাকেও তো আজ ক্রোধে উন্মাদ মানুষেরা এমনিভাবে টেনে নামিয়ে মারতে মারতে মেরে ফেলতে পারত !

কপালের কথা কে বলতে পারে ? কোনো অশুভক্ষণে কবে সে মানুষ মেরে বসবে, নিজেও মারা পড়বে। কী মারাত্মক রকম বিপজ্জনক তার কাজ !

সাধে কি মা বারণ করেছিল এ কাজ নিতে, মায়া কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিল। আজও মায়া কি সাধে প্রতিদিন দারুণ উৎকণ্ঠা বুকে নিয়ে তার জন্য রাস্তায় চোখ পেতে রাখে, তাকে ফিরতে দেখলে যেন জীবন ফিবে পায়।

গাড়ি নিয়ে এখানে দাঁড়াবার হুকুম নেই। ট্র্যাফিক পুলিশ এসে ধমক দিয়ে যায়। চোখ-কান বুজে কেশব গাড়তে স্টার্ট দিয়ে সাবধানে আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যায়।

কিন্তু শত শত গাড়ি যখন একই দিকে বেগে চলেছে তখন এতখানি কম স্পিডে গাড়ি চালানোর অসুবিধাও অনেক। খানিক এগিয়ে যেতে যেতেই পিছনে অসহিষ্ণু হর্নের আওয়াজ শুনতে শুনতে আপনা থেকেই গাড়ির স্পিড সে বাড়িয়ে দেয়।

স্টার্ট দিলেই মৃত গাড়িটি জীবন্ত হয়ে ওঠে। চালাতে শুরু করলেই যেন সে জীবনে গতি পায়। সেই গতিতেই যেন লয় পায় কেশবের দেহমনের নিদারুণ অশান্তি।

কিন্তু গাড়ি গ্যারেজে ঢুকিয়ে গ্যারেজের লাগাও নিজের ছোটো কুঠুরিতে গিয়ে জামা ছাড়তে ছাড়তে আবার এক অকথ্য গভীর বিষাদে মন ভরে যায়।

সে বিষাদের আবার ঝাঁঝ আছে। প্রাণটা জ্বালা করে !

অজানা দুর্বোধ্য নালিশ উথলে উঠতে চায় বুকের কড়ায়ে।

কী অপরাধ সে করেছে যে যে কাজে তার সব চেয়ে বেশি বিতৃষ্ণা সেই কাজটাই তাকে করতে হবে জীবিকার জন্য ?

নিমাই বলে, বিড়ি হবে একটা ?

নিমাই বাড়ির ছোকরা চাকর এবং গাড়িটার ক্লিনার। বাড়ির লোকের ফুটফরমাশ খাটে, গ্যারেজ ঝাঁট দেয়, গাড়ির চাকা ধোয় আর বডি মুছে সাফ করে।

কোনোদিন ভালোভাবে করে। কোনোদিন যেমন তেমনভাবে করে। কোনোদিন একেবারে ফাঁকি দেয়।

সাধারণত হাফপ্যান্ট পরে থাকে। কিন্তু তার জন্য একসেট পায়জামা আর হাওয়াই জামার ব্যবস্থাও করা আছে। ছুটির দিন আর অন্যান্য দিন সন্ধ্যার পর বাড়িতে অতিথি সমাগম ঘটলে নিমাই হাফপ্যান্ট ছেড়ে পায়জামা আর হাওয়াই জামা পরে সকলকে চা সিগারেট জোগায় ফুটফরমাশ খাটে।

একনম্বর ফাজিল আর বখাটে ছেলে। কিন্তু ডাগর ডাগর চোখওলা গোলগাল মুখখানায় এমন একটা ভীরু সচকিত মেয়েলি বেদনার ভাব আছে যে তাকে দেখলেই যেন মায়া হয়।

ফাঁকিবাজ ছোঁড়াটার জন্য গাড়ির ক্লিনারের কাজ কেশবকেই করতে হয় বেশির ভাগ। কতবার সে নালিশ করার কথা ভেবেছে স্বয়ং কর্তার কাছে, ছোঁড়ার ওই মায়াবি মুখটার জন্য আজ পর্যন্ত পেরে ওঠেনি নালিশটা পেশ করতে।

বিড়ি চাওয়ার জবাবে কেশব শুধু একনজর তাকায় তার দিকে। ললনার কাছে ধার করা বইটা তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করে।

সহজে ভড়কে যাওয়ার ছেলে নিমাই নয়। মিনতি আর নালিশ মেশানো সুরে সে বলে, বিড়ি-সিগ্রেট টানি জানোই তো দাদা, একটা দিলে দোষ কী ? তুমি না দিলে শম্ভুর কাছে চাইব তো !

দোষ কী চাইলে ?

ও বড়ো ছ্যাঁচরা।

শম্ভু রান্নার কাজ করে। দরকারের সময় খানসামা সেজেও কাজ চালিয়ে দেয়। চালাকচতুর চটপটে মানুষ, চাউনি দেখেই টের পাওয়া যায় মগজটা তার প্যাঁচালো বুদ্ধিতে ঠাসা।

কী যে সেই প্যাঁচালো বুদ্ধি সেটাই কেবল ধরা যায় না। কেশব তো এসেছে সেদিন, শম্ভু পুরানো বিশ্বাসী লোক। চার বছরের উপর আছে। প্যাঁচালো কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় মেলে এমন কিছুই সে আজ পর্যন্ত করেনি।

কেশব তাকে পছন্দ করে না। শম্ভুর মুচকি মুচকি হাসি দেখলে তার গা জ্বালা করে।

একটা সিগারেট দিতেই নিমাইয়ের গোমরা মুখে হাসি ফোটে। ফস করে দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরিয়ে টান দেয় পাকা ধোঁয়াখোরের মতো।

বিড়ি-সিগ্রেট খেয়েই তুই মরবি। মা-বাপ নেই ?

বাপ-মা-ভাইবোন সব আছে নিমাইয়ের, দেশে আছে। ললনাদের দু-পুরুষ আগে ছেড়ে আসা দেশে। ললনার ঠাকুর্দার বাবার গোমস্তা ছিল নিমাইয়ের ঠাকুর্দার বাবা !

নিমাই যেন বলতে চায় যে সে কি নিছক মাইনে-করা চাকর অনিমেষের বাড়িতে? তা যেন ভাবে না কেশব। এদের সঙ্গে তার কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক !

লীনাদি আমায় কত ভালোবাসে জানো ? শম্ভুকে হুকুম দিয়েছে খিদে পেলে খুশিমতো নিয়ে খাব, কিছু বলতে পাবে না। ঠান্ডা লাগবে বলে খোলা ছাদে শুতে দেয় না। বলে কী জানো ? শম্ভু অর্জুনেরা শুক, তোর সইবে না। গরম লাগে তো ঘরে ফ্যান চলে, মেঝেতে শুয়ে থাকবি।

ঘাড় উঁচু করে তাকায় নিমাই। তার অহংকার যেন কেশবকে চ্যালেঞ্জ করা, আমার সঙ্গে পারবে তুমি ?

কেশব মোলায়েম কণ্ঠে বলে, বোস নিমাই।

নিমাইকে পাশে বসিয়ে তার গায়ে হাত রেখে আরও মৃদু আরও স্নেহভরা সুরে জিজ্ঞাসা করে, বাড়ির জন্য মন কেমন করে না রে ?

নিমাই শুধু মুখ বাঁকায়।

মা-র জন্য বেশি মন কেমন করে না ?

না, ছোটোবোনটার জন্য।

মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে নিমাই। তার বড়ো বড়ো চোখ দুটি ধীরে ধীরে জলে ভরে ওঠে। টপটপ করে ফোঁটাফোঁটা জল পড়ে।

ছুটি নিয়ে গেলেই পারিস দেশে ?

গিয়ে খাব কী ? ওরাই না খেয়ে মরছে।

কেশব একটু কড়াসুরে বলে, সিগারেট খাস যে ?

কিনে তো খাই না।

নিমাইয়ের পরনে হাফপ্যান্ট। নিজের কাপড় দিয়েই কেশব তার চোখ মুছিয়ে দেয়।

শম্ভুর গলা শোনা যায় : ও ডেরাইভারবাবু, হুজুর আজ খাবেন-দাবেন না ? ছুটি মিলবে না গরিবের ?

খেয়ে উঠে খবরের কাগজটা চেয়ে এনে কেশব শুয়ে শুয়ে কাগজ পড়ে।

হেডলাইনগুলিতে চোখ বুলোতে বুলোতেই আজ গভীর ঘুম নেবে আসে কেশবের চোখে। বেলা চারটের সময় ললনাকে আনতে যেতে হবে। তার আগে কোনো ডিউটি নেই। অবশ্য বাড়ির মেয়েদের যদি হঠাৎ কোনো খেয়াল না চাপে বা কোনো প্রয়োজন উপস্থিত না হয়।

অ্যালার্ম ঘড়িটা ঠিক করে মাথার কাছে রেখে সে শোয়। তিনটের সময় অ্যালার্ম বাজবে। চারটে পর্যন্ত দূরে থাক তিনটে পর্যন্তও সে ঘুমোতে পারবে না জানে, অনেক আগে জেগেই পরে অ্যালার্ম শুনবে, তবু কেশব অ্যালার্ম ঠিক না করে শুতে পারে না।

যদি না ঘুম ভাঙে আজ ? কোনোদিন ঘুম আসে কোনোদিন আসে না, ঘুম এলেও ঘণ্টাখানেকের বেশি কোনোদিন ঘুমোতে পারে না, তবু যদি সময়মতো না ভাঙে ?

আজ সত্যই তার ঘুম ভাঙল কানের কাছে ঘড়ির বাজনার আওয়াজে। অ্যালার্ম না বাজলে হয়তো আরও ঘণ্টাখানেক ঘুমেব জের চলত।

কতকাল তার এমন গাঢ় ঘুম হয়নি ?

ঘড়িব বাজনা থামিয়ে দিতে দিতেই কিন্তু বুকটা তার ধড়াস করে ওঠে।

অর্গান বাজিয়ে ললনা গান কবছে !

কী ব্যাপাব ? ঘড়ি ঠিক আছে, বাইবেব রোদের দিকে তাকালেও বোঝা যায় তিনটের বেশি বেলা হয়নি। কোনো কাবণে আগেই কি কলেজ ছুটি হয়ে গেছে ললনার ? ট্রামে-বাসে কিংবা ট্যাক্সিতে সে বাড়ি ফিবছে ?

ললনার গানটা শুনতে শুনতে একটা চমক লাগে কেশবের। এই অসময়ে ললনা তো গান করছে না, গান ঠিক কবছে।

এটা সাধারণত ঘটে থাকে শনিবার। সন্ধ্যার পর প্রায় শনিবারেই অনেক লোকজন আসে, বিশেষ বৈঠক বসে। সে আসরে ললনাকে গান গাইতে হয়—নতুন গান আগে থেকে সে গানটা ঠিক করে রাখে।

খববের কাগজটা তুলে নিয়ে কেশব থ বনে থাকে খানিকক্ষণ। একেবারে বারের ভুল হয়ে গেছে তার ? আজ শনিবার, দুটোর সময় তার গাড়ি নিয়ে কলেজে হাজির হওয়াব কথা।

তার জন্য অপেক্ষা করে করে বিরক্ত আর ক্রুদ্ধ হয়ে ট্রামে-বাসে বা ট্যাক্সিতেই ললনা বাড়ি ফিরেছে নিশ্চয।

হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে কেশব তাড়াতাড়ি জামা গায়ে দিতে যায়। চারদিকে ঝাপসা হয়ে আসায় চোখ বুজে বসে থাকতে হয খানিকক্ষণ। গলা শুকিয়ে গেছে। হাত পা কাঁপছে।

তা হোক, এখনও সময় আছে। ললনার বেলা ভুল হয়ে গিয়ে থাক, অনিমেষের আপিসে ঠিক সময়েই গাড়ি নিয়ে যেতে পারবে।

একটু বিশ্রাম করে কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেয়ে সে গ্যারেজে যায়।

দেখতে পায় অনিমেষ স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছে গ্যারেজে। ওবেলার অ্যাকসিডেন্টে গাড়িটা কী রকম জখম হয়েছে পরীক্ষা করছে।

বিরক্ত হওয়ার বদলে বেশ খুশিই মনে হয় তাকে।

এই যে কেশব। ঘুমোচ্ছিলে বুঝি ? আমি আজ আগেই চলে এলাম। ললনা টেলিফোনে অ্যাকসিডেন্টের খবরটা জানাতেই ট্যাক্সি করে চলে এসেছি।

কেশব বলে, কী করে যে ভুল হয়ে গেল আজ শনিবার। কলেজে গাড়ি নিয়ে যাওয়া হল না—

ভালোই হয়েছে। আজ আর গাড়ি বার কোরো না। কাল আসবার সময় একেবারে কানুকে সঙ্গে নিয়ে আসবে, ভালো করে দেখবে কোনো ড্যামেজ হয়েছে না কি। বিশেষ কিছু হয়নি না ?

মনে তো হয় না।

তবু একবার দেখা ভালো। হয়তো সামান্য খুঁত হয়েছে, অল্পে সারানো যাবে। নইলে গাড়ি চালাতে চালাতে বেড়ে গিয়ে একদিন হঠাৎ একেবারে বিগড়ে যাবে গাড়িটা।

অনিমেষ স্মিতমুখে তাকায় কেশবের দিকে।

তুমি নাকি শুনলাম খুব কায়দা করে মেয়েটাকে আর গাড়িটাকে বাঁচিয়ে দিয়েছ ? নিজে সিরিয়াসলি উন্ডেড হবার রিস্ক নিয়েছিলে ?

কেশব চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ঢোঁক গিলবার চেষ্টা করে।

লীনা গাড়িগুলির পজিশন এঁকে আমায় এতক্ষণ বোঝাবার চেষ্টা করছিল। একটু এদিক-ওদিক হলেই গাড়িটা তো বেশি রকম জখম হতই, তোমার বিপদ হত বেশি, লীনারা বেঁচে যেত। আমারও তাই মনে হল। ও সময় মাথা ঠিক রাখা তো সহজ কথা নয় !

বেশ বোঝা যায় অনিমেষ অত্যন্ত খুশি হয়েছে। সহজে গদগদ হবার মানুষ সে মোটেই নয়।

কিন্তু প্রশংসা শুনে কেশব সুখী হয়েছে মনে হয় না। তার কাঁচুমাচু বিনীত ভাবটা শুধু কেটে যায়।

সে ভাবে, এত পিঠ না চাপড়ে দশটা টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলেই হয় !

মুখে বলে অন্য কথা।

আমায় যদি আজ দরকার না থাকে—

না, আর দরকার কী ? তুমি বাড়ি যেতে পার।

একটু হেসে অনিমেষ বলে, তোমার ঘরটানটা কিন্তু বড়োই খাপছাড়া কেশব। একজন ইয়ংম্যান, নিজের ফ্যামিলি নেই, ছুটি পেলেই বাড়ি ছোট—এর মানেই বুঝতে পারি না আমি।

কেশব চুপ করে থাকে।

অনিমেষ তখন গম্ভীর হয়ে বলে, বাইরের বদখেয়ালের চেয়ে এটা অবশ্য ভালো।

দুই

সারাদিন ডিউটি দিয়ে সত্যই কেশব প্রায় রোজ রাত্রেই গ্রাম্য শহরতলিতে তার পুরানো ভাঙাচোরা নোংরা বাড়িতে ফিরে যায়।

শহরের শৌখিন এলাকায় অনিমেষের আধুনিক ফ্যাশনের নূতন রং-করা বড়ো বাড়ি। গ্যারেজের লাগাও ড্রাইভারের থাকবার ঘরটি ছোটো হলেও খোলামেলা ঝকঝকে তকতকে। প্রতিবছর বাড়িটির আগাগোড়া চুন ফেরানো রং লাগানো হয়, এ ঘরটিও বাদ যায় না।

স্টেশন পেরিয়ে সেই কতদূর বোসপাড়া, সেখানে ইট বার-করা নোনায়-ধরা দালানের ছোটো ছোটো ঘর, আলকাতরা-মাখানো ছোটো ছোটো জানালা দিয়ে ভালো আলো-বাতাস খেলে না ঘরের মধ্যে, ভিতরটাও ভাঙাচোরা জিনিসপত্রে বোঝাই।

রাত্রিটুকুর জন্য অত দূরে ও রকম একটা ঘরে রাত কাটাতে যাওয়ার বদলে এখানে থাকলে রাত্রের খাওয়াটাও কেশব পায়।

বাড়ির সেই একঘেয়ে শাকচচ্চড়ি কুচো চিংড়ির বদলে বড়োলোকের বাড়িব আধুনিক রুচির পুষ্টিকর সুখাদ্য। কিন্তু দেখা যায় সুখাদ্যের চেয়ে বাড়ির টানটাই কেশবের ঢের বেশি জোরালো।

রাত বেশি না হলে স্টেশন পর্যন্ত ট্রাম-বাস পাওয়া যায়। কিন্তু স্টেশনের পাশ দিয়ে লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে গেলে আর ও সব বালাই নেই।

বোসপাড়া পর্যন্ত প্রায় এক মাইল রাস্তা তাকে হাঁটতে হয়। সেখানে ছোটোবড়ো নতুন পাকাবাড়ি আছে, বৈদ্যুতিক আলো আছে, সাজানো মনোহারি দোকান এবং লন্ড্রি হেয়ারকাটিং সেলুন এ সবও আছে, কিন্তু আছে অপ্রধান হয়ে। প্রাধান্য সেখানে জবাজীর্ণ কাঁচা-পাকাবাড়ির, গেঁয়ো বাঁশঝাড় ডোবাপুকুরের সঙ্গে মেশানো শহুরে বস্তি খাটাল আর কাঁচা নর্দমার।

বাগানবাড়ি আছে দু চারটা। কিছু লোকের ছোটোখাটো বাসভবনের লাগাও একরত্তি বাগানেও ফুল কিছু কিছু ফোটে। কিন্তু ফুলের গন্ধ হটিয়ে দুর্গন্ধই জাহির করে রাখে নিজেকে।

তাছাড়া আছে মশা আর মাছি। দুয়েরই অখণ্ড প্রতাপ।

তবু কেশবের ফিরে যাওয়া চাই। বিশেষ কারণে বাত বেশি হয়ে গেলে ট্রাম-বাস মেলে না, কেশব হেঁটেই রওনা দেয। সরকারদের বাড়ি থেকে স্টেশনও প্রায় আধমাইল রাস্তা।

ফিরে আসতে হয় খুব ভোরে। অনিমেষের তিযাত্তর বছরের বুড়ি মা-কে রোজ সকালে গঙ্গাব ঘাটে নিয়ে যেতে হয়।

কেশব বিয়েও করেনি।

অর্থাৎ আলোয় ঝলমল এমন খোলামেলা পবিচ্ছন্ন এলাকায় সুন্দর বাড়িতে এমন সুবিধাজনক একটি ঘব থাকতে, নিজের বাড়িতে আপনজনের মধ্যে শুধু কযেক ঘণ্টা ঘুমানোর জন্য তার ফিরে যাওয়া!

বাড়িতে সেকেলে গেঁয়ো স্বভাবের একগাদা আপনজন। মা বোন-মাসি-পিসি-ভাই-ভাজদের সে সংসারে প্রায় পবের মতো হয়ে গেলেও যাবা আজও তার আপনজন হয়ে আছে।

ললনা বিশ্বাস কবে না।

তার বাড়ির সমস্ত খবর সে জেরা করে জেনে নিয়েছে। ওই বাড়ি আব ওই আপনজনদের জন্য তার এত টান ? এ একেবারে অসম্ভব কথা ! মাঝে মাঝে গেলে অবশ্য আলাদা কথা ছিল।

আজও অ্যাকসিডেন্টের দৌলতে সকাল সকাল ছুটি পেয়ে কেশব বাড়ির দিকে ছুটেছে শুনে সে হেসে বলে, বাড়িই যে যায় তোমরা জানলে কী করে ? সঙ্গে গিয়েছ কোনোদিন ?

মেয়ের কথার গতি অনুমান করে তার মা নির্মলা। ভুরু কুঁচকে বলে, কী বলছিস তুই !

বলছি, বাড়ি যায় না হাতি ! কোথায় আড্ডা আছে নয ইয়ে-টিয়ে আছে—

চুপ কর লীনা !

ধমক নয। সে সাহস নির্মলার নেই। এতবড়ো স্বাধীনচেতা মেয়ে ! বিরক্তি আর বেদনার সঙ্গে শুধু প্রতিবাদ জানালো যে পাঁচজনের সামনে কোনো মেয়ের মুখে একটা পুরুষের রাত করে ইয়ে-টিযের কাছে যাওয়ার কথা বলা শোভা পায় না।

মা-র ক্ষোভ ললনা টের পায়। কিন্তু ভেবে পায় না তার শিক্ষিতা একেলে মায়ের এটা কীসের সংস্কার, কোথা থেকে এল !

সংসারের সাধারণ একটা বাস্তব কার্য-কারণ নিয়ে ইঙ্গিত করাটা কেন মা-র কাছে দোষনীয় ঠেকে কে জানে !

বাড়িই ফিরে যাচ্ছিল কেশব। কিন্তু বেলায় রওনা দিয়েও বোসপাড়া পৌঁছতে তার সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল।

হরেনের মোটর মেরামতির গ্যারেজের হেডমিস্ত্রি কানুকে বলে যেতে হবে, ভোরে তার সঙ্গে গিয়ে অনিমেষের গাড়িটি পরীক্ষা করে দেখবে যে দুর্ঘটনায় রোগ-ব্যারাম কিছু হয়েছে নাকি।

অনিমেষ তো তাকে বলেই খালাস। তার বিশেষ বন্ধু হলেও চারিদিকে কানু মিস্ত্রিকে নিয়ে কী রকম টানাটানি, আগে থেকে বলে না রাখলে সেও যে কানু মিস্ত্রির পাত্তা পাবে না, এ খবর তো আর ভদ্রলোক রাখে না।

ওয়ার্কশপের মধ্যে একটা শূন্যে তোলা গাড়ির তলায় আধশোয়ার মতো বাঁকা হয়ে বসে কানু গাড়িটার হৃৎপিণ্ডে কী একটা চিকিৎসা চালাচ্ছিল। নিশ্চয় কঠিন আর গুরুতর চিকিৎসা।

কেশব ডাকে, কানু ?

কানু বলে, দাঁড়া।

বলে প্রায় আধঘণ্টা নিঃশব্দে একমনে ইঞ্জিনটার চিকিৎসা চালিয়ে যেন চটেমটেই বেরিয়ে আসে।

গায়ের তেলকালি-মাখা কভারটা খুলে ফেলতে ফেলতে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, ব্যাটারা যত সব ধ্যাধ্যেরে পচা-মরা গাড়ি এনে দেবে—আর আমায় হুকুম করবে কানু সারিয়ে দাও।

কেন, গাড়িটা তো নতুন লাগছে ?

গাড়ি তো নতুন, ইঞ্জিনটা ঠাকুর্দার চেয়ে বুড়ো। ঠাকুর্দার হাড়ের চেয়ে রদ্দিমাল দিয়ে ইঞ্জিনটা করেছে। শুধু বাইরেটা দেখে এ গাড়িটা কেউ কেনে ?

ওয়ার্কশপের মালিক হরেনের পরনে মিলিটারির পরিত্যক্ত ফুলপ্যান্ট আর শার্টে সিভিলিয়ানি সামঞ্জস্য করা বেশ। মুখের চামড়া যেন শুকনো আমসির ছাল দিয়ে গড়া।

কাল কিন্তু গাড়িটা ছাড়তেই হবে কানু। রসিকবাবুর ভাগনের গাড়ি। রসিকবাবুর কাকাই কিন্তু গাড়ি-টাড়ির ব্যাপারে কর্তা।

কানু বলে, গাড়িটার শ্রাদ্ধ করতে বলে দিন।

হরেন চটে বলে, কী রকম ?

কানু বিড়ি ধরিয়ে বলে, চটছেন কেন ? মানুষ মরে গেলে ডাক্তার বাঁচাতে পারে ? মরা একটা ইঞ্জিন পাঠিয়ে আপনাকে বলছে বাঁচিয়ে দাও। মরা ইঞ্জিন বাঁচাতে শিখিনি বাবু। আমার দ্বারা হবে না। ইঞ্জিনিয়ারবাবু যদি বলেন কিছু করা যায়, আমাকে যা করতে বলেন করব। মুখ্যসুখ্য মিস্ত্রি বাবু আমি, ভাঙা-পচা ইঞ্জিন সারাবার বিদ্যে পাব কোথা ?

হরেন বলে, সেরেছে ! শেষে আমার ঘাড়েই চাপাল ?

কানু মৃদুস্বরে বলে, কাল হপ্তা পাইনি, আজ আমার চাই। পাঁচ রোজ ওভারটাইম আছে।

হরেন কয়েক মুহূর্ত পাথরের মূর্তির মতো অপলক চোখে চেয়ে থাকে।

তারপর খেদ আর অনুযোগের সুরে বলে, আমার সঙ্গে এ রকম করিস কেন রে ? আমার অবস্থাটা বুঝবি না তুই ?

কানু শেষটানে বিড়িটার সুতো পর্যন্ত পুড়িয়ে উদাস উদারভাবে বলে, বুঝতে দেন না, তাই বুঝি না। যাকগে বাবু, হপ্তাটা দিয়ে দিন।

কেশব লক্ষ করে, ওয়ার্কশপের একত্রিশজন কারিগর খানিক তফাতে এলোমেলোভাবে দাঁড়িয়ে আছে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। একেবারেই যেন স্বার্থ বলতে তাদের কিছুই নেই। সারা সপ্তাহ খেটেছে কিন্তু হপ্তা পাবার জন্য ব্যগ্রতা উগ্রতা নেই।

চারিদিকে চেয়ে দেখে হরেন বেঁটে রোগা এম এ পাস সুধীরকে হুকুম দেয়, এদের হপ্তা দিয়ে দাও।

সুধীর আমতা আমতা করে বলে, একটু মুশকিল হয়েছে। হপ্তা দেবার ক্যাশ টাকা নেই। বঙ্গাসদন ব্যাংকের চেকটা ক্যাশ হয়নি।

কেন হয়নি ?

ব্যাংকটা ফেল পড়েছে শুনলাম।

হরেন কটমট করে তার দিকে তাকায়। ব্যাংক ফেল পড়ার অপরাধটা যেন তারই। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে কয়েকবার কানু আর তফাতে দাড়ানো মিস্ত্রি-মজুরদের দিকে চেয়ে দেখে।

সুধীরকে বলে, সেই টাকা থেকে দিয়ে দাও।

কোন টাকা সেটা আর বলার প্রয়োজন হয় না। সুধীর বলে, আচ্ছা।

হপ্তা পেয়ে কানু তাকে দেশি মদের দোকানে টেনে নিয়ে যায়।

খা দিকিনি একটু আজ। কী রকম ম্যাদা মেরে যাচ্ছিস দিন দিন ?

শরীরে কেমন জুত পাচ্ছি না।

হয়েছে কী ?

কে জানে। রোগ-ব্যারাম তো কিছু টের পাই না।

দু-নম্বর জলো মদের পাইট থেকে তার গেলাসে আউন্সখানেক ও নিজেব গেলাসে চার-পাঁচআউন্স ঢেলে কানু বলে, এত কী ভাবিস বল তো ? সারাক্ষণ ভেবে ভেবে তোর নিজেকে কাহিল লাগে। একটা মাগ নেই পুত নেই অত তোব ভাবনা কীসেব ? গায়ে ফুঁ দিয়ে ফুর্তি করে বেড়াবি। এক-একটা লোক থাকে মিছিমিছি ভেবে মরে।

মদটা গিলে হেসে বলে, খবর আছে, মস্ত খবর। ও মাসের তেরো তারিখে সাদি করছি।

কেশব উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করে, সেটাকে ?

মুখ বাঁকিয়ে মাথা নাড়ে কানু, না, ওর বাপ শালা বড়ো একগুঁয়ে। কিছুতে রাজি হল না। এ অন্য একটা মেয়ে, মা দেখে পছন্দ করেছে।

ছোটো একটা মনোহারি দোকানের মালিক, তার তেরো-চোদ্দোবছরের কচিমেয়ে। মেয়েটাকে পছন্দ হওয়ায় কানুর সংসার করার সাধ জেগেছিল অথবা সংসার করার সাধ জাগায় মেয়েটাকে পছন্দ হয়েছিল ঠিক করে বলা যায় না।

কানু প্রায় বছরখানেক চেষ্টা করছে, কিন্তু মেয়ের বাপ রাজি নয় মেয়েকে, একটা ধেড়ে মিস্ত্রির হাতে সে কিছুতেই দেবে না। তার আসল আপত্তি অবশ্য এই নয় যে কানুর একটু বয়স হয়েছে। বেলাও তো কচিখুকিটি নেই। আসল কথা দোকানে কাজ করলেও সে হল ভদ্রলোক, কানু স্রেফ মজুর।

এতদিনে কানুর ধৈর্য শেষ হয়েছে। মায়েব পছন্দ করা যেমন হোক একটা মেয়েকে বিয়ে করে এবার সে সংসারী হবেই।

কথা কইতে কইতে সন্ধ্যা হয়ে আসে। কানু মাতাল নয়, মদ খাওয়া অভ্যাস দাঁড়ায়নি, কিন্তু মাঝে মাঝে যেদিন খায় সেদিন নেশা করার জন্যই খায়। মদ খেতে বসে কেশবের মতো ছিটেফোঁটা একটু মালে একরাশি সোডা মিশিয়ে খাওয়ার পালা শেষ করাব ধাত তার নয়। শেষ পর্যন্ত বেলাকে বাতিল করার সিদ্ধান্ত করে মন বোধ হয় ভালো নেই, আজ বেশ খানিকটা গিলবে মনে হয়।

সন্ধ্যা হতে হতে নেশা জমে আসে কানুব।

সে বলে, চল না একটু ফুর্তি করি ?

কেশব বলে, বেশ বাবা তুমি, দুদিন বাদে বিয়ে করে সংসারী হবে—

কানু একগাল হেসে বলে, তবে যাব না যা। আরও খানিকটা হইচই করে ঘুমোব।

তুই খা। আমি গেলাম।

মদ খায় না বলে গর্ববোধ করে না কেশব। বেশি খেতে ভয় করে তাই খায় না। এতে আর বাহাদুরি কীসের ? বরং উলটোটাই বলা যায়। দু-একচুমুক খেলে একটু সতেজ মনে হয় নিজেকে।

এক দিন একটু বেশি করে খেয়ে দেখলে হত কেমন লাগে। কিন্তু ভাবতেও যে তার আতঙ্ক হয়। একবার চড়া নেশা হলে হাজার ইচ্ছা করলেও আর তো রেহাই পাবে না নেশার প্রক্রিয়াটাকে ঘটতে দিতেই হবে। যদি যন্ত্রণা হয়, যদি মনে হয় মরে যাচ্ছে, তবু কিছু করার থাকবে না ! নাইতে গিয়ে জলে ডুব দিয়ে পাকে আটকে যাওয়ার চেয়ে সেটা কি কম ভয়ংকর অবস্থা ?

যদি কোনো মন্ত্র বা ওষুধ জানা থাকত যা প্রয়োগ করামাত্র নেশা কেটে গিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাওয়া যায়, কানুর মতো বেশি খেয়ে পরীক্ষা একদিন সে করে দেখত কী রকম লাগে।

লেভেল ক্রসিংটা পার হলেই শহরতলির একেবারে অন্য রকম চেহারা।

আলোয় ঝলমল বড়ো বড়ো অট্টালিকার শহর আর নোংরা পুরানো জীর্ণ ঘরবাড়ির আধ-অন্ধকার শহরতলিকে রেলপথটা পৃথক করে রেখেছে। এপারে সীমা কর্পোরেশনের। ওপারে আরম্ভ মিউনিসিপ্যালিটির।

দুপুরে একপশলা বৃষ্টি হয়েছিল। কেশবের লম্বা ঘুমের যেটা প্রধান কারণ। ধুলো আর গোবরে রাস্তাটা প্যাচপ্যাচ করছে। এখানে-ওখানে গর্ত, সেগুলিতে জলের বদলে জমেছে পাতলা তরল কাদা।

তবু কী ভিড় মানুষের !

শুধু ময়লা জামাকাপড় পরা বা অর্ধউলঙ্গ গরিব মানুষেরই ভিড় নয়। ফিটফাট বেশধারী বাবুমানুষ, স্যুট-পরা সাহেব মানুষ এবং দামি শাড়িপরা ভদ্রমহিলাও এই পথে হাঁটছে, দুপাশের দোকানে কেনাকাটা করছে। খানিক এগিয়েই সিনেমা। শো চলছে, ভিতরটা বোঝাই, তবু বাইরে গিজগিজ করছে ভদ্র-অভদ্র মেয়ে-পুরুষ।

পরের শো-র টিকিটের প্রয়োজনে এত আগে এসে ধন্না দিয়েছে।

চেনা মানুষ শুধায়, আজ সকাল সকাল ?

কেশব বলে, ছুটি পেয়ে গেলাম।

আপিসে কেরানির খেয়ালে লটকানো শ্রান্ত চেনা মানুষ মন্তব্য করে, তোমার তো ভাই আরামের চাকরি। পরের মোটরে চেপে বেড়াও, খেয়ে দেয়ে খাটিয়ায় শুয়ে নাক ডাকাও।

করে দেখলে আরাম টের পাওয়া যায়। বাবু হুকুম দেবে জোরসে চালাও। জোরসে চালিয়ে মানুষ চাপা দিয়ে তুমি শালা মার খাও আর জেলে যাও। কত আরাম !

এগোতে এগোতে আরও কমে আসে রাস্তার আলোর জোর, দোকানপাটের দেখা মেলে দূরে দূরে, বাড়িগুলির গ্রাম্যতা আর জীর্ণতা বেড়ে যায়। এবরো-খেবরো খোয়ার তৈরি এই প্রধান রাস্তা থেকে দুপাশে পাড়ার মধ্যে ঢুকে গেছে ইটপাথরের গলিগুলি। বাগচীপাড়ার ফাঁকা জায়গার বাজারটা খাঁখাঁ করছে দেখা যায়। এখানেই সকালে একবেলা বাজার বসে।

বোসপাড়ার মোড়ে বিবর্ণ থামটার মাথায় টিমটিম করে জ্বলছে একটা অল্প পাওয়ারের বালব। এ যেন বাঁশঝাড় ডোবাপুকুর খোলার ঘরের বাগ-মানা মানুষগুলিকে জানিয়ে দেওয়া যে বৈদ্যুতিক আলো জ্বললেই কি এসপ্ল্যানেডের মতো ঝলমল করে ? এটাও বৈদ্যুতিক বাতি—এদিকে তাকিয়ে ঘরে লণ্ঠন আর ডিবরি নিয়ে সন্তুষ্ট থাক।

সন্ধ্যাদীপ জ্বালো খাঁটি তেল দিয়ে, শুদ্ধ তুলার সলতে বানিয়ে। সে আলোতে শান্তি আছে, স্নিগ্ধতা আছে। এ তো কাচের খেলনায় নিছক শুধুই আলো।

শরতের মনোহারি দোকানটায় কিন্তু একেবারে আধুনিকতম আলোর ব্যবস্থা। বালবের বদলে দুটো লম্বা কাচের মোটা নলের আশ্চর্য রকম আলোয় যেন দিন আর পূর্ণিমা রাতের আলোর সমন্বয় ঘটেছে।

এ রকম মনোহারি দোকান আশেপাশে কাছাকাছি আর নেই। এ এলাকাতেই নেই। অনেকটা পথ হেঁটে সীমান্তের লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে খাঁটি শহরের আওতায় এ রকম দোকান খুঁজে নিতে হবে।

কিন্তু হেঁটে পয়সা খরচ করে সেখানে গিয়ে যে শৌখিন জিনিসটা দরকারি জিনিসটা যে দামে কিনবে—সে জিনিসটা সেই শরতের এই দোকানে।

যুদ্ধের শেষে দোকানটা খুলে শরৎ এই কথা ঘোষণা করেছিল —বিশ্বাস না হয়, পরখ করো। শহর থেকে যে জিনিসটা যে দামে আনবে ঠিক সেই দামে সেই জিনিস যদি আমার কাছে না পাও, মাল আনার খরচ বলেও যদি দুটো পয়সা বেশি নিই, কান কেটে ফেলব তোমাদের সামনে।

শরতের দেওয়া বিড়িটা একবার টেনে দশবার কেশে বুড়ো আদিনাথ বলেছিল, দু-চারটে পয়সা বেশি নেবে বইকী বাবা। মাল আনতে খরচ লাগে না ?

শরৎ হেসে বলেছিল, না ঠাকুর্দা ওটা ইশকুলে শেখানো হিসেব, ব্যাবসার হিসেবে নয়। রোজ পাড়া থেকেই তিন-চারশো লোক শহরে কাজ করতে যায় দ্যাখো না ? পেস্ট বলো ব্লেড বলো পাউডার সিঁদুর যাই বলো—ওরা তো আনবেই নিজেদের দরকার মতো, অন্যেরা পয়সা দিলে তাদের জন্যও এনে দেবে। এক পয়সা বেশি নিই না বলেই লোকে এখান থেকে কেনে। দোকান করে লাভ নেই।

শরৎ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেছিল।

তার দোকানে ডজন ডজন দাড়ি কামাবার ব্লেড কিন্তু মুখে তার সাত-আটদিনের খোঁচাখোঁচা গোঁপদাড়ি। মাসে তার তিন চারবারের বেশি দাড়ি কামাবার সময় হয় কদাচিৎ।

কেশব বলেছিল, তাহলে তুমি দোকান চালাচ্ছো কী করে শরৎদা ?

চালাচ্ছি লোকসান দিয়ে !

লোকসান দিয়ে শরৎ তার দোকান চালায় ! এমনই তার লোকসান দেবার নেশা। তার মতো ঘরের পয়সা লোকসান দিতে চেয়ে দ্বিতীয় কেউ কিন্তু আশেপাশে এ রকম মনোহারী দোকান দিতে পারেনি।

পাল্লা দেবার অনুযোগ এড়াতে রমেশ প্রায় দেড়শো গজ তফাতে ব্রজ দত্তের বাইরের ঘরে দোকান করার চেষ্টা করেছিল।

ক দিন পরে দেখা গিয়েছিল রাতারাতি কে যেন দোকানের ভিতরে বিষ্ঠা ছড়িয়েছে, বাইরের তালার উপরেও দলা করে রেখেছে খানিকটা ওই জিনিস।

রমেশ তাতেও না দমায় তিন দিন পরে রাত্রিবেলা তালাবন্ধ দোকানের ভিতরে পেট্রোলের আগুনে অর্ধেক মাল পুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

সবাই অনুমান করেছিল কীর্তিটা কার। কিন্তু কে কী বলবে, কে কী করবে ? শরৎ নিজে কিছুই করেনি, শুধু টাকা খরচ করেছিল। বেশ মোটা টাকাই খরচ করেছে, এ সব কাজ অল্প পয়সা ঢেলে করানো যায় না। হোক লোকসান, তার মতো মনোহারী দোকান শরৎ কাউকে কাছাকাছি খুলতে দেবে না !

শরতের দোকানে দু-পয়সার নস্য কিনে কেশব কাছেই দক্ষিণ দিকে বোসপাড়ার রাস্তায় ঢোকে। বোসপাড়ায় ছাড়াছাড়াভাবে থোকথোক ঘনবসতি। কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি হয়তো আট-দশটি বাড়ি, তারপরেই খানিকটা ফাঁকা মাঠ- পুকুর বাগান।

বড়ো বড়ো বাড়িগুলি আর নতুন যে বাড়ি উঠেছে সেগুলিই কেবল বাড়ির কোনো থোকে না ঘেঁষে কমবেশি তফাতে তফাতে দাঁড়িয়ে আছে।

রাত বেশি হয়নি। আলো নিভিয়ে বোসপাড়া ঘুমিয়ে না পড়লেও রাস্তায় লোক খুব কম। কোনো দাওয়ায় বসেছে কয়েকজনের আড্ডা, কোনো বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে ছেলেমেয়ের চেঁচিয়ে পড়া, কোনো বাড়িতে বাজছে রেডিয়ো।

প্রকাণ্ড বটগাছটার লাগাও সাদা চুনকাম করা চৌকা দোতলা বাড়ি আবছা আঁধারে বড়োই রহস্যময় দেখায়, সংলগ্ন আটচালা দুটো সে রহস্যকে আরও ঘনীভূত করেছে। ভিতরে আলো জ্বলছে, মানুষের গলার আওয়াজ বাইরে ভেসে আসছে, নাকে এসে লাগছে রান্নাঘরের সম্ভারের গন্ধ। তবু তারা-ভরা নীলাকাশ যেমন প্রকাশ্য হয়েও রহস্যময়, বৈশাখী গুমোট সন্ধ্যায় নিথর জমকালো বটগাছটা জীবন্ত হয়েও যেন মৃতের মতো ভয়ের রহস্যে ঘেরা, তেমনি সাধারণ ইটের বাড়িটার ছায়াছন্ন শুভ্রতা যেন ছায়ালোকের প্রতীকের মতো রহস্যানুভূতিকে নাড়া দেয়।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করে কেশব। প্রতিদিন বাড়ি ফেরার পথে মায়াকে জানান দিয়ে যায় তার বাড়ি ফেরার কথা। কিন্তু আজ যদি মায়া তাকে ভেতরে ডাকে ? যদি টের পায় তার মুখের গন্ধ ?

বেড়ার ওপর থেকে গানের কোমল টানের মতো মিষ্টি মেয়েলি গলায় প্রশ্ন আসে, কে ?

এতজন লোকের রান্না রাঁধতে রাঁধতেও মায়া তবে তার প্রত্যাশায় সত্যই ঘনঘন পথের দিকে তাকায় !

কেশব বলে, আমি।

দাঁড়িয়ে কেন ? ভেতরে এসো ?

চৌকো দালানটির ভিতরে একরত্তি একটু পাকা উঠোন আছে। এ পাশে প্রাচীর-ঘেরা প্রশস্ত মেটে উঠোন। মাচাই আছে তিনটি। লাউ-কুমড়া আর উচ্ছেগাছের। কয়েকটা জবাগাছে ফুল ফুটে আছে। এদিকে দালান থেকে একটু তফাতে চালাঘরে রান্নাঘর।

দালানের পাশ কাটিয়ে মায়া তাকে রান্নঘরে নিয়ে যায়।

তার সঙ্গে ছিল গণেশ। একা রাঁধতে ভয় করে।

গণেশের চিবুক ধরে চুমো খেয়ে মায়া বলে, এবার পড়বে যাও মাণিক। পরীক্ষা আসছে যে ?

বছর দু-তিন আগেও ডিবরি জ্বলত রান্নাঘরে। আজকাল বেড়ার শালগাছের খুঁটিটার গায়ে লাগানো একটা ওয়াল ল্যাম্প আলো দেয়। .

দুয়ারের কাছে পিঁড়ি পেতে দিয়ে মায়া বলে, বোসো। মুখ যে বড়ো শুকনো দেখছি ? খুব খাটিয়েছে বুঝি আজ ?

না। সারা দুপুর ঘুমিয়েছি।

তবে ?

একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। অল্পের জন্য বেঁচে গেছি।

ল্যাম্পের রঙিন আলোয় ঠিক বোঝা যায় না কতকটা পাংশু হয়ে যায় মায়ার মুখ। চোখে পলক নেই দেখে, ঠোঁট দুটি ফাঁক হয়ে গেছে দেখে অবশ্য সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায় তার মনে-প্রাণে কত জোরে ঘা লেগেছে। কী আলোড়ন উঠেছে।

মায়া রূপসি কি না বলা কঠিন। লাবণ্যে ঢলঢল করছে তার তেল-চকচকে একরাশি কালো চুলে ঘেরা শ্যামল রঙের মুখখানা, আলগা তাঁতের শাড়ি ঘেরা শ্যামল কোমল অপুষ্ট দেহটা।

কেশব বলে, কী হল ?

মায়া বলে, কিছু খাবে ? একটু দুধ খাও, কেমন ?

কেশব হেসে ফেলে।—দুধ খাব !

তা খাবে কেন, দুধ খেলে যে শরীরটা ভালো থাকবে ! ওই আবার কালী আসছে। দুদণ্ড ভালো করে কথা কইবার যো নেই।

এগারো বছরেই কালী ইজের ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। ডুরে শাড়ির আঁচল লুটিয়ে বেণী দুলিয়ে এসে সে আবদার জানায়, খিদে পেয়েছে ঘুম পেয়েছে কাকিমা। কত রাঁধবে তুমি ?

মায়া ঝংকার দিয়ে বলে, আ মরণ, রান্না বাকি আছে নাকি আমার ? সবাইকে ডেকে এনে জায়গা করে বোস, খেতে দিচ্ছি। লণ্ঠন আনিস।

ভাইবোনদের ডেকে আনতে কালী দালানের মধ্যে অদৃশ্য হতেই মায়া চট করে উঠে এসে আঁচল দিয়ে কেশবের মুখের ঘাম আর ক্লেদ মুছে নিতে নিতে বলে, বুকটা ঢিপঢিপ করছে। এ কাজ ছাড়তে হবে তোমাকে। জামাকাপড় ছেড়ে এসো গে। দালানে ওদের সবাইকে বলবে কী হয়েছিল, আমিও শুনব।

তফাতে সরে গিয়ে বাঁকা চোখে চেয়ে বলে, মদ খেয়েছ, না ? গন্ধ পেলাম ?

একটুখানি খেয়েছি, সামান্য।

থামে লটকানো ল্যাম্পের আলো এখন আরও কাছ থেকে মুখে পড়েছে। চোখ দেখে মনে হয় কীসের আলো কীসের রান্নাবান্না ঘরসংসার আর কীসের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সামান্য ওই মানুষটা ছাড়া তার কাছে কিছুরই অস্তিত্ব নেই।

আহত ব্যাকুলতার ভাবটা কেটে যায় কয়েক মুহূর্তে। কামড়ে ধরা ঠোঁটে একটু হাসিও ফোটে।

যাকগে, বেশ করেছ। ব্যাটাছেলে একটু-আধটু খেলে কী হয় ? আমি বুঝেছি বিপদটা ঘটেছিল বলে তো ?

আটচালাটার পিছনে কলাবাগান, ছোটো একটা পুকুর আছে। তারপরেই কেশবদের বাড়ি। বাগান দিয়ে পুকুরপার ঘুরেও যাওয়া যায়।

মায়া বলে, না। রাত করে ওদিক দিয়ে গিয়ে কাজ নেই। সদর দিয়ে ঘুরে যাও।

দালানের একটা ঘরে রঞ্জন পড়ছিল। গোবিন্দের সে বড়ো ছেলে, একুশ-বাইশবছর বয়স। সে বলে, চললে নাকি মামু ?

ঘুরে আসছি। কাণ্ড হয়েছে একটা, বলছি এসে।

গোবিন্দ পুজোর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়।

কীসের কাণ্ড কেশব ?

বয়স প্রায় ষাট হবে গোবিন্দের। চুল অধিকাংশ পেকে গেছে। দীর্ঘ দেহ, ফরসা রং পরনে পাটের কাপড়।

জামাকাপড় ছেড়ে এসে বলছি।

কেশবের বাড়িতে অনেক লোক। তার বিধবা মা, তিন ভাই, দুটি বোন, মেজোভায়ের বউ, তার দুটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে, একজন পিসি ও তার ছেলে।

একতলা বাড়িটা জীর্ণ হয়ে এলেও ছোটো ছোটো কুঠরি আছে অনেকগুলি। কেশব একা একখানা ঘর দখল করলেও ঘরের জন্য অসুবিধা হয় না। তবে কেশবের সেজোভাই প্রণব এবং পিসির ছেলে ভোলার বিয়ে হলে ঘরের টানাটানি পড়বে।

পিসি পারলে রাত পোহালেই ছেলের বিয়ে দেয়। কেশবের ভয়ে কিছু করতে পারে না। কে জানে কী বিবেচনা কেশবের। ব্যাটাছেলে তো রোজগার করবেই একদিন—চাকরি পেয়ে হোক ফিরিওলাগিরি কুলিগিরি করেই হোক। পাকাঘরে দুধ-ভাতে কিংবা ভাঙা কুঁড়েতে আধপেটা শাকভাত খেয়ে জীবন কাটবে মানুষ যার যেমন অদৃষ্টে আছে।

কিন্তু বয়স গেলেও যে বিয়ে করার সুখটাই নষ্ট হয়ে গেল জীবনে ? দুদিনের জন্য হলেও এই তো বয়েস বিয়ের আসল রস আর আনন্দ পাবার। জীবনটাই তো অস্থায়ী মানুষের।

কেশবের নিজের ফসকে গেছে কিনা, অন্যের জীবনে এ রস আর আনন্দের কোনো দাম তার কাছে নেই।

শহর থেকে এটা-ওটা আনার ফরমাশ ছিল দু-তিনজনের। বিমলা জিজ্ঞাসা করে, খালি হাতে এলি, পাটি আনিসনি তো ?

কেশব বলে, না। আমি বলে অ্যাকসিডেন্ট হয়ে মরছিলাম—

মাগো ! বলিস কী রে ? ভগবান দীনবন্ধু !

ফরমাশি জিনিস না আনা হয়ে থাকলে যারা অনুযোগ দেবার জন্য উদ্যত হয়েছিল তারা একেবারে চুপ করে যায়।

সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণ জানিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে কেশব পুকুরে গিয়ে স্নান করে আসে। তাড়াতাড়ি না যাওয়াই ভালো। গোবিন্দের আধডজন ছেলেমেয়েকে খেতে বসিয়েছে, ওরা খেয়ে না উঠলে মায়া এসে শুনতে পাবে না তার দুর্ঘটনার কাহিনি।

সে ফিরে যেতেই গোবিন্দ বলে, তুমি যে আমাদের ভাবিয়ে রেখে গেলে। হয়েছে কী ? এসো, বোসো।

দাওয়ায় মাদুর বিছানো হয়। কেশব বসতেই সকলে তাকে ঘিরে বসে। মায়া নিঃশব্দে গোবিন্দের পিছনে বসে, যেখান থেকে মুখ দেখা যায় কেশবের।

কেশবের দুর্ঘটনার কথা বলতে শুরু করলে ঘরের ভেতর থেকে অবলা ডেকে বলে, আরেকটু গলা চড়িয়ে বলো তো কেশব। তোরা কেউ টুঁ শব্দ করবিনে মেরে ফেলব।

মেরে ফেলবে ! ছেলেমেয়ে ঘরসংসার সবই অবশ্য অবলার। পক্ষাঘাতে অর্ধেকটা দেহ অবশ হয়ে সে আজ কয়েক বছর বিছানায় পড়ে আছে।

সে বিছানা নিয়েছিল বলে মায়া এসে জায়ের সংসার ঘাড়ে নেয়। অবলার রোগটা হয় মায়া এখানে আশ্রয় নিতে আসার কয়েক মাস পরে।

কেউ কেউ তখন বড়ো ভয়ানক ইঙ্গিত করেছিল। কবিরাজের মেয়ে, কত তুকতাক ওষুধপত্র জানে। অবলা উঠে চলে-ফিরে বেড়াতে পারলে তাকে দাসী হয়ে থাকতে হয় জায়ের। কে জানে অবলার রোগটা সে-ই ঘটিয়েছে কি না !

নইলে সুস্থ-সবল মানুষটা খায়-দায় হেঁটে বেড়ায় কাজকর্ম করে, এমন হঠাৎ কেন অর্ধেক অঙ্গ অবশ হয়ে যাবে ?

কিন্তু লোকে কানে তোলেনি সে ইঙ্গিত। অন্যকে কাঁদতে দেখলে যে না কেঁদে পারে না, নিজেকে ভুলে সকলের এমন প্রাণপাত সেবাযত্ন সে করে যায় দিনের পর দিন, সকলের জন্য যার বুকভরা দরদের শতশত পরিচয় নিত্যই পাওয়া যায়, নিজের স্বার্থে সে কখনও পক্ষাঘাত ঘটাতে পারে একটা মানুষের !

জোরে জোরে কেশব দুর্ঘটনার কাহিনি বলে যায়। বড়ো বড়ো চোখ মেলে তার মুখের দিকে চেয়ে মায়া যেন গিলতে থাকে তার কথাগুলি।

বাড়ি ফেরার সময় আরও যেন ওজন বেড়েছে মনে হয় সারাদিনের বিষাদ অবসাদ আর ভয়ের। এবার যেন কষ্ট হচ্ছে বেশি। রাত বেশি হয়নি। কিন্তু বোসপাড়ার ভিতরের দিকে এই গলি রাস্তায় লোক চলাচল কমে গেছে। নীড়ে নীড়ে জীবনকে গুটিয়ে নিয়েছে মানুষ।

গামছার বোঝা কাঁধে নিয়ে ফিরিওলা অধর সারাদিন পথে পথে ঘুরে বাড়ি ফিরছিল।

বলে, কেশববাবু মা-র একটা গামছা ফরমাশ ছিল।

মা-কেই দিয়ো।

দামটা ?

দাম মা-ই দেবে।

এদিকে খানিক তফাতে শেষ হয়েছে বৈদ্যুতিক এলাকাব সীমানা। শবতেব বেডিয়ো ক্ষীণভাবে শোনা যায়। গানেব কথাগুলি বোঝা যায় না কিন্তু সুব শুনে মনে পড়ে পবিচিত গানেব কথা—ললনাকে অনেকবাব গাইতে শুনেছে।

দক্ষিণ থেকে ভেসে আসছে সাধক ভুবনেশ্ববেব চড়া গলাব কালী সংগীতেব সুব। তাবও কথাগুলি ধবা যায় না কিন্তু সুব শুনে মনে পড়ে যায় শোনা গানেব জানা পদ।

বাড়ি গিয়ে কী কববে ? বই পড়া গল্প কবা সহ্য হবে না। ঘুম আজ বাতে আসবে কি না, কখন আসবে জানা নেই।

ক্ষোভে বুকটা জ্বালা কবে কেশবেব। কত বড়ো বড়ো ডাক্তাব কবিবাজ কলকাতা শহবে। পাড়াতেই আছে নগেন ডাক্তাব, সোমনাথ কবিবাজ, কতলোকেব চিকিৎসা কবছে। তাব কষ্ট দূব কবাব সাধ্য ওদেব নেই।

গিয়ে বললে ঘুমেব ওষুধ দেবে। বেশি মদ খেতে তাব ভয় কবে, ঘুমেব ওষুধ খেতে তাব আবও বেশি আতঙ্ক।

এ ভয় না কাটিয়ে তাকে ঘুমেব ওষুধ দেবাব কী মানে আছে ? এ যেন মুখ যাব সেলাই কবা তাকে অমৃতেব পাত্র দিয়ে পান কবতে বলা।

ধীবে ধীবে তাদেব বাড়ি ছাড়িয়ে কেশব এগিয়ে যায়।

ভুবনেশ্ববেব বাড়ি বলতে শুধু দুখানা ঘব। বছব পনেবো আগে বাড়িটা তৈবি হয়েছিল, আজ পর্যন্ত বাইবে ইটেব উপব আস্তব পড়েনি। ছাদে বেলিং নেই। ছাদে উঠবাব জন্য বাইবে সবু একটা আগলা কাঠেব সিঁড়ি বসানো আছে।

দুয়াব খুলে মোহিনী বলে, কেশব নাকি ? কী ভাগ্যি ! এসো এসো।

পাতলা একখানি শাড়ি আলগাভাবে গায়ে জড়ানো। এবাবও কেশবেব যেন চমক লাগে। কয়েক মুহূর্ত চোখ ফেবাতে পাবে না। তাব মনে পড়ে অজন্তাব নাবীমূর্তিব কথা।

আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে মোহিনী বলে, ভাবী গবম পড়েছে।

ভুবনদা ছাদে না ?

শুধু ভুবনদাব সঙ্গেই কথা কইতে আসা হয় বুঝি ? আমাকে পছন্দ হয় না ?

পছন্দ হয় বলেই তো ভয় কবে।

খোলা ছাদে গামছা পবে ভুবনেশ্বব বসেছিল।

এসো কেশব। ধোয়া ছাদ, বসে পড়ো।

গান থেমে গেল ভুবনদা ?

গান কখনও থামে বে পাগল ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে অবিবাম গান চলেছে। ওই গান শুনতে শুনতে কখনও শখ হয়, নিজে নিজেব গান একটু শুনি।

ও গান আমবা শুনতে পাই না কেন ?

কান পাতলেই শুনতে পাবে। কানেব বাইবেব দুয়াবটা বন্ধ কবে আগে তালা দেবে। হট্টগোলেব আওয়াজটা আগে বন্ধ কবতে হবে তো ? নইলে শত আওয়াজে গান ডুবে যাবে না ?

ভোগীব পক্ষে কি তা সম্ভব ?

খুব সম্ভব। ভোগ কবাব কাযদা জানলেই হল। আমিও তো ভোগ কবি। ভোগ কবি কিন্তু আমি কিছুই চাই না। বলে কিনা পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। আমি পুত্রও চাই না, পিণ্ডেব কামনা বাখি না।

কেশব ধাঁধায় পড়ে বলে, কী বকম হল ? ভোগ কবেন অথচ—

ভুবন হাসে।

ওটাই তো আসল কথা ভাই। ভোগ আমিই করি কিন্তু ভুলি না যে আমায় ভোগ করায় তাই ভোগ করি।

কেশব চুপচাপ ভাবে। মাথার উপরে তারা-ভরা আকাশ পুরানো হয় না কিন্তু চারিদিকে এলোমেলোভাবে ছড়ানো বাড়ি আর গাছপালার পৃথিবীটা যেন জীর্ণ পুরানো হয়ে গেছে।

আমার অসুখটা সারিয়ে দেবেন ভুবনদা ?

মোহিনী বলে অসুখ ? তোমার আবার কী অসুখ গো ?

মোহিনী কখন এসে সিঁড়ির মাথায় বসেছিল তারা টের পায়নি। কেশব বলে, সেটাই তো জানি না। মাথা ঘোরে, ঘুম হয় না, ভেতরে একটা অদ্ভুত যন্ত্রণাবোধ হয়—

মোহিনী বলে, বিয়ে থা করে সংসারী হও, সেরে যাবে।

ভুবন বলে, আমি বুঝেছি তোমার অসুখটা কী। তোমার রোগ হল অবিশ্বাস। এ রোগ সারাতে হলে তোমার নিজেকে ছোটো করতে হবে, বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। আমি সাহায্য করতে পারি।

মনে কিন্তু সাড়া জাগে না কেশবের।

অবিশ্বাস ? এক অজ্ঞাত দুর্জয় শক্তিতে অন্ধবিশ্বাসের অভাব ? কত অসংখ্য মানুষের এ বিশ্বাস ভেঙে গেছে। কই, তারা তো ভোগে না তার মতো রোগে ? হাসি আনন্দের অভাব তো নেই তাদের জীবনে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোনো বালাই নেই কানুর। সে তো দিব্যি আছে—খাটে, খায়-দায় আর ঘুমায়।

মা করুণ চোখে তার খাওয়া দেখতে দেখতে বলে, এই খেয়ে কী করে এত খাটিস তুই ? এই বয়সে তোর এই খাওয়া !

শরীরটা ভালো নেই।

আমারও মরণ নেই।

কিছুই করার নেই, খেয়ে উঠে কেশব শুয়ে পড়ে। গোবিন্দের বাড়ির দিকে তার ঘরের জানালা। জানালার পাশে চৌকিতে বিছানা পাতা। জানালার দিকে মুখ করে শুয়ে সে আকাশ-পাতাল ভাবে।

একে একে আলো নেভে এ বাড়ির ও বাড়ির। রাত বেড়ে চলে।

তখন আলো জ্বলে মায়ার ঘরে। জানালায় একটি লণ্ঠন বসানো আছে দেখা যায়। খানিক পরে নিভে যায় আলোটা।

মায়ার সংকেত। কিন্তু আজ যেন মায়ার ডাকেও সাড়া দেবার ক্ষমতা নেই কেশবের। কী হবে গিয়ে ? মায়া ওই এককথাই বলবে—যে কাজে এমন প্রাণের ভয় সে কাজ তুমি ছেড়ে দাও !

কেশব ওঠে না। খানিক পরে তাকে চমকিত অভিভূত করে মায়া এসে তার জানালা ঘেঁষে দাঁড়ায়।

ঘুমিয়েছ নাকি ?

হঠাৎ মমতার বন্যায় প্রাণটা যেন গলে যেতে চায় কেশবের। তার জন্য এও সম্ভব করতে পারে মায়া ? সন্ধ্যারাত্রে চালাঘরে একা রাঁধতে যার ভয় করে, ছেলেমেয়ে একজনকে পাহারা দরকার হয়, প্রায় মাঝরাত্রে সে এসেছে কলাবাগান আর পুকুরপারের অন্ধকার দিয়ে একা !

কী আশ্চর্য, তোমার ভয় করল না ?

করল না ? কী করব ? আজ আমার এত জরুরি কথা ছিল, আজকেই তুমি গেলে না।

শরীরটা ভালো নেই আজ। চলো তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

পাগল হয়েছ ? এত রাতে সঙ্গে যাবে, কারও যদি চোখে পড়ে ? একা হলে বলতে পারব ঘাটে এসেছিলাম।

এক মুহূর্ত ভেবে বলে, শরীর খারাপ, আজ তোমার গিয়ে কাজ নেই। আমায় কথা দাও কাল থেকে গাড়ি চালাতে যাবে না ? নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোই গে। কথা তোমাকে দিতেই হবে নইলে—

কাজ না করলে খাব কী ?

অন্য কাজ করবে।

কেশব সস্নেহে বলে, অন্য কাজ কি জানি ? আচ্ছা পাগলির পাল্লায় পড়েছি। শোনো, কাল আমি বেরোব কিন্তু গাড়ি চালাব না। গাড়িটা কাল মেরামত হবে। এখন শোও গে যাও, কাল কথা হবেখন। আচ্ছা একটু দাঁড়াও।

কেশব খিড়কির দরজা খুলে বাইরে গিয়ে বলে, তুমি একলাই যাও, আমি একটু এগিয়ে দিচ্ছি। ভয়-টয় পাবে শেষকালে।

তারপর বলে, ঘরে আসবে ?

মায়া বলে, না। দরজা খোলা রেখে এসেছি। জানাজানি হয়ে যাবে।

জানাজানি তো একদিন হতেই পারে। কী করবে তখন ?

কী আর করব ? তাড়িয়ে দিলে তুমি খাওয়াবে। না খাওয়াও ঝি খাটব, ভিক্ষে করব।

গাড়ি বার হবে না, ভোরে অনিমেষের বুড়ি মা-কে গঙ্গায় নিয়ে যাবার জরুরি তাগিদ নেই। কানু যাবে আটটার পর। আরও দেরি করে গেলে চলে। কিন্তু সারারাত ছটফট করে অভ্যাসমতো অন্ধকার থাকতে উঠে কেশব ঘাটে নাইতে যায়।

কর্মচঞ্চল কোলাহলমুখর শহর আবার তাকে টানছে। ভিতরে কী যেন চাপ দিচ্ছে তাড়াতাড়ি এই শান্ত ভাবালু পরিবেশ ছেড়ে লেভেল ক্রসিং-এর ওপারে পালিয়ে যায়। অনিমেষের রঙিন তকতকে বাড়ির লনের পাশে গ্যারেজের লাগাও তার পরিচ্ছন্ন ঘরটিতে গিয়ে না বসলে, বাড়ির ভিতর থেকে ললনার গানের সুর কানে না এলে তার স্বস্তি নেই। কিন্তু দিনান্তে আবার যে সে ক্রমে ক্রমে পাগল হয়ে উঠবে এখানে ফিরে আসতে ?

ঘাটে দাঁড়িয়ে গা মুছছে, মায়া একটা গেলাস হাতে নিয়ে এসে বলে, টাটকা দুধ, দুয়ে নিয়ে এলাম। একচুমুকে খেয়ে ফেলো। রোজ তোমাকে একগ্লাস দুধ খেতে হবে।

হঠাৎ দুধ কমে গেলে বাড়িতে কী বলবে ?

কত হিসেব রাখে সবাই। খানিকটা জল মিশিয়ে নেব।

তিন

নিয়মিতভাবে না হলেও পালা করে কমে বাড়ে—কেশবের অদ্ভুত রোগটা।

হয়তো বেশ ভালোই আছে ক-দিন। শরীর তাজা,মনে ফুর্তি, জোর করে ঘুম ঠেকিয়ে মায়ার সংকেতের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করা, জীবনটা ধন্য মনে করা যে এই রুক্ষ কঠোর স্বার্থপর হৃদয়হীন জগতে মায়ার এমন ভালোবাসা পেয়েছে, এমনভাবে সে ভালোবাসতে পেরেছে মায়াকে।

স্বপ্নের মতো করেই ভাবে কী কারণে যেন শেষ হয়ে যায় সুস্থ সুন্দর দিনগুলি। আসে নিদারুণ দুঃস্বপ্নের পালা।

মাথা ঘোরে। বুকের মধ্যে টিপটিপ করে হঠাৎ ধরাস করে ওঠে বুকটা। এলোমেলো খিদে পায়, কখনও অসহ্য চনচনে খিদে, কখনও একেবারেই খিদের অভাব। হজম হয় না। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে, বারবার জল খেলেও ভেজে না। ঢোঁক গিলতে কষ্ট হয়।

ঘুম আসে না।

আর ওই অজানা আতঙ্কের মতো কী যেন চেপে ধবে রাখে প্রাণটাকে।

জীবনটা মনে হয় যন্ত্র। মায়ার ভালোবাসাকে মনে হয় যান্ত্রিক। কিছুই নেই তার এই প্রেমে। দরদ করা তার স্বভাব, পাঁচজনকে যেমন আপনা থেকে স্নেহ করে, তাকেও তেমন আপনা থেকে ভালোবাসে।

ডাক্তার তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করেছে দেহের যন্ত্র এবং উপাদান সব কিছু। কোনো খুঁত মেলেনি।

কেন তবে এমন হয় ?

যখন ভালো থাকে নতুন কিছুই তো ঘটে না যে বলা যাবে যে সে জন্য সব উলটোপালটা হয়ে গেল।

দিনরাত্রি ক-টা ভালো কেটেছে। অন্ধকাব থাকতে উঠে দেহমনে সুখ আর স্বস্তি নিয়ে কাজে যাচ্ছে।

ঠিক তেমনই আরও একটা দিন এবং রাত্রি কাটল।

তারপর ভোরে ঘুম ভেঙেই মনে হল দেহমনে স্বস্তি নেই।

শুরু হল দুঃখের দিন।

মায়া বলে, তাব এই অসুখের জন্যই গোড়ায় নাকি তাব খুব মমতা হত, প্রাণ কাঁদত। ইচ্ছা হত, আদর-যত্ন দিয়ে সেবা করে তার অসুখ সারিয়ে দেয়, রাতে ঘুম না এলে শিশুব মতো তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

সেই ভাবটাই তারপর অন্য রকম হয়ে গেছে।

তুমি যদি আমার সত্যিকারের স্বামী হতে, সবসময় খোলাখুলিভাবে তোমার সেবা করতে পারতাম—

অসুখ সারিয়ে দিতে ?

এক মাসও লাগত না। তোমার অসুখ আর কিছুই নয়। তুমি ভাবী মায়াবী মানুষ। সংসারে কারও কাছে মায়া-মমতা পাওনি বলে তোমার এ রকম হয়েছে। এত খাটবে পয়সা আনবে খাঁটি একটু দরদ পাবে না—এটাই তোমাব সয না।

কেন, মা—?

তোমার মা ? আমি জানি সব। তোমার চেয়ে তোমার ভায়েব জন্য মা-র দবদ বেশি। তুমি কাঠখোট্টা মানুষ, মোটর চালাও, স্নেহ দিয়ে তুমি করবে কী !

স্নেহের কাঙাল বলে ? কঠিন বাস্তব নিয়ে তার জীবন কিন্তু ভিতরে তার স্নেহ-মমতার জন্য আকণ্ঠ পিপাসা।—এ পিপাসা মেটেনি বলে তার দেহমন বিগড়ে গেছে ?

কিন্তু কই, সে তো টের পায়নি এই মারাত্মক তৃষ্ণা। বরং নিজের ঘরে পরের ঘরে যে স্নেহ-মমতার ছড়াছড়ি দেখেছে তাকে মনে হয়েছে কুৎসিত ন্যাকামি। এ স্নেহ এ মমতা উথলায় নিছক বাস্তব দেনাপাওনার নিরিখে। মা বলো, বউ বলো, ভাইবোন-বন্ধু বলো, যতটুকু প্রতিদান পাবে বা পাওয়ার আশা রাখবে ঠিক ততটুকুই দরদ দেবে প্রতিদানে।

প্রথম বয়সে বুকটা জ্বালা করত। কিন্তু সে ছেলেমানুষি ক্ষোভ মিটে গেছে বহুদিন আগেই। এটাই যখন নিয়ম সংসারের এ জন্য আপশোশ করার তো কিছুই নেই। স্বামী ছাড়া গতি নেই বলে, একদিন স্বামীর কপাল ফিরবে আশা করা ছাড়া উপায় নেই বলে, সীতা-সাবিত্রী-শৈব্যারা যদি চরম দুঃখবরণ করে থাকে তাতে তো এরা ছোটো হয়ে যায় না।

জীবন যখন যেমন তখন তার তেমনই রীতিনীতি। এই রীতিনীতি ঠিকমতো ধরতে পারা, আগামী সুখের দিনের জন্য দুঃখের দিনের তপস্যা বরণ করা, এ তো সহজ কথা নয়, তুচ্ছ কথা নয়।

ক-জন এটা পারে ?

না, পরীক্ষা পাস করেও চাকবি জোটাতে পারেনি বলে, রোজগার করতে না পেরেও সকলের কাছে চোর বনে থাকতে রাজি হয়নি বলে, সবাব স্নেহ-মায়া কেন বিষিয়ে গিয়েছিল সে জন্য তার কোনো নালিশ নেই। যে মা তখন খেতে বসলে অবজ্ঞার সঙ্গে থালায় ভাত তরকারি ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেতে দিত, এক পয়সা রোজগার না কবে পাঁচজনের অন্ন ধ্বংস করার অনুযোগ দিত, সেই মা আজ খাওযাব সময় সামনে বসে কম খাওয়ার জন্য কাঁদো কাঁদো হয়ে অনুযোগ দেয় বলে তার এতটুকু দুঃখ বা জ্বালা হয় না।

এটাই নিয়ম স্নেহ-মমতার। মা তার সাধারণ নিয়মের বাইরে গিয়ে অনিয়মকে ববণ করার শিক্ষাদীক্ষা পাযনি সেটা কার দোষ ? মায়ের নিশ্চয় নয় !

অবাধ্য দুরন্ত শিশুকেও মা শাসন করে। পাস করে চাকরি করে পয়সা আনাব বয়স হলেও ছেলে রোজগার না করে ঘবেব ভাত খেলে মা বিতৃষ্ণা দেখাবে না ? সে অধিকার তার পুরোমাত্রায় আছে।

সেই ছেলে আবার মোটরগাড়ি চালিয়ে হোক, আর চুরিডাকাতি করে হোক রোজগাব করে এনে সংসারে দিলে তাকে স্নেহ জানাবাব অধিকারও মা-র পুরোমাত্রায় আছে।

মায়ার কথার কোনো মানে হয় না। স্নেহ-মমতা পাওয়া না পাওযা নিয়ে তার কোনো নালিশ নেই !

স্নেহের অভাবে কারও এ রকম অসুখ হয় !

কবে শুরু হয়েছিল অসুখ ? কীসে এর সূত্রপাত ?

তন্নতন্ন করে নিজের অতীত জীবন খুঁজে কেশব এ প্রশ্নের জবাব পায় না। মনে হয় এ যেন তাব জন্মগত বিকার, সাবাজীবনে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে।

বয়স বাড়াব সঙ্গে ক্রমে ক্রমে প্রকট হয়েছে লক্ষণগুলি। ধীরে ধীরে তাব জীবনের গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। নিজের বড়ো হওয়াটা যেমন খেযালে আসেনি বড়ো হওয়াব আগে, অসুখের বাড়টাও তেমনই খেয়াল করেনি লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট হওয়ার আগে।

আজ যে ভোঁতা কষ্টকব ঝিম-ধবা ঘুম ঠেকিয়ে বাখে এটাই হয়তো ছিল আগেকাব দিনের সেই রাত জেগে ব্যর্থতা আব হারমানাব হিসাব কষতে কষতে লজ্জা আব গ্লানিবোধ করা। আজ যে আতঙ্কের জন্য ঘুমেব ওষুধ খেতে পাবে না, একদিন এটাই হয়তো ছিল তার অন্ধকারের ভয়।

যাই হোক, মোট কথা এই যে তাব জীবন আব এই অসুখ একসাথে গাঁথা।

এ জীবনে তার রেহাই নেই।

ললনা খুব মিশুক।

ব্যাপকভাবে সামাজিক মেলামেশাটা বাড়ির সকলেরই ধর্ম, একমাত্র অনিমেষের বুড়ি মা ছাড়া। কেবল ছুটির দিন নয়, অন্যান্য দিনেও প্রায়ই সন্ধ্যার পর সকলে আত্মীয়বন্ধুর বাড়ি যায়।

শনিবারের বৈঠকটা এক বিশেষ ব্যাপার, অনেক লোক সমাগম হয়। শনিবার ছাড়াও লোকজন আসে।

হয় বাড়িতে নয় বাইরে আত্মীয়বন্ধুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হাসিগল্প প্রায় একদিনও বাদ যায় না।

গোড়ায় কেশব ভেবেছিল যে ঘনিষ্ঠ মানুষ ও পরিবারের বুঝি সীমা সংখ্যা নেই এদের। তারপর অল্প দিনেই সে টের পেয়েছে যে শিক্ষিত অভিজাত সমাজের বহু লোকের সঙ্গেই হয়তো জানাশোনা আছে কিন্তু ঘনিষ্ঠতার সীমানাটা সংকীর্ণ। কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিবার ও কয়েকজন বিশেষ মানুষের সঙ্গেই এদের নিয়মিত মেলামেশার আদান-প্রদান চলে।

ললনার মেলামেশার সীমানা আরও বিস্তৃত। ভালো গান জানে বলে সর্বত্রই তার আদর ও কদর বেশি। লোকের বাড়িতে ও বাইরে নানা উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানে তাকে নেওয়ার জন্য সর্বদাই টানাটানি চলে।

তাছাড়া, তার বন্ধু এবং বান্ধবীর সংখ্যাও প্রচুর। তার কারণটা বোধ হয় এই যে বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু বা বান্ধবী তার একজনও নেই !

অনেকের সঙ্গে সাধারণভাবে মিলতে মিশতে সে যেন এত ব্যস্ত যে বিশেষভাবে কারও সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ হবার সময় বা সুযোগ পায় না।

তার সখাও নেই, সখিও নেই।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ললনাকে নিতে গাড়ি আসে। গানের খাতিরে তার এই দাবি সাগ্রহে মেনে নেওয়া হয়। ঘরের গাড়ি চড়ে আসরে বৈঠকে সভায় সম্মেলনে গান গেয়ে গেয়ে বেড়ালে চলবে কেন। পেট্রল-খরচের হিসাবটাও তো খেয়াল রাখতে হবে।

মাঝে মাঝে অবশ্য গানের আসরে নিয়ে যাবার জন্য কেশবকেও গাড়ি বার করতে হয়।

সব সময় সকলকে তো আর গাড়ি পাঠাতে বলা যায় না। ড্রয়িংরুমে প্রবেশাধিকার না থাক, গাড়িতে তো ড্রাইভারকে কাছে রেখেই দিনের পর দিন চালাতে হয় নানাজনের সঙ্গে হাসিগল্প আলাপ-আলোচনার পালা। কার সঙ্গে ভাব বেশি কার সঙ্গে কম সেটাও গোপন রাখা যায় না ড্রাইভারের কাছে।

কেশব টের পায়, হাসিখুশি মিশুক বটে ললনা কিন্তু সকলের জন্যই ঘনিষ্ঠতার একটা স্পষ্ট সীমা সে টেনে দিয়েছে, সে সীমা পেরিয়ে নিজেও কখনও এগোয় না, অন্যকেও এগোতে দেয় না।

নরেশকে পর্যন্ত নয়। অথচ প্রথম দিকে তার ধারণা হয়েছিল, নরেশের সঙ্গে বুঝি ললনার খুব ভাব, হয়তো বা প্রেমেরই কাছাকাছি !

এতবার কেউ বাড়িতে আসে না। এত বেশিবার আর কারও সঙ্গে ললনা একা গাড়িতে চাপে না।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে কেশব জেনেছে, ঘনিষ্ঠতা চায় কেবল নরেশ, ললনা নয়।

নরেশ একটা ওষুধের কারখানায় বেশ ভালো মাইনেতেই চাকরি করে।

সেদিন ললনাকে মনে হচ্ছিল খুব শ্রান্ত। মুখটা বিবর্ণ দেখাচ্ছিল।

মন্দ্রার জন্মদিনের উৎসবে গিয়ে ললনা তাকে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করতে বলে। আধঘণ্টার মধ্যে সে বাড়ি ফিরে যাবে।

ঘণ্টাখানেক পরে নরেশের সঙ্গে সে এসে গাড়িতে ওঠে। তেমনি ক্লান্ত বিবর্ণ দেখালেও হাসিখুশি ভাবটা সে যেন জোর করে বজায় রেখেছে।

কেশব শোনে কী কথার জের টেনে ললনা বলছে, দশজন সুস্থ মানুষেব সঙ্গে না মিশলে আমার দম আটকে আসে।

আমি কি অসুস্থ মানুষ ? আমার সঙ্গে একটু বেড়ালে দোষ কী ?

এই তো বেড়াচ্ছি। আপনাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আমি বাড়ি যাব। বন্ধুর বাড়ি উৎসব চলছে, বাড়িতে জরুরি কাজ না থাকলে চলে আসি ?

কী কাজ ?

আছে একটা ঘরোয়া ব্যাপার।

কেশব টের পায়, নরেশ আহত হয়ে চুপ করে গেল।

ললনা বলে, আপনি তো খুব বড়ো কেমিস্ট। বাতাসে অক্সিজেনের পার্সেন্টেজ আরও বেশি হল না কেন বলতে পারেন ? অক্সিজেন আমাদের এত দরকারি !

চট করে আড়চোখে কেশব নরেশের মুখ দেখে নেয়। একটু বিষণ্ণ হাসি ফুটেছে নরেশের মুখে।

যাক, তবু জানা গেল তোমার মায়া আছে। মনে কষ্ট দিয়ে অন্তত ছেলে-ভুলানোর চেষ্টাও করো।

কিন্তু সত্যিই কি ছেলে-ভুলানো প্রশ্ন করেছিল ললনা ?

পরদিন আপিস-কলেজ যাবার বেলায় নিমাই এসে জানায়, ললনা কলেজ যাবে না। ডাক্তারকে ফোন করা হয়েছে।

ইস্ ! কী রকম যে করছে শ্বাস টানার জন্য। দেখলে এমন কষ্ট হয়।

কেশব বলে, রাতে ডাক্তার এসেছিল শুনলাম ?

সে তো পেটব্যথার জন্য। এখন আবার হাঁপানি উঠেছে।

প্রতিমাসে ললনা খুব ব্যথা ভোগ করে এটাই জানা ছিল কেশবের। এ সময় তার যে আবার হাঁপানিও হয় আজ সেটা প্রথম জানতে পারে।

বোসপাড়াতেই তিনজন হাঁপানি রোগীকে সে চেনে, তারা সবাই পুরুষ। তার পিসেরও এই রোগ ছিল। পিসে মরবার পর পিসির মাথায় কেমন একটু গোলমাল দেখা দিয়েছে। মাঝে মাঝে সে এমন ভাব করে যেন হাঁপানির আক্রমণ হয়েছে—খুব শ্বাসকষ্ট।

ডাক্তার দেখিয়ে জানা যায় রোগটা তার মানসিক।

অনেকক্ষণ ইতস্তত করে কেশব বাড়ির ভিতরে যায়। উপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে অনিমেষ বিরস মুখে সিগারেট টানছিল।

কেশব বলে, একটা কথা বলছিলাম আপনাকে। আমার পিসেমশায়ের হাঁপানি ছিল। তিনি একটা খুব সোজা প্রক্রিয়া করতেন, তাতে উপকার হত দেখেছি।

ডাক্তার এসে ইনজেকশন দেবে।

আমি বলছিলাম কী, প্রক্রিয়াটা খুব সোজা, করে দেখলে কোনো ক্ষতি নেই। তিনগাছা চুল গোড়াসুদ্ধ তুলে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া—শুধু এইটুকু। অনেক সময় পিসেমশায় আশ্চর্য ফল পেতেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে শ্বাসটানার কষ্ট কমে যেত।

অনিমেষ খানিকক্ষণ নীরবে চেয়ে থাকে।

তারপর বলে, না, আমার যাই মনে হোক, করে দেখলে কোনো ক্ষতি নেই। অ্যাজমাতে কী জানো অনেকখানি নিওরোটিক ব্যাপার আছে। একটা মেন্টাল এফেক্ট হয়তো হয়। তুমিই বরং বলো লীনাকে। তোমার পিসেমশাই উপকার পেতেন এ কথাটায় জোর দিয়ো বুঝলে ?

ললনার মুখ দেখে, একটু বাতাসের জন্য তার, প্রাণান্তকর কষ্ট দেখে কেশবের নিজের দেহ-মনের সমস্ত অস্বস্তি আর কষ্টবোধ যেন মিলিয়ে যায়।

তার কথা শুনে ললনা হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, করে দেখি কী হয়। আমাকেই চুল তুলতে হবে ?

না, অন্যে তুললেও চলবে। আপনার সামনে চুল আগুনে পুড়িয়ে দিতে হবে।

আপনিই তুলে পোড়ান।

একটু বাতাসের জন্য প্রাণান্তকর যাতনায় ললনার তখন অন্য সব বোধশক্তি চাপা পড়ে গেছে, কেশব একটু সংকোচের সঙ্গেই তার মাথা থেকে তিনগাছা চুল তুলে নেয়। চুল তিনটি দলা পাকিয়ে এক টুকরো কাগজ জ্বালিয়ে তার মধ্যে ফেলে দেয়।

কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় ললনা এতটুকু আরামও পায় না। কেশবের পিসের মতো গভীর কুসংস্কারের জোরালো অন্ধবিশ্বাস সে কোথায় পাবে।

ডাক্তারকে এসে ইনজেকশন দিতে হয়।

কিছুকাল থেকে আরেকজন ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করছে ললনার সঙ্গে।

তার অভিযানটা শুরু হয়েছে হঠাৎ।

বঙ্কিম আজ মস্ত লোক, তার অনেক ক্ষমতা অনেক প্রতিপত্তি। অনিমেষের চাকরির সঙ্গে সোজাসুজি তার সংযোগ নেই কিন্তু চাকরির কলকাঠি যাদের হাতে তাদের সঙ্গে তার বেশ খানিকটা একধরনের বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক আছে।

চোরাকারবারি মুনাফার একটা যে অংশ ক্ষমতার পূজায় লাগে সে তার ভাগ পায়।

নরেশের মতো ললনার পিছনে প্রতি সম্মেলনে আসবে, বৈঠকে বা সভায় ঘুরবার মতো তার সময় নেই। সে একাই বাড়িতে আসে।

এবং বেশ টের পাওয়া যায় যে তার পদার্পণ ঘটলে বাড়ির সকলে একটু তটস্থ হয়ে ওঠে। একটু অস্বস্তিও বোধ করে।

যতই অর্থ আর প্রতিপত্তি থাক, বয়স গিয়েছে পঞ্চাশের দিকে।

ললনার সঙ্গে একেবারেই মানাবে না। তাছাড়া বউ করে কোনো মেয়েকে গলায় ঝুলোবাব ইচ্ছা তার আছে কি না সেটাও যথেষ্ট সন্দেহের বিষয়।

তবে এটাও অবশ্য ঠিক যে বয়স হলে মানুষের মতিগতির যে বদলও হয সংসারে অনেকবার তা দেখা গিয়েছে।

নইলে বিশেষ সভা-সম্মেলনে বিশেষ সম্মানিত অতিথি হিসাবে ছাড়া কোথাও যাওযার সময় তার হয় না বটে কিন্তু নিজেব বাড়িতে আজকাল সে মাঝে মাঝে সাংস্কৃতিক বৈঠক বসায়। এবং দেখা যায় এ সব ক্ষেত্রে টাকা বা নিজেকে জাহির করার বড়োবাজারি চিরপরিচয যে দিতে নেই এটা সে ভালোরকমভাবেই জানে। গরিব শিল্পী সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক অধ্যাপকদের সে মার্জিতভাবেই সম্মান করে।

তবে একটু গা বাঁচিয়ে করে। কে জানে কে কবে কী অনুগ্রহ চাইতে আসবে ঐই পবিচয়েব সুযোগে।

আগেও ললনাকে সে দেখেছে কিন্তু চোখে লাগেনি। ললনার রূপটা যদি হত মোহিনীব মতো তাহলে হয়তো প্রথম দর্শনেই সে ঢের বেশি পাগল হয়ে উঠত।

ঘটনাচক্রে ললনার গান শুনে সে মুগ্ধ হয়ে গেছে।

কাব্যের ছোঁয়াচ লাগে সব মানুষেরই। প্রাণের গভীরতায় যা কিছু আলোড়ন তোলে যৌবনে হয়তো সে সব তার প্রাণেও সাড়া জাগাত। হয়তো বিশেষভাবে গান শুনেই তার প্রাণটা ব্যাকুল হত বেশি। সিনেমা জগতে রূপসি গায়িকার অবশ্য অভাব নেই। কারও রূপে আর গানে মুগ্ধ হলে সামাজিকভাবে তাকে তোয়াজ করার দরকারও হয় না। কিন্তু সে তো ব্যাবসাদারি সস্তা গান। সে গান শুনে শুধু মজাই লাগে। অত কায়দা ললনা জানে না কিন্তু প্রাণ দিয়ে গান গেয়ে সে মানুষেব প্রাণকে ব্যাকুল করতে পারে।

উদ্যোগী পুরুষ, ব্যস্ত মানুষ। ললনার হৃদয় জয় করতে তার এক অশোভন তাড়াহুড়ো দেখা যায়।

বোকাহাবা তো নয়। তার টাকা আর প্রভাব-প্রতিপত্তিই আসল কথা এটা সে জানে। একজন সাধারণ তরুণ যে ধৈর্য আর অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রিয়ার বিমুখী মনটা নিজের দিকে ফেরাবার তপস্যা করবে সেভাবে অগ্রসর হয়ে তার কোনো লাভ নেই।

ওভাবে কোনো মেয়ের মন জয় করার আশা সে রাখে না। মন তাকে কিনতেই হবে। তবে এই মনটা তো আর ঝনাত করে টাকা ফেলে কিংবা সুযোগ-সুবিধা বাগিয়ে দেবার কথা দিয়ে কেনা যাবে না।

একটু সামাজিক তোড়জোড়ও দরকার।

দিনে তিন চারবার ফোন করে। যখন তখন আসে। দু-চারমিনিট গল্প করে।

বলে, একটা গান শোনাও না?

অন্য কেউ হলে ললনা হয়তো বলত, এখন তো গাইতে পারব না।

কিন্তু বঙ্কিম শুনতে চাইলে অসময়েও গান শোনাতে হয়। বাবার দিকটা খেয়াল রাখতে হয় তাকে। বঙ্কিমের অনেক ক্ষমতা।

সিনেমা দেখাতে নিয়ে যায়। বঙ্কিম দুটো বিশেষ সম্মানজনক নিমন্ত্রণের পাশ পায়। সঙ্গে যাবার জন্য ললনাকে নিমন্ত্রণ জানায়।

মাঝেমধ্যে শুধু বন্ধুর সঙ্গে ছাড়া কারও সঙ্গে ললনা সিনেমা যায় না। কিন্তু বঙ্কিমের কথা আলাদা।

মা বলে, তুই যে এভাবে সিনেমায় যাচ্ছিস, সবাই তো দেখছে?

কেশবের সামনেই বলে। তৈরি হয়ে সে যখন গাড়িতে উঠতে যাবে।

বঙ্কিম অবশ্য তার গাড়ি পাঠাতে চায়। ললনা বারণ করে।

মায়ের অনুযোগের জবাবে ললনা বলে, কী করব বলো? বাবাকে বললাম, বাবা বললে সিনেমায় যেতে দোষ কী?

আমায় তো একদিন নিয়ে যায় না। যার তার সঙ্গে তোর যেতে যদি দোষ নেই, আমায় একদিন নিয়ে যেতে কী দোষ?

যাবে আমার সঙ্গে? এসো না মা, লক্ষ্মী মেয়ে। ভাবী উপকার হবে আমার।

না বাছা। উনি কী ভেবে কী করছেন জানি নে। না বলে কয়ে হুট করে তোমার সঙ্গে যাই কী করে?

কেশব ভাবে, মাও ভয় করে বাড়ির কর্তাকে। মেয়েও তোষামোদ করে বাপের মুরুব্বিকে। শুধু তার জগতের মা আর মেয়েরা যে রকমভাবে করে এদের রকম-সকমটা তার চেয়ে খানিকটা আলাদা।

শুধু ললনার জন্যই বঙ্কিম সাময়িকভাবে কিছুদিনের জন্য নিজে বাড়িতে মাসে দুটো-তিনটে সাংস্কৃতিক বৈঠক ডাকছে এটা মোটামুটি জানাজানি হয়ে গেছে সংশ্লিষ্ট মহলে। কিন্তু ললনাকে কেউ দোষ দেয়নি তার নিন্দাও করেনি।

এইভাবেই তো জগৎ চলে। ভদ্র-অভদ্র কত গান জানা মেয়ে বঙ্কিমকে গান শুনিয়ে একটু খুশি করতে পারলে বর্তে যেত।

ওরা কেউ ধারেকাছে ঘেঁষতে পারত না বঙ্কিমের। কতভাবে কত রকম চেষ্টা করেও তাকে টানা যায়নি।

ললনা যদি তাকে দিয়ে তার নিজের বাড়িতে সকলকে ডেকে বৈঠক বসাবার ব্যবস্থা করে থাকতে পারে তাকে বাহাদুর মেয়ে বলতে হবে।

কেশব শুনছে কি শুনছে না কেয়ার না করে বেশ বলে, তোমাকে দিয়ে কয়েকজন চালাক মানুষ নিজেদের কাজ বাগিয়ে নিতে চাইছে বুঝতে পারছ না? আসলে এরা বঙ্কিমের স্তাবক হতে চায়, তাই এভাবে তোমার প্রশংসা করে। সত্যিকারের সংস্কৃতিচর্চা যারা করে তারা কি ওর বাড়ি যায়? যে কজন তোমার খাতিরে যায়, তারা ওভাবে ওই লোকটার সামনে তোমার প্রশংসা করে? বোঝো না?

বুঝি বইকী। আমি সব বুঝি। আপনি যে এ কথাগুলি কেন বললেন তার মানেও বুঝি।

বলে দোষ করলাম?

না ! বলে প্রমাণ দিলেন যে আপনার বিদেশি বিদ্যাবুদ্ধি আপনাকে গ্রাস করেনি।

বিদ্যাবুদ্ধির দেশ-বিদেশ আছে নাকি ?

এটা যে জানে তার কাছে নেই। না জানলেই আছে !

বঙ্কিম সেদিন বিশেষভাবে ললনাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। তার বাড়িতে সন্ধ্যার সময় আসর বসবে, ললনার যাওয়া চাই।

একটু দেরি হবে আমার। একটা কাজ সেবে যাব।

তা হোক। দেবি হলে আপত্তি নেই। কিন্তু ললনার যাওয়া চাই।

আসলে ললনার কাজ কিছুই ছিল না। আগে গেলে বেশিক্ষণ থাকতে হবে তাই দেবি করে যাওয়া।

সে অনিমেষকে বলে, তুমিও চলো না বাবা ?

অনিমেষ বলে, না। আমার কাজ আছে।

প্রায় সাড়ে সাতটার সময় ললনাকে নিয়ে কেশব বঙ্কিমের বাড়ির সামনে পৌঁছায়। বাইবে থেকে দেখে মনে হয না ভিতরে অনেক লোকের আসব বসেছে। উপরেব এক ঘরে রেডিযো বাজছে শোনা যায়।

ললনা ভিতরে গিয়ে ফিরে আসে পাঁচ-সাতমিনিটের মধ্যে।

থমথম করছে মুখ, ঠোঁট ফুলে উঠেছে, চোখে বিদ্যুতের ঝলক।

কেশব মনে মনে বলে, অ !

ধীরপদেই ললনা গাড়িতে ওঠে, শান্তভাবেই বলে, বাড়ি চলুন।

অনিমেষ বাইরের ঘরেই ছিল। বাড়িতে পা দিয়েই ললনা বলে, বাবা, এখুনি বঙ্কিমবাবুকে ফোন করে দাও তো আর যেন কখনও আমাদের বাড়িতে না আসে।

কেন ?

ছল করে খালি বাড়িতে ডেকে নিয়ে আমায় অপমান করেছে। মুখে অপমান করলে তোমায় জানাতাম না। এমন অসভ্য মানুষ হয় ? চলে আসব, কিছুতে হাত ছাড়বে না। আমাকে শেষে হাতে কামড়ে দিতে হল।

একটু থেমে খানিকটা খুশির সুরে ললনা যোগ দেয়, একেবারে রক্ত বাব করে দিয়েছি।

অনিমেষ নীরবে ফোনের কাছে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নেয়।

চার

সেদিন বাড়ি ফিরতে প্রণব খুব রাগের সঙ্গে অনুযোগ দিয়ে বলে, তুমি কি দাদা এমনি উদাসীন হয়ে থাকবে ? সংসারের দিকে একটু ফিরেও তাকাবে না ? সব ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে আমাকেই ? বিয়ে করে আমিই ঝকমারি করেছি নাকি ?

এমনিতে প্রণব খুব শান্ত এবং নিরীহ। ছোটোখাটো রোগা মানুষটার চেহারায় একটু রুগ্ণ রুগ্ণ ভাব। পোস্টাপিসে চাকরি করে।

আচার-নিয়ম যা শিথিল হবার হয়ে গেছে। কিন্তু সে মাছ-মাংস খায় না। নিয়মিতভাবে সন্ধ্যা আহ্নিক করে।

কেশব বলে, হল কী? আমাকে কী করতে বলছ? আমি ভোরে বেরিয়ে এত রাতে বাড়ি ফিরি, সংসারের দিকে তাকাব কখন? আসলে আমার তো ওখানেই থাকার কথা।

তাই বলে কোনো দায়িত্ব নেবে না সংসারের?

রাত্রে ওরা যদি আমায় ছুটি না দিতেন? তোমরা ধরে নাও না কেন আমি বিদেশে চাকরি করতে গেছি! লোকে কি চাকরি ফেলে সংসারের ঝঞ্ঝাট পোয়াতে আসে?

আসে না? বিয়ে পইতে রোগ-ব্যারামে দরকার হলেও চাকরি নিয়ে পড়ে থাকে?

কেশব শান্তভাবে বলে, সে হল আলাদা কথা। আমি ভাবলাম তুমি সংসারের খুঁটিনাটি দরকারের কথা বলছ।

প্রণব গোমড়া মুখে বলে, ছোটোখাটো ব্যাপারে তুমি তাকাবে না জানি। নিজের বোনের বিয়ের ব্যাপারে তো একটু নজর দিতে হয়। না সেটাও খুঁটিনাটি ব্যাপার তোমার কাছে?

মিনুর বিয়ে? আমায় তো কিছুই বলিসনি তোরা। আজ আচমকা ঝগড়া শুরু করলি।

প্রণব একলা কোমর বাঁধেনি। দলবল নিয়ে প্রস্তুত হয়েইছিল।

বিধবা সুমতি বলে, কোনো বিষয়ে গা করো না, তোমায় বলতেই যে ভয় করে দাদা।

মা বলে, কী ধুমসো হয়েছে মেয়েটা তোর চোখেও কি পড়ে না? তোর বাপ বেঁচে থাকলে রাতে ঘুম হত না, মুখে অন্ন রুচত না।

পিসির মেয়ে দুর্গা বলে, সত্যি, মামা বেঁচে নেই, তুমিই তো কর্তা সংসারের, তোমারই দায়িত্ব সব। একটা কেলেঙ্কারি হলে লোকে তোমাকেই ছিছি করবে, বলবে অমুকের বোন এই করেছে।

অসহায়ের মতোই চারিদিকে তাকাচ্ছিল কেশব। সে ভাবটা তার কেটে যায়। সে বুঝতে পারে গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে নইলে সবাই মিলে তাকে এভাবে আক্রমণ করত না। ছেলেমেয়েগুলি পর্যন্ত ভিড় করে এসে কিছু না বুঝেও ব্যাপারটার গুরুত্ব অনুভব করে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রণবের বউ আদরিনীর এই এতখানি ঘোমটা। ঘোমটা তারই জন্য—সে ভাসুর। বিয়ের দু-বছরের মধ্যে দুটি ছেলেমেয়ে হয়েছে, অন্য সকলের কাছে লজ্জা কমাবার অধিকার পেয়েছে কিন্তু ভাসুরের কথা আলাদা। ঘাটে গিয়ে প্রায় উলঙ্গ হয়ে গা ধোয়, স্নান করে—চারিদিকে কত চোখ, গ্রাহ্যও করে না।

কিন্তু ভাসুরের কাছে ঘোমটা টেনে জড়সড় হয়ে থাকা চাই।

সে একা নয়, আরও অনেক মেয়েবউয়ের মতোই খোলা ঘাটে নির্বিবাদে তিনহাতি গামছায় কাজ চালিয়ে ঘরে দশহাত ঘোমটা টানে বলেই কেশবের গা-জ্বালা করে না। আর পাঁচজনের সঙ্গে সমান তালে চললে তো দোষ দেওয়া যায় না মানুষকে।

মিনু ছাড়া বাড়ির সকলে প্রায় ছেঁকে ধরেছে তাকে, বাচ্চাকাচ্চারা পর্যন্ত। জামাকাপড় ছেড়ে স্নান করে খোলা উঠানে জলচৌকিটা পেতে বসে একটা বিড়ি ধরিয়ে সে সবে ভাবতে শুরু করেছিল ডাল আর ডালনা দিয়ে রুটি খাবে না শুধু একটা ডিম সিদ্ধ করে দিতে বলবে।

হঠাৎ এই আক্রমণ।

বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে সে গম্ভীর আওয়াজে হুকুম দেয়, ভোলা আমায় এক ছিলুম তামাক দে।

তার ভাবান্তর দেখে সকলে ভড়কে গিয়ে চুপ করে থাকে।

মস্ত উঠোন। চারিদিকে ঘিরে আছে চুনবালি-খসা ঘরগুলি। এই উঠানে চোদ্দো সালের যুদ্ধের পর চার বছর প্রতিমা এনে দুর্গাপূজা হয়েছিল, প্রতিমা আনা-নেওয়ার জন্য দরজা ভেঙে বসানো হয়েছিল কাঠের বড়ো গেট।

আজ সেই গেটের বদলে বসানো হয়েছে আলকাতরার পিচে কাটা টিনের তৈরি ঝাঁপ।

খড়ো ঘরের শরৎ যেমন একবারে যুদ্ধে ফেঁপে গিয়ে দালান তুলে দোকান দিয়েছে, আগের যুদ্ধে তার বাবাও কীভাবে যেন কিছু টাকা বাগিয়েছিল।

ভোলা এসে বলে, তামাক যে শুকিয়ে খটখটে হয়ে আছে মামা ?

ঘোমটার আড়াল থেকে আদরিনী ফিসফিস করে বলে, আঃ মরণ, দু-ফোঁটা জল দিয়ে মাখতে পারলি না ? আয় তামাক সেজে আনি।

প্রণব প্রশ্ন করে, ভাবছ কী ?

ভাবছি, মিনুর বিয়ে কি তোমরা ঠিক করেছ ? কী করেছ না করেছ আমায় বলবে তো ?

আমরা করিনি কিছু। তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে হবে, তাই বলছিলাম।

কেশব বলে বুঝেছি, একটু ভাবতে দাও।

সর্বাত্মক পারিবারিক আক্রমণের মানে সে এখন বুঝেছে। এটা আক্রমণ নয়, এইভাবে তার শরণাপন্ন হওয়া। নিজেরা কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না, সাহস পাচ্ছে না নিজেদের দায়িত্বে কিছু করে বসতে, তাই তাকে চেপে ধরেছে মুশকিল আসান করার জন্য।

তামাক টিকে হুঁকো কল্কি সবই বাড়িতে থাকে কিন্তু কেশব তামাক খায় কদাচিৎ।

মিনিট দুয়ের মধ্যে নতুন জল-ভরা হুঁকো হাতে ঘোমটার ফাঁক থেকে কল্কিতে ফুঁ দিতে দিতে আদরিনী এসে যায়। হুঁকোর মাথায় কল্কিটা বসিয়ে ভোলার হাতে দিয়ে চাপা গলায় বলে, হুঁকো হাতে দিয়ে পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করবি, বুঝলি ?

প্রণব গর্বের সঙ্গে বউয়ের দিকে তাকায়।

কী যে ধীরস্থির বনে গেছে কেশব। কে বলবে তার দেহমনে অস্থিরতাব পীড়ন চলে।

হুঁকোয় টান দেয়। একটু জল ফেলে ঠিক করে নিয়ে আবার টান দিয়ে একটু আরামের কাশি কাশে।

বলে, কী ব্যাপার হয়েছে আমি শুনতে চাই। মিনু কোথা গেল ? মিনুকে ডেকে আনো।

প্রণব তাড়াতাড়ি বলে, না না, মিনুকে ডাকা ঠিক হবে না।

কেশব জোর দিয়ে হুকুমের সুরে বলে, মিনুকে ডাকতে হবে। বেচারা হয়তো কোনো দোষ করেনি, তোমরা বানিয়ে বানিয়ে ওকে মিথ্যে দোষী করেছ। আগে মিনু আসবে, তারপর আমি তোমাদের কথা শুনব।

মিনুকে ডাকতে হয় না, সে নিজেই এগিয়ে আসে। উঠানের এককোনায় একটা গোলাকার থাম দাঁড়িয়ে আছে। একক এই থামটি কী উদ্দেশ্যে গাঁথা হয়েছিল কেউ জানে না।

হয়তো বৃহৎ কোনো পরিকল্পনা ছিল। থামটা অর্ধেক গেঁথেই যা শেষ হয়ে গিয়েছিল।

থামের আড়ালে বসে মিনু অতক্ষণ শুনছিল সকলের কথাবার্তা।

কেশবের কথা শুনে সে থামের আড়াল ঘুচিয়ে ধীরপদে এসে কেশবের পায়ের কাছে বসে।

আমায় ডাকছিলে দাদা ?

হ্যাঁ, ডেকেছি।

ধুমসো মেয়ে ?

মিনু সত্যই বেড়েছে দুর্ভিক্ষের দেশের নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে। অথবা দুর্ভিক্ষের দেশেই এটা ঘটে ? আবোল-তাবোল খেয়ে খিদের জ্বালা মেটাবার ফলে গড়ন বাড়লেও প্রক্রিয়াটা অস্বাভাবিক হয়ে যাওয়ার ফলে ?

নিরীহ প্রণব হঠাৎ ঝেঁঝে বলে, তুমি তবে ওর কথাই শুনবে ?

হুঁকোয় টান দিয়ে কেশব বলে, মোটেই না। তোমরা তো কথাই বলছ না, খালি প্যানপ্যান করছ। এতক্ষণে বলতে পারলে না ব্যাপারটা কী হয়েছে। ওর কাছেই তবে শুনি।

বললাম তো ওর বিয়ের ব্যবস্থা করা চাই।

ও কী করেছে জানতে চাই আমি।

মা বলে, তবে আর কাজ কী কথায়, চ যাই গে আমরা।

বাপ বহুদিন স্বর্গে গেছে, বিশেষ মুহূর্তে সে যেমন কবত তেমনিভাবে হুঁকোটা আছড়ে ফেলে কেশব বলে, মিনু কী কবেছে না করেছে বলে তবে যাবে। পষ্টাপষ্টি সব না বলে তোমরা যদি যাও, এ মাসের মধ্যে জলের দরে আমি বাড়ি বেচে দেব। আমার থাকাব ভাবনা নেই।

তোমার একার নাকি বাড়ি ?

আমি বেচতে পারি—তুমি অর্ধেক টাকা পাবে।

ঘোমটা ফাঁক করে আদরিনী ফিসফিস করে বলে, কী যন্তনা, এত কথা না বাড়িয়ে জানিয়ে দিলেই ফুরিয়ে যায়। তোমরা তো আর দোষ কবনি।

মা বলে, মারধোর করিস নে যেন শুনে। আমার হয়েছে সব দিকে জ্বালা।

সুমতি বলে, মেয়ে করেছে কী শুনবে ? দুপুরবেলা বেবিয়ে গেছে কাউকে কিছু না বলে। সন্ধ্যাবেলা ফিরেছে। কোথা গিয়েছিলি ? না, বেড়াতে গিয়েছিলাম, বেশ করেছি, রোজ যাব। উলটো চোপা আমাদের ওপব।

মিনু নিজে থেকে বলে, বেড়াতেই তো গিয়েছিলাম। জমিয়ে জমিয়ে দেড়টাকা করেছি, চান্দিক একটু ঘুরে দেখে এলাম। তোমরা খালি বলবে, কার সাথে গিয়েছিলি, কোথা গিয়েছিলি।

কেশব বলে, বলে গেলি না কেন ?

হুঁ, কত যেতে দিত বললে।

তোমার একলা যাওযা উচিত হয়নি।

কেন বকুল যায় না ?

এ একটা মোক্ষম যুক্তি বটে মিনুর। এই সেদিন পর্যন্ত বিপিনদের সঙ্গে অবস্থা চালচলন সবদিক দিয়ে তারা সমান ছিল, গলায় গলায় ভাব ছিল আবাব কথায় কথায় কলহ-বিবাদ ছিল দু-পুরুষের প্রতিবেশী পরিবার দুটির মধ্যে। এমনকী বাড়ি দুটি পর্যন্ত গাঁথা হযেছিল একধাঁচে। তফাত যেটুকু ছিল সেটুকু আগে গণনার মধ্যেও আসেনি। সেটা হল একজন বিশেষ মানুষের সঙ্গে কী একসূত্রে বিপিনদের একটু আত্মীয়তা থাকা এবং এ রকম কোনো মানুষেব সঙ্গে কেশবদের কোনো রকম সম্পর্ক না থাকা।

ওই মানুষটা মন্ত্রী হবার পর তফাতটা খুব বড়ো হযে উঠেছে।

ভেঙেচুরে নতুন রকম হয়েছে বাড়িটার চেহারা, সেকেন্ড-হ্যান্ড একটা গাড়ি কেনা হয়েছে, একেবারে বদলে গেছে বাড়ির সকলের চালচলন।

তাদের মতো প্রায় পাড়াটুকুব মধ্যেই ছিল সমস্ত পবিবাবটির দিবারাত্রির জীবনযাত্রা, পুরুষেবা শুধু শহরে যেত পয়সার ধান্ধায়।

ভাসাভাসাভাবে ছাড়া আজকাল ওদের . ন সময়ই হয় না পাড়ার লোকের সঙ্গে মেলামেশার—এ বাড়ির সঙ্গেও নয়। মেলামেশা চেনা-পরিচয়ের নতুন ছড়ানো জগৎ তৈরি হয়ে গেছে। বড়োলোক মেয়েপুরুষ কত মানুষ আসে যায়, এ বাড়ির মেযেরাও পালটা দেখা-সাক্ষাতের পাট বজায় রাখতে সর্বদাই বেরোয়।

সেই প্রয়োজনে একেবারে বদল হয়ে গেছে তাদের অভ্যস্ত ঘরকন্নার পালা।

প্রণব বলে, ওদের কথা আলাদা। ওদের অবস্থার সঙ্গে আমাদের তুলনা হয় যে বকুলের কথা বলছিস ?

সুমতি বলে, যাদের যেমন চালচলন। বকুল যা করে মানায়, বাড়ির সবার চালচলনের সঙ্গে খাপ খায়। তুই হলি গরিব গেরস্তঘরের মেয়ে—

বাইরে বেরোতে হলে বড়োলোক হতে হয় নাকি ? গরিবের মেয়েরা বেরোয় না ?

মিনুর মন্তব্যে সুমতি চটে বলে, সে তারা বেরোয় যাদের অভ্যাস আছে, সে রকম শিক্ষা আছে। তুই তো বেরিয়েছিলি বজ্জাতি করতে।

মিনু সোজাসুজি কেশবের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, ঘোষদের জমিতে ওই যে হোগলার চালা তুলেছিল, ঘর ভেঙে ওদের তাড়িয়ে দিয়েছে। সকাল থেকে আমগাছতলায় বসেছিল। একটির সঙ্গে আমার ভাব হয়েছে। দুপুরবেলা ওরা চলে গেল, কোথায় যায় দেখতে সঙ্গে গিয়েছিলাম।

ফিসফিসানি বজায় রেখেও গলা চড়িয়ে আদরিনী বলে, মিছে কথা বলছ কেন ঠাকুরঝি ? ও বাড়ির শচীনের সঙ্গে তুমি ফিরেছ, সবাই দেখেছে।

মিনু কিছুমাত্র দমে না গিয়ে বলে, ফিরেছিই তো, সবাই দেখেছেই তো। রিকশা করে আসছিল আমায় হাঁটতে দেখে রিকশায় তুলে এনেছে। বজ্জাতি করতে গেলে কি সবাইকে দেখিয়ে ওর সাথে ফিরতাম ? কেউ টেরও পেতে না তাহলে। তোমাদের বাঁকা মন, খারাপটা ছাড়া তোমরা ভাবতে পারো না।

একটু থেমে মিনু আবার বলে, ওই তো ওরা ঘুরে ঘুরে কোথাও ঠাঁই পেল না, শেষকালে স্টেশনে গিয়ে উঠল। কাল আবার ঠাঁই খুঁজতে বেরোবে। গেরস্তঘরের কত মেয়ে বউ ভিক্ষে করছে দেখে এলাম। আমি আর ভয় করিনে তোমাদের। তাড়িয়ে দিলে দেবে, ভিক্ষে করে গতর খাটিয়ে খাব। যে সুখেই রেখেছ !

মিনুর শেষ কথাটা কানে যেন বিঁধে যায় কেশবের।

মায়াও একদিন বলেছিল, কী সুখেই রেখেছে ! এতলোকের সংসার, এতগুলি বাচ্চাকাচ্চা, একটা ঝি পর্যন্ত রাখবে না। খাটতে খাটতে হাড়কালি হয়ে গেল।

তবু মায়ার কেন এত দরদ সবার জন্য, এমন শান্ত মধুর ব্যবহার ? তার কাছে যাই বলুক, মিনুর মতো মুখ খুলে একটু নালিশ কেন সে জানাতে পারে না ? তার স্নেহ মমতায় ফাঁকি নেই। কিন্তু স্নেহ-মমতা একটু কম করলে কী আসত যেত ?

মিনুকে নিয়ে আলোচনা সে রাত্রে সেখানেই শেষ হয়। কেশবকে দু একদিন ভেবে চিন্তে দেখতে হবে, সে সকলকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে মিনুর কাণ্ড নিয়ে কেউ যেন আর হইচই না করে। মিনুও যেন এ রকম না বলে কয়ে বাড়ি ছেড়ে যায় না।

পয়সা নেই, আর যাব কী করে ? দু চারটে পয়সা জমলে তবে তো।

মিনুর সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। ছেলে খুঁজে বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। মিনুও তাই চায়। আর সমস্ত বিষয়ে চলবে এক রকম নিয়ম, শুধু তার বিয়ের বেলা হবে নিয়মভঙ্গ, এতবড়ো ধেড়ে মেয়ে সে কুমারী হয়ে থাকবে। লোকে যা-তা ভাববে, যা তা বলবে। এটা সইছে না মিনুর।

তার কাছে লজ্জাকর গ্লানিকর হয়ে উঠেছে এই অনিয়ম।

বিছানায় শুয়ে কেশব মায়ার দরদের মানেটা বুঝবার চেষ্টা করে। সংসার অন্যের, তাকে খাটাচ্ছে দাসীর মতো। তবু সেই সংসারের সকলের জন্য তার বুক-ভরা স্নেহ কেন ? এতটা নরম না হয়ে একটু শক্ত হলে, প্রাণ দিয়ে এত বেশি খাটতে অস্বীকার করলে যে অন্যায় অবিচার খানিকটা কম হয়, এটাও কি জানা নেই মায়ার ?

তাকে ছাড়া চলবে না গোবিন্দের সংসার। জোরের সঙ্গে বললে একটা ঝিয়ের ব্যবস্থা না করে দিয়ে সে যাবে কোথায় ?

তবু মায়া নালিশ করে না, বিরক্ত হয় না, মুখ বুজে খাটে আর স্নেহ করে।

এটাই তার স্বভাব বলে ? যে যন্ত্রের যে কাজ সে যন্ত্রকে যেমন তাই করতে হয়। তেমনি স্নেহ না করে পারে না বলেই মায়া স্নেহ করে ?

আজ একটু খটকা লেগেছে কেশবের মনে।

এও তো হতে পারে যে নিজের প্রয়োজনেই সবার জন্য মায়ার স্নেহ ? সংসারের ভার নিয়ে বাচ্চাকাচ্চা রুগণা জায়ের দায়িত্ব নিয়ে খাটতে তাকে হবেই। পর যদি সে ভাবে সকলকে, মমতা যদি তার না থাকে সবার জন্য, সে দায়িত্ব হয়ে উঠবে নীরস বোঝা বওয়া, খাটুনি হয়ে দাড়াবে দাসীর কষ্টকর খেটে মরা।

যাদের জন্য বুক ভরা দরদ তাদের জন্য খেটে মরার সুখ আর গর্ববোধটা জুটবে না।

তার জন্য মায়ার সীমাহীন ব্যাকুল ভালোবাসার মানেও কি তবে তাই ?

এ রকম দেহমন প্রাণ দিয়ে ভালো না বাসলে তাদের সম্পর্কটা হয়ে যাবে অন্যায়, একটা পাপ ?

সংসারের সাধারণ নিয়মে সাধারণ হিসাবে তাদের ঘনিষ্ঠতা অনুচিত বলেই এমন অসাধারণ প্রেম মায়ার দরকার হয়েছে ন্যায় অন্যায় উচিত অনুচিতের উর্ধ্বে উঠে সে হিসাবটা বাতিল করার জন্য ?

তার জন্য অনেকদিন নরক ভোগের প্রশ্নটাকে তুচ্ছ করে দেবার জন্য ?

পাঁচ

কানু মিস্ত্রির বিয়ে ভেঙে গেছে।

ভেঙে দিয়েছে সে নিজে।

কেন, সংসার করার ইচ্ছা নেই তার ?

আছে না ? কিন্তু মনটা বড়ো বিগড়ে গেল। একটা ছুড়িকে পছন্দ করে এত সহজে হার মানব ? ক দিন ধরে কী ছটফটানি গেছে কী বলব মাইরি তোকে। মুখে ভাত রোচে না, রাতে ঘুম হয় না, ভিতরটা জ্বালা পোড়া করে।

কেশব হা করে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

কানু বলে যায়, কেবলি মনে হয় ভারী অন্যায় কাজ করতে যাচ্ছি। মানুষের বাচ্চার তো এটা উচিত নয়। যা চাইব না পেলে অমনি হাত গুটিয়ে নেব, যেমন তেমন একটা পেলেই খুশি থাকব, তবে আর বাঁচা কেন ? চেষ্টা তো করে দেখতে হয়। ওর বাপটাকে শুধু মাঝে মাঝে বলেছি, বাস। জবরদস্ত চেষ্টা তো করিনি।

মস্ত একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কানু।

হয় হবে না হয় না হবে, আমি তো বেঁচেছি বাবা, মনটা ঠিক করে। রাতে ঘুম হচ্ছে আবার।

কেশব জিজ্ঞাসা করে, ভাব আছে তোদের ?

ভাব ? পিরিত ? ও সব আমার আসে না ভাই। কাঠখোট্টা মিস্ত্রির, খাটি, ও সব রস পাব কোথা ? মাঝেমধ্যে মা র কাছে আসে, দেখা হয়, দুটো কথা হয়, বাস।

কানু একটু হেসে মাথা দুলিয়ে যোগ দেয়, তবে বেলা জানে ওকে আমার খুব পছন্দ।

মা কী বলল ?

মা চটেমটে মামার কাছে চলে গেছে। দুদিন বাদে রাগ পড়লে আবার আসবে।

কানু একবার উঠে পড়ে লাগবে, প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখবে বেলাকে নিয়েই যদি সংসার করার সাধটা মেটানো যায়।

সে যদি জানত কী করলে তার অসুখটা সারানো যায় ! সেও একবার উঠে পড়ে লাগত, জীবনপণ করে চেষ্টা করে দেখত।

ললনার চিকিৎসা করে অজয় ডাক্তার। রোগের আক্রমণ ঘটে ললনা বিছানা নিলে তখন সে তাকে দেখে এসেছে বরাবর, কখনও তার গান শোনেনি।

ঘটনাচক্রে অনিমেষের এক বন্ধুর বাড়িতে কান দিয়ে তার গান শুনে এবং চোখ দিয়ে তাকে গাইতে দেখে সে একটা বড়ো ভয়ংকর ব্যবস্থা দিয়েছে।

কিছুকাল ললনাকে গান গাওয়া একেবারে বন্ধ রাখতে হবে।

গান গাইতে ফুসফুসে চাপ পড়ে বলে নয়, গান সে বড়ো বেশি মন দিয়ে বড়ো বেশি আবেগের সঙ্গে গায় বলে। হাঁপানি নাকি এক হিসাবে বড়োই বেখাপ্পা রোগ। চেঞ্জে গিয়ে অনেকের রোগ তো সারেই, এক জায়গাতে শুধু বাড়িবদল করেই নাকি কারও কারও অসুখ ভালো হয়ে যেতে দেখা গেছে।

গান বন্ধ থাক। ললনার স্নায়ুমণ্ডলী বিশ্রাম পাক। দেখা যাক কী ফল হয়।

আর খুব বেড়াক। শহর থেকে দূরে গিয়ে রোজ গাঁয়ের হাওয়া খেয়ে আসুক।

উৎসব বৈঠক সভাসমিতি আর এত বেশি লোকের সঙ্গে মেলামেশার চাপ থেকেও তার স্নায়ুমণ্ডলী রেহাই পাক।

আপনি যে উলটো কথা বলছেন ডাক্তারবাবু ? দশজনের সঙ্গে মিলেমিশেই যে আমার মনটা ভালো থাকে ?

নইলে মনটা খারাপ থাকে তো ? মনটা যাতে কিছুতেই খারাপ না হয় চেষ্টা করে দেখা যাক। এমনিতে মনটা ভালো থাকলে দশজনের সঙ্গে মিশতে মিশতে আরও ভালো লাগবে।

ললনা তবু খুঁতখুঁত করে, গান বন্ধ, মেলামেশা বন্ধ—

অনিমেষ বলে, কয়েক মাসের ব্যাপার তো। অসুখটা যদি সেরেই যায় ?

তাই হোক, আরোগ্যের আশায় দেখাই যাক একটা কঠিন পরীক্ষা করে।

ললনাকে গান শেখায় ভূদেব।

সে শুনে বলে আর একটি নতুন গান তোমায় শিখতে হবে, গাইতে হবে। তারপর তুমি ছুটি নিয়ো। বেশ কিছুদিন ধরে পরীক্ষা করছি সুরটা নিয়ে। বিদেশি সুর কতখানি খাঁটি রেখে কত কম দেশি সুর মিশিয়ে দিলে লোকে নিতে পারে ?

সত্যি ? নিশ্চয় শিখব। এটা না শিখে কখনও গান বন্ধ করতে পারি ?

কেশবের কাজ বাড়ে। ললনাকে রোজ গাঁয়ের দিকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া।

তবে কিছুদিন থেকে মাইনেটা সে বাড়িয়ে নেবার কথা ভাবছিল। এই সুযোগে সেটা আদায় করে নেয়।

তার বাড়ির দিকের রাস্তা দিয়েও গাঁয়ে যাওয়া যায়। বোসপাড়া ছাড়িয়ে এগোতে থাকলে তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যেতে থাকে শহরতলির শেষ চিহ্নগুলি, পাওয়া যায় খেত মাঠ বাঁশঝাড় কাঁচাঘরের খাঁটি গ্রাম।

এদিকে কলকারখানা এক রকম নেই বলা চলে। রাস্তাটা খুব খারাপ। শহরের যে সব দিকে শিল্প গড়ে উঠেছে অনেক বেশি দূর এগিয়ে গেলেও সে সব দিকে শহরতলির লক্ষণবিহীন গাঁ যেন চোখেই পড়তে চায় না।

সেদিন ললনাকে বোসপাড়া পেরিয়ে ওই গাঁয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, একটু ফাঁকা জায়গায় পথের ধারে একটা শিরীষ গাছের তলায় দাঁড় করানো গাড়িতে সে দেখতে পায় কানু আর বেলাকে।

পাশাপাশি বসে কথায় দুজনে একেবারে মশগুল !

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে সেও গাড়ি দাঁড় করায়।

ললনা নামতে নামতে বলে, আপনার বাড়ি এইখানে নাকি ? এতদূর ?

আট-দশদিন গান ও ছুটোছুটি বন্ধ রাখায় ললনার মুখের চেহারা গলার আওয়াজ বদলে গেছে।

একদিন যাব আপনাদের বাড়ি। আপনি রোজ কেন বাড়ি ফেরেন দেখে আসব। হঠাৎ গেলে বাড়ির মেয়েরা মুশকিলে পড়বেন, নইলে আজকেই যেতাম।

ললনার কৌতূহলটা যে কত প্রচণ্ড কেশব তা টের পায়। কিন্তু মাইনে করা ড্রাইভারের কাছে কৌতূহলটা একটু চেপেই রাখতে হয়। সিনেমায় বড়োলোক অভিজাত ঘরের মেয়ে এভাবে একা ড্রাইভারের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে গেলেই তার প্রেমে হাবুডুবু খায়। কিন্তু বাস্তব জগতের মেয়েরা অত বোকাও নয়, সস্তাও নয়।

মাইনে করা ড্রাইভারও মানুষ। তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা, ভদ্রঘরের ছেলে বলে তাকে আপনি বলা এক জিনিস। মানুষ বলেই তার প্রেমে পড়তে হলে বড়ো বিপদের কথা হয় !

তবে মাইনে করা ড্রাইভার যদি মহাপুরুষ হয় সেটা আলাদা কথা। মোটরগাড়ির মালিকের মেয়েকে প্রেমের টানে পাগলিনি করার জন্য কজন মহামানুষ মানুষকে এগিয়ে নেবার গুরুদায়িত্ব আর কর্তব্য বাতিল করে মাইনে করা ড্রাইভার হয়েছে সেটা অবশ্য গবেষণার ব্যাপার।

খেয়াল ? নতুনত্বের পিপাসা ? বিকার ? একটা মোটরগাড়ির মালিকের মেয়ে হয়েও ওই ঘরবাড়ির মতো নিজেকে পুরুষের সম্পত্তি বলে জানার ফলে দিশেহারা হয়ে প্রতিহিংসা নেওয়া ?

স্বাধীনতার সুগার কোটিং করা দাসীপনায় তিক্ত জীবনে মুক্তি খোঁজার সন্ত্রাসবাদ ?

কিন্তু তাকে প্রেম বলা কেন ! প্রেম তো বিকার নয়, খেয়াল নয়, স্বার্থপরতা নয়।

শুধু নারীপুরুষেই তো প্রেম হয় না ! মানুষের জাতটাকে বাদ দিয়ে কোথায় তারা প্রেম করবে ?

শুধু রাধা শুধু কৃষ্ণের মধ্যে পর্যন্ত প্রেম হয় না। তাদের প্রেমকে রূপ দেয় নিয়ন্ত্রিত করে মানুষের প্রেমের জগৎ। কত কবি হাজার হাজার বছর ধরে আঁকড়ে ধরেছে শুধু নায়ককে আর নায়িকাকে, সার করেছে তাদের প্রেমটুকুকে—তবু মানুষের প্রেমের জগৎকে বাদ দিতে পারেনি। চুরি করে এনে চুপিচুপি রং চড়িয়ে ওই জগতের মালমশলা দিয়ে তাকে গাঁথতে হয়েছে ছাঁকা প্রেমের বাঁকা দালান।

ললনা কি এ সব ভাবে ? ভাবে বইকী। স্পষ্টই সে অনুভব করে জীবনকে সুন্দর করার অজুহাতে বাস্তব জগৎ ও জীবন থেকে কত কৃত্রিমতার আড়াল তৈরি করে তবেই তার ভদ্র আর মার্জিত জীবন সম্ভব হয়েছে। কী মূল্য তাদের দিতে হয় এ জন্য সে টের পেতে আরম্ভ করেছে আজকাল।

ছাঁকা মনুষ্যত্বকে ভালোবাসার ফাঁকি অভ্যাস হয়ে যাওয়ায় মানুষকে সে ভালোবাসতে পারে না !

সূর্য পশ্চিমে হেলেছে। গুমোটে গাছের পাতাটি নড়ে না। পথে লোক চলাচল বেড়ে গেছে কুড়ি-বাইশজন নানাবয়সের চাষি মেয়েবউ দল বেঁধে এসে মাঠে নেমে কোনাকুনি গাঁয়ের দিকে এগিয়ে যায়। তাদের রুক্ষ চুল, শুকনো মুখ, পরনে ছেঁড়া মলিন কাপড়।

হয়তো পেটের জন্য খাটতে গিয়েছিল নয়তো কাজ অথবা খাদ্যের সন্ধানে গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরছে।

জিজ্ঞাসা করে জেনে নিল না কেন ?

চাষি মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ললনা হঠাৎ বলে, আমি একটু গ্রাম থেকে ঘুরে আসছি।

একা যাবেন ?

কী হবে একা গেলে ?

গাড়ি আর আপনাকে সেফলি ফিরিয়ে নিয়ে যাবার দায় আমার। কোনো বিপদ হলে আপনার বাবা আমাকে পুলিশে দেবেন।

গ্রামে আবার বিপদ কী ?

ললনা মাঠে নেমে যায়।

মাঠটুকু পেরিয়ে ললনা গাছপালা ঘরবাড়ির আড়ালে চলে গেছে, কানুর গাড়িটা কাছে এসে থামে।

বেলা সলজ্জভাবে হেসে বলে, আপনি যে এখানে কেশবদা ?

বাবুর মেয়ে বেড়াতে এসেছেন।

কানু বলে, আমিও আরেক বাবুর মেয়েকে বেড়াতে এনেছি।

গাড়ি কার ?

কারখানার গাড়ি। মেরামতের পর টেস্ট করতে বেরিয়েছি। একটা ভাওতা দিয়েছি, দশ বারো মাইল খুব স্পিডে চালিয়ে দেখতে হবে।

কেশব সংশয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে বাড়ি থেকে বেলাকে আসতে দিল ?

কানু হাসে। তাই কী দেয় ? আগে বলা ছিল, রাস্তায় গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করব।

বেলা অনুযোগ দিয়ে বলে, একটু গাড়ি চড়াবার জন্যে আধমাইল হাঁটিয়েছে —ফিরবার সময় আবার হাঁটাতে হবে।

কানু বলে, আমার দোষ নাকি ? তোমারই তো ভয়, পাড়ার কাছে হলে চেনা লোক দেখতে পাবে। আমি তো বলছি দেখতে পাক না চেনা লোক— ভালোই হবে। বাড়িতে নয় বকাবকি করবে গায়ে তো ফোসকা পড়বে না ? টের তো পাবে যে কানু মিস্ত্রি ছাড়া মেয়ের গতি নেই।

মিনুর বাড়টা অস্বাভাবিক, বেলা খুব রোগা। মুখের ছাঁচ তেমন সুশ্রী নয়, কিন্তু দেখেই টের পাওয়া যায় খুব চালাক-চতুর মেয়ে।

বেলাও বাইরে বেড়াতে বেরিয়েছে বাড়িতে কিছু না জানিয়ে, সেদিন মিনুও বেরিয়েছিল। কত তফাত দুজনের অকাজের রকমে।

মিনু বেরিয়েছিল ভাবাবেগের তাড়নায়, মরিয়া হয়ে। জানুক সবাই বুঝুক সবাই যে তাকে আর তুচ্ছ করা চলবে না। একটি ছেলের খোঁজ মিলেছে, কথাবার্তা চলছে। তাতেই মিনুকে শান্ত আর সুখী দেখাচ্ছে আশ্চর্য রকম।

বেলা বেরিয়েছে হিসাব করে সাবধান হয়ে। কেউ যাতে জানতে না পারে, গণ্ডগোল না হয়। কেশব জানে তবুও এটা শখের বেড়ানো নয়, কানুর সঙ্গে মোটর বিহারটাই আসল কথা নয়।

দুজনের মশগুল হয়ে কথা বলার ধরনটা একনজর দেখেই সে এটা টের পেয়েছিল।

পাশে এসে পড়লে তবেই তার গাড়ির আওয়াজটা ওদের কানে গিয়েছিল, মুখ তুলে তাকিয়েছিল।

এমনি সুযোগ সুবিধা নেই, ওরা তাই একটু পরামর্শ করতে বেরিয়েছে। বুদ্ধিটা কানুর হতে পারে কিন্তু বেলার কাছেও পরামর্শটাই আসল কথা।

কানুর গাড়ি ফিরে যায়। কেশব একটু ঈর্ষাবোধ করে। কানুর যেমন কোনো বিষয়ে দোমনা ভাব নেই, মনটা একবার ঠিক করে নিতে পারলেই হল —বেলারও তেমনি কোনো বিষয়ে ন্যাকামি নেই হাবামি নেই।

যদি বিয়ে হয়, দুজনে মিলবে ভালো।

একটা বিড়ি ধরিয়ে কেশব ভাবে, গরিব সংসারে দুঃখকষ্ট পেয়ে বেলাও বড়ো হয়েছে, মিনুও বড়ো হয়েছে, বিদ্যাও প্রায় একই রকম দুজনের পেটে, কীসে এতখানি তফাত হল দুজনের প্রকৃতিতে? কানুর সঙ্গে তার পার্থক্যের মানে আছে। সে রোগা, কানু সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ।

কিন্তু বেলা আর মিনু কেন দুরকম হল?

কারণটা কি বংশগত? শুধু রক্তের স্রোতের জন্য? কিন্তু বেলার বাবা অজিতদের চেয়ে তাদের বংশই তো উঁচু।

অথবা কারণটা এই যে অনেকটা ভালো অবস্থা থেকে তারা নীচে পড়েছে কিন্তু অজিতদের চিরদিনই সমান দুরবস্থা? যেমনই হোক ঠাকুর্দার আমলের একটা বাড়ি আজও তাদের আছে কিন্তু অজিতরা চিরদিন পরের ঘরের ভাড়াটে। কঠোর বাস্তবতার সঙ্গে তাদের বাড়ির মানুষের চেয়ে অজিতের পরিবারটির সম্পর্ক অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে ললনা ফিরে আসে।

বলে, কলেরা বসন্ত লেগেছে খুব। রক্ষাকালীর পুজো হবে চাঁদা চেয়ে নিল। রোগ-ব্যারামের এমন ছড়াছড়ি বোধ হয় জগতে কোথাও নেই।

এবার যেন কাটতেই চায় না অসুস্থ অবস্থাটা। এবার তো তার কয়েক দিনের জন্য একটু ভালো থাকার পালা।

অসুখটা কি বেড়ে গেল? আরও দীর্ঘ হল কষ্টভোগের সময়?

তবে একটা সান্ত্বনা এই যে এবার যেন লক্ষণগুলির উগ্রতা খানিকটা কম। আগের চেয়ে দু-একঘণ্টা বেশি ঘুম হচ্ছে, কিছু খেতেও পারছে।

আগের বারের মতো শ্রান্ত দুর্বল হয়ে যায়নি শরীরটা, ভোঁতা হয়ে যায়নি চিন্তা আর অনুভূতি।

মায়ার উপরে পর্যন্ত বিতৃষ্ণা জন্মে যায়। এবার মায়ার জন্য ব্যাকুলতা কমে গেলেও বিরাগের ভাবটা আসেনি।

তার গাড়ি চালানো বন্ধ করতে কয়েক দিন মায়া পাগল হয়ে উঠেছিল, কী কারণে সে হঠাৎ চুপ করে গেছে। বোধ হয় টের পেয়েছে যে এই অসম্ভব আবদার করে লাভ নেই।

তার বদলে সে ধরেছে অন্য আবদার।

তোমার চেহারা দেখলে কান্না পায়। ঠিকমতো সেবাযত্ন হচ্ছে না তোমার।

কী করা যায়!

একটা ঘর ভাড়া নাও। তুমি আমি থাকব।

তাতে আর লাভ কী হবে বলো? সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত বাইরেই কাটবে।

অন্ধকারে মায়ার মুখ দেখা যায় না। তার মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে সে বলে, দ্যাখো অ্যাদ্দিন বলিনি তোমায়। আমার জন্যেই আরও তোমার শরীর খারাপ হচ্ছে। কখন সবাই ঘুমোবে, কখন আমি তোমায় ডাকব এর একটা উৎকণ্ঠা আছে তো? এ রকম চোরের মতো আসা যাওয়ারও তো একটা উদ্‌বেগ আছে? কোথায় সকাল সকাল ঘুমোবে, আমার জন্যই তোমার রাত জাগতে হয়।

রাত এমনি জাগতে হয়। ঘুম এলে তো ' মার?

আমি তোমায় ঘুম পাড়িয়ে দেব। সেই জন্যই তো বলছি কোথাও গিয়ে বাসা বাঁধি চলো। ঘুম যদি তোমার নাও আসে, এখন একলাটি জেগে ছটফট করো, আমি থাকলে কথাবার্তা কইলে অত কষ্ট হবে না।

একটা কেলেঙ্কারি হবে যে?

হোক কেলেঙ্কারি।

কেশব ভেবে-চিন্তে বলে, আচ্ছা, ভেবে দেখি।

একটু পরেই খটকা লাগায় হাত বাড়িয়ে টের পায় মায়ার চোখে জল ঝরছে।

মায়া ভিজে গলায় বলে, আমি বুঝেছি সব। আসলে আমাকে তোমার দরকার নেই, তুমি চাও না আমাকে। রাতে ঘুম আসে না তাই একটু মজা করে যাও।

কেশব তাকে আদর করে বলে, তুমি ভুল বুঝেছ। ভেবে দেখি মানে আমি অন্য উপায়ের কথা ভাবছি।

সত্যি ? দ্যাখো, গায়ে আমার কাঁটা দিয়েছে। কী উপায় বলো না ?

আগে ভাবি, তারপর বলব। মাথাটা ভোঁতা হয়ে আছে।

ইস। আমি মরলে তোমার অসুখটা যদি সারত !

শুনে কেশবের রোমাঞ্চ হয় না বটে কিন্তু সে বিশ্বাস করে মায়ার এ সব মন ভুলানো বানানো কথা নয়। সমস্ত দায় আর ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে তার সঙ্গে নিরালা একটি নীড়ে প্রকাশ্যভাবে নিশ্চিন্ত মনে বাস করার আশাতেই হয়তো সে এভাবে এ সব কথা বলে। তাকে উসকিয়ে দিতে চায় যে গভীর রাতে এভাবে চোরের মতো কিছুক্ষণের জন্য তাকে পাওয়ার বদলে ব্যবস্থা করলেই চব্বিশ ঘণ্টা সে তাকে আপন করে পেতে পারে—এ জন্য ঘব ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার কলঙ্কও সে বরণ করতে রাজি আছে। কিন্তু এ তো ছলনা-চাতুরীর কথা নয়। সে নিজেরও সুখ আর সার্থকতা চায়— সেটা কি অপরাধ মানুষের ? নিজেকে সে তো বিনা শর্তে সঁপে দিতে চায় নিন্দা-কলঙ্ক তুচ্ছ করে সমাজ আর আইনের স্বীকৃতি না পেয়েও তার সঙ্গে নিজস্ব একটি নীড় বাঁধার আশায়।

সন্তান সে চাইবে না। সে জানে এ জীবনে সন্তান শুধু তার বিড়ম্বনাই হবে।

এতদিনের অভ্যস্ত সামাজিক জীবনও সে চাইবে না। কযেক দিন আগেও গোবিন্দের ভাইয়ের মেয়ের বিয়েতে তাকে সাদরে সমাদরের সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল। সে খুব খাটতে পারে, কাজে-কর্মে তাকে বিশেষভাবে দরকার হয়।

যাওয়ার আগে মায়া বলে গিয়েছিল, যাচ্ছি, কিন্তু মনটা আমার পড়ে রইল এখানে। চেষ্টা করে কৌশলে তোমায় একটা নেমন্তন্ন দেওয়াব। যেয়ো কিন্তু তুমি।

মায়া কি আর জানে না ঘর ছাড়লে আত্মীয়-কুটুম্ব আর তাকে ডাকবে না ?

একখানার বেশি ঘর ভাড়া করার সাধ্য কেশবের নেই। ওই একখানা ঘর আর কেশব হবে তার সম্বল।

যেখানেই ঘর নেওয়া হোক, ঘরটা বিচ্ছিন্ন নয়। আশেপাশে চারিদিকে ঘরে ঘরে মানুষ গিজগিজ করবে, ছেলের বিয়ে মেয়ের বিয়ে পূজাপার্বণে মানুষের ভিড়ে নেমন্তন্ন পাওয়ার বদলে গাদাগাদি মাখামাখি ঘেঁষাঘেঁষি করে মানুষের যে ভিড়টা বসবাস করছে তার সঙ্গে পরিচয় হবে।

তারা কেউ জিজ্ঞাসাও করবে না কেশবের সে বিয়ে-করা বউ কি না। মন্ত্র পড়ে পুরুষটার সঙ্গে তাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে অথবা সরকারি আইন তাকে পুরুষটার সঙ্গে থাকবার অনুমতি দিয়েছে—এটা কেউ খেয়ালও করবে না।

পরের সংসারে উদয়াস্ত খেটেও মায়া কি এটা জেনেছে ?

জানুক বা না জানুক। তার অসুখটা সারাবার জন্য মায়া মরতেও প্রস্তুত। এটা মুখের কথা নয়, কেশব জানে সে যদি মায়াকে বুঝিয়ে বলে যে শেষরাত্রে তাকে গোবু দুয়ে খানিকটা টাটকা দুধ খাওয়ানোর বদলে মায়া যদি গলায় কলসি বা পাথর বেঁধে ডোবা-পুকুরে ডুবে মরে তাহলে সে সেরে যাবে—শেষ পর্যন্ত মায়া ডুবে মরবে নিজের ইচ্ছায়।

সমগ্র জীবনের হিসাবে কদর্য কুৎসিত হবে সেই আত্মহত্যা। কিন্তু সমগ্র জীবন তো বলতে পারবে না মায়া মিথ্যাচারিণী, সে ভণ্ডামি করেছে, সমগ্র জীবনকে ঠকিয়েছে।

বৃহত্তর জীবনের হিসাবনিকাশ রীতিনীতি সে জানে না, জীবন সম্পর্কে সে তার নিজের জানা-চেনা জগতের হিসাবনিকাশ রীতিনীতিতে একনিষ্ঠ।

আকাশে এরোপ্লেন চলে, সে মুখ তুলে চেয়ে দ্যাখে আর আওয়াজ শোনে।

তার কাছে এটা গরুড় পক্ষীর নতুন রূপের ম্যাজিক নয়। তার জ্যাঠতুতো ভাই বিষ্ণু আকাশে এরোপ্লেন চালিয়ে পেট চালায়।

মায়ার প্রস্তাব মন্দ কী ?

রাত্রির গোপনতায় চুপিচুপি মেলামেশার পালা শেষ করে কয়েকটি চেনা মানুষের সংকীর্ণ পরিবেশ ত্যাগ করে এত বড়ো শহরের অন্য কোনো এক কোনায় নতুন মানুষের মধ্যে গিয়ে বাসা বাঁধা ?

সংসারে তার শিকড় তো খুবই আলগা। মাসে মাসে কিছু টাকা দেয় আর প্রতিদিন বাড়ির সকলে যখন ঘুমানোর আয়োজন করছে, ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন বাড়ি ফিরে কোনোদিন দুখানা রুটি খেয়ে কোনোদিন না খেয়ে নিজের আলাদা ছোটো ঘরটিতে ঘুমিয়ে বা ঘুমের জন্য ছটফট করে রাতটুকু কাটায়।

একটা বিক্ষোভ আর আলোড়ন সৃষ্টি না হলে, সকলে মিলে তাকে চেপে না ধরলে তার খেয়ালও হয় না যে বোনের বিয়ে দেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নামে হলেও সে বাড়িতে আছে এবং নামে হলেও সে বাড়ির কর্তা, গুরুতর ব্যাপারে তাই তাকে ডাকা, তার দায়িত্ব আর কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেওয়া। নইলে কার কী আসে যায় সে যদি রাতটুকু এখানে কাটাতে না আসে ?

যে টাকা সংসারে দেবার কথা সেটা ডাকে পাঠিয়ে দেয় ?

তার টাকা নিতে কারও আপত্তি হবে না। টাকায় কলঙ্ক লাগে না।

না, এই সংসারটি মোটেই তার সমস্যা নয়, এরা নামেই তার আপনজন। এদের সঙ্গে তার মিলও নেই মনের দিক থেকে, স্নেহ-মমতার বাঁধনও নেই। সে প্রায় অন্য জগতের মানুষ হয়ে গেছে।

এদের ছেড়ে যেতে তার কষ্ট হবে না। নিয়মিত টাকাটা পেলে এরাও চোখের জল ফেলবে না তার জন্য—

কিন্তু তার উৎসাহ জাগছে কই ? সাধ হলেও প্রিয়ার সঙ্গে একান্তে দু-দণ্ড কথা বলার সুযোগ তার এখন নেই, পৃথিবী ঘুমোলে কখন তার সংকেত আসবে সে জন্য প্রতীক্ষা করে থাকতে হয় তবু সর্বদা তাকে কাছে পাবার রোমাঞ্চকর কল্পনা হৃদয়-মনে সাড়া তো জাগায় না তার ? বরং নানারকম দ্বিধাসংশয় জাগে, ভয় করে। ঘর বাঁধার পর সর্বদা কাছে পেয়ে মায়াকে যদি তার ভালো না লাগে ? যদি বিস্বাদ হয়ে যায় তার সেবাযত্ন আর দরদ করার আকুলতা-ব্যাকুলতা ?

অন্ধকার থাকতে উঠে গোয়াল থেকে গোবিন্দের গোরু দুইয়ে ঘাটে এসে সে যখন তাকে টাটকা দুধ খাওয়ায়, তখন সত্যই মনে হয় তার চেয়ে ভাগ্যবান পুরুষ এ জগতে নেই। মনে হয় কাঁচা দুধ নয় যেন সত্যই অমৃত পান করছে।

কিন্তু নিজের ঘরে যত্ন করে রেঁধে বেড়ে আরও বেশি দরদ দিয়ে খাওয়ানোটা যদি একঘেয়ে লাগে ? যদি মনে হয় ঘরে ঘরে মায়েরা-বউয়েরা যন্ত্রের মতো এটা করছে, কী বৈচিত্র্য বা রোমাঞ্চ আছে তার সেবায় ?

যেখানে আছে সেখানে তখন আর ফিরিয়ে আনা যাবে না মায়াকে। মন বিগড়ে যাক, বিতৃষ্ণা জাগুক, তাকে বোঝা মনে হোক, সারাজীবন বিয়ে-করা বউয়ের মতো তার বোঝা বয়ে চলতে হবে।

কী সাংঘাতিক কথা !

কিন্তু শুধু এইদিক দিয়ে কি সাংঘাতিক কথাটা ? মায়াকে তার ভালো না লাগতে পারে সে বোঝা হয়ে উঠতে পারে, এই সম্ভাবনাটা ?

এই আশঙ্কায় মায়াকে নিয়ে যদি তার নীড় বাঁধতে ইচ্ছা না হয়, মায়া এমন ব্যাকুল হলেও তার মধ্যে সাড়া না জাগে মায়ার জন্য তার ভালোবাসার মানেটা কী দাঁড়ায় ?

কী দরের ভালোবাসা এটা ?

হিসাবটা তো জটিল নয় মোটেই। অতি সহজ সরল কথা। একটি দুঃখিনী নারী নির্বিচারে তাকে দেহমন দান করেছে, গ্রহণ করতে তার দ্বিধা জাগেনি কিন্তু মেয়েটির জন্য কোনো রকম ঝঞ্ঝাট পোয়াতে সে রাজি নয়। গা বাঁচিয়ে গোপনে তার ভালোবাসা ভোগ করতে সে প্রস্তুত আছে কিন্তু কোনো রকম বাস্তব অসুবিধা বাস্তব দায়িত্ব মানতে তার রুচি নেই।

মায়া যেভাবে আছে এভাবে থাকলে তার কোনো ভাবনা নেই। দরকার হলে সম্পর্ক চুকিয়ে দিলেই ফুরিয়ে গেল।

সে তো তবে অমানুষ, পাষণ্ড ? সাধারণ স্বার্থপর লম্পট ছাড়া কিছুই নয় ?

ছয়

অনিমেষের বুড়ি মা বড়োমেয়ের কাছে এলাহাবাদ গেছে। জামায়ের খুব অসুখ।

চিকিৎসার জন্য কমলের কলকাতা আসার কথা। তবু অনিমেষের মা নাতজামাইকে দেখতে ছুটে গেছে। তিন দিন কাশীতে তীর্থ করে কমল আর মলিনাদের সঙ্গে ফিরে আসবে।

কেশবের একটু বেলা করে কাজে গেলেও চলে। মায়া বলেছে, তা তুমি যেয়ো। কিন্তু ভোররাত্রে ঘাটে গিয়ে দুধটা খেতে হবে।

একটু ভেবে বলেছে, আচ্ছা থাক। আরাম ছেড়ে কেন উঠতে যাবে ? আমিই জানালায় দুধটা দিয়ে আসব।

অন্ধকারে তার মুখটা মায়া দেখতে পায় না। দেখলে চমকে যেত।

কিন্তু কিছু একটা সে টের পেয়েছে।

ক দিন কী হয়েছে তোমার ? কেমন যেন মন মরা আড়ষ্ট ভাব ? আবও খারাপ হয়েছে নাকি শরীর ?

না। শরীর ঠিক আছে।

মিনুর বিয়ের কথাবার্তা প্রায় হয়ে গেছে। ছেলেটির খবর দিয়েছিল গোবিন্দ।

গোবিন্দের নাকি সংসারে মন নেই। দিন দিন বৈরাগ্য বাড়ছে কিন্তু পাড়ায় বিয়ে পইতে শ্রাদ্ধ হোক পূজাপার্বণ হোক কিংবা সরকারি আধা সরকারি সব অব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আর প্রতিবাদ জানাবার সভাই হোক – সব কিছুতে সে জড়িত থাকে।

আগে কোনো ব্যাপারে তার টিকিটি দেখা যেত না, অবলার পক্ষাঘাত হবার আগে। বলত, সময় কই ভাই ? দোকান দেখব, এত বড়ো সংসার দেখব, ঝঞ্ঝাট কী সোজা ?

ক্রমে ক্রমে যত বৈরাগ্য বেড়েছে বাইরের অনেক কিছুতে জড়িয়ে পড়ার সময়ও তত বেশি পেয়েছে।

তবে রঞ্জনকে পড়ার বদলে দোকানের পিছনে কিছু সময় দিতে হয়।

তা হোক। তার তো শখের পড়া। তাকে ওই দোকানটাই সম্বল করতে হবে দুদিন পরে। দিনরাত পড়েও ফেল করেছে দুবার। শতকরা সত্তরজন ফেল করাদের দলটাকে সে ছাড়িয়ে উঠবে সে আশা কেউ রাখে না।

ভোরবেলা হঠাৎ গোবিন্দ আসে। কেশবকে দেখে বলে, তুমি বেরোওনি এখনও ? ভালোই হয়েছে। আমি ভাবছিলাম, প্রণবকেই জানিয়ে যাব কথাটা, তোমার সঙ্গে পরে আলোচনা হবে।

গোবিন্দ মাদুরে জাঁকিয়ে বসে। প্রণব এলে দু ভাইকে তার বক্তব্য জানায়।

অবিলম্বে সে রঞ্জনের বিয়ে দেবে ঠিক করে ফেলেছে। ভেবে চিন্তে এটাও ঠিক করেছে যে তারা যদি সম্মত হয় সে আর মেয়ে খোঁজাখুঁজি করবে না মিনুর সঙ্গেই ছেলের বিয়ে দেবে।

বয়সে বেমানান হবে না। তবে মিনুর বাড়ন্ত গড়ন, রঞ্জন আর একটু লম্বা চওড়া হলেই অবশ্য মানাত ভালো। সে জন্য আসরে যাবে না।

কেশব চমৎকৃত হয়ে বলে, হঠাৎ বিয়ে ঠিক করলেন কেন ?

খুলেই বলি তোমাদের। এবারও ফেল করে দুদিন একটু মুসড়ে গিয়েছিল তারপর হঠাৎ দেখি দিব্যি তাজা ভাব। বললে, ব্যাপার কী জানো ? আমাদের ইচ্ছে করে ফেল করিয়েছে, ইংরেজিতে কড়া হাতে নম্বর কেটেছে। পাস করলে চাকরি দিতে হবে, তাই। গায়ের জোরে বেশি বেশি ফেল করিয়েছে তারপর শুনলাম কী সব আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, পলিটিকস করছে। তা করুক, তাতে কোনো আপত্তি নেই। আখেরে হয়তো ভালোই হবে। কিন্তু একে আনাড়ি তায় গায়ের জ্বালা, গোড়ায় বেসামাল হয়ে পড়বে। তাই ভাবলাম বিয়েটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দিই, যাই করুক একটু সামলে করবে।

কেশব বলে, মিনুর সঙ্গে হয় না গোবিন্দদা।

কেন ? বাধা কী ?

এক জায়গায় কথাবার্তা প্রায় পাকা হয়ে গেছে

তাতে কী ? সব পাকা হবার পর সম্বন্ধ ভাঙে না।

কেশব আমতা আমতা করে বলে, তাছাড়া। একেবারে পাশাপাশি বাড়ি, আমার কেমন ভালো লাগছে না।

গোবিন্দ গম্ভীর মুখে বলে, এই তো ভালো। তোমরাও ছেলের বিষয় সব ভালোভাবে জানো, আমরাও মেয়েকে ভালো করে জানি। তাছাড়া ওই ছেলেটির চেয়ে আমাদের রঞ্জন নিশ্চয় পাত্র হিসাবে অনেক ভালো ?

প্রণব বলে, তুমি আপত্তি করছ কেন ? গোবিন্দদা মিনুকে নেবেন এ তো আমাদের ভাগ্যের কথা।

গোবিন্দ উঠে দাড়ায়।

তোমরা কথাবার্তা বলো। কাল পরশু আমায় জানালেই হবে। এখানে দেনা পাওনা যা ঠিক হয়েছে তার বেশি আমি কিছুই চাইব না।

গোবিন্দ চলে গেলে প্রণব মা-কে ডাকে। সুতরাং আর্দাবণী এবং পিসিরাও আসে। সেদিনের চেয়েও জোরালো সংঘাত বেধে যায় কেশবের সঙ্গে বাড়ির সকলের।

বাজে একটা অ্যাপ্রেন্টিস ছেলের বদলে রঞ্জনের সঙ্গে মিনুর বিয়ে হবে শুনেই সকলে যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছে মনে হয়।

কেশবের যুক্তিহীন অর্থহীন অসম্মতির মানেই কেউ বুঝতে পারে না।

মা বলে, এ কী একগুঁয়েমি তোর, অ্যাঁ ? তুই কি পণ করেছিস আমরা সবাই যা বলব সেটাই তুই ভেস্তে দিবি, ঠিক উলটোটা গাইবি ?

প্রণব বলে, এ চলতে পারে না। আমরা সবাই যখন চাইছি, রঞ্জনের সঙ্গেই মিনুর বিয়ে হবে। তুমি সেদিন বাড়ি বেচে দেবার ভয় দেখাচ্ছিলে, । া বাড়ি বেচে। খরচপত্র বন্ধ করে দিয়ো। আমি যেভাবে পারি চালাব।

মিনু একটু তফাতে দাঁড়িয়ে শুনছিল। ছোড়দার দৃঢ়তা দেখে তার মুখখানা যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কেশব টের পায়, এ বিয়ে ঠেকাবার সাধ্য তার হবে না। বিশেষত গোবিন্দ যখন বিশেষভাবে মিনুকেই ছেলের বউ করতে ইচ্ছুক।

ভিতরে একটা প্রচণ্ড বিক্ষোভ অনুভব করে। ক-দিন মায়ার জন্য ছিল আত্মগ্লানি, আজ তার সঙ্গে মিশেছে ক্ষোভ।

কাজে যেতে হবে। তৈরি হয়ে সে পথে নেমে যায়। বিপিনদের বাড়ির সামনে একটি মোটর দাঁড়িয়েছিল। সিনেমার তারকা হবার মতো রূপসি একটি মেয়ে বাড়ির সামনের রোয়াকে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল বকুলের সঙ্গে। দুজনেরই ঝকঝকে তকতকে আধুনিক সাজ।

সেইখানে সামনাসামনি দেখা হয় মোহিনীর সঙ্গে। শরতের বাগানের পুকুরে স্নান করে ভিজে কাপড়ে ফিরছিল।

আশ্চর্য এই যে আজ তাকে এভাবে রাস্তায় দেখে কেশবের চমক লাগে না। আপশোশ জাগে।

কেশববাবু আজ এত দেরি করে যে বেরোচ্ছেন !

মোহিনী দাঁড়ায়। সেই অবস্থায় সভ্য জগতের সুসজ্জিতা মেয়ে দুটির কয়েক হাত তফাতে। বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করে না।

বলে, তোমার তো গাড়ি আছে, একটু বেড়িয়ে আনো না ? ভালো লাগে না আর। একজন খালি নেয়ে বলবে আমি নাইনি খেয়ে বলবে আমি খাইনি। কোথায় একটু নিয়েও যাবে না, ঘর থেকে বেরোতেও দেবে না এমন বিশ্রী লাগে !

প্রাণটা বোধ হয় তার ছটফট করছিল এই কথাগুলি কাউকে শোনাবার জন্য। কথাগুলি বলেই সে এগিয়ে যায়।

এত বিব্রত ছিল কেশবের মন তবু আজকেই প্রথম তার খেয়াল হয় যে পুকুরে গামছা পরে নাওয়া আর ভিজে কাপড়ে বাড়ি ফেরাটা মেয়েদের লজ্জাহীনতা বা অসভ্যতা নয়, নিছক দুর্দশা !

ক-টা পুকুর আছে আশেপাশে। মেয়েদের নাইতে তো হবে। পুকুর ছাড়া নাইবে কোথায় ? পুকুরপারে খোলা জায়গায় কাপড় ছাড়া ঢের বেশি লজ্জাকর, তার চেয়ে ভিজে কাপড়ে বাড়ি ফেরার অসভ্যটুকুই ভালো।

উপায় কী ?

•

বোসপাড়ার রাস্তার মোড়ে ভুবনেশ্বরের সঙ্গে দেখা। তার হাতে ওষুধের শিশি।

কার ওষুধ ভুবনদা ?

তোমাদের বউঠানের, আবার কার ! জ্বর বাধিয়ে বসেছে। জ্বর যতটা নয়, গায়ে জ্বালাপোড়া বেশি।

তাই বটে। ভুবন গিয়েছে ডাক্তারের কাছে ওষুধ আনতে সেই ফাঁকে মোহিনী গা জ্বালাপোড়ার চিকিৎসাটা সেরে রেখেছে, পুকুরে ডুব দিয়ে এসে।

রোগ সম্পর্কে জীবন সম্পর্কে মায়ারও এমনই অবজ্ঞা। ভূতের ভয়ে মূর্ছা যাক, জ্বর গায়ে স্নান করে মরে পেত্নী হয়ে সেই ভূতের দেশে যেতে এদের আপত্তি নেই।

শরতের দোকান থেকে অজিত তাকে ডাকে। সকালে শরৎ দোকানে হাজির থাকে। তাকে কয়েক মিনিটের জন্য খদ্দের সামলাবার ভার দিয়ে অজিত দোকানের বাইরে আসে।

বলে, কানুকে তো আপনি ভালোমতো চেনেন। স্বভাব-চরিত্র কেমন ওর ?

স্বভাব ভালোই।

মদ-টদ খায় ?

আপনার আমার মতো কদাচিৎ শখ হলে খায় ?

সে কথা বলছি না। নেশা-টেশা নেই তো ? রোজগার করছে, এতকাল বিয়ে-থা করেনি, এটা কেমন খাপছাড়া লাগছিল।

কেশব একটু হেসে বলে, এক হিসাবে খাপছাড়া বলতে পারেন, তবে খারাপ কিছু নয়। ও বলে কী, চোদ্দোপুরুষ কখনও হাতের কাজ করে খায়নি, বংশে আমি প্রথম খাঁটি মিস্ত্রি বনেছি। গেরস্তঘরের ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে ঘরে এনে মরব ?

একটু থেমে জিজ্ঞাসা করে, কানুর বিষয়ে এত খোঁজখবর কেন ?

অজিত চিন্তিতভাবে বলে, অনেকদিন থেকে মেয়েটাকে বিয়ে করার কথা বলছে। তা বাড়ির মেয়েরা বলছিল, দিলে মন্দ হয় না। বউমার বিশেষ ইচ্ছা এখানে হোক। বলে কী, ও যা মেয়ে এ রকম লোকের হাতে পড়লেই সুখী হবে। চাকরে বাবুগোছের ছেলের সঙ্গে বনবে না। কী করব তাই ভাবছি। মেয়েটা একটু কাঠখোট্টাই বটে, মায়া-দয়া কম।

কেশব বলে, ওর সাথেই বিয়ে দিন। মানুষটা খাঁটি। ভদ্রঘরের বউ হতে না পারলেও মেয়ে আপনার সত্যি সুখী হবে।

কানু মানুষটা খাঁটি বইকী। তার মতো ভেজাল মানুষের তুলনায় কানু নিশ্চয় খাঁটি মানুষ।

তার মতো কারও জীবনে বোধ হয় এমন এলোমেলো রীতিনীতি উলটো-পালটা যুক্তি-তর্কের কারবার নেই। নিজের প্রয়োজনে যখন যা সুবিধা তাই সে উচিত বলে জানে, তাই সে করে। আত্মীয়-বন্ধুব মুখ-চাওয়া রীতিনীতি নিয়মকানুনের ধার সে ধারে না।

তার চেয়ে প্রণবও বেশি খাঁটি মানুষ। যত কুসংস্কাবের জের টেনে চলুক, যতই সংকীর্ণ হোক তার মন, যত তুচ্ছ স্বার্থ নিয়েই হোক তার কারবার।

তার সংস্কার সংকীর্ণতা স্বার্থপবতা আত্মকেন্দ্রিক সুবিধাবাদ নয়, একটা ব্যাপক জীবনের নিয়ম অনিয়ম নীতি-দুর্নীতিকে নিজের জীবনেও স্বীকার করা সম্মান দেওয়ার নিদর্শন। অনেকে যে রকম মানুষ, অনেকের যেমন জীবন সেও তেমনই মানুষ হতে তেমনই জীবন পেতে চায়।

কিন্তু তাব তো কোনো নিময়নীতিরই বালাই নেই। ন্যাকামি আর ছুঁচিবাই-ভরা সংকীর্ণ সেকেলে পচা জীবনযাত্রা আঁকড়ে আছে বলে বাড়ির মানুষেরা তুচ্ছ হয়ে গেছে তার কাছে, ওদের সুখ-দুঃখ নিয়ে এতটুকু মাথা না ঘামিয়েও একটু করুণা মেশানো অবজ্ঞার দৃষ্টিতে ওদেব দিকে তাকায়, কে মরল কে বাঁচল খবর নেওয়াও প্রয়োজন বোধ করে না।

অথচ বড়ো বড়ো পারিবারিক ব্যাপারে ঠিক ওদের পর্যায়ের বাড়ির কর্তাটির মতোই সে তর্জন গর্জন করে, হুকুম দেয়, প্রত্যাশা করে সকলে মাথা নিচু করে তাব বিচার মেনে নেবে।

এ সংসারের মানানসই বউ সে চায় না, অথচ তেমনই একজনের একই ধরনের দাসীর মতো আত্মসমর্পণ আর ভাবালু স্নেহ-ভালোবাসা চোরের মতো উপভোগ করে।

ড্রাইভাবদের সঙ্গে সে মিশতে পারে না। তাদের মোটা বসিকতা আর সস্তা খোশগল্প তার পছন্দ হয় না।

অথচ সমকর্মীদের একেবারে উপেক্ষা করার সাধ তার নেই। কর্মজগতের খবরাখবর এদের কাছে জানা যায, এদের মারফতে কাজ পাওয়াও যায়। ইয়াকুব তাকে জ্যাকসনের চাকরিটা জুটিয়ে দিয়েছিল। জ্যাকসন দেশে চলে গেলে অনিমেষের এই চাকরির খবরটা তাকে দিয়েছিল ডাক্তার ঘোষের ড্রাইভার সুখলাল।

একটু মেলামেশা বজায় রাখতে হয় কিন্তু সেটা প্রাণখোলা মেলামেশা নয় তার শুধু অভিনয় করা যে আমিও তোমাদের মতোই বড়োলোকের মাইনে করা ড্রাইভার।

ললনাদের স্তরের শিক্ষিত মার্জিত আধুনিক মানুষদের জন্যও সে প্রায় বোসপাড়ার সেকেলে পচা মানুষগুলির মতোই করুণা-মেশানো অবজ্ঞা পোষণ করে।

এদের শুধু বাইরের জাঁকজমক ভিতরে ফাঁকি। প্রাণান্তকর চেষ্টায় একটা ধোঁয়াটে কৃত্রিম আবহাওয়া সৃষ্টি করে বাস্তব জগৎ আর জীবনকে ঝাপসা করে রাখে। কত হীনতা-দীনতা-অনিয়ম যে

চাপা থাকে চকচকে পালিশ করা প্রকাশ্য জীবনের আড়ালে। কত দুঃখ-বেদনা পঙ্গুতা-ব্যর্থতা যে সর্বসম্মতিক্রমে চাপা দিয়ে রাখা হয় হাসি-গান আর জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্যের তৈরি করা মিথ্যা সার্থকতার আবরণে!

কত বছর ধরে মাসের পর মাস কয়েকটা দিন ললনা যাতনায় কাতরে আসছে, একটু বাতাসের জন্য দু-হাতে হাঁটু জড়িয়ে বসে চোখ কপালে তুলে হাঁপিয়ে আসছে, কিন্তু কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধু ছাড়া কেউ জানেও না তার কী অসুখ, জানার প্রয়োজনও বোধ করে না,

ললনার শরীর ভালো নেই শুনেই তার প্রকাশ্য জীবনের শতাধিক ভাগীদাররা কয়েকটা দিনের জন্য তাকে রেহাই দেয়।

অথচ বিতৃষ্ণা আর অশ্রদ্ধা নিয়েও ড্রাইভার হিসাবে যতটা সম্ভব এই জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে মশগুল হয়ে থাকে। মুখ ফুটে কিছু না বলেও ললনার সঙ্গে তার একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে যে যত বই আর পত্রিকা ললনা পড়ে সেগুলি যেন তার না পড়ার সময়টুকুর জন্য কেশবকে ধার দেওয়া হয়।

এ জন্য ললনা যে তাকে ছোটোলোক অশিক্ষিত ড্রাইভার ভাবে না, লেখাপড়া জানা খানিকটা ভদ্রমানুষ মনে করে এটুকুর জন্যই সে গর্ববোধ করে।

উৎসব আসর সভাসমিতির যত কাছে ঘেঁষা সম্ভব ঘেঁষে গিয়ে সে যেটুকু পারে গান শোনে, আলাপ-আলোচনা তর্ক-বিতর্ক বক্তৃতা শোনে, গাড়ি চালাতে চালাতে অর্ধেক মন দিয়ে শোনে আর বুঝবার চেষ্টা করে এদের কথাবার্তা।

এইভাবে সে নিজেকে অংশীদার করতে চায় এদেরও জীবনের। সে তবে বাদ দিল কোনটা? আপন হল কোন স্তরের মানুষগুলির? এর সোজা মানে কি এই নয় যে সে সুবিধাবাদী এবং সে জন্য সর্বস্তরের সমস্ত রকম জীবনের ভাগ চেয়ে তার গুলিয়ে গেল সে নিজে কোন রকম জীবন চায়।

ললনা বলে, আপনাকে তো বেশ তাজা দেখাচ্ছে আজ। বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছেন বুঝি?

আজ পর্যন্ত কখনও ললনা এভাবে এই সুরে কথা বলেনি। একদল রুক্ষ কেশ ছিন্নবেশ চাষি মা-বউকে খেটে কিছু রোজগারের চেষ্টার শেষে দল বেঁধে গাঁয়ে ফিরতে দেখে সে অনেক ইতস্তত করে তাদের পিছু ধাওয়া করেছিল। ঘণ্টা দেড়েক গ্রামে কাটিয়েছিল।

সেই জন্যই কি এই প্রসন্নতা? সে বিয়ে করেনি জেনেও এই সুমিষ্ট রসিকতা?

কেশবও হালকা সুরে বলে, আমি কারও সঙ্গে ঝগড়া করি না। গাড়িটা আমার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করেছে।

ললনা ভড়কে গিয়ে বলে, কী হয়েছে গাড়ির?

গাড়িটা পুরোনো হয়ে গেছে। সেদিনের ধাক্কাটা সামলাতে পারছে না। বেশিদিন চলবে না আর। বাবুকে বলে একটা নতুন গাড়ি কিনুন।

ললনা একটু হাসে।

গাড়িটা নতুন হলে বাবা বিক্রি করে দিত। আমরা খুব আরামে আছি ভাবেন না? খাইদাই গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়াই, আকাশ ফুঁড়ে টাকা আসে, ভাবনা কী! আমাদেরও সেদিন আর নেই, কাহিল অবস্থা।

গান বন্ধ করে, নানামতের নানাস্বার্থের নানালোকের সঙ্গে ভদ্র ও মার্জিতভাবে সমঝে চলার বিষম প্রক্রিয়াটা বাতিল করে, প্রতিদিন উদার আকাশ খোলা মাঠঘাটের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে গিয়ে আস্তাকুঁড়ের আধা-ন্যাংটো খিদেয় কাতর নোংরা ক্ষুব্ধ মানুষগুলির সঙ্গে ভাসাভাসা পরিচয় করে চেহারা যেন ফিরে গেছে ললনার।

এবারের বিছানা নেবার নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেছে। তাকে হাপাতে হয়নি। কতটা ব্যথা ভোগ করেছে সেই জানে কিন্তু বিছানা তাকে নিতে হয়নি।

ললনা আবার বলে, বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, গরিবের দেশ কিনা, বেশির ভাগ লোক খেতে পায় না পরতে পায় না রোগে ভুগে মরে। তাই মনে হয় আমরা বুঝি মস্ত চালে চলি, লাখপতিদের মতো মজা লুটি। চালটা কোথায় ? মজাটা কোথায় ? এই তো একটা বাড়ি, দিদিরা এলে ঘরের ব্যবস্থা কী হবে ভাবতে হয়। এই তো একটা গাড়ি। ফার্নিচারগুলো দরকারি, শাড়ি কাপড় পোশাকগুলো দরকারি। বাড়াবাড়িটা কোথায় ?

কেশব স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

ওই গরিবদের সঙ্গে তুলনা করলে তবেই বলা যায় চালে আছি, বাড়াবাড়ি করছি। এত লোকের ভাঙা কুড়ে, আমাদের কেন মডার্ন ফ্যাশনের পাকাবাড়ি থাকবে ? এত লোকে গোরুর গাড়িতেও চাপতে পায় না, আমরা কেন মোটরগাড়িতে চাপব। এত লোকের চুলে জট গায়ে মাটি, নেংটি পরে আধপেটা খায় আবার না খেয়েও মরে আমরা কেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকব, ভালো পোশাক পরব, ভালো খাবার খাব ?

ললনা বেশ বলতেও পারে। গানের চাপা আবেগটা বোধ হয় কথায় মুক্তি খুঁজছে।

হাভাতের সঙ্গে তুলনা করলে তবেই মনে হবে আমরা বিলাসী। নইলে আজকের দিনে এটুকু সুখ সুবিধা মানুষ ভোগ করবে না ? আরও বেশি পাওয়া উচিত। সেটাও বিলাসিতা হবে না, চাল হবে না।

এ পর্যন্ত বেশ লাগে ললনার কথাগুলি। সহজ কথা, কেশব বুঝতেও পারে মানতেও পারে। সত্যিই তো, মানুষের সভ্যতা ভালো ভালো বড়ো বড়ো সভ্যতা নয়, ভালোভাবে বাঁচার সভ্যতা।

গাড়ি থাকা বা বাড়ি থাকা সোফা টেবিল আলমারি থাকা পরিচ্ছন্নতা আর একটু শোভা ও সৌন্দর্যের ব্যবস্থা থাকা, সুবেশ ও সুস্বাদু খাদ্যে রুচি থাকা— আজকের দিনের সভ্যতার মানে এ সব তো নিছক প্রাথমিক ব্যাপার, সামান্য ব্যাপার। এ সমস্তকে বিলাসিতা বা চাল বলতে হলে তার মানে দাড়ায় একমাত্র ভেকধারী সন্ন্যাসীর বিলাসিতা বা চাল নেই।

কিন্তু তারপরেই ললনা সব গুলিয়ে দেয়।

বলে, গরিবের ঘাড় ভেঙে আমরা যদি টাকা জমাতাম তাহলেও এবং বলা চলত।

তার অজ্ঞতায় কেশব পর্যন্ত আশ্চর্য হয়ে যায়।

গরিবের ঘাড় ভেঙে যারা টাকার কাঁড়ি করে তারাই আপনাদের দেয়।

দেয় না, আমরা আদায় করি। আমাদের ছাড়া ওদের চলে না।

গরিবদের ছাড়াও চলে না। আপনাদের টাকাও আসলে গরিবের টাকা। ওরা গরিবকে শোষণ করে, আপনারা তারই একটু ভাগ পান।

ললনা একটু হাসে।—টাকা আবার গরিবের বড়োলোকের ছাপ মারা হয় নাকি।

হয় না ? বইয়ে কী লেখে জানি না, সে বিদ্যে নেই। সোজা কথায় বুঝি আমার টাকা আপনি কেড়ে নিলে সেটাকে আমার টাকাই বলব। দশজনকে ফকির করে একজন তাদের টাকা নিলে সেটা গরিবের টাকা হল না ?

কে জানে ললনা মেনে নেয় কি না তার কথা। অথবা তার সঙ্গে তর্ক করতে চায় না বলে চুপ করে যায়।

ললনার মধ্যে একটা অস্থিরতা দিন দিন বাড়ছে লক্ষ করা যায়। সারাদিন সে যেন ছটফট করে বেড়ায়। কতবার যে উদ্দেশ্যহীনভাবে বসবার ঘরে আসে, একটু বসেই উঠে দাঁড়ায়, লনে নামে,

গ্যারেজে ঢুকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ শুধু গাড়িটার দিকে চেয়ে থেকে ফিরে যায়। এবার আক্রমণ হয়নি, রোগ হয়তো তার সত্যিই সেরে গেল। কিন্তু তেমন খুশি মনে হয় না ললনাকে।

রোগ সারাবার জন্য যে মূল্য তাকে দিতে হয়েছে সেটা বোধ হয় তাকে পীড়ন করছে খুব।

অন্যের লেখা গান অন্যের দেওয়া সুরে যে গায় সেও সৃষ্টিই করে, প্রাণের আবেগ খরচ না করে যন্ত্রের মতো গেয়ে কেউ মানুষকে মাতাতে পারে না।

সেদিন বিকালে বেরোবার আগে কেশব জানায়, তেল নিতে হবে।

ললনা বাড়ির ভেতর থেকে ঘুরে এসে বলে, থাক গে আজ আর বেরোব না।

কেশব বলে, বেণীবাবুর ওখান থেকে এমনিই পাওয়া যাবে। দাম পরে দিলেও চলবে।

ললনা বলে, না, ধারে তেল কিনে বেড়াব না।

সাত

শুনেছিল অনিমেষের পদোন্নতি হয়েছে, কিছু মাইনেও বেড়েছে। কিন্তু সকলের রকম-সকম দেখে মনে হয় তার যেন সর্বনাশ হয়ে গেছে।

নতুন গাড়ি কেনার কথা বললে ললনা বলে যে গাড়িটা নতুন হলে বেচে দেওয়া হত।

তেল কেনার টাকার অভাবে তার বেড়ানো বন্ধ রাখতে হয়।

তারপর সে জেনেছে ব্যাপার ! কিছু বেশি বেতনের নতুন একটা পদে উন্নতি হওয়াটা সত্যই অভিশাপ দাঁড়িয়ে গেছে অনিমেষের।

এ পদে উপরি আয় নেই একটি পয়সা।

তাই বটে : এ রকম একটা বাড়ি করে মাইনে-করা ড্রাইভার, রান্নার লোক আর দুজন চাকর রেখে যে চালে চলে অনিমেষ, আজকের দিনে বড়ো চাকরির মাইনেতে কী আর তা সম্ভব হয়।

শত্রুতা ঠিকই করেছে বঙ্কিম। পদোন্নতি করিয়ে দিয়ে গায়ের জ্বালা মিটিয়েছে।

চাল খাটো করার, খরচ কমাবার ব্যবস্থা চলেছে।

কেষ্টকে বিদায় দেওয়া হয়েছে, নির্মলাই এখন থেকে রান্না করবে।

চাকর একজন রাখতে হবে। অর্জুনকে রাখা দরকার কিন্তু নিমাইকে না রাখলেও চলে।

শুনে নিমাইয়ের সে কী কান্না !

না, সে কিছুতেই দেশে ফিরে যাবে না, এখানেই থাকবে।

আমার মাইনে কমিয়ে দাও দিদিমণি, আমায় ছাড়িয়ে দিয়ো না !

এই সেদিনও তার মন কেমন করত দেশের জন্য, মায়ের জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদত। আজ দাঁড়িয়েছে বিপরীত। এ বাড়ির চাকরি ছেড়ে শহর ছেড়ে দেশে ফিরে যাবার নামে তার কান্না আসে।

কান্না থামিয়ে সে কিছুক্ষণ ভাবে। তারপর বলে, আচ্ছা, আমি তবে একটা কাজ খুঁজে নিই। তদ্দিন আমায় রাখবে তো ?

ললনা বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ রাখব। আমিই কাজ জুটিয়ে দেবোখন তোকে একটা।

নিমাইকেও কেশব যেন আজ ঈর্ষা করে ! গেঁয়ো ছেলে কিন্তু কত সহজে সে রপ্ত করে নিয়েছে শহরের জীবন আর চালচলন। শুধু তাই নয়, কানুর মতো তাকেও মনস্থির করতে দশবার ভাবতে হয় না, ইতস্তত করতে হয় না। সেও নিজের মনটা বোঝে ! শহরে সে থাকতে চায়, শহরেই সে থাকবে। দেশে যাবার নামে কাঁদতে কাঁদতেই সে ঠিক করে ফেলতে পারে এ বাড়িতে না রাখলে অন্য বাড়িতে কাজ খুঁজে নেবে !

তাকে হয়তো কয়েক দিন রীতিমতো মাথা ঘামিয়ে ঠিক করতে হত দেশে ফিরবে না শহরে থেকে যাবে। ঠিক করাব পরেও থেকে যেত দ্বিধার ভাব।

কেন ? তার অসুখটার জন্য ?

নিজেকে নিষ্ঠুরভাবে একটা প্রচণ্ড আঘাত হানতে ইচ্ছা হয় কেশবেব।

ভোবে কাজে এসে ললনাকে গান গাইতে শুনে কেশব আশ্চর্য হয়ে যায়।

ললনার ধৈর্যের বাঁধ তবে ভেঙে গেল ? গানের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল রোগের যাতনা ?

সেদিন ভোবে বুড়িকে গঙ্গা নাইয়ে এলে সে আবও আশ্চর্য হয়ে যায় ছোটোবড়ো চারটি মেয়েকে ললনা গান শেখাচ্ছে দেখে। মলিনা জানালাব কাছে দাঁড়িয়ে চুপ করে শুনছে।

ললনার আনন্দোজ্জ্বল মুখ যেন তার মুখেব স্থায়ী বিষণ্ণতাকে নষ্ট করে দিয়েছে।

শিক্ষার্থিনীদের মধ্যে দুটি মেয়ে পাড়াব, দুজনকে কেশব কখনও দ্যাখেনি।

ঘড়ি ধরে ঠিক এক ঘণ্টা শিখিয়ে ললনা তাদের কয়েকটি উপদেশ দিয়ে বিদায় দেয়।

খানিক পরেই আসে জীবন আর শঙ্কর, ললনার সঙ্গে এই যুবক দুটির অনেক দিনের আলাপ। সামনের শনিবার সন্ধ্যায় তারা একটি সভাব আয়োজন করেছে, ললনাকে গিয়ে দু-একখানা গান গাইতে হবে।

ললনা বলে, এবার টাকা দিতে হবে কিন্তু।

টাকা ? জীবন আর শঙ্কর মুখ চাওয়াচাওয়ি কবে।

কত টাকা ?

বনানীদি যা পান। অনেক পয়সা খবচ কবে গান শিখেছি। এবার কিছু উশুল করবই।

কেশব ভাবে, ব্যাপাবটা কী রকম হয় ? গানেব জন্য নয়, টাকার জন্য ? ও রকম বিশ্রী কঠিন একটা রোগ থেকে আরোগ্যলাভের চেয়ে টাকাটা বড়ো হল ললনাব কাছে !

চিন্তাটা এমন পীড়ন করে তাকে সে সুযোগেব অপেক্ষায় না থেকে ললনার কাছে গিয়ে বলে, আবার গান আবম্ভ করলেন নাকি ? অসুখটা সেবে যাচ্ছিল—

ললনা একটু হাসে।

গান না গাইলে আমাব চলে না। সব শূন্য মনে হয়।

কেশব ধাঁধায় পড়ে যায়। তাহলে গানেব জন্যই ? টাকাব খাতিরে নয় ?

তার মুখের ভাব দেখে ললনা বলে, তাছাড়া ভেবে দেখলাম, ঠিক গানের জন্যই তো অসুখ নয়। আমার কারণ হল আমার নার্ভাস উইকনেস একটু যদি সামলে চলি, মনটাকে শক্ত রাখি, গানের জন্য কেন অসুখ হবে ? এতলোক গান গায় তাদের হয় না, আমার কেন হবে ? অনিয়ম বাদ দিয়ে, ভালো ফুড আর টনিক খাব—

ললনা আবার একটু হাসে।

তাছাড়া, এবার শুধু ভাবেব জন্য নয়, টাকার জন্য গাইব। সে রকম স্ট্রেইন আর হবে না। তবু যদি ভুগতে হয়, ভুগব !

চিকিৎসার জন্য কমলের কলকাতা আসার দিন ক্রমাগত পিছিয়ে যাচ্ছিল। অনিমেষের মা-ও এলাহাবাদে নাতনির কাছে আটকে গিয়েছে। কমলের অসুখটা কী স্পষ্ট করে এখানে কেউ জানায়নি। শুধু লেখা হয়েছে যে স্নায়বিক রোগ।

কয়েক দিন পরে বিমান ডাকে কমলের ভাই নির্মলের চিঠি আসে। কেবল কমল আব মলিনা নয়, তারা সকলেই কলকাতা আসছে। অবিলম্বে যেমন হোক একটি বাড়ি ভাড়া করে যেন টেলিগ্রাম করে তাদের জানানো হয়।

বাড়ি দরকার এই জন্য যে কমলের চিকিৎসা বেশ কিছুদিন সময় লাগবে।

অনেক চেষ্টায় একটা ফ্ল্যাট জোগাড় হয়। এলাহাবাদে টেলিগ্রাম যায় দিন চারেক পরে অনিমেষ আর ললনাকে কেশব স্টেশনে নিয়ে যায়।

মাস ছয়েক আগে কমল আর মলিনা কলকাতায় বেড়াতে এসেছিল, কেশব তখন কমলকে দেখেছিল।

সুশ্রী চেহারা, খুব হাসিখুশি আমুদে মানুষ।

আজ দুপাশ থেকে দুজন লোক সেই কমলকে শক্ত করে ধরে হাঁটিয়ে আনছে দেখে কেশব পলকহীন চোখে চেয়ে থাকে।

কমল কাছে আসবার আগেই সে ব্যাপার বুঝতে পারে। মানুষ পাগল হলে তাকে দেখলেই সেটা টের পাওয়া যায়।

কমলের মাথাও কামানো।

অন্য কাউকে কেশব চেনে না। বছর ত্রিশেক বয়সের যে যুবকটি কমলকে ধরে আনছে, দেখে মনে হয় সে কমলের ভাই নির্মল। বিধবা মহিলাটি খুব সম্ভব কমলের মা।

পরে কেশব জানতে পারে প্রৌঢ়বয়সি পুরুষটি কমলের কাকা, মহিলাটি তার স্ত্রী এবং কুড়ি-বাইশবছরের অন্য যে তরুণটি কমলকে ধরে আনছিল সে এদের ছেলে।

ললনা মলিনা কেউ এদের সঙ্গে আসেনি।

একটা গাড়িতে কুলোবে না, ট্যাক্সি ডেকে মানুষ ও মালপত্র ভাগাভাগি করে তোলা হয়। কমলকে নিয়ে অনিমেষ নির্মল আর সেই ছেলেটি এ গাড়িতে ওঠে।

হঠাৎ কেশবের চোখে পড়ে, স্টেশনের ভিতরে দূরে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে ললনা মলিনা আর অনিমেষের মা এদিকে চেয়ে আছে।

অনিমেষ গাড়িতে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

নির্মল বলে, প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম নার্ভাস ব্রেকডাউন। ডাক্তারও তাই বলেছিলেন। তারপর জানা গেল মাথার গোলমাল।

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের বংশে কারও—

ভিড়ের জন্য গাড়ি তখন দাঁড়িয়েছিল মুখ ফিরিয়ে কেশব নির্মলের বিমর্ষ মুখে আতঙ্কের ছাপ দেখতে পায়।

ধীরে ধীরে নির্মল বলে, বাবার একবার হয়েছিল। ছ-মাস পর সেরে যায়।

বোধ হয় ঢোঁক গিলবার জন্যই সে একটু থামে।

কাকার কাছে শুনলাম, এটা নাকি আমাদের বংশের ধারা। একবার অ্যাটাক হয়, ছ-মাস এক বছর চিকিৎসার পর সেরে যায়। কাকারও হয়েছিল। বিশেষ চিকিৎসা আছে, দাদারও সেই চিকিৎসাই হবে। যে কবিরাজ বাবার চিকিৎসা করেছিলেন তিনি বেঁচে নেই, তবে তার ছেলে আমাকে জানিয়েছে যে মরার আগে তিনি আমাদের বংশের এই অসুখটার চিকিৎসাব সমস্ত খুঁটিনাটি লিখে রেখে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন।

কমল একটা গোঙানির মতো আওয়াজ করে উঠবার চেষ্টা করে। মিনিট খানেক ধস্তাধস্তি করে আবার ঝিমিয়ে যায়।

কাকা বললেন, প্রত্যেকটি লক্ষণ বাবার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। অন্য কাউকে চিনতে পারে না, কিন্তু বউদিকে দেখলেই দাদা রেগে ওঠে, মারতে যায়। বাবাও মা-কে দেখলেই ভায়োলেন্ট হয়ে যেতেন। বউদিকে সব বলেছি, আপনিও বুঝিয়ে বলবেন, বেশি যেন মন খারাপ না করেন। দাদা ঠিক সেরে যাবে, হয়তো ছ-মাসও লাগবে না।

অনিমেষ কাতরভাবে বলে, এটা ঠেকানো যায় না ? একবার হবেই সকলের ?

নির্মলও কাতরভাবে বলে, হবেই বলা যায় না, সম্ভাবনা আছে। জ্যাঠামশায়েব হয়নি, তার বড়োছেলের বয়সও প্রায় পঞ্চাশ হল, তার হয়নি। কতগুলি নিয়ম পালন করলে নাকি ঠেকানো যায়। বাবা আমাদের ছেলেবেলা খেতে দিতেন না, বারবার বলতেন কখনও যেন সিগারেট না ধবি। আরও অনেক নিয়ম মানাতেন, শিখিয়ে দিতেন। আমার চেয়ে দাদা এ সব ভালো জানত, বড়ো হয়ে গ্রাহ্য করেনি। আমাদের মাছ-মাংস সিগারেট সব চলেছে। কিছুদিন থেকে ক্লাবে গিয়ে দাদা একটু একটু ড্রিঙ্ক করছিল। আমবা টেব পাইনি, বউদিকে বলেছিল যে ক্লাবে পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে হয, এক-আধপেগ না খেলে মেলামেশা যায় না।

ড্রিঙ্ক শুরু করার ঠিক দু-তিনমাসের মধ্যেই অ্যাটাকটা হল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে অনিমেষ বলে, তোমবা তোমাদের চিকিৎসা চালিয়ে যাও, আমি একজন স্পেশালিস্টকে দেখাব।

গাড়ি চালাতে চালাতে কেশব ভাবে তাব অসুখটা বেড়ে চলতে চলতে একদিন সেও যদি পাগল হয়ে যায় ?

আশ্চর্য কিছুই নয়। কমলের মতো সুস্থ সবল হাসিখুশি মানুষটার মাথা যদি হঠাৎ এমনভাবে বিগড়ে যেতে পাবে, তার মাথায় গোলমাল হয়ে যাওয়া অসম্ভব কী ?

আশ্চর্য এই যে কথাটা ভেবে নির্মলেব মতো তার আতঙ্ক জাগে না। পাগল যে হয়ে যায় তার ভাবনাই বা কী তাকে দুঃখকষ্টের বোধই বা কী থাকে ? পাগল হলে তো আর চেতনা থাকে না যে আমি পাগল হয়েছি !

অনিমেষের আর্থিক অসুবিধা চলেছে। তবু সে জামাইকে স্পেশালিস্ট দেখাবে।

রোগটা কী এবং কেন যদি জানা যায়। যদি অল্পদিনে রোগ সাবাবার উপায় থাকে। রোগ সারলেও আক্রমণের অনেক নিদর্শন রেখে যাবে নিশ্চয। কমলেব কাকাকে দেখলেই সেটা টেব পাওয়া যায়। পাগল না হলেও মানুষটা যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নয়, মাথার মধ্যে অনেক রকম পাগলামি বাসা বেঁধে আছে।

কমলের বেলা এর যতটা সম্ভব প্রতিবাদ যদি কবা যায়।

তাব রোগের কোনো স্পেশালিস্ট নেই ? কেশব ভাবে। কেউই বলে দিতে পারে না কী তার অসুখ, কেন সে ভুগছে, এ বোগের আবোগ্য আছে কি নেই ?

স্পেশালিস্ট অবলার পক্ষাঘাতের কারণ পষ্ট বলে দিয়েছে—মেরুদণ্ডের ভিতরে কী যেন হযেছে তার। এ কথাও জানিয়ে দিয়েছে যে অবলাব সেবে উঠবার আশা নেই।

জেনে অবলা যেন নিশ্চিন্ত হয়েছে।

তার যদি এ জীবনে আবোগ্যলাভের আশা না থাকে, সেটা জানাই ভালো। দেহমন একটু তাজাবোধ কবলেই তার যে আশা জাগে, সে যে স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ কবে নীবোগ নির্ভয় আনন্দময় জীবনের, এই মিথ্যা আশা মিথ্যা স্বপ্নকে বাতিল করে দিয়ে রোগের বোঝা বইতে বইতে জীবনটা কাটিয়ে দেবার জন্য নিশ্চিন্ত মনে প্রস্তুত হতে পাবে

কত মানুষ কত রোগের যাতনা সয়ে পঙ্গু হয়ে আরোগ্যের আশা ছেড়ে দিযে জীবন কাটাচ্ছে। সেও নিজেকে তাদেরই একজন মনে করবে।

আরোগ্যলাভের জন্য আর ব্যাকুল হতে হবে না।

ভাবতে ভাবতে কেশবের মনে হয়, কমলকে যে স্পেশালিস্টকে দিয়ে দেখানো হবে, সেও যদি তার শরণ নেয় ?

তার অবশ্য মাথার ব্যারাম নয়। কিন্তু যে মাথা দিয়ে মানুষ জগতে এত কাণ্ড করছে, সূক্ষ্ম থেকে বিরাট সব কিছুই যে মাথার আয়ত্তে, সেই মাথা বিগড়ে গেলে তার বিশেষ চিকিৎসা যাকে শিখতে হয়েছে তার কি আর অন্য রকম রোগ সম্পর্কে জ্ঞান নেই ? মাথার মতো অঙ্গ, সে অঙ্গের চিকিৎসায় দেহযন্ত্র সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান না থাকলে কি স্পেশালিস্টের চলে ?

তার মাথাও ঘোরে—ঝিমঝিম করে।

সংকল্পটা ক্রমে ক্রমে মাথার মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে কেশবের।

কেশব বাড়ি ফেরার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, নিমাই এসে চাপা উত্তেজনার সঙ্গে জানায়, খবর জানো ? বাবুর বড়োজামাই পাগল হয়ে গেছে। বড়োমেয়েকে দেখলেই নাকি কামড়াতে আসে—দিদিমণি তাই পালিয়ে এসেছে এখানে।

আসলে নিমাই এসেছে সিগারেট টানতে। সে এত বোকা ছেলে নয় যে কেশব কিছুই জানে না জেনে ধরে নিয়ে তাকে কমলের পাগল হবার খবর জানাতে আসবে। আসল খবর এই যে কমল উঠেছে ভাড়াটে ফ্ল্যাটে। মলিনা এসে বাস করছে এ বাড়িতে।

তাকে দেখলেই কমল নাকি মরিয়া হয়ে ওঠে !

কেশব তাকে একটা সিগারেট দিয়ে বলে, দেশের জন্য তোর আর মন কাঁদে না, না রে নিমাই ?

কাঁদে না ? বাঃ !

বেশ তো ফুর্তিতে থাকিস দেখি।

কী করি বলো ? মন খারাপ করে লাভ কী ? এবারও ধান ভালো হয়নি, তাতে আবার ধান কেটে নিয়ে গেছে। দেশে যাওয়া হবে না এখন।

তাই ফুর্তিতে আছিস !

ফুর্তি আবার কী দেখলে ? মায়ের বলে চিঠি পাইনে একটি মাস। কিন্তু মন খারাপ করে রইলে আর লাভ কী হবে বলো ?

মোহিনীর হয়েছে ডবল নিমুনিয়া।

হয়েছিল সামান্য জ্বর। ভুবন তার জ্বরের জন্য ওষুধ আনতে গেছে, সেই ফাঁকে শরতের বাগানের গাছ-ঢাকা ছায়া-শীতল পুকুরে গায়ের জ্বালা কমাবার জন্য জ্বর গায়ে অনেকক্ষণ ডোবাডুবি করে ভিজে কাপড়ে হেঁটে বাড়ি ফেরার জন্য কি না কে জানে !

জ্বরের জন্যই পুকুরের জলে গা জুড়োতে যাওয়া।

সেটা কী জ্বর ছিল ?

মোহিনীর কিছু হলেই ভুবনশ্বের কাবু হয়ে পড়ে। যথাসর্বস্ব হারাবার ভয়ে মানুষ যেমন ভড়কে যায়।

লেভেল ক্রসিংয়ের ওপার থেকে বেশি ভিজিটের ডাক্তার এনেছে। দিবারাত্র ডাক্তারের নির্দেশমতো ওষুধপত্র খাওয়াচ্ছে, সেবা করছে।

জরুরি চিঠি লিখেছে ভাই, খুড়ো আর ভগিনীপতির কাছে। সাহায্য চাই, টাকার সাহায্য সেবা-যত্ন দেখা-শোনা করার সাহায্য।

বাড়ি ফেরার পথে খবর নিতে গিয়ে কেশব দ্যাখে, দরজায় দাঁড়িয়ে ভুবন মুখ বাঁকিয়ে বিড়ি টানছে।

ভুবন বলে, এইমাত্র ঘুমালো।

বলে, একলাটি আর তো পেরে উঠছি না ভাই। চিঠির একটা জবাব কেউ দিলে ? টাকা না দিক—

টাকা চেয়েছিলে বুঝি ভুবনদা ?

চিকিৎসার জন্য চেয়েছি। কোনোদিন তো চাই না, আজ হঠাৎ এমন বিপদ হল—

কেশব খোঁচা দেবার সুরে বলে, ওদেরও দোষ নেই ভুবনদা। কোনোদিন কোনো সম্পর্ক রাখবে না, বিপদে পড়ে হঠাৎ সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখবে। দু-চারবছরের মধ্যে বউঠানকে নিয়ে একবার দেখা করতে গিয়েছিলে কি ? ওরা আছে না বিপদে পড়েছে খবর নিয়েছিলে কি ?

সে যাই হোক, নিজের ভাই, বাপের ভাই, নিজের বোন—

না ভুবনদা, নিজের নয়। তুমি ভাবে থাকো, বোঝ না তো সংসারের ব্যাপারটা। আদান-প্রদান না থাকলে কি আত্মীয়তা থাকে ? তোমার চিঠি পেয়ে ওরা সবাই ভড়কে গেছে। ভাবছে, জবাব দিলেই কী হাঙ্গামায় পড়বে কে জানে। একটা বড়ো রকম ঝঞ্ঝাটে না পড়লে তুমি সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখবে এটা ওরা ভাবতে পারছে না।

গোঙানির আওয়াজ শুনেই দুজনে তাড়াতাড়ি ভেতরে যায়।

মোহিনীর মাথায় বসানো আইসব্যাগটা সরে গেছে।

কেশব বলে, ব্যাগটা একজনকে মাথায় ধরে রাখতে হবে ভুবনদা।

ভুবন বলে, সারাদিন ধরেই তো আছি ভাই। কেউ তো এল না। একজন নার্স রাখব ভাবছি। কিন্তু টাকা নেই, কী করি। বাড়িটা বাঁধা দেব ভাবছি শরতের কাছে।

ললনা নানাসুরে গান গায়। মোহিনীর কাতরানির সুরটা একঘেয়ে, কিন্তু এমন ধারালো যে প্রাণের মধ্যে যেন কেটে কেটে বসে।

মোহিনী ছটফট করে, বিড়বিড় করে বকে যায়। কে দেখবে তার অপরূপ দেহের ছটফটানি, কে শুনবে তার বিকারের কথা ?

ভুবন হঠাৎ তাড়াতাড়ি আইসব্যাগটা মোহিনীর মাথায় চেপে ধরে কিন্তু রাগে গা যেন জ্বলে যায় কেশবের।

বিকারের ঘোরে মোহিনী সিনেমার কথা বলছে ! সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা নয়, সিনেমায় অভিনয় করতে যাওয়ার কথা।

জড়ানো অস্পষ্ট হলেও মোহিনীর কথা মোটামুটি বুঝতে কষ্ট হয় না। বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দুটি মনের কথাই সে জ্বরের ঘোরে প্রকাশ করছে।

আর সব কথা তুচ্ছ হয়ে গেছে তার কাছে।

'একজন সারাদিনরাত ঘরে বসে তাকে পাহারা দেবে। কাজে বেরোবে না, পয়সা রোজগার করবে না, শুধু তাকে পাহারা দেবে ! চারিদিকে পিঁপড়ে গিজগিজ করছে কি না তাই গুড়ের ভাঁড়টি পাহারা দেবে !

সিনেমায় ঢুকবেই সে এবার—কেন ঢুকবে না ? শুধু একটা দিন চান করে এলোচুলে পুজোর থালা হাতে মন্দিরে যেতে হবে, সে জন্য কতগুলি টাকা দেবে বলেছে। পরে আরও কত ছবিতে নামাবে বলছে। সারাদিন পাহারা দিয়ে তাকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখবে ভেবেছে একজন ? এবার সে পালিয়ে গিয়ে সিনেমায় ঢুকবেই।

বজ্জাতটার সঙ্গে আর সে তো থাকবে না [illegible]র গেলেও।

বিহ্বল ভুবনের ক্লিষ্ট-কাতর মুখের দিকে চেয়ে কেশবের রাগও হয়, হাসিও পায়—মায়া হয় না।

এবার ভুবন টের পেয়েছে যে বিয়ে করা বউয়ের রূপকে পর্যন্ত শুধু পাহারা দিয়ে নিজের করে রাখা যায় না, তারও দাম দিতে হয়। মানুষ সমুদ্র পাহাড় মরুভূমি বনজঙ্গল তন্নতন্ন করে খুঁজে আনে যা কিছুর দাম আছে। এক টুকরো হিরের লোভে কত বড়ো বড়ো খনি খোঁড়ে। এমন অপরূপ দেহ

মোহিনীর—আঁকা ছবিতে যে দেহের আশ্চর্য গঠন সৌন্দর্যে, যৌবনের বিকাশ কৃত্রিম মনে হত, চোখ মেলে দুদণ্ড পর্দার ছবিতে সেই জীবন্ত বাস্তব রূপ দেখে মানুষ খুশি হয়ে পয়সা দিতে প্রস্তুত।

উপযুক্ত মূল্য না দিয়েই এই রূপকে ঘরের মধ্যে কোণে নিজের করে রাখার সাধ্য যেন ভুবনের আছে !

এমনভাবে পাহারা দিলেও সিনেমার ডাক ঠিক এসে পৌঁছে গেছে বন্দিনী মোহিনীর কাছে।

দিনরাত চোখে চোখে রাখে তবু কোন ফাঁকে মোহিনীর কাছে আহ্বান এসে গেছে—চলে এসো, নিজের দাম বুঝে নাও।

মোহিনীর ভাঙা ভাঙা যে কয়েকটি কথা তার কানে গিয়েছে তার চেয়েও গভীরভাবে সে ধরতে পেরেছে তার আসল তাৎপর্য।

কেশবের মনে পড়ে যায় পুরানো ব্যাপারটা। খুব বেশি পুরানো নয়, বছর-দেড়েক আগের কথা।

কী সম্পর্কে ভাই হয় মোহিনীর, সিনেমা-জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। সে এসে উশকানি দিয়ে সিনেমায় অভিনয় করে নাম ও পয়সা রোজগারের জন্য খেপিয়ে দিয়েছিল মোহিনীকে।

ভুবন চোখ কপালে তুলে বলেছিল, রাম রাম, ছিছি, ভদ্রঘরের মেয়েরা ওখানে যায় ?

মোহিনীর ভাই কড়াসুরে বলেছিল, আমার বউটা ভদ্রঘরের মেয়ে নয়।

ভালোভাবে বুঝিয়ে বলার চেষ্টাও সে করেছিল। সিনেমা-জগৎটাকে কদর্য করে রাখা হয়েছে সত্যি কিন্তু সেটা শুধু মাতাল আর বেশ্যাদের জগৎ নয়। টাকার চেয়ে কিছুই বড়ো নয় সেখানে, মনুষ্যত্বের কেনাবেচা চলে। কিন্তু রূপ আর গুণেরও খানিকটা কদর আছে বইকী ?

কারিগর আর কাঁচামাল ছাড়া তো কিছুই তৈরি হয় না। যতই সস্তা করা হোক ছবি, যতই চেষ্টা চলুক সস্তায় রূপ ও গুণ ভাড়া কবাব রূপসি আর গুণীদের বাদ দিয়ে ছবি তোলা কর্তাদের সাধ্য নয়।

শুধু রূপও ওরা কেনে। রূপসি অভিনয় একেবারে না জানুক, ডায়ালগ বেশি নেই, অ্যাকশন বেশি নেই, রূপসি মেয়েটিকে এখানে-ওখানে গুঁজে দিয়ে ছবি জমাবার সস্তা কায়দায় ওরা নিজেদের ওস্তাদ ভাবে।

তার বউকে কেন নিয়েছে সিনেমায় ?

তার বউ হাসিখুশি সখির পার্ট খুব ভালো করতে পারে। তার বেশি সে কিছুই পারে না। শুধু নায়িকার হাসিখুশি সখি হওয়া ! তিন ছেলের মা হল, তিন-চারমাসের বাচ্চাটাকে তার হেফাজতে রেখে গিয়ে সে মহারানির চিফ সখির পার্টও করেছে।

বিগড়ে তো সে যায়নি ? বরং তার অনেকগুলি ঘরোয়া দোষ কেটে গেছে।

প্রকৃতি রূপ দিয়েছে মোহিনীকে। মোহিনী যদি শক্ত হয়ে থাকে, তার রূপের সিনেম্যাটিক ছবিটুকু ছাড়া কিছুই বিক্রি করতে না চায়, কার সাধ্য আছে তাকে বিগড়ে দেবে ?

ভুবন আর তর্ক করেনি। বয়োজ্যেষ্ঠ শালাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলেছিল, খবরদার আমার বাড়িতে আর এসো না, অপমান হবে।

আজকেই তো করলে চূড়ান্ত অপমান ?

আকাশের বাঁকা চাঁদটার দিকে কয়েক মুহূর্ত চোখ তুলে চেয়ে থেকে ভুবন বলেছিল, আবার এলে অপমান নয়, খুন করব।

সে আর আসেনি। কিন্তু সিনেমার ডাক ক্রমাগতই এসেছে মোহিনীর কাছে।

ভুবন টের পায়নি।

কী করে টের পাবে ভুবন ? মোহিনীর জ্বরের জন্য ওষুধ আনতে ডাক্তারখানায় গেলে সেই ফাঁকে যে মোহিনী গায়ের জ্বালায় পুকুরে ডুব দিয়ে আসে, এটাও কি সে ভাবতে পেরেছে না জানতে পেরেছে।

ভুবন যেন কাতরভাবে কেশবের কাছে নালিশ জানায়, কোনোদিন মুখ ফুটে কিছু বলবে না। কিছু চাইবে না—

কিন্তু কেশবের সহানুভূতি মেলে না।

এ কী আর বলতে হয় ভুবনদা ? কথায় আর যাই হোক পেট ভরে না।

কী জানি, আমি এ সব বুঝি না ভাই। হিমসিম খেয়ে গেলাম।

বাড়ি ফিরে কেশব মিনুকে ডাকে।

ভুবনদার বউয়ের অসুখ জানিস ?

জানি না ? তিন-চারবার দেখে এসেছি।

শুধু দেখে না এসে একটু সেবা-যত্ন করলে ভালো হত। ভুবনদা একলা পারছে না।

মিনু মুখ বাঁকিয়ে বলে, তোমাদের হুকুম হলেই গিয়ে সেবা করতে পারি ! সঙ্গে তো আবার একজন পাহাবা দরকার হবে ? আচ্ছা সে আমি ঠিক করে নেব, ভোলা নয় খুকুকে সঙ্গে নিলেই হবে।

মিনু নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকে। কেশব টের পায় তার নিজের কিছু বলার আছে।

তোমার মত না থাকলে এখানে হবে না, বুঝলে ? ছোড়দাদের জানিয়ে দেব, আমি রাজি নই, গোলমাল করব। তোমার কথার দাম দেব না ? একটা কিছু কারণ না থাকলে তুমি যেন এমনই অমত করছ !

বাড়িতে তার মান বজায় থাকবে বোনের এই আশ্বাসে কেশব স্বস্তিও পায় না, বোনের কাছে কৃতজ্ঞতাও বোধ করে না। আগেই সে টের পেয়েছে যে তার কথার দাম না দেবার মতলব বাড়ির লোকের নেই। সেদিন যতই জোর গলায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে থাক পরে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করেই সকলে চুপ হয়ে গেছে।

তার মনের ভাবটা ভালো করে বুঝে তবে ওরা এগোবে। তার অমত যদি খুবই জোরালো হয় তাহলে অগত্যা সেটা মেনে নিতেই হবে সকলকে—কিন্তু সেদিনের রাগারাগি ঝগড়াঝাঁটির পর কেশবের চরম জিদ যদি খানিকটা নরম হয়ে থাকে, যদি টের পাওয়া যায় যে তার মতামত অগ্রাহ্য করলে খুব চটে যাওয়া ছাড়া সে বিশেষ কিছুই করবে না, তাহলে তার অমতেই মিনুর বিয়ে এখানে দেওয়া হবে।

কেশব খুশি হতে পারেনি।

এর চেয়ে সকলে তাকে অগ্রাহ্য করলেই যেন ভালো হত। রঞ্জনের সঙ্গেই এরা মিনুর বিয়ে দেবে জেনে মায়ার সমস্যাটা জরুরি হয়ে উঠেছিল। মিনুর বিয়ের আগেই তাকে মনস্থির করে ফেলতে হত।

তারা দুজনে স্বাধীন মানুষ, এ জগতে কারও কোনো ক্ষতি না করে পরস্পরকে ভালোবেসেছে। তাদের সম্পর্কের গোপনতা শুধু তাদেরই সুবিধার জন্য। কলঙ্কের ভয় তারা করে না। জানাজানি হলে তারা প্রকাশ্যভাবেই একসঙ্গে বাস করবে। ভব হলে আইনসঙ্গতভাবে, সামাজিকভাবে।

সে স্বার্থপর হোক, সারাজীবনের জন্য মায়ার দায়িত্ব নিতে তেমন উৎসাহ বোধ না করুক, এ হিসাবে তার ফাঁকি নেই। ভালো লাগুক বা না লাগুক, জানাজানি হলে সে তো আর মায়াকে ফেলতে পারবে না।

কিন্তু রঞ্জনের সঙ্গে মিনুর বিয়ের প্রস্তাব কলঙ্কের প্রশ্নটা অন্য দিক দিয়ে গুরুতর করে তোলে।

এখন জানাজানি হোক, কলঙ্ক রটুক, সে হবে শুধু তাদের দুজনের কলঙ্ক, দু-বাড়ির দুটি মানুষের। তারা দুজন বাড়ি থেকে বিদায় নিলেই চুকে গেল।

কিন্তু রঞ্জন আর মিনুর বিয়ে হলে একটা সম্পর্ক সৃষ্টি হবে দুটি পরিবারের মধ্যে। কলঙ্ক তখন আর তাদের দুজনের থাকবে না, তখন আঘাত গিয়ে লাগবে দুটি পরিবারের গায়েই।

তারা দুজন চিরকালের জন্য চলে গেলেও লাগবে।

অথচ এদিকে গোপনতা বজায় রাখতে বাধ্য হলেই, জানাজানি হওয়াকে ভয় করলেই তার আর মায়ার সম্পর্ক দাঁড়িয়ে যাবে অন্যায়, অসঙ্গত।

তাই কী করবে না করবে তাকে ঠিক করে ফেলতেই হয় মিনুর বিয়ের কথা পাকা হবার আগেই।

কিন্তু আর সেটা জরুরি নয়। জোর গলায় সে না বললেই চাপা পড়ে যাবে রঞ্জনের সঙ্গে মিনুর বিয়ের প্রস্তাব।

এর চেয়ে সমস্যাটার মীমাংসা করে ফেলা জরুরি থাকাটাই যেন ভালো ছিল। বাধ্য হয়ে কী করবে না করবে তাকে ঠিক করতেই হত, অন্ত হত এই টালবাহনার।

তাড়াহুড়ো না করলেও চলে, রঞ্জনের সঙ্গে মিনুর বিয়ে অবশ্যম্ভাবী নয়, এটা টের পাওয়ামাত্র তার মনে হয়েছে, আগে তবে স্পেশালিস্টকে দেখাবার হাঙ্গামাটা মিটিয়ে নেওয়া যাক, তারপর বিবেচনা করা যাবে মায়ার কথা !

মিনুর বিয়ে বলেই যেন তাদের একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে হবে শুনে মায়া বলেছিল, ধন্য মানুষ তুমি ! সূক্ষ্ম তোমার বিচার। সংসারে মেয়ে-বউ যেন কেউ ঘর ছেড়ে যায় না, আমি প্রথম যাচ্ছি। আমরা চলে গেলে যা হবার হবে অত ভাবনা কীসের ?

সত্যই কি সে বেশি রকম ভাবে, চিন্তায় অনাবশ্যক জটিলতা নিয়ে আসে ? সে বাঁকা মানুষ তাই সহজভাবে পষ্টভাবে কিছু ভাবতেও পারে না, করতেও পারে না ?

আট

দীর্ঘ জটিল পরীক্ষার পর স্পেশালিস্ট ডাক্তার দত্ত তার অভিমত প্রকাশ করে।

কেশব সাগ্রহে ললনাকে জিজ্ঞাসা করে, ডাক্তার কী বললেন ? ললনা হঠাৎ চটে যায়।

তা জেনে আপনার দরকার কী ?

না, এমনি জিজ্ঞেস করছি। সেরে যাবে তো ?

সারবে বইকী।

কিন্তু বাড়ির ড্রাইভারের কাছে কি আর গোপন থাকে বাড়ির জামায়ের রোগ সম্বন্ধে স্পেশালিস্ট ডাক্তার কী বলেছে সেই খবর।

বংশগত কারণে কমল পাগল হয়েছে এটা একেবারে উড়িয়ে দিয়েছে ডাক্তার দত্ত। উন্মাদ রোগের ঝোঁক একটু থাকতে পারে এই বংশে, তার বেশি কিছু নয়। রোগের আসল কারণ ছিল কমলেরই নিজের জীবনে এবং নিজের দেহে।

সাধারণ হিসাবে লজ্জাকর কারণ। অন্তত দেহগত কারণটা। দেহের বিকার আর জীবন যে সম্পর্কহীন নয় মানুষের।

কমলের বাবা যে চিকিৎসায় সেরেছিল সে চিকিৎসায় কুলোবে না। ডাক্তার দত্তকে দিয়েই চিকিৎসা করানো দরকার।

প্রণব মত দিয়েছে কিন্তু কমলের মা আর কাকা বেঁকে দাঁড়িয়েছে।

তারা বলে, এ সব হল ডাক্তারের চালাকি। একরাশি টাকাই শুধু খরচ হবে, ফল পাওয়া যাবে না কিছুই। এ রোগের কি দ্বিতীয় চিকিৎসা আছে ? বংশানুক্রমে পরীক্ষিত সুনিশ্চিত চিকিৎসা থাকতে একজন স্পেশালিস্ট বলছে বলেই অন্ধকারে এগিয়ে চলার কোনো মানে হয় ?

ডাক্তার দত্তের চিকিৎসা চললে তারা সহায়তা করবে না !

এখন মলিনা 'যা বলে।

মলিনাকে দেখলেই কমল অবশ্য উগ্র হয়ে কামড়াতে যায়, তবু সে তার বিবাহিতা স্ত্রী। কমলের টাকা-পয়সা সব তারই হেফাজতে আছে। তিন বছরের ছেলেটাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে মলিনা বলে, আমি তো কিছুই বুঝতে পাবছি না বাবা। তবু মলিনাকে তাজা মনে হয়। মুখে সে বলে বটে যে কিছুই বুঝতে পারছে না, মনে মনে কিন্তু সে ডাক্তার দত্তের উপর নির্ভর করতেই ইচ্ছুক।

ডাক্তার দত্তের কল্যাণে সে একটা স্থায়ী দুঃস্বপ্নের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে। বংশগত রোগ নয় ! ছেলেকেও তার বড়ো হয়ে একবাব পাগল হতে হবে এটা ভাগ্যের অনিবার্য নির্দেশ নয় ! মলিনা যেন অনেক শান্তি পেয়েছে।

অনিমেষ বলে, কিন্তু তোমাকেই শেষ কথা বলতে হবে।

মলিনা চিন্তিত মুখে বলে ডাক্তার দত্ত যখন বলছে স্পেশালিস্ট দরকাব, আমার তো মনে হয়—

অনিমেষ বলে, আমিও তাই বলছি।

ডাক্তার দত্তকে দিয়ে নিজের পবীক্ষা কবানোর জন্য এবার কেশব উদগ্রীব হয়ে পড়ে। একজন কেন পাগল হয়েছে যদি ঠিকভাবে ধরতে পারে ডাক্তার দত্ত, তার অসুখটা নিশ্চয় অনায়াসে ধরে ফেলবে।

অনিমেষের কাছে সে একখানা পরিচযপত্রের আবেদন জানায়।

তোমার আবার কী হল ?

মাথার যন্ত্রণা, রাতে ঘুম হয না—

অনিমেষ চমৎকৃত হয়ে বলে, সে জন্য এত বড়ো স্পেশালিস্টকে দেখাবে ? ওর ফি কত জানো ?

কেশব বলে জানি বইকী ! দেখি যদি একটু কম-টম করেন। সাধারণ ডাক্তারের চিকিৎসায় কিছু হল না। ভয় হচ্ছে, যদি পাগল হয়ে যাই ! টাকার মায়া করে কী হবে বলুন ! যথাসর্বস্ব যায় যাবে, অসুখটা যদি সারে—

পরিচয়পত্র লিখতে গিয়ে অনিমেষ কয়েকবার মুখ তুলে তার দিকে চায়। মাথায় ছিট আছে সন্দেহ নেই, নইলে এই জোয়ানমদ্দ সুস্থ-সবল মানুষটা মাথা ধরে আর ঘুম হয় না বলে স্পেশালিস্টকে দেখাতে চায়। একটা বিয়ে করলেই তো সব সেরে যায়।

ড্রাইভারকে সোজাসুজি বিয়ের কথাটা বলতে সংকোচ হয় অনিমেষের। সে একটু ঘুরিয়ে বলে, আমারও এ রকম হয়েছিল। তোমার চেয়ে কম বয়সে। মাথা ঘুরত, ঘুম হত না। তারপর চাকরি নিলাম, বিয়ে করলাম, আপনা থেকে সব সেরে গেল।

সেরে গেল ? মাথাব মধ্যে ঝিমঝিম কবে ওঠে অনিমেষের, কিছুদিনের জন্য সেরে গিয়েছিল বটে—কিন্তু তারপর মাঝে মাঝে মাথা কি তার ঘোরেনি, ঘুমের জন্য ছটফট করেনি ? পদোন্নতি হওয়ার পর জামাই পাগল হবার পর আবার কি মাথাটা তার বেশি করে ঘোরে না, ঘুমের জন্য সারারাত ছটফট করে না ?

কেশব বলে, আমার অসুখটা আরও কঠিন। ডাক্তাররা ধরতেই পারল না কী হয়েছে !

নিশ্বাস ফেলে অনিমেষ বলে ছুটি নেবে তো চিকিৎসার জন্য ?

কয়েক দিনের ছুটি যদি দ্যান—

অনিমেষ গম্ভীর হয়ে বলে, দ্যাখো স্পেশালিস্ট দেখাচ্ছ, ট্রিটমেন্ট দু-চারদিনের ব্যাপাব হবে না। আমাকে আবার নতুন ড্রাইভার রাখার হাঙ্গামা করতে হয়। তার চেয়ে এককাজ করা যাক—

কেশব প্রতীক্ষা করে।

কী জানো, আমি আর ড্রাইভার রাখবই না ভাবছিলাম, নিজেই ড্রাইভ করব। তোমাকে একেবারে বিদেয় দিতে মন চায় না। একটু সম্পর্ক বজায় থাক। তুমি রোজ শুধু আমাকে অফিসে পৌঁছে দেবে আর আপিস থেকে ফিরিয়ে আনবে। তোমার আর কোনো ডিউটি থাকবে না। পাববে ?

পারব।

আজ মাসের মোটে সতেরো তারিখ। তা হোক, এ মাসটা তোমায় ছুটি দিয়েছি ধরব। শুধু আপিসে পৌঁছে দেবে নিয়ে আসবে তবু এ মাসের পুরো মাইনেটাই পাবে। সামনের মাস থেকে মাইনেটা অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া যাবে, কেমন ?

পদোন্নতি হয়েছে, আয় পড়ে গেছে ধপাস করে, কতদিকে খরচ কমেছে, কেষ্ট বিদায় হয়েছে, নিমাই নোটিশ পেয়েছে, তাকে কেন বহাল রেখেছে অনিমেষ—এই কথাই কিছুদিন থেকে ভাবছিল কেশব। প্রত্যাশাও করছিল বরখাস্তের হুকুমের।

কিন্তু নিজে গাড়ি চালিয়ে আপিস গেলে মান থাকে না অনিমেষের। ড্রাইভার-চালিত গাড়িতে বসে সিগার টানতে টানতে অন্তত আপিস যাওয়া আর আপিস থেকে বাড়ি ফেরাটা তাকে বজায় রাখতেই হবে আপিস করার অঙ্গ হিসাবে।

কীভাবে কথাটা তাকে বলবে ভাবছিল অনিমেষ। আজ সুযোগ পেয়েই পাকা ব্যবস্থা করে নিয়েছে। কেশব বুঝতে পারে।

পরিচয়পত্রখানা তার হাতে দিয়ে অনিমেষ বলে, নতুন ব্যবস্থায় তোমার কোনো ক্ষতি নেই, তুমি ফ্রি থাকবে সারাদিন, অন্য কাজ করতে পারবে। আমিই ব্যবস্থা করে দেব। আমাকে আপিস পৌঁছে দিয়ে তুমি সেই কাজে চলে যাবে, দরকার সময় আমাকে তুলে নিয়ে আসবে। মোটামুটি দেখ, উপার্জন তোমার বেশি হবে।

কেশবের হাতঘড়ির হিসাবে পুরো দু-ঘণ্টা তেরো মিনিট পরে ডাক্তার দত্ত তাকে কামরায় ডাকে—অনিমেষের লেখা পরিচয়পত্রটি পাঠানো সত্ত্বেও।

কেশবের মনে হয়, পরিচয়পত্র না এনে সোজাসুজি নিজে এসে ধন্না দিলেই বোধ হয় ভালো করত !

ডাক্তার দত্ত হাসিমুখে বলে, অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি ? উপায় নেই। দিন দিন রোগীর ভিড় বাড়ছে, আর পেরে উঠছি না আমি।

ডাক্তার দত্তের রকম দেখে আর মুখের ভাব দেখে কেশব আশা ছেড়ে দেয়। রোগীব ভিড়ে ডাক্তার বিহ্বল হয়ে গেছে। বিশেষ রোগী হিসেবে তার বিশেষ চিকিৎসা কি এর দ্বারা সম্ভব হবে ?

ডাক্তার দত্ত ক্লান্ত শান্ত সুরে জিজ্ঞাসা করে, ব্যাপারটা কী ? বসুন। রোগীর চেয়ারে বসতে না বলে আপনাকে অন্য চেয়ারে বসতে বলা উচিত ছিল। আজ পর্যন্ত আপনার মতো সুস্থ-সবল রোগী আমার চেম্বারে আসেনি।

কেশব বিনীতভাবে বলে, আপনার যদি আজ সময় না থাকে—

ডাক্তার দত্ত ক্লান্তমুখে হাসি এনে বলে, আপনি কতক্ষণ সময় আমাকে দিতে পারেন আর আমি কতক্ষণ সময় আপনাকে দিতে পারি পরীক্ষা হোক না ? সাতটায় এ চেয়ারে বসেছি, এগারোটা বাজে। সন্ধ্যা পর্যন্ত নয় বসব আপনার জন্য। আপনি পারবেন তো ?

হঠাৎ খুশির যেন সীমা থাকে না কেশবের !

সে টের পায় ডাক্তার দত্ত তার চিকিৎসা শুরু করে দিয়েছেন ! নইলে সামান্য একটা ড্রাইভার রোগীর জন্য এতবড়ো স্পেশালিস্ট ডাক্তার এমন বকবক শুরু করে ?

ডাক্তার দত্ত মেরুদণ্ড সোজা করে হাই-পাওয়ার চশমায় স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থেকে বলে, কোনো রোগ নেই, তবু কত লোক যে আমায় শুধু টাকা দেবার জন্য আসে ! আবার রোগী হলেও টাকা দিয়ে আমায় যেন কিনে নিয়েছে এমনিভাবে ফিরিস্তি পেশ করে, আমার এই অসুখ, ওই অসুখ। দশ-বিশবছরের অসুখ, কিন্তু আশা করে রাতারাতি আমি সারিয়ে দেব। এতগুলি টাকা দিলে আমি এত বড়ো ডাক্তার, রাতারাতি দশ-বিশবছরের পুরানো রোগ না সারাতে পারলে আমি আছি কী জন্য ?

কেশব সত্যই ভড়কে যায় !

জগতে জটিল কঠিন রোগ আছে বলেই প্রতিদিন নিরুপায় রোগী এককাঁড়ি টাকা এ সব স্পেশালিস্টদের পায়ের কাছে ফেলে দেয়। রোগীকে এদের গ্রাহ্য না করারই কথা। অথচ তাকে রোগীর চেয়ারে বসিয়ে ডাক্তার দত্ত রোগের বিবরণ শোনার বদলে নিজের কথা বলতে আরম্ভ করেছে—ডাক্তারকে কত খাটতে হয়, রোগীরা কেমন অবুঝ, রোগ সারান কত কঠিন কাজ !

কুড়ি-বাইশবছরের একটি মেয়ে এক কাপ ঘোলাটে রঙিন কী একটা পানীয় এনে টেবিলে রেখে প্রশ্ন করে, আজও পারবে না তো ?

ডাক্তার দত্ত মাথা নাড়ে।

মেয়েটি রুষ্ট মুখে বলে, তবে আর দরকার নেই।

বলে গটগট করে ভেতরে চলে যায়।

ডাক্তার দত্ত হাসিমুখে কেশবের দিকে চেয়ে বলে, দেখলে তো ? রোগীও দেখব আবার ঘরের লোকের ফরমাশ না শুনলে তারাও চটবে ! সবাই যেন পেয়ে বসেছে আমায়।

আরও প্রায় আধঘণ্টা এমনিভাবে এলোমেলো কথাবার্তা চালিয়ে ডাক্তার দত্ত সেদিনকার মতো কেশবকে বিদায় দেয়। বুকে স্টেথস্কোপটা পর্যন্ত লাগায় না।

রোগটা কী দেখলেন না ?

না, আজ কেবল রোগীকে দেখলাম। রোগীকে না বুঝলে রোগ বুঝব কী করে ?

কেশব স্বস্তি পায়। কৃতজ্ঞতা বোধ করে। হঠাৎ যেন আশার গুঞ্জন শোনে। না, এ ডাক্তার সত্যি খুব ভালো। গোড়াতেই ঠিক ধরেছে তার রোগের একেবারে আসল কথাটি।

রোগটা যে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে তার জীবনে, তাকে ভালো করে না জানলে রোগ যে ধরা যাবে না, এটা অনুমান করতে দেরি হয়নি।

ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্টগুলি নিয়ে পরদিন আবার তাকে যেতে বলা হয়।

পরদিন রিপোর্টগুলি দেখতে দেখতে ডাক্তার দত্ত বলে, বাঃ, এ তো অর্ধেক কাজ এগিয়ে আছে !

পরীক্ষা ও চিকিৎসা মোটামুটি কীভাবে কতদিন চলবে, খরচ কতদূর গড়াতে পারে এ সব বিষয়ে সেদিন কথা হয়।

ডাক্তার দত্ত বলে, তোমার কী অসুখ হয়েছে বলা কঠিন হবে না। কিন্তু আসল কথা হল কেন হয়েছে বার করা।

আরেকটি কথা খুব পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলা হয় কেশবকে। ডাক্তারের কাছে কোনো কথা গোপন করলে চলবে না—তার নিজের জীবনের কথা। খোলাখুলি সব জানাতে হবে।

ডাক্তার অবশ্য রোগীর সব গোপন কথা শোনে শুধু চিকিৎসার জন্য, ভালোমন্দ বিচারও করে না, ও সব কথা মনে করেও রাখে না।

কথাটা ভালো করে ভেবে দ্যাখো।

খোলাখুলি সব বলতে পারবে না যদি মনে করো, তাহলে আর না এগোনোই ভালো। তোমার কতগুলি টাকা আর আমার সময় শুধু নষ্ট হবে। তার চেয়ে বরং টাকাগুলো সব আমায় দিয়ে চলে যাও—এককথাই দাঁড়াবে।

গোপনীয় কী আছে তার জীবনে ডাক্তার দত্তকে যা জানানো যাবে না ? এমন কোনো পাপ তো সে করেনি কখনও ডাক্তারকেও যা বলা যায় না।

শুধু এক মায়ার কথা। মায়ার কথা জানাতে তার আপত্তি কী ? মায়ার নাম-ধাম-পরিচয় নিশ্চয় ডাক্তার দত্তের দরকার হবে না !

সে সরলভাবে বলে, দেখুন, একজনের সঙ্গে আমার গোপন ভালোবাসা আছে—একটি বিধবার সঙ্গে। নাম-ঠিকানা বলতে হবে না তো ?

না না, নাম-ঠিকানা আমার দরকার নেই। ভালোবাসাটা কী রকমের পরে সেটা একটু জানালেই হবে—আমি প্রশ্ন করব তুমি জবাব দেবে। আরও অনেক কথা জানতে হবে।

কেশব বিব্রতভাবে বলে, গোপনীয় আর কিছু নেই। কিন্তু আর একটা কথা বলি। এই ভালোবাসার ব্যাপারটার জন্য কিন্তু আমার অসুখ নয়। এটা অনেক পরে ঘটেছে।

ডাক্তার দত্ত সায় দিয়ে বলে, আমিও তাই বলছি। আগে অসুখ, পরে ভালোবাসা। কাজেই তোমার ভালোবাসাটা কী বকম তাই থেকে রোগের লক্ষণ জানা যাবে।

কেশব ভাবে, কী সর্বনাশ ! মায়ার সঙ্গে তার ভালোবাসা তার রোগেরই একটা লক্ষণ নাকি ? একবার ভাবে সোজাসুজি কথাটা জিজ্ঞাসা করে। আবার ভাবে, এ রকম প্রশ্ন কি করা চলে ডাক্তারকে ?

ডাক্তার দত্ত বলে, কথাটা গোলমেলে লাগছে ? আচ্ছা এই পয়েন্টটা নিয়েই আমাদের কাজ শুরু করা যাক। ভালোবাসা থেকে অসুখের লক্ষণ• কীভাবে বার করা যায় ? ভালোবাসার ওপরেও অসুখটার প্রভাব থাকায় কতগুলি পিকুল্যারিটিজ এনে দেয়। কাজেই ওগুলি অসুখেরই লক্ষণ। ওইগুলি বিচার করলে—

সেদিন দুটি চিন্তা মাথা জুড়ে থাকে কেশবের।

টাকার চিন্তা আর প্রেমের রহস্যের চিন্তা।

একটি পয়সা কখনও জমাবার চেষ্টা করেনি, নিজের খরচ বাদে সব টাকা বাড়ির লোকের পিছনে খরচ করেছে। আজ এত দরকারি চিকিৎসার টাকা তার হাতে নেই !

বাড়িটা বাঁধা রাখতে হবে কিংবা বেচে দিতে হবে। কে জানে। কী হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে বাড়ির সকলে। এমন একজন বন্ধু পর্যন্ত তার নেই যার কাছে কিছু টাকা ধার করতে পারে। বন্ধু তার শুধু কানু, ধার দেবার মতো টাকা কানুর নেই।

ভালো হয়ে যাবার আশা আরও জোরদার হয়ে উঠেছে আজ। মনে এসেছে দ্বিধাহীন সংকল্প, চিকিৎসা শেষ পর্যন্ত সে চালিয়ে যাবেই। বাড়ির সকলে যতই রাগ করুক যতই চেঁচাক, দরকার হলে বাড়ি সে বিক্রি করবে।

নিজের প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তায় কেশব আশ্চর্য হয়ে যায়। এমন গুরুতর বিষয়ে এমন অনায়াসে মনস্থির করে ফেলা তো তার নিয়ম নয় !

ডাক্তার দত্ত বলে দেয়নি কিন্তু আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর থেকে কেশবের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কথাটা যে তার প্রেমটা গোপন বলে, গভীররাত্রে চুপিচুপি গিয়ে মিলিত হবার রোমাঞ্চ আছে বলে সে মায়াকে ভালোবাসে ! এটা না থাকলে তার বুকে ভালোবাসা জাগত না, এর অভাব ঘটলে তার ভালোবাসা নির্জীব হয়ে যাবে।

মায়াকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মতো ঘর বাঁধতে এই জন্য তার উৎসাহ জাগে না !

ভাসাভাসাভাবে এই সত্যের ঈঙ্গিত আগেও তার মনে এসেছে।

কিন্তু কেশব সন্তুষ্ট হতে পারে না। শুধু এইটুকুই কি তার প্রেমের রহস্য ?

মনে হয়, এ শুধু আংশিক সত্য। আরও গভীর কিছু আছে তার ভালোবাসায়, আরও বড়ো সত্য আছে।

কেন তার মনটা এমন হল, সে প্রশ্ন নয়। সে প্রশ্নের জবাব আবিষ্কার করতে আরও সময় লাগবে ডাক্তার দত্তের।

যে কারণেই রাত্রির গোপনতার রোমাঞ্চকর অসামাজিক প্রেমে তার রুচি জন্মে থাক, সেটাই সব কথা নয়। মোহিনীর সঙ্গে ভালোবাসার খেলায় ঢের বেশি রোমাঞ্চ আর উত্তেজনার প্রতিশ্রুতি ছিল। মায়ার সঙ্গে ভাব হবার আগে মোহিনীর তীব্র আকর্ষণে নিজের রোগের যাতনা পর্যন্ত সে প্রায় ভুলে গিয়েছিল। তবু তো মোহিনী চেষ্টা করেও তার মন পায়নি।

মোহিনীর স্বামী আছে বলে ? পাপ-পুণ্য না হোক, ন্যায়-অন্যায় উচিত-অনুচিতের বিচার তার আছে বলে ? নীতিজ্ঞান ?

কেশব জানে না। তাই যদি হয় তবে সেটাও তো প্রমাণ যে ওই রোমাঞ্চটাই তার কাছে সব নয়, যথেষ্ট নয় !

আরও কিছু সে নিশ্চয় পেয়েছে মায়ার কাছে, আরও বড়ো কিছু। নইলে তার ভালোবাসা পাওয়ার ভাগ্য মায়ার হত না !

নয়

বাড়িটা বাঁধা রেখেই কেশব টাকা জোগাড় করে।

বাড়িতে তুমুল প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। কিন্তু সে গ্রাহ্যও করে না। বিশেষ বিচলিতও হয় না।

বাড়ির মানুষ তর্ক করতে চায়, ঝগড়া করতে চায়, রাগারাগি করতে চায়, কিন্তু তাকে বাগাতে পারে না। কখনও ধৈর্য ধরে চুপচাপ তাদের কথা শুনে, কখনও ধমক দিয়ে আবার কখনও সোজাসুজি স্থানত্যাগ করে সে তাদের সঙ্গে সংঘাত যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলে।

আরোগ্যলাভের জোরালো আশাই মনে তার আশ্চর্য রকম জোর এনে দিয়েছে।

মায়া বলেছিল, আমার দুটো গয়না লুকানো আছে। নেবে ?

না।

মোহিনীর অসুখ সেরেছে কিন্তু এখনও সে বিছানা ছাড়েনি। রোগে ভুগে একটা অদ্ভুত কমনীয়তা এসেছে তার রূপে।

আগেকার ছেলেটির সঙ্গেই মিনুর বিয়ে দেওয়া হবে স্থির হওয়ায় গোবিন্দ চটে গিয়ে ভাংচি দিয়ে সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েছে।

রঞ্জনের সঙ্গে তার বিয়ে দেবার সাধটা আবার প্রবল হয়ে উঠেছে সকলের মধ্যে।

কানুর বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গেছে। বেলা একদিন সকালে বেড়াতে এসে কেশবকে বলে, তোমার বন্ধুটি এক নম্বরের ইয়ে কেশবদা। কিছু নেবে না নেবে না শেষ পর্যন্ত ঘাড়টি মটকেছে। বাবা দাদা দুজনকেই দেনা করতে হল।

এমনিই দেনা করতে হচ্ছে মানুষকে, একটা মেয়ের বিয়ের জন্য করতে হবে না ?

নিমাই একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। কাছেই একটা ময়রার দোকানে।

খুব খাবার খাবি মজা করে ?

না, সিনেমা দেখব।

কেশব নতুন কাজ খুঁজছিল, অনিমেষকে আপিসে পৌঁছে দিয়ে ফিরিয়ে আনার সামান্য পয়সায় তার চলবে কেন। দেনাও শোধ দিতে হবে।

কানু বলে, বাস চালাবি ?

পারব ? সহ্য হবে ?

কানু চটে বলে, সহ্য হবে ? জোয়ানমদ্দ মানুষ তুই, বলতে লজ্জা করে না ? কিছুদিন শিখতে হবে, বাস। ভালো রোজগার।

বলে, তাছাড়া, বাস চালালে তোর ওই হিস্টিরিয়া ভাবটা সেরে যাবে। ব্যাটাছেলে দু-চুমুক মদ খেতে ভয় পায় !

হিস্টিরিয়া !

ডাক্তার দত্তও তার অসুখের নাম বলেছে কী একটা যেন হিস্টিরিয়া। মেয়েদের যে হিস্টিরিয়া হয় সে রকম নয়।

শুনে কেশব বলেছিল, সে কী স্যার, হিস্টিরিয়া তো মেয়েদের হয় ?

পুরুষের হয় না ? মেয়েদের তুলনায় তোমরা মহাপুরুষ বলে ? তোমার অসুখের এটা একটা বড়ো লক্ষণ—মেয়েদের তুমি খুব হীন ভাবো। মেয়ে জাতটার সম্পর্কেই তোমার একটা দারুণ ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা আছে। এটা তোমার অসুখের কারণও হতে পারে।

এখন ঠিক বলতে পারছি না, এ ভাবটা তোমার কোথা থেকে এল, কেন এল খুঁজছি।

কেশব হতভম্ব হয়ে বসে থাকে।

কানুও তার হিস্টিরিয়া ভাবের কথা বলেছিল। বলেছিল অবশ্য দু-চুমুক মদ খেতে তার আতঙ্কের নিন্দা করে, কিন্তু অন্যান্য আরও সব লক্ষণ হয়তো তার চোখে পড়েছে।

এমনিতে কানুর মতো সাধারণ একজন মিস্ত্রির পর্যন্ত যা মনে হয়েছে, এত বড়ো একটা স্পেশালিস্ট ডাক্তারের কাছে সেটা ধরা পড়ে যাবে বইকী।

কিন্তু হিস্টিরিয়া ?

সে কাতরভাবে বলে, তাহলে ওই যে মাথা ঘোরে বুক ধড়ফড় করে ঘুম হয় না—ও সব আমি ভান করি বলছেন স্যার ?

ডাক্তার দত্ত হাসিমুখে বলে, তা কেন বলব ? ওগুলি তোমার অসুখের লক্ষণ। নিউরেস-থেনিয়ায়—মানে স্নায়বিক দুর্বলতাতেও এ সব লক্ষণ হয় বটে কিন্তু মুখ দেখেই বলে দেওয়া যায় তোমার নার্ভাস মোটেই উইক নয়। হিস্টিরিয়ায় রোগের ভান করে, কিন্তু তোমার সেটা নেই। এই অসুখটার রকমফের আছে তো, রোগী আর কারণের ওপর সেটা নির্ভর করে।

তবু যেন কেশব মানতে পারে না তার হিস্টিরিয়া হয়েছে। ন্যাকা মেয়েদের যে রোগ হয়।

সে বলে, কিন্তু আমি তো কোনো রকম পাগলামি করি না স্যার ? পাড়ার একটি বউয়ের হিস্টিরিয়া আছে, মাঝে মাঝে খেপে গিয়ে—

ডাক্তার দত্ত বাধা দিয়ে বলে, বউটির সঙ্গে তোমার তফাতটা ভুলো না। সে হেসে-কেঁদে গড়াগড়ি দিয়ে পাগলামি করে, তুমি অন্যভাবে করো।

করি স্যার ?

নিশ্চয় করো।

সেরে যাবে তো ?

নিশ্চয় সেরে যাবে। তোমার অসুখের ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝে গিয়েছি। এবার চিকিৎসা আরম্ভ হবে। এটা মনের অসুখ তাই তোমার চিকিৎসাটাও হবে মানসিক।

কেশব প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, কিন্তু আমার তো কাব্যিরোগ নেই স্যার ? বরং রসকষ খুব কম। গাড়ি হাঁকাই, রোগটার কষ্ট আছে—

ডাক্তার দত্ত হেসে বলে, কাজেই তুমি নীরস কাঠখোট্টা মানুষ হয়ে গেছ ? একেবারে চাঁছাছোলা বস্তুবাদী ? এইখানেই হয়েছে তোমার মুশকিল। নিজেকে বোঝ না, কিন্তু তেজেব সঙ্গে সেটা তুচ্ছ কবে উড়িয়ে দিতে পারো। তুমি জেনে রেখেছ রসিক ভাবুক মানুষ কথায় কথায় হেসে-কেঁদে আকুল হয়, ভাবাবেগে গদগদ হয়ে থাকে। কাব্যিক রোগ বলতে তুমি বোঝ ছ্যাবলামি, ন্যাকামি। তুমি ভাব যেহেতু তুমি সব সময় সব বিষয়ে সিরিযাস, কাজেই কাব্যিরোগ তোমার হতেই পারে না।

কেশব চুপ করে থাকে।

কিন্তু সিবিয়াসলি নিয়েছ বলেই কি তোমার অবাস্তব অসম্ভব কল্পনা আর ইচ্ছাগুলি বাস্তব হবে, সম্ভব হবে ? তুমি যে মেয়েলি হিস্টিবিয়া দেখেছ, তোমার কাছে ছ্যাবলামি পাগলামি ঠেকলেও তাবা নিজেদেব কাছে কি কম সিবিয়াস ? ভাব তো, কতখানি সিরিয়াসলি নিলে মানসিক ভুল ধারণা দেহের ক্রিযাকে কন্ট্রোল করতে পারে ? একটু দরদের জন্য কত বকম উদ্ভট কাণ্ড করে, তোমার কাছে ওই ফাঁকা দরদের কোনো দাম নেই। দবদের লোভে রোগের ভান করার কথা তুমি ভাবতেও পাবো না। জেগে থেকে হালকা মিষ্টি স্বপ্নের জাল বোনা তোমার আসে না, ও রকম কাব্যিরোগকে তুমি ঘেন্না করো। বেশ কথা। কিন্তু তুমি যে দুটো জগৎকে জয় করতে চাও ভোগ করতে চাও, দুবকম দুটো জীবনকে একসঙ্গে আঁকড়ে থাকতে চাও—এটাকে কী বলব ? এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে চেয়ে তুমি যে মিথ্যা কল্পনার জাল বুনে চ'লা, সেটাকে কী বলব ? ভুল ধাবণা বাঁকা কামনা থেকে যদি মেয়েলি হিস্টিরিয়া হয়, তোমার ভুল ধ বণা অসম্ভব ইচ্ছা থাকলেও তুমি রেহাই পাবে কেন ?

বুঝলাম না স্যার।

আজ বুঝিযে বলছি, আবার বুঝিয়ে বলব, তোমাকে বুঝতেই হবে। তাছাড়া তোমার আর কোনো চিকিৎসা নেই।

এ কথাও বুঝলাম না স্যার।

এ কথাটা বুঝতে কষ্ট হবে না। তোমার অসুখের চিকিৎসায় ওষুধপত্র লাগবে না। তোমার ভাষাতেই বলি, মেয়েলি হিস্টিরিয়া হলে ওষুধপত্র কাজে লাগে, তোমার বেলা দরকার লাগবে না। তোমার ব্যাপারটা তোমায় বুঝিয়ে দেওয়াই তোমার একমাত্র চিকিৎসা। আমি এতদিন বুঝবার চেষ্টা কবে এসেছি, এখনও খুঁটিনাটি অনেক কিছু আমারও বুঝতে বাকি আছে। তবে মোটামুটি যা বুঝেছি তাতে এবাব আসল চিকিৎসা শুরু করে দেওয়া যেতে পারে। আসল চিকিৎসাটা হল তোমায় বোঝানো, তোমার কতগুলি ভুল ধারণা ভেঙে দেওয়া।

কেশব নীরবে চেয়ে থাকে।

ডাক্তার দত্তকে কয়েক মুহূর্তের জন্য আনমনা মনে হয়। কেশব টের পায় ডাক্তার দত্ত তাকে বোঝাবার উপযুক্ত সহজ ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না।

বেশ কিছুক্ষণ গভীরভাবে ডাক্তার দত্ত চিন্তা করে, কেশব টুঁ শব্দটি করে না, নড়াচড়া করে না। ডাক্তার দত্তের চিন্তাটা তারই আরোগ্যের জন্য।

ভুল ধারণা ভেঙে দেওয়ার মানেটা গোড়ায় ভালো করে বুঝে নাও। তোমার আমার মন হল হরেক রকম ভুলের গুদাম। কত রকমের ধারণা সংস্কারে যে ঠাসা হয়ে আছে বলা যায় না। আমি কিন্তু তোমার মনের ভুলের গুদামটা সাফ করার চেষ্টা করব না। সে ক্ষমতা আমার নেই। আমি তোমায় কিছুই শেখাব না। অন্যগুলি বাদ দিয়ে আমি শুধু তোমার মনের কয়েকটা বিশেষ বিশেষ গলদ বেছে নেব, তোমার অসুখটার জন্য যেগুলি দায়ি।

কেশব চেয়ে থাকে।

আসল গলদটা হল ওই—আগে যা বলছিলাম। যা আছে, যা পাওয়া সম্ভব, তুমি তাতে সন্তুষ্ট নও। প্রায় বিপরীত দুরকম জীবন তুমি একসঙ্গে চাও—তার মানেই দাঁড়ায়, দুদিকে তোমার যেমন টান তেমনই আবার বিতৃষ্ণা। তুমি দুরকম জীবন চাও কিন্তু পুরোপুরি চাও না। এক দিকে টান বেশি হলে তুমি সেই দিকে ভিড়ে পড়তে, একেবারে সন্তুষ্ট না হলেও ভালোলাগা মন্দলাগা মেশাল দিয়ে মোটামুটি দিন কাটত—হিস্টিরিয়া জন্মাত না। কিন্তু তোমার মুশকিল হল ওইখানে। তুমি যত জোরের সঙ্গে এটা-ওটা দুটোই চাও—তেমনি জোরের সঙ্গে দুটোকেই অপছন্দ করো। সেকেলে ঘরোয়া ভাব, স্নেহ-ভালোবাসা, নিজের কথা ভুলে গিয়ে মেয়েদের তোমার পায়ে নিজেকে সঁপে দেওয়া—এ সব তোমার চাই, একেবারে ছাঁকা খাঁটি জিনিসটি চাই। ওই বিধবাটির সঙ্গে তাই তোমার ভালোবাসা হয়। কিন্তু তুমি যে ছাঁকা খাঁটি জিনিসগুলি চাও সে রকম কিছু তো আর সংসার পাবার নয়—ওটা নিছক তোমার কল্পনার জিনিস। কাজেই বাস্তবে যা পাও তাতে তোমার মন ওঠে না, রাগ হয়, বিতৃষ্ণা জন্মে যায়। ভালোবেসে বিধবাটি তোমার কাছে তুচ্ছ ফেলনা মানুষ হয়ে থাকে—তুমি যা চাও দিতে পারে না বলে তোমার রাগ হয়, বিতৃষ্ণা জন্মে যায়। দরদ ভালোবাসা সস্তা মেকি মনে হয়। এদিকে তোমার আবার শহরের দিকে টান। শহুরে মেয়েটিকেও তুমি ভালোবাস—

কেশব এবার মুখ খোলে, ভালোবাসি স্যার ?

ভালোবাসো বইকী। বিধবাটি কে আমি জানি না, কিন্তু শহুরে মেয়েটি কে আন্দাজ করতে পেরেছি।

কেশব ব্যাকুলভাবে বলে, আপনার এ কথাটা ধরতে পারলাম না স্যার। অবাস্তব ছাঁকা দরদের লোভ আমার থাকতে পারে, ও ব্যাপারটা খানিক খানিক বুঝতে পারছি। কিন্তু ভালোবাসব অথচ ভোগ করতে চাইব না, আমি ও সব ন্যাকামিতে বিশ্বাস করি না। শহুরে মেয়েটিকে যদি ভালোবাসতাম, মনে মনে অন্তত চাইতাম নিশ্চয়—

চাইতে বইকী—এখনও চাও। মানুষটা তুমি খুব হিসেবি তো, রিয়ালিটি যেটুকু বোঝ সেটুকু মেনে নিতে পারো, যা সম্ভব নয় জানো সেটা নিয়ে ন্যাকামি করো না। তুমি স্পষ্ট জানো যে যতই ভালোবাস আর যতই কামনা কর, মেয়েটি তোমায় ভালোও বাসবে না ধরাও দেবে না। অসম্ভব জানো বলেই মনের চাওয়াটা নিয়ে মনে মনে ঘাঁটাঘাঁটি করে মিথ্যে স্বপ্ন দেখার বদলে সাধটা মনের মধ্যেই চেপে দিয়েছ। যতটা ঘনিষ্ঠতা সম্ভব ততটাই মেনে নিয়েছ, বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে সবটা তিতো করে দেবার চেষ্টা করনি।

ডাক্তার দত্ত হাসে।—এই মেয়েটির সম্পর্কে একটি প্রশ্ন গোড়ার দিকে তোমায় জিজ্ঞাসা করব ভেবেছিলাম। তারপর আর দরকার মনে করলাম না। প্রশ্নটা কী জানো ? মেয়েটি তোমার পছন্দমতো ভালোবাসা নিয়ে ধরা দিতে চলেছে—ঘুমিয়ে এ রকম স্বপ্ন কোনোদিন দেখেছ কি না।

কেশব পলকহীন চোখে চেয়ে থাকে।

ডাক্তার দত্ত বলে, তাছাড়া আরও একটা দিক বিবেচনা করার আছে। যে রকম ভালোবাসা তোমার প্রাণ চায় তুমি জানো ললনার ধাতেই তা আসবে না।

কেশব বলে, কী রকম ভালোবাসা চাই আরেকটু বুঝিয়ে বলুন।

কী রকম ভালোবাসা চাও ? যে রকম জীবন চাও তার সঙ্গে যেটা খাপ খায়। সব মানুষ এই নিয়মেই ভালোবাসা চায়। শহুরে আধুনিক জীবন যে চায় সে ওই রকম ভালোবাসাও চাইবে, যে সেকেলে গ্রাম্য জীবন পছন্দ করে সে সেকেলে গেঁয়ো মেয়ের ভালোবাসা খুঁজবে। তোমার পছন্দ দুরকম জীবন—অবশ্য সেই জন্যই দুরকম জীবনের ওপরে তোমার বিদ্বেষও আছে। তুমি চাও ভালোবাসার ছোটো গেঁয়ো মেয়ের সরলতা থাকবে কিন্তু যুবতি মেয়ের তীব্রতা আর গভীরতা থাকবে—নিষ্কাম অন্ধ ভালোবাসা হবে অথচ কোনো রকম ন্যাকামি থাকবে না, আবার ললনাদের ভালোবাসার মতো মার্জিত হবে, বৈচিত্র্যও থাকবে। এটাই শেষ কথা নয় কিন্তু। ভালোবাসাটা আবার মনগড়া কিছু হলে চলবে না—রক্তমাংসের মানুষের ভালোবাসা হবে, বাস্তব পৃথিবীর ভালোবাসা হবে।

কেশব খানিকক্ষণ হতভম্বের মতো বসে থাকে।

তারপর ধীরে ধীরে বলে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি স্যার। আমার মতো মেশাল জীবন তো অনেকের আছে, সবার কেন হিস্টিরিয়া দাঁড়ায় না ?

ডাক্তার দত্ত খুশি হয়ে বলে, সুন্দর প্রশ্ন করেছ। বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন করেছ। তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারবে, তোমার অসুখ নিশ্চয় সেরে যাবে। যাদের এ রকম মিশেল জীবন, হিস্টিরিয়া না দাঁড়াক সংঘাতটা কমবেশি তাদের মধ্যেও আছে। তুমি কি সকলের চেয়ে পৃথক মানুষ, ভিন্ন রকম মানুষ ? কতগুলি যোগাযোগ ঘটে তোমার বেলা সংঘাতটা—দাঁড়িয়ে গেছে হিস্টিরিয়ায়, এইমাত্র। আরও অনেকের বেলাও এ রকম নিশ্চয় ঘটেছে। তুমি তেজি একগুঁয়ে মানুষ—এটা একটা বড়ো ফ্যাক্টর কিন্তু সেটাই আসল নয়। তুমি যদি আপিসে চাকরি করতে কিংবা অন্য কোনো ভদ্র পেশা নিয়ে ললনাদের জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে, ব্যাপার অন্য রকম হত। সংঘাতটা আসত কিন্তু অবস্থা অনুসারে আপস করা সামঞ্জস্য করার ব্যবস্থাও হত। রোজগার কম হলে খানিকটা সামঞ্জস্য করে সংঘাত নিয়েই জীবন কাটাতে—বেশি রোজগার হলে ও দিকের মায়া কাটিয়ে ললনাদের মধ্যে ভিড়ে পড়তে। কিন্তু তুমি নিলে মোটর চালানোর—রিয়ালিটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেল। জীবনের রাফ সাইডটার পরিচয় পেলে। তোমার ও দিকের জীবনে, ললনাদের জীবনে, আরও উঁচুস্তরের বড়ো বড়ো লোকদের জীবনে কত ফাঁকি কত মিথ্যার রং চড়ানো সে সব তোমার কাছে ধরা পড়তে লাগল। দুর্বল প্রকৃতির লোক হলে সংঘাতটা সইয়ে নেবার এড়িয়ে যাবার পথ খুঁজে নিত—নেশা-টেশা করে জীবনটা খানিক বিগড়ে দিয়ে সামলে যেত। তেজ আর একগুঁয়েমির জন্য তোমার হল মুশকিল। তুমি আপস করলে না—দুটো জীবনকেই ভোগ করতে চাইলে। অসম্ভবকে চাইলে, স্বপ্নকে বাস্তব করার সাধটা আঁকড়ে ধরলে। ফল দাঁড়াল হিস্টিরিয়া।

ডাক্তার দত্ত খানিকক্ষণ কেশবের মুখের ভাব লক্ষ করে বলে, আজকেই সবটা বুঝে ফেলা যাবে না। একা তোমার পেছনে অত সময়ও দেওয়া যাবে না। ক্রমে ক্রমে খোলসা করতে হবে।

সেরে যাব তো ?

নিশ্চয়। এমন শক্ত সবল শরীর, তার ওপর তোমার বুদ্ধি আছে বাস্তববোধ আছে। সহজেই সেরে যাবে।

এবার অন্য রোগীর পালা।

কেশব উঠে দাঁড়িয়ে বলে, শেষ কথাটা জিজ্ঞেস করে যাই। আর সব যেমন আছে তেমনই থাকবে, আমি ব্যাপারটা বুঝলেই সেরে যাব ? এটাতেই বড়ো খটকা লাগছে মনে।

ডাক্তার দত্ত হেসে বলে, সব যেমন আছে তেমনই থাকবে কেন ? ব্যাপার তলিয়ে বুঝলেই তুমি আর মিথ্যা অসম্ভব সাধ নিয়ে অস্থির হবে না, তোমার রোগটা সেরে যাবে।

হাসি বন্ধ করে বলে, একটা কথা মনে রেখো। আমার কাছেও অসম্ভবকে সম্ভব করার আশা কোরো না। আমি ডাক্তার আমি তোমার রোগটাই সাবাতে পারি, তোমার জীবনে সুখ শান্তি আনন্দ এ সব এনে দিতে পারি না। তোমার মাথা ঘোরে, গলা শুকিয়ে যায়, বুকটা হঠাৎ ধড়াস করে ওঠে, রাত্রে ঘুম হয় না—এ সব আমি সারিয়ে দেব। তার বেশি কিছু আশা কোরো না। তোমার বাস্তব জীবনটা যদি দুঃখের হয়, মনের দুঃখে রাত্রে যদি তোমার ঘুম না হয়—তোমায় আমি বড়ো জোর ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি। তোমার দুঃখ আমি দূর কবতে পারব না।

আপনি শুধু আমার রোগটা সারিয়ে দিন।

সন্ধ্যার পর কানুকে বিবরণ জানাতে গিয়ে কেশব দ্যাখে, কানু বিছানায় শুয়ে আছে, তার বাঁ পায়ে আর মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা।

কী ব্যাপার রে ?

ব্যাপার আর কী, অ্যাকসিডেন্ট।

কাজ করতে করতে দুর্ঘটনা ঘটে। পায়ের তিনটি আঙুল ছেঁচে গিয়েছিল, হাসপাতালে কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছে। মাথায় চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

কী করে হল ?

আর বলিস কেন, ব্যাটার যত সস্তা রদ্দি মেশিন দিয়ে কাজ চালাবার চেষ্টা।

দুর্ঘটনার বিবরণ শুনতে শুনতে কেশব হঠাৎ বলে ওঠে, আরে, পরশু না তোব বিয়ে ?

সারা মাথায় ব্যান্ডেজ জড়ানো, শুধু মুখ খোলা। কানু হেসে বলে, জ্বর-টর যদি না এসে যায়, পায়ে মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে বিয়ে করতে যাব। ওদের বিশ্বেস নেই বাবা। আজ এক রকম ভাবে কাল আবেক রকম ভাবে—সময় পেলে একটা গোলমাল পাকিয়ে বসত কি না কে জানে।

কেশবও একটু হাসে।—তুই এমন বিয়ে পাগলা হয়ে উঠবি কোনোদিন ভাবতেও পারিনি।

বিয়েপাগলা মানে ? ওকে আমি বিয়ে করবই। ফাঁক পেলে যদি জোর করে অন্য কারও সঙ্গে গেঁথে দেয় ? নইলে দু-চার ছ-মাস এদিক-ওদিক হল তো বয়ে গেল।

জোর করে কারও সঙ্গে গাঁথতে পারবে না। ও মেয়ে শক্ত আছে। ওকে নোয়ানো যাবে না। জোরটা পেল কোথা থেকে তাই ভাবি। ভারী আশ্চর্য লাগে।

আশ্চর্যের কী আছে ? দিনকালটা দেখতে হবে তো। বোকা নরম পুতুল হয়ে থাকা মেয়েদেবও আর পোষাচ্ছে না বাবা। দিনকাল ঘাড় ধরে শক্ত বানিয়ে দিচ্ছে, চালাক করে দিচ্ছে।

এ কথা নিয়ে কেশব তর্ক চালায় না। তিনটে আঙুল গেছে, মাথা ফেটেছে, তবু হঠাৎ সে বন্ধুর সম্পর্কে দারুণ একটা ঈর্ষা অনুভব করে।

ভাবে, গাড়ি চালানো শিখে বড়োলোকের গাড়ি চালানোর বদলে সে যদি কানুর মতো গাড়িগুলি মেরামত করার কাজ শিখত !

জীবনের গতিটাই হয়তো তার একেবারে হয়ে যেত অন্য রকম।

রোগও হত না, ডাক্তার দত্তের কাছে চিকিৎসার জন্য ধন্নাও দিতে হত না।

মেয়েলি-মার্কা নয়, পুরুষালি-মার্কা নয়, হিস্টিরিয়া। তবু কী বিশ্রী রোগ। কানু মিস্ত্রি কেন, ঝাঁকা-মুটে হয়েও যদি এ রোগের দায় এড়ানো যেত, তাও হত অনেক বড়ো সৌভাগ্যের কথা।

কমপেনসেশন পাবি না ?

পাব না ? ইয়ার্কি নাকি ! তিনটে আঙুল গেছে, মাথা ফেটেছে, কমপেনসেশন পাব না ? দেবে তো কয়েকটা টাকা, আঙুল তাতে জোড়া লাগবে ?

ঝাঁঝের সঙ্গে জোর দিয়ে কথা বলতে যাওয়ায় মাথায় বোধ হয় ঝাঁকি লাগে। কানু মুখ বিকৃত করে।

কেশব বলে, যদি না দেয় ? যদি বলে তোর নিজের দোষে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে ?

যদি না দেয় মানে ? ঘাড় দেবে ! বেশ মোটা রকম কমপেনসেশন দেবে। নইলে বাছাধনকে ছেড়ে দেব ভেবেছিস ? পচা বদ্দি মেশিন দিয়ে কাজ চালাবে, অ্যাকসিডেন্ট হলে কমপেনসেশন দেবে না--ইয়ার্কি নাকি ?

কানুর মা চা দিয়ে যায়। বলে, চেয়ে দ্যাখো কাণ্ডখানা। লেখাপড়া শিখবে, অফিসে ভালো চাকরি করবে, সুখে থাকবে। তা নয়, লেখাপড়া শিকেয় তুলে সাহেব তাড়াতে গিয়ে জেল খাটা চাই। কী দরকার তোর সাহেব তাড়িয়ে ? চাকরিগুলো তো বানিয়েছে সাহেবরাই। লেখাপড়া শেখ, একটা সাহেব নয় তার পেয়ারের লোককে ধরে চাকরি বাগা।

কথা যাই বলুক, যে মনোভাবই প্রকাশ পাক কথায়, দুর্ঘটনায় আহত ছেলের জন্য মায়ের দরদ আর বেদনাই উথলে বেরিয়ে আসছে টের পেয়ে তারা চুপ করে থাকে।

কেশবের মনটাও নাড়া খায়। সেও চুপ করে শোনে।

তবু তার মনে প্রশ্ন জাগে, এও কি হিস্টিরিয়া ?

কানুর মা-র এক চোখে ছানি পড়তে শুরু করেছে, চুপসানো মুখে একটি দাঁতেরও বালাই নেই। কানু তার শেষ বয়সের শেষ ছেলে, আগের ছেলেমেয়েগুলি কোনোটাকে আঁতুর থেকে, কোনোটাকে শৈশবকালে যম টেনে নিয়ে গেছে।

চায়ে চিনি ঠিক হয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করে কানুর মা আবার আবেগের সঙ্গে শুরু করে, মরার সময় ওর বাপ বলে গিয়েছিল, ছেলেকে মানুষ কোরো, লেখাপড়া শিখিয়ো। মৃত্যুশয্যায় মানুষটাকে কী বলেছিলাম জানিস বাবা ? নিজে উপোস করি তবু ছেলেকে মানুষ করব, লেখাপড়া শেখাব। মানুষটার মৃত্যুশয্যায় বলেছিলাম তো বটে, কিন্তু কী করি বলো ? ছেলের নেই লেখাপড়ায় মন, দেশ থেকে সাহেব তাড়াতে লাগল। জেল খেটে তাই এই মিস্তিরিগিরি করা। এবার মাথা ফেটেছে, আরবার গুলি খেয়ে মরতে হবে। কিছু দেখিনি শুনিনি জানিনি বুঝিনি ভাবছ ? সাহেব তাড়াতে পাগল হলে এ দশা হবেই হবে।

এ সব কথা বলতে গেলেই কানু চিরদিন চটে গেছে স্মরণ করে বুড়ির বোধ হয় খেয়াল হয় যে তার ছেলে আর ছেলের বন্ধু চুপচাপ মন দিয়ে তার এ ধরনের কথা শুনছে।

ও মা, কড়ায়ে তেল চাপিয়ে এয়েছি যে—পুড়ে গেল বুঝি। এবার মরলে বাঁচা যায় !

তারপর ওঠে কেশবের অসুখের কথা।

কানু সব শুনে বলে, সব ধাপ্পাবাজি। খালি কথার মারপ্যাঁচ। বাড়ি বাঁধা দিয়ে টাকাগুলো ফাঁকিবাজকে গছিয়ে দিলি।

কেশব বলে, না। ডাক্তার খুব জব্বর, পেটের কথা টেনে বার করে। মুখ ফুটে বলিনি, আমার কথা থেকে আঁচ করে কী বললে জানিস ?

কেশব মুচকে মুচকে হাসে। আড়চোখে কানুর দিকে তাকায়। বেলার মা হঠাৎ পট করে মরে যাওয়ায় তার বিয়েটা প্রায় দুমাস পিছিয়ে গিয়েছিল। এক মাস অশৌচ, তারপর এক মাস বিয়ের তারিখ ছিল না। পছন্দ-করা মেয়ে বেলার সঙ্গে বিয়ে—দুজনে মিলে অনেক চেষ্টায় সম্ভব করা বিয়ে।

কানু তাই দুর্ঘটনার জন্যও বিয়ে পিছিয়ে দেবে না—ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থাতেও বেলাকে বিয়ে করে আনবে।

ললনাকে সে ভালোবাসে শুনে কে জানে কানু কী বলবে ! সে তো মায়ার কথাও জানে।

কী ডাক্তার বললে ?

বললে এমনি সুবিধে হবে না জানি, তাই বাবুর মেয়েটার সঙ্গে স্বপ্নে পিরিত জমাই। আমি একেবারে থ বনে গেলাম মাইরি। কী স্বপ্ন দেখি সেটা পর্যন্ত আঁচ করেছে।

কানু বলে, আহা, ওটুকু আমিও বলতে পারতাম। মুখচোখ ভালো না, রংটাও সুবিধের নয়। কিন্তু মাইরি, কী গান গায়। আমি ক-দিন ক-টা মিটিংয়ে গান শুনেছি। মনে হয়েছে, এ রকম না হলে মেয়ে ? কী ছাই একটা বেলাকে পছন্দ করেছি, বড়ো ছোটো নজর তো আমার !

কানু হাসে।—তুই সর্বদা গান শুনছিস, রোজ মেলামেশা চলছে—জোয়ানমদ্দ মানুষ তুই। মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে পিরিতের স্বপ্ন দেখবি না। তুই কি শুকদেব ?

স্বপ্ন দেখে লাভ ?

লাভ-লোকসানের হিসেব কষে লোকে স্বপ্ন দ্যাখে নাকি ? যে স্বপ্ন দেখতে সাধ যায় সেটাই দ্যাখে।

জানিস না বুঝিস না, বিদ্যা ফলাস না বেশি। ভয়ের স্বপ্ন দেখিসনি কখনও ? স্বপ্ন দেখে ঘেমে-টেমে ঘুম ভাঙেনি ? খানিকক্ষণ বুক ধড়ফড় করেনি ?

সে তো আলাদা স্বপ্ন। আমি মজাদার স্বপ্নের কথা বলছি। পেট গরম না হলে কেউ কখনও ভয়-টয়ের বিশ্রী স্বপ্ন দ্যাখে ? পেট গরম হওয়াটা কী বাবা স্বপ্নের দোষ !

কতকাল ডাক্তার দত্তের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে আসছে, সদ্য শুনে এসেছে তার ব্যাধি থেকে শুরু করে তার প্রেম আর আসল ব্যাখ্যা, কেশব সবজান্তার মতো হাসে।

বলে, না ভাই, জ্ঞান-বিজ্ঞানকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমাকে তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছেন। আমার মনের ভেতরের খবর আমার জানা নেই, উনি ঠিক ঠিক সব বাতলে দিলেন। আমার শরীরে কোনো রোগ নেই এ তো আগের ডাক্তারও বলেছিল। রোগ যে মনের, শরীরে যা হয় সেটা মনের রোগ থেকে হয়, এটা ধরতে পারেনি। ইনি ঠিক ধরেছেন। মনের রোগটা কেন হল তা পর্যন্ত বলে দিয়েছেন, —এ কী সোজা কথা ?

কেশব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

এবার সেরে যাব।

সেরে গেলেই ভালো।

দশ

কিন্তু কই আরোগ্য ?

দিন কাটে, মাস কাটে, আরোগ্যলাভের সূচনাও তো দেখা যায় না ?

বুঝতে তো পেরেছে সবাই। ভোরে ঘুম ভেঙে কেন শহরের জন্য মন উতলা আর সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে বোসপাড়া তাকে কেন টানে, মায়ার দরদ কেন চায়, ললনার সঙ্গ কেন চায়, কিছুই বুঝতে তার বাকি নেই।

কিন্তু মাথা তো আগের মতোই ঘোরে, বুক তো আগের মতোই আচমকা ধড়াস করে ওঠে, অদ্ভুত এক তৃষ্ণায় বুক আর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে, জলে যে তৃষ্ণার কষ্ট মেটানো যায় না।

মাঝে মাঝে আগের মতোই অজানা আতঙ্ক অস্থির করে রাখে।

টাকার দুশ্চিন্তায় রাত্রে বরং আরও বেশি ঘুম হয় না।

বাড়ি বাঁধা রাখার টাকা ফুরিয়ে এল। এ টাকা কী করে শোধ করবে তার জানা নেই।

ডাক্তার দত্ত চেঞ্জের কথা বলেছে।

কিন্তু বাইরে কোথাও চেঞ্জে যাবার সাধ্য তার নেই। পয়সা পাবে কোথায় ?

চেঞ্জে গিয়ে বোধ হয় লাভও নেই।

রোগের কষ্ট আরও বেড়ে যাবে। থাকতে পারবে না।

ডাক্তার দত্তের কাছ থেকে অন্তত বর্তমান পরিবেশটা থেকে সরে থাকবার উপদেশ পেয়ে চন্দননগরে মামার বাড়ি কিছুদিন থাকতে গিয়েছিল।

দু-তিনটে দিন একটু ভালো লাগল, তারপরেই যেন হুহু করে চড়ে গেল রোগের সবগুলি লক্ষণ। পালিয়ে আসতে হল বোসপাড়ায়, কলকাতা শহরে।

নতুন কাজ পেয়েছিল। রাজেনবাবু নামে একজন ব্যাবসাদারের গাড়ি চালাবার কাজ। অনেক ঘোরাফেরা করতে হয় বলে মাইনে ছিল ভালো।

অনিমেষের লোক জুটছিল না, অল্প পয়সায় শুধু অপিসে পৌঁছে দেবার লোক পাওয়া শক্ত। প্রতিবেশী বীরেশ গাড়ি কিনলে তার সঙ্গে ব্যবস্থা করে অনিমেষ বলতেই বেশি মাইনের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে বীরেশের কম মাইনের কাজে সে ঢুকে পড়েছে।

টাকার এত টানাটানি তবু বেশি টাকার কাজটা সে ছেড়ে দিল। —ওই কাজের অসুবিধার জন্য অসুখটা বেড়ে গিয়েছিল বলে—রাজেনের কাজে ছুটি পেয়ে বাড়ি ফিরতে বড়ো বেশি রাত হয়ে যেত বলে এবং বীরেশের বাড়িটা ললনাদের বাড়ির খুব কাছে বলে।

অসুখ কি তার সারবে না ?

ডাক্তার দত্তকে চিন্তিত দেখায়।

তুমি গলদটা নিশ্চয় বুঝতে পারছ না। তোমার ভুল ধারণার ঠিক কোনটা ভুল, আর কেন ভুল ধরতে পারছ না।

পারছি বইকী সার। এমন জলের মতো করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন তারপরেও বুঝতে বাকি থাকে ?

তোমার রাগ আর বিতৃষ্ণার কারণটা বুঝেছ ? তোমার ঘরোয়া জীবন, অনিমেষবাবুদের সভ্য জীবন,—দুটো জীবন তোমায় কেন টানে, তবু দুটো জীবনের ওপরেই কেন এত গায়ের জ্বালা ?

কেশব জোর দিয়ে বলে, শুধু বুঝেছি সার ? মনে-প্রাণে অনুভব করছি।

ডাক্তার দত্ত আবার জিজ্ঞাসা করে, বুঝে হোক না বুঝে হোক, অ্যাদ্দিন যা চাইছিলে সেটা অবাস্তব অসম্ভব কল্পনা, এটা বুঝেছ ঠিকমতো ? হাজার জোরের সঙ্গে সারাজীবন চেয়ে গেলেও তোমার উদ্ভট কামনা কোনোদিন মিটবে না ?

কেশব বলে, বুঝেছি সার।

ডাক্তার দত্ত গম্ভীর মুখে বলে, এ সব বুঝলে তো ভুল ধারণা থাকার কথা নয়। বুঝবার পরেও উদ্ভট অসম্ভব ইচ্ছাটা বজায় থাক, তাতে এসে যাবার কথা নয়। কত মানুষের কত সঙ্গত সম্ভব ইচ্ছা মেটে না। সে জন্য হিস্টিরিয়া হলে গরিব মানুষ যত আছে সবাইকে রোগটা ধরত। তাদের মধ্যেই বরং এ রোগটা সবচেয়ে কম। তাহলেই বুঝতে পারছ, তুমি কী ভাব না ভাব তাতে আসে যায় না, তুমি কী চাও বা না চাও তাতেও আসে যায় না যদি তোমার জানা থাকে যে ভাবনাটা ভুল, যা চাও তা পাওয়া যাবে না। জেনেশুনেও মানুষ কত গুরুতর ভুল ধারণা পুষে রাখে, অভ্যাস ছাড়তে পারে না। তার ফলে আর যাই হোক, এ রোগের সিমটম্‌স দেখা দিতে পারে না। ভুল ধারণা সত্যের মতো মনটা দখল করে না থাকলে শরীরের প্রভাব খাটাতে পারে না।

মনের গলদ চিনতে পারলেই কি সেরে যায় ?

না। সেটা আমার পয়েন্ট নয়। তোমার মনের গলদ সারিয়ে দেবার দায় আমার নয়—তোমাকে শুধু গলদ চিনিয়ে দেওয়া আমার কাজ। জানবার বুঝবার পরেও গলদ থেকে যেতে পারে, তোমার ইমোশনকে কনট্রোল করতে পারে—কিন্তু তখন তার একটা লিমিট থাকবে। ইমোশনের গোলমাল এতটা চড়বে না যাতে অসুখটার লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। বুঝতে পারছ কথাটা ? হিস্টিরিয়ার জন্য একটা বিশেষ মানসিক অবস্থা দরকার—সে জন্য ইয়াং গার্লদের মধ্যে এ রোগটা বেশি দেখা যায়। এই মানসিক অবস্থার আসল কথাটা কী ? ভুল ধারণা বদ্ধমূল হবে—দেহমনের কাজ নিয়ন্ত্রণ করবে। তোমার বুঝবার মতো করেই বলি। যেমন ধরো, হিস্টিরিয়ার কান্না। ছেলে মরে গেলে মা পাগলের মতো কাঁদে। তার কান্নার মানসিক কারণটা শোক। কিন্তু এটা হিস্টিরিয়া নয় এই জন্য যে ওই মানসিক কারণটার একটা বাস্তব কারণ আছে— ছেলের মরণ। এই বাস্তব কারণটা বাদ দিলেই মা র কান্নাটা হয়ে যাবে হিস্টিরিয়া কান্না। ছেলে মরেনি অথচ এ রকম কী করে হওয়া সম্ভব ? ছেলে না মরলেও মা-র মনে যদি ধারণা জন্মায় যে তার ছেলে সত্যি মরে গেছে—মনের ওই ভুল ধারণাটা তখন শোকের কারণ হয়ে মা-কে কাঁদাবে। প্রক্রিয়াটা বুঝতে পারছ ?

পারছি।

হিস্টিরিয়ার একটা লক্ষণ ধরা যাক। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের কাছে যতখানি দরদ আর সহানুভূতি পেলে সুস্থ মানুষের চলে যায়—রোগীর তাতে চলে না। তার একটা ভুল ধারণা জন্মায় যে তাকে সকলের আরও বেশি ভালোবাসা উচিত, তাকে নিয়ে সকলের আরও বেশি ব্যস্ত আর বিব্রত হওয়া উচিত। অন্যভাবে উচিতটা হয় না দেখে সে রোগের ভান করবে। তার ধারণা, রোগ হয়েছে বলে তাকে নিয়ে সবাই ভাবনা-চিন্তা করবে, ব্যস্ত আর বিব্রত হয়ে পড়বে, এটাই হবে তার মস্ত সুখ। সংঘাত থেকে তোমারও এই রকম একটা মানসিক অবস্থাটা সৃষ্টি হয়েছে, কতগুলি ভুল ধারণা জন্মেছে। এই জন্য তোমার ভিতরকার সংঘাত আর তার কারণগুলি আমাকে এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বুঝতে হয়েছে, তোমাকে বোঝাতে হয়েছে। ভুল ধারণাও মানসিক বিকার কিন্তু রোগীর যদি জানা থাকে এটা বিকার—বিকারটা বজায় রাখলে এমনকী বাড়িয়ে গেলেও আর যাই হোক, হিস্টিরিয়া হবে না। তুমি বিকৃত ইচ্ছা, বিকৃত চিন্তা-ভাবনা মনে লুকিয়ে রাখো, গোপনে তোমার বিকৃত সাধ মেটাও—সেটা আলাদা ব্যাপার। তা থেকে হিস্টিরিয়া জন্মায় না।

কেশব নিশ্বাস ফেলে বলে, তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াল সার ? রোগটা আরোগ্য হবে না ?

ডাক্তার দত্ত অভয় দিয়ে বলে, ভড়কে যেয়ো না। তোমার বোঝার মধ্যে গলদ রয়েছে— গলদটা আমাকে ধরতে দাও।

আজ কেশবের প্রথম মনে হয় যে তার বোঝার মধ্যে নয়, ডাক্তার দত্তের বোঝার মধ্যেই কোনো গলদ আছে। তার রোগটাকেও ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারছে না।

বড়োলোক রোগীরই চিকিৎসা করে এসেছে এতকাল, তার ধাতটা ঠিক ধরতে পারছে না। এত চেষ্টা করেও চিকিৎসার ফল হচ্ছে না।

অর্থাৎ অসুখটা তার সারবে না।

ডাক্তারের কাছে যাবার জন্য দু-ঘণ্টার ছুটি নিয়েছিল, বীরেশের বাড়ি ফিরে না গিয়ে সে সটান বাড়ি ফিরে যায়।

হতাশার বদলে এবার সে বোধ করে প্রচণ্ড জ্বালা। রাগে আর ক্ষোভে যেন ফেটে যেতে চায় বুকটা। যে চিকিৎসা সবার বেলা খাটে, তার বেলা সে চিকিৎসাটা পর্যন্ত খাটবে না ? তার রোগ আরোগ্য হবে না ?

কেন আরোগ্য হবে না ?

কেন তার এই অভিশাপ ?

ছটফট করার বদলে সে এবার গুম খেয়ে থাকে। কাজে যায় না, কারও সঙ্গে কথা বলে না, পুরো তিনটে দিন চুপচাপ ঘরে বসে কাটিয়ে দেয়।

ডাক্তার দত্তের কথাগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবে।

আজ পাঁচ মাসের ওপর ডাক্তার দত্তের কাছে তার আনাগোনা। কত কম টাকা নিয়ে কত ধৈর্যের সঙ্গে কত সময় দিয়ে ডাক্তার দত্ত তার রোগটা বুঝবার চেষ্টা করেছে, তার চিকিৎসা চালিয়ে এসেছে।

সে অবশ্য জানে এটা দয়া বা খেয়াল নয় ডাক্তার দত্তের। তার টাইপের রোগীর চিকিৎসা আজ পর্যন্ত সে করেনি, সে একেবারে নতুন রকম রোগী। তাই তার বৈজ্ঞানিকের মনে টাকার কথা সময়ের দামের কথা বড়ো না হয়ে আগ্রহের সঙ্গে তার রোগটা বিশেষভাবে পরীক্ষা করার এবং চিকিৎসা করে তাকে আরোগ্য করার জোরালো তাগিদ জেগেছে।

দিনের পর দিন এত করে যে কথাগুলি ডাক্তার দত্ত তাকে বোঝাতে চেয়েছে, তার কোন কথাটা সে বোঝেনি ?

মনে তার অনেক অন্ধকার। সমাজ আর জীবন, বাস্তবতা আর মানসিক প্রক্রিয়া—এ সমস্ত তলিয়ে বুঝবার সাধ্য তার নেই।

কিন্তু ডাক্তার দত্ত গোড়াতেই স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে যে তাকে তত্ত্বকথা বোঝাবার কোনো চেষ্টাই করা হবে না, তত্ত্বকথা বুঝে তবে তার রোগটা বুঝবার দরকারও হবে না।

ডাক্তার দত্তের ভাষাটা পর্যন্ত মনে আছে। আঙুল উঁচিয়ে হাসিমুখে বলেছিল : অর্থাৎ, তোমাকে আরেকজন ডাক্তার দত্ত হয়ে উঠবার কোনো প্রয়োজন হবে না। তুমি নিজের কমনসেনস দিয়ে তোমার নিজের জীবনের মানেটা বুঝলেই যথেষ্ট হবে।

কী স্বস্তিই সেদিন সে বোধ করেছিল !

সত্যই তো, তার জ্ঞানবুদ্ধির বোধগম্য করে না বললে সে যে কিছুতেই বড়ো বড়ো কথা বুঝবে না এটা যার খেয়াল আছে সে কী সোজা সাধারণ স্পেশালিস্ট।

নইলে সে কি এমন জোরের সঙ্গে বলতে পারে যে কমলের রোগ বংশগত নয়, পুরানো চিকিৎসায় ফল হবে না ? তিনপুরুষ ধরে জানা আর প্রমাণ করা সত্যকে বাতিল করে এমন জোরের সঙ্গে কথা বলা কি মুখের কথা ?

তিনপুরুষ ধরে কমলের বাপ-ঠাকুর্দারা পাগল হয়েছে বংশগত কারণে, লাগসই পুরানো চিকিৎসায় তারা সেরেও গিয়েছে।

কিন্তু কমল পাগল হয়েছে অন্য কারণে, তার ভিন্ন চিকিৎসা দরকার—তিনপুরুষের সত্যকে বাতিল করে জোর গলায় এ কথা কি কেউ বলতে পারে সব কিছু স্পষ্ট পরিষ্কারভাবে না জেনে না বুঝে ?

তবু তার বেলাই ব্যর্থ হয়ে গেল এতবড়ো অভিজ্ঞ স্পেশালিস্টের রোগনির্ণয় আর চিকিৎসা।

তাকেও কি কম জোরের সঙ্গে ডাক্তার দত্ত জানিয়েছে যে তার রোগ কী তা জানা গেছে, চিকিৎসা কী হবে ঠিক করা গেছে, সে নিশ্চয় সেরে যাবে ?

তাকে তো বুঝতেই হবে এটা কী ব্যাপার।

পাগল কমল সেরে যাবে।

তার রোগটা কেন সারবে না ? এরও একটা কারণ আছে নিশ্চয় !

চারদিনের দিন প্রায় রাত্রি থেকে উঠে একটিবার শহরে যাবার জন্য, ললনার সঙ্গে একটু মেলামেশার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে কেশবের মন-প্রাণ।

মায়ার সঙ্গেও এ ক-দিন দেখা-সাক্ষাৎ কথাবার্তা নেই।

এ রাত্রিটা ভোর হয়েছে। শহর থেকে ফিরে আজ রাত্রেই মায়াকে সে টের পাইয়ে দেবে, তাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে না পারুক কত সে তাকে ভালোবাসে।

ভোররাত্রে ঘাটে নাইতে গেলে কাচের গেলাসে চুরি করে সদ্য দোয়া উষ্ণ টাটকা দুধ নিয়ে মায়া আজ আসে না।

বাছুর বড়ো হয়েছে। দুধটাও ঘন হয়েছে। বেশি দুধ আনবার সাহস মায়ার হয় না, কোন গোরু কত খেলে কত দুধ দেয় সে হিসাব গোয়ালা কেন, ছাপোষা গোরু-পোষা গেরস্থরও জানা হয়ে গেছে। যেটুকু দুধ মায়া আনে, একচুমুক খেয়ে কেশবের মনে হয় খানিকটা অমৃত পান করল।

আজ মায়া না আসায় কেশব ভাবে, ভোরের আগেই ঘাটে এসেছে রাত থাকতে। মায়া বুঝি তাই টের পায়নি।

আধঘণ্টা পরে আবার সে ডোবায় আসে। আধঘণ্টা আগে যে ডোবায় এসে ডুব দিয়ে গেছে সেটা বাতিল করতে হয় বাধ্য হয়ে।

শীতের রাত্রিশেষে একবার ডুব দিয়েছে মায়াব জন্য, আজ রাত্রে তাদের দেখা হবে মায়াকে এই সুসংবাদ জানিয়ে খুশি করার জন্য, ভোরে আরেকবার তাকে ডুব দিতে আসতে হল ডোবায়।

মায়া তখন আসে।

দুধের গেলাসের বদলে কয়েকখানা এঁটো বাসন হাতে নিয়ে এসে বলে, রাগ কোরো না। দুধ দুয়ে নিয়ে চুরি করে খাই বলে পরশু সকালে বাখাবি দিয়ে মেরেছে। পিঠে কালচে পড়ে গেছে একেবারে, দেখবে ?

শায়া-ব্লাউজের বালাই নেই মায়ার। আঁচলটা সরিয়ে দিতেই কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত টানা ব্লু-ব্ল্যাক কালির মতো মৃত রক্তের কালশিরাটা চোখে পড়ে।

খুব জোরেই বাখারি মেরেছে।

কেশব বলে, এমন করে তোমায় মারতে পারে ? তুমি কী করলে ?

কী আর করব ? কপালের নিন্দে করে খানিকক্ষণ কাঁদলাম।

বাসন ক-খানা চটপট মেজে নিতে নিতে মায়া কথা বলছিল—মুখ না তুলেই। তার মানেও কেশব জানে। ঘাটে একা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলতে দেখে আবার যদি পিঠে বাখারি বসায় !

স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থেকে কেশব বলে, আমারও তোমায় মারতে ইচ্ছে করছে।

ধোয়া বাসন হাতে মায়া উঠে দাঁড়ায়।

তবে আমি পালাই। বেলায় যাব।

বলেই মায়া যেন মিলিয়ে যায় ভোরের আবছা আলোয়।

মায়া বেলায় আসবে জানিয়ে রাখলেও কেশব বেরোবার জন্য তৈরি হয়।

মনটা একেবারে বিগড়ে দিয়েছে মায়া।

বাখারি দিয়ে অমন করে মায়াকে মেরেছে, চুরি করে তাকে দুধ খাওয়ানোর পুরস্কার মায়া পেয়েছে চুরি করে নিজে দুধ খাওয়ার অপবাদ আর পিঠের কালসিটে দাগ।

তবু কেশব বিন্দুমাত্র মমতা বোধ করে না।

মার খেয়েও মায়া চুপচাপ সয়ে গেছে, এই বাড়িতেই মুখ গুঁজে পড়ে আছে—এই কথা ভেবেই গা যেন তার জ্বলে যেতে থাকে।

গা বমিবমি করার মতো তীব্র একটা বিতৃষ্ণা যেন ভিতরে পাক দিয়ে উঠতে চেয়ে শরীরটাকে অসুস্থ করে দেয়।

ও কি মানুষ ? ও তো গোরু-ছাগলের শামিল। ভাত-কাপড় আর একটু আশ্রয়ের জন্য পশুর মতো এমন মার নইলে নীরবে হজম করে যায়।

রাত্রিব অন্ধকারে ওরই সঙ্গে ভালোবাসার খেলা খেলবার জন্য পাগল হয় বলে আজ যেন প্রথম সে নিজেব ওপর সত্যিকারের ঘৃণাবোধ করে।

কেশব বেরিয়ে যাবার জন্য তৈবি হচ্ছে, পাগলের মতো চেহারা নিয়ে হাজির হয় ভুবন।

কী ব্যাপার ভুবনদা ?

ভারী বিপদে পড়েছি ভাই।

ভুবন ধপাস করে চৌকিতে বসে পড়ে।

পাগলের মতো চেহারা নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসুক, ব্যাপার সে প্রকাশ করে ধীরে ধীরে, নির্জীব নিস্তেজ মানুষের মতো।

মোহিনী দুদিন আগে তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। কিছু না জানিয়ে কোনো ফাঁকে এককাপড়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল, ভুবন টের পায়নি।

প্রথমে সে ভেবেছিল কারও সঙ্গে বুঝি বেরিয়েই গিয়েছে মোহিনী। তারপর ভেবে-চিন্তে সে দমদমে শালার কাছে ছুটে যায়। বেরিয়ে যদি না গিয়ে থাকে তবে ভাইয়ের কাছেই যাবে, মোহিনীর আব কোথাও যাওয়াব জায়গা নেই।

সেখানে গিয়ে জানতে পারে মোহিনী কারও সঙ্গে বেবিয়ে যায়নি, ভাইয়ের বাড়িতেই গিয়েছে।

তাহলে বিপদ কীসের ?

ভুবন মুখখানা কাঁদো কাঁদো করে বলে, আমার কাছে আর আসবে না বলে দিয়েছে ভাই। একবার দেখা পর্যন্ত করলে না। ভাইকে দিয়ে বলে পাঠালে এ জন্মে আমার মুখ দেখবে না, ভাইয়ের কাছে থেকে সিনেমার রোজগারে পেট চালাবে। ওখানে গিয়ে যদি বিরক্ত করি ভায়ের বাড়ি থেকেও বেরিয়ে যাবে। ভয়ে পালিয়ে এলাম ভাই।

কেশব বলে, ঠিক করেছেন। অত ভাবছেন কেন ? ঝোঁকের মাথায় ভাইয়ের কাছে গেছে, ঝোঁকটা কেটে গেলেই ফিরে আসবে। এত বিবেচনা করছেন, আপনার দিকটা বিবেচনা করবেন না ?

ভুবন মাথা নাড়ে।

না, আমি টের পেয়েছি, ও আর আসবে না।

মনে হয় ভুবন বুঝি কেঁদেই ফেলবে।

হঠাৎ সে কেশবের হাত চেপে ধরে বলে, তুমি একটিবার যাবে ভাই ? তোমার কথা মানে, তুমি গিয়ে হয়তো বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিরিয়ে আনতে পারো।

কেশবের মায়া হয় না।

মনে মনে বরং হাসিই পায়।

ধীরে ধীরে বলে, পাগল হয়েছেন ভুবনদা, আপনার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করল না, আমি গিয়ে বুঝিয়ে বললেই চলে আসবে ? আপনি বরং এক কাজ করুন। একখানা চিঠিতে স্পষ্ট লিখে দিন যে এবার থেকে আপনি আর দিনরাত বউদিকে চোখে চোখে রাখবেন না, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দেবেন, সিনেমায় ঢুকতে চাইলেও কোনো আপত্তি করবেন না।

ভুবন বিরস মুখে চেয়ে থাকে।

কেশব বলে, এ ছাড়া আমি তো করার কিছু ভেবে পাচ্ছি না। এভাবে যখন বউদি গেছে, মনটাকে শক্ত করেই গেছে। সিনেমায় বউদি ঢুকবেই, আপনি ঠেকাতে পারবেন না। তার চেয়ে আপনি যদি উদারভাবে জানিয়ে দেন যে আপনি বাধা দেবেন না, বউদি স্বাধীনভাবে যা খুশি করতে পারবে তাহলে হয়তো ফিরে আসতে পারেন। যা খুশি করতে পারবেন মানে অবশ্য সিনেমায় গিয়ে হোক, অন্য রকম ভদ্রভাবে হোক, বউদি পয়সা রোজগার করতে পারবে। মেয়েদের পয়সা রোজগার করার অধিকারটা আপনি উড়িয়ে দেবেন না, ওই নিয়ে ঝগড়া করবেন না। পরিষ্কার করে এ সব লিখে দিন, বউদি নিজেই হয়তো ফিরে আসবে।

হয়তো !

বউদির মনের কথা আমি কী করে বলব বলুন ?

অনেকক্ষণ গুম খেয়ে বসে থেকে ভুবন উঠে দাঁড়ায়।

বলে, দেখি ভেবে।

বেরোবার কথা ভুলে গিয়ে কেশব ডাকে, মিনু, এক ছিলিম তামাক দে।

কল্কিতে ফুঁ দিতে দিতে মিনু এসে বলে, দাদা, তামাক।

মিনুর সঙ্গে মায়াকে দেখে কেশব চমৎকৃত হয়ে যায়।

এই অসময়ে মায়া কী করে এল ? বাখারির ভয় না করে গোবিন্দের সংসারের কাজকর্ম ফেলে, দায় এড়িয়ে ?

মিনু নিশ্চয় আনমনা ছিল। কেশবের চাউনি আর মায়ার ভাব দেখে তার মুখে অর্থযুক্ত হাসির ঝিলিক খেলে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয়ে সে করে বসে আরও বেশি বোকামি। জিভের ডগায় কামড় দিয়ে ফেলে।

কেশবের মনে হয় আজ সকালে তাকে ঘিরে যেন একটার পর একটা নাটক হয়ে যাচ্ছে। অথবা এ রকম নাটক রোজই ঘটে, নজর দেয় না বলে তার চোখে পড়ে না ? মিনুর মুখের সামান্য একটু হাসির ঝিলিক আর জিভের ডগায় কামড় দেবার পিছনে কত বড়ো গুরুতর বাস্তবতা আছে ভাবতে গিয়ে কেশবের মাথা ঘুরে যায়।

কেশব গম্ভীর মুখে ধীরে ধীরে মায়াকে জিজ্ঞাসা করে, তোমার রান্নাবান্না হয়ে গেছে ?

মায়া বলে, এর মধ্যে হয়ে যাবে ? এই তো সবে কলির ন টা বাজলো। তোমার নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে শুনলাম ? ক-দিন পাগলের মতো করছ ? দিনরাত ঘরের মধ্যে মুখ গুঁজে থেকে নিজের মনে বিড়বিড় করছ ?

হ্যাঁ। তুমি কার কাছে শুনলে ?

মিনু আস্তে আস্তে সরে যায়।

তার কেটে পড়ার রকম চেয়ে দেখতে দেখতে চোখে যেন পলক পড়ে না কেশবের।

তারপর সে সোজাসুজি মায়াকে জিজ্ঞাসা করে, মিনু টের পেয়েছে আমাদের কথা ?

কিছু কিছু টের পেয়েছে বইকী। এ কী একেবারে গোপন থাকে মেয়েদের কাছে ?

মায়ার মুখে আজ এ কী ধরনের কথা ! কেশব যেন আকাশ থেকে পড়ে।

কী করে টের পায় মেয়েরা ? তুমি জানতে দিয়েছ ?

মায়া যেন একটু ভয় পেয়ে যায়।

তার মানে ? আমি জানতে দেব কী গো ! আমার কি মাথাখারাপ ? চালচলন দেখে মেয়েরা এমনিই টের পেয়ে যায়। এতকাল ধরে আমরা---

মায়া আর জের টানে না তার কথায়।

গলা চড়ানোর উপায় নেই কেশব তাই মুখ খিঁচিয়ে বলে, অ্যাদ্দিন বলনি কেন মেয়েরা টের পেয়ে গেছে ?

মায়া দাঁতে দাঁত লাগিয়ে মিনিটখানেক বিস্ফারিত চোখে তার বিকৃত মুখভঙ্গির দিকে চেয়ে থাকে। আজ পর্যন্ত বিনাবিচারে সে কেশবের সমস্ত অসভ্যতা সংকীর্ণতা অন্যায় স্বার্থপরতাকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে। সে তো জানে ভালোবাসার এটাই নিয়ম। মানুষটা মোটর চালায়। শহরে অর্ধেকের বেশি জীবন কাটায়। দেবতা মানে না, আচার মানে না, সংসার মানে না, নিয়ম মানে না — বাড়িতে এ সব যারা মানে সকলে তারা তার ভয়ে কেউকেউ করে।

এ মানুষটার ভালোবাসা পেতে হলে নিজেকে সঁপে দিতেই হবে। সীতার মতো সাবিত্রীর মতো নিজেকে সঁপে দেবার সাধ্য তার নেই। সীতা বা সাবিত্রী কেন, সাধারণ একটা পুরুষের সাধারণ একটা ঘরনি হয়ে খুব কষ্টকর জীবন কাটিয়েও নিজেকে ধন্য করার সাধ্য তার নেই।

সে বাতিল মেয়েমানুষ।

পুরুষ মেয়েমানুষের জোট পাকানো জীবনে সে শুধু ঝঞ্ঝাট— বাড়তি বোঝা।

অথচ মেয়েমানুষ হিসাবে একমাত্র তারই সঙ্গে কারবার এই দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠ পাগলাটে মানুষটার। তাকে নিয়েই তার হিসাবনিকাশ যে কী করে তার সামাজিক মর্যাদা বজায় রেখে নিজের হাজার অসবি-- ঘটিয়েও তার সঙ্গে ভালোবাসা চালিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু লাভ কী হল তার ? রাধার মতো এই কৃষ্ণটির কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েও নিজেকে সে হারালো।

কেশবের অসহ্য ঠেকে মায়ার এ রকম ভঙ্গি করে মূক হয়ে দাঁড়িয়ে ঠোঁট নেড়েচেড়ে মনের চিন্তার বাক্য সাজানো

সে বলে, ঢং কোরো না। একটা সাংঘাতিক বিপদের মুখে পড়েছি। বুঝতে পারছ না ?

না বুঝতে পারছি না। তোমার বিপদ কি আমার জন্যে, আমার দোষে ?

কেশব খানিকক্ষণ গুম খেয়ে থাকে।

কথা যখন বলে বেশ টের পাওয়া যায় মায়ার উপর গায়ের জ্বালা তার কমেনি।

সে নয় বুঝলাম, এ সব ব্যাপার মেয়েরা এমনিই টের পায়। তে নার কোনো দোষ নেই। বুদ্ধি তোমার খুব চোখা, কিন্তু অ্যাদ্দিন বলনি কেন ? চুপ করে থাকার মানে কী ?

কপাল রে ! এও আবার বলতে হয় নাকি ? এ তো সবাই জানে ! সংসার ছাড়া মানুষ তো নও, কী করে জানব সোজা কথাটা তোমার খেয়ালে আসেনি ?

মায়া ঝাঁঝালো হাসি হাসে।

সত্যি, অবাক করলে আমাকে। ছেলে ছোকরাও জানে লুকিয়ে ভালোবাসা দু চারদিন চলে, তাও আবার ফাঁকতালে সুযোগ বুঝে চালাতে হয়। বঙ্কুন পর্যন্ত এটা বোঝে। নইলে তোমার বোনটির আজ গতি থাকত ?

কেশবের আবার চমক লাগে।

বটে নাকি ?

তবে কী ? নিজে কান পেতে শুনিনি ওদের কথাবার্তা ? মিনু কী বলে জানো ? বলে, এত সস্তা নাকি আমি ? বিয়ে করে ঘরে নিয়ে যত খুশি আদর কোরো। ভালোবাসার শখ হয়েছে, বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারো না ?

কেশবের মুখখিঁচুনির ভাবটা বদলে গেলেও মায়া স্বস্তি পেতে ভরসা পায় না। শুধু ভাবে, মানুষটা কি বুঝেছে তার কথা এবং ব্যথা ?

কেশব খুব শান্তভাবে, প্রায় সুমিষ্ট স্বরে বলে, আমি ভাবতাম তুমি বুঝি খুব সরল—অর্থাৎ বোকা। তুমি এত চালাক ?

মায়া বোকার মতোই ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

কেশব বলে, আমি কী বললাম বুঝেছ ঠিক। বুঝেও না বোঝার ঢং করছ। ভয় হচ্ছে, না ? চালাকি টের পেয়ে গেছি ?

কেশবকে অবাক করে দিয়ে মায়া একটু হাসে।—তোমার কথা বুঝতে পারছি না। ভয়, কীসের ভয় ? তোমাকে তো আমি ভয় করি না। আগে সবাইকে ভয় করতাম—তোমার জন্য সব ভয়-ভাবনা কাটিয়ে দিয়েছি। তোমাকে ভয় করব কেন ? সব ভয় কাটিয়ে দিতে তোমায় ধরলাম, তোমাকেই আবার ভয় করব ? ভারী তো লাভ হল আমার তাহলে ! কী করবে তুমি আমার? বড়ো জোর ত্যাগ করবে। তা তুমি করতে পারো—যেদিন খুশি !

মায়া আর দাঁড়ায় না। ধীরপদে হেঁটে যায় ও ঘরের দাওয়ায় কাজের ছলে জমায়েত মেয়েদের কাছে। খানিক দাঁড়িয়ে কথাও বলে তাদের সঙ্গে। তারপর ধীরপদে খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে যায়।

মায়া জোরগলায় বলে গেল, সে ভয় করবে না, কেশব বড়ো জোর তাকে ত্যাগ করবে ! যেদিন খুশি করতে পারে।

মনে হয় চরম বিদ্রুপের চাবুকই মায়া তাকে মেরে গেল।

কিন্তু বিশ্বাস হতে চায় না।

মায়া কি জেনে বুঝে হিসাব করে খোঁচাটা দিয়েছে ?

জিজ্ঞাসা করেছে, কবে তুমি আমায় গ্রহণ করলে যে ত্যাগ করার ভয় দেখাচ্ছ ? গ্রহণ করার লোভ দেখিয়ে খেলাই করলে এতদিন, এখন ইচ্ছা হলেই ত্যাগ করতে পারো।

তোমার জন্য আমি মরতে পারি, তোমার অসুখটা সারানোর জন্য মরতে পারি—মায়া বলেছিল। সে কথার সঙ্গে যেন মিল আছে তার আজকের ডোন্ট কেয়ার ঘোষণা করার—এটা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু আর কী মানে হয় মায়ার কথার ?

আজ মেয়েলি অভিমানের ভাষায় খোঁচা দিয়ে গেল, এখনও আশা একেবারে ছাড়তে পারেনি।

হয়তো কেশব মন ঠিক করে ফেলতেও পারে, তাকে নিয়ে ঘর বাঁধতেও পারে।

পরের ঘরে দাসীর মতো বিধবার জীবন তার ঘুচতেও পারে।

এ আশা নির্মূল হলে মায়া তাকে আরও স্পষ্ট আরও তিতো কথা বলবে।

ফুঁসে ফুঁসে উঠবে।

গাল দেবে।

তার মানে কী দাঁড়ায় ?

মায়ার মেয়েলি অভিনয়ের মানে ভাবতে গিয়ে নিজেকে হাস্যকররকম বোকা মনে হয় কেশবের।

এতদিন মায়া তবে তাকে এত মায়া করে এসেছে এই আশায় !

হিসেব করে দেখেছে যে সব রকমে যেচে নিজেকে সঁপে না দিলে, নিষ্কাম মায়ামমতার জালে না জড়ালে তাকে বাঁধা যাবে না, তাকে দিয়ে বিশ্রী জীবনটা ঘুচিয়ে নিজস্ব একটি নীড়ে স্বাধীন সচ্ছল জীবন পাওয়া যাবে না।

মায়া যে[illegible] হয়েছে কথাটা। কতবার অনুভব করেছে মায়ার দরদের বাড়াবাড়ি অনেকটাই অভিনয়। কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়নি, সাহস হয়নি। মায়া তাকে শুধু ভালোবাসার খাতিরে ভালোবাসেনি—এই সহজ সরল বাস্তব কথাটা বারবার টের পেয়েও বারবার বাতিল করে দিয়েছে।

নইলে তার নিজের জীবন আর বিশ্বাসের ভিত্তিও যে একেবারে চুরমার হয়ে যায় !

মায়া ফাঁদ পেতেছে মায়ার।

ফাঁদ জেনেও চোখ-কান বুজে সে ধরা দিয়েছে ফাঁদে।

মায়ার মতো মানুষ যে এত হিসেব করে মায়ার ফাঁদ পাতে না, নিজের এই অন্ধ বিশ্বাসকে মর্যাদা দিতে ধরা দিয়েছে। এ বিশ্বাস ভেঙে যাওয়া তার সাংঘাতিক বিপদ। জীবনটা অর্থহীন হয়ে যাওয়া।

এই ভয়ে সে মেনে নিয়েছে মায়ার মমতার অভিনয় !

মিনু ঘর ঝাঁট দিতে এলে কেশব হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ রে মিনু, ও বাড়ির ওই মায়া একটু বোকাটে হাবাটে মানুষ না ?

মিনু বলে, বোকাহাবা ? মায়া মাসির মতো চালাক-চতুর মেয়েমানুষ এ তল্লাটে আছে ?

একটু পাগলাটে, না ?

পাগলামির ভান করে, ভারী চালাক তো। বিধবা হয়েছে, বয়েস হয়েছে, কত যে ওর শখ। এমনই লোকে নিন্দা করবে, তাই পাগলামির ভান করে শখ মেটায়। কাল কী করেছে জানো ? এই বড়ো মাছের আধসের পেটি এনেছিল, রান্না করে—

কে এনেছিল মাছের পেটি ?

রঞ্জনদা।

কেশব জানে। রঞ্জন হঠাৎ একটা চাকরি বাগিয়ে ফেলেছে ভোজবাজির খেলা দেখানোর মতো। মাইনে বেশি নয়, চাকরি স্থায়ী নয, কিন্তু চাকরি তো !

চার টাকা সের মাছের আধসের পেটি নিয়ে সে বাড়ি ফিরেছিল। হাতে মাইনে পাওয়ার আনন্দে।

কেশবেব মনে পড়ে যায় যে মাস কাবার হয়েছে, তারও মাইনে পাওনা হয়েছে বীরেশের কাছে।

সেই মাছ নিয়ে কেলেঙ্কারি।

দশ টুকরো করা হয়েছিল আধসের মাছ। গোবিন্দ দু-টুকরো, রঞ্জন দু-টুকরো, বাকি সবাই এক টুকরো করে।

অবশ্য মাযাকে বাদ দিয়ে। সে তো মাছ খাবে না।

মায়া বাচ্চাদের খাওয়ায়।

খেয়েদেয়ে শুতে যাবার আগে তারা দালানের ঘরে এসে লাফাতে থাকে : এইটুকু ভেঙে ভেঙে মাছ দিল কেন ? দাদার মাছ দাদাই বুঝি একলা খাবে ?

কালী বলে, মাসি আদ্দেক মাছ খেয়েছে। আমি চোখে দেখেছি। বললে কী জানো ?—বলিস যদি মেরে ফেলব !

মিনু বলে যায়, মায়া মাসি তারপর যে কী কাণ্ড শুরু করল যদি দেখতে দাদা। হাসে কাঁদে দেয়ালে মাথা ঠোকে আর বলে যে বিড়ালে মাছ খেয়ে গেল, তার কী দোষ ?

দৃশ্যটা কল্পনা করবার চেষ্টা করতে করতে কেশব বলে, সত্যি কথাই তো ? বিড়াল মাছ খেয়ে গেলে মায়া কী করবে ?

মিনু মুচকে হাসে।

বিড়াল মাছ খায়। মানুষ সেটা টেরও পায়। বিড়াল মাছ খেলে কি কেউ হেসে কেঁদে ঢং করে মাথা কপাল কোটে ? বাচ্চারা কি বিড়াল পোষে না, বিড়াল চেনে না ? বিড়াল মাছ খেলে তারা বলে নাকি যে মায়া মাসি মাছ খেয়েছে ? কালী নিজের চোখে দেখেছে বলেই বলছে।

তাই নাকি।

তাও ভাত দিয়ে খায়নি। ভাত রাঁধেনি তখনও। সকালে খাওয়ার জন্য মুড়ি কেনা ছিল। মাছ রেঁধে মুড়ি দিয়ে মাছের ঝোল খেয়ে মায়া মাসি বিড়ালকে দায়ি করেছে।

খিলখিল করে হেসে ওঠে মিনু।

থেমেও যায় হঠাৎ।

কেশবের চোখ মুখ দেখে সে মাথা হেঁট করে লেপায় লেপায় গোবরমাটির মোটা পুরু সর-পড়া মেঝেতে বুড়ো আঙুলে আঁচড় কাটা শুরু করে।

কেশব কোনো কথা না বলায় নতমুখে নিজেই বলে, রঞ্জনদা ধমকে দিলেন, তাইতে সবাই চুপ করে গেল। নইলে চুরি করে মাছ খাওয়ার জন্য রঞ্জনদার বাবা নিশ্চয় একটা লাথি কষিয়ে দিতেন মায়া মাসিকে।

কেশব খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আচমকা বলে, তুই মিছে কথা বলছিস মিনু। তোর মায়া মাসিকে লাথি মারবার সাহস কখনও হয় রঞ্জনের বাবার ? তোর মায়া মাসি গর্জে উঠবে না।

কী যে বলো তুমি। মায়া মাসি রোজ কত লাথি ঝাঁটা খাচ্ছে। চুপ করে সব সয়ে যায়। না সয়ে উপায় কী বলো ? বিধবা মানুষ, কোথায় যাবে, কার কাছে যাবে ? লাথি ঝাঁটা মেনে নিয়েই মায়া মাসিকে চলতে হয়।

বোনের কাছে এই জবাবটাই কেশব আশা করছিল।

বেরোতে দেরি হয়ে যায়।

অনিমেষ হয়তো আপিসে চলে গেছে।

হাতে পয়সা নেই। বীরেশের কাছ থেকে মাইনেটা আজ আদায় করতেই হবে।

বীরেশের নিজের ব্যাবসা, নিজের আপিস। খাওয়া দাওয়া করে ধীরে সুস্থে সে বার হয়, তার আগে গাড়ি বার করার দরকার হয় কদাচিৎ—তবু কেশব দেরি করলে সে রাগ করে।

বীরেশ রাগ করবে জেনেও দেরি করে বার হয়ে কেশব আগে যায় অনিমেষের বাড়ি।

কাছাকাছি গিয়ে শুনতে পায় ভিতরে আট দশটি তাজা কণ্ঠকে ললনা তালিম দিচ্ছে।

গাড়িবারান্দার নীচে সিঁড়ির কোণে বসে নিমাই বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে গান শুনছে।

কী রে নিমাই, দোকানে কাজ নেই ?

দোকানে তো সারাদিন কাজ সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত। গান শুনতে পালিয়ে এয়েছি।

কেশবও গান শোনে।

সতেজ তেজি সুর, সরল জোরালো কথা। দেশজোড়া মানুষের অভাব অভিযোগ দাবি দাওয়ার গান।

নতুন গান। আগে কখনও শোনেনি।

গান শুনতে শুনতে কয়েকবার রোমাঞ্চ হয় কেশবের। কিন্তু এ যেন অন্য রকমের রোমাঞ্চ, আগে ললনার গান শুনে যেমন হত ঠিক সে ধরনের নয়।

আগের মতো আজ আর রোমাঞ্চের সঙ্গে ভিতরে কোনো রকম কষ্টকর অনুভূতি জাগছে না।

গান থামতেই নিমাই উঠে দাঁড়িয়ে বলে পালাই। ওদিকে আবার গোসা করবে।

তোর দেশের খবর কী রে ?

নিমাই যেতে যেতে জবাব দেয়, ওই খবর, দুর্ভিক্ষ। মানুষ উপোস দিয়ে মরছে।

ভিতর থেকে জনাদশেক তরুণ-তরুণী কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এসে চলে যায়।

কেশব একটা বিড়ি ধবায়।

ব্যস্তভাবে ললনা বেবিয়ে আসে।

গাড়িবাবান্দাব সামনে দাঁড়িয়ে কেশবকে বিড়ি টানতে দেখে সে থমকে দাড়িয়ে এক মুহূর্ত ভাবে।

তাবপব কাছে গিয়ে বলে, বাবা আজ ছুটি নিয়েছেন. আপিস যাবেন না। আমায় এক জায়গায় পৌঁছে দেবেন আজ ? বড়ো দেবি হয়ে গেছে।

একটু উদাসীন ভাব ললনাব হুকুম তো কবছেই না, সে যেন অনুবোধও জানাচ্ছে না।

কলেজ যাবাব তাগিদ নেই, ললনা পড়া ছেড়ে দিয়েছে। কেশব তাই জিজ্ঞাসা কবে, কোথায় যাবেন ?

এ বকম আনমনেই সে ললনাব জবাব শোনে। কয়েক দিন ললনাকে সে চোখেও দেখেনি। আজ সে কাছে এসে দাঁড়ানোব সঙ্গে সঙ্গে দেহেমনে পুলকেব সঞ্চাব অনুভব কবেছে। বিগড়ে যাওয়া হৃদয়-মন শান্ত হতে শুবু কবেছে।

মনে হয় ললনাব সঙ্গ চেয়েই সে যেন ছটফট কবছিল।

ললনাব কথা ভালো কবে শুনতে না পাওয়ায় সে সংশয়েব সঙ্গে জিজ্ঞাসা কবে, কোথায় যাবেন বললেন ? সিনেমা স্টুডিয়োতে ?

ললনা হেসে বলে, আপনি দেখছি অবাক হয়ে গেলেন ! সিনেমায় ঢুকেছি জানেন না ? দুটো ছবিতে পার্ট কবছি গান গাইছি। পার্ট অবশ্য সামান্য. গানটাই আসল।

না থেমে শুধু সুব পালটে ললনা কৈফিয়ত জানায়, নিজেই চালিয়ে যেতাম কিন্তু আমাব ফিবতে দেবি হয়ে যাবে। যা সব এলোমেলো ব্যবস্থা ওদেব। কী কাজে বাবাব আবাব গাড়ি দবকাব হবে।

কেশব উঠে দাঁড়িয়ে বলে, চলুন আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি। আপনিও শেষে সিনেমায় নিজেকে বিক্রি কবলেন ?

মুখ লাল হয়ে যায় ললনাব। তেমন ফবসা নয় বলে গাল দুটি তাব একটু কালচে হয়ে গেছে মনে হয়।

বিক্রি কবেছি মানে ?

সিনেমায় গান গাইছেন তো ? আপনি না সিনেমাব সস্তা গান ঘেন্না কবেন ?

সিনেমাব সস্তা দেশি আব মার্কিনি লাবেলাপ্পা ধবনেব গান সম্পর্কে তাব ঘৃণাব কথাটা ললনা অবশ্য সোজাসুজি কেশবকে জানায়নি, গাড়িতে তীব্র আবেগেব সঙ্গে বন্ধুদেব কাছে বলাব সময় কেশব শুনেছিল। এবং শুনে তখন বীতিমতো আশ্চর্যও হয়ে গিয়েছিল।

ললনাব গান অবশ্য এক ধবনেব—তন্ময় কবে দেয়, ব্যাকুলতা জাগায়। তাব গান শুনতে শুনতে মজা লাগে, বাগ হয়, ঘৃণা জাগে তেজেব সঙ্গে গর্জে উঠে জগৎ থেকে সমস্ত অন্যায়-অবিচাব দূব কবতে কোমব বাঁধাব তাগিদ জাগে।

কিন্তু সিনেমাব গানও তো বেশ জমাট লাগে. নাচেব গান একটু সুড়সুড়ি দেওয়া মজাদাব লাগে ?

আগে কোনোদিন ভাবেনি, ললনাব মন্তব্য শোনাব পব তফাতটা খেয়াল কবে ক্রমে ক্রমে সে ব্যাপাবটা বুঝেছিল। ললনাব গান যদি হয় খিদেব সময়কাব মাছ-মাংস ডাল ভাত, সিনেমাব গান চানাচুব আব মদেব চাট।

হাতেব ছোট্টো ঘড়িটাব দিকে চেয়ে একটু হেসে ললনা বলে, গাড়ি বাব কবুন। যেতে যেতে তর্ক কবা যাবে।

বোধ হয় তর্ক করার জন্যই তার পাশে সামনের সিটে ললনা বসে। সে তর্ক করবে কেশবের সঙ্গে ! সে যেন ধরে নিয়েছে যে তার সঙ্গে তর্ক করবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি না থাকলেও বাস্তব জ্ঞানবুদ্ধি কেশবের যথেষ্ট আছে—তর্কটা একতরফা ব্যাখ্যা ও উপদেশ বর্ষণ হয়ে দাঁড়াবে না।

গাড়ি চলতে শুরু করলেই সে বলে, আর্টিস্টদের স্টুডিয়োতে নেবার জন্য ওদের গাড়ি আছে। আমার এ ঝঞ্ঝাট কেন বলুন তো ? পৌঁছে দেবার জন্য আপনাকে খোশামোদ করতে হল ? আমিও তো নিজেকে বিক্রি করেছি, আমিও তো আর্টিস্ট ?

কেশব চুপ করে থাকে।

নামকরা আর্টিস্ট হলে, খুব পয়সা টানতে পারলে আমার সময়মতো সুবিধামতো স্পেশাল গাড়ি পাঠাত। গাড়ি এসে ধন্না দিয়ে থাকত বাড়ির দরজায়, আমি দেরি করলে স্টুডিয়োতে দেরিতে কাজ আরম্ভ হত। কিন্তু আর দশজনের মতো আমি নিজের গরজে স্টুডিয়োতে সময়মতো যাব, তাই আমার জন্য মেয়েস্কুলের বাসের মতো গাড়ির ব্যবস্থা। চারদিকে থেকে পনেরো-বিশজনকে একবার কুড়িয়ে নিয়ে যাবে। সুটিং শুরু হবে বারোটায়, দশটায় তৈরি থাকতে রাজি হলে ওদের গাড়ি আসত—

কেশব বলে, সে তো বুঝলাম। কিন্তু আপনি কেন—

নিজেকে বিক্রি করেছি ? এ প্রশ্নের জবাবটাই এতক্ষণ দিলাম আপনাকে। নিজেকে বিক্রি যদি করতাম, স্টুডিয়োতে পৌঁছে দেবার জন্য আপনাকে কষ্ট দিতে হত ? নতুন নেমেছি, এখুনি একেবারে নতুন গাড়ি কিনে না দিক, অন্তত গাড়ির স্পেশাল ব্যবস্থা করত। খুশি হলে বাড়ির দরজায় দুঘণ্টা গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখতাম।

কেশব চুপ করে থাকে।

ললনা ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, দাম নিলাম না, বিক্রি হলাম কীসে ? দাম ছাড়াই কিছু বিক্রি হয় নাকি ?

এতক্ষণে এবার কেশব মুখ খোলে।

একদিন নাম হবে, টাকা হবে এই আশায়—

তার কাছে এতটা জ্ঞানবুদ্ধি ললনা বোধ হয় প্রত্যাশা করেনি। রেগে ওঠার জন্য লজ্জাবোধ করে শান্ত সুরে বলে, সে আশা থাকতে পারে। নামের জন্য টাকার জন্য লড়াই করলে নিজেকে বিক্রি করা হয় নাকি ? একেবারে নতুন হলেও সহজে নাম আর টাকা করার সুযোগ আমার আছে। গাইতে তো জানি ? রং একটু ময়লা কিন্তু পর্দায় তাতে আসে যায় না। গড়ন আমার ভালোই, আপনিও তো মাঝে মাঝে হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন। ওদের শর্ত মেনে নিলে ওরাই আমাকে ঠেলে আকাশে তুলে দেবে। তাতে আমারও লাভ, ওদেরও লাভ। আমি তা করিনি, নিজেকে বিক্রি করার মেয়ে আমি নই।

ললনা যেন নরম হয়ে অভিমানের সুরে কৈফিয়ত দেয়, নিজের সাফাই গায়। টের পাওয়া যায়, যত জোরগলাতেই সে ঘোষণা করুক যে সিনেমায় নিজেকে বিক্রি করেনি, নিজের মনেই তার খটকা আছে।

যতদিন প্রচুর আয় ছিল অনিমেষের, বিলাসিতা না থাকলেও সুন্দর মার্জিত জীবনযাপন চলছিল বিনা বাধায় ও নির্ভাবনায়, ততদিন গান নিয়ে সভা-সমিতি নিয়ে অনায়াসে মেতে ছিল ললনা। সিনেমা জগতের কোনো আকর্ষণ ছিল না।

সিনেমা জগতে গিয়ে শিল্পীর লড়াই চালাবার কোনো তাগিদ সে তখন অনুভব করেনি।

আজ মুশকিলে পড়ে দরকার হয়েছে এই লড়াই শুরু করা। কিছুটা আত্মসমর্পণ কি করতে হয়নি ? এতদিনের নীতি আর আদর্শের সঙ্গে খানিকটা আপস ?

কিন্তু বলার কিছু নেই। অবস্থা বদলে গেলে মানুষ নতুন ব্যবস্থা করবে, তাতে দোষেরও কিছু নেই। এটুকু স্বীকার করতে না চাওয়াটাই বিশ্রী অভিমানের পরিচয়।

ললনা বলে, একটু আস্তে চালান। এমন জরুরি কাজ নয় যে আমাদের দুজনকে মরতে হবে।

কেশব স্পিড অর্ধেকেরও কম করে দিলে ললনা হেসে বলে, আস্তে চালালে বেশি সময় কথা বলতে পারব। বাবাকে নাকি আপনি সেদিন মারতে চেয়েছিলেন ? বাবা বললেন, রোগের জ্বালায় আপনার স্যুইসাইডের ঝোঁক আছে, এলোপাথারি গাড়ি চালিয়ে বাবাকে সঙ্গে নিয়ে মরার ঝোঁক চেপেছিল।

কেশব গাড়ির গতি আরও মন্থর করে দিয়ে বলে, একটা কথা বলব রাগ করবেন না ?

কথাটা তো শুনি। তারপর ঠিক করা যাবে রাগ করব কি না। আমি রাগ করলেই বা আপনার কী এসে যায় ?

শহরের শেষ প্রান্ত। এবার শহরতলি শুরু হবে। শহরের অংশ অথচ খাঁটি শহরের তুলনায় ঘরে-দুয়ারে দোকানপাটে শহরের চাপা দেওয়া দৈন্য যেন প্রকট হয়ে আছে।

তবু গাড়ির কী ভিড় মোড়ে।

পুলিশের নির্দেশে গাড়ি থামিয়ে কেশব বলে, আপনার বাবার বুদ্ধি-বিবেচনা কম। সংসারের সোজা নিয়মকানুন বোঝেন না।

মানে ?

আপনাকে একজন অপমান করতে চেষ্টা করেছিল, উনি গর্জন করে উঠলেন। তারপর ঝিমিয়ে গেলেন। ভয় পেয়ে গেলেন। কেন, আবার উনি গর্জন করে উঠতে পারতেন না যে একটা বজ্জাত তার মেয়েকে বাগাতে না পেরে তার ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়ছে—এ অন্যায় বরদাস্ত করা চলবে না ?

আপনি দেখছি সব জানেন।

জানি বইকী।

বাবার শরীর খুব খারাপ, তা জানেন ? সারাজীবন খেটে খেটে বাবা আমাদের জন্যই—

পুলিশ হাত তোলামাত্র কেশব সশব্দে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ইলেকট্রিক হর্নটা চেপে রেখে আগের গাড়ি ক-টাকে ডিঙিয়ে গিয়ে জোরে গাড়ি চালায়।

ললনা ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে, আমায় নিয়ে স্যুইসাইড করবেন ? আমি তো কোনো ক্ষতি করিনি আপনার !

মনে মনে কেশবের হাসি পায়। স্টিয়ারিং হুইলে একটু গলদ আছে, সেটা মারাত্মক হতে পারে অনায়াসেই। কিন্তু গলদটা তার ভালো করেই জানা আছে, দু-আঙুল বাঁচান রেখে সে গাড়ি লরি মানুষ ল্যাম্পপোস্ট ঘেঁষে গাড়িটাকে চড়া স্পিডে নিরাপদে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

ললনা বারবার স্যুইসাইড করার কথা বলছে কেন ? আপিস ফেরত অনিমেষকে নিয়ে সে নাকি স্যুইসাইড করতে চেয়েছিল। আজ ললনাকে নিয়ে তার নাকি স্যুইসাইড করার ঝোঁক চেপেছে। আত্মহত্যা করার কথা স্বপ্নেও তার মনে আসেনি। এরা বাপেবেটিতে সিদ্ধান্ত করেছে যে মাথায় তার বিকার আছে সে আত্মহত্যা করতে চায়।

শহরতলির সোজা রাস্তা।

গাড়ির স্পিড চরমে চড়িয়ে কেশব হালকা সুরে বলে, আসুন না দুজনে আমরা একসঙ্গে মরে যাই ? আপনি রাজি হলেই আমি এমন করে অ্যাকসিডেন্ট ঘটাব যে আপনিও টের পাবেন না আমিও টের পাব না কী করে মরলাম। একটুও কষ্ট হবে না।

তরতর করে পিছনে সরে যাচ্ছে টেলিফোন টেলিগ্রাফ বিদ্যুতের তার লাগানো থামগুলি, ইটের বাড়ি কারখানা খোলার বস্তি ফাঁকা জমির টুকরোগুলি।

ললনা শান্তকণ্ঠে বলে, প্রায় এসে গিয়েছি। ওই বাগানবাড়িটা আমার স্টুডিয়ো।

গাড়ি থামাতে গিয়ে চাকায় ব্রেক কষার আর্তনাদ ওঠে।

ললনা রেগে বলে, পরের গাড়ি, মায়া না-ই রইল। একটু বিবেচনা তো করতে হয় ?

ললনা নেমে যায়।

কেশবও নামতে নামতে বলে, এক মিনিট—একটা কথা শুনে যান। অপবাদ দেবেন না।

তাড়াতাড়ি বলুন, দেরি হয়ে গেছে।

কেশব গম্ভীর মুখে বলে, আপনার তাড়াতাড়ি আছে বলেই স্পিডে চালিয়ে এসেছি। আপনি তার মানে ধরলেন, আপনাকে নিয়ে স্যুইসাইড করার ঝোঁক চেপেছে। এতদিন মিছেই কলকাতায় গাড়ি চালালাম ? কোথায় স্পিড দেওয়া যায়, কোথায় আস্তে চালাতে হয়, তাও শিখিনি ? ব্রেকের আওয়াজ শুনে দোষ দিচ্ছেন, পরের গাড়ি বলে মায়া নেই, স্পিডের মাথায় ঘ্যাঁচ করে থামিয়েছি। ব্রেকটার দোষ আছে সে খবর রাখেন ? খুব জোরে ব্রেক কষলেই বরং আওয়াজ উঠত না।

ললনা বলে, তাই নাকি !

কেশব বলে, ওই পোস্টটার কাছে ব্রেক কষেছি, এখানে গাড়ি থেমেছে। গাড়ি হঠাৎ থামালে আপনি হুমড়ি খেয়ে পড়তেন না ? যে স্পিডে আসছিলাম তাকে ব্রেক দিয়ে এর আদ্দেক জায়গায় থামালে গাড়ির ক্ষতি হয় না। বিশ্বাস না হয়, যারা জানে তাদের জিজ্ঞাসা করবেন।

ললনা তাড়াতাড়ি বলে, না না, জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই, আপনার কথা বিশ্বাস করছি।

হাতঘড়িটার দিকে একনজর তাকিয়ে সে আবার বলে, কী জানেন, আপনার মধ্যে কেমন একটা মরিয়া বেপরোয়া ভাব এসেছে। কী হয়েছে আমি জানি না কিন্তু আপনার ভাবটা বেশ বোঝা যায়। স্যুইসাইড করার কথা বাবা বলেছিলেন. আপনার ভাব দেখে আমার মনেও খটকা লেগেছে। ব্রেকের আওয়াজ শুনে ভেবেছি আপনি বুঝি ঝোঁকের মাথায় ব্রেক কষেছেন।

ললনা প্রাণপণ চেষ্টায় একটু হাসে, আর দাঁড়াতে পারছি না। পরে কথা বলব।

বড়ো ম্লান মনে হয় ললনার হাসি। এতক্ষণ নিজের ভাবে মশগুল ছিল, খেয়াল করেনি। ললনার মুখেও ক্লিষ্টতার ছাপ।

তার অসুখের একটা আক্রমণ হয়ে যাবার পর যেমন কৃশতা বিবর্ণতার ছাপ পড়ত তার মুখে।

দশ-বারোদিন ললনাকে সে চোখেও দ্যাখেনি।

কে জানে কী ঘটে গেছে এর মধ্যে ?

জোরে পা চালিয়ে গিয়ে কেশব তার নাগাল ধরে। বাগানবাড়ি—স্টুডিয়োর নতুন খোয়া বিছানো পথে তার পাশে হাঁটতে হাঁটতে কেশব ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করে, অসুখটা আবার হয়েছিল নাকি ?

ললনা গা-ছাড়াভাবে সায় দিয়ে বলে, হ্যাঁ। নিয়ম-টিয়ম সব চুলোয় গেল, চিকিৎসা বন্ধ হল, হবে না ? ভালো করে সেরে উঠতে পারিনি তো। কতকালের অসুখ—সারতে সময় লাগবে না ?

কেশব প্রায় হাত ধরে তাকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু কখনও কোনো অবস্থায় এক মুহূর্তের জন্যও সে ভুলতে পারে না কিনা যে ললনা মায়া নয়, তাই সামলে যেতে পারে।

মিনতি করে বলে, একটু দাঁড়ান, আধমিনিট।

আপনি সব মাটি করবেন।

কেশব সময় নষ্ট করে না, সোজাসুজি প্রশ্ন করে . এত ঝঞ্ঝাট আপনার, মেয়েদের গান শেখানো, সিনেমা করেন—তবু সভা করে বেড়ান কেন ? ডাক্তার না বারণ করেছিল ? কী দরকার সভায় যাবার ?

ললনা ধীরে ধীরে বলে, দরকার আছে বলেই যাই। সভায় যাওয়ার জন্য তো অসুখ নয়, সভায় গেলে বুকে বরঞ্চ জোর পাই। কী অবস্থা বলুন তো দেশের ? এমন কঠিন অসুখটা আমার সারানো যায় জানা গেল কিন্তু ভালো করে সেরে উঠবার সুযোগ পেলাম না। দেশের অবস্থাটা বদলাবার জন্য ও সব সভা হয়, তাই আমি যাই, গান গাই।

মস্ত একটা দামি মোটরকে পথ ছেড়ে দিতে তাদের পাশে সরে যেতে হয়।

গাড়ির ড্রাইভারের পোশাক কী জাঁকজমক।

আরাম আর আলস্যের জীবন্ত প্রতীকের মতো গাড়ির মোটা ভুঁড়িওলা মালিক আড়চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে যায়।

ললনা বলে, উনি মালিক।

কেশব বলে, ও ব্যাটা চুলোয় যাক। আপনার কথা বলুন রোজগার তো করছেন কিছু কিছু। যেটুকু না করলে নয় তাই রোজগার করে চিকিৎসাটা চালিয়ে গেলে হত না ? সভা-টভায় সময় নষ্ট না করে শুধু ওষুধ-পথ্যের পয়সাটা রোজগার করে ?

তা হয় না। ওটা অনেক বড়ো লড়াই।

বড়ো লড়াইটা ভালোভাবে করার জন্যই দুদিন ঢিল দিয়ে অসুখটা সারাবার জন্য লড়াই করতেন ?

হঠাৎ যেন বেশি পরিমাণে লোকজন ছুটোছুটি করে, আসা-যাওয়া শুরু করে, স্টুডিয়োতে যে একটা উৎকট রকম চাঞ্চল্য এসেছে ত্রিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে এখান থেকে টের পাওয়া যায়। হঠাৎ যেন অত্যধিক চঞ্চল হয়ে উঠেছে স্টুডিয়োটা। তবে সেটা সত্যিকারের কর্ম-চাঞ্চল্য অথবা জমকালো গাড়ির আরোহীটির জন্য কর্ম করার চাঞ্চল্য দেখানো সেটা অবশ্য সহজেই টের পাওয়া যায়।

কেশব বুঝতে পারে, মালিকও জানে যে এই কর্মব্যস্ততাটা লোক দেখানো, তাকে দেখানো ফাঁকিবাজি শো।

কিন্তু এটাই যেন সে চায়—ফাঁকিতেই যেন সে খুশি।

গাড়িবারান্দায় একটা সিনের সেট করা হয়েছিল। গাড়িবারান্দার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সে যেন হাসিমুখে রীতিমতো একটা বক্তৃতা ঝেড়ে দেয় যে বেশি খাটুনি নয়—ছবিটির আর্টিস্টিক কোয়ালিটির দিকে যেন সবসময় সকলের নজর থাকে।

ললনা মুখ বাঁকায়।

স্টুডিয়োতে হাজিরা দেবার তাগিদ যেন তার ফুরিয়ে গেছে। আর তাড়াহুড়ো করবার প্রয়োজন নেই।

একবার সে হাই তোলে।

কেশব বলে, আপনার তাড়াতাড়ি, এখন বরং থাক। গাড়ি নিয়ে ওয়েট করছি, আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। তখন কথা হবে।

ললনা বলে, আর আমার তাড়া নেই। আপনি আধঘণ্টা ধরে জেরা করুন। ও ব্যাটা এসেছে মানেই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কাজ আরম্ভ হবে না। শুটিং ঠিকমতো এগোচ্ছিল না, নিজে ব্যাপারটা বুঝতে এসেছে। দু-চারজন আজ বরখাস্ত হবে।

কেশব চমৎকৃত হয়ে বলে, বটে ?

ললনা হাসে।

কোন দু-চারজন জানেন ? ডিরেক্টর বাগচীবাবু যাদেব ওপর চটেছেন। আমাকেও হয়তো—

ললনা আবার হাসে।

এখনও সে যেন সাফাই গাইবার চেষ্টা করছে যে নিজেকে সে সিনেমার হাটে বিক্রি করেনি। সে কারও মন জোগায় না, সে লড়াই করে। বাগচীবাবু তার ওপর খুশি নন, হয়তো আজকেই তাকে বরখাস্ত করে দিতে পারেন।

মাথা গুলিয়ে যাচ্ছিল কেশবের। সে জিজ্ঞাসা করে, চিকিৎসাটা চালানো যায় না ?

ললনা বলে, না। দেশশুদ্ধ লোক বিনা চিকিৎসায় মরছে, আমি কেন রেহাই পাব বলুন ?

এতক্ষণ ললনা একটিও বড়ো কথা বলেনি। দেশের অবস্থা বদলাবার জন্য যে সব সভায় গিয়ে সে যে বিপ্লবের গান গেয়ে মানুষকে মাতিয়ে দেয়, সেটা যেন সে করে তার নিজের স্বার্থে ! মুখ ফুটে যেন তার বলে দেবার দরকার ছিল যে মনে-প্রাণে সে দেশের দুর্দশার অবসান চায়।

তার কঠিন অসুখ চিকিৎসা চালিয়ে তার আরোগ্যলাভ সম্ভব হলেও দেশের অবস্থা না বদলালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তার নিজের অসুখ, আর দেশের অবস্থার যোগাযোগের কথাই সে বলে এসেছে, এইবার বোধ হয় সে প্রথম উল্লেখ করল দেশের লোকের বিনা চিকিৎসায় মরার কথা।

কথা এড়িয়ে যেতে চায় ললনা ? সভায় ছকে-আঁটা বক্তৃতা করার কায়দায় তার প্রশ্নকে এড়িয়ে যেতে চায় ?

কেশব তাই কড়াসুরে প্রশ্ন করে, বাজে খরচা একটু কমিয়ে, সস্তা শাড়ি পরে—

পরনের সেকেলে দামি শাড়িটার দিকে চেয়ে ললনা হাসে।

এটা আমার মা-র শাড়ি। পয়সা দিয়ে কিনিনি। এমন শাড়ি কেনার পয়সা কোথায় পাব ?

কেশব হতভম্বের মতো চেয়ে থাকে।

তার মায়ের শাড়িটার দিকে তাকাচ্ছে না স্থানে স্থানে পোকায় কাটা শাড়ি জড়ানো তার দেহটার দিকে তাকাচ্ছে বুঝতে না পেরে ললনা এবার রেগে যায়।

বলে, সস্তা শাড়ি পরে সিনেমা স্টুডিয়োতে আসা যায় না, এটুকু সহজ বুদ্ধিও আপনার মগজে গজায় না ? এদের দেওয়া সোনা রুপার জড়ি বসানো হাজার টাকার শাড়ি পরে স্টুডিয়োতে এলে বুঝি খুশি হতেন ? তাহলে কিন্তু আপনাকে পৌঁছে দেবাব জন্য তোষামোদ করতাম না—এদের গাড়ি আমায় নিতে আসত।

কেশব টের পায়, ললনা তার সঙ্গে লড়াই করছে।

এতক্ষণ সাফাই গেয়েছিল। এবার তাকে আক্রমণ করেছে।

বিড়ির কৌটায় দুটো আস্ত সিগারেট ছিল, একটা সিগারেট ধরিয়ে কেশব ধীরে ধীরে বলে, এবার তবে যাই। হয়তো আর দেখাই হবে না। আমার অসুখটা আমি সারাবই।

ললনারও রাগ হয়েছিল।

সে বলে, আপনার অসুখটা নিয়ে জগৎ চলে ভাবেন বুঝি ?

কেশব বলে, তাহলে কি আপনার অসুখটা নিয়ে জগৎ চলে ?

দুজনে বাক্যহারা হয়ে থাকে।

যাই বলেও কেশব যেতে পারে না। এভাবে কি বিদায় নেওয়া যায় ললনার কাছে ?

বাগানবাড়ির সমস্তটাই স্টুডিয়ো। প্রাচীন দিঘি আর পামগাছের সারি, কেয়ারি করা ফুলের বীথি, কোনায় ঠেলে দেওয়া মালিদের ভাঙা কুঁড়েঘর কত ছবিতে কত দৃশ্যে যে ঠাঁই পেয়েছে—কত যে কমিয়ে দিয়েছে ছবি তোলার হাঙ্গামা আর খরচ।

কিন্তু কেন্দ্রটা ওই দালানবাড়িতে। ভাগ্যে একজনের বহুকাল আগে ইংরেজের শহরে দেশি বিলাতি মেশাল করা আধুনিক সভ্য জীবনযাপন করতে হাঁপ ধরত, মাঝে মাঝে বন্ধু-পার্ষদ আর বেশ্যা নিয়ে হাঁপ ছাড়ার জন্য বাগানবাড়িটা তৈরি করেছিল।

সিনেমা তৈরি অনেক সহজ হয়ে গেছে তার কল্যাণে।

ক্ষমা চাওয়ার সুরে নয়, সহজ বাস্তব একটা সত্যকে প্রকাশ করার সহজ সুরে কেশব বলে, আমি খুব বাড়াবাড়ি করে বসলাম, বরাবর প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন, আপনাকে তাই সয়ে যেতে হল। অন্য কেউ হলে গালে চড় কষিয়ে দিত।

ললনাও সহজ সুরে বলে, আপনি ভালো চালাক। রাগারাগি হওয়ার সব দায় আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। বরাবর প্রশ্রয় দিয়ে এসেছি, কাজেই আপনার কোনো দোষ নেই ! আমি কিন্তু আপনাকে কোনোদিন প্রশ্রয় দিইনি, দেবার দরকারই হয়নি। আপনি বরাবর সংযত থেকেছেন, মানিয়ে চলেছেন।

কেশব বলে, আপনি যখন সিনেমায় ঢুকেছেন, আর সংযম রাখব না, মানিয়ে চলব না।

ললনা নিশ্বাস ফেলে বলে, আপনি বুঝবেন না। আপনি শুধু বাইরে থেকে দেখছেন আমাদের। কমলদার চিকিৎসা বন্ধ হয়ে গেছে খবর রাখেন ? বাবা দিদিকে জানিয়ে দিয়েছে আর টানতে পারবে না। ডাক্তার দত্তেব চিকিৎসা বন্ধ করে সেই পুরানো চিকিৎসাই কবা হোক। দিদি বিছানা নিয়েছে, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে শুধু কাঁদছে। অনিলবাবু কাকাদের রাগ ভাঙাতে ছুটে গেছেন। রাগ ভাঙবে কি না, পুরানো চিকিৎসাটাও কমলদার জুটবে কি না ঠিক নেই।

ডাক্তার দত্ত—?

তাই তো বলছিলাম আপনি আমাদের বাইরেরটাই শুধু দেখেছেন ভেতরের খবর জানেন না। ডাক্তার দত্ত টাকা চান না, ট্রিটমেন্ট চালিয়ে যেতে রাজি আছেন। কিন্তু তাই বলে অন্য খরচগুলিও কি তিনি নিজের পকেট থেকে দেবেন ?

ললনা সোজাসুজি তার মুখেব দিকে তাকায়। প্রাচীন বটগাছটার পাতার ফাঁক দিয়ে তার মুখে এক ঝলক রোদ এসে পড়েছে।

আপনি বাবাকে বোকা বলছিলেন। আগে হলে আপনার গালে আমি চড় কষিয়ে দিতাম। আমি নিজেই বাবাকে বোকার বেহদ্দ বলে জেনেছি তাই বাপ তুলে গাল দিয়ে রেহাই পেয়ে পেলেন। বাবা সত্যি বোকা। দুটো পয়সা রোজগার করেছে, ভেবেছে আমি মস্ত বাহাদুর। কীভাবে পয়সা কামিয়েছে সেটা কোনোদিন ভাবেনি। শেষ পর্যন্ত টানতে পারবে না, কী দরকার ছিল কমলদার চিকিৎসার দায় ঘাড়ে নেবার ? ওর আপনজনদের চটিয়ে বাহাদুরি করার ? মাঝখান থেকে কমলদার এ কূলও গেল ও কূলও গেল।

তার মানে সারবার উপায় আছে তবু কমলবাবুও আরোগ্য হবেন না ?

দেখি চেষ্টা করে—সিনেমায় গান গেয়ে যদি দিদির সর্বনাশ ঠেকাতে পারি।

দেখা যায় ললনার অনুমান সত্য নয়। মালিকের আবির্ভাবে এক ঘণ্টা কাজ বন্ধ থাকার বদলে শুটিং শুরু হয়ে যায়।

ললনা বলে, কত সহজ হয়ে গেছে ছবি তোলা।

তাই বটে। দূর থেকে কাছ থেকে এদিক থেকে ওদিক থেকে দিঘিটা দেখাতেই কত ফুট ফিল্ম কাজে লেগে যায়—সুন্দরী একটা মেয়েকে প্রকাণ্ড ভাঙা ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে আঁকা-বাঁকা ভঙ্গি করে নামিয়ে জলে চুবিয়ে ভঙ্গিহীন সিক্ত বসনে উঠিয়ে এনে কত ফুট ফিল্ম সার্থক হয়।

মুচকি হাসি চাপতে চাপতে, রোগা বেখাপ্পা শরীরটার নানারকম ভঙ্গি আর ঢং সামলাতে সামলাতে মানুষটা এসে অতিকষ্টে তোতলিয়ে ললনাকে বলে, আপনাকে ডাকছে।

ছবি তোলা দেখার বদলে কেশব তাকিয়ে থাকে যে লোকটি তাদের দিকে এগিয়ে আসছিল তার দিকে।

সর্বাঙ্গে তাব অবিরাম ঘটে চলেছে এলোমেলো নড়নচড়ন, ঠোঁট কাঁপছে চোখ মিটিমিটি করছে আর মাথাটা যেন ভিতরের ধাক্কায় চমকে চমকে নড়ে উঠছে।

ই—ইনি.... ? ই—ইনি.... ?

ললনা বলে, ইনি আমার বন্ধু।

সে বোধ হয় ভদ্রতার হাসি হাসবার চেষ্টা করে। হাতের আঙুল থেকে শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিরামহীন নড়নচড়ন যেন নতুন একটা বিশৃঙ্খলা, নতুন একটা অসামঞ্জস্য সংঘটিত হয়।

তোতলিয়ে তোতলিয়ে কতগুলি ভাঙা শব্দও সে উচ্চারণ করে।

কথাগুলির মানে কেশব বুঝতে পারে। ভেতরে যাবার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। তফাতে সরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাবা এতক্ষণ কথা বলছে, তাকে বাদ দিয়ে একলা ললনাকে ডাকবার সাহস স্টুডিয়োর কর্তাদের নেই। ললনা হয়তো রেগে যাবে, হয়তো বর্জন করবে স্টুডিয়োর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক।

ঝাল-মশলা হিসাবে ললনাদের খানিক খানিক না মিশিয়ে শুধু পেশাদার স্টারদের দিয়ে আব জমানো যাচ্ছে না জনসাধারণের পয়সায় সিনেমার আসর।

ললনার মুখের দিকে এক নজর তাকিয়ে কেশব একটু হেসে মাথা নেড়ে গেটের দিকে চলতে শুরু করে।

এগারো

মনের দুটো জগৎ ওলট-পালট হয়ে গেল। কিন্তু যন্ত্রণা কই ?

বরং দেহমন যেন শান্ত হয়ে গেছে তার। সুন্দর হোক কুৎসিত হোক সত্যের সন্ধান পেয়ে যেন তার পরম মুক্তি জুটেছে। মায়ার ওপর ললনার ওপব বিতৃষ্ণা আরও আগুনের মতো জ্বলে ওঠার বদলে যত বিরাগ আর বিতৃষ্ণা ছিল সব নিভে গিয়ে মমতা বেড়েছে।

নিজের মনে সত্যই কেশব তাজ্জব বনে যায়।

খসে গেছে মায়ার ফাঁকির মুখোশ, ধরা পড়ে গেছে যে তার মায়ের বাড়া দরদ, স্বেচ্ছায় সাগ্রহে বিনা পয়সায় কেনা ক্রীতদাসীর চেয়েও পোষ মেনে তার জন্য মরণ-বাঁচন পণ করা, তার ভীরুতা, কোমলতা, ব্যাকুল গভীর ভাবাবেগ—এ সব মিথ্যা, আসল নয়।

বারবার সে মায়াকে জানিয়ে দিযেছে যে ঘরে ঘরে ছোটোবড়ো সংসারে সে শুধু দেখেছে সস্তা সুখের লোভ, ফাঁকি আর হীনতা, দীনতা, দুঃখকষ্টে হাবুডুবু খেতে খেতেও মনকে চোখ ঠেরে কোনো মতে বেঁচে থাকার ধোঁকাবাজিতে সুখী থাকা।

এ রকম সংসারকে সে ঘেন্না করে। বউ নিয়ে এ রকম সংসারের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ার কথা ভাবলেও গা গুলিয়ে তার বমি আসে।

লেখাপড়া ছেড়ে তাই সে বখাটে হয়েছে। কেরানি হবার বদলে হয়েছে মোটর ড্রাইভার।

মায়া তবু আশা ছাড়েনি।

মায়া তবু প্রাণপণে চালিয়ে এসেছে মায়ার ফাঁদ পেতে তাকে বাগাবার চেষ্টা।

কাল গেল মায়ার এই মুখোশ খোলার পালা।

আজ সমস্ত শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির জৌলুস হারিয়ে, গান গেয়ে সভায় হাজার মানুষের মধ্যে আলোড়ন জাগাবাব মহত্ত্ব হাবিয়ে, বুচি বূপ হাসি গান আনন্দের আবরণ খসিয়ে আরেকটি মায়ার মতোই ললনা গেল সিনেমায় সস্তা গান গাইতে। কেশব আজ টের পেয়েছে, মায়া আর ললনা একই মিথ্যার এপিঠ আর ওপিঠ।

মায়া থাকে ডোবাপুকুর-বাঁশঝাড়ের অন্ধকারে আর ললনা থাকে আলোয় ঝলমল রেডিয়ো আর মোটরগাড়ির হর্নে উচ্চকিত লনওলা সুন্দব সাজানো বাড়ির পরিচ্ছন্ন পাড়ায়। মা-বাবা-ভাই-বোন ভগিনীপতির সুবিধা হচ্ছে না বলে ললনা অগত্যা সিনেমায় ঢুকে লড়াই শুরু করেছে তাদের জগৎটা পালটে দেবার জন্য।

কিন্তু তার নিজের দিকের হিসাবটা তবে কী দাঁড়ায় ?

মায়া আর মায়ার জীবন ও জগৎকে ভালোবেসেও সে রাত্রির অন্ধকারে মায়াকে ভোগ-দখল কবেছে, তাকে বাঁধবার জন্য মিথ্যা মায়ার ফাঁদ পেতেছে জেনেও সে তো মায়াকে এড়িয়ে যায়নি, এতটুকু রেহাই দেয়নি মায়াকে।

ললনা আব তার জীবন ও জগতের টানে মাঘের হাড়-কাঁপানো শীতের রাত্রিশেষেও ডোবায় ডুব দিয়ে প্রস্তুত হয়ে সে সাগ্রহে ছুটে গিয়েছে অনিমেষের গাড়ি চালানোর চাকরি করতে।

দিনের শেষে শহরের আলোকময় রাত্রি শুরু হতে না হতে সে অবশ্য ব্যাকুল হয়ে উঠতে শুরু করেছে মায়া আর চাঁদ ও তাবার বেশি আলোয আঁধার করা জগৎটায় ফিরে যাওয়ার জন্য—কিন্তু কত তুচ্ছ কারণে, ললনার সামান্য একটু প্রয়োজনে, বছরের কত রাত তার কেটে গিয়েছে শহরেই।

কানুর সঙ্গে দু-একচুমুক দেশি মদ খেয়ে কত দিন সে মায়াকে অগ্রাহ্য করে সোজাসুজি ঘরে গিয়ে একঘুমে রাত কাটিয়েছে।

ব্যাকুল মায়া একটা ছুতো করে বাড়িতে এসে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলছে—সে টের পেয়েও উঠে যায়নি, মায়াকে ভরসা দেয়নি, যে আমি ঠিক আছি, তোমারই আছি, ভেবো না।

মায়াকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে পেয়েছে বলেই কারণে-অকারণে তুচ্ছং করতে পেরেছে তার আকর্ষণ কিন্তু সে মনে করতে পারেও না কবে কোন গুরুতর কারণে ভোররাত্রে উঠে শহরে ছুটে যায়নি।

ললনা আর তাব জীবন ও জগতের টানটা একটা দিনের জন্যও এড়িয়ে যেতে পারে না।

জ্বর এসেছে।

কাঁথার তলে সারারাত কেঁপেছে আর কাতরেছে।

ভোররাত্রে উঠে ডোবার ঘাটে গিয়ে স্নান না করলেও নাকে-কানে কপালে জল ছুঁইয়ে নিয়মপালন করেছে, তারপর মাথাটা গামছা চুবিয়ে চুবিয়ে জল ঢেলে ধুয়ে ফেলেছে। শহরে যাত্রা করার জন্য।

ললনার জীবনে বিশ্রী বাজে দিনগুলি, বাপের মোটা বেতন এবং সকলের জানিত ও স্বীকৃত মোটা উপরি আয়ের পয়সার জীবনটা সুন্দর করার উজ্জ্ব ; করার চেষ্টাগুলি মাঝে মাঝে মনটাকে বিগড়ে দিয়েছে বটে কিন্তু বরাবর সে তাকে মন-প্রাণ দিয়ে শ্রদ্ধা কবে এসেছে জানা-চেনা রক্তমাংসের আদর্শ নারীত্বের প্রতীক হিসাবে। ললনার চেয়ে অনেক ভালো অনেক বড়ো অনেক খাঁটি মেয়ে জগতে হয়তো অনেক আছে কিন্তু তাদের সঙ্গে কেশবের দূরত্বটা প্রায় দুস্তর।

ললনার চেয়ে তারা হাজারগুণ মহীয়সী হলেও তার কাছে তারা নিছক কাল্পনিক জীব।

বাড়িতে ললনার গান অভ্যাস করার একঘেয়ে প্রক্রিয়াটা পর্যন্ত সে বরাবর মন দিয়ে শুনে এসেছে—একঘেয়ে লাগার বদলে মুগ্ধ হয়ে থেকেছে।

দশ-বিশহাজাব লোকের সভায় সেই গান শুনে তার মনে হয়েছে যেন নতুন গান শুনছে—এই দশ-বিশহাজার লোকের মতো তাকেও মাতিয়ে দেবার, রাগিয়ে দেবার, রোগ শোক দুঃখ দুর্দশার বিরুদ্ধে লড়াই করার রোমাঞ্চকর সাধ জাগাবার নতুন গান।

ললনার অসুখটার আক্রমণ হলে একটু বাতাসের জন্য তাকে দারুণ কষ্ট ছটফট করতে দেখে তার মনে হয়েছে, মরে গিয়ে নিজের জীবন দিয়ে সে যদি কষ্ট একটু লাঘব করতে পারত ললনার !

সেই ললনা সিনেমায় ঢুকেছে পয়সার জন্য !

বাপেব অনেক আয় ছিল, সে আয় হঠাৎ কমে যাওয়ায় দশ-বিশহাজার মানুষের সঙ্গে তাকেও মাতিয়ে জাগিয়ে খেপিয়ে তোলার সাধনাটা তুচ্ছ হয়ে গেছে ললনার কাছে।

তার রক্তমাংসের একমাত্র জীবন্ত দেবী সস্তা সিনেমায় ভিড়ে গেছে পয়সার দরকারে।

কিন্তু তার রাগ হচ্ছে কই ?

মায়া বা ললনাকে দোষী বা ছোটো ভাবতে পারছে কই, ঘৃণা করতে পারছে কই ?

ঘৃণা বা বিতৃষ্ণা জাগা আর সম্ভব নয়। তার কাছে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে আসল সত্যটা।

দোষ ওদের নয়।

মন্দ জগতের মন্দ নিয়ম খাটছে তাদের জীবনে, তারা কী করবে ?

সিনেমায় ঢোকার সুযোগটা গ্রহণ করার জন্য পাগল হয়ে মোহিনী যে পালিয়ে গিয়েছে সে জন্য সে তাকে দোষী করেনি, সব দিক দিয়ে দায়ি ভেবেছে ভুবনকে।

আজ ভুবনকে পর্যন্ত দায়ি ভাবতে পারছে না। শত দোষ করে থাক ভুবন, হীনতা ক্ষুদ্রতা স্বার্থপরতার অন্ধকারে যতই ভরাট হোক তার মন—তার মানসিক অবস্থাটা যে কায়েম করে রেখেছে অন্যেরা এই বাস্তব সত্যটাকে মেনে নিলে দায়ি তো তাকে কোনোমতেই করা যায় না।

মনের অন্ধকারের জন্য দাযি যদি সে না হয়, তাকে ছোটো ভাবার ঘৃণা করার অধিকারঁও তো এ জগতে কারও থাকতে পারে না !

মোহিনীর মতো রূপসি বউকে দিনরাত পুলিশের মতো পাহারা দেবার তাগিদটা তার জন্মগত দুর্বলতা নয়, জগতের সবচেয়ে অগ্রসর মানুষ হবার অধিকার নিযে মানুষ হয়েই সে জন্মেছে। নিজেদের স্বার্থে অন্যের খুশি মাফিক বরাদ্দ করা তাব জীবন, গড়ে দিয়েছে তার মতিগতি, সে করবে কী ?

মায়া যদি লাথিঝাঁটা-বাখারির মার মুখ বুজে সয়ে যাওয়াই সংসারের নিময় বলে জানে, নিয়ম পালন করার জন্য তাকে অমানুষ বলা চলে কোন যুক্তিতে ? তার ভালোবাসাকে অবলম্বন করে জীবনটা একটু সার্থক ও সুন্দর করার লড়াই যদি সে নিজের জানা নিয়মে করেই থাকে, কী বলে তাকে দোষ দেওয়া যায় ?

প্রয়োজন যদি বাধ্য করে থাকে ললনাকে সিনেমায় সস্তা গান গাইতে—মারাত্মক রোগ থেকে আরোগ্যলাভ করাটা পর্যন্ত যে তুচ্ছ করে দিতে পারে সভায় সমাবেশে লড়াইয়ের গান গাইবার তাগিদে, সে যদি অন্য দিকে অন্য প্রয়োজনের চাপে সিনেমার সস্তা পয়সা তুচ্ছ করার মতো মনের জোর নিজের মধ্যে খুঁজে না পায়, তার জানা নিয়মনীতি অনুসারে যেভাবে গিয়েছে এভাবে সিনেমায় ঢোকা তার কাছে যদি দোষের না হয়—তাকে ছোটো ভাবা যায় কী করে ?

না, মানুষের জীবনকে যারা ব্যাহত ও ব্যর্থ করে রাখে কেবল তাদের ছাড়া সংসারে কোনো মানুষকে বাজে ভাবা যায় না, ছোটো ভাবা যায় না, ঘেন্না করা চলে না। সংসারে গলদ থাকলে মানুষের মধ্যে গলদ থাকবে না ? সংসারে মহৎ মানুষ বীর মানুষ এগোনো মানুষ আছে বলেই ধনী মানুষ ভীরু মানুষ পিছোনো মানুষ অমানুষ হয়ে যায় না। জোর করে তাকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে, মহৎ

মানুষ বীর মানুষ এগোনো মানুষ হতে দেওয়া হয়নি—এ অপবাধ তাদের নয়। একজনের একটা দোষ আছে বলেই তার গুণটা বাতিল হয়ে যায় না।

ললনার মতো আলো পেলেও যাদের চোখে রঙিন কাচের চশমা এঁটে দেওয়া হয় জীবনে তাদের মিথ্যা বং তো থাকবেই।

মিথ্যার রং মেশানো থাক, আলো পেয়েছে বলেই ললনা আসল কথাটাও ধরেছে ঠিকই—জগৎটা পালটে নিতে হবে, সে জন্য লড়তে হবে।

নইলে অনিয়ম আর অব্যবস্থা ঘুচবে না।

মায়ার জগৎ, তার জগৎ, ললনার জগৎ পালটে দিতে হবে।

ঠিক কথা !

ডাক্তার দত্তের চিকিৎসায় কেন ফল হয়নি বুঝতে আর বাকি নেই কেশবের।

যে অনিয়মেব জন্য তার রোগ, সেটা রয়েছে সংসারে। সংসারটা না পালটিয়ে অনিযমটা যাবে না। তার বোগও আরোগ্য হবে না।

তার মানেও খুব সোজা। সংসারটা পালটাবার লড়াই তাকেও করতে হবে। শুধু নিজের রোগ নিজের সুখদুঃখেব হিসাব নিযে যেতে থাকলে কিছুই হবে না কস্মিনকালেও।

দেহমন হালকা হয় কেশবের।

অনিমেষের গাড় তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে কেশব যায় বীরেশের বাড়ি। বীরেশ রেগেই ছিল। কেশব গিয়ে পৌঁছতেই সে ধমক দিয়ে বলে, তুমি তো আচ্ছা লোক ! বলা নেই কওয়া নেই কামাই কবে বসলে ?

কেশব বলে, আজ্ঞে, অসুখ করেছিল।

বীরেশ আরও রেগে বলে, অসুখ করেছিল ! এ রকম কামাই করলে তোমায় আমি রাখব না।

কেশব মুখ তুলে কড়াসুরে বলে, সে আপনার খুশি। রাখা না রাখার মালিক আপনি। রাখতে না চাইলে বিদায় দেবেন কিন্তু এ রকম ধমক দিয়ে কথা কইবেন না।

বীরেশ তার মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে যায়। রাগ চাপতে তাকে যে নিজের সঙ্গে রীতিমতো লড়াই করতে হচ্ছে এটা স্পষ্ট বোঝা যায।

নতুন গাড়ি কিনেছে, এখনও নিজে চালাতে সাহস পায় না। কেশব বুঝতে পারে, সেটাও তার সংযমের একটা কারণ। চাকরি যে এখানে তার খতম হয়ে গেল তাতে সন্দেহ নেই। তবে আরেকজন লোক পাওয়ার আগে তাকে বীরেশ জবাব দেবে না।

তার অসহ্য বেয়াদবি সহ্য করে যাবে আরেকজন ড্রাইভার পাওয়া পর্যন্ত—অর্থাৎ একদিন কী দুদিন তার চাকরির মেয়াদ !

অন্য লোক পেলেই তাকে তাড়াবে, বাকি মাইনেটা দিতে গোলমাল গড়িমসি কবে গায়ের ঝাল ঝাড়বার চেষ্টা করবে।

বীরেশের গায়ের জ্বালা এখনকার মতো চেপে যাবার মতলব আঁচ করে কেশব মনে মনে একটু হাসে।

বোধ হয় দশ মিনিটও লাগে না।

নাওয়া-খাওযা আগেই সারা হয়েছিল বীরেশের। মিনিট দশেকেই প্রসাধন সেরে পোশাক পরতে যাওয়ার আগে শুধু একটা আন্ডারওয়ার পরে তাকে বলতে আসে, গাড়ি বার করো।

বাড়িতে নিজের ও আত্মীয়স্বজনের বয়স্কা আশ্রিতা মেয়ে পাঁচ-ছটির কম নয়। তিন-চারজন তারা কলেজে পড়ে। পোশাক পরার আগে প্রসাধনের সময় বীরেশের সেকেলে ল্যাঙটের চেয়ে বিশ্রী এই আন্ডারওয়ার পরে অনায়াসে বাড়ির মধ্যে এদিক-ওদিক চলাফেরা করে—গ্রাহ্য করে না।

কেশব বলে, গাড়ি বার করছি সার। আপনি রেডি হয়ে আসবার আগেই আমি রেডি হয়ে থাকব। ওষুধপত্র কিনতে হবে, আজ আমার মাইনেটা দেবেন।

দুদিন পরে নিয়ো।

গরিব মানুষ, অসুখ হয়েছে। টাকার বড়ো দরকার সার। ওষুধ-পথ্য না পেলে হয়তো ফের দুদিন কামাই করে বিছানায় পড়ে থাকব।

কাল-পরশু নিয়ো। চাওয়ামাত্র দিতে হবে এমন কিছু নিয়ম আছে নাকি ?

পরশু মাস কাবার হয়েছে।

তাতে কী হয়েছে ? কাল-পরশু নিয়ো।

কেশব মনে মনে বলে, তোমার মতলব বুঝেছি। মতলব ভাজবে আমিও জানি, টের পাইয়ে দিচ্ছি দাঁড়াও।

প্রসাধন সেরে দামি পোশাক পরে বীরেশ সিগার ধরিয়ে হেলতে দুলতে বেরিয়ে এসে গাড়িতে ওঠে।

স্নান করে চুপিচুপি পূজা সেরে খাওয়া-দাওয়া সে আগেই চুকিয়ে রাখে।

সাহেবি পোশাকে সিগার টানতে টানতে বেরোয় কিন্তু কেশবের তো অজানা নেই কিছুই।

কপালের বদলে বুকে সে ফোঁটা চন্দনের নকশা আঁটে - রবার স্ট্যাম্পের মতো তৈরি করা নকশা। তামার পাত্রে রাখা শ্বেতচন্দনের বাটায় স্ট্যাম্পটা ডুবিয়ে বুকে ছাপ মারলেই হল—এক মিনিটও লাগে না।

গাড়ি নিয়ে রাস্তায় নেমেই কেশব চাপায় স্পিড।

আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম হয় বীরেশের !

আরে আরে, কী করছ পাগলের মতো ? চাদ্দিকে গাড়ি এত জোরে চালায় ? আস্তে চালাও।

আস্তেই চালাচ্ছি সার। আপনাকে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমি একটু জরুরি কাজে বেরোব। হাতে একটা পয়সা নেই যে বিড়ি-সিগ্রেট কিনি।

তুমি বাবু আস্তে গাড়ি চালাও, মাইনে আজকেই মিটিয়ে দেব।

তাহলে ঠিক আছে।

কেশব গাড়ির স্পিড কমিয়ে দেয়।

আপিসে পৌঁছেই তার মাইনে দিয়ে বীরেশ তাকে সঙ্গে সঙ্গে বরখাস্ত করে দেয়।

বিনা নোটিশে তাড়াচ্ছেন, পনেরো দিনের মাইনে বেশি দিতে হবে সার।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে বীরেশ নীরবে আরও পনেরো দিনের বেতন তাকে দিয়ে দেয়।

অনিমেষের কাছে সে শুনেছিল লোকটার মাথার ছিট আছে—মাথা বিগড়ে গেলে যা খুশি করতে পারে, নিজে বাঁচবে কী করবে গ্রাহ্য করে না। সত্যই তো, কী স্পিড চাপিয়েছিল গাড়িতে ! অ্যাকসিডেন্ট হলে কেবল সে নয়, নিজেও যে মরবে এটা খেয়ালও করেনি। কাজ নেই বাবা, এ সব মানুষকে চটিয়ে কাজ নেই।

পনেরো দিনের মাইনে আদায় করেও কেশব কিন্তু ছাড়ে না।

বলে, আমার বাড়ি যাবার গাড়িভাড়াটা সার ?

কত ?

আজ্ঞে মোটে দশ পয়সা।

পরদিন কাক-ডাকা ভোরে কেশব হাজির হয় কানুর বাড়ি। কানুকে তার অসুখ সম্পর্কে সুসংবাদটা জানাতে হবে। একটা কাজের কথাও বলতে হবে।

কানুর বিয়ে আবার পিছিয়ে গেছে।

কাবখানায় দুর্ঘটনার জন্য ঠিক করা তারিখে বিয়েটা হয়নি। এই মাসে বিয়ের আরেকটা যে শুভদিন বাছা হয়েছিল তার সাতদিন আগে বেলার ঠাকুমা গেছে মাবা।

এক মাস অশৌচ যাবে। তারপর মাস দেড়েকের মধ্যে একটাও বিয়ের তারিখ নেই।

তিন মাস পরে যদি হয় তো হবে তাদের বিয়ে।

টিনের ছোটো পুরানো বাড়ি। দুখানা মোটে ছোটো ছোটো ঘর আর একফালি বারান্দা।

কানু তাকে বারান্দায় বসায়।

ঘরের মধ্যে একটা চেনা মুখকে আড়ালে সরে যেতে দেখে কেশব তাজ্জব বনে যায়।

এত সকালে এ বাড়িতে বেলা ?

কানু এক মুহূর্তও ইতস্তত করে না। ডেকে বলে, একটু চা-টা দিতে হয় তো ? বন্ধু-মানুষ বাড়ি এয়েছে ?

ভেতর থেকে বেলার গলা শোনা যায়, মুন্ডু ধরিয়ে জল চাপিয়েছি গন্ধ পাও না ? নাক বন্ধ নাকি ? তাড়াহুড়ো কোবো না, পুড়ে মরলে ভালো হবে ?

কেশব তাজ্জব বনে চেয়ে থাকে।

কানু বলে, মুন্ডু কী জানিস ? একটা পেট্রল স্টোভ বানিয়েছি। সিগারেট লাইটার দেখেছিস তো, ছোট্ট জিনিস, একটা পলতে। একটা বড়ো ডিবেয় ছ্যাঁদা করে সাতটা পলতে বসিয়ে দিয়েছি—চট করে জল ফুটে যায়।

একদিন ফেটে গেলে টের পাবি।

ফেটে গেলেই হল ! অ্যাদ্দিন ঘাঁটছি কারবার করছি, পেট্রলের ব্যাপার জানি না ভেবেছিস ? ইঞ্জিন যদি না ফেটে চলে তবে আমার স্টোভও ফাটবে না। তবে হ্যাঁ, এ স্টোভে অন্যের সুবিধে হবে না। আমার সব মাগনায় চলে, অন্যের খরচা পোষাবে না। নইলে—

নইলে ?

নইলে পেটেন্ট নিয়ে সস্তা পেট্রল স্টোভ বানিয়ে বাজারে ছাড়তাম—বড়োলোক হয়ে যেতাম।

বাজারে মাল ছাড়তে হলে কারখানা করতে হয়। টাকা পেতিস কোথায় ?

টাকাওলা একজনকে লাভের ভাগীদার করতাম—সে টাকা দিত।

কাচের গ্লাস আর টিনেব মগে তাদের চা এনে দিয়ে বেলা বলে বন্ধু এলে খাতির করবে তুমি, আমায় ডাকা কেন ? ঘরে না এনেই ঘাড়ে দায় চাপানো ভালো নয়। বন্ধু তো এবার দফা সারবে, পাঁচজনকে বলে বেড়াবে।

কানু বলে, তেমন বন্ধু নয়। আমি গাড়ি সারাই, ও শালা গাড়ি চালায়।

বেলা বলে, এবার আমি পালাই। চাদ্দিক ফরসা হয়ে গেছে।

বলে বুনো হরিণীর মতো সত্যই সে পালিয়ে যায়।

কেশব বলে, ধাঁধা লাগছে যে।

কানু বলে, স্পষ্ট জিজ্ঞেস করতে পারলি না ? ছুটে গিয়ে নাগাল ধরে জিজ্ঞাসা কর, ধাঁধা মিটিয়ে দেবে।

কেশব চাপচাপ লাল আটালো গমের আটা সেঁকা রুটি দিয়ে গুঁড়ো দুধের বিশ্রী চায়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খায়, ধীরে ধীরে অনুযোগের সুরে বলে, তুই জানিস না ধাঁধাটার মানে ?

কানু বলে, ধাঁধা কিছু নয়, সিধে ব্যাপার। চণ্ডীতলায় ওর পিসির বাড়ি, পিসি ওকে বড্ড ভালোবাসে। বাচ্চাবেলায় মা-র হয়েছিল অসুখ, পিসি মাই দিয়ে বাঁচিয়েছিল। খুশি হলেই পিসির কাছে যায়, দু-একদিন থেকে আসে। এবার পিসির কাছে যাবার নাম করে আমার বাড়ি বেরিয়ে গেল।

রোজ আসে ?

পাগল নাকি তুই ? ও হপ্তায় এসে এক দিন ছিল, কাল বিকেলে এসে রাতটা থেকে গেল।

কাচের গ্লাসে গরম চায়ে চুমুক দিয়ে কেশব বলে, বাড়িতে নিশ্চয় জানে ?

জানে বইকী। পিসি পর্যন্ত জানে। পিসি কাল একটু পায়েস রেঁধেছিল, বাচ্চাকালে মাই খাইয়েছে, ওকে না দিয়ে তো নিজের রাঁধা পায়েস খেতে পারে না। ডেকে আনতে গিয়ে শোনে মেয়ে নাকি আগের দিন তারই বাড়ি গেছে। পিসি কথাটি না কয়ে সটান এখানে এসে হাজির।

মা-কে ভাগিয়েছিস বুঝি ?

সোজা কথা বড়ো বাঁকা বুঝিস। মা-কে ভাগাব কেন ? মা গঙ্গায় নাইতে গেছে, খানিক বাদেই আসবে। মা না থাকলে ও আসত, না আমিই ওকে খালি বাড়িতে থাকতে দিতাম ? কাল ওর পিসি এসে এক ঘণ্টা মা-র সঙ্গে গল্প করে গেল না ? যাবার সময় শুধু একটিবার ডাকল, বেলা আসবি নাকি ? মা বললে, থাক, আমি দিয়ে আসব।

কেশব বলে, বটে ! বাড়িতে কিছু বলে না ওকে ?

কানু বলবে, কী বলবে ? ভয়ে চুপ করে আছে। চোখ-কান বুজে দুটো মাস কাটিয়ে দিয়ে বিয়েটা সেরে দিতে পারলে বাঁচে। মেয়ের নেই কেলেঙ্কারির ভয়, বকাঝকা দিতে গেলেই ঝঞ্ঝাট। তার চেয়ে চুপচাপ দুটো মাস কাটিয়ে মেয়েকে বিদেয় করে হাঁপ ছাড়াই ভালো।

কেশব বলে, সে তো ভালো বুঝলাম। কেলেঙ্কারির ভয়ে ওরা তোদের ঘাঁটাতে চায় না, দেখেও দ্যাখে না, জেনেও জানে না, কিন্তু তুই যদি শেষ পর্যন্ত বিয়ে না করিস ও মেয়েকে—এ ভয়টা তো আছে ওদের ?

কানু হেসে বলে, না, ওদিক দিয়ে ওরা নিশ্চিন্ত। জানে যে পৃথিবী উলটো গেলেও আমাদের বিয়ে হবেই হবে।

কেশব আচমকা জিজ্ঞাসা করে, কমপেনসেশান আদায় করতে পারবি তো ঠিক ?

করব না তো কি ছেড়ে দেব ভেবেছিস ? অনেক কম দিয়ে ঠকাবার চেষ্টা করেছিল, আমি কিছুতেই ছাড়লাম না। কিছুদিন গোলমাল করে হার মানল।

কানু কাজে যাবে।

উঠতে গিয়েও সে বসে।

বন্ধুকে আরেকটা বিড়ি দিয়ে নিজে একটা ধরিয়ে বলে, তোকে আজ খুব তাজা দেখাচ্ছে ? দিব্যি হাসিখুশি ভাব। এমন তো দেখিনি কখনও ! ব্যাপারটা কী ?

আমার রোগ সেরে গেছে।

সেরে গেছে ! হঠাৎ ?

কেশব হেসে বলে, তা সারেনি, তবে সেরে গেছেই বলা যায়। আমার অসুখ কেন জানিস ? সংসারটা বদখত হয়ে আছে বলে। সংসারটা পালটে দেবার লড়াই করব ঠিক করেছি।

কানু বলে, বটে ! তা ও লড়াই তো কত লোকেই করছে। সংসারটা যদ্দিন না পালটাচ্ছে তদ্দিন তোর রোগ সারবে না।

কেশব বলে, শোন না, সেই কথাই বলছি। সবার জীবন শুধরে দেবার লড়াই করব ঠিক করতে রোগ যেন অর্ধেক কমে গেছে, লড়াই আরম্ভ করলে নিশ্চয় আরোগ্য।

চালচলন
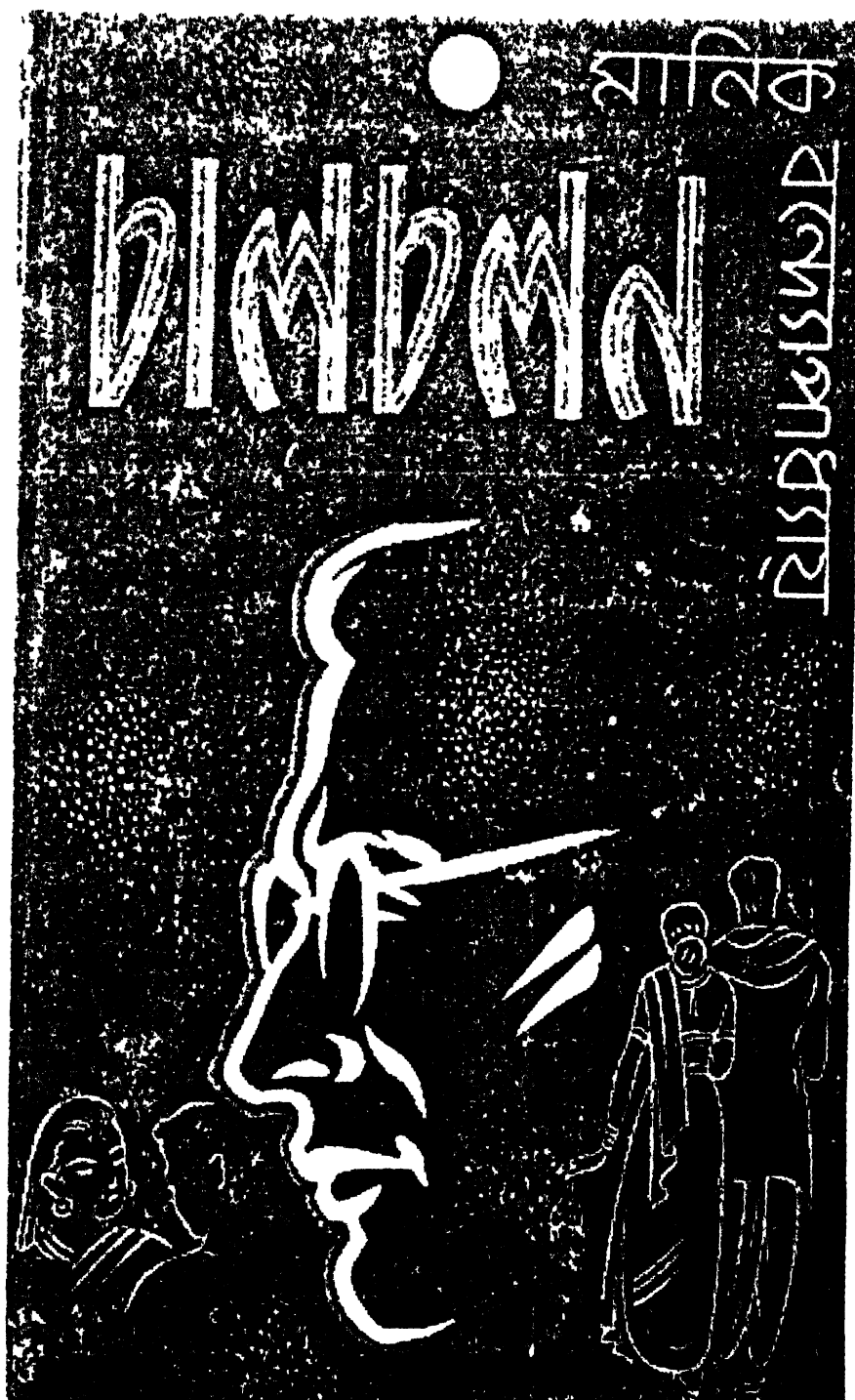
চালচলন প্রথম সংস্করণেব প্রচ্ছদচিত্র

১

জ্যোৎস্নাকে ভোরের আলো ভেবে সুনীল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। ভোরের বদলে শেষরাত্রে।

ভোর শুরু হতে হতেই সে প্রতিদিন বেড়াতে বার হয়। যখন রাত্রির অন্ধকার সবে তরল হতে শুরু করেছে অথবা রাত্রিশেষের জ্যোৎস্নাতে লাগতে আরম্ভ করেছে ভোরের আলোর রং।

এ বাড়িতে এত ভোরে আর কারও ঘুম ভাঙে না।

বেড়াতে বেরিয়ে সুনীল ফুল তুলে আনে। প্রতিদিন।

ভোরের শুরুতে বার না হলে পথের ধারের পরের বাগানে পরের গাছে ফুল মেলে না। রাস্তা থেকে যে সব ডাল আয়ত্ত করা যায় একটু দেরি হলে সমস্ত ফুল লুট হয়ে ডালগুলি সাফ হয়ে যায়। তারই মতো আরও কয়েকজনের ফুল তোলার বাতিক আছে।

সুনীল কিন্তু যায় বেড়াতেই, ফুল তুলতে নয়। বেড়াতে গিয়ে ফুল তুলে নিয়ে আসে।

শুধু তুলে আনে। ফুলগুলি তার আর কোনো কাজেই লাগে না।

একে ওকে বিলি করে দেয়।

পিসি পূজা করে। ফুল দিয়েই করে। কিন্তু নিজের পূজার জন্য দরকারি দু চারটি ফুল সে নিজেই জোগাড় করে আনে। সুনীলের ফুল দিয়ে— নানারকম সুন্দর টাটকা ফুল হলেও—পিসি পুজো করে না। ম্লেচ্ছ নাস্তিকটার ফুল দিয়ে পুজো করলে নাকি অপরাধ হবে।

আমি নিজে যদি পুজো করি পিসি?

তুই করবি পুজো!

কেন? বিধিনিয়ম মন্ত্রতন্ত্র আমি সব জানি।

বেশি জেনেই তো গোল্লায় গেছিস।

রাস্তায় নেমে খানিকটা হেঁটে সুনীলের খেয়াল হয় ভোর হতে তখনও বেশ খানিকটা বাকি আছে।

খেয়াল হয় চাঁদের দিকে চেয়ে।

আগের দিন ভোরের সময় আকাশের আরও অনেক নীচে ছিল চাঁদটা। আজ বরং আরেকটু নীচে নামার কথা সেই সময়ে।

কী করা যায়? ঘড়ির দিকে একনজর তাকালেই হত, বোঝা যেত এটা রাত্রি শেষের কোন স্তর। চাঁদটাই তাকে ভাওতা দিয়েছে। বাইরে জ্যোৎস্না দেখে মনে হয়েছে আজ বুঝি দেরিই হয়ে গেল ঘুম ভাঙতে, কোনোদিকে না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছে।

চারিদিক নির্জন নিঝুম। জাগবার সময় ঘনিয়ে এসেছে বলে পৃথিবী যেন আরও বেশি শান্ত আর স্তব্ধ হয়ে গেছে। বহুদূরে দু একটা কুকুরের ক্ষীণ ডাক আর বাদুড়ের পাখার আওয়াজ ছাড়া জগতে শব্দ নেই। কয়েক ঘণ্টা আগেও চারিদিক শুধু রেডিয়ো মুখরিত করে রেখেছিল।

ইতস্তত করতে করতে সুনির্দিষ্টভাবে সময়টা জানা যায়।

কাছে এবং দূরে ঘণ্টা বাজে। তিনটি করে ঘণ্টা। রাত এখন তিনটে।

আরও দেড়ঘণ্টা তার চাদর গায়ে দিয়ে ঘুমানো উচিত ছিল। তারপর ধীরেসুস্থে বেরোলেই হত।

নিজের খাপছাড়া আচরণটা সুনীলকে হঠাৎ যেন বড়োই বিব্রত করে দেয়। হঠাৎ যেন তার খেয়াল হয় যে চারিদিকে ঘরে বারান্দায় আনাচেকানাচে অসংখ্য মানুষ নির্বিচারে ঘুমোচ্ছে, শুধু একা

সে ভোরবেলা বেড়াবার ঝোঁকে বেড়াতে বেরিয়ে পড়েছে রাত তিনটের সময়। এমন নয় যে সন্ধ্যারাত্রেই খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়েছিল, ইতিমধ্যে যথেষ্ট ঘুম হয়েছে—অন্তত তার পক্ষে যত ঘণ্টা ঘুমানো দরকার।

রাত সাড়ে এগারোটায় শুয়েছিল। রাত তিনটের মধ্যে তার ফুরিয়ে গেল ঘুমের কারবার। বাইরে জ্যোস্না দেখে ভোর মনে করে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ল বেড়াতে !

কেন ?

কেন তার এই খাপছাড়া স্বভাব ?

নিজের অদ্ভুত আচরণের মানে বুঝবার চেষ্টা করতে গিয়ে সুনীল মনের মধ্যে নিদারুণ অস্বস্তিবোধ করে। তার মনে হয়, এমন একটা কিছু গোলমাল তার ভিতরে আছে যা তাকে দশজন সাধারণ মানুষের থেকে পৃথক করে রেখেছে। সকলে যখন ঘুমায় সে তখন রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে বেড়াতে।

এবং রাস্তায় নেমে কেন এভাবে বেড়াতে বেরিয়েছে তার মানে বুঝবার চেষ্টায় মাথা ঘামায়।

সুনীল হাঁটতে থাকে।

বেরিয়ে যখন পড়েছে আর বাড়ি ফিরে গিয়ে লাভ নেই।

নিঝুম শহরতলির নির্জন পথ ধরে একা একা হেঁটে চলতে মন্দ লাগে না। মনোজের বাড়ির কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে দুপাশে বাড়িগুলি খানিকটা ফাঁকা ফাঁকা হয়ে আসে।

বাঁদিকে একতলা বাড়িটার সামনে সুনীল দাঁড়ায়।

ভোরে রোজ সে বেড়াতে যাবার সময় মনোজকে ডেকে দিয়ে যায়। মনোজের বুলাই আছে। বাইরের ঘরে জানালার কাছে মনোজ শোয়, জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে তার নাগাল মেলে। ঠেলা দিয়ে তাকে ডেকে তুলে সুনীল আবার রাস্তায় নেমে হাঁটতে আরম্ভ করে।

মনোজ বেড়ায় না—তাকে ভোরে উঠতে হয় কাজে যাবার জন্য।

সে কাজ করে সহায়রামের কারখানায়। ঠিক ছটায় প্রথম ভোঁ পড়ে। সুনীল ডেকে দেবার পর কারখানায় যাবার জন্য প্রস্তুত হবার সময়টুকুই মনোজের হাতে থাকে।

আজ এখন মনোজকে ডাকার কোনো অর্থ হয় না। বেচারা আরও প্রায় দুঘণ্টা ঘুমোবার সময় পাবে।

অথচ এমনি আশ্চর্য ব্যাপার যে প্রত্যেক দিনের মতো তাকে ডেকে দেবার কথা ভেবেই সুনীল বাড়ির সামনে দাঁড়ায় এবং নিজের মধ্যে স্পষ্ট অনুভব করে মনোজকে ডেকে দেবার তাগিদ।

এরই নাম কি অভ্যাস ?

এমনিভাবেই কি মানুষ নিজের অভ্যাসের বশ হয় ? কতগুলি বিষয়ে যন্ত্রে পরিণত হয় ?

হাঁটতে শুরু করে সুনীল মনে মনে একটা সংকল্প স্থির করে। আজ প্রায় সাত-আটবছর সে ভোরে নিয়মিত বেড়াতে বার হচ্ছে—মনোজকে ডেকে দেবার অভ্যাসটা মোটে বছর খানেকের।

পরদিন সে বেড়াতে না বেরিয়ে দেখবে কেমন লাগে।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে উঠে সে দাঁড়ায়।

দূরে বাঁক ঘুরে একটা গাড়ি আসছে সশব্দে। মালগাড়ি বুঝতে পারা যায়। এ সময় কোনো প্যাসেঞ্জার ট্রেন নেই।

সামনে দিয়ে গাড়িটা চলে যায়, সে একটি একটি করে গোনে মোট কতগুলি ভ্যান আছে। তারপর আবার নিজেকে প্রশ্ন করে, কেন ?

অল্পবয়সে মালগাড়ি দেখলে ক-টা গাড়ি গুনবার ছেলেমানুষি শখ ছিল— আজও সেটা বজায় রয়ে গেল কী করে ? মালগাড়ি আসছে দেখে আজও সে সাগ্রহে দাঁড়িয়ে পড়ে কেন, গাড়িগুলি গোনা হওয়ার পর খেয়াল হয় কেন যে এখন আর সে ছেলেমানুষ নেই, বালক বয়সের এ রকম একটা অভ্যাসের জের টেনে চলার কোনো আর মানে হয় না ?

মালগাড়ির ভ্যান গোনাটা অপরাধ নয়। যুবক বয়সে মালগাড়ির ভ্যান গুনে দেখবার কৌতূহল জাগাটা অস্বাভাবিক ব্যাপারও নয়। কিন্তু মুশকিল হল এই যে এটা তার হঠাৎ জাগা খেয়াল বা কৌতূহল নয় স্রেফ ছেলেবেলায় সেই অভ্যাসটার জের টানা।

একটু সময়ের জন্য সে যেন বালকে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, ফিরে গিয়েছিল মফস্বলের সেই ছোটো শহরটিতে, যেখানে রেললাইনের কাছে একটা বাড়িতে থাকার সময় এই অভ্যাসটা গড়ে উঠেছিল।

ব্যাপারটা সচেতনভাবে ঘটলে সুনীল এত বিচলিত হত না। হাঁটতে হাঁটতে সে এই আত্মবিস্মৃতির মানেটা বুঝবার চেষ্টায় এতই বিব্রত আর অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে যে একেবারে বিমান ঘাঁটির কাছে পৌঁছে তার খেয়াল হয় কতটা রাস্তা হেঁটেছে।

সাড়ে চারটের ঘণ্টা পড়ে।

দেড় ঘণ্টা ধরে নিজের মনে হেঁটেছে।

হাঁটার অভ্যাস থাকায় এতটুকু শ্রান্তিবোধ করেনি।

তারাগুলি ম্লান হয়ে এসেছে। চারিদিকে দেখা দিচ্ছে জাগরণ ও জীবনের নমুনা। একঝাঁক অজানা পাখি মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলে যায়। কোথায় পাড়ি জমাবে কে জানে। মনটা অদ্ভুত রকম উদাস হয়ে যায় সুনীলের। কতটুকু সময় লাগে রাত ফুরিয়ে দিন শুরু হতে, খানিক পরেই রোদ উঠবে, চারিদিক কর্মব্যস্ত হয়ে উঠবে— কিন্তু এতটুকু সময়কে অবলম্বন করেই যেন অনন্ত সময় আর অসীম বিশ্ব আকুল করে দিয়েছে তার অনুভূতিকে।

বড়ো ছোটো তার জীবন, তুচ্ছ সব বাঁধনে তার চেতনা পরাধীন। নিজে [illegible] সে জানে না, বোঝে না। তার জীবনের অর্থ নেই।

অনুভূতিটা অসহ্য মনে হয়। বাড়ি ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে এতদূর এসেছে—একছুটে যদি জীবন ও জগতের সীমানা পার হয়ে চলে যেতে পারত।

বাস চলতে আরম্ভ করলে প্রথম বাস ধরে সে বাড়ি ফিরে আসে।

বাস থেকে নেমেই মনে হয়, কী যেন ভুলে এসেছে, ফেলে এসেছে।

যতক্ষণ বাসে ছিল, এ ভাবটা টেরও পায়নি।

গলির মুখের দিকে এগোতে এগোতে জোরালো হতে থাকে অস্বস্তিবোধ –কী যেন ভুলে এসেছে, ফেলে এসেছে।

ভবেশ বলে, এই যে সুনীল। আজ যে বড়ো খালি হাতে ? ফুল আনোনি ?

না, আজ অন্যদিকে গিয়েছিলাম।

তাই বলো ! আজ ফুল তুলে আনা হয়নি তাই মনে হচ্ছিল কী যেন ভুলে এসেছে, ফেলে এসেছে। বেড়াতে বেরিয়ে কখনও বাসে ফেরে না। তাই বাসে যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ কিছুই অনুভব করেনি। বাস থেকে নেমে যেই হাঁটতে আরম্ভ করেছে বাড়ির দিকে, সেই শুরু হয়েছে প্রতিদিন বেড়িয়ে ফেরার শেষ পর্যায়—সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করেছে খালি খালি ভাব।

শুধু তার নিজের নয়।

বেড়িয়ে ফিরছে অথচ তার হাত খালি এটা যে ভরেশ ছাড়াও কতজনের চোখে পড়ে।

মুদিখানার গগন, তিনতলা বাড়িটার একতলার ভাড়াটে শঙ্কর, স্কুলের ছাত্র বিমল, ভূপেনের স্ত্রী অনিলা এবং বোসেদের বেণু তাকে প্রশ্ন করে তার হাতে ফুল নেই কেন।

বেণুর জিজ্ঞাসা করাটা আশ্চর্য ব্যাপার নয়। ফুলগুলি তাকেই দান করে সুনীল। বেণু এক রকম তারই বেড়িয়ে ফেরার প্রতীক্ষায় বাইরের রোয়াকে দাঁড়িয়ে থাকে।

কিন্তু বেণু ছাড়াও পাড়ার এতগুলি ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ যে তার হাতের ফুলের অভাবটা খেয়াল করে, এটা প্রায় অভিভূত করে দেয় সুনীলকে।

বাড়ি ঢুকতেই তার সাড়া পেয়ে পিসি বলে, সুনীল, আজ তোর কয়েকটা ফুল দিস তো বাবা। জ্বর নিয়ে আর ফুল তুলতে পারিনি আজ। গঙ্গাজলে ধুয়ে নিয়ে তোর ফুল দিয়েই চালাতে হবে।

আজ তো ফুল আনিনি পিসি।

তবেই দফা সেরেছিস আমার।

জ্বর নিয়ে নাইবা করলে পুজো?

কী যে বলিস তুই পাগলের মতো। আমার জ্বর বলে পুজো বাদ যাবে না কি? আর লোক নেই পুজো করার? পুজো করবে বাণী—কিন্তু এখন ফুল পাওয়া যায় কোথা।

রমেনকে বলে দাও, বাজার থেকে ফুল কিনে আনবে।

যাঃ, কেনা ফুলে কোনোদিন পুজো হয়নি, তোলা ফুল চাই।

দেখি, দু-চারটে ফুল যদি পাই।

রান্নাঘর থেকে লতা ডেকে বলে, চা খেয়ে যাও না?

ফুল এনে খাব।

বড়ো রাস্তার ধারে অবিনাশের প্রকাণ্ড বাগানওলা বাড়ি, বাগানে বহু ফুলের গাছ—ডালে ডালে অসংখ্য ফুল ফুটে আছে।

গেটে দারোয়ান বলে, ক্যা মাংতা বাবু?

কয়েকটা ফুল নেব।

নেহি বাবু। মানা হ্যায়।

সুনীল বলে, আরে বাবা, মানা তো হ্যায় জানি। তুম ররং বাবুকো বোলকে আও যে এক বাবু পূজাকা ওয়াস্তে দু চারঠো ফুল মাংতা।

গলা বেশ চড়িয়েই কথাগুলি বলে সুনীল। একটু দূরে বাগানে অবিনাশের মেয়ে মিলনী তাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বোধ হয় ফুলের শোভাই দর্শন করছিল—তার কানে পৌঁছে দেবার জন্য।

পরিচয় নেই, কিন্তু বহুকাল পাড়ায় আছে, মুখ দেখে মিলনী দেবী নিশ্চয় চিনতে পারবে যে সে পাড়ায় থাকে।

মিলনী মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে এগিয়ে আসে।

কী বলছেন?

কয়েকটি ফুল ভিক্ষা চাইছিলাম। বাড়িতে পুজোর জন্য দরকার।

দারোয়ানকে কিছু ফুল তুলে দেবার হুকুম দিয়ে মিলনী বলে, আপনি সুনীলবাবু না?

সুনীল সায় দিয়ে বলে, পথেঘাটে অনেকবার দেখেছেন, মুখ দেখে পাড়ার মানুষ বলে চিনবেন ভেবেছিলাম। নামটাও জানা থাকবে ভাবতে পারিনি তো।

রেণুদির কাছে আপনার নাম শুনেছি।

রেণুদির কাছে ?

রেণুদি আমাকে পড়ায়।

ও !

দেহটা বেশ মোটাসোটা বলে এতক্ষণ তাকে রেণুর সমবয়সি মনে হচ্ছিল, এবার মুখের দিকে চেয়ে সুনীল টের পায় যে মিলনীর মুখখানা অনেক বেশি কচি—তার পক্ষে রেণুর ছাত্রী হওয়া একেবারেই খাপছাড়া ব্যাপার নয়।

মিলনী বলে, আপনি বাঁশি বাজান তো ? রেণুদিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, রেডিয়োতে মার্কিনি গানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রোজ রাত্রে কে বাঁশি বাজান ? রেণুদি আপনার নাম বললেন। একদিন আমরা গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম, আপনি আপিস যাচ্ছিলেন। রেণুদি আপনাকে দেখিয়ে বললেন, উনিই সুনীলবাবু, উনিই বাঁশি বাজান।

রেণুর উচিত ছিল আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

মিলনী একটু হাসে।

রেণুদি বলেছিল, আমি রাজি হইনি।

কেন ?

আমি যেচে কারও সাথে আলাপ-পরিচয় করি না। রেণুদি জিজ্ঞেস করেছিল, ডাকব, আলাপ করবে ? আমি যদি সায় দিয়ে বলতাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, ডাকো, আলাপ করিয়ে দাও—আপনি আবোল-তাবোল কত রকম কিছু ভাবতেন। রেণুদি আপনাকে বলত, মিলনী তোমার বাঁশি শুনে তোমার সাথে আলাপ করতে চেয়েছিল, তাই ডেকে আলাপ করিয়ে দিয়েছি। আপনি কত রকম কিছু ভাবতেন।

কী ভাবতাম ?

যান ! আপনি যেন ছেলেমানুষ !

প্রায় বুড়ো হয়ে পড়েছি। এই ফাল্গুনে তিরিশ বছর বয়স হল।

তিরিশ !

বাঁশি বাজাই বলেই আমাকে কলেজের ছাত্র ভেবেছিলেন নাকি ?

বাঁশি বাজান বলে ভাবিনি। আমাকে আপনি আপনি বলছেন বলে ভাবছি ভাবব নাকি।

তোমার মতো মেয়ের সঙ্গে কখনও মিশিনি, মন-মেজাজ জানি না। রেণু আমার কাছে সাইকলজি পড়ে, তুমি রেণুর কাছে কলেজের পড়া পড়—কিন্তু আমি হঠাৎ তুমি বললে তুমি খুশি হবে না রাগ করবে সত্যি আমার জানা নেই !

সাইকলজি পড়ান ? আবার বাঁশিও বাজান ?

কী করি বলো ? দুটোই দরকার হয়েছে !

দারোয়ান একরাশি ফুল নিয়ে এসে হাজির হয়। তার গামছায় বেঁধে।

ফুল দেখে সুনীল বলে, এ তো সব সিজন ফ্লাওয়ার—বিলেতি ফুল। এ ফুলে তো পিসির পুজো চলবে না।

মিলনী ভীষণ চটে যায়।

শুয়ারকা বাচ্চা, তুম ইয়ার্কি শুরু কর দিয়া ? কোন ফুলমে পূজা হোতা তুম নাহি জান্তা হায় ?

রামশরণ সবিনয়ে জানায় যে তাকে পূজার ফুল তুলে আনার হুকুম দেওয়া হয়নি। সে কী করে জানবে !

মিলনী আবার বলে, শুয়ারকা বাচ্চা !

হঠাৎ সে হাসে।

আসুন আমার সঙ্গে। নিজের হাতে পুজোর ফুল তুলে নিন।

রামশরণ দুবার শুযারকা বাচ্চা শুনেও কনৌজী ব্রাহ্মণের উদারতার সঙ্গে বলে, সাব বাগানমে আযা।

অবিনাশ সকলের কাছে অবিনাশবাবু, কিন্তু রামশরণের কাছে সে সাব।

অবিনাশের সঙ্গেও মুখচেনা ছিল সুনীলের।

মিলনী পরিচয করিযে দিতে অবিনাশ বলে, তুমি পুজোর চাঁদা চাইতে এসেছিলে না?

হ্যাঁ, পঞ্চাশ টাকা আদাযও করেছিলাম।

অবিনাশ হাসে।

চাঁদা চাইবার কাযদায তোমার অরিজিন্যালিটি ছিল। সবাই এসে বলে, আমার অনেক টাকা আছে কাজেই আমাকে বেশি চাদা দিতে হবে। তুমি কেবল ও কথা বলনি। কী করে বেশি চাঁদা তোলা যায পরামর্শ চেযেছিলে। তারপর কৌশলটাও জানিযেছিলে নিজেই। প্রথমেই আমার নামে যদি মোটা টাকা ধরা থাকে– অন্যেরা কম দিতে পারবে না, যে এক টাকা দিত সে দু টাকা দেবে। এ রকম কাযদা করে চেযেছিলে বলেই পঞ্চাশ টাকা দিযেছিলাম—নইলে কুড়ি টাকার বেশি দিতাম না।

অবিনাশ খুব রোগা। দেখে মনে হয মানুষটা বুঝি খেতে না পেযে পুষ্টির অভাবে শুকিযে শীর্ণ হযে গেছে। বযসে প্রৌঢ় মনে হয—বযস যে তার সত্তরের দিকে ঘেঁষেছে এটা অনুমান করা যায না।

মিলনী বলে, ইনি খুব ভালো বাশি বাজাতে পারেন।

অবিনাশ বলে, তা জানি।

তুমি কী করে জানলে?

ওর বাঁশি শুনেছি। গত পুজোর জলসাতে ও তখন বাঁশি বাজিযেছিল।

সুনীল আশ্চর্য হযে বলে, আপনার সে কথা মনে আছে? মিলনী বলে বাবার অদ্ভুত মেমারি। সামান্য একটা বিষয আমরা হযতো দুদিনে ভুলে যাই, পাঁচ বছর পরে বাবার মনে থাকে।

অবিনাশ বলে, তুমি ভুল বললে—সামান্য বিষয মনে থাকে না। মনে রাখার মতো কোনো একটা বৈশিষ্ট্য থাকলে তবেই মনে থাকে। তোমার বাঁশির সুরটা আমার ভালো লেগেছিল--কাদুনে সুর বাজাওনি।

তাদের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বলে অবিনাশ পূজার জন্য ফুল তুলে বিদায নেয।

পরের শনিবার সন্ধ্যায তাদের বাড়িতে কযেকজনকে বাশি শোনাবার নিমন্ত্রণ করে মিলনী বলে, আসবেন তো?

আসব।

তার এই বাড়তি বিনযটুকু ভালো লাগে সুনীলের।

২

সন্ধ্যার পর মনোজ আসে খবর নিতে।

সুনীল তখন বাড়ি ছিল না।

লতাকে মনোজ জিজ্ঞাসা করে, সুনীল আজ ভোরে বেড়াতে যাযনি?

গিয়েছিল তো ?

কী ব্যাপার হল ? আমায় ডাকল না কেন ?

ততক্ষণ চা পান চলুক, দাদা এলে সমস্যার মীমাংসা হবে।

আধঘণ্টার মধ্যেই সুনীল ফিরে আসে। তার কাছে ব্যাপার শুনে মনোজ বলে, মাথার চিকিৎসা কর। জ্যোস্না দেখে রাত তিনটের সময় বেড়াতে বেরিয়ে গেলে ?

বাণী শুনে বলে, কী সর্বনাশ ! রাত তিনটে থেকে বাইরের দরজা খোলা পড়েছিল ! সমস্ত যদি চুরি হয়ে যেত ! মনোজ বলে, সত্যি এবার ওর চিকিৎসা দরকার। জোর জবরদস্তি করে একটা বিয়ে না দিলে আর চলছে না।

সুনীল বলে, নিজের মাথার চিকিৎসা তো করলে দু দুবার—লাভ হয়েছে কী ?

লতা আপশোশের আওয়াজ করে বলে, কীভাবে যে তুমি কথা কও দাদা !

মনোজের দুনম্বর বউ মারা গিয়েছে মাত্র কয়েক মাস আগে—কাজেই বউয়ের কথা তুলে মনোজকে খোঁচা দিতে শুনে লতার প্রাণে আঘাত লাগে।

মনোজ নির্বিকারভাবেই বলে, মাথা ঠিক থাকলে তো ঠিকভাবে কথা কইতে পারবে !

মনোজের এই ভাবটা লতা বা বাণীর পছন্দ হয় না। দুবার বউ মরল মনোজের কিন্তু একবারও তাকে শোকে বেশি রকম বিচলিত হতে দেখা গেল না, বৈরাগ্যের চিহ্নও পাওয়া গেল না তার কথায় বা চালচলনে।

বউয়ের মরণ সহজে সামলে নেওয়াটা মেয়েদের পছন্দ করা সম্ভব নয়।

লতা ও বাণীর সামনে কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলেও খানিক পরে বাইরের ঘরে বসে দুই বন্ধুতে যখন একান্তে আলোচনা হয় তখন বেশ চিন্তিতভাবেই প্রসঙ্গটা সুনীল আবার টেনে আনে। বলে, তামাশা নয় আমার সত্যি কিছু হয়েছে।

মনোজ শান্তভাবেই বলে, আশ্চর্য নয়। কিছু না হলে এ রকম ধারণা আসে না, এভাবে কেউ বলে না—আমার কিছু হয়েছে। ব্যাপার কী ?

খুঁটিনাটি অভ্যাসের দাস হয়ে পড়ছি। কেমন যন্ত্রের মতো হয়ে উঠছে জীবনটা। একটু এদিক-ওদিক হলে মনটা খুঁতখুঁত করে--বিধবাদের যেমন ছুঁচিবাই হয়, সেই রকম। এই গেল এক দিক। অন্য দিকে, মাঝে মাঝে একটু অদ্ভুত কষ্ট হয়। সব ফাঁকা লাগে। মনটা উদাস হয়ে যায়—

সুনীল নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথাটা স্পষ্ট ও বোধগম্য করে তুলবার চেষ্টা করে বন্ধুর কাছে, কিন্তু নিজেই টের পায় যে বক্তব্য তার ধাঁধাই থেকে যাচ্ছে।

মনোজ শেষে বলে, অনেক কথাই তো বলবি, সোজা কথার স্পষ্ট জবাব দে দেখি। মনটা উড়ুউড়ু করে না বিষণ্ণ লাগে ?

সুনীল বলে, কী রকম যে লাগে—

বলতে পারছিস না। কথা দিয়ে বোঝানো যায় না, কেমন ?

ঠিক এ রকম ভাব তো হয় না। বৈরাগ্য হয়েছে বলতে পারতাম কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক সে রকম নয়। ভয়ানক ফাঁকা ফাকা লাগছে, খুব কষ্ট হচ্ছে, অথচ এদিকে বেঁচে থাকতে যে ভালো লাগছে না তাও নয়। পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে, সেই সঙ্গে খিদে না থাকলে মানে বোঝা যায়। বেশ চনচনে খিদে, খেয়ে দিব্যি আরাম লাগছে অথচ পেটে যেন কী রকম একটা কষ্ট।

মনোজ হেসে বলে, তোর উপমা আমার মাথায় ঢুকল না ভাই। খিদে পেলে জোর করে না খেয়ে থাকলেও কিন্তু পেটের মধ্যে কষ্ট হয়।

তার মানে মনের খিদে চেপে রাখছি ?

অসম্ভব কী ?

সুনীল মাথা নেড়ে বলে, না।

কোনো মেয়েকে— ?

সুনীল মাথা নাড়ে।

মনোজ বলে, আমিও তাই ভাবছিলাম। তুই প্রেমে পড়লি অথচ আমি জানলাম না—এ খাপছাড়া ব্যাপার কী করে হয় ! একটা বিয়ে করে দ্যাখ না কী হয় ? হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে।

সুনীল মাথা নাড়ে।

সুনীলের বিয়ে না করার কারণ মনোজের জানা।

একশো তিরিশ টাকা বেতন স্থায়ী চাকরি।

কিন্তু বিয়ের কথা বললেই সুনীল কানে আঙুল দেয়।

বলে, তোমরা খেপেছ ? অন্তত দুশো টাকার কমে আজকাল দুটো মানুষের চলে !

লতা বলে, পাড়ার ক'টা লোকে দুশো টাকা মাইনে পায় ? তোমার মতো মাইনেওলা গন্ডাগন্ডা লোক যে বিয়ে করেছে, তাদের চলছে কী করে ?

চলছে ? কে বলল চলছে ? ওকে চলা বলে ? তাহলে তো গাছতলায় থাকাকেও চলছে বলতে হয় !

মুখে জোরের সঙ্গে এ কথা বললেও মনে মনে সুনীল কিন্তু সুনিশ্চিত নয় যে এটাই তার বিয়ে না করার আসল কারণ—বিয়ে করার পক্ষে তার বেতন যথেষ্ট নয়।

বিয়ে করার ইচ্ছা থাকলে নয় বলা যেত যে বেতন কম বলে সে বিয়ে করছে না, হিসাব কষে অগত্যা মনের সাধটা চেপে রাখছে। বিয়ে করে সংসারী হবার ইচ্ছা দূরে থাক, কথাটা ভাবলেও তার গভীর বিতৃষ্ণা জাগে !

বিয়ের নামেই যখন এত বিতৃষ্ণা জাগে -কী করে বলা যায় যে আসল কারণ এই বিতৃষ্ণা নয় ? সাধ জাগলে এই মাইনেতেই সে যে চোখ কান বুজে বিয়ে করে বসত না, ভবিষ্যতে করে বসবে না, তার স্থিরতা কী !

বিয়ে সম্পর্কে সুনীলের বিরাগের খবর মনোজ জানে। কেন এই বিরাগ এটাই কেবল সে বুঝতে পারে না।

এই দিক দিয়ে আজ সে কথা তোলে। বলে, একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারি না ভাই। বিয়ে করে সংসারী হবার অনিচ্ছা মানুষের থাকে কিন্তু এ সব মানুষ সংসারের বদলে অন্য কোনোদিকে ঝোঁকে। একটা কোনো বিশেষ কাজ নিয়ে মেতে থাকে ধর্মটর্ম হোক, দেশের কাজ হোক কিংবা জ্ঞানচর্চা হোক, একটা কিছু থাকে। নয়তো কোনো ব্যায়াম ট্যায়াম থাকে, পাগলামি থাকে। মানে আর কী, বিয়ে করে সংসারী হওয়াটাই সংসারের সাধারণ নিয়ম, বেশির ভাগ মানুষ এটা করে। যে করে না সে একটু অসাধারণ হয়, একটু খাপছাড়া হয়। কিন্তু তোর বেলা তো এ সব কোনো কারণ খুঁজে মেলে না। তোর কোনোদিকে ঝোঁক নেই, কিছুই তুই করসি না। ধর্মকর্মে তোর মন নেই, টাকা চাস না, বিদ্যা চাস না, দেশের কোনো কাজ করিস না—কোনো নেশাও তোর নেই। তোর কেন বিয়ে করতে অনিচ্ছা হবে ?

সুনীলকে খুশি হতে দেখে মনোজ একটু ভড়কে যায় প্রথমে। সুনীলের কথা শুনে সে তার খুশি হবার কারণটা টের পায়।

সুনীল বলে, ঠিক, ঠিক। আমিও ঠিক এই কথাটা ভাবছিলাম। জানিস, এই খটকাটাই আমার মনে বড়ো হয়ে উঠেছে আজকাল। আমি খাপছাড়া মানুষ যদি হই—অন্য সব খাপছাড়া মানুষের মতো নই কেন ? সব দিক দিয়ে সাধারণ—অথচ এ রকম অসাধারণ মতিগতি কেন ? ভাবতে ভাবতে মাথাগরম হয়ে যায় ভাই !

মনোজ ইতস্তত করে বলে, আমার কী মনে হয় জানিস ? তুই বড়ো বেশি ভাবিস। বউ নেই কাজ নেই, নেশা নেই—ভাবনা রোগ ধরেছে তোকে। এমনি নেশা নেই ভাবনাটাকে তুই নেশায় দাঁড় করিয়েছিস।

সুনীল চুপ করে থাকে। হঠাৎ কথাটাকে উড়িয়ে দিতে পারছে না বুঝতে পারে। একটু ভেবে দেখা দরকার।

মনোজ বলে, ঠিক যে দুশ্চিন্তা তা নয় -শুধু চিন্তা। সংসার থাকলে সংসারের চিন্তায় মানুষ যেমন ডুবে থাকে, নিজের আবোল তাবোল চিন্তা নিয়ে তুই তেমনি মেতে আছিস।

তাই মনে হয় আমার।

জ্ঞানীরা না ঘুমিয়ে চিন্তা করছে– তাদের চিন্তার একটা ধারা আছে, নিয়ম আছে, উদ্দেশ্য আছে। তোর ও সব বালাই নেই। নিজের মনে শুধু নিজের কথা চিন্তা করিস।

পাগল হয়ে যাব না তো ?

না, না। চিন্তা করে কেউ পাগল হয় ? বড়ো বড়ো লোকেরা সবাই তাহলে পাগল হয়ে যেতেন। একটা কাজ কর না ?

কী কাজ ?

বলে, পড়াশোনা কর।

পড়াশোনা ?

ডিগ্রি আছে জানি। আরও ডিগ্রির পড়াশোনা নয়। কোনো একটা বিষয়ে ভালো করে জানবার জন্য পড়াশোনা। এলোমেলো ভাবছিলি, একটা বিষয়ে নিয়মমাফিক ভাববি। আমার মনে হয়, তোর মগজটা একটু বেশি রকম চোস্ত। ঠিকমতো চালাবার কেউ ছিল না, থাকলে পরীক্ষায় ফার্স্ট সেকেন্ড হয়ে পাস করাতো, বড়ো একটা বিদ্বান হয়ে দাড়াতিস।

বই পড়ে কিছু হয় ?

হয় না ? বই ছাড়া মানুষ সভ্য হতে পারত ? আগে বই না এলে রেলগাড়ি মোটরগাড়ি জাহাজ এরোপ্লেন অ্যাটম বোমা হতে পারত ?

আসল কথাটা বুঝতে পেরেছি। আসলে জ্ঞানচর্চা নিয়ে মাততে বলছিস তো ? জ্ঞানচর্চা আরম্ভ করাতে পারি জোরসে কিন্তু মাততে পারব কি ? কোনো বিষয়ে রস না পেলে গায়ের জোরে মাতা যায় ?

মনোজ বলে, কী জানিস, নেশাও অনেক সময় মানুষের তৈরি হয়ে যায়। প্রথমে হয়তো নীরস লাগে, তারপর ঘাটতে ঘাঁটতে মশগুল হওয়া যায়। কোনো একটা বিষয় ধরে একবার লেগেই দ্যাখ না। পড়তে আরম্ভ করে হয়তো আরও বেশি জানবার রোখ চেপে যাবে, সব ভুলে পড়াশোনা আর গবেষণা নিয়ে মেতে থাকবি।

দেখি ভেবে।

৩

ভেবে দেখতেই দিন কেটে যায়।

কিছু আর করা হয় না।

যা ভালো লাগে না মানুষ তা কী করে গায়ের জোরে অবলম্বন করবে ?

আপিসে যেতে ভালো লাগে না তবু আপিসে যায় বটে নিময়মতো, কিন্তু সে হল আলাদা কথা। একটা কিছু ভালো লাগে না বলে তো আর উপোস করে মরা যাবে না।

বাজে ডাল-তরকারি দিয়ে কাঁকরওলা ভাত গিলতেও ভালো লাগে না কিন্তু তাই বলে একবেলা ভাত না খেয়েও তো রেহাই নেই। রুটি চিবোতে চিবোতে মনে হয় ভেতো বাঙালি হয়ে না জন্মালেই বোধ হয় ভালো ছিল কিন্তু রুটিও সমানে চিবিয়ে যেতে হয় একবেলা।

বই পড়তে গেলে মনটা কেবল ব্যাকুল হয়। গল্প-উপন্যাস পড়তে বসলে তার মনে অসংখ্য প্রশ্ন জাগে, তার মধ্যে প্রধান প্রশ্নটা এই যে মানুষের জীবনে এত সংঘাত কেন—কী এর প্রয়োজন ছিল। কেন মানুষ নিজেদের জীবনকে এভাবে জটিল করে, অশান্তিতে ভরে দেয়।

জ্ঞানের বই পড়তে বসলে তার মনে হয় মানুষের কত জানবার আছে, কতটুকু জ্ঞান মানুষ সঞ্চয় করেছে—কিন্তু সে এই জ্ঞান দিয়ে করবে কী ? জানার তো শেষ নেই—খানিকটা জেনে তার কী আর লাভ হবে ?

যা কোনো কাজে লাগে না সে জ্ঞান তাসপাশার নিয়ম জানার চেয়ে মূল্যহীন। তাসপাশার নিয়মের জ্ঞানটা তবু খেলার কাজে লাগে !

রেণু বলে, আপনার এ সব খাপছাড়া কথা শুনলে হাসি পায়। জ্ঞানকে অমূল্য বলা হয়, আপনি কথাটার উলটো মানে করেছেন। জ্ঞান না হলে মানুষ কখনও মানুষ হতে পারত ? মানুষ যে ক্রমেই সভ্যতার পথে এগিয়ে যাচ্ছে, আবিষ্কারের পর আবিষ্কার করে চলেছে, সে তো মানুষ জ্ঞানের চর্চা করে বলেই !

সুনীল হেসে বলে, তা বলিনি—জ্ঞানকে তুচ্ছ করিনি। আমি বলছি আমার কথা। আমার যা কোনো কাজে লাগবে না আমি তা শিখে কী করব ? নিজের মনে আউড়ে যাওয়া ছাড়া সে জ্ঞানের কোনো মূল্যই থাকবে না।

লেখাপড়া শিখলেন কেন তবে ?

চাকরি করার জন্য !

আপনি তাহলে বলতে চান যারা চাকরি করবে না তাদের লেখাপড়া শেখার দরকার নেই ? চাষি মজুর এরা মূর্খ হয়েই থাকবে ? দেশে শিক্ষা বাড়াবার দরকার নেই ?

সুনীল একটা সিগারেট ধরায়।

আপনি সোজা কথাটা এমনভাবে বাড়িয়ে ঘুরিয়ে আমায় চেপে ধরেন তর্কের সময় ! অন্যের কথা আমি বলিনি—আমি শুধু বলছি আমার কথা।

আপনি কি পৃথিবী-ছাড়া মানুষ ?

তা কেন হবে ? আমার মতো অনেকে আছে। আমার যা জীবন তাতে জ্ঞান আরও বাড়ালে কোনো কাজেই লাগবে না ! চাষিমজুর অশিক্ষিত লোকের শিক্ষা নিশ্চয় দরকার—নিজেদের অবস্থা বোঝার জন্য দাবিদাওয়া বোঝার জন্যে, অবস্থা ভালো করার উপায় জানার জন্যে। সে জন্য তাদের যতটা আর যে রকম শিক্ষা দরকার তাই হবে তাদের পক্ষে যথেষ্ট। ফাঁকা জ্ঞানচর্চার জন্য তারা কেন সময় আর এনার্জি নষ্ট করবে ?

ওদের মানসিক জীবন, সাংস্কৃতিক জীবন বুঝি দরকার নেই ?

নাঃ, আপনি কিছুতেই আমার কথাটা বুঝবেন না ! আমিও তো তাই বলছি ! স্কুলে বাংলা পড়ান, দরকার শব্দটার মানে বোঝেন না ! যার যতটা জ্ঞান দরকার তার সেটা অর্জন করা দরকার বইকী, দরকারটা মানসিক জীবন, সাংস্কৃতিক জীবন আর্থিক জীবন সব কিছু ধরেই।

এবার রেণু হেসে ফেলে।

বলে, আপনি সুন্দর বাঁশি বাজান কিন্তু কথা বলেন বিশ্রী ! মনের ভাব একেবারে ভালো করে প্রকাশ করতে পারেন না ! বললেই হত ফাঁকা অকেজো বুদ্ধিচর্চার কোনো দাম নেই !

সুনীল আহত হয়ে বলে, তাই বললাম না আমি ?

কখন বললেন ? আপনি বললেন জ্ঞানের কথা ! জ্ঞান মানেই মানুষের যা জানা উচিত, প্রত্যক্ষভাবে কাজে না লাগলেও যা কাজে লাগে ! আমার জীবনের সব চেয়ে বড়ো আপশোশ কী জানেন ? পড়াশোনার অবসর পেলাম না। শুধু পড়িয়েই জীবন কাটল—যন্ত্রের মতো বাঁধা বুলি বাঁধা গত পড়িয়ে। মেয়েদের কচিমুখের দিকে চেয়ে জীবনে ঘেন্না ধরে যায় !

রেণু বেশ আয়েস করে বসেছে চেয়ারে।

রেণু ছিল বাপের বড়োই আদুরে ছোটো মেয়ে। তিনটি মেয়েকে যেভাবে হোক পার করে দেবার পর এই মেয়েটিকে কলেজে পড়াতে পেরে সে যেন ক্লিষ্ট ক্লান্ত শান্তিহীন জীবনে প্রথম কর্তব্য পালন করার আনন্দের স্বাদ পেয়েছিল। নিজেও অমানুষ, ছেলেমেয়েগুলিকেও অমানুষ তৈরি করেছে—জীবন তো ছিল অভিশাপ। তবু একটা মেয়েকে মানুষ করার ব্যবস্থা করতে পেরেছে ভেবেই তার কী আনন্দ !

ছেলেরা চাকরি পায় বিয়ে করে আর ভিন্ন হয়ে যায় !

মেয়েদের দান করতে হয় অর্থাৎ বিদেয় করতে হয় ঘুষ দিয়ে। ছেলেরা নিজেরাই বিদেয় হয়ে যায় বাপকে মাইনের টাকা দিতে হবে বলে।

বেচারিদের দোষ নেই।

জীবন গেছে পালটে আর হয়েছে বিষম কঠিন, আজকের দিনে যা অবস্থা তাতে একসাথে থাকার মানেই আপনজনের সাথে নিষ্ঠুর সংঘাতের অশান্তি মেনে নেওয়া।

টুইশনি করে আর স্কুলে পড়িয়ে নিজেই করে নিয়েছিল বাড়তি রোজগারের ব্যবস্থা।

জোর করে বলেছিল, এবার তো নিশ্চিন্ত হলে ?

রেণুর মা বেঁচে থাকলে অবশ্য ভাবনার কারণ ঘটত। মেয়ে বিয়ে করবে না, নিজে রোজগার করে খাবে, এ ব্যবস্থা মানাতে তার সঙ্গে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হত সন্দেহ নেই।

নীলাম্বরের মনটাও খুঁতখুঁত করছিল—কিন্তু মেয়েই ছিল তার জীবনে একমাত্র অবলম্বন। মেয়েকে ছেড়ে সে থাকতে পারত না। বিয়ে হলে মেয়ে পরের বাড়ি চলে যাবে—তার চেয়ে রোজগার যখন করছে দু-একবছর পরেই না হয় বিয়ে হবে !

নীলাম্বর মারা যাবার পর বিধবা দিদি তার তিনটি ছেলেমেয়ে আর ছোটো ভাইটিকে মানুষ করার দায়িত্ব চেপেছে তারই ঘাড়ে। বড়োভাই দুজন সামান্য সাহায্য করে।

রেণু ভার না নিলে যে সুরবালা আর প্রদীপের সব দায়িত্বই তাদের নিতে হত বাধ্য হয়ে এটা খেয়াল থাকলেও হাত তাদের কিছুতেই যেন আরেকটু দরাজ হতে চায় না !

রেণুরও খাটুনি কমাবার সুযোগ হয় না।

খাটুনি বইকী !

সকালে পড়াতে হয় মিলনীকে, দুপুরে যেতে হয় স্কুলে পড়াতে। সন্ধ্যার পর পড়াতে যেতে হয় পাড়ার আরেকটি মেয়েকে।

নিজেও একটু পড়াশোনা করে।

সমিতির কাজও দু-একটা তার উপরে চাপে।

রাত্রে নিজের পড়াশোনা করতে গিয়ে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে।

তখন সুনীলের বাঁশির সুর কানে এলে তার দেহমনে কেমন যেন একটা অদ্ভুত প্রক্রিয়া ঘটে। প্রথমে যেন ঝিমিয়ে অবশ হয়ে আসে শরীরটা কয়েক মুহূর্তের জন্য, একটা অকথ্য পীড়াদায়ক হতাশার ভাব জাগে—সব যেন শেষ হয়ে গেছে জীবনে, অর্থহীন শূন্যতা ছাড়া ভবিষ্যৎ বলে কিছুই নেই।

অল্পক্ষণের জন্য একটা ঘোরের মতো এ ভাবটা জাগে।

তারপর ঘুমের ঘোরের মতোই এটা কেটে গিয়ে সে তাড়াতাড়ি চাঙা হয়ে ওঠে।

একেবারে যেমন ঝিমিয়ে গিয়েছিল ঠিক তার উলটোটা ঘটে এখন। সারাদিনের পরিশ্রমের শ্রান্তিক্লান্তি আর ঘুমের আবেশ সব যেন উপেই যায় না শুধু—নতুন প্রাণের জোয়ার এসে যেন তাকে বেশি রকম প্রাণবন্ত করে তোলে।

জীবনটা মনে হয় সুন্দর। আনন্দ উৎসাহ যেন ধরবে না প্রাণে !

বাঁচার জন্য লড়াই করছে, নিজের জীবন আর অন্যের জীবন আরেকটু সুন্দর করার জন্য লড়াই করছে—মানুষ হয়ে জন্মানোর চেয়ে বড়ো সার্থকতা কি খুঁজবে জীবনে ?

অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসে না কিন্তু কোনো কষ্টই হয় না সে জন্য। পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে দেহমনেও কিছুমাত্র গ্লানি বা অস্বস্তি বোধ করে না।

জগতে সব ঠিক নেই। জীবনে অনেক অভাব, অনেক অপূর্ণতা, অনেক দুঃখ।

কিন্তু সব ঠিক করার লড়াই তো আছে ! একদিন সব ঠিক করে নেওয়া যাবে—একা তার জন্য নয়, সব মানুষের জন্য—এ বিশ্বাস তো আছে !

এ বিশ্বাস যেন একটু নরম হয়ে গিয়েছিল, জোরালো হয়ে ঠিক যেন সঞ্জীবনী সুধার মতোই দেহমনকে তার আবার চাঙা করে তুলেছে !

পরদিন সুনীলকে সে বলে, কাল রাত্রে চমৎকার বাজিয়েছিলেন। আপনার বাঁশি শুনে বেশ তাজা লাগে নিজেকে !

সে কী! শান্তি ঠিক উলটো কথা বলে। বাঁশি শুনতে ভালোই লাগে কিন্তু ওর নাকি মনটা কেমন কেমন করে, কান্না পায় !

আমার কিন্তু আনন্দ হয় !

সুনীল বলে, এ তো ভারী সমস্যার কথা হল !

কেন ?

একই লোকের বাঁশি শুনে একজনের আনন্দ হয়, একজনের কান্না পায় !

এতে সমস্যার কী আছে ? যে যেমন ভাবের ভাবুক তার তেমনি প্রতিক্রিয়া হয় ! মন কেমন করার ন্যাকামি আমার আসে না।

আপনার ভারী শক্ত মন।

আপনার চেয়ে ?

আমার মন নরম। নিজের বাঁশির সুরে নিজেই ব্যাকুল হই।

রেণু বলে, ওটা নরম মনের লক্ষণ নয়—সুর সৃষ্টির আবেগ। প্রাণ দিয়ে না বাজালে কি কেউ ভালো বাঁশি বাজাতে পারে ? বাঁশি কেন, গান গাইতে সেতার এস্রাজ বাজাতে ও রকম ভাব আসা চাই। নইলে জমে না।

দেখা হয়েছিল প্রতিদিনের মতোই। সুনীল বেড়িয়ে ফিরছিল, রেণু যাচ্ছিল মিলনীকে পড়াতে।

রেণু সুরসৃষ্টির আবেগ উন্মাদনার কথা ব্যাখ্যা করে চলে যায়, সুনীল কিন্তু এত সহজে চুকিয়ে দিতে পারে না কথাটা।

রেণু অনেকবার তার বাঁশির প্রশংসা করেছে, কিন্তু এভাবে কখনও করেনি ! তার বাঁশি শুনতে ভালো লাগা এক জিনিস, আর বাঁশি শুনে তাজা বোধ করা আরেক জিনিস !

রঞ্জন দাঁড়িয়েছিল তাদের বাড়ির সামনের দাওয়ায়, মুখখান তার সকালবেলাই করুণ দেখাচ্ছে। রঞ্জন কলেজে পড়ে—ছেলে ভালোই, তবে একটু লাজুক আর ভাবুক।

কাল আমাব বাঁশি শুনেছিলে বঞ্জন ? না ঘুমিয়ে পড়েছিলে ?

শুনেছি,

কেমন লাগল ?

সুন্দব বাজান আপনি। সবাই প্রশংসা কবে।

উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসা কবে ফেলে নিজেব উচ্ছ্বাসেব জন্য বঞ্জন একটু লজ্জা বোধ কবে।

সুনীল প্রশ্ন কবে, ভালো লাগে বুঝলাম। কী বকম ভালো লাগে ?

প্রশ্নটা বুঝতে না পেবে বঞ্জন তাকিয়ে থাকে।

আমি বলছি কী, কাল যখন বাঁশি শুনছিলে, তোমাব কী বকম লাগছিল ? বেশ মজা লাগছিল, নিজেকে তাজা বোধ কবছিলে, না উদাস লাগছিল ?

উদাস লাগছিল।

মনটা কেমন কবছিল ?

হ্যাঁ।

পাশেই শান্তিদেব বাড়ি।

শান্তি সবে ঘুম থেকে উঠে কলতলায় মুখ ধুতে যাচ্ছিল। আলগা আঁচলটা ঠিক কবে শান্তি বলে, সুনীলদা এই সকালবেলা হঠাৎ যে ?

এমনি এলাম। বাঁশি শুনেছিলে ?

কানেব পাশে বাজান, না শুনে উপায় কী ?

ঘুমোলেই হয়।

আপনাব বাঁশি শুনতে শুনতে ?

তুমি বাড়িয়ে বলছ।

শান্তি একটু হাসে

কেন বিনয় কবছেন ? নিজে তো জানেন ভালো বাজাতে পাবেন আব নেহাত বাজে বেবসিক মানুষ ছাড়া আশেপাশেব সবাই আপনাব বাঁশি শোনে।

শান্তিব মুখেব ভাব পবিবর্তনেব দিকে ভালো কবে নজব বেখে সুনীল জিজ্ঞাসা কবে, ঠিক কবে বলবে, বাশি শুনে কালও তোমাব কান্না আসছিল ?

শান্তি চোখ বুজে একটু ভেবে নিয়ে বলে, ঠিক কান্না কী আসে ? বাশি শুনলে সবাব যেমন হয়, প্রাণটা আকুলি-বিকুলি কবে, মনেব মধ্যে যেন -

মজা লাগে না ?

মজা মানে ? ভালো লাগে। আনন্দই হয়, তবে সে যেন কেমন এক বকমেব আনন্দ। কবুণ সুব শুনলে আপনাব হয় না এ বকম ? ভালো লাগছে তবু যেন কষ্ট হচ্ছে ?

বোজ এ বকম হয় ?

বাঁশি শুনলে যেমন হবাব তা বোজ হবে না ? আজ এক বকম কাল আবেক বকম হবে ?

শান্তি একটু থেমে বলে, আজ এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস কবছেন ?

সুনীল একটু হেসে বলে, জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল খাবাপ লাগে নাকি।

পবে খাবাপ লাগে। বাঁশি থামাব পব।

শোনাব সময় লাগে না তো ?

না। তখন বেশ লাগে।

রান্নাঘরে সকালবেলার জলখাবারের পাট চলছিল। বাড়ির সকলে সেখানে ছিল। এ বাড়ি থেকে তিনজন ন-টায় আপিসে পাড়ি দেয়, সকালবেলার সামান্য খাওয়াটা একটু তাড়াতাড়ি চুকিয়ে নেওয়া হয়।

তার বাঁশি শোনার ফলে খারাপ লাগায় এবং ঘুম না আসায় শান্তিই বোধ হয় এত দেরিতে উঠেছে।

শান্তির দাদা ভবানী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলে, এই যে সুনীল। চা খাবে নাকি ?

চা তো পেলেই খাই।

ভবানীর স্ত্রী মিনতি চা দিতে এসে বলে, কাল অনেক রাত পর্যন্ত বাজিয়েছিলেন।

তার মানে অনেক রাত পর্যন্ত জ্বালিয়েছিলাম তো ?

না, না। আপনি সুন্দর বাজান। রেডিয়োতে রাত বাড়লেই কী সব মার্কিনি সুর দেয়, কান ঝালাপালা হয়ে যায়। তারপর আপনার বাঁশি খুব ভালো লাগে।

রেডিয়োর কল্যাণেই একটু বেশি রাতে বাজাতে শুরু করতে হয়।

ভবানী বলে, আমি আগে ভাবতাম ফাজিল-ফক্কর ছোড়ারাই শুধু বাঁশি বাজায়। এখন দেখছি বাঁশিটা বাজনা হিসাবেও বাজে নয়, ফাজিল ছোঁড়া না হলেও বাঁশি বাজানো যায়।

সুনীল হেসে বলে, আমাদের কেষ্টঠাকুরের জন্য বাঁশি আর বাজিয়ে সম্পর্কে এ রকম ধারণা। তার বাঁশি শুধু রাধা রাধা বলত, লোকে ভাবে বাঁশিটা বুঝি বিশেষ করে মেয়েদের মন ভুলাতে চেয়ে ফাজিল ছোঁড়ারাই বাজায়।

ভবানী প্রশ্ন করে, আচ্ছা শুধু রাত্রে বাজাও কেন ?

সুনীল বলে, বাঁশিটা দূর থেকে শোনার বাজনা। চারিদিক একটু স্তব্ধ হলে বাজাতে হয়।

ভবানী বলে, এও কিন্তু বাঁশি নিয়ে মানুষের খুঁতখুঁতানির একটা কারণ। দূর থেকে সুর ভেসে আসছে, যে বাজাচ্ছে তাকে দেখা যাচ্ছে না, চারিদিকে নিঝুম হয়ে আছে—

ভবানী একটু হাসে, যাই বলো, বাঁশিটা কাব্যিক বাজনা।

৪

সুনীল খুব চাপা।

কতখানি চাপা সে নিজেও জানে না, অন্যেরাও টের পায় না।

তার মনে নানা ভাবের যে সব কথা জাগে, আবেগ অনুভূতির জোয়ালো যে সব তরঙ্গ ওঠে, এমন সহজ আর স্বাভাবিকভাবে বাইরে বিশেষ কোনো প্রতিফলন না ফেলে তার বেশিরভাগ তার ভিতরেই লীন হয়ে যায় যে খুব ঘনিষ্ঠ মানুষও তার ভিতরের খাঁটি পরিচয় খুব কমই টের পায়।

তার ভাবুকতা আর আবেগ ব্যাকুলতা একেবারেই গোপন থাকে। হৃদয়ের দিক দিয়ে তাকে বরং বেশ খানিকটা আবেগবিহীন শক্ত মানুষ বলেই মনে হয় লোকের।

সাধারণভাবে তার ব্যবহার আন্তরিক, আত্মীয়বন্ধুর জন্য টান আছে টের পাওয়া যায়। কিন্তু হৃদয় যে কখনও তার গভীরভাবে আলোড়িত হয়, বাঁশি বাজাবার সময় এবং তারপরে যে কী অবর্ণনীয় ভাবাবেশে গভীরভাবে ডুবে যায়, চাঁদ বা তারা ভরা আকাশ যে জীবনের রহস্য, জগতের সীমাহীনতা ইত্যাদি প্রশ্ন জাগিয়ে কীভাবে তার চেতনাকে নাড়া দেয়, কারও পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব হয় না।

বেণুব পক্ষে পর্যন্ত নয়।

সুনীল নিজেব মুখে যখন তাকে বলে যে তাব মনটা নবম, বাঁশি বাজাবাব সময় সে বড়োই ব্যাকুলতা অনুভব কবে বেণু তাই অনাযাসে সে কথা অবিশ্বাস কবে উডিযে দিতে পাবে।

সুনীলেব মতো মানুষেব হৃদযে আবাব ওই ধবনেব ভাবেব তবঙ্গ !

শুকনো হৃদযে তবঙ্গ ওঠে কখনও ? তবঙ্গ যা কিছু উঠবাব তাব বাঁশিতে ওঠে।

অন্যপক্ষে, বেণুকেও সুনীলেব বড়োই শক্ত আব নির্বিকাব মনে হয। সে সহজে বিচলিত হয না বলে নয, অনেক বকম দাযিত্ব কঠোব নিষ্ঠাব সঙ্গে পালন কবে বলে নয, কথায ব্যবহাবে কখনও ব্যাকুলতা বিহ্বলতাব লেশটুকু প্রকাশ পাযনি বলে।

তাব মধ্যে মৃদুতা কমনীযতাব অভাব নেই, নীবস বুক্ষ বদমেজাজি সে মোটেই নয, কিন্তু তাব কোমলতা যেন কেমন এক ধবনেব !

নিজেব বোনেদেব বা শান্তিব যে কমনীযতা সে চিনতে পাবে বুঝতে পাবে—বেণুব কাছে সেটা ভাবুতা, ন্যাকামি আব ঢং !

পবস্পবেব জন্য তাবা একটা আকর্ষণ অনুভব কবে। মাঝে মাঝে আজকাল আকর্ষণটা এমন তীব্রভাবেই অনুভব কবে যে দুজনেই তাবা কিছুক্ষণেব জন্য বীতিমতো ভাবনায পড়ে যায। ব্যাপাবটা কী দাড়াল ?

তাবপব তাবা ভাবে, ধেত, ও সব বাজে কথা !

ঘনিষ্ঠতা তাদেব সাধাবণ বন্ধুত্বেব স্তবেই বযে গেছে। কাবণ, প্রত্যাশা কবাব ভবসা কবাব খুঁটিনাটি সূত্র আব সংকেতগুলিব আদানপ্রদান না হওযায সে সম্পর্কটা তাদেব মধ্যে গড়েই উঠতে পাবেনি ক্রমে ক্রমে বাস্তব জীবনে কাছে এনে দেয নাবীপুবুষকে।

কাছে এনে দিতে দিতে একদিন অনাযাসে দুজনেব দেহমন এক হযে যাবাব সম্পর্ক সৃষ্টি হযে যায।

সুনীল যেন অভিমান কবেই তাব চাবিদিকে ছড়ানো গবিব দুঃখী, পঙ্গু বিক্ত মানুষগুলিব দিকে তাকায না, ওদেব অস্তিত্বকে উপেক্ষা কবে চলে।

তোমবা আছ ? থাকো।

আমি আছি, আমিও থাকি।

জীবনটা কী, সুখদুঃখ কী তাই বুঝলাম না, তোমবা দুঃখী না আমি দুঃখী কী কবে জানব !

কষ্ট ?

খিদেব কষ্ট ? বোগেব কষ্ট ? শীতেব কষ্ট ? মা বাপ বউ ছেলেমেযে ভাইবোনেব কষ্ট দেখে মাথাব কষ্ট ?

· কে জানে বাবা ওটা কষ্ট কি না—হযতো বা ওটাই বাঁচাব মজা !

সমযেব শেষ নেই, আকাশেব সীমা নেই, জীবনেব মানে নেই, ফাঁকিতে গড়া তোমাব আমাব ভগবান, আনন্দ বেদনাব কোনটা খাঁটি কোনটা ভেজাল অথবা দুটোই বাজে জানা নেই।

তোমবা মেকি বা আমি মেকি কে বলবে ?

তোমাদেব কাতবানিটাই হযতো জীবনেব আসল উপভোগ চবম উপভোগ ! উপোস কবে বা অসুখে ভুগে ছটফটিযে মবে যাওযাটাই হযতো জীবনেব চবম আব সার্থক উপভোগ—সময যে অসীম আব তাব আযু যে দু-দণ্ডেব তাবই চবম প্রমাণ !

বোগে না ভুগলেও, খেতে না পেলেও তোমাকে আমাকে মবতে হবেই !

সারাদিন পথে-ঘাটে ট্রামে-বাসে আপিসে অসংখ্য মানুষের বাঁচার জন্য মর্মান্তিক প্রচেষ্টা দেখে এসে, একটা একটু সুস্থ মুখ দেখে নিরানব্বইটা ক্লিষ্ট ক্লান্ত কেরানি, চাষি আর কুলিমজুর ফেরিওলা, দোকানি আর ভিখারি, রঙিন কাপড়ে মোড়া ক্ষুধাতুরা শিকারিনি একাকিনী বেশ্যা, ভদ্র মেয়ে, এক পায়ে কুষ্ঠের ক্ষত ব্যান্ডেজ করা যুবতি ভিখারিনি—সারাদিন জীবনের এই বিচিত্র কুৎসিত রূপ দেখে এসে, সন্ধ্যার পর চারিদিকে মার্কিনি ঢংয়ের গানবাজনায় মুখরিত অনেকগুলি রেডিয়োর বেলেল্লাপনার পরিচয় পেতে পেতে সুনীল যখন বাঁশিটি হাতে নিয়ে ছাদে গিয়ে বসে, তখন এই সব চিন্তা তার মনে আসে।

বাঁশি নিয়ে ছাদে যায় কিন্তু সব সপ্তাহে একদিনও বাঁশি বাজায় কি না সন্দেহ।

ছুটির দিন বাইরে বেরিয়ে মানুষের কুৎসিত জীবন না দেখলেও চলে।

ছুটির দিন সে বাঁশি বাজায়।

কাজের দিনে পথে-ঘাটে চারিদিকে যে অসংখ্য দুঃখী মানুষ দেখেছিল, তারা কি শুনবে তার বাঁশি ?

তারই মতো যারা দুঃখী মানুষের ভিড় চষে আপিসে যায় দুটো পয়সার জন্য, মানুষকে অবশ্য দুঃখী করেছে বড়ো কর্তারা, তাদের কোনো দোষ নেই, তবু নিজেদের দায়িত্ব স্মরণ করে যারা ম্রিয়মান হয়ে থাকে—তারাই শুধু শুনবে তার বাঁশি।

রেণু শুনবে, শান্তি শুনবে, মিলনী শুনবে—আর যে কে শুনবে মন থেকে মিলিয়ে যায় সুনীলের।

বাঁশি বাজাতে শুরু করে সে অল্পক্ষণে ভুলে যায় কেউ তার বাঁশি শুনছে কী শুনছে না।

নিজে বাজায়, নিজে শোনে, নিজেই সে মোহিত হয়ে যায়।

সিদ্ধেশ্বরের আফিমের পরিমাণটা চড়ে গেছে। কমে গেছে দুধের বরাদ্দ। সংসারে আয় আর বাড়েনি চার বছর আগে সুনীল চাকরিতে ঢোকার পর।

ব্যয় বেড়ে গেছে অনেকগুণ।

বাড়ানো হয়নি ইচ্ছা করে, বরং কমাবার অবিরাম লড়াই চালানো সত্ত্বেও বেড়ে গেছে।

আরাম বিলাস নয়, বাঁচার জন্য দরকারি কিন্তু অপরিহার্য নয় এ রকম কয়েকটা খরচ বরং কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবু খরচ গেছে বেড়ে !

আয় না বেড়ে সব জিনিসের দাম চড়ে গেলে এটা ঘটবেই।

শুধু খাবার-দাবার জামাকাপড় বাড়ি ভাড়া এ সব তো নয়, শিক্ষা পর্যন্ত হয়েছে অগ্নিমূল্য।

চার বছরের ছোটো ছেলেমেয়ে দুটিকে স্কুলে দিতে হয়েছে, বড়ো তিনজন উঠেছে উঁচুর দিকে—ধাপে ধাপে স্কুল-কলেজের বেতন আর আনুষঙ্গিক খরচ পেয়েছে বৃদ্ধি।

অমিয় আর বিনয় দুজনেই কলেজে পড়ে। অমিয় এবার গ্র্যাজুয়েট হবার পরীক্ষায় পাস করে আরও পড়তে চাইলে চারটি মেয়েরই স্কুল কলেজের পড়া চলবে কি না সন্দেহ আছে সিদ্ধেশ্বরের মনে।

দুধ কমাতে হয়েছে চাপে পড়ে। আফিম চড়ে গেছে সেই চাপেই। কারণ, শরীর খারাপ হওয়ায় আফিম না বাড়ালে মৌজ আসে না। আবার আফিম বাড়িয়ে দুধটুকু কমিয়ে দেওয়ায় শরীর আরও খারাপ হয়ে যায়।

চমৎকার আত্মঘাতী চক্র।

প্রভা বলে, তুমি না আস্তে আস্তে কমিয়ে আনবে ?

সিদ্ধেশ্বর বলে, পারছি কই ?

শরীর যে ভেঙে পড়ছে গো !

সেই জন্যেই তো পারছি না ! এত ঝঞ্ঝাট, চিন্তাভাবনা আর সয় না আমার।

এ আপশোশের মানে বোঝে সকলেই, সাত বছরের মীনা পর্যন্ত বোঝে !

সুনীল তাকায় না সংসারের দিকে। কোনো দায় কোনো ঝঞ্ঝাট সে ঘাড়ে নিতে রাজি নয়। মাসে মাসে বেতন পেলে হাতখরচের টাকাটি রেখে বাকি সমস্ত টাকা সে মা-র হাতে তুলে দেয়।

সংসারের জন্য এইটুকু ছাড়া আর কিছুই যেন তার করাব নেই।

এবং সে জন্য তাকে কিছু বলারও নেই কারও।

বিয়ে করেনি। নিজের বাজে খরচ বিলাসিতার খরচ এক বকম কিছুই নেই। মাসে মাসে মাইনের বেশির‌ভাগ টাকা সে চার বছর ধরে দিয়ে আসছে সংসারে।

বিয়ে করে সে যদি ভিন্ন হয়ে যেত ?

একেবারে ডুবে যেত সিদ্ধেশ্বরের সংসাব।

সুনীলের বিয়ে করাটা এই দিক দিয়ে বিপজ্জনক সংসারের পক্ষে। তবু আশ্চর্য এই। সে বিয়ে কবে না বলে সকলের মনেই খুব কষ্ট।

বড়ো ছেলে মানষ হয়েছে, চাকরি করছে অথচ ঘরে একটি বউ আসেনি, এ যেন একটা চরম অসম্পূর্ণতা সংসারের, একটা স্থায়ী আপশোশ প্রত্যেকের জীবনে।

এটা জানা কথাই যে বিয়ে করে সুনীল ভিন্ন সংসার না পাতলেও এ সংসাবে একজন লোক বাড়বে। আজকের দিনে এ অবস্থায় একটা মানুশ বাড়া সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু জানা থাকলেই মানুষের মন কি মানতে পারে সেটা ?

যে জানা থাকার কোনো সংযত যুক্তি নেই, সমর্থন নেই !

বাড়িতে বউ আসার যে আনন্দ, সংসারের যে পূর্ণতা ঘটা, তা থেকে কেন তারা বঞ্চিত থাকবে ? কেন তাদের মেনে নিতে হবে এই অনিযম ?

আজও তাই সুনীলকে বিয়ের কথা বলা হয়।

বলতে গিয়ে প্রভা মাঝে মাঝে কেঁদেও ফেলে।

বাজার করা সওদা আনা এ সব পাট নেই সুনীলের।

নিজের প্রয়োজনেই সে দোকানে যায়। গগনেব মনোহারি দোকানে। নস্য কিনতে।

গগন চামচে করে নস্য মেপে দিতে দিতে বলে, ক-টা টাকা বাকি রয়ে গেছে অনেক দিন।

আমার কাছে ? আমি তো বাকি নিই না কিছু।

আপনার ভাই নিয়ে গেছে।

সংসারের হিসাবে যা বাকি যায়, মাসকাবাবে মিটিয়ে দেওয়া হয় না ?

সিগারেটের দামটা বাকি থেকে গেছে ক-মাস।

সিগারেট ?

গগন সায় দিয়ে বলে, আপনাদের অ্যাকাউন্টে একসঙ্গেই সব হিসাব ছিল, এ মাসে দেখছি শুধু সিগারেটের দামটা ক-মাস বাকি থাকছে। আপনার ভাই বলল, ও মাসে দেওয়া হবে।

ও ! আচ্ছা ওটা দিয়ে দেব। কত হয়েছে ?

তেইশ টাকা দুআনা। কিছু মনে করবেন না সুনীলবাবু, ধার দিয়ে প্রায় ডুবতে বসেছি। বারো-শো টাকার মতো বাকি পড়ে গেছে। পুরানো খদ্দের, পাঁচ-সাতবছর ধরে মাল নিচ্ছেন, বরাবর পয়লা

দোসরা তারিখে হিসেব মিটিয়ে দিয়েছেন। এখন কারও কারও কাছে তিন মাস চার মাসের পাওনা বাকি, আদায় হচ্ছে না।

দিন দিন খারাপ হচ্ছে মানুষের অবস্থা।

অমিয় শুধু সিগারেট ধরেনি, ধারে সিগারেট কিনতে শিখেছে। তার মধ্যেও চালাকি খাটিয়েছে। তাকে গগন বাকি দেবে না, তাই সিগারেট কিনেছে বাড়ির হিসাবে।

পয়সায় কুলোয় না তবু অমিয়কে পর্যন্ত সিগারেট ধরতে হয়, এ রকম কৌশলে জোগাড় করতে হয় সিগারেট।

দত্তদের বাড়ির সামনের রোয়াকে এই সকালবেলা গাঁজার ছোটো কলকেটি হাতে নিয়ে কৈলাস একলাটি বসে আছে। বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে, আজও টের পাওয়া যায় মানুষটা সুপুরুষ ছিল। ভদ্রঘরের ছেলে, ভালো চাকরি করত, গাঁজা খেতে আরম্ভ করে তার সব গিয়েছে।

কেন যে সে গাঁজা খেতে আরম্ভ করল, কেন যে নেশাটা চড়াতে চড়াতে নিজের মাথা নিজে বিগড়ে দিল, কেন যে আজ তার সকাল থেকে কলকিতে টান দেওয়া আরম্ভ করতে হয়—সে নিজেও বোধ হয় জানে না।

সুনীলও ভেবে পায় না এ রকম তিলে তিলে কেন মানুষ আত্মহত্যা করে।

সুস্থ স্বাভাবিক ছিল মানুষটা। অন্তত বাইরে থেকে কথাবার্তা চালচলনে তাই মনে হত।

কোনো একটা গোলমাল নিশ্চয় ছিল—সংঘাত বা অসঙ্গতি। অকারণে তো মানুষ নেশা করে না।

কিন্তু কী সেই সংঘাত, অসঙ্গতি ?

কিছুই ঠেকাতে পারেনি কৈলাসকে। না তার নিজের ভিতরের বাধা, না বউ ছেলেমেয়ের মমতা, না সমাজ।

যোগাযোগ হয়তো ছিল, কেউ হয়তো গাঁজা ধরিয়েছিল কৈলাসকে। কিন্তু গাঁজা না ধরলে সে অন্য নেশা ধরত।

অমিয়রও কি প্রয়োজন হয়েছে সিগারেট খাওযার ? কেনার ক্ষমতা না থাকলেও যেভাবে হোক জোগাড় করে নিয়ে সিগারেট খাওয়ার ?

সিগারেট অবশ্য গাঁজা নয়। নেশা বলেই গণ্য হয় না সিগারেট খাওয়া।

অমিয়র চেয়ে অনেক কম বয়সেও অনেকে বিড়ি-সিগারেট ফুঁকতে শেখে।

কিন্তু পয়সা না থাকলেও যেভাবে হোক জোগাড় করে ফুঁকতে হবে কেন ?

সুনীল জানে, প্রথমে মাঝে মধ্যে দু-একটা খেতে খেতে অভ্যাস জন্মেছে এবং দৈনিক দু-তিনটে করে বাড়ানো পর্যন্ত হাতখরচের পয়সাতেই অমিয়র নেশার খরচ কুলিয়ে গিয়েছে।

সেইখানে সীমা রাখলে তো কোনো প্রশ্ন ছিল না ! কলেজে পড়ে, সিগারেট টানার অধিকার তার জন্মেছে। কিন্তু বাপ-ভাই রাগ করবে জেনেও লুকিয়ে চালাকি করে তাদের নামে ধারে সিগারেট কেনার স্তরে তাকে পৌঁছতে হয়েছে, এটাই হল আসল বিপদ আর সমস্যা।

অন্য বড়ো নেশা সর্বনাশকে অগ্রাহ্য করার। সিগারেট অমিয়কে গুরুজনের রাগ, বাড়িতে ছোটো হওয়া, লজ্জা পাওয়া অগ্রাহ্য করিয়েছে।

তফাত শুধু ডিগ্রির।

বাড়ি ফিরে সে সিদ্ধেশ্বরকে বলে, দোকান থেকে বাকি আনা একেবারে বন্ধ করে দাও।

কেন ? প্রত্যেক মাসে টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়।

তা হোক, ওতে খরচ বেশি হয়। দোকানে খারাপ জিনিস দিয়ে বেশি দাম নেয়।

মাসের শেষে কুলোয় না যে।

ও সমান কথা। মাসকাবারেই আবার দিতে হয় তো। এক মাস ঠেকিয়ে রাখলে আর গোড়ার দিকে হিসেব করে চললে বাকি আনার দরকার হবে না। বাকিটা টাকাটা এবার আমি দেবখন।

অমিয়কে শাসন করল না কেন? কেন সে বাড়িতেও ব্যাপারটা গোপন রেখে এভাবে অমিয়র বাড়ির নামে ধারে সিগারেট কেনা বন্ধ করতে চাইছে?

ভাইকে শাসন করার তিক্ততাটুকু পর্যন্ত কি সে এড়িয়ে চলতে চায়!

কেন তার এই দুর্বলতা?

বেণুর কাছে ধার করে সে দোকানের টাকাটা দিয়ে দেয়। বলে, আমার সই করা স্লিপ ছাড়া বাকি দেবেন না।

গগন আপশোশ করে বলে, চটে গেলেন তো? কী করি বলুন—

সুনীল একটু হাসে।

চটিনি। কী জানেন, বাকিতে জিনিস পাওয়া গেলেই খরচ বেড়ে যায়। দরকার তো অনেক কিছুর, অভাবের শেষ নেই। বাকিতে পাওয়া গেলে মনে হয়, এখন তো কেনা যাক, পরে দেখা যাবে। নগদ পয়সা বার করতে হলে প্রত্যেকটা জিনিস কিনব কি না দশবার ভাবতে হয়।

এটা ঠিক বলেছেন।

বেণুর কাছে টাকা নেবার সময় সে তাকে হঠাৎ তার টাকা ধার করার প্রয়োজনটা জানায়নি।

সন্ধ্যার পর বেণু ছাত্রীকে পড়িয়ে বাড়ি ফিরলে সে তার কাছে যায়।

বেণু ভিতরে চা খাচ্ছিল।

বারান্দায় একটি সস্তা দামের সাদাসিদে লম্বাটে টেবিল, চারিদিকে সাধারণ কয়েকটি কাঠের চেয়ার।

সম্প্রতি সে এই টেবিলে কাচের ডিসে খাওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। তার আগে ছিল সেই চিরন্তন ব্যবস্থা, একরোখা কাঁসার বাসন, মেঝেতে বসে এটো ছড়িয়ে খাওয়া—দুবেলা বাসন মাজার, মেঝে ধোয়ার হাঙ্গামা।

অকারণে শুধু অভ্যাসের খাতিরে অমূল্য সময় নষ্ট করা।

সুরবালার আপত্তি অগ্রাহ্য করে বেণু এ ব্যবস্থা চালু করেছে।

সুরবালা এখন পর্যন্ত মেঝেতে বসেই খায়—পাথরের থালা বাটিতে।

তবে বেণু নাকি আশা করছে যে বছর খানেকের মধ্যে দিদিকেও দলে ভিড়িয়ে নিতে পারবে।

কিছু খাবেন? দিদি ডিম রাধে চমৎকার।

উনি তাহলে ডিম রাঁধছেন?

বেণু হেসে বলে, হ্যাঁ। সেদিন বাড়ি ফিরে দেখি, আমার জন্য ডিম রাঁধা বাকি নেই, দিদি নিজেই রেঁধে ফেলেছে। খেটেখুটে এসে আবার রাঁধব! একটা ডিম খান।

কম পড়বে না?

এ প্রশ্ন একেবারেই দোষের নয়, বরং অতিশয় সঙ্গত আজকের দিনে। মাথা গুনতি হিসেব করেই সব কিছু রান্না করতে হয় বেশির ভাগ বাড়িতে।

আগে কম পড়ার প্রশ্ন তুললে মানুষ চটে যেত।

আজকাল প্রশ্নটা উচিত ও ভদ্রতাসঙ্গত বলে গণ্য হয়ে গেছে।

বেণু বলে, ঘরে ডিম আছে, একটা সিদ্ধ করে ঝোলে দিলেই হবে।

গরম একটা রুটি দিয়ে ডিম খেতে খেতে সুনীল অমিয়র ব্যাপারটা রেণুকে জানায়।

এক মুহূর্ত গুম খেয়ে থেকে গভীর খেদের সঙ্গে বলে, আমার মনটা সত্যি বড়ো দুর্বল। ওকে শাসন করা উচিত ভেবেও কিছু বলতে পারলাম না।

রেণু হেসে বলে, সে কী কথা ? আপনি তো ভালোই করেছেন ! আপনি করেন ঠিক, ভাবেন অন্য রকম !

ঠিক করেছি ?

নিশ্চয় ! প্রথমবার সামনাসামনি বকুনি দেওয়া লজ্জা দেওয়ার চেয়ে এভাবেই হয়তো ফল ভালো হবে। সেন্টিমেন্টাল ছেলে তো—যখন জানবে আপনি সব টের পেয়েছেন, টাকাটা মিটিয়ে দিয়েছেন, অথচ ওকে কিছুই বলেননি। মনটা খুব নাড়া খাবে।

প্রশ্রয় পেয়েও যেতে পারে তো ?

না। দোকানে যে আর বাকি দিতে বারণ করে দিয়েছেন ? এ তো এক রকম বলেই দেওয়া হল যে তার কাজটা খুব অন্যায় হয়েছে, আর যাতে না করতে পারে তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। অথচ তার মানটাও বাঁচানো হয়েছে। এর চেয়ে প্র্যাকটিক্যাল স্টেপ আর কী নিতে পারতেন ?

কী একটা কথা বলতে গিয়ে সুনীল যেন বলতে পারে না, কয়েক মুহূর্ত ব্যাকুল দৃষ্টিতে রেণুর দিকে চেয়ে থাকে। রেণু একেবারে অবাক হয়ে যায় তার এই ভাব দেখে। আত্মবিস্মৃত মানুষ হঠাৎ নিজেকে খুঁজে পেলে যে রকম করে ওঠে, বিস্ময়ে আনন্দে তেমনিভাবে যেন সচকিত হয়ে ওঠে সুনীল।

তারপর আবার যেন হারিয়ে ফেলে নিজেকে।

রেণুর মনে হয় সেও মহামূল্যবান কিছু হারিয়ে ফেলেছে। তবু আশায় আশায় প্রশ্ন করে, কী হল ? কী বলছিলেন ?

বলছিলাম কী, টানাটানি বেড়েই চলেছে দিন দিন। একটু আয় না বাড়ালে আর চলছে না।

সত্যই কি এ কথা বলতে যাচ্ছিল সুনীল ? এ কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে ওভাবে সে তাকাবে কেন !

কষ্ট হবে।

কষ্ট কি আপনি কম করছেন ?

রেণু একটু হাসে। বলে, এটা আমার লাইন। স্কুলেও পড়াই, বাড়িতেও পড়াই, তেমন গায়ে লাগে না। আপনার অভ্যাস নেই, তাই কষ্ট হবে।

অভ্যাস হতে ক-দিন লাগে ?

সুনীল চলে যাবার পর রেণু অনুভব করে সুনীলকে আজ তার একটু রহস্যময় মনে হচ্ছে ! যেমন ভেবে আসছে ঠিক সে রকম নয় মানুষটা। আরও কিছু আছে তার মধ্যে।

৫

মিলনীকে যেন আচমকাই খুব ভালো লাগতে আরম্ভ করেছে সুনীলের।

ভোরে বেড়াতে বেরিয়ে পথে যেদিন মিলনী আর অনাদির সঙ্গে দেখা হয় সেদিন থেকে।

মিলনী পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, এঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। মানে, ইনি দয়া করে আমায় বিয়ে করবেন।

বলেন কী ! এতই দয়া পেয়েছেন আপনার কাছে যে উলটে আপনাকেই দয়া করতে পারেন ?

তার কথা শুনে অনাদি খুব খুশি হয়েছিল। চেহারা আর বেশে এ রকম সাধারণ মানুষটার কাছে সে এমন স্মার্ট কথা প্রত্যাশা করেনি।

দুজনকে একসাথে বেড়াবার সুযোগ দিতে নমস্কার করে সে এগিয়ে যাবে, অনাদি বলে, আসুন না একসাথে গল্প করতে করতে বেড়াই।

সে বলে, আমার সঙ্গে আপনার হাঁটা হবে না।

কেন ?

আমি হাঁটতে বেরোই না। বেড়াতে বেরোই।

চলতে চলতে মিলনী বলে, আপনি ভাবলেন তামাশা করছি ? এর চার-পাঁচটা বিলাতি ডিগ্রি আছে, মস্ত পণ্ডিত লোক। দয়া করে না হলে আমার মতো মুখ্যু খোঁড়া মেয়েকে কখনও বিয়ে করতে চায় ?

সুনীল হেসে বলে, কথাটা দয়া নয়, মায়া। মায়ার আবার অনেক রূপ জানেন তো ? এ ক্ষেত্রে মায়ার অর্থ হল প্রেম।

কার পক্ষ টানছেন সুনীলদা ?

আপনার পক্ষ !

তাহলে আমায় তুমি বলবেন। বুড়ি হয়ে স্কুলে পড়তে শুরু করেছি বটে কিন্তু আমি তো স্কুলের ছাত্রী।

অনাদিকে খুশি মনে হয়, সত্যই খুশি মনে হয়। মিলনীকে বিয়ে করার সুযোগ পেয়ে সে যেন সত্যই বর্তে গেছে। নামকরা উচ্চশিক্ষিত পরিবারের ছেলে, বিদেশ থেকে অনেক বিদ্যা অর্জন করে এসেছে, মিলনীর মতো মেয়েকে জীবনসঙ্গিনী হিসাবে পাবে বলে তার এত বেশি কৃতার্থ হওয়ার ভাবটা একটু তাজ্জব করে দেয় সুনীলকে !

বেড়াতে বেড়াতে যেটুকু আলাপ পরিচয় হয় তাতেই টের পাওয়া যায় বুদ্ধি অনাদির সত্যই খুব তীক্ষ্ণ জীবনে বড়ো হবার আকাঙ্ক্ষাটা অত্যন্ত তীব্র। এবং রুচি-অরুচি পছন্দ-অপছন্দ থেকে সব বিষয়ে ব্যক্তির স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রচণ্ড রকম সজাগ !

বিরাট একটা আগেকার বিদেশি এবং এখনকার দেশি-বিদেশি মিশেল কারখানার সামনে দিয়ে যাবার সময় আলাদাভাবে এসেছিল এ দেশে শিল্পবিস্তারের কথা এবং প্রসঙ্গক্রমে মার্কিনি সভ্যতার বর্তমান বিকৃতির কথা।

অনাদি যেন ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিল, আমি ওদের সভ্যতা সংস্কৃতি পছন্দ করি। আমেরিকাতেই খাঁটি ব্যক্তি-স্বাধীনতা আছে। টাকা করতে চাও টাকা করবে, বিদ্বান হতে চাও বিদ্বান হবে, এমনকী গ্যাংস্টার হতে চাইলে তাও হতে পারবে।

অ্যাঁ ? গ্যাংস্টার হতে পাওয়াও আপনার মতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা নাকি ?

নিশ্চয় ! যে যেমন লাইফ চায়, তাই যদি সে না পেল, তার বেঁচে থাকার কোনো মিনিং আছে ? আইন আছে, পুলিশ আছে, কেউ যদি আইনকে চ্যালেঞ্জ করে চোর-ডাকাত হতে চায়, সেটা তার খুশি। ধরা পড়বে, জেলে যাবে, ফাঁসি যাবে, এ রিস্ক নিয়েই সে ওটা করছে।

সুনীল হঠাৎ হেসে ফেলে।

খুন করে ফাঁসি যাওয়াটাও ব্যক্তি-স্বাধীনতা ?

নিশ্চয়, খুন তো জগতে হচ্ছেই হরদম। যুদ্ধে বিগ স্কেলে হচ্ছে, অন্যভাবেও হচ্ছে। কোনো ব্যক্তির দরকার হলে তারও নিশ্চয় খুন করার অধিকার আছে।

ফাঁসির আইনটা তবে অনুচিত ?

তা কেন হবে ? আইনটাও দরকার। কোনো প্রয়োজন নেই, ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না, শুধু কথা কাটাকাটি হতে হতে একজন আরেকজনকে খুন করে বসলে তো চলবে না। ব্যক্তির পক্ষে দরকারি হওয়া চাই খুন করাটা। ব্যক্তি নিজের অধিকার খাটাতে রিস্ক নেবে, জীবন পণ করবে, ব্যক্তি স্বাধীনতার মানেই তাই। আইন দিয়ে এটা কনট্রোল করা হয়। রাস্তায় নেকেড হয়ে নাচবার অধিকারও প্রত্যেক ব্যক্তির আছে— কিন্তু মদ গাঁজা খেয়ে খেয়াল হল আর রাস্তায় নেচে দিলাম, এটা তো আর ব্যক্তি স্বাধীনতা নয়। রাস্তায় ওভাবে নাচলে দশজনে আমায় উন্মাদ ভাববে, গায়ে থুথু দেবে কাদা ছুঁড়বে—এ সব জেনেও, এ সব ফেস করেও যদি কেউ ও রকম করতে চায় নিশ্চয় তার সে স্বাধীনতা আছে।

সুনীল হেসে বলে, সে তো সব দেশেই আছে। শাস্তি পাবে জেনেও কেউ যদি আইন ভাঙে, তাকে ঠেকাবে কে ? কিন্তু শাস্তি দেবার আইন থাকা চাই, আইনটা খাটানো চাই। এই পয়েন্টটা আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন। চোর-ডাকাত গায়ে ফু দিয়ে বেড়ালে সেটা ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রমাণ হয় না।

সবাই তারা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল অজানা গলির মোড়ে বড়ো রাস্তার গোড়া বাঁধানো বটগাছটার তলে।

লাল সিমেন্টের গোল চত্বর গাছটার গোড়ায়, অনেকে বসতে পারে। এক দিকে ছেলেখেলার মন্দিরের মতো একটা মন্দিরে শিবঠাকুরের ফটো সামনে চত্বরে কিন্তু শ্বেতপাথরের বিশ্রামরত ষাঁড় জাবর কাটা ভুলে গিয়ে যেন ষাঁড়টি মন্দিরের শিবঠাকুরের ফটোটার দিকেই স্থির চোখে চেয়ে আছে।

মিলনী রাগ করে বলে, তোমরা তর্ক করো, আমি বাড়ি যাই। আমার এটুকু ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চয় আছে।

সুনীল বলে, না, নেই। মেয়েরা ব্যক্তিই নয়, তাদের আবার ব্যক্তি স্বাধীনতা কী ? আমি বরং কেটে পড়ি, তর্ক থেমে যাবে।

বলেই সে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যায় শহরতলি স্টেশনটার দিকে। কিছু বছর আগেও এ অঞ্চলটাকে শহরতলি বলা চলত, আজ শহরে পরিণত হয়েছে, একাকার হয়ে গেছে শহরের সঙ্গে।

ডোবাপুকুর, খোলার ঘর, ইটের দালান, কংক্রিটের সিনেমা হাউস জড়াজড়ি করে আছে।

লণ্ঠনের পাশে নয়, ইলেকট্রিক লাইটের পাশে শুধু লণ্ঠন জ্বলে না, প্রদীপও একটা জ্বলে। একটা মোটরের হেডলাইট জ্বালিয়ে অন্য আরেকটা মোটর যে কারখানায় মেরামত হয়, তারই পাশে ছোটো চালাঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে মহাভারত পড়তে পড়তে সরকারের পেনশনপ্রাপ্ত পিয়ন জগৎ মাঝে মাঝে চোখ তুলে অসময়ে নতুন করে পাতা সংসারের দিকে তাকায়। সারাদিন রোজগারের ধান্ধায় ঘুরে কেটে যায়। এই মহাভারত পড়ার সময় সে রোজ ভাবে পেনশনের জোরে ঝোঁকের মাথায় আবার বিয়ে করবার সময় যদি জানা থাকত যে আগে দিনের বেতনের হিসাবে তার পেনশন পাওয়া না পাওয়া এভাবে প্রায় সমান হয়ে যাবে।

সুনীল চালাঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকে, জগৎ বাড়ি আছ ?

আজ্ঞে যাই।

শিথিল ঝিমধরা একটা নড়বড়ে মানুষ সামনে এসে দাঁড়ায়। পরনে তার হাফপ্যান্ট।

সুনীল বলে তোমার ছেলের কাজের কথা বলেছিলে না ? আজ এগারোটার সময় আমার আপিসে পাঠিয়ে দিয়ো।

ভালো করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার শক্তিও যেন লোপ পেয়েছে জগতের। জীর্ণ শিথিল দেহে বোধশক্তিটাই হয়তো এমনভাবে ঝিমিয়ে গেছে, যে কিছুই আর তাকে নাড়া দিতে পারে না।

দাওযায একটা পিঁড়ি পেতে দিযে বত্না বলে, বাবুকে বসতে বল ?

না, আব বসব না।

মুখখানা এখনও কচিই আছে বলা যায। আবও কচিবযসে জগতেব পেনশনেব অন্নে পেট ভবাতে এসেছিল।

আগেব সে দিনকাল থাকলে দশ-পনেবোবছব পেট ভবাবাব আশা মিটত। তিন-চাববছবেই জগৎ শেষ হযে এসেছে, একটা বছবও আব টিকবে ভবসা নেই।

জগতেব ছেলে শ্রীপদ যদি তখন খেতে পবতে দেয।

আগে সুনীলেবা কাছেই একটা বাড়িতে থাকত। জগৎ বাজাত বাঁশেব বাঁশি- -গেঁযো টানা সুবে। তাব বাঁশি শুনতে শুনতে বাঁশি বাজানো শিখবাব শখ হয সুনীলেব।

জগৎ অবশ্য তাব গুবু নয। বাঁশি শেখাব প্রেবণা জুগিযেছিল শুধু এটাই তাব ছেলেকে চাকবি জুটিযে দেবাব কাবণ।

জগৎ তাদেব অত্যন্ত অনুগত ছিল। ফুটফবমাশ খেটে বখশিস পেত—পেনশন নেবাব পব কিছুদিন তাদেব এখনকাব বাড়িতে চাকবেব কাজও কবেছিল।

তাবপবেও মাঝে মাঝে দেখা কবে এসেছে--শুধু আনুগত্য জানিযে আসাব জন্য।

সুনীল কিন্তু ভাবে, জগতেব সেই বাঁশেব বাঁশিব কথা ভেবেই কি তাব ছেলেব জন্য চেষ্টা কবে চাকবিটা জুটিযে দিল? এই ভাবপ্রবণতাই হযতো তলে তলে তাকে প্রভাবিত কবেছে।

বহুকাল পবে আজ সে জগৎকে জিজ্ঞাসা কবে, তোমাব সেই বাঁশি দুটো আছে জগৎ ?

আজ্ঞে, বাঁশি ? বাঁশিব পাট কবে চুকে গেছে বাবু। ছেলেপিলেবা নিযে ভেঙে দিযেছে।

সুনীল দেখতে পায, বত্না একদৃষ্টে তাব মুখেব দিকে চেযে আছে।

তাব ম্লানমুখ আব কবুণ চাউনি দেখে জগতেব উপব সুনীলেব বাগ আব বিতৃষ্ণাব যেন সীমা থাকে না।

পথে নেমে গিযে কিন্তু তাব মনেব ভাব পালটে যায।

জগতেব দোষ নেই।

সে তো শুধু প্রথা মেনে গিযেছে।

তাবা নয অন্যভাবে চিন্তা কবতে শিখেছে – জগতেব চেতনা তো আব পালটে দেযনি।

৬

মাসকাবাবে সুনীল আপিস থেকে ফিবছে, মুদিখানাব গগন ডেকে বলে, স্লিপ ক-টা নিযে যাবেন বাবু।

কীসেব স্লিপ গগন ?

গগন আশ্চর্য হযে বলে, স্লিপ পাঠিযে সিগাবেট নিযেছেন না ? আপনাব ভাই নিযে গেছে।

দেখি স্লিপগুলি।

সবগুলিই সিগাবেটেব স্লিপ, সই কবা আছে তাব নাম। তাব নাম জাল কবাব কাবণ সুনীল বুঝতে পাবে। সিদ্ধেশ্ববেব দোকানে আসা যাওযা আছে, কিন্তু এই দোকানেব সঙ্গে তাব কোনো সম্পর্ক নেই—সে সহজে টেব পাবে না।

সহজে না হলেও টেব যে সে পাবে এটা অবশ্য জানাই ছিল অমিযব। জেনেও গ্রাহ্য কবেনি, বেপবোযা হযে তাব নাম জাল কবেছে।

অমিয়র দোকানের ধারটা মিটিয়ে দেবার পর দু-তিনদিন অমিয় একেবারে চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল, মুখ তুলে তার মুখের দিকে চাইতে পারেনি। তার শঙ্কিত ভাব দেখে বোঝা গিয়েছিল সে প্রতি মুহূর্তে শাসনের প্রতীক্ষা করছে।

সুনীলের আশা হয়েছিল, রেণুর কথাই ঠিক হবে, অমিয় আর ও রকম কাজ করবে না।

এ যে একেবারে উলটো ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেল ! অমিয় এক রকম তাকে চ্যালেঞ্জ করে বসেছে যে এই রকম ছলচাতুরী করে সে সিগারেট ফুঁকবেই !

অমিয় বাড়ি ছিল না। ফিরে আসে প্রায় ন-টার সময়।

সুনীল তাকে ঘরে ডেকে স্লিপগুলি তার হাতে দিয়ে বলে, এ সব কী আরম্ভ করেছ ?

অমিয় চুপ করে থাকে।

সুনীল এবার গর্জন করে ওঠে। চুপ করে থাকলে চলবে না। কোন দেশি বজ্জাতি এ সব ? এর নাম জুয়াচুরি তা জানিস ?

অমিয় ধীরে ধীরে বলে, আমি কী করব ? আমি কি ছোটো ছেলে আছি ? আমায় পয়সা দেবে না—

প্রায়ই তো নিস দু-একটাকা মা-র কাছ থেকে।

তাতে কী হয়। সব ছেলে হপ্তায় তিন-চারবার সিনেমা দ্যাখে, অন্য খরচও করে। আমার কোনোটা কুলোয় না। একদিন একটা টাকা দিলে মা আব সহজে দিতে চায় না। এক টাকায় কী হয় আজকাল !

আমি যে সিনেমাও দেখি না, সিগারেটও খাই না ?

অমিয় চুপ করে থাকে।

গরিবের ছেলেরা কী করে সপ্তাহে তিন-চারবার সিনেমা দ্যাখে, এত টাকার সিগারেট খায় ? একটু দুধ না পাওয়ায় বাবার শরীর ভেঙে যাচ্ছে। তোমার পেছনে কত খবচ হয় হিসাব করেছ ? তবু দু-চারটাকা হাতখরচের জন্য যা দেওয়া হয়, তাই তো যথেষ্ট ! কত ছেলে আছে টুইশনি করে পড়ার খরচ তোলে।

অমিয় হঠাৎ কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, আমার যে রকম নার্ভাস স্ট্রেইন চলেছে—

সুনীল ভাবে, সেরেছে। অমিয় আবার বলে না বসে যে আমি প্রেমে পড়েছি !

কেন ?

আমি ফেল করে যাব।

সুনীল আশ্চর্য হয়ে বলে, সে কী কথা ? এখনও ছ-সাতমাস বাকি পরীক্ষার, এখন থেকে ফেল হয়ে যাবি ভাবছিস কেন ?

যে রকম পরীক্ষা করেছে, যত পার্সেন্ট পাস করছে, আমি জানি ঠিক ফেল করে যাব। পড়া ম্যানেজ করতে পারি না, গোলমাল হয়ে যায়।

কেন ? তুই তো বেশি না পড়েও ভালোভাবে পাস করে এসেছিস ?

সে তো আগে করেছি। পাস করার জন্য কী করে পড়তে হয় জানতাম। এবার বুঝতেই পারছি না কী করে পড়ব।

মানুষ পড়ে আবার কী করে ? মন দিয়ে বুঝে বুঝে পড়ে যায়—পড়ার আবার অন্য নিয়ম আছে নাকি ?

অমিয় মাথা নেড়ে বলে, নিজে নিজে বুঝে পড়া যায় না।

সুনীল বলে, আচ্ছা তুই এখন যা।

অমিয় খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বলে, আর করব না।

সুনীল অনুভব করে, ভাইকে কী বলবে তার জানা নেই ! সমস্যাটা ভালো করে না বুঝে তাকে কোনো আশা বা আশ্বাস দেওয়া,—এখন থেকে তাব ফেল কবার চিন্তা দূর করা—অসম্ভব।

রেণুর সঙ্গে একটু পরামর্শ করতেই হবে।

অমিয়র একটা কথা সে বুঝেছে—নার্ভাস স্ট্রেইন ! নিজে যখন ছাত্র ছিল তখন বুঝতে পারত না, আজকাল ছাত্রদের স্নায়ুর উপরে সত্যই কী অসম্ভব চাপ পড়ে—ছাত্রজীবনের কথা মনে করলে আজ মোটামুটি বুঝতে পারে।

বেশির ভাগ ছাত্রের মাথা কেন বিগড়ে যায় না এটা সত্যই আশ্চর্য !

রেণু বলে, আপনি ঠিক ধরেছেন। আপনাদের চেয়ে ওদেব অবস্থা হয়েছে ঢের বেশি কঠিন, ওরা নিজেদের সমস্যা অনেক বেশি বুঝতে শিখেছে। গুরুজনগিরি না করে ওদের সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহাব করা দরকার।

সুনীল বলে, আমি ভাবছি বন্ধুর মতোও নয়, শত্রুর মতোও নয়—নতুন কোনো রকম ব্যবহার না করাই ভালো। এতদিন যেভাবে ব্যবহাব করে এসেছি হঠাৎ সেটা পালটে দিলে ফলটা হয়তো উলটো হবে।

কিছু তো বলতে হবে করতে হবে আপনাকে ?

সুনীল সায় দিয়ে বলে, আমি ভাবছি সোজা বলে দেব, পাস যখন করতেই পারবে না, মিছামিছি পড়ে লাভ কী। পড়া বন্ধ করে দেওয়াই ভালো। ফেল করার ভাবনা ওকে এত কাবু করেছে কেন আমি জানি। বেচারা আমাদের কথাই ভাবছে। আমরা সবাই এত কষ্ট করছি তবু ওকে পড়াবার জন্য এত টাকা খরচ করছি, ও ভাবছে ফেল করলে ভয়ানক একটা অপরাধ করা হবে। ওকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকাব যে আমরা শুধুই ওকে ভালোবেসে ওর জন্য ত্যাগস্বীকার করছি না—পাস করে চাকবি করে পড়াবাব খরচটা উশুল করে আনবে এটাও আমবা আশা করছি। একটা শক লাগবে। ফলটা ভালো হবে।

রেণুব চাউনি দেখে সত্যই তার বোমাঞ্চ হয !

খুব খাপছাড়া কথা বললাম, না ?

রেণু প্রায় ভর্ৎসনার সুবে বলে, এতকাল এ বকম খাপছাড়া কথা শুনিনি কেন তাই ভাবছি। নিজের ভাইটিকে নিয়ে যেই বিপদে পড়লেন, দিব্যি গড়গড় করে বেরিয়ে এল কথাগুলি। আমি যে কত বিষয়ে কত কথা বলতে গিয়েছি—

রেণু হঠাৎ থেমে যায়। আজই বোধ হয় প্রথম সুনীলের সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলার সময় তার মুখ লাল হয়ে ওঠে।

সুনীল যেন ভয়ে পেয়ে যায় লজ্জায় তার মুখ লাল হতে দেখে। ভাইয়ের ব্যাপার এত বোঝে কিন্তু রেণুর আবেগ-উন্মাদনা যেন তার কাছে দুর্বোধ্য অস্বস্তিকর ব্যাপার।

নিশ্বাস ফেলে সে বলে, কী জানেন, আপনি শক্ত হাতে জীবনের হাল ধরেছেন, আমার মনটা বড়ো দুর্বল। ভাইকে একটা থাপ্পড় মারা উচিত ছিল, তার বদলে ভাবতে বসেছি কী করে ছোঁড়ার একটা গতি করা যায়।

আপনার এই ধরনের ঠাট্টা-তামাশাগুলি বড্ড গায়ে লাগে। ব্যাটাছেলের কাজ করছি বলে আমি কি মেয়েমানুষ নই ?

তাই কি বললাম আমি ?

বলার রকমে বুঝতে পাবি। অত বোকা নই।

বোকা ? রাম রাম ! বুদ্ধি নিয়ে বেঁচে আছেন। বুদ্ধি দিয়ে সব চালাচ্ছেন।

এর নাম ঝগড়া। এব নাম কলহ। কিন্তু এ তো আর দাম্পত্যকলহ নয় যে অনায়াসে লঘু ক্রিয়ায় পরিণত হবে—স্ত্রী বেচারার উপায়ান্তর না থাকার জন্য !

রেণু তাই বলে, আমি বোকা হলেই আপনি খুশি হতেন জানি। মিলনীর বুদ্ধি নেই, শুধু বাপেব টাকা আছে, মিলনীব মতো আমার কেন বাপের টাকা নেই, শুধু বাঁচবার বুদ্ধি আছে, এটা আপনার বড্ড খারাপ লাগছে।

সুনীল উঠে দাঁড়িয়ে বলে. আপনার টাকাটা কালকেই দিয়ে যাব। চান তো আজকেও দিতে পারি।

রেণুও উঠে দাঁড়িযে বলে. আপনি ছোটোলোক !

সুনীল রাস্তায় নেমে অনুভব করে মিলনীই যেন আগাগোড়া তাকে টানছিল. মিলনীর আকর্ষণেই সে বেরিয়েছিল বাড়ি থেকে।

গেট খোলা ছিল। দারোয়ান আজ তাকে সেলাম দেয়।

মিলনী প্রায় এক ডজন বান্ধবী নিয়ে ব্যস্ত ছিল

ড্রয়িংরুমে ভিড় দেখেই সুনীল ভাবে, তাই তো ! এবার কী করা যায় ?

মিলনী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, আসুন আসুন—আপনি আসবেন ভাবতেও পারিনি সুনীলদা। বাঁশি এনেছেন তো ? তা আনবেন কেন !

সকলেই অপরিচিত। সকলে একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে।

মিলনীর বান্ধবীদের বেশভূষা সুনীলকে আশ্চর্য কবে দেয়।

সকলের গায়েই প্রচুর গয়না—পরস্পরেব তুলনায় কেবল কমবেশি হবে। দেখেই বোঝা যায় কুমারী ও বিবাহিতা সকলেই এরা সেকেলে গোঁড়া ধনী পরিবাবের মেয়ে।

মিলনীর সঙ্গে তাদের বেশভূষার পার্থক্যটা খুবই প্রকট।

সুনীল বলে, আজ ব্যাপার কী ?

মিলনী বলে, ব্যাপার কিছু নয়. এরা আমার পুবানো বন্ধু, বোনটোনও আছে। এমনি নেমন্তন্ন করেছি।

তবে আমাব পালানোই উচিত !

মিলনীর সম্পর্কে একটা প্রশ্ন সুনীলের মনে ছিল কিন্তু সে জবাব খোঁজেনি। আজ আপনা থেকেই জবাবটা খুঁজে পায়।

প্রশ্নটা ছিল এই যে এত বযসে মিলনী কেন স্কুলে মোটে সেকেন্ড ক্লাসে পড়ে !

আজ তার খেয়াল হয় যে পাঁচ-সাতবছর আগেও অবিনাশ ছিল সাধাবণ সেকেলে চালচলনের ব্যবসায়ী, বাড়ির মেয়েরা যাদেব অন্তঃপুরেই আটক থাকে এবং রামায়ণ মহাভারত পড়া আর মোটা মোটা গোটা গোটা অক্ষরে চিঠি লিখতে শেখাই যারা মেয়েদের পক্ষে যথেষ্ট লেখাপড়া হয়েছে মনে করে !

যুদ্ধের বাজারে ঘোষালের সঙ্গে একদিকে অবিনাশ যেমন আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে অন্যদিকে তেমনি ঘোষালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অবলম্বন করেছে অ্যারিস্টোক্রেটিক চালচলন।

মিলনী স্কুলে ভর্তি হয়েছে অনেক বয়সে।

আধুনিক সভ্য জীবনে অভ্যস্ত হয়ে এলেও, অনাদির মতো ছেলের সঙ্গে বিয়ে স্থির হলেও, মাঝে মাঝে অতীত জীবন আর পুরানো সঙ্গিনীদের জন্য তাব মন কেমন করে।

তাই এমনিভাবে তার বর্তমান জগতের সকলকে বাদ দিয়ে সে শুধু পুরানো বান্ধবীদের নিমন্ত্রণ করে এনে আড্ডা জমায় !

পরদিন ভোরে বেড়াতে যাবার সময় দেখা যায় গেটের সামনে মিলনী দাঁড়িয়ে আছে।

বলে, কাল কিছু বলতে এসেছিলেন নিশ্চয়। তাই ভাবলাম ভোরে বেড়াতে যাবার সময় শুনতে হবে কথাটা। আমারও একটু বেড়ানো হবে।

এমন খুশি হয় সুনীলের মনটা যে, সে নিজেই যেন আশ্চর্য হয়ে যায়। এ রকম মনের গতি হওয়া তো উচিত নয় তার।

বিশেষ কোনো কথা বলবার ছিল না। এমনি গল্প করতে এসেছিলাম।

শুনে মিলনীকেও অত্যন্ত খুশি হতে দেখা যায়।

সে বলে, বলেন কী ! আমার সঙ্গে গল্প করতে !

এটা তোমার বিনয় না তামাশা ?

দুটোই। আমি কি সত্যি সত্যি ভাবছি আমার সঙ্গে গল্প করবার ইচ্ছা হওয়াটা খাপছাড়া কিছু ? বিদ্যে কম বলেই কি একজনের সঙ্গে কথা কইতে ভালো লাগবে না মানুষের ! আমারও আপনাকে খুব ভালো লাগে।

বাঁশি বাজাতে ...নি বলে ?

না, এমনি। সাধারণ বাঁশি বাজিয়েদের মতো নন বলে। সে রকম লোক হলে কি এভাবে পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস পেতাম ? জানি যে অন্য রকম কিছু আপনার মনে আসবে না। আপনাকে ভালো লাগে এটাই শুধু ভাববেন।

সুনীল হেসে বলে, কেন ? অন্য রকম কেন ভাবব না আমি ?

মিলনীও হেসে বলে, ও রকম আজগুবি ভাবনা আপনার আসবে না বলে ! একজনের ভালো লাগাকে ভালোবাসা মনে করে নিজেকে ভোলাবার মতো বোকা আপনি নন। প্রথম দিন আমি এটা বুঝতে পেরেছিলাম।

ভালো লাগা থেকে কিন্তু ভালোবাসা হতে পারে !

সে যদি হয় তখন দেখা যাবে। তাতে তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই। '

বলো কী ! আরেকজনের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, তবু বলছ ভয় পাবার কিছু নেই ?

আমি কেন ভয় পেতে যাব ? আমি বরং বুঝতে পারব ভুল করতে যাচ্ছিলাম। ভয় পাবে আরেকজন।

মিলনী একটু থেমে বলে, কী জানেন, এত রকমের এতজন আমায় ভালোবাসাবার চেষ্টা করছে, এখনও কেউ কেউ করছে, যে এ ব্যাপারে আমি পেকে গিয়েছি। সব বুঝতে পারি। তাই আর মাথাও ঘামাই না। চেষ্টা করে যে ভালোবাসানো যায় না এটুকু যারা বোঝে না তাদের মতো বোকা কেউ আছে ?

সুনীল বলে, চেষ্টা করে ভালোবাসানো যায় না ঠিক তবে ওর মধ্যে একটা মস্ত কিন্তু আছে। এটা হল আসল ভালোবাসার কথা। এটা জাগানো যায় না, কিন্তু চেষ্টা করে একজনের মধ্যে ধারণা জন্মিয়ে দেওয়া সম্ভব যে ভালোবাসা জন্মেছে। পরে ভুল ভাঙবে কিন্তু সে তো আলাদা কথা।

এ রকম আর ক-টা হয় ?

এ রকমটাই বেশি হয়। সবাই যে সজ্ঞানে চেষ্টা করে ভুল ধারণাটা জন্মায় তা নয়, কিন্তু ব্যাপারটা আসলে দাঁড়ায় তাই। নইলে বেশির ভাগ ভালোবাসা বাস্তবের ধোপে টেঁকে না কেন ?

ভোরের আলো স্পষ্ট হয়েছে। বাঁশ বোঝাই গোরুর গাড়ি চলেছে আড়তের দিকে—রাত্রি থাকতেই গাঁ থেকে রওনা দিয়েছিল টের পাওয়া যায়। মলিন বেশে দৃঢ়পদে মেয়েপুরুষ খাটতে চলেছে।

পাশাপাশি চলতে চলতে কলহ্ করে চলেছে শার্ট আর হাফপ্যান্ট পরা একটি কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে আর সস্তা তাঁতের শাড়ি পরা একটি অল্পবয়সি বউ।

বউটি বলছে, পিছু পিছু এসো না বলছি মোর ! এখনও ফিরে যাও বলছি। তেমন মেয়ে পাওনি মোকে, কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।

ছেলেটি বলছে, ফিরে চল বলছি—হাত ধরে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাব।

সুনীল আর মিলনী পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। মিলনী আস্তে হাঁটছিল, ওরা এসে তাদের নাগাল ধরেছে।

মেয়েটি বলে, লবি বাস যেটা আসবে এবার সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ব বলছি !

ছেলেটি বলে, আচ্ছা, বেশ, চ তোকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মোর পা আছে, নিজে যেতে জানি।

তোকে পৌঁছে দিয়েই চলে আসব।

মেয়েটি আর কিছু বলে না।

দুজনে অল্পে অল্পে তাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়।

সেদিন ফুল তোলা হয় না সুনীলের।

সে জন্য মনটা খুঁতখুঁত করে না।

অন্যদিক দিয়ে অস্বস্তি আর অশান্তি বাড়তে থাকে বেলা বাড়ার সঙ্গে। একটা সিদ্ধান্ত ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট সত্যের রূপ নিতে থাকে।—মিলনী আর নিজের সম্পর্কে একটা গুরুতর সিদ্ধান্ত।

সবদিক ভেবে-চিন্তে কথাটা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত সে ঠিক করতে পাবে না সত্যটা অপ্রিয় হবে কি না, নিজের কাছে নিজে ছোটো হয়ে যাবে কি না এই সত্যটাকে স্বীকার করতে হলে।

প্রথমে প্রশ্নের রূপ নিয়ে এসেছিল কথাটা। মিলনীকে যে তার এত ভালো লেগেছে তার কারণ কি এই যে মেয়েটির সঙ্গে শুধু বন্ধুত্ব ছাড়া অন্য কোনো রকম জটিল সম্পর্ক সৃষ্টি হবে এ আশংকা করার প্রয়োজন নেই ?

মিলনী আর অনাদির মিলন স্থির হয়ে আছে এবং অদূর ভবিষ্যতেই ঘটবে, অনাদির তুলনায় সে অতিশয় তুচ্ছ মানুষ, তার দিকে অন্যভাবে মিলনী ফিরেও তাকাবে না। সে অনায়াসে প্রাণ খুলে মিলনীর সঙ্গে মিশতে পারে, এমনকী ভালোবাসা পর্যন্ত জানাতে পাবে তাকে—কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারে যে মিলনী তাকে প্রশ্রয় দেবে না, হয়তো তাকে বেদনা দেওয়ায় দুঃখে একটু কাঁদবে কিন্তু তার ভালোবাসাকে মেনে নিয়ে তাকে বিপদে ফেলবে না কিছুতেই।

মিলনী যেমন নিশ্চিন্ত তার সম্পর্কে যে হাজার হাসিখুশি প্রাণখোলা মিষ্টিকথা দিয়ে মিশলেও, আবছা ভোরে তার প্রতীক্ষায় বাগানের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও, তাকে যে মানুষ হিসাবে বন্ধু হিসাবে খুব ভালো লেগেছে এটা সরলভাবে জানতে দিলেও—সে কখনও একটা সুযোগ পেয়ে তার হাত চেপে ধরে গদগদ ভাষায় প্রেম নিবেদন করে তাকে বিপদে ফেলবে না। সেও তেমনি নিশ্চিন্ত যে একেবারে হাত ধরে টেনে বুকে চেপে ধরলেও মিলনীর দায় ঘাড়ে দেবার তার প্রয়োজন হবে না।

লতা বলে, নাইতে যাবে না ? ন-টা যে বাজতে যায় ! বাবা নেয়েখেয়ে জামাকাপড় পরছে।

শরীরটা ভালো লাগছে না লতা।

শুনে লতা যেন আঁতকে ওঠে।

প্রায়ই যে অসুখে ভোগে, প্রায়ই যে বলে শরীরটা ভালো নেই, তার মুখে এ কথা শুনতে অভ্যাস হয়ে যায় সকলের। কয়েক বছরের মধ্যে যে সর্দি-কাশি ছাড়া কোনো রোগে ভোগেনি, সর্দি-কাশিতেও সম্বৎসরে ভুগেছে কদাচিৎ দু-একবার, সে যখন হঠাৎ বলে শরীরটা ভালো নেই, তখন আঁতকে যাবার কথাই স্নেহশীলা কৃতজ্ঞ বোনটার।

দু-একমিনিটেব মধ্যে সমগ্র পবিবারটি একসঙ্গে এসে ঘিরে ধরে।

বাস্তায় কোনো মানুষ অ্যাকসিডেন্টের কবলে পড়লে বাস্তাব আত্মীয় মানুষরা যেভাবে তাকে ছেঁকে ধরে।

সিদ্ধেশ্বর বলে, কী হয়েছে ?

সুনীল উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের গেঞ্জিটা খুলতে খুলতে বলে, কী আবার হবে ?

তোমার নাকি শরীর খাবাপ ?

গামছাটা টেনে কাঁধে ফেলে ভিড় ঠেলে নাইতে যেতে যেতে সুনীল বলে, শরীর মানুষের ও রকম একটু খাবাপ হয়। তোমরা পাগলামি কোবো না।

স্নান করে খেয়ে সে আপিসে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে, লতা এসে বলে, আমায় এমন লজ্জা দিলে কেন দাদা ? এর চেয়ে নিজেই জুতো মারলে পাবতে !

জুতো পবতে পরতে সুনীল বলে, জুতো নয়, আরেকটু ছোটো হলে তোর কান মলে একটা চাপড় কষিয়ে দিতাম। তোর কাছে আমাব শবীর খারাপ হয়েছে বলার পর্যন্ত জো নেই ! বাড়িতে তুই হট্টগোল বাধিয়ে দিবি ! তোর দাদা-ভক্তির চোট সইতে আধঘণ্টা আগে আপিসে যেতে হল।

লতা ধীর শান্তকণ্ঠে বলে, ফিরে এসে হযতো দেখবে আমিও যমেব আপিসে চলে গিয়েছি।

মনেব দুঃখে ?

আমাব অসুখ হতে পারে না ?

অসুখ হলেই যমের আপিসে যেতে হয় নাকি ? কী অসুখ হল তোব আবার ?

লতা একবার চোখ বোজে।

থেকে থেকে আমার বুক ধড়ফড় করে, মাথা ঘোরে। তুমি বকলে আমার বুকের মধ্যে এখন কেমন করছে তুমি বুঝবে না।

সুনীল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, বুক ধড়ফড় করে ? বকলে-টকলে করে, না নিজে থেকে করে ?

নিজে থেকে করে ! বসে আছি, হঠাৎ কেমন চমকে যাই, বুকটা ধড়াস কবে ওঠে, তারপর খানিকক্ষণ ধড়ফড়ানি চলে। ভীষণ ভয় ভয় করে।

লতা আবার চোখ বুজে বলে, হঠাৎ হার্টফেল করে মরে যাব দেখ।

কদ্দিন এ রকম হচ্ছে ?

অনেকদিন। আগে কম হত আজকাল আরও বেড়েছে।

অ্যাদ্দিন বলিসনি কেন ?

বলিনি ? মা-কে কতদিন বলেছি। মা কানেই তোলে না, বলে, এ সব বয়সকালের ন্যাকামি। খাই দাই হেঁটে-চলে বেড়াই, আমার আবার অসুখ কীসের ?

আমায় বলিসনি কেন ?

তুমি কোনোদিকে তাকাও না, তোমায় আবার কী বলব !

সুনীল একটু ভেবে বলে, যা তুই শুয়ে থাকবি যা। এখুনি ডাক্তার এনে তোকে দেখাব।

আপিস যাবে না ?

না।

পাড়ার ডাক্তার। নাম সত্যশরণ। বয়স বেশি নয়, অল্পসময়ে পশাব ভালো জমিয়েছে।

গরিবেবা তাকে ডাক্তাব হিসাবে পছন্দ করে। একটা গুণ আছে সত্যশরণেব, রোগেব সঙ্গে রোগীর অবস্থা খানিকটা বিবেচনা করে সে ব্যবস্থা দেয়।

বিবরণ শুনে সত্যশবণ বলে, খুব সম্ভব নার্ভের গোলমাল, হার্টেব নয়।

লতাকে পরীক্ষা ও জিজ্ঞাসাবাদের পব সে বায় দেয, হার্ট ঠিক আছে।

লতা বলে, তবে বুক ধড়ফড় কবে কেন ?

সত্যশরণ একটু হাসে। হার্ট খারাপ না হলেও অন্য কাবণে পালপিটেশন হয। বদহজমের জন্য হয়, বক্ত কমে গেলে হয, অন্য অসুখ থেকে হয—বেশি চা-কফি খেলে পর্যন্ত হতে পাবে।

সুনীল বলে, নড়াচড়া বাদ দিয়ে সারাদিন পড়লেও হতে পাবে।

না পড়লে যে ফেল হয়ে যাব !

ব্যবস্থা হয হালকা পুষ্টিকব খাদ্য, ঘবেব কাজ কিংবা বেড়ানোব পবিশ্রম, ঘুম এবং দুশ্চিন্তা ত্যাগ করে আনন্দে থাকা।

ডাক্তার বিদায় হয়ে গেলে সুনীল বলে, তোব আর পড়ে কাজ নেই।

লতা আঁতকে ওঠে।

না না, পড়া ছাড়ব কেন ? দ্যাখো না দুদিনে সেবে যাচ্ছি। হার্টেব অসুখ তো নয়।

ডাক্তার আসবাব আগেই সিদ্ধেশ্বব আপিসে চলে গিয়েছিল। বাড়িতে ডাক্তাব এসেছে, ফি দিতেই হবে, লতাকে দেখা শেষ হলে সিদ্ধেশ্বব নিশ্চয বলত, আমাব হার্টটা একটু দেখুন তো ডাক্তারবাবু !

লতাব চেয়ে তার হার্ট পরীক্ষা করাই জবুবি ছিল বেশি।

সেদিন বাত্রে বাঁশি বাজিয়ে শোবার আগে কলঘবে যাবাব সময লতাদেব শোবাব ঘবে কান্না শুনে থমকে দাঁড়ায।

শুনতে পায বাণী বলছে, বাতদুপুরে কাঁদছিস কেন দিদি ?

পিসি বলে, হল কী তোব ? দিব্যি শুয়েছিলি, হঠাৎ কান্না শুবু করলি যে ?

লতা কাঁদতে কাঁদতে বলে, দাদাব বাঁশি শুনে ঘুম আসে না, না ঘুমোলে অসুখ সাববে না, দাদা পড়া ছাড়িয়ে দেবে।

৭

রেণু জিজ্ঞাসা করে, সাত-আটদিন বাঁশি শুনছি না যে ?

বাজাই না।

কেন ?

বোনের হুকুম।

ব্যাপার শুনে বেণু বলে, আপনি এই ন্যাকামিকে প্রশ্রয় দিলেন? বাঁশি শুনে কখনও ঘুম নষ্ট হয়?

অবস্থা বিশেষে হয়। বাঁশির জন্য নয়, আতঙ্কে।

বাঁশি শুনে আতঙ্ক?

সুনীল বলে, বাঁশি শুনে ঘুম আসছে না, ঘুম না এলে অসুখ সারবে না, অসুখ না সারলে পড়া বন্ধ হয়ে যাবে।

আসল আতঙ্ক পড়া বন্ধ হবার?

সুনীল মাথা নাড়ে।

আসল ভয় হল বিয়ের। ঠিক বিয়েরও নয়— যেমন তেমন একজনের সঙ্গে বিয়ে হবার ভয়। চারিদিকে দেখছে তো বিয়ে করে সাধারণ লোকের কী অবস্থা— ওই ভয়ে নিজের দাদা তার বিয়ে করছে না। পড়া বন্ধ হলেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে। বাপ ভায়ের টাকা নেই, ভালো ছেলে জুটবে না।

বেণু আশ্চর্য হয়ে বলে, আপনি এত তলিয়ে বোঝেন?

সুনীল বলে, এ আর বোঝা কঠিন কী? দেখছি তো চোখের সামনে। ওর কি আর পড়ার জন্য পড়া? নিজেকে বাঁচাবার জন্য পড়া। রাত জেগে পড়ত আজকাল একটু সকাল সকাল শোয় কিন্তু ঘুম আসে না ওই জন্যই। ও ভাবে আমার বাঁশির জন্য ঘুম আসে না।

বুঝিয়ে দেননি?

বুঝিয়ে লাভ নেই। বরং উঠে পড়ে লেগেছে শরীরটা ঠিক করার জন্য রাত্রে ঘুমোবার চেষ্টা করছে তাই করুক। ক দিন পরে বাঁশি শুনতে শুনতে ঘুমোতে পারবে।

বেণু খানিক চুপ করে থেকে খেদের সঙ্গে বলে, সত্যি কী অবস্থা দেশের ছেলেমেয়েদের।

শুধু ছেলেমেয়েদের কেন? তবে অবস্থা যেমনি হোক, এ লক্ষণটা ভালো।

কোন লক্ষণ?

এই যে নিজেদের হাল ধরবার চেষ্টা। লতা শুধু বাপ ভাই আর অদৃষ্টের উপর বরাত দিয়ে বসে নেই, নিজেই লড়াই করছে। সাধারণ ঘরের সাধারণ মেয়ে তো, কেউ বলে ও দেয়নি কিছু। নিজেই অবস্থা আঁচ করে ব্যবস্থা করছে। নিজে লড়াই না করলে আমরা কি আর ওকে পড়াতাম? করে বিয়ে হয়ে যেত।

ভাই বোন সবাই আপনারা বিয়ে বিরোধী।

এক কারণে।

বেণু মাথা নাড়ে— -না, তফাত আছে। বোনটি ভাবছেন শুধু নিজের কথা, আপনি ভাবেন ওদের সকলের কথা। একা হলে আপনি কি আর বিয়ে করতেন না।

সুনীল একটু হাসে।

আপনারা সবাই ওই এক ভুল করেন আমার সম্পর্কে। ভাবেন না আপনজনদের জন্য ত্যাগ করছি। আসল কথা কিন্তু মোটেই তা নয়। বিয়ে করার ইচ্ছা দূরে থাক, ও কথা ভাবতেও বিতৃষ্ণা বোধ হয়। আমার ধাতটাই এ রকম। কোনো শারীরিক বা মানসিক কারণ নিশ্চয় আছে। কোনো রকম অ্যাবনর্মাল সেক্স টাইপ হব হয়তো।

কথা শেষ করেই সুনীল হঠাৎ প্রশ্ন করে, আচ্ছা আপনার—?

বেণু মুখ বাঁকায়।

ইচ্ছে তো হয়। কিন্তু পছন্দমতো মানুষ পেলাম কই?

দুজনে তারা পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে। রেণুর হাসিটা হয় একটু করুণ আর লাজুক।

রেণুর মধ্যে অল্প অল্প পরিবর্তন ধরা পড়ে সুনীলের কাছে। যেমন ওই করুণ ও লাজুক হাসি। এ হাসি সুনীল কখনও আর দ্যাখেনি।

সেদিন বিশ্রী কলহ হয়ে গেল—প্রায় অকারণেই। তাকে ছোটোলোক পর্যন্ত বলে বসল রেণু। অথচ পরদিন দেখা হতে এমনভাবে নিজেই সে কথা শুরু করল যেন ও সব ঝগড়াঝাঁটি কিছুই তাদের মধ্যে ঘটেনি অথবা ঘটে থাকলেও যেন কিছুই তাতে আসে যায় না !

আগে রেণু অন্তত জিজ্ঞাসা করত, রাগ করেননি তো ?

কেমন একটা বিরক্তি আর খানিকটা বিদ্বেষের ভাব অনুভব করে সুনীল। মনে হয়, তাকে ভালোমানুষ পেয়ে রেণু যেন তাকে তুচ্ছ করছে, অবহেলা করছে। একদিকে গায়ে পড়ে ঝগড়া করে তাকে গাল দিয়ে ক্ষমা চাওয়াও যেমন সে দরকার মনে করে না, অন্যদিকে তেমনি আবার তাকে অনুকম্পা করে একটু আত্মীয়তা আর স্নেহ-মমতা দেখাতে চায়।

সে যেন দুঃখী বঞ্চিত মানুষ, তার কাছে একটু দয়া পেলে খুশি হবে।

নিজের সম্পর্কে পুরানো অস্বস্তিবোধটাও জোরালো হয়ে ওঠে সুনীলের।

কেন এত চুলচেরা বিচার ? কী এমন আসে যায় রেণুর কথা ব্যবহার একটু এদিক-ওদিক হলে ? দীর্ঘকাল ধরে তাদের পরিচয়, পরস্পরের জন্য তাদের কোনো দুর্বলতা থাকলে এতদিন এত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার পর তা কী গোপন থাকত ? বন্ধুত্বের সম্পর্কই তাদের গড়ে উঠে নিজস্বতা আর বৈশিষ্ট্য নিয়ে—প্রত্যেক বন্ধুত্বেরই যেটা থাকে।

বন্ধুত্ব ছাড়া তাদের মধ্যে আর কোনো সম্পর্কই সম্ভব নয়, তারা সেটা চায়ও না।

কিন্তু তারা তো যন্ত্র নয়, মানুষ। যতই শক্ত আর সেন্টিমেন্ট-বর্জিত হোক, রেণুঁ আবার মেয়েমানুষ, তার কথায় ব্যবহারে একটু এদিক-ওদিক ঘটলে সে কেন এমন অস্বস্তিবোধ করবে, সামান্য ব্যাপার নিয়ে এমনভাবে মাথা ঘামাবে ?

মিলনীর সঙ্গে প্রথম থেকে কেন সে অবাধে প্রাণ খুলে মিশতে পেরেছে, এত অল্পসময়ে কেন তাদের ভাব জমেছে ও মিলনীকে কেন এত ভালো লেগেছে তার কারণটা আবিষ্কার করে কয়েকদিন সুনীল অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিল।

এতদিন জানা যায়নি কিন্তু মিলনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মানোর পর একটা ব্যাপার খুব স্পষ্ট হয়ে গেছে যে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার নিজস্ব একটা পছন্দ-অপছন্দের নিয়ম দিয়েই সে বরাবর নিয়ন্ত্রিত হয়েছে—বেশ পাকাপোক্ত বুদ্ধিমতী মেয়েদের সঙ্গে মিশতেই সে পছন্দ করে, যার ছেলেমানুষি এবং ভাবুকতা যত কম তাকে ততটা ভালো লাগে। এর মধ্যে বয়সের প্রশ্ন নেই, অল্প-বয়সি কোনো মেয়ে যদি রেণু বা মিলনীর মতো বুড়িয়ে যেতে পারে, তার সঙ্গও সে পছন্দ করবে !

সে তো নিছক একটা যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয় তবে ! এ রকম একটা ধরাবাঁধা নিয়ম নইলে পিছন থেকে তাব হৃদয়-মনকে কী করে নিয়ন্ত্রিত করে ?

কিন্তু গ্লানিবোধ খুব তাড়াতাড়িই কমে গেছে সুনীলের।

ক্রমে ক্রমে কয়েকদিনের মধ্যে তার কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে এটা তার যান্ত্রিকতা নয়, এটাই তার জীবনের বাস্তবতা।

কারণ যাই হোক, যৌনবিজ্ঞান আর মনোবিজ্ঞান কী ব্যাখ্যা দেবে তার জানা না থাক— সংসারের ন্যাকামি-মার্কা হালকা দরদ ভালোবাসা সম্পর্কে তার মধ্যে আছে গভীর বিতৃষ্ণাবোধ। এই বিতৃষ্ণার একটা বাস্তব কারণ নিশ্চয় আছে। কাজেই যে মেয়েব সঙ্গে একটু বেশি ঘনিষ্ঠতা করলে ভালোবাসার ঝামেলা সৃষ্টি হতে পারে তাদের সম্পর্কে সাবধান হয়ে দূরত্ব বজায় আর যাদের সম্পর্কে এ রকম আশঙ্কা নেই তাদের সঙ্গে নির্ভয়ে প্রাণ খুলে মেশাই তো তার পক্ষে স্বাভাবিক।

শুধু স্বাভাবিক নয় উচিতও বটে।

সিনেমা আর সস্তা বই কাঁচা মনটা যার বিকৃত করে দিয়েছে এমন একটি মেয়েকে মন খুলে মেলামেশার মধ্যে নিজের অজান্তে আশা দিয়ে উসকানি দিয়ে তারপর সরে যাবার বাঁদরামি তাকে কবতে হয়নি।

একেবারে যে হয়নি তা নয়। কিশোর বয়সে একটি কিশোরীর সঙ্গে এ রকম বাঁদরামিই সে করেছিল।

তবে আজকেব হিসাবে সেটা ছেলমানুষি বলেই ধবা চলে।

বেশিদূর না এগিয়ে মেয়েটির ক্ষতির বদলে বরং সে উপকারই করেছিল। সতেরো বছরের ছেলে আর ষোলো বছরের মেয়ের মিলন কি আর সম্ভব হতে দিত দুবাড়ির মানুষেরা !

তার চেয়ে দু-চারদিন কেঁদে, বিষ খাবে বলে চিঠি লিখে, বছব খানেক পরে হয়তো একটু বিষণ্ণ মনে অন্য একজনের [illegible] হয়ে বিয়ের আসরে পিঁড়িতে বসে ব্যাপারটা চুকিয়ে দিয়ে সে বেঁচে গেছে !

মুনসেফের বউ হযেছিল, আজ সে উন্নত হয়েছে সাবজজের বউয়ের পদে। হয়তো জজের বউও হয়ে থাকতে পারে ইতিমধ্যে। বছর তিনেক খবব বাখা হয়নি।

বছর তিনেক আগে সুনীল মফস্বলের এক শহরে তাকে দেখতে গিয়েছিল বুক ঠুকে। কিশোর বয়সেই একটি মেয়েব হৃদয নিয়ে খেলা করে তার জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছে কি না এই প্রশ্নের পীড়ন থেকে রেহাই পেতে, পদ্মা জীবনে সুখী হতে পরেছে কি না জেনে আসতে।

পদ্মাকে সুখী দেখলে সে নিজে সুখী হবে কি না, পদ্মাব জীবনে রং আর বস দুয়েরই প্রাচুর্য আছে জানলে, নিজে সে ক্ষুব্ধ হবে কি না, এ প্রশ্নও তার মনে জাগেনি।

যার জন্য এতটুকু মন কেমন কবে না, ছেলেমানুষি ভালোবাসা ভুলে সে সুখী হয়েছে জানলে কখনও ক্ষোভ জাগে ?

লালপেড়ে গবদের শাড়ি পবা সদ্যস্নাতা পদ্মা ফুলচন্দনের তামার রেকাবি হাতে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

তুমি ? আপনি হঠাৎ এতদিন পরে ?

না, ফুল চন্দনেব রেকাবি তাব হাত থেকে খসে পড়ে যাযনি। কথায ব্যবহারে টেরও পাওয়া যায়নি যে মাত্র দশ বছর আগে সে আঁকাবাঁকা অক্ষরে দলিল লিখে দিয়েছিল, সুনীলের জন্য সে বিষ খেয়ে মরবে !

স্বামী চিন্তাহরণের দিকে চেয়ে হাসিমুখে বলেছিল, তুমি এঁকে চিনবে না। জন্ম থেকে আমরা পাশাপাশি বাড়িতে মানুষ হয়েছি, ইনি আমায় ছোটোবোনের মতো ভালোবাসতেন।

সুনীলকে বলেছিল, বসুন, চা-টা খান, আমি পুজোটা সেরে আসি।

চিন্তাহরণ খেয়েছিল শুধু একটা ডিম।

বলেছিল, ডিসপেপসিয়া ভাই—না খেলে মরে যাব তাই একটু খাই।

ভাসা-ভাসা আলাপ চলেছিল। মাঝে মাঝে হঠাৎ যেন জীবন্ত হয়ে সাগ্রহে চিন্তাহরণ একটা প্রশ্ন করছিল, তারপর আবার ঝিমিয়ে গিয়ে চালিয়েছিল ভাসা-ভাসা আলাপ।

সুনীল জিজ্ঞাসা করেছিল, কতক্ষণ লাগে পুজো করতে ?

দু-তিনঘণ্টা তো বটেই।

তারপরেই চিন্তাহরণ জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা, উনি এই ধর্মভাবটা কোথায় পেলেন বলতে পারেন ? বাপের বাড়িতে তো এ সব কোনো পাট নেই !

সুনীল বলেছিল, কার মধ্যে কীভাবে ধর্মভাব আসে তা কী বলা যায় ?

তা বলা কঠিন বটে। আমিও ক্রমে ক্রমে ওইদিকে ঝুঁকছি। তা সত্যিই তো ভাই, ভোগ যে করব তার জন্য ত্যাগ চাই না ? ত্যাগ ছাড়া কি ভোগ সম্ভব হয় ? একটা অতীন্দ্রিয় জগৎও তো আছে, মাঝে মাঝে আমার মনে হয় কী জানেন ? হয়তো আমার মধ্যে ধর্মভাব জাগাবার জন্যই ভগবান আমাকে এঁর স্বামী করেছেন। দু-তিনঘণ্টা পুজো করা, তিন-চারঘণ্টা ধর্মগ্রন্থ পড়া—আমি তো দুদিন চালাতে পারতাম না। আমার সে মনের জোর দেননি ভগবান। ওঁকে আমার স্ত্রী করে পাঠিয়েছেন, যাতে আমার ওই দুর্বলতার পূরণ হয়।

আবছা ভোরে মিলনী আজও দাঁড়িয়ে আছে তার বাবাব মস্ত বাড়িওলা মস্ত বাগানের গেটের সামনে। চাঁদের আলোয় বিভ্রান্ত হয়ে বেশ খানিকটা রাত্রি থাকতে থাকতে না বেরোলেও আজ প্রায় রাত্রি শেষ হতে না হতে সুনীল বেড়াতে বেরিয়েছিল।

মিলনী বলে, প্রায় আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি। অবশ্য মনে হচ্ছে আধঘণ্টা—হয়তো পাঁচ-দশ মিনিট হবে।

একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না ? লোকে কিছু ভেবে বসতে পারে তো !

মোটেই না। রাত সাড়ে এগারোটা বারোটার সময় আপনার বাড়ি গিয়ে হাজির হলে ববং বাড়াবাড়ি হত। তা তো আমি যাইনি !

ব্যাপারটা কী ?

তেমন কিছু না। বেড়াতে বেড়াতে আলাপ কবব ভাবছি।

হাঁটতে আরম্ভ করেই কিন্তু সে কথা শুরু করে দেয়। বলে, ব্যাপারটা হল ওই মহাবিদ্বান ভদ্রলোকটিকে নিয়ে। বাবার কাছে টাকা নিয়েছিল দশ-বারোদিন আগে। কত টাকা সেটা শুনে কাজ নেই। মস্ত বিদ্বান বলেই তো বাবা আমাকে দিতে রাজি হননি ওর হাতে, বাবা বলতেন, বিদ্যাটা খাটিয়ে দেখাতে হবে। ও খুশি হয়ে মেনে নিত, বলত যে বিদ্যা আর অর্থ মিলিয়েই সিদ্ধি সম্ভব। আমাকে বাবাও কিছু বলেনি, ও লোকটাও বলেনি। পরে শুনলাম, হঠাৎ এসে টাকা চায়, একটা চান্স পেয়েছে। বাবা ইতস্তত করে টাকা দিয়েছিলেন। তারপর থেকে আর আসে না।

আসে না মানে ? টাকা নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছে, কাজে ব্যস্ত হয়ে আসতে পারছে না !

মিলনী দাঁড়ায়। বিরাট এক বটগাছেব তলে। রাস্তার ধারে বটগাছের গোড়া কেউ একজন সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে, ঝবনায় পালিশ করা কতগুলি ছোটোবড়ো কালো পাথর রাখা হয়েছে গুঁড়ি ঘেঁষে, তাকে পড়েছে সিঁদুর আর ফুল।

মিলনী ধীরে ধীরে বলে, টাকাটা হাতে পেয়েই এমন ব্যস্ত হয়ে পড়ল ?

টাকাটা পেয়েই কাজ আরম্ভ করেছে।

সব শুনে নিন। কতবার টেলিফোন করে ডেকেছি, আসেনি। কাল আমি নিজেই বাড়িতে গিয়েছিলাম দেখা করতে আর ব্যাপার বুঝতে। টেলিফোন করে জানিয়ে গিয়েছিলাম যে আমি আসছি—রাত তখন ন-টা হবে। গিয়ে শুনলাম কী জানেন ? জরুরি কাজে বেরিয়ে গেছে, ফিরতে অনেক রাত হবে। আমি তো অবাক ! বাড়ির লোকের ব্যবহারও যেন কেমন কেমন লাগল। আমি ঠায় বসে রইলাম অনাদির জন্য, বললাম যে বিশেষ দরকার আছে, যত রাত্রিই হোক অনাদির সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরব। ওর বোন এমন বিশ্রী একটা ঠাট্টা করলে। অথচ আগে আমাকে যে কী খাতিরটাই করত !

মিলনী একটু থামে। সিমেন্ট শিশিরে ভিজে আছে, তাদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলতে হয়।

মিলনী বলে, প্রায় এগারোটার সময় ফিরে এল। বেশ বুঝলাম, আমায় ধন্না দিয়ে বসে থাকতে দেখে খুব বিরক্ত হয়েছে। এমনভাবে কথা বলল ব্যবহার করল—একেবারে যেন অন্য মানুষ ! আমি বিদায় নিয়ে রেহাই দিলে যেন বাঁচে। পাঁচ মিনিটেই ব্যাপার কী ভালো করেই বুঝলাম, মাথা ঘুরছিল বলে তাড়াতাড়ি চলেও এলাম।

সুনীল একটু ভেবে বলে, তোমার ভুল হয়নি তো ? হয়তো কোনো মুডে ছিল, কিংবা কিছু একটা ঘটেছে—

মিলনী বলে, ভুল হয়নি। ব্যাপাব ঠিক বুঝে নিয়েছি। কী বুঝতে পাবছি না জানেন ? কী করে এটা সম্ভব হয় !

সুনীল চুপ করে থাকে।

মিলনী ক্ষোভের সঙ্গে বলে, আমায় বোকাহাবা ভাববেন না—আমি ব্যাবসাদারের মেয়ে। বুড়ো বয়সে স্কুলে মোটে সেকেন্ড ক্লাসে উঠেছি—এ সব আমাব খেয়াল ছিল।

বিয়ে না করলে টাকাটা ফেবত দেবে।

মিলনী একটু হাসে। ভোরেব অস্পষ্ট আলোয় অদ্ভুত দেখায় তার সেই হাসি।

বলে, রাতে এক মিনিট ঘুমোইনি, শুধু এই কথা ভেবেছি। মুশকিল তো ওইখানেই। টাকা ও ফেরত দেবে না। চেষ্টা কবছে এড়িয়ে যেতে, আমাকে বাদ দিয়ে যদি টাকাটা বাগাতে পারে সেই চেষ্টা কবছে--নইলে অগত্যা বিয়েই করবে আমাকে। বাবা তো আর ছেড়ে কথা কইবে না—চাপ দেবে। টাকা ফিরিয়ে দেবার বদলে তখন আমায় বিয়ে করবে। এ কী বিপদে পড়লাম সুনীলদা ?

খাপছাড়া হাসি দিয়ে আরম্ভ করেছিল, কথার শেষে মিলনী কেঁদে ফেলে।

তাকে সামলে নেবার সময় দিয়ে সুনীল বলে, বিপদ ভাবছ ? এমন বিগড়ে গেছে মন ?

যাবে না ? শুধু টাকার লোভ হলেও কথা ছিল। ও দুর্বলতা অনেকেব আছে, আমার নিজের বাবারও আছে—মেনে নিতাম। কিন্তু বাবাব তো আবও ঢের টাকা আছে, ভবিষ্যতে বাবাব কাছে আবও কত টাকা পাবার আশা আছে—তবু আমায় চায় না। টাকা এত ভালোবাসে তবু টাকার জন্যেও আমায় নিয়ে ভুগতে ইচ্ছা নেই। এটা কী ভয়ানক কথা বুঝতে পাবছেন না ?

অবিনাশবাবুকে বিয়ে ভেঙে দিতে বলো।

বাবা শুনবে না। এ সব বুঝবেই না বাবা। ও তো বলছে না যে বিয়ে করবে না। এটাই তো ওর চালাকি। বাবা যাতে জোব করে টাকা ফেরত না চাইতে পারে, আবার বিয়েও ভেঙে যায়, সেই চেষ্টা করছে। আমি বলতে গেলে বাবা সব আমাব ছেলেমানুষি বলে উড়িয়ে দেবে। দুদিন আগেও তো আমিই ফুর্তিতে লাফিয়েছি।

সুনীল শান্তভাবে বলে, আমিও তাই ভাবছিলাম। তুমি সত্যি বোকা নও, অথচ এমনভাবে কী করে তোমায় ভুলিয়ে এল এতদিন ধরে। তুমি খানিকটা আত্মহারা হয়ে পড়েছিলে।

মিলনী বলে, তা ঠিক।

সুনীল মনে মনে বলে, আত্মহারা হবার কারণটা যদি তুমি বুঝতে। সেকেলে ব্যাবসাদারের একেলে কলেজে পড়া মেয়ে বলেই যে অমন একটি অ্যারিস্টোক্র্যাট বর পাবার নামে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলে এটুকু বুঝলে ভবিষ্যতে কাজ দিত !

মুখে বলে, ভুল যখন করেছ, প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। ব্যাপারটা বুঝুন না বুঝুন, বাবাকে তোমার জানিয়ে দিতে হবে যে এ বিয়ে ভেঙে দিতেই হবে। উনি রাগ করবেন, ঝামেলা হবে—কিন্তু সেটা তোমাকে সইতে হবে।

অনাদিকে একবার বলে দেখব, বাবার টাকাটা ফিরিয়ে দিক, আমায় রেহাই দিক।

বলে দেখতে পারো। তবে টাকার জন্য বিলাতি বিদ্যা নিয়ে বিবেক বিসর্জন দিয়ে এসেছে, বলে কোনো লাভ হবে মনে হয় না। তবু চেষ্টা করতে দোষ নেই—যতই হোক উঁচুঘরের ভদ্রঘরের ছেলে তো !

বাড়ির দিকে চলতে চলতে মিলনী বলে, বাবা যদি কিছুতেই না বোঝে তাহলে অন্য উপায় দেখতে হবে।

কী উপায় ?

পরে বলব।

সুনীল অস্বস্তিবোধ করে।

বলোই না শুনি ?

আগে ওকে বলে বাবাকে বলে চেষ্টা করে দেখি—কিছু ফল না হলে তখন বলব।

সুনীল অস্বস্তি নিয়েই বাড়ি ফেরে।

মিলনী বুদ্ধিমতী কিন্তু তার মধ্যে দুই স্তরের জীবনেব জোরালো সংঘাত। এই সংঘাত চাপা থাকে তার তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর সব মেয়ের মধ্যেই যে সাধারণ বাস্তববোধ থাকে তার সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করা চালচলনের আড়ালে—সহজে সকলে সন্ধান পায় না।

কিন্তু সে তো জানে ওই সংঘাত মিলনীর মধ্যে কী জোরালো ভাবপ্রবণতা সৃষ্টি করেছে।

হঠাৎ ঝোঁক চাপলে তার বুদ্ধি-বিবেচনা ভেসে যাওয়া আশ্চর্য নয়, ভয়ানক কিছু করে বসা আশ্চর্য নয়।

আজও তার ফুল তোলা হয় না।

৮

আপিস থেকে বাড়ি ফিরতেই লতা উত্তেজিতভাবে বলে, দাদা, সর্বনাশ হয়েছে। মনোজদার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।

তার উত্তেজনা লক্ষ করতে করতে সুনীল ব্যাপারটা শোনে।

যখন তখন যে কোনো ব্যাপারে উত্তেজিত হওযাটা লতার পক্ষে অসাধারণ কিছু নয়, কিন্তু তার আজকের উত্তেজনা একেবারে অন্য ধরনের। ভয়ে-ভাবনায় এদিকে মুখখানা তার একেবারে ছোটো হয়ে গেছে।

সাধারণ ঘটনা। মনোজদের কারখানায় হাঙ্গামা হয়েছিল, পুলিশ এসে লাঠিচার্জ করে।

মনোজের মাথায় আঘাত লেগেছে। অন্য কয়েকজন বেশি রকম আহত হয়েছে, মনোজের গুরুতর আঘাত লাগেনি।

হাসপাতালে নয়, বাড়িতেই আছে মনোজ।

দেখতে যাবে না ?

যাব।

একটু থেমে সুনীল জিজ্ঞাসা করে, তোর এখন বুক ধড়ফড় করছে না লতা ?

আচমকা এ প্রশ্ন শুনে লতা একটু ভড়কে গিয়ে বলে, কই না ? বুক ধড়ফড় করবে কেন ?

ভয়ে-ভাবনায় মুখ শুকিয়ে গেছে, এমনভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, তবু লতার বুক ধড়ফড় করছে না ! কে জানে সে সত্য কথা বলেছে কি না ?

কিন্তু যদি সত্য কথাই বলে থাকে লতা, তার মানে দাঁড়ায় এই যে শুধু দাদার বাঁশি শুনে তার বুক ধড়ফড় করে, অন্য কোনো কারণে করে না !

জামাকাপড় না ছেড়েই সুনীল মনোজকে দেখতে যায়। মনোজ সম্পর্কে নিজের মনোভাবেরও সে কোনো হদিস পায় না।

বন্ধু হিসাবে মানুষ হিসাবে মনোজ যে তার মনে খুব উঁচু আসন পেয়েছে তা নয়, সাধারণ মানুষ ছাড়া তাকে সে অন্য কিছুই ভাবে না, তবু একটা অসাধারণ আকর্ষণ সে তার জন্য অনুভব করে।

মনোজের সঙ্গে কথা বলার সময় নিজের সম্পর্কে তার স্থায়ী অস্বস্তিবোধটা কীভাবে যেন কেটে যায়।

ব্যাপারটা একেবারেই দুর্বোধ্য তার কাছে। মনোজ যে তার অস্বস্তির কারণটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে পেরেছে তা নয়। সাধারণভাবে দশজনে তাকে যা বলত মনোজও সেই কথাই বলেছে যে তার কোনো অবলম্বন নেই, বউ নেই, সংসার নেই, ধর্মচর্চা জ্ঞানচর্চা খেলাধুলা বা অন্য কোনো নেশা নেই—নিজের মনে নিজেকে নিয়ে থাকে বলে এ রকম ফাঁকা ফাঁকা লাগে, খুঁটিনাটি বিষয়ে মাথা ঘামায়।

একাচোরা মানুষ। তাই শুধু অবলম্বন করেছে বাঁশি। নিজে বাজায় নিজেই শোনে।

কথাটা এত সহজ হলে আর ভাবনার কী ছিল !

কারণ আসল প্রশ্নটা হল যে আর কোনো অবলম্বনের দিকে তার মন যায় না কেন ? বউ-ই বলো আর জ্ঞানচর্চা ধর্মচর্চা তাসপাশার নেশাই বলো, প্রয়োজন হলে আপনা থেকেই মানুষের এ সব কোনো এক দিকে ঝোঁক আসে, মন যায় বলেই মানুষ একটা কিছু নিয়ে মেতে থাকে।

তার কোনোদিকে মন যায় না কেন ?

মনোজ এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি। কথায়বার্তায় মানুষকে মাতিয়ে রাখতেও সে পটু নয়। তবু তার কাছে এলে ভেতরের একটা ক্ষীণ টনটনে ভাব যেন কমে যায়। অথচ মনোজের কাছে গিয়ে এই স্বস্তিটুকু বোধ করার তেমন তাগিদ যে অনুভব করে তাও নয়।

ভোরে যেদিন মনোজের বাড়ির দিকে বেড়াতে যায় সেদিন তাকে ডেকে তুলে দেবার পর দু চারমিনিট কথা হয়—অন্যদিন হয়তো একবারও দেখাই হয় না তাদের। মনোজ নিজে মাঝে মাঝে তাদের বাড়ি আসে। কিন্তু মনোজ বাড়িতে এলেও সব দিন সুনীল সে সময় বাড়ি থাকে না।

মনোজের মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা। বিছানায় বসে বিড়ি টানছিল। আঘাত গুরুতর নয়—তাহলে অবশ্য হাসপাতালেই যেতে হত।

মনোজ একটু হেসে বলে, আয়।

মনোজের মা বলে, এসো বাবা বোসো। অনেকদিন পরে এলে। ওর কাণ্ড দ্যাখো, কোনোদিন এই রকম করে মারা পড়বে।

মনোজ বলে, ভালোই হয়েছে, দুটো দিন একটু বিশ্রাম পাব। সকাল থেকে রাত নটা-দশটা পর্যন্ত বাইরে কাটে।

অত ধান্ধায় নিজেকে জড়িয়েছিস কেন ?

ধান্ধা আছে তাই জড়িয়েছি। এ তো আর কারও একার শখের ব্যাপার নয়, দশজনের দশরকম বাঁচার লড়াই—আমি বেচারা বাদ থাকব কেন ?

বেচারা নাকি !

মনোজ হেসে বলে, আজকের দিনে কার রেহাই আছে বল ? সবাই জড়িয়ে গেছে, কারও কম কারও বেশি। আমি কি আর বড়ো বড়ো কথা ভেবে যাই ? বাজার করা আপিস করার মতো করতে হয় তাই করি। তুই যে কী করে এ রকম গা বাঁচিয়ে চলিস আমি সত্যি বুঝতে পারি না।

মন যায় না যে।

তাই তো অবাক লাগে !

মনোজের মা রান্নাঘরে চলে গিয়েছিল, চা নিয়ে আসে ঘোমটা-টানা একটি বউ।

মনোজ বলে, অত বড়ো ঘোমটা দিয়ো না, এ আমার অনেক কালের বন্ধু, এক রকম ঘরের লোক। দু-হাতের কাপ দুটি নামিয়ে দিয়ে ঘোমটা কমিয়ে সুনীলের দিকে এক নজর তাকিয়ে সে চলে যায়।

অল্পবয়স, মনোজের সঙ্গে মানায় না। ময়লা রং, মুখের ছাঁদটি সুন্দর।

তাকিয়ে যাবার রকম থেকেই সুনীল টের পায় মেয়েটি বেশ চালাক-চতুর, বয়স কম হলেও হাবাগোবা নয়।

সুনীল বলে, কী ব্যাপার হল ?

মনোজ হেসে বলে, ব্যাপার আবার কী ? আমার লোকের দরকার, ক-মাস পরে আনতাম। তা মেয়েটা একটা বজ্জাতের হাতে যাচ্ছিল, আমিই বিয়ে করে নিয়ে এলাম।

মন গেল ?

মন ? এমনিতে এত তাড়াতাড়ি ফের বিয়ে করতাম না ঠিক। মনটা আজও বড্ড টাটায়। চেনা লোকের মেয়ে, একটা বদলোকের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছিল, নইলে দেরি করতাম, যদ্দিন না মনের ঘা-টা শুকোয়। তা ভেবে দেখলাম কী, বৈরাগ্য তো আর নিইনি, নেবও না, মা একা সামলাতে পারে না, ছেলেমেয়ে দুটো দেখার লোক চাই। দুদিন বাদে সেই বিয়ে করবই, এ মেয়েটাকেই বাঁচিয়ে দিই।

জগতের কথা মনে পড়ে সুনীলের। বুড়ো বয়সে আবার বিয়ে করার অন্য কারণ ছিল জগতের। মনোজের যুক্তিটা কত সহজ ও বাস্তব !

সুনীল বলে, তা ভালোই করেছিস। এত বয়সে দুটো ছেলেমেয়ে নিয়ে একটা কচি মেয়েকে বিয়ে করেছিস বলে আমি তোকে খোঁচা দেব না। এ রকম হাজার হাজার কচি মেয়ের যে রকম বিয়ে হয়, সে তুলনায় এর তো সুপাত্র জুটেছে, ভালো বিয়ে হয়েছে।

মনোজ খুশি হয়ে বলে, আমি ভাবছিলাম, তুই বুঝি গাল দিবি ! তোর একবার হল না, আমার তিন দফা হয়ে গেল—তাও আবার এত অল্পবয়সি বউ এনেছি !

সুনীল হেসে বলে, গাল দেব না কী করব এই ভয়ে আমায় কিছু বলিসনি তো ? সেটা আমি আগেই বুঝেছি। নইলে এতক্ষণ রক্ষা রাখতাম !

মনোজ একটু হাসে।

ডাক না একটু আলাপ করি ?

দুদিন যাক ভাই। মা চটে যাবে।

সুনীল সায় দিয়ে বলে, সেই ভালো। কিছু কিছু লোক আছে, সে দিনকাল আর নেই বলে যারা শুধু লাফায়—সব কুসংস্কার ভেঙে ফেল। কুসংস্কার ভাঙা ভালো, কিন্তু যা আপনা থেকেই ভেঙে যাচ্ছে সেগুলি নিয়ে অনর্থক হাঙ্গামা করে লাভ কী ? ক-দিন আর বাঁচবে তোর মা ? মরলেই তো সব কুসংস্কারও শেষ হয়ে গেল। ওই বুড়িকে ঢেলে সাজাতে চাওয়ার কোনো মানে হয় ?

বাস থেকে নেমে সুনীল একটু দাঁড়ায়।

মিলনী ?

না, মিলনীর সঙ্গে দেখা করার কোনো তাগিদই ভিতরে নেই। অথচ অনায়াসে কয়েক পা হেঁটে সে মিলনীর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে আসতে পারে। দুদিন আগেও যার সঙ্গে কথা বলতে এত ভালো লাগত !

অনাদিকে ঠেকাবার কী উপায় ঠিক করেছে খুলে না বলুক, সে টের পেয়ে গিয়েছে মিলনীর মনের কথা।

সাধারণ চালচলনে গোপন থাকা মিলনীর ভাবপ্রবণতার কথা ভেবে কয়েকদিন সে অত্যন্ত চিন্তিত হয়েছিল।

অন্য কিছু করা না গেলেও সে কী করবে ভেবে রেখেছে সেটা প্রকাশ করে না বলায় সুনীলের চিন্তা আরও বেড়ে গিয়েছিল।

খাপছাড়া কিছু করার কথা না ভেবে থাকলে তার কাছেও খুলে বলে না কেন ?

কয়েক দিন আগে আবার সে মিলনীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি শেষ উপায়টা কী ভেবে রেখেছ বললে না তো ?

এবারও মিলনী একই জবাব দিয়েছিল, পরে বলব।

আমাকে বলতে দোষ কী ?

দোষ আছে।

বলে মিলনী একটু হেসেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে সে হাসির মানে সুনীল বুঝতে পারেনি, বুঝতে কিছু সময় লেগেছিল। হাসিটা তার মনে হয়েছিল খাপছাড়া, তাই ভুলতে পারেনি। মিলনীর কাছ থেকে দূরে সরে যাবার পর ওই হাসির চমকপ্রদ মানেটা হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

অন্য উপায়ে যদি না ঠেকানো যায় অনাদির খপ্পরে গিয়ে পড়া তাহলে সুনীলকে অবলম্বন করে সে এই বিপদ-সমুদ্রে পাড়ি দেবার কথা ভাবছে !

আইনমতে একজনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলে কেউ তো আর তাকে অনাদির সাথে গাঁথতে পারবে না !

মিলনীর চিন্তাধারাও সুনীল অনুমান করতে পারে। অনাদি ভণ্ড প্রতারক। ভালোবাসা দূরে থাক, মিলনীকে সে অপছন্দ করে। এত বেশি অপছন্দ করে যে আরও অনেক বেশি টাকার লোভটাও সে তুচ্ছ করে দিতে পারে তাকে বিয়ে করা থেকে রেহাই পাবার জন্য।

এমনিতে সুনীলকে স্বামী করার সাধ তার নেই। কিন্তু অনাদিকে বিয়ে করার চেয়ে সুনীলকে বিয়ে করা অনেক ভালো।

বাপকে কিছু না জানিয়ে লুকিয়ে সুনীলকে বিয়ে করে অনাদির ব্যাপার সে জন্মের মতো চুকিয়ে দেবে।

খুব যে নতুন একটা উপায় মিলনী ঠাউরে রেখেছে তা নয়।

বাধা ডিঙিয়ে ভালোবাসা সার্থক করতে গোপনে বিয়ে চুকিয়ে দেওয়াটা কেবল নাটকে উপন্যাসে নয়, বাস্তব জীবনেও একটা সহজ সাধারণ উপায়।

নিজেকে বেশ খানিকটা বিপন্ন মনে হয় সুনীলের !

এক রকম রাজকন্যাই বলা চলে—রাজা বাপের টাকার হিসাবে। এক গরিবের মেয়েকে একটা বজ্জাতের হাত থেকে বাঁচাতে মনোজ তাকে বিয়ে করেছে বন্ধুবান্ধব কাউকে না জানিয়েই, কিন্তু একজন বিলাতফেরত মস্ত ঘরের উচ্চশিক্ষিত ছেলের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য মিলনীকে বিয়ে করা তার উচিত এবং সংগত মনে হবে না তো !

কর্তব্য করছে—নিজেকে এই অজুহাত দেখিয়ে ভেবে শেষ পর্যন্ত সে মিলনীকে বিয়ে করে বসবে না তো ?

সব সমস্যা মিটে যায়!

বাবাকে সে বলতে পারে, তিলে তিলে তোমাকে আর আত্মহত্যা করতে হবে না, চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে এবার তুমি খাও দাও ঘুমাও আর তীর্থ করো।

মা-কে বলতে পারে, রাজকন্যা বউ এনে দিয়েছি, এখন থেকে রাঁধুনি রাঁধবে, চাকরানি বাসন মাজবে—তুমি শুধু খাটে বসে থাকবে আর ঝি-রাঁধুনিদের হুকুম দেবে গরিব ছেলের রাজকন্যা বউয়ের রানি শাশুড়ির মতো।

লতাকে সে বলতে পারে, শাড়ি দেবে গয়না দেবে মোটরে চাপিয়ে হাওয়া খাওয়াবে সিনেমা দেখাবে এমন ছেলে তোকে এনে দিতে পারি, নয়তো ফেল করে করে সারাজীবন পড়তে চাইলে তোকে পড়াতেও পারি—কোনটা তুই চাস ·

এ কোনো অবাস্তব চিন্তা নয়। মিলনী আইনমতে প্রাপ্তবয়স্কা, কাউকে না জানিয়ে সে যদি আইনমতে তাকে বিয়ে করে, অবিনাশ যতই রাগুক যতই গালাগালি দিক, তাকে জামাই বলে না মেনে তার উপায় থাকবে না। মেয়ের মুখ চেয়ে জামাইকে নিজের আর্থিক স্তরে টেনেও তুলতে হবে তাকে !

তবে তার ভয় কীসের ? নিজেকে বিপন্ন ভাবে কেন ? এমন একটা সুযোগ কি সচরাচর আসে মানুষের জীবনে ? মিলনীকে নিজে চেষ্টা করে দেখার সময় পর্যন্ত না দিয়ে তার বরং তাকে গিয়ে বুঝিয়ে বলা উচিত যে তাড়াতাড়ি একুশ দিনের নোটিশে তার গলায় মালা দেওয়াই মিলনীর একমাত্র বাঁচবার উপায় !

সুনীল নিজের মনে হাসে।

বড়ো বড়ো ডিগ্রিওলা মহামহাপণ্ডিত অনাদির জীবন-জয়ের চেষ্টার মতোই হবে বইকী তার উদ্‌ভ্রান্তা মিলনীকে ধরে তার নিজের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা।

মিলনীর মতলব টের পাবার পর থেকে অকারণে যাবার সব তাগিদ ফুরিয়ে গিয়েছে সুনীলের। মুখে কিছুই বলেনি।

কিন্তু মনে মনে কথাটা যে মিলনী ভাবতে পেরেছে এটা কত বড়ো অপমান সুনীলের !

সুনীলকে দিয়ে অনাদিকে ঠেকাবার শেষ উপায়টা ঠাউরে নেবার পর মিলনী যে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে, মুখ থেকে কালো ছায়া সরে গেছে, এটা আরও কত বড়ো অপমান !

মিলনী জানে, তাকে বললেই সে তাকে গোপনে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাবে—এ দিক থেকে তার এতটুকু দুশ্চিন্তা নেই।

সুনীল ধন্য হয়ে যাবে, কৃতার্থ হয়ে যাবে। নিজেকে মহাভাগ্যবান মনে করবে।

অপমানের কথা সত্যই কিন্তু এই অপমানের কথা ভেবে সুনীলের গা-জ্বালা করে না।

চিন্তাটা এখনও মিলনীর মনে, তবু তার মনের কথাটা শুধু অনুমান করেই নিজের সঙ্গে তার যে লড়াই শুরু করতে হয়েছে মিলনীর কাছে অপমানিত হয়ে নিজের জীবনের অভাবের সমস্যাগুলি চুকিয়ে দিয়ে আরামে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবার লোভটার সঙ্গে—এটা তো আর গোপন বা মিথ্যা নয় তার নিজের কাছে।

মনের কথাটা মিলনী যখন মুখ ফুটে প্রকাশ করবে সে তখন কী করবে কে জানে !

মুদিখানার গগন ডাকে, বাবু শুনছেন ?

ধীরে ধীরে দোকানে ওঠে সুনীল। নানাচিন্তায় সে এমনি তন্ময় হয়েছিল যে গগনের ডাকে অত্যন্ত বিরক্তিবোধ করে।

গগন বলে, আপনার ভাইকে ধারে সিগারেট দিচ্ছি - আপনার ভাই বলেই দিচ্ছি। তবে কিনা আপনাকে একটু বলে রাখলাম কথাটা। এ নিয়ে রাগারাগি করবেন না

তুমি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দিচ্ছ গগন।

ও কথা বলবেন না বাবু। আপনার মর্যাদা আমরা জানি। আপনি হাঙ্গামা না ঠেকালে আমরা ডুবে যেতাম।

তাই বুঝি আমি মানা করলেও আমার ভাইকে ধারে সিগারেট খেতে দিয়ে তার শোধ নিচ্ছ?

গগন সখেদে বলে, কী জানেন, তেল নুন বেচলেও আমরা মানুষ তো? খানিকটা বুঝি তো মানুষের কারবার? উপদেশ ভাববেন না বাবু, আপনাকে উপদেশ দেবার সাধ্যি আমার নেই। তবে কিনা বিড়ি-সিগারেটটাও ডালভাতের মতো দরকারি হয়েছে। খালি পেট ভরে খেলেই কি প্রাণী বাঁচে? বুক ভরে নিশ্বেস নিতে হয় ক্ষণে ক্ষণে ওমনি প্রায় নিশ্বেস নেবার মতো হয়েছে বিড়ি সিগারেট টানা।

সুনীল আশ্চর্য হয়ে চেয়ে থাকে খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা মূর্খ মুদিওলা গগনের দিকে।

গগন বলে, আপনার ভাই এসে বললে আমি নিজের নামে স্লিপ কেটে ধারে সিগারেট নেব, দাদার কাছে টাকা এনে আমিই শোধ দেব। মিছে কথা বলছে বুঝলাম সুনীলবাবু, তবু ধারে সিগারেট দিলাম। আমার লোকসান যায় যাবে। সিগারেট দরকার আপনার ভায়ের। একটা কথা শুধাই আপনাকে, বেয়াদপি ভেবে নিয়ে রাগ করবেন না যেন। ভাইকে সিগ্রেট খাওয়ার হাতখরচটা দ্যান না কেন?

হাতখরচ দিই। দু একটা সিগারেট খেয়ে বিড়ি টানলে যথেষ্ট কুলিয়ে যায়।

সুনীল চেয়ে দ্যাখে, দোকানের পিছনে বাড়ির ভিতরে যাবার দরজা ফাঁক করে উঁকি মারছে একটি কচি কিশোরী মেয়ের পাকা মুখ।

তার জবাব শুনে মেয়েটি মুখ বাঁকায়।

গগনের মেয়ে সুভদ্রা। তাদের বাড়িতেও কয়েকবার ওকে সে দেখেছে।

প্রথমে ভেবেছিল লতার কাছে আসে এবং ভেবে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল লতার সঙ্গে কথা বলতে আসে মুদিওলা গগনের ওই শিক্ষাদীক্ষায় বঞ্চিতা অল্পবয়সে পাকা মেয়ে সুভদ্রা।

ওরা কী কথা বলাবলি করে কে জানে। তারপর লতাকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিল সুভদ্রা তার সঙ্গে আলাপ করতে আসে না, আসে অমিয়র কাছে পড়া জিজ্ঞাসা করতে।

কী পড়ে?

বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ, ফার্স্ট বুক, অঙ্ক — লতা হেসেছিল।

সুভদ্রা নিজেই যে শুধু মাঝে মাঝে পড়া বুঝতে আসে তা নয়, অমিয়ও নাকি মাঝে মাঝে গিয়ে ওকে পড়া বুঝিয়ে দিয়ে আসে।

এতক্ষণ মনে পড়েনি, সুভদ্রাকে দেখে সুনীলের কথাটা খেয়াল হয়।

নগদ টাকায় দাম পাবে না জেনেও তার ভাইকে গগনের ধারে সিগারেট খাওয়াবার উদারতার মানেও এতক্ষণে সুনীল বুঝতে পারে।

সিগারেটের দাম গগন অন্যভাবে আদায় করে নিচ্ছে।

সুনীল এক টিপ নস্য নিয়ে বলে, তুমি অনেক বকলে গগন। সংসারে কী জানো, সব কিছু জড়িয়ে আছে। আমার ভাইকে ধারে সিগারেট খাইয়ে তুমি ক দিক সামলাবে? তার চেয়ে বরং ওকে একটা চাকরি জোগাড় করে দাও। তোমার দোকানেই দাও না?

গগন আর দরজার আড়ালে সুভদ্রা তাকিয়ে থাকে, সুনীল রাস্তায় নেমে যায়।

লতা জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছে ? মাথা ফেটে গেছে একেবারে ?

না, বেশি লাগেনি। ভালোই আছে, বউ সেবা করছে।

লতা চমকে বলে, বউ ?

আবার বিয়ে করেছে বাঁদরটা। বেশ হয়েছে বউটা, খুব অল্প বয়েস।

ছিছি !

সব কথা শোনার আগেও লতা ছিছি করে, সুনীলের কাছে সব বিবরণ শুনেও লতা ছিছি করে। বলে, ও সব ছুতো সবাই দেয়। যার টাকা আছে সে তাহলে ও রকম দু-চারগন্ডা মেয়েকে বিয়ে করে বাঁচালে দোষ কি ?

কী ঝাঁঝ লতার কথায় !

কয়েকদিন রেণুর সঙ্গে দেখা হয়নি।

কীভাবে তরতর করে যে কেটে যায় কাজেব দিনগুলি !

ছুটির দিন মনে প্রশ্ন জাগে, একটানা খেটে যাওয়া ছাড়া জীবন থেকে কী পেলাম এই দিনগুলিতে ?

সকালে রেণু আসে।

প্রায় নির্বিকারভাবে তার হাতে একখানা ছাপা কার্ড তুলে দেয়।

কার্ডটা পড়তে পড়তে কয়েকবার সে মুখ তুলে তাকায় কিন্তু রেণুর মুখের ভাব বদলায় না।

রেণুর বিয়ে। একজন অধ্যাপকের সঙ্গে। রেণু তাই নিমন্ত্রণ করতে এসেছে।

খানিকক্ষণ তারা বাক্যহারা হয়ে থাকে। সুনীল খবরটা পেয়েছে আচমকা, তার পক্ষে কথা খুঁজে না পাওয়া আশ্চর্য নয়। কিন্তু রেণু অনেকদিন ভাববার ও অনুভব কবার সময় পেয়েছে, নিজের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র তার হাতে দিয়ে কী বলবে ভেবে এসেছে, সে কেন চুপ করে থাকে ? সুনীলই আগে কথা বলে।

আপনিও দলে ভিড়লেন ?

হ্যাঁ, একজনকে বাগাতে পেরেছি।

আপনার সঙ্গে এত ভাব ছিল ভদ্রলোকের, আমার সঙ্গে পরিচয় হল না ?

রেণু ধীরে ধীরে বলে, ভাব বিশেষ ছিল না, অল্পদিনের আলাপ। প্রায় চল্লিশের মতো বয়স হয়েছে, বিয়ে করার কথা ভাবছিল। ক-দিন আলাপ-পবিচয়ের পর একটা প্রস্তাব পেশ কবল। দুজনে ক-দিন আলোচনা করলাম, একটা বোঝাপড়া হল। আমিও বাজি হয়ে গেলাম। এই আর কী ব্যাপার !

মানুষটাকে চিনি না, তাই জিজ্ঞেস করছি বোঝাপড়া টিকবে তো ?

তা টিকবে। কচিখুকি তো নই, প্রেমেও পড়িনি যে মাথা গুলিয়ে ভুল করে বসব।

আবার দুজনে খানিকক্ষণ বাক্যহারা হয়ে থাকে। সুনীল আচমকা বলে, মিলনীর বিয়েটা বোধ হয় ভেঙে যাবে।

রেণু আশ্চর্য হয়ে বলে, কেন ?

সুনীল তাকে সব শোনায়। শুনে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে রেণু বলে, এ সব ছেলেমানুষি কথা। সে ধাঁচের লোকই নয় অনাদিবাবু।

টাকাটা নিয়েই তবে এ রকম ব্যবহার আরম্ভ করল কেন ?

কোনো একটা কারণ আছে নিশ্চয়। মিলনী বাড়িয়ে বলেছে। এর মধ্যে একদিন অনাদিবাবু এসে সব মিটিয়ে দিয়ে যাবেন।

রেণুর এতখানি বিশ্বাস অনাদির উপর ?

সুনীল টের পায় অনাদি সম্পর্কে মিলনীর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে তার মনে এখনও অনেক খটকা আছে, রেণুর কথায় আরও জোরালো হয়ে উঠেছে খটকাগুলি।

সত্যই তো। অনাদিকে কী করে এত নীচ ভাবা যায় ?

পরিষ্কার ব্যাপার, বাস্তব ঘটনা।

অথচ বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না।

নিজের ধারণা বিশ্বাস বিচারবুদ্ধি সব কিছুর বিরুদ্ধে যাচ্ছে ঘটনাটা—হিসাব করলে যা অসম্ভব বলে গণ্য করা যায় তাই যেন বাস্তবে সম্ভব হয়েছে।

অনাদির পক্ষে কী করে সম্ভব মিলনীকে এতদিন এভাবে ধাপ্পা দিয়ে আসা এবং তার কাছেও নিজেকে তেজি ন্যায়নিষ্ঠ শক্ত মানুষ হিসাবে নিজেকে এতদিন খাড়া করে রাখা ?

এতখানি নীচতা যার মধ্যে আছে তাকে কী করে এতদিন মহৎ মানুষ বলে সে ভুল করে এল ? দেশেবিদেশে বিদ্যা অর্জন করে কী এমনি চোখা হয়েছে অনাদির মতলববাজির বুদ্ধি আর হৃদয় থেকে এতখানি মিলিয়ে গেছে ন্যায় অন্যায়ের বোধ যে অনায়াসে এমন সহজভাবে স্বাভাবিকভাবে সে শিক্ষিত মহৎ মানুষের অভিনয় করে সকলকে ঠকাতে পারে ?

অনাদির টাকা নেওয়ার প্রশ্নটা মিলনীও বড়ো করেনি, সুনীলের কাছেও কথাটা গুরুতর নয়।

এ কথা তো স্থির করাই ছিল যে বিয়ের আগে সে যৌতুকের টাকাটা নেবে, পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভ করে কিছু কিছু উপার্জন হতে আরম্ভ হলে তাদের বিয়ে হবে।

ঠিক কথাই। দেশ বিদেশে সঞ্চয় করা বিদ্যা দিয়ে তো পেট ভরে না মানুষের।

বাড়ির অবস্থা ভালোই অনাদির। বিদেশ ঘুরিয়ে তাকে বিদ্বান করে আনতে এত পয়সা ঢালার পর আরও দু-একবছর তাকে এবং তার বউকে খেতে পরতে দিতে হলে বরং কৃতার্থই হয়ে যেত বাড়ির লোকেরা।

কিন্তু সে ব্যবস্থায় অনাদি রাজি হয়নি। উপার্জন সে করবে জানা কথাই। তবু উপার্জনের ব্যবস্থা ঠিক করে উপার্জন আরম্ভ করার আগে সে বিয়ে করবে না।

তার এই তেজ আর আত্মসম্মানবোধ মিলনীর মধ্যে শ্রদ্ধাই জাগিয়েছিল।

এ সবও তবে তার অভিনয় ?

টাকাটা বাগিয়ে নিয়েই মিলনীর সঙ্গে একেবারে উলটো ব্যবহার শুরু করে দেওয়া সত্যই তাহলে কত বড়ো বজ্জাতির পরিচয় অনাদির ? অনেকদিন ধরে ফন্দি আঁটা বজ্জাতির পরিচয় ?

তাকে এ রকম সাংঘাতিক লোক বলে জেনে, আগাগোড়া শুধু টাকাটা বাগাবার জন্যই সে ভালোবাসার ভান করে এসেছে জেনে, ওই মানুষটার সঙ্গে বাকি জীবনটা কাটাবার ভয়াবহ চিত্র কল্পনা করে মিলনী যদি নিজেই বিয়ে ভেঙে দেয়,—টাকাটা সে মফতে পেয়ে যাবে, মিলনীর দায়ও ঘাড়ে নিতে হবে না !

মিলনীর দায় !

কথাটার মানে তলিয়ে ভাবতে গিয়ে মাথা যেন ঘুরে যায় সুনীলের !

অবিনাশের আরও অনেক টাকা আছে, মিলনীকে বিয়ে করলে আরও টাকা আদায় করার সুযোগ পাবে—কিন্তু সে সুযোগও অনাদি চায় না।

অর্থাৎ মিলনীকে সে চায় না, মিলনার দায় সে টাকার খাতিরেও ঘাড়ে নিতে অনিচ্ছুক। যৌতুকের টাকাটা বাগাতে পারলেই সে খুশি।

অবিনাশের সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা আরও দুর্বোধ্য আরও অবাস্তব হয়ে ওঠে সুনীলের কাছে।

অবিনাশকে সে বলে, বিয়ের আগে এতগুলি টাকা অনাদিকে দেওয়া কি ঠিক হল?

অবিনাশ আশ্চর্য হয়ে বলে, কেন?

টাকাটা নিয়ে যদি গোলমাল করে?

অবিনাশ হেসে বলে, কী গোলমাল করবে?

যদি বিয়ে না করতে চায়?

অবিনাশ আবার আশ্চর্য হয়ে বলে, বিয়ে করতে চায় বলেই তো ভুকের টাকাটা আগাম নিয়েছে, যদি বিয়ে করতে না চায় মানে? তুমি কী বলতে চাইছ মোটেই বুঝতে পারছি না।

সুনীল তখন আর দ্বিধা না করে মিলনীকে বিয়ে করতে অনাদির অনিচ্ছার কথা প্রকাশ করে।

অবিনাশ কিন্তু নিশ্চিন্তভাবে বলে, কে বললে তোমায় অনাদি মিলনীকে বিয়ে করতে চায় না?

ওর ব্যবহার থেকে বোঝা যাচ্ছে। টাকাটা নেবার পর মিলনীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছে না।

ভালো ব্যবহার করছে না অর্থ কী?

আসা-যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। মিলনার সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলে না।

অবিনাশ একটু হাসে।

কে জানে মান-অভিমানের কী ব্যাপার হয়েছে ওদের মধ্যে। সে ওরা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নেবে। তার মানে বুঝি তোমরা ধরে নিয়েছ অনাদি টাকাটা নিয়ে এখন বিয়ে করতে চায় না? আমায় কি তোমরা এমনই বোকা পেয়েছ, ও রকম একটা বদলোকের কাছে মেয়ে দেব? আমার মেয়েকে চায় না শুধু আমার টাকা চায়—এ রকম জামাই আনব আমি? মানুষ চেনার ক্ষমতা একটু আছে আমার, নইলে আর এই বাজারে কারবার করে খেতে হত না।

অবিনাশও এতখানি বিশ্বাস করে অনাদিকে।

তবে এ কথাও তো সত্য যে অনাদিকে বিশ্বাস না করলে তাকে টাকা আর মেয়ে দিতেই বা সে রাজি হবে কেন। সে তো কন্যাদায়গ্রস্ত বিপন্ন মানুষ নয়।

সুনীল তবু ইতস্তত করে বলে, বিয়ের পর যদি খারাপ ব্যবহার করে?

অবিনাশ বলে, তোমরা বড়ো ছেলেমানুষ। খারাপ ব্যবহার করবে কেন? মিলনীকে পছন্দ করে বিয়ে করছে, ওর সঙ্গে বনবে না জানা থাকলে অনাদি কখনোই রাজি হত না। খারাপ ব্যবহারের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবে আমার মেয়ের যদি কোনো দোষ থাকে, অনাদি সেটা সংশোধন করা দরকার মনে করে, সে জন্য একটু শক্ত হতে পারে। সে তো ভালো কথাই। সেটুকু অধিকার স্বামীর থাকবে না?

মনোজও তার কাছে সব শুনে বলে, আমিও কিছুই বুঝতে পারছি না ব্যাপার। ও রকম শিক্ষিত মার্জিত বিবেচক মানুষ, সকলের সঙ্গে এমন সুন্দর কথা ব্যবহার, মিলনীর সঙ্গে এত ভাব—সে এ রকম একটা কাণ্ড করে বসবে? আমারও বিশ্বাস হচ্ছে না।

বেণু অবিনাশ আর মনোজের কথায় আরও মাথা ঘুরে যায় বলে সুনীল একটা দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত করে বসে।

নিজে সে অনাদির কাছে যাবে। ব্যাপার বুঝে আসার চেষ্টা করবে।

অনাদির বাড়িতে এই তার প্রথম যাওয়া। বাড়িটা দেখেই সে একটু আশ্চর্য হয়ে যায়। বেশ বড়ো বাড়ি, পুরানো আভিজাত্যের ছাপ আছে বাড়িটাতে কিন্তু সেটাও একেবারে সেরেসে আভিজাত্য।

বাড়ির সামনে ছোটো একটা বাগান। সেই বাগানে গাছের ডাল টেনে নুইয়ে পেয়ারা পাড়ছিল একটি তরুণী মেয়ে।

বাড়ির চেহারা যতই সেকেলে হোক, মেয়েটির পুরোমাত্রায় আধুনিক বেশ। তাই দ্বিধা না করেই সুনীল অনাদিকে ডেকে দেবার কথা বলতে তার দিকে এগিয়ে যায়।

পেয়ারা গাছের ডাল ছেড়ে দিয়ে মেয়েটি চলে যায় বাড়ির ভিতরে।

খানিক পরে বেরিয়ে আসে মিহি ধুতি ও গলাবন্ধ কোট পরা বড়ো এক ভদ্রলোক। সুনীলের অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে ভদ্রলোক অনাদির বাবা।

আরেকটা কথা অনুমান করতেও তার দেরি হয় না যে অনাদিদের পরিবারটি সম্পর্কে তার যে ধারণা ছিল সেটা ঠিক নয়।

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবার কিন্তু পরিবারটিকে আধুনিক বলা যায় না কোনোমতেই।

কাকে চান ?

অনাদিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।

ঘরে এসে বসুন।

অনাদির বাবার কথা বলার ধরনটা ধীর স্থির অমায়িক। ধীরে ধীরে স্থিরপদে চলা। এ যুগের জীবনের তীব্র গতিশীলতা যেন নাগাল পায়নি অনাদির বাবার।

অনাদি ভিতর থেকে বেরিয়ে এলে দেখা যায় বাড়িতে সেও ধীর স্থির গম্ভীর।

হাসিমুখে না হলেও অমায়িকভাবেই সে বলে, আসুন, আসুন। কী খবর সুনীলবাবু ?

খবর আপনি বলবেন। আমি শুধু জানতে এসেছি।

বসুন। কী খবর জানতে চান ?

সুনীল বড়োই বিপন্নবোধ করে। এতক্ষণে সে টের পেয়েছে কতখানি দুঃসাহসে ভর করে সে নাক গলাতে এসেছে অনাদির ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপারে আত্মীয় বা বন্ধু না হয়েই।

বাড়ি বয়ে এসে গায়ে পড়ে অপমান করার জন্য ইচ্ছা করলেই অনাদি রেগে উঠতে পারে, গালাগালি দিয়ে অপমান করে তাকে দূর করে দিতে পারে বাড়ি থেকে।

তার কিছুই বলার বা করার থাকবে না।

তবে অনাদি জানে মিলনীর সে বন্ধু, শ্রদ্ধেয় বন্ধু। এইটুকুই শুধু তার ভরসা।

একেবারে সোজাসুজি খোলাখুলি কথা বলি অনাদিবাবু ?

অনাদি স্থিরদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। মুখে কিছুই বলে না। কোন ব্যাপারে সে এসেছে সেটা খানিকটা যে অনাদি অনুমান করতে পেরেছে সেটা আশ্চর্য নয়।

সুনীল আবার বলে, আপনি বুঝতেই পারছেন আপনার পক্ষের কী খবর জানতে এসেছি। খোলাখুলি কথা না বললে কথা পেড়ে কোনো লাভ নেই। একবার ভেবে দেখুন। আমি সমালোচনা করতে আসিনি—সে অধিকার যে আমার নেই আমি ভালো করেই তা জানি। আমি শুধু ব্যাপারটা জানতে বুঝতে এসেছি। যদি আমার নাক গলানো পছন্দ না করেন- আগেই সেটা জানিয়ে দিলে ভালো হয়। আসল কথা না পেড়ে দু চারমিনিট এ কথা ও কথা বলে আমি বিদায় নিতে পারি।

মিলনী কি আপনাকে পাঠিয়েছে ?

না। তবে আমি ওর পক্ষ থেকেই আসছি। ব্যাপার যা বুঝব হয়তো ওকে বলতে হবে—অবশ্য যদি দরকার হয়।

আপনি ভারী চালাক মানুষ সুনীলবাবু।

বোকা নই, এটুকু জানি।

অনাদি খানিক চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলে, বেশ, কী বলবেন বলুন। খোলাখুলি কথাই হবে। তাড়াহুড়ো করবেন না, চা আনতে বলি।

চা-খাবার এনে দেয় বাগানের সেই অবিবাহিতা মেয়েটি, তাকে এগিয়ে আসতে দেখেই যে বাড়ির ভিতরে চলে গিয়েছিল। অপরিচিত লোকের সঙ্গে সে কথা বলে না, কিন্তু মানুষটা দাদার পরিচিত জানবার পর চা-খাবার দিতে অনায়াসেই সামনে আসে।

তার মুখের ক্লিষ্টতার ছাপটা সুনীলের খুবই চেনা।

সাধারণ সেকেলে মধ্যবিত্ত পরিবারের একেলে হয়ে উঠতে খুব বেশি হাঙ্গামা হয় না, কিন্তু এ রকম সেকেলে অভিজাত পরিবারের একেলে হওয়াটা বড়োই কষ্টকর প্রক্রিয়া। কত কিছু যে ভাঙতে হয়, ভেঙে যেতে দিতে হয় !

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সে কথা তোলে।

মিলনী বলছিল, টাকাটা বাগিয়ে নিয়েই আপনি ওকে অবহেলা করছেন।

সে তো মিলনী বলবেই।

ওর কী দোষ ? টাকাটা নেবার আগে এক রকম ব্যবহার করছিলেন, টাকাটা নেবার পরেই একেবারে অন্য রকম হয়ে গেলেন। মিলনীর তো এ রকম মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক যে টাকাটা বাগিয়ে নিয়ে আপনি এখন ওকে—

সুনীল কথাটা শেষ করে না।

অনাদি চুপ করে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে দেখে সুনীল আবার বলে, আমাদের মনেও খটকা লেগেছে। একটা তো মানে আছে আপনার টাকা নিয়েই দুর্ব্যবহার শুরু করাব ?

দুর্ব্যবহার ?

মিলনী তাই বলছে।

অনাদি বলে, সোজা সহজ ব্যাপারে মিলনী এত রং চড়াতে চাইলে আমি কী করব বলুন ? যেতে বলেছে যাইনি—ব্যস্ত আছি, কিন্তু ঠিক সে জন্য নয়। আমি অন প্রিনসিপল যাইনি, যাওয়া উচিত নয় বলে যাইনি। মিলনী ধরে নিয়েছে, এটা বুঝি আমাদের ভালোবাসার বিয়ে—আমরা দুজনেই সব ব্যবস্থা করছি। আসলে এটা আর দশটা সাধারণ বিয়েব মতোই ব্যাপার—বরপক্ষ কন্যাপক্ষ দরদস্তুর ঠিকঠাক করে বিয়ের ব্যবস্থা করেছে। যৌতুকের টাকাটা আমি বিয়ের আগে নিয়েছি। অনেকেই এ রকম নেয়।

ভালোবাসার বিয়ে নয় ?

নিশ্চয় নয়। ওর বাবা আগে আমার বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন, সব ঠিকঠাক করেছেন,—তারপর আমায় ডেকে মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন। আগে ছিল কনে দেখা, আজকাল একটু রকমফের হয়েছে। একদিন কনে দেখে পছন্দ-অপছন্দের বদলে দু-চারদিন মেলামেশা করতে দেওয়া।

তর্কের কথা নয়, বুঝবার কথা। মনে মনে অনাদির কথাগুলির সঙ্গে নিজের ধারণা ও বিশ্বাসগুলিকে খাপ খাওয়াতে খাওয়াতে সুনীল বলে, বেশ তো। তাই নয় হল। এটা ভালোবাসার

বিয়ে নয়। এতদিন প্রায়ই দেখা করতেন, যৌতুকটা নিয়েই কেন একেবারে আড়ালে ঠেলে দিলেন মিলনীকে ?

সেটাই নিয়ম বলে। কনে দেখা হয়েছে, পছন্দ করা হয়েছে, বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, এখন আবার কেন কনের সঙ্গে আগের মতো মেলামেশা চালাব ?

বুঝতে পারলাম না।

কী করে বুঝবেন ? আপনারা ধরে নিয়েছেন আমাদের বিয়েটা একটা রোমাঞ্চকর রোমান্সের ব্যাপার। শুধু আমার আর মিলনীর ব্যাপার, আর কোনো প্রশ্ন নেই। আপনারা সব ব্যাপার জানেন না, আমাদের মেলামেশা দেখে আপনারা ও রকম মনে করলেও করতে পারেন। কিন্তু সব জেনেও মিলনী এ রকম ভাবে কেন ? বিয়ের আয়োজনটা করেছে দুটো পরিবারে—বিয়ের পর মিলনীকে নিয়ে আমি ভিন্ন ঘর বাঁধব না —বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি এসে ওকে বউ সেজে ঘরকন্না করতে হবে।

সুনীল অনাদির দেওয়া সিগারেটটা ধরিয়ে বলে, মিলনীকে কিছু না জানিয়ে যৌতুকের টাকাটা নিলেন কেন ?

ওকে জানাব কেন ? কনের সঙ্গে পরামর্শ করে কেউ বিয়ের যৌতুক নেয় নাকি ?

কনে কিন্তু জানতে পারে। বাপের কত টাকা যাচ্ছে, কখন কীভাবে যাচ্ছে—

মিলনীও ইচ্ছা করলেই জানতে পারে। আমরা বাপব্যাটা মিলে দলিলে সই করে ওর বাবার কাছে টাকা নিয়েছি—দলিলটা দেখতে চাইলেই হয়।

দলিল ?

আইনসঙ্গত কন্ট্রাক্ট। মিলনীকে বলবেন, ন্যাকামি না করে কী রকম দলিল সই করে টাকাটা নিয়েছি যেন বাপের কাছে জানবার চেষ্টা করে।

তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে অনাদি যোগ দেয়, বাপ দলিলে সই করাবে, মেয়ে করবে ন্যাকামি। আমার তো একটা বিচার-বিবেচনা আছে ? ভবিষ্যতের হিসাবনিকাশ আছে ? এ রকম একটা মিথ্যা ধারণা বজায় থাকলে কত রকম অসম্ভব অবাস্তব প্রত্যাশা জাগবে, সে সব যখন মিটবে না—আমাদের অবস্থাটা কী দাঁড়াবে ? আমরা সাধারণভাবে মেলামেশা আলাপ-আলোচনা করেছি--তার ফলে যদি দুজনের ভালোবাসা জন্মেই থাকে-- জন্মেছে। কিন্তু আর সবকিছু ছোটো করে ওটাকেই ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তোলার উপায় তো আমাদের নেই। আমাদের সাধারণ বিয়ে– ভালোবাসার অত মিথ্যে রং চড়ালে আমাদের চলবে কেন ?

মিলনীকে এ সব বুঝিয়ে বলেননি কেন ?

বুঝিয়ে দেবার জন্যই ওর ন্যাকামিকে প্রশ্রয় দেওয়া বন্ধ করেছি। বলার চেয়ে এতে আরও ভালো করে বুঝবে।

একটু থেমে সে যোগ দেয়, ওকে এটা বোঝানো দরকার না হলে কঠোরভাবে নিয়মটা পালন করতাম না—মেলামেশা কমিয়ে দিলেও বজায় রাখতাম।

সুনীল খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করে, মিলনীর ন্যাকামির কথা বলছেন। যার ন্যাকামি পছন্দ হয় না, তাকে নিয়ে কী করে সুখী হবেন ?

অনাদি একটু হেসে বলে, এ সব ছেলেমানুষিপনার ন্যাকামি—ভুল ধারণার ন্যাকামি। ভুল ধারণা শুধরে দিলেই এ সব ছেলেমানুষি সেরে যাবে। আমরা সুখী হব না কেন ? পরস্পরকে আমাদের পছন্দ হয়েছে। হয়তো ভালোবাসাও জন্মেছে। আমি তো আর সেটা অস্বীকার করছি না ! তবে মানিয়ে চলতে হবে, ভালোবাসার নামে ন্যাকামি চলবে না।

সুনীল বলে, ও !

অনাদির কথা শুনে এবার মনে মনে হাসবে না গম্ভীর হবে সুনীল ভেবে পায় না।

একবার অনাদির বিচারবুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হয়, আবার মনে হয় সবটাই তার ছেলেমানুষি, ন্যাকামি।

হয়তো মিলনীর চেয়েও রোমান্সের রোমাঞ্চ অনাদি বেশি চায়—সাধারণ রোমান্স একঘেয়ে হয়ে গেছে বলে একটু বাঁকাপথে নাটকীয়ভাবে রোমান্সের ব্যবস্থা করেছে।

মিলনীর প্রাণপণ চেষ্টা তাদের বিয়েটাকে ভালোবাসার বিয়েতে দাঁড় করানো।

অনাদির প্রাণপণ চেষ্টা তার এই ন্যাকামিকে এতটুকু প্রশ্রয় না দেওয়া।

গুরুজনদের ঘটকালিতে তাদের সাধারণ চলতি বিয়ে।

উভয়পক্ষে দরদস্তুর করে যৌতুক ইত্যাদি স্থির করে নিয়ে ব্যবস্থা করা বিয়ে।

এর মধ্যে প্রেমের প্রশ্নই ওঠে না।

একটু ব্যতিক্রম শুধু করা হয়েছে এই যে একদিন আধঘণ্টা দেখাশোনা জিজ্ঞাসাবাদ পরীক্ষা নিরীক্ষার বদলে কিছুদিন স্বাধীনভাবে পরস্পরের মেলামেশার মধ্যে পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করা। অনাদিই নাকি এটা দাবি করেছিল।

পরস্পরকে কেন তবে তারা পছন্দ করল?

অনাদি অমানুষ নয়। যৌতুকটা তার কাছে প্রধান নয়।

মিলনীর ন্যাকামিপনা তার সয় না, তবু সে ওই মিলনীকেই পছন্দ করেছে।

অনাদি যৌতুক নিয়ে তাকে বিয়ে করবে জেনেও মিলনী তাকে পছন্দ করেছে।

দুজনের চরম অমিল।

তবু তারা মিলতে চায়।

নীতি নিয়ম রুচি প্রবৃত্তিতে তাদের বিরোধ, কাব্যিক ভালোবাসা কুৎসিত হয়ে গেছে তাদের জীবনে—তবু তারা আনুষ্ঠানিক প্রথায় মিলতে চায়।

কেন এটা ভালোবাসা নয়?

রাত দশটা বাজে।

খিদেয় পেট জ্বলছে।

লতা খেতে ডাকতে এলে সুনীল বলে, একটা খাম পোস্টকার্ড দিতে পারিস?

নেই তো দাদা।

বাড়িতে খাম পোস্টকার্ডও থাকে না?

রাখলেই থাকে। তোমরা এনে রাখবে না তবু থাকবে কী করে? সেনেদের বাড়ি থেকে খাম চেয়ে কিনে নিয়ে এলাম, তবে বাবা জরুরি চিঠিখানা লিখল।

লতা একটু হাসে।

ওরা কিছুতে দাম নেবে না—আমিও কিছুতে দুআনা না দিয়ে খামটা নেব না। খামের দামটা নিয়ে সে যে কী এক লড়াই হল কী বলব তোমাকে!

সুনীল জিজ্ঞাসা করে, বাবার হঠাৎ জরুরি চিঠি লেখা দরকার হল কেন?

তোমার জন্য দরকার হল। সতেরো-শো টাকা নগদ দেবে, তেরো ভরির গয়না দেবে। মেয়ে দেখতে সুন্দর, স্কুলে পড়ে আবার গানও জানে।

সুনীল হাসিমুখেই বলে, খিদে পেয়েছে। ইয়ার্কি না দিয়ে জায়গা করবি যা তো?

খুঁজে পেতে একটা পুরানো ময়লা সাদা খাম সে জোগাড় করে। লতার অঙ্কের খাতার একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে মিলনীকে চিঠি লেখে।

লেখে :

অনাদি তোমায় ভালোবাসে। তুমিও অনাদিকে ভালোবাস। নিজেবা বুঝেশুনে ব্যবস্থা করো। আমার কিছু বলারও নেই, কবাবও নেই।

বাড়িতে খাম না থাকায় বিযাবিং চিঠি দিলাম।

খামে ডানদিকে মিলনীব ঠিকানা লিখে সুনীল বাঁদিকে স্পষ্ট অক্ষরে নিজের নাম ঠিকানাটা লিখে দেয।

কাব চিঠি না জানলে মিলনী হয়তো ডবল দাম দিয়ে বিযাবিং চিঠিটা নিতে অস্বীকার কবতেও পাবে।

তেইশ বছর আগে পরে

তেইশ বছর আগে পরে

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

তেইশ বছর আগে পরে প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

প্রথম অধ্যায়

তেইশ বছর আগে ছাত্রজীবনে একটি করুণ কাহিনি রচনা করেছিলাম। 'অতসী মামি' নিয়ে গল্প লেখা শুরু করার পর এটি আমার দ্বিতীয় লেখা। কাহিনিটি প্রকাশিত হয়েছিল বিচিত্রায়। সম্পাদকেবা নতুন লেখকের রসালো গল্পও স্বেচ্ছায় খুশি হয়ে ছাপেন বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে এটা প্রমাণ করার জন্য লেখা অতসী মামি বার হবার পর বিচিত্রা-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় উপেনদার তাগিদ আর উৎসাহেই দু-নম্বর কাহিনিটি লেখা হয়। অতসী মামিও করুণ রসে ফেনানো কাহিনি। পরে এই কাহিনিটির নাম দিয়ে গল্প সংকলন বার করতে আমার দ্বিধা হয়নি। কারণ, বস যাই থাক, যতই রোমান্টিক হোক, ওটা ছিল সম্পূর্ণ গল্প। ওই কাহিনি-সংকলনের মধ্যে অতসী মামি-র পরেই ব্যথার পূজা-কে ঠাঁই দেবার লোভ সামলাতে নিজের সঙ্গে কী লড়াইটাই কবতে হয়েছিল অনভিজ্ঞ তরুণ লেখক আমাকে !

এ তো গল্প নয়। এ যে অসম্পূর্ণ কাহিনি। মাসিকের পাতায় জীবনের খণ্ডিত একপেশে অসম্পূর্ণ কাহিনি ছাপানোর ছেলেমানুষির জের তো গল্প সংকলনে টানা চলে না !

কাহিনিটিকে সম্পূর্ণতা দেবার দাযিত্বই কেবল নয়, বাস্তবকে ফাঁকি দিয়ে আর সত্যকে আড়ালে রেখে কীভাবে ফেনিল ভাবালুতার গল্প লেখা যায় সেটা দেখিয়ে দিয়ে সাহিত্যে ব্যথার পূজা-র নজির বাতিল করার দায়িত্বও আজ তেইশ বছর পরে পালন করছি।

দু-একটি সামান্য ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে বিচিত্রায় প্রকাশিত অসম্পূর্ণ কাহিনিটি অবিকল তুলে দিয়ে আমাদের উপন্যাস আরম্ভ করা যাক :

১

বন্ধুব জীবনেব কাহিনি।

যে বয়সে যৌবন বিদায় নেয় না সেই বয়সে বন্ধু পৃথিবী হতে চিরতরে বিদায় নিয়েছে। তার ব্যথার পূজা সমাপ্ত হয়েছে কি হযনি সে প্রশ্নের জবাব আজ আর মিলবে না। জীবনের ওপারে, যেখানে দুঃখলেশহীন অফুরন্ত আনন্দ-উৎসবের অপরিম্লান হাসিই শুধু ব্যাপ্ত হয়ে আছে শুনতে পাই, সেখানে গিয়ে যদি তার দেখা পাই, তবে হযতো এ প্রশ্নের জবাব পাব।

এক-একটি অভিশপ্ত জীবনে এক-একটি বিশিষ্ট ক্ষণে মরণের প্রলোভন কী দুর্জয় হয়েই না দেখা দেয়। বেদনায বিকল প্রাণ দেহের বন্ধন কাটিয়ে দেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। জীবন হয় রসহীন, তিক্ত ; মরণ হয় মধুর। বন্ধুর জীবনে তেমনি একটি ক্ষণ এসেছিল। কিন্তু ইহজগতে থেকেই দিনের পর দিন স্তূপীকৃত হয়ে ওঠা বেদনার আগুনে নিজেকে শুদ্ধ করবার আশায় মৃত্যুর সেই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা সে জয় করেছিল। এপারের ব্যর্থ সাধনায় ওপারের জীবনকে সার্থক করে তুলবার জন্য সে বেঁচেছিল বলেই আজ এই কল্পনাতীত বেদনার্ত কাহিনি বলবাব সুযোগ আমি পেয়েছি ; নাহলে কোথায় কবে এক দীর্ণ আত্মা অস্বাভাবিক উপায়ে স্বাভাবিককে বরণ করে নিত, নিখিল অন্তরে যার আনাগোনা তিনি ছাড়া এতটুকু আভাসও হয়তো কেউ পেত না।

তার তপস্যার, তার সুতীব্র সাধনার সমাপ্তি হয়ে গেছে। গেছে যাক। চোখে আমার জল আসে আসুক। বিরাম নেই, বিচ্যুতি নেই, ক্ষণিকের বিস্মৃতি নেই, সুদীর্ঘ তেরো বছরের প্রত্যেকটি অনুপল সে জ্বলেছে। অতল বিস্মৃতির অন্ধকারে তার বেদনা ঢাকা পড়ুক স্বপ্নহীন চিরনিদ্রার কোলে তার দীর্ণ

হৃদয় অনন্তকাল ঘুমিয়ে থাকুক। তার কথা ভেবে চোখের জল ফেলি, কিন্তু এ ছাড়া আমার অন্য কামনা সে বেঁচে থাকতেও ছিল না।

উচ্ছ্বাস থাক, ভালো লাগে না। বেদনার সমুদ্রের পরিচয় দিতে খানিকটা ফেনা তুলে দেখিয়ে লাভ নেই, লজ্জাও করে।

নাম জগদীশ—। ঢাকা শহরে আমাদের ছিল পাশাপাশি বাড়ি। কবে তার সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়েছিল, ভুলে গেছি। তার বাবা ছিলেন টাকার কুমির না কী বলে তাই। তাদের রাজপ্রাসাদের পাশে আমাদের বাড়িটা নিতান্ত খাপছাড়া দেখাত নিশ্চয়, কিন্তু কেন যে এই বাড়িটা জগদীশের ভালো লেগেছিল সেই জানে। জন্মেই মা-কে হারিয়েছিল, আমার মা-র কাছেই তার দিন এবং রাত্রির বেশিরভাগ সময় কাটত। বাবা তার ছিলেন ভারী ভালো মানুষ। টাকার গদিতে বসেও যারা তুলোর গদি ছাড়া বসবার জন্য কিছু পায় না তাদের ছোটো মনে করতেন না। জগদীশ যে আমার সঙ্গে মিশত তাতে তাঁকে খুশি হতেই দেখেছি।

তেইশ বছর বয়স পর্যন্ত আমাদের বন্ধুত্ব জমাট বাঁধল, তারপর হল ছাড়াছাড়ি। একসঙ্গে এম এ পাস করে আমি চাকরি নিলাম এবং একটি ছোট্ট মেয়ের জীবনের সঙ্গে বাকি জীবনটা গেঁথে ফেললাম। জগদীশ সে সব কিছু করল না, বাপের কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকা নিয়ে মস্ত জাহাজে চেপে বসল।

মনে পড়ে প্রশ্ন করেছিলাম, কী পড়তে যাচ্ছিস রে ?

ছোঃ ! পড়তে নয়, বেড়াতে। যাবি ?

বিয়ে করে ফেললাম যে !

ওই তো দোষ ! করলি কেন ? বউদি অভিশাপ দেবে তাই, নইলে তোকে কি ফেলে যেতাম রে !

পূর্ব হতেই স্থির ছিল বিদাযের সময় কেউ মুখভাব করতে পারব না। হাসিমুখেই কথা বলছিল, কিন্তু যখন আমার নেমে আসার সময় হল চকিতে তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। আমার গলা জড়িয়ে ধরে তেইশ বছরের বন্ধু আমার কাঁদল !

যাবার সময় কাঁদল কিন্তু দু-বছরে চিঠি লিখল মোটে তিনখানা ! জগদীশকে চিনতাম, চিঠিপত্র লেখা তার ধাতসই নয়।

জগদীশের বাবা ডেকে পাঠালেন।

চিঠিপত্র পাও ?

আজ্ঞে না। জানেন তো চিঠি লিখতে ওর কত আলস্য।

ভাবনা হচ্ছে যে হে ! যে ছেলে !

বললাম, আজ্ঞে, এমনিই তো চিঠিপত্র লেখে না, তার ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে !

একটা টেলিগ্রাম করব কি না ভাবছি। কোথায় আছে তাও কী ঠিক জানি ছাই ! চরকির মতো ঘুরছেই তো খালি।

বৃদ্ধ একটা নিশ্বাস ফেললেন।

বছর চারেক পরে জগদীশ দেশে ফিরল। ফিরবার ইচ্ছা বিশেষ ছিল না, বাপের কঠিন অসুখের খবর পেয়ে বাধ্য হয়েছে ফিরতে।

তার আসার দিন পাঁচেক আগেই তার বাবা মারা গেছেন। শ্রাদ্ধের পর মাস তিনেক বাড়ি থেকে কলকাতায় চলে গেল। তারপর দশ বছর আর সাড়াশব্দ নেই। মাঝখানে কেবল খবর শুনলাম, সে তার সর্বস্ব দান করেছে। অদ্ভুত দান ! বাড়িঘর বিষয়-সম্পত্তি যা ছিল সব বিক্রি করে একটা ফান্ড করে দিয়েছে বাংলা থেকে প্রতি বৎসর দুটি মেয়েকে মিউজিক শিখবার জন্য বিলাতে পাঠাতে।

যে বছর বাঙালি মেয়ে পাওয়া যাবে না সে বছর ভারতবর্ষের যে কোনো প্রদেশের মেয়েরা ওই বৃত্তি পেতে পারবে।

কিছুকাল পরে রাঁচি থেকে একটি পোস্টকার্ড বন্ধুর বার্তা বহন করে আনল। জরুরি দরকার কিছু টাকা চেয়েছে।

কিছুই মাথায় ঢুকল না। রাচি শহর নয়, চিঠি লিখেছে একটা কটমটে নামযুক্ত গ্রাম থেকে। রাঁচির অভ্যন্তরে এক বিকট নামের এবং খুব সম্ভব নামের চেয়েও বিকটতর গ্রামে আমার বাল্যবন্ধুটি কী করছে এতকাল পরে জরুরি প্রয়োজন জানিয়ে সামান্য ক টা টাকা বা চেয়ে পাঠাল কেন, অনেক ভেবেও প্রশ্ন দুটির জবাব পেলাম না।

সবস্ব দান করার খবরটা যদি সত্যও হয় বাপের রাশি রাশি টাকা থেকে নিজের দরকার মেটাবার মতো টাকাও কি সে রাখেনি ?

সেইদিন রাত্রের এক্সপ্রেসে রওনা হলাম। রাচিতে এক বন্ধু থাকতেন, তিনিই খবর নিয়ে জানালেন গ্রামটি হুড্রু ফলস যেতে মোটরের শেষ স্টপেজ। এই গ্রামের পর মাইল দেড়েক হেটে ফলসে যেতে হয়।

তৎক্ষণাৎ ট্যাক্সি নিয়ে বার হলাম। ষোলো মাইল ভালো এবং মাইল আষ্টেক খারাপ রাস্তা পার হয়ে গন্তব্যস্থানে যখন পৌঁছলাম তখন চারটে বাজে। শীতের বেলা এরই মধ্যে রোদের তেজ কমে গেছে।

যেখানে মোটর থামল তার হাত কয়েক দূরে খড়ের ছাওয়া কতগুলি মাটির ঘর। মোটরের শব্দে কোমরে তিন হাত চটের মতো মোটা কাপড় জড়ানো জন পাঁচেক লোক ছুটে এল। নিজের একাণ্ড আধুনিকত্ব নিয়ে প্রকৃতির একেবারে অন্তর রাজ্যে প্রবেশ করে মোটরটি বোধ হয় লজ্জিত হয়ে পড়েছিল, ড্রাইভারের ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র নিঃশব্দ হয়ে গেল। আমার মনে হল যে সভ্যতা ও আধুনিকতা চব্বিশ মাইল পিছনে ফেলে এসেছি তারই একটা অস্ফুট আওয়াজ কানে আসছিল হঠাৎ সেটিও বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু ও তো গেল কবিত্বের দিক। জগদীশ কি সত্যি এইখানে বাসা বেঁধেছে ? ঠাট্টা করেনি তো ? দশ বছরের নীরবতার পর এমনি একটা পরিহাস করবে সেটাই বা কেমন কথা।

একটি লোককে কাছে ডেকে প্রশ্ন করলাম, এখানে এক বাঙালিবাবু আছে রে ?

বংগালি বাবা ? হঃ।

বাবু নয়, বাবা। সন্ন্যাসী হয়ে গেছে নাকি ?

কোথায় থাকেন ? ঘর চিনিস ?

কুটিরগুলির পিছনে আকাশের দিকে আঙুল বাড়িয়ে লোকটা সংকেত করল।

তাকেই সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হলাম। আনাচকানাচ দিয়ে খানপাঁচেক ঘর পার হয়ে দেখা গেল অন্য কুটির থেকে একটু তফাতে একখানা ঘর দাড়িয়ে আছে। সামনে গিয়ে ডাকলাম, জগদীশ ?

জগদীশ ভেতরে ছিল বাইরে এসে চমকে উঠল। এতদূরে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি এ কথা যেন কোনোমতে সে বিশ্বাস করতে পারছে না এমনিভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

জগদীশই বটে। মানুষ বদলায়, তার নাম বদলায় না নইলে জগদীশ বলে এর পরিচয় দিতে বাধত। চার বছর ইউরোপ বাসের পর দামি বিলাতি পোশাক পরা যে লোকটি ঠোঁটের এক কোণ দিয়ে সিগারেট চেপে ধরে অন্য কোণে সাহেবি হাসি ফুটিয়ে সজোরে আমার হাত ধরে নাড়া দিয়ে প্রীতি জানিয়েছিল, সে যদি জগদীশ, এই ময়লা চটে কোমর থেকে হাঁটু অবধি ঢেকে, খালি গায়ে খালি

পায়ে, একমাথা রুক্ষ চুল আর জীর্ণ শীর্ণ বিবর্ণ দেহ নিয়ে যে লোকটি আমার সামনে এসে দাঁড়াল তাকে জগদীশ বলব কোন মুখে ?

নীচে নেমে এসে আমার দুটি হাত চেপে ধরে বলল, স্বপ্নেও ভাবিনি তুই আসবি ভাই ! এখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। ভেতরে আয়।

সে না হয় যাচ্ছি, কিন্তু এ কী কাণ্ড বল তো ? এখানে কী করছিস ? এমন চেহারা হয়েছে কেন ? কতদিন আছিস এখানে ?

ম্লানমুখে হাসি ফুটিয়ে বললে, সব বলব, ভেতরে আয়, পাতার কুটিরের প্রাসাদে চাটাইয়ের সিংহাসনে বসিয়ে আজ তোর অভ্যর্থনা করব। এতদিনে আমায় ভুলিসনি ! এত দূরে ছুটে এসেছিস বন্ধুকে দেখতে !

হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেল। ছোটো ঘর, হাত দশেক লম্বা, হাত আষ্টেক চওড়া। এককোণে কয়েকটা হাঁড়ি-কলসি। একপাশে উনুন, তার কাছে মাটির বেদির ওপর কালিমাখা গুটি-দুই হাঁড়ি। একদিকে খাওয়ার জলের কলসির কাছে একটা অ্যালুমিনিয়ামের গেলাস ছাড়া সমস্ত ঘরে ধাতব বাসন আর চোখে পড়ল না। অন্য পাশে খড়ের গদিতে চাটাই বিছানো—জগদীশের রাজশয্যা ! বালিশ নেই, বাড়তি এবং ছেঁড়া কাপড় মাথার কাছে পুঁটলি করা আছে।

এমনি সব আসবাবের মাঝে নিতান্ত খাপছাড়া একটি অপূর্ব আসবাব চোখে পড়ল। বিছানার পাশে, সিল্কের রুমাল ঢাকা দামি মেহগনি কাঠের ছোট্ট একটি জলচৌকি। তার ওপরে একটি চওড়া পাড় শাড়ি। শাড়িটির জায়গায় জায়গায় লালচে দাগ, বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

ওটা কী রে ?

যেন নিতান্ত বিস্মিত হয়েছে এমনিভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে ব্যথিত স্বরে জগদীশ বললে, অমন করে বলছিস যে ? বুঝতে পারছিস না ? আমার স্ত্রীর কাপড়।

স্ত্রীর কাপড় ! জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাইলাম।

স্বপ্নের জড়তা কাটাতে মানুষ যেমন নিজের মাথায় ঝাঁকুনি দেয় তেমনিভাবে মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে জগদীশ যেন নিজেকে প্রকৃতিস্থ করে নিল। লজ্জিত কণ্ঠে বলল, তুই যে জানিস না খেয়াল ছিল না ভাই। সব বলব, তখন বুঝবি। তোর কাছে পয়সা আছে ? ব্যাগটা বার করে তার হাতে দিলাম। একটা সিকি বার করে জগদীশ ডাকল, জিরাই।

দরজার কাছে পাঁচ-সাতজন লোক বসেছিল, একজন সাড়া দিল, আজ্ঞে বাবা ?

কিছু দুধ আর কলা জোগাড় করে নিয়ে আসতে হবে যে বাবা !

আমি হাঁ করে জগদীশের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। এ কী কণ্ঠস্বর ! এ কী বলবার ভঙ্গি ! ঠিক যেন প্রবীণা গৃহিণী। পরের ছেলেকে কাজে পাঠাবার সময় এমনি অননুকরণীয় কণ্ঠে তাঁরাই অনুরোধ জানান বটে ! সংসারের ছোটোবড়ো ঝঞ্ঝাটে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে যারা, অথচ যাদের জীবনের সমস্তটুকুই নিহিত আছে ওই ঝঞ্ঝাট ভোগ করার মাঝে, তাদেরই শান্তি আর ক্লান্তির ছায়াপাতে অপূর্ব মুখচ্ছবির এ কী অবিকল প্রতিলিপি আমার এই বাল্যবন্ধুটির মুখে ফুটে উঠল !

ক্ষুধায় নাড়ি জ্বলছিল, দুধকলা আর মোটা চিড়ার ফলার অমৃতের মতো লাগল। বাইরে ছোটো বারান্দাব মতো ছিল, জলযোগের পর সেইখানে গিয়ে বসলাম। তারপর দুজনের যে সাধারণ খবরাখবর আদান-প্রদান এবং সুখ-দুঃখের গল্প চলল তার সঙ্গে এ কাহিনির সম্বন্ধ নেই।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। শীতের সন্ধ্যা, তবু আমার মনে হল এ সন্ধ্যারও যেন একটা নিজস্ব মাধুর্য আছে। আর সেই মাধুর্যের খোঁজ মেলে এমনি এক নির্জন, নিঃশব্দ সভ্যতার বাঁধন-খসানো অখ্যাতনামা

গ্রামে পাতার কুটিরে ছেলেবেলার বন্ধুর পাশে বসে। যতদূর দৃষ্টি চলে,—অনন্ত বৃক্ষশ্রেণি। সবুজ আর সবুজ। সেই সবুজ গাঢ় হতে হতে সবুজের সীমা ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে কালো হয়ে ওঠে।

জগদীশ হঠাৎ বলে, শহরে ফিরে যাবি তো ?

এই চব্বিশ মাইল ফিরে যাব ?

কিন্তু এখানে কি রাত কাটাতে পারবি ভাই, ভারী কষ্ট হবে ?

বললাম, তুই যদি এতকাল এখানে কাটাতে পেরে থাকিস, একটা রাত কাটাবার ক্ষমতা আমার হবে।

জগদীশ একটু ভেবে বললে, আমায় কিন্তু জিরাইয়ের মেয়ে রেঁধে দিয়ে যায়, খাবি তো ?

তুই খাস, আমি খাব না ?

জগদীশের সংকোচ তবু গেল না, ইতস্তত করে বললে, বিছানা নেই, কিছু নেই—

বাধা দিয়ে বললাম, নেই তো নেই ! এই চাটাইয়ে পাশাপাশি শুয়ে দুই বন্ধুতে গল্প করেই রাত কাটিয়ে দেব।

খানিক পরে জিরাইয়ের মেয়ে হাজির হল। আঁটোসাঁটো গড়ন, বিধাতা গায়ের রংয়ের দোষ পুষিয়েছেন অতিরিক্ত যৌবন দিয়ে। শরমকুণ্ঠিত পদে জল আনতে চলে গেল। জল এনে মশলা বেটে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে অস্ফুটস্বরে কী বলল, বুঝতেই পারলাম না।

জগদীশ বললে, আচ্ছা যা। মাছ পাস তো আনিস।

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চলে গেল।

জগদীশ বললে, আমি হলাম জিরাইয়ের বাবা, সেই সূত্রে ওর দাদামশাই। তোকে দেখে আজ মুখ খুলল না অন্য দিন কত গল্পই করে। স্বামীটা পাঁড় মাতাল, দিনরাত তাড়ি গেলে আর ওকে ধরে মারে। কিন্তু মেয়েটা সেই মাতালটাকেই যে কী ভালোবাসে ভাবলে অবাক হয়ে যাই। জাত-অজাত মানে না, ভদ্র-অভদ্র জানে না, মার্জিত-অমার্জিত মনের খবর রাখে না, ভালোবাসা বিধাতার কী অপূর্ব সৃষ্টি তাই ভাবি। অমন চেহারা, মাতালটাকে ছেড়ে যে কোনো ভালো লোককে বিয়ে করতে পাবে, ওদের সমাজে তাতে দোষ নেই। সবাই উপদেশও দেয় তাই। ও শুনে ঘাড় নেড়ে বলে, কবব। কিন্তু করে না। আমি একবার বলেছিলাম, জবাব দিয়েছিল, কী করব ভাইয়া, ওকে ছাড়তে মন কাঁদে ! আশ্চর্য !—জগদীশ একটা নিশ্বাস ফেলল।

এখানে কেন সে এভাবে আছে এ প্রশ্নের জবাবে সে বলল, আজ নয় ভাই, কাল সকালে বলব—দিনের বেলা।

চাটাইয়ে পাশাপাশি শুয়ে গল্প করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, অনেক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। জলচৌকিটির সামনে হাঁটু গেড়ে নিস্পন্দ হয়ে জগদীশ বসে আছে। তার সমস্ত মুখ আমার নজরে পড়ছে না, যেটুকু পড়ল তাতে আমার বুকের ভেতর টনটন করে উঠল। একবার জগদীশের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নত করে সে শাড়িটিকে চুম্বন করল। সে কী চুম্বন ! মনে হল শাড়িটির ভাঁজে ভাঁজে, প্রত্যেকটি সুতার পাকে পাকে সুধা সঞ্চিত হয়ে আছে, অধরের স্পর্শ দিয়ে অনন্তকাল জগদীশ সে সুধা পান করে যাবে। কতক্ষণ পরে হিসাব ছিল না, জগদীশ মাথা তুলল। মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে চাইতেই দেখলাম তার দুচোখ জলে ভরে গেছে। তাড়াতাড়ি চোখ বুজে নিঃশব্দে পড়ে রইলাম। তার বুক ভাঙা দুঃখের এমন অপূর্ব প্রকাশের সাক্ষী হয়ে যে রইলাম, সে কথা গোপনই থাক।

নিজে থেকে যদি বলে, শুনব। যার যা বেদনার সম্পদ সে তার গোপন থাকাই শ্রেয়।

পরদিন অতি ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। জীবনের এতগুলি বছর কাটিয়ে দেবার পর সেইদিন প্রথম অনুভব করলাম পাখির ডাকে ঘুমভাঙা জিনিসটা সত্যি সত্যি কী। কিচিরমিচির প্রলাপ, কিন্তু

কী মিষ্টি ! যেন প্রভাতকে বরণ করে নেবার বরণডালায় লক্ষ প্রাণীর প্রকাশব্যাকুল আনন্দ-প্রদীপের শব্দিত শিখা !

ড্রাইভার এসে সেলাম জানিয়ে বললে, কখন ফিরবেন বাবু ?

বাহুল্য প্রশ্ন। আসল কথা, ভালো রকম সেলামির ব্যবস্থা না করলে সে আর এই জঙ্গলে পড়ে থাকতে রাজি নয়। তাই করা গেল।

বেলা বাড়ল। জগদীশকে বললাম, ফলস দেখে আসি চল।

জগদীশ ঘাড় নেড়ে বললে, এখন নয়, বিকেলে।

প্রায় তিনটের সময় জগদীশ আমাকে ফলস দেখাতে নিয়ে চলল। উঁচুনিচু বাঁকাপথ। কোথাও সর্ষেখেতের বুক ভেদ করে গেছে, কোথাও ছোটোবড়ো পাথরের টুকরো দিয়ে নিজেকে ঢেকে ফেলেছে। অর্ধেক পথে ছোটো একটি নদী পড়ল। আসলে ঝরনাই ; এরা বলে নদী। হেঁটেই পার হওয়া যায়। গোটা পনেরো মহিষ স্নান করছিল, সেই মহিষবাহিনীর সেনাপতিকে দেখে আমি হেসে ফেললাম। বছর পাঁচেকের একটা উলঙ্গ ছেলে সকলের বড়ো মহিষটার পিঠে গদিয়ান হয়ে তারস্বরে আদেশ জারি করছে। এই ধুমসো কালো দৈত্যগুলিকে আগলাবার ভার পড়েছে এই পুঁচকে মানব সন্তানটির ওপরে ! হাসির কথাই !

জলপ্রপাতের মৃদু গুঞ্জনধ্বনি কানে আসতে বুঝতে পারলাম, কাছে এসেছি। আরও কিছুদূর অগ্রসর হতে শব্দ বাড়ল এবং দেখা গেল পাথরে ঠাসা নদীগর্ভে জলস্রোত বয়ে চলেছে। শীতকাল, জল বেশি নেই।

জগদীশ আঙুল বাড়িয়ে বললে, ওই পাথরের ও পাশে চল। সেখানে চারশো ফিট নীচে এই জলের ধারা আছড়ে পড়ছে। পাথরে পাথরে পা দিয়ে প্রপাতের মুখের কাছে এসে দাঁড়ালাম।

নর্মদার বিপুল জলরাশির বিপুলতম পতনের সৌন্দর্য দেখে এসেছি। আজ বুঝলাম বিপুলতাই সব নয়, সৌন্দর্য ক্ষুদ্র বৃহতের অপেক্ষা রাখে না। নর্মদা সুন্দর, কিন্তু এই যে গুচ্ছ গুচ্ছ সৌন্দর্যের ফুল ফুটে আছে এখানে শ্যামসুন্দর রূপ তরুর শাখায়, এরও তো তুলনা বোধ হয় নেই !

চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল, ওস্তাদ শিল্পী বটে ! এ যেন ছবির মাঝে চঞ্চল জীবনের প্রকাশ। পাথর নড়ে না, পাহাড় নড়ে না, চতুর্দিকের তরুশ্রেণির শাখায় বাতাসের বেগে যে দোলা জাগে তাও চোখে ধরা পড়ে না, সব যেন তুলি দিয়ে আঁকা নিশ্চল ছবি। তার মাঝে এই পাহাড়ি ঝরনা জীবন্ত, এর প্রাণ আছে, এ চঞ্চল। প্রতি মুহূর্তে বিরামহীন গতিতে চারশো ফিট নীচে লাফিয়ে পড়ে নিজেকে চূর্ণ করে শুভ্র কুহেলির জাল বুনে সূর্যকিরণের রশ্মি-বিশ্লেষণে অপূর্ব শোভা ফুটিয়ে তুলছে !

পাশ দিয়ে ঘুরে নীচে নামলাম। নীচে থেকে সবটুকু জলধারা দৃষ্টিগোচর হয়। মুগ্ধ হয়ে দেখলাম। সূক্ষ্ম জলকণা ঝরনার প্রীতিস্পর্শ জানিয়ে দিল। ওপরে যখন উঠলাম তখন চারটে বেজে গেছে এবং হাঁফ ধরে গেছে।

একপাশে প্রকাণ্ড একটি মসৃণ পাথর পড়েছিল। দেখলেই বোঝা যায় মানুষের হাত পড়েছে। বললাম, আয়, এই পাথরটাতে বসি।

অগ্রসর হতেই জগদীশ আমার হাত চেপে ধরে বললে, না।

চেয়ে দেখি তার মুখ অস্বাভাবিক বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

হাত ধরে সেই পাথরের পাশে অন্য একটা পাথরে বসিয়ে বললে, বলছি।

সেইখানে প্রপাতের একটানা ছন্দের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সে তার কাহিনি বলে গেল।

২

তেইশ বছর বয়স পর্যন্ত ঘরের কোণে কাটিয়ে যখন বাইরে পা দিলাম তখন এই কথা ভেবে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না যে মানুষ ঘরের কোণটা আঁকড়ে থাকে কী সুখে। কী সে বাইরের রূপ। দেশে দেশে প্রকৃতির নব নব রূপের বিকাশ, দেশে দেশে মানুষের বিভিন্ন নিজস্ব বৈচিত্র্যময় জীবনযাত্রা প্রণালি। এই দুয়ে, প্রকৃতি আর মানুষে মিলে বাইরেটাকে কত বড়েই না বাড়িয়েছে। রূপসি ধরণী। বিচিত্রা।

বাবা জানতেন পড়তে গেলাম। ছাই পড়া। আমি তখন মানুষকে পড়ছি। দেড়শো কোটি নরনারীকে অনেকগুলি পরিচ্ছেদে ভাগ করে ভগবান যে বইটি লিখেছেন সেই বইখানা পড়ছি। অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ আমায় কী শেখাবে?

মুক্তির উন্মাদনা, বাধন ছেঁড়ার দৌড়ে চলা, সে যে কী জিনিস বলবার ভাষা নেই। কিন্তু কী আশ্চর্য এই সৃষ্টি। মুক্তির আনন্দকে নিবিড়তর করে তুলবার জন্য চারিদিকে কত বন্ধনই ছড়িয়ে আছে।

নারী।

সে অদ্ভুত সৃষ্টি বিধাতার। পথ চলতে দেবে না। মনের আনন্দে জীবনের পথে গান গেয়ে চলেছ শ্রান্তি ক্লান্তির লেশমাত্র নেই, কণ্ঠে অপূর্ব করুণা ফুটিয়ে বলবে, পথিক, বড়ো শ্রান্ত তুমি, বিশ্রাম চাই না? এসো তোমায় নতুন পাথেয় দেব। দেয়। কিন্তু দেবার ফাঁকে ফাঁকে পায়ে শিকল বাঁধে।

লিওনবার্ গভাচারেক আত্মীয়বন্ধু বললে, চলো চার্চে।

ভারতবর্ষের বাঙালির ওপর ওদের একটা বিশ্রী লোভ আছে। লিওনবার হাতে হাজার কয়েক টাকা গুঁজে দিতেই তার আত্মীয়বন্ধুরা ঠান্ডা হয়ে গেল।

নোটের তাড়া নিয়ে রুমালে চোখ ঢেকে লিওনবা বললে, বন্ধু, তুমি কী নিষ্ঠুর।

একটা তৃতীয় নেত্র হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করল।

আমি তখন কনস্টান্টিনোপলে। কলেজের আহমেদকে মনে পড়ে? তারই এক খুড়োর বাড়িতে। ইচ্ছা ছিল ভদ্রলোকের বাড়িতে দিন দুই আতিথ্য গ্রহণ করে আফ্রিকাটা ঘুরে আসব। শুনেই খুড়োর মেয়েটি ঠোঁট ওলটালে।

থেকে গেলাম।

দিন কুড়ি পরে খুড়োটি মুখ অন্ধকার করে বললে, সরি। গো। গো আমি নিজেই করতাম, সেইদিনই বাবার অসুখের সংবাদ পেয়েছিলাম।

জগদীশ কতক্ষণ নিঃশব্দ থেকে ধীরে ধীরে বলল, আজ আমার একমাত্র সান্ত্বনা ভাই, আমার কথা তাদের মনে নেই। থাকেও না। তারা আমার যৌবনকে যে জাগরণে জাগিয়েছিল সেই জাগরণই আমার জীবনকে অভিশপ্ত করে দিয়েছে। ওই দুটি নারী যদি প্রথম যৌবনে আমার অন্তরের ব্যাকুল কামনাকে অমন করে উত্তেজিত করে না তুলত তবে হয়তো আজ আমার এমন করে জ্বলতে হত না। তারা আমায় ভুলেছে, তাদের যে ক্ষতি আমি করেছিলাম আমার ক্ষতির কাছে সে ক্ষতি তুচ্ছ হয়ে গেছে। তবু, বিদায় নেবার কালে তাদের অনুচ্চারিত অভিশাপবাণী আজও এক-একসময় আমার নিশ্বাস বন্ধ করে আনে। যাক।

জাহাজেই তাকে দেখি। মন ভারী খারাপ ছিল। ডেকচেয়ারে কাত হয়ে চোখ বুজে নিজের অদৃষ্ট চিন্তা করছিলাম। চোখ মেলেই দেখলাম, অদূরে রেলিংয়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সূর্য তখন পশ্চিমে হেলে

পড়েছে, আর একটু নামলেই সাগরের জলে ডুবে যাবে। পড়ন্ত সূর্যের সোনালি আভা তার মুখে এসে পড়েছে। চোখে আমার কী ভালোই যে লাগল। পলক পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। আমার সমগ্র সত্তা মুগ্ধ হয়ে অপরিচিতা মেয়েটির অপরূপ সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে রইল।

রূপ ? রূপ বইকী ! দৃষ্টিকে সম্মোহিত করে মনের ভেতরে যে জিনিস অমন আলোড়ন জাগিয়ে তুলতে পারে তাই তো রূপ ! সে বছর সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর সেরা রূপসি বলে যে স্বীকৃত হয়েছিল, তাকে দেখে এসেছিলাম ; তার রূপের সঙ্গে এ রূপের এতটুকুও নৈকট্য নেই। সে রূপ দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম, মুগ্ধ হয়েছিলাম এবং চোখের আড়াল হতেই একঘণ্টার ভেতরে ভুলেও গিয়েছিলাম। কিন্তু সেদিন সেই বাঙালি তরুণীর রূপ দেখে মনে হয়েছিল, সে যেন আমারই অন্তরের আনন্দ-প্রদীপের বিচ্ছিন্ন শিখা। এতকাল পরে হঠাৎ দেখা দিয়ে আনন্দের আলোকচ্ছটায় আমার অন্ধকার অন্তর উদ্ভাসিত করে তুলেছে !

সূর্যদেব অস্ত গেলেন।

পশ্চিমের আকাশের গাঢ় রক্তবর্ণের শেষ চিহ্নটুকু ঘনায়মান কালোর মাঝে লুপ্ত হয়ে গেল। জাহাজে আলো জ্বলে উঠল। ধীরে ধীরে সে চলে গেল।

পরদিন আলাপ হল।

প্রথম দিন একাই দেখেছিলাম, পরদিন বিকেলে ডেকে এল এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে। ডেকে আর বাঙালি ছিল না, ভদ্রলোক বারবার আমার দিকে তাকাতে লাগলেন। নিচু গলায় তরুণীকে কী বলায় স্পষ্ট বোঝা গেল সে আপত্তি করছে। কিন্তু তার আপত্তি করার মর্যাদা না রেখেই ভদ্রলোক আমার সামনে এসে বললেন, নিশ্চয় বাঙালি ?

বাংলাতে বললাম, সন্দেহ আছে !

ভদ্রলোক ভারী খুশি। মাথা দুলিয়ে বললেন, ঠিক, সন্দেহ থাকতেই পারে না, বাঙালির বৈশিষ্ট্য যাবে কোথা। হা হা হা ! সেই জন্যই তো যেচে আলাপ করা। বাঙালি বলে চিনতে কি আর পারিনি ? ও হল যাহোক কিছু বলে কথা আরম্ভ করা। আপনি বিরক্ত হবেন ভেবে আমার মেয়ে তো আপত্তিই করছিল।

বিরক্ত হব ? আপনারা বিরক্ত হবেন ভয়েই তো আমিও যেচে আলাপ করবার চেষ্টা করিনি !

ভদ্রলোক আরও খুশি। হাসতে হাসতে বললেন, ভাগ্যে আপনার বিরক্ত হবার রিস্কটুকু নিয়েছিলাম। নাহলে এক জাহাজে থেকে বাঙালি হয়েও পরস্পরের পরিচিত না হওয়ার কলঙ্ক থেকে যেত।

আমিও হাসলাম।

নাম শুনলাম, অনন্তলাল। কলকাতার অ্যাটর্নি। পরিচয় ছিল না, নাম আগেই শুনেছিলাম।

বাবাকে চিনতেন, বিষয়সূত্রে পরিচয়। বাবার নাম শুনেই আপনি থেকে একেবারে তুমিতে নেমে গেলেন। দশ বছরের ছেলের মতো আমার পিঠ চাপড়ে সস্মিত মুখে বললেন, খাসা লোক তোমার বাবা। তাঁর ছেলেও যে তাঁরই মতো খাসা হবে সন্দেহ নেই।

মনে মনে হাসলাম। না থাকে ভালোই।

মি. সেন দেখলাম মনে-প্রাণে নিতান্তই বাঙালি। সাহেবের সঙ্গে হয়তো সাহেবি এটিকেট বজায় রেখেই আলাপ করেন, আমার সঙ্গে আলাপ করলেন একেবারে বাঙালি প্রথায়। তখন আমি ভীষণ সাহেব, নকল কি না, আসলকে ছাড়িয়ে উঠবার চেষ্টা করছি। কিন্তু তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারে এটিকেটের অভাব থাকলেও রাগ করতে পারলাম না। খুশিই হলাম। চিত্রার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ওর জন্যই এবার বিলাত-ভ্রমণটা হয়ে গেল। মিউজিক শিখছিল, এইবার ডিগ্রি পেয়েছে। আমার ছেলে শরৎ আইন পড়ছে, দুজনে একসঙ্গেই গিয়েছিল। তার পড়া শেষ হয়নি,

কাজেই মেয়েকে ফিরিয়ে আনবার জন্য নিজেকেই যেতে হল। বিলাতে শিক্ষা পেলে কী হবে, বাঙালির মেয়ে তো। একা ফিরবার সাহসটুকু নেই। চিত্রা সকোপে বলল, মিথ্যে নিন্দে করছ বাবা। আমি তো একাই ফিরব ঠিক করেছিলাম, টেলিগ্রাম করে বারণ করেছিল কে ?

আমার নাম শুনেই চিত্রা যে চমকে উঠেছিল সেটা স্পষ্ট দেখেছিলাম। বিলাতে শিক্ষা পেয়েছে, কিন্তু সে যেন কী রকম নার্ভাস হয়ে পড়ল। কী কারণে জানি না বরাবর দেখেছি মেয়েরা প্রথমটা আমাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। বেশ বুঝি, আমার সঙ্গে পরিচয় না হলেই যেন তারা খুশি হত। একজন তো স্বীকার করেছিল, প্রথম দিন আপনাকে দেখে ভারী ভয় পেয়েছিলাম মি. মিত্র।

সকৌতুকে প্রশ্ন করেছিলাম, কেন বলো তো ?

কিছুতেই বলবে না, শেষে মুখ লাল করে বলেছিল, কী জানি। আপনার এমন মিষ্টি স্বভাব, কিন্তু প্রথম দিন মনে হয়েছিল আপনার ভেতরে কী যেন আছে, আঘাত করবে।

ব্যাপারটা অনুভূতির, ওটা বরং বুঝতে পারি। কিন্তু আমার নাম শুনে চমকাবার কী আছে ভেবে পেলাম না।

বললাম, কাল তো আপনাকে দেখিনি মি. সেন।

কাল ভয়ানক মাথা ধরেছিল। ওর মা তো কালকের সামান্য দোলানিতেই শয্যা নিয়েছেন।

মিসেস সেন সঙ্গে এসেছেন নাকি ?

হ্যাঁ, ছাড়লেন না। বললেন, এই সুযোগে বিলাত দেখা না হলে আর হবে না।

চিত্রা বলল, দেকে খুব সম্ভব মা-কে দেখতে পাবেন না মি. মিত্র। জাহাজ পোর্ট ছাড়ার পরেই শুয়েছেন, আবার পোর্টে জাহাজ পৌঁছলে উঠবেন। আপনি কী পড়তে গিয়েছিলেন মি. মিত্র ?

পড়তে নয়, বেড়াতে।

বেড়াতে ! সত্যি ! কোথায় কোথায় ঘুরলেন ?

ঘুরেছি অনেক, আজ চার বছব ওই কাজই তো করছি !

আমেরিকায় গিয়েছিলেন ?

ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম।

চিত্রা মি. সেনের দিকে চেয়ে বলল, বাবাকে কত বললাম, চলো বাবা ঘুরে আসি। আর কি আসা হবে !

সস্নেহ অভিযোগ। মৃদু অভিমানের ছায়ায় চিত্রার মুখখানি অপূর্ব হয়ে উঠল। মি. সেন কন্যার ডান হাতটি হাতের মুঠোয় টেনে নিয়ে সস্নেহে বললেন, সময় হল না যে রে ! আর তোর মা সঙ্গে রয়েছেন, অত ঘোরা কি তার পোষায় ?

চিত্রা বললে, বুঝি তো ! তবু—

মি. সেন বললেন, তবু দুঃখটা চেপে রাখতে পারি না। ভাবনা নেই রে, আমেরিকা তোর দেখা হবে। সেকালের রাজাদের মতো আমিও না হয় একটা পণ ঠিক করে দেব যে বিয়ের পর আমার মেয়েকে আমেবিকা বেড়িয়ে আনবার প্রতিজ্ঞা করবে, তবে মেয়ের বিয়ে দেব।

চিত্রার মুখের ওপর কে যেন সিঁদুর ছড়িয়ে দিল, বললে, যাও ! তুমি বুঝি সেকেলে রাজা ?

আরে রাজা হওয়া তো সোজা ! তোর মতো একটি রাজকন্যা মেয়ে থাকলেই হল।

৩

মনেব সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রয়োজন হল না ; স্পষ্টই বুঝলাম চিত্রাকে আমার চাই। এ চাওয়ার হাত থেকে আমার মুক্তি নেই। রূপ হিসাবে সেই তুর্কি মেয়েটির কাছে চিত্রা হয়তো দাঁড়াতেও পারবে না, কিন্তু সে মেয়েটির রূপ ছিল শুধু দেহের সৌন্দর্য। অন্তরের ছায়াপাতে তার বাইরের রূপ মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠেনি। সে চেয়েছিল খেলা করতে, আমিও চেয়েছিলাম তাই। অন্তরের যোগ না থাকায় তাই তার অমন রূপও আমার অন্তরে রেখাপাত করতে পারেনি।

চিত্রার রূপের স্পর্শে আমার সেই জ্বালা-ভরা রূপপিপাসা তেমনভাবে সাড়া দিল না। তাকে পাবার কামনা অপূর্ব মধুর বেদনার রূপ নিয়ে আমার অন্তরে ভবে গেল। প্রথম দর্শনে ভালোবাসা কাব্যের কথা ; সে সব কিছু নয়। কিন্তু কেমন যেন একটা নতুন রকম অনুভূতি। চিত্রাকে চাই, কিন্তু এতদিন যেভাবে চেয়েছি সেভাবে নয় মনে হল কোথায় যেন একটি ফুলের কুঁড়ি ফুটে উঠছে, আমার এতদিনকার চাওয়া দিয়ে চিত্রাকে কামনা করামাত্র সে কুঁড়িটি ঝলসে পুড়ে যাবে, ফুটবে না।

অনেক রাত পর্যন্ত ডেকে বসে নিজের অন্তবকে একবাব বুঝবার চেষ্টা কবলাম।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, আকাশে অনেক তারা। কোনোটি শুধু চেয়ে আছে, যেন যে মহাশূন্যে চিরদিনের জন্য তাব স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেছে তার সীমা কোথায় গিয়ে মিশেছে সে কথা ভেবে পলক হারিয়ে ফেলেছে। কোনোটি চপল বিরাট আকাশের বিপুল গাম্ভীর্যের মাঝে থেকেও চোখ টিপে টিপে কেবলি ইশারা করে চলেছে !

নিজেকে বড়ো ছোটো, বড়ো অপদার্থ মনে হতে লাগল। কেউ বলে দিল না কিন্তু অন্ধকারে বসে একটা অহেতুক বেদনার সঙ্গে আমার মনে হল, অসংযত যৌবন যেন ধাপে ধাপে আমায পশুত্বের দিকে ঠেলে দিয়েছে। জানি সবই, যৌবনের যত জয়গান, নরনারীর সম্পর্ক নিয়ে বড়ো বড়ো পণ্ডিতের যত গভীর গবেষণা, বিশ্বসাহিত্যের নতুন প্রবাহে যৌবন বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব—জানতে তো বাকি ছিল না কিছুই ! যৌবন যখন হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠেছিল তখন মনে প্রাণে বিশ্বাসও করেছি, পাপ-পুণ্য মিথ্যা, নবনারী পরস্পরের জনাই সৃষ্ট হয়েছে, তাদের মিলনকে নিয়ন্ত্রিত কববাব অধিকার সমাজ ধর্ম কারুবই নেই ! তখন জেনেছি, হিসাব করে যৌবনকে খরচ করা ভয়ের পরিচয়, যৌবনের পঙ্গুতার পরিচয়, যৌবনের পঙ্গুতার লক্ষণ।

কিন্তু সেদিন অন্ধকার নিশীথে মনে হয়েছিল—তাই কী ? অসংযত যৌবনের পরিচর্যা করা পশুধর্মের কতটুকু উপরে ? দোষ না থাক, লক্ষ লক্ষ ঈশ্বর বিশ্বাসীব মতে যা অন্যায়, যা পাপ তা শুধু স্বভাবের নিয়ম হোক, বিজ্ঞান অঙ্ক কষে স্থির করুক, প্রেম-ভালোবাসা সমস্তই সেই স্বভাবের চিরন্তন দাবির রূপান্তরমাত্র, কিন্তু সেইটুকুই কি সব ? তবে সেই স্বভাবের নিয়ম মেনেই যে দুটি নারীর সঙ্গে খেলা করে এলাম তাদের কথা ভেবে আমার মনে এ আগুন জ্বলে কেন ?

সংস্কার ?

আজন্ম অভ্যস্ত ভালোমন্দের জ্ঞান ?

সেও তো স্বভাবেরই নিয়ম !

হায় রে, তখন তো বুঝিনি ! দেহের যৌবনকে বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম অস্ত্রে বিশ্লেষণ করে যে সত্য আবিষ্কৃত হল, সে যে সত্য তা অস্বীকার কবা চলবে না, কিন্তু সেই সত্যের মাপকাঠিতে মনের যৌবনের বিচার করি কোন যুক্তিতে ? বিকৃত যৌবন দেহের অণুতে পরমাণুতে যে অত্যুগ্র জ্বালা ধরিয়ে দেয়, তাবই জের টেনে চলি মনের দোবগোড়া পর্যন্ত। সে যৌবন যতখানি জ্বলে, ধূমোদ্‌গার করে তার চেয়ে অনেক বেশি। সেই ধূমের স্পর্শে মনের শুদ্ধতম, শুভ্রতম শাশ্বত যৌবন মলিন হয়ে যায়। জ্ঞানের হাটে তখন তাকে দেহের যৌবনের সঙ্গে একদামে বিক্রি করি ! আমারই মতন সর্বহারা

দুঃখের মাঝে যারা যৌবনের স্নিগ্ধ-শান্ত কমনীয় মূর্তির দেখা পেয়েছে, তাদের বুকে লুকিয়ে থেকে যৌবনের দেবতা মানুষের নির্দয় লাঞ্ছনায় কাঁদে। একটু চুপ করে থেকে জগদীশ বলল, থাক গে। ও লাঞ্ছনার তো শেষ নেই, সৃষ্টির প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত সমভাবেই চলে আসছে।

জাহাজে চিত্রার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু ঘনিষ্ঠতার সুযোগ সে দেয়নি। স্পষ্ট বুঝতাম আমায় এড়িয়ে চলতে চায়। আলাপ করত ভাসাভাসাভাবে, আন্তরিকতার পরিচয় পেতাম না।

জাহাজ যেদিন বোম্বে পৌঁছবে তার পূর্ব দিন একটি ঘটনায় আমার প্রতি তার মনের ভাব পরিবর্তিত হয়ে গেল। অন্তত তার বাইরের ব্যবহারে অনেকটা আন্তরিকতা দেখা গেল।

সেদিন বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জোর বাতাস বইতে আরম্ভ করল। সাগরের ঢেউয়ের মাতলামি বেড়ে যাওয়ায় জাহাজ অত্যন্ত দুলতে লাগল। মি. সেন সঙ্গে সঙ্গে শয্যা নিলেন। মিসেস সেন একটু সামলে নিয়েছিলেন, দুদিন ডেকেও এসেছিলেন, তিনি আবার কেবিনে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন। ডেকে বায়ুসেবনকারীর সংখ্যা হঠাৎ আশ্চর্য রকম কমে গেল। চার বছরে কতবার সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছি, প্রবল ঝড়ে উত্তাল সাগরের বুকে জাহাজের অত্যধিক রকমের বিশ্রী দোলায় কতবার দুলেছি, এতো তার কাছে ছেলেখেলা। কেবিনে বদ্ধ থাকা আমার পোষায় না, রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে জাহাজের নাগরদোলায় দুলতে দুলতে ঢেউয়ের ওঠানামা দেখতে লাগলাম।

মি. মিত্র !

ফিরে দেখি, চিত্রা।

অবাক হয়ে বললাম, আপনি যে এখনও দাঁড়িয়ে আছেন ? জাহাজের অর্ধেক লোক শুয়েছে।

চিত্রা বললে, বাবাও শুয়েছেন। কী করা যায় বলুন তো ?

করবার কিছু নেই। বাতাস কমলেই মি. সেন উঠে পড়বেন। কাল বোধ হয় পৌঁছে যাব।

কিন্তু আমারও যে মাথা ঘুরছে ; আর গা বমিবমি করছে !

কোনো ওষুধ নেই ?

বললাম শুয়ে থাকাই সব চেয়ে ভালো ওষুধ। মাথা ঘুরছে যখন বিছানায় গিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকুন, আপনা হতে কমে যাবে।

ডেকে বাতাসে বেড়ালে মাথাধরাটা-- হাতের রুমালের কথা ভুলে গিয়ে চিত্রা দুহাতে শাড়ির আঁচলটা মুখে গুঁজে দিল। তার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল।

বুঝলাম।

বললাম, শিগগির আসুন আমার কেবিনে।

বলে অগ্রসর হতেই চিত্রা আমার একটা হাত একহাতে চেপে ধরল। পাকস্থলীর যে জিনিসগুলি বাইরে আসবার জন্যে ঠেলাঠেলি লাগিয়েছিল, তাদের দমন করে রাখতেই তার সবটুকু শক্তি ব্যয় হচ্ছে বুঝে আমি চিত্রার বাহুমূল ধরে নিয়ে চললাম। চিত্রাদের কেবিন জাহাজের শেষপ্রান্তে ; একটু দূরে ! আমার কেবিন কাছেই, দরজা ঠেলে ভেতরে আসতেই চিত্রা মেঝেতে বসে পড়ল। এতক্ষণ প্রাণপণ চেষ্টায় দমন করেছিল, আর পারল না। মুখে চোখে জল দিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছিয়ে হাত ধরে তুলে আমার বিছানায় শুইয়ে দিলাম। চিত্রা তখন থরথর করে কাঁপছে।

একটু সুস্থ হয়ে মাথা তুলে মেঝের দিকে চেয়ে চিত্রা বলল, ছি ! ছি ! কী করলাম ! মেঝেটা নোংরা হয়ে গেল।

বললাম, কুণ্ঠিত হবেন না মিস সেন, ধুয়ে দিলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। মেথরকে ডেকে দিতে বলে দিয়েছি। আর একটু নেবু খাবেন ?

চিত্রা ঘাড় নাড়ল। উত্তেজনায় তখনও তার দুচোখ জলে পরিপূর্ণ, আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বলল, আপনার কেবিনটা যদি কাছে না থাকত মি. মিত্র, অত লোকের মাঝে ওই কাণ্ডটি করলে লজ্জায় আমি মরেই যেতাম। আপনাকে যে কী বলে—

লজ্জা দেবেন ভেবে পাচ্ছেন না। সে কাজটা না হয় পরেই করবেন ? বমিবমি ভাবটা কমল ?

চিত্রা ঘাড় নাড়ল, একটুও না। গলাটা জ্বলছে। কী করব ?

শিশুর মতো অসহায় প্রশ্ন ! দুবছর বিলাতে কাটিয়েছে !

কী আর করবেন ? একটু শুয়ে থেকে উঠে কেবিনে চলে যাবেন।

উঠব কী করে ? দাঁড়ালেই এবার নাড়ি সুদ্ধ উঠে আসবে।

না না, কিচ্ছু হবে না। না হয় আপনি এখানেই থাকবেন, আমি অন্য বন্দোবস্ত করে নেব।

আপনি বোধ হয় ভাবছেন মি. মিত্র, এ রকম তো আজ অনেকের হয়েছে, আমার মতো কেউ অস্থির হয়ে পড়েনি। সত্যি বলছি, আমার মতো বেশি কারও হয়নি। কী রকম যে লাগছে বলা যায় না। মনে হচ্ছে বিছানা ছেড়ে কোনোদিন উঠতেই পারব না।

আগে আর হয়নি কিনা, তাই এ রকম লাগছে। কালকেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

বলে সান্ত্বনা দিলাম।

মেথর এসে মেঝে পরিষ্কার করে দিয়ে গেল।

চোখ বুজে চিত্রা কী ভাবল সেই জানে, খুব সম্ভব আমার কেবিনে বেশিক্ষণ থাকাটা লোকেব চোখে বাজবে এ কথাটা তার হঠাৎ খেয়াল হল। চোখ খুলে বলল, আমায় বরং কেবিনে দিয়ে আসুন।

আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুন না ?

না অনেকটা ভালো লাগছে, এই বেলা যাওয়া ভালো।

আমার একটা হাত চেপে ধরে মনের জোবে কম্পিত পা দুটিকে স্থির করবাব চেষ্টা কবতে করতে চিত্রা তার কেবিনে প্রবেশ করল।

ফিরে এসে আমি সেই বিছানায় মুখ গুঁজে পড়লাম।

মনে হল এইটুকু সময়ের ভেতরে যেন বিছানার স্পর্শটুকু পর্যন্ত বদলে গেছে। উপাধানে মৃদু সুবাস, যেন মুহূর্তপূর্বে সে যে কুন্তলের পবশ পেয়েছিল সেই স্পর্শের অতি মৃদু স্মৃতি। ঘরেব বাতাসটি পর্যন্ত যেন চৈত্র রাতেব দখিনার মাধুর্যে ভরে উঠেছে মনে হল।

জগদীশ হঠাৎ চুপ করল।

আমার কাছেই পাথরেব ফাটলে একটি বনফুলের চারায় একটিমাত্র ফুল ফুটেছিল। পাথরের বুকে রসের সংবাদ চারাটি কী করে পেয়েছিল সেই জানে, কিন্তু ভুল সংবাদ পায়নি। ফুল ফুটিয়ে তার প্রমাণ দিয়েছে। ফুলটি তুলে নাকের কাছে ধরলাম। অস্পষ্ট সুবাস। নীল সাগরের বুকে গতিশীল জাহাজের কেবিনে আমার বন্ধুর শয্যার উপাধানটি তার প্রিয়তমার কেশের যে মৃদু গন্ধটি চুরি করে রেখেছিল যেন তারই অস্ফুট প্রতিধ্বনি এই নাম-না-জানা ফুলটির বুকে ফুটে উঠেছে !

জগদীশ আবার বলতে আরম্ভ করল, বিকালের দিকে বাতাস কমে গেল। যাঁরা বিছানা নিয়েছিলেন তাঁরা একে একে শুকনো মুখ নিয়ে ডেকে এসে হাঁফ ছাড়লেন। মি. সেন, মিসেস সেন ও চিত্রা তিনজনেই এসে চেয়ার দখল করে বসে পড়ল।

হেসে প্রশ্ন করলাম, কেমন আছেন সব ?

প্রত্যুত্তরে মিসেস সেন ক্ষীণভাবে একটু হাসলেন।

মি. সেন বললেন, তুমি কিন্তু মহা ভাগ্যবান !

চিত্রা কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল।

চিত্রা আর আমাকে এড়াবার চেষ্টা করল না। তাব ব্যবহারে এতদিন যে ইচ্ছাকৃত আন্তরিকতার অভাব আমায় পীড়া দিচ্ছিল, এরপর থেকে আর তার চিহ্নও খুঁজে পেলাম না। মনে হল দুজনের পরিচয়ের মাঝখানে যে পর্দাটি ছিল সেদিনের জোর বাতাসে সেটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে !

আনন্দে আমার অন্তর পূর্ণ হয়ে গেল। বিশেষ কিছু নয়, যে কোনো পরিচিতা মেয়ে আমার সঙ্গে ও রকম ব্যবহার কবত, কিন্তু তার বিমুখতার ভাবটি কেটে গিয়ে আমাদের পরিচয় যে স্বাভাবিক স্বচ্ছতা লাভ করল তাই আমার পবম সম্পদ বলে মনে হতে লাগল।

কলকাতায় বিদায় নেবার সময় মি. সেন ও মিসেস সেন কলকাতায় এলেই তাঁদেব বাড়ি যাবার নিমন্ত্রণ করলেন। চিত্রা শুধু বলল, আসবেন কিন্তু মি. মিত্র, ভুলবেন না।

আহ্বানের সুরটা আমাব মনের পছন্দ হল না। মনকে বোঝালাম, ওই যথেষ্ট।

বাড়ি ফিরে দেখলাম, বাবা নেই। তারপর মাস চারেকেব কথা তুমি জানো।

৪

বাড়ি বসে থাকতে ভালো লাগল না, হঠাৎ একদিন কলকাতা চলে গেলাম।

চিত্রাদের বাড়ি যখন গেলাম তখন সন্ধ্যা উতরে গেছে এবং ড্রইংরুমে সান্ধ্য মজলিশ বসেছে।

চিত্রা হাসিমুখে অভ্যর্থনা করল। মিসেস সেন ভারী খুশি।

চার মাস বাড়িতেই ছিলেন নাকি মি. মিত্র ?

হ্যাঁ।

চলুন বাবার সঙ্গে দেখা করবেন। ভয়ানক কাজ পড়েছে, আপিস ঘরেই প্রায় সময় থাকেন।

ঘবের বাইরে এসে বললাম, আপনার অনেক বন্ধু জুটেছে দেখাছ

হ্যাঁ। সব গুণীলোক। মি. রায়ের গান শুনলে অবাক হয়ে যাবেন।

মি. রায় ? সকলের শেষে যাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন উনিই কি মি. রায় ?

হ্যাঁ। ভেতরে আসব বাবা ?

ভিতরে মি. সেনের কণ্ঠ শোনা গেল, না না এসো না, তুমি এলেই মাথা গুলিয়ে দেবে।

চিত্রা হেসে বলল, মি. মিত্র এসেছেন বাবা।

মি মিত্র ? কোন মি. মিত্র ? ললিতাব বাবা ? নাঃ, তুমি সব গোলমাল বাধিয়ে দিলে দেখছি ! চলো যাচ্ছি।

চিত্রা আমার দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে বলল, কাজ করবার সময় বাবা বিশ্বসংসার ভুলে যান।

মি. সেন দরজা খুলে আমায় দেখে বললেন, ' রে, তুমি ! তুমি আবার মিস্টার নাকি ? বিদেশে যাই হোক, দেশে ও সব মিস্টারের বালাই রেখো না হে !

বলে সশব্দে হাসলেন।

চিত্রা হেসে বলল, তুমিও তো মিস্টার, বাবা।

এককালে ছিলাম, এখন আর নাই। অনন্তবাবু হতে ভারী ইচ্ছে, কিন্তু কমলি ছাড়ছে না ! বলে আবার হাসলেন।

আমার আগমনে যে ভারী খুশি হয়েছেন এবং বিপর্যয় কাজের জন্য দুদণ্ড আমার সঙ্গে গল্প করতে পারছেন না বলে যে ভারী দুঃখিত হয়েছেন বারবার এ কথা প্রকাশ করতে করতে ঘরে ঢুকে মি. সেন নথিপত্রে ডুব দিলেন। আর একটা কাজ করলেন, পরদিন আমাকে ডিনারে নেমন্তন্ন।

ড্রইংরুমে ফিরবার পথে বললাম, আপনার বাবার সহজ ব্যবহার আমার এমন ভালো লাগে মিস সেন !

চিত্রা বললে, বাবা ওই রকম, যাকে স্নেহ করেন তার সঙ্গে ব্যবহারে একবিন্দু এটিকেট মেনে চলেন না।

স্নেহ করেন ! কথাটায় অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠলাম।

সকলের মিলিত অনুরোধে চিত্রা গান ধরল। নতুন শিখে আসা ইংরাজি গান, মিষ্টি করুণ সুর।

গান শেষ হলে সকলে এমন সকলরব প্রশংসা আরম্ভ করে দিলেন যে আমার অন্তরের সুর-প্রেমিক লজ্জায় মাথা হেঁট করল।

জলধি রায় কেবল দেখলাম নীরব প্রশংসায় গানের প্রকৃত মর্যাদা দিলেন। আরও একটা জিনিস দেখলাম, লোকটির চেহারা। বাঙালি যুবকের যে গ্রিক ভাস্করের খোদাই করা মূর্তির মতো অমন চেহারা থাকতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। বড়ো বড়ো দুটি চোখে অন্তরের কবিপ্রাণ উঁকি মারছে। খদ্দরের পাঞ্জাবি আব আর চাদরমাত্র তার পরিধানে, কিন্তু মনে হয় লোকটা কত যত্নেই না বেশভূষা করেছে ! স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহ, ঠোঁটের কোণে কৌতুকের হাসি। মাথার চুলে পর্যন্ত বৈশিষ্ট্যের ছাপ, যেভাবে বিন্যাস করা আছে মনে হয় ঠিক সেভাবে ছাড়া আর কোনো উপায়েই বিন্যস্ত কবা চলে না।

রায়ের দিকে চেয়ে চিত্রা বলল, প্রশংসা ?

রায় বলল, এমন ভালো লাগছিল যে প্রশংসা করতে ভুলেই গিয়েছি, এটা কি কম প্রশংসা হল ?

চিত্রা হাসল।—তা বটে, আপনার প্রশংসার অরিজিনালিটি আছে। মি. মিত্রকে আপনার গান শুনিয়ে দেবেন না জলধিবাবু ? বলে আমার দিকে চাইল।

বললাম, এইমাত্র মিস সেনের কাছে আপনাব গানের এমন প্রশংসা শুনেছি মি. রায়, যে আপনার গান না শোনার ক্ষতিটা বড়ো বেশি হবে বলে মনে হচ্ছে।

চিত্রা বলল, ইংরাজি নয় কিন্তু, বাংলা কিংবা হিন্দি।

রায় বলল, তোমার ইংরাজি সুরে সবার কান ভরে আছে, একটা বাংলা গান গেয়ে সেটুকু কাটিয়ে দাও, তারপর না হয় মি. মিত্রের ছোটো ক্ষতির অহেতুক ভয়টা বড়ো ক্ষতি দিয়ে মিটিয়ে দেব।

রায়ের তুমি সম্বোধনটা আমার কানে বাজল।

চিত্রা হেসে বলল, কী গাইব ?

ফরমাশ ? আচ্ছা গাও—এই লভিনু সঙ্গ তব।

কারণ কী বোঝা গেল না, রায়ের ফরমাশ শুনে চিত্রার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। স্পষ্ট বোঝা গেল ও গানটা গাইতে তার বিশেষ আপত্তি আছে। ভারী বিস্ময়বোধ হল।

একটু ইতস্তত করে চিত্রা গাইল। কবির অন্তরে সুন্দরের সঙ্গলাভে যে অনির্বচনীয় আনন্দসুধা সঞ্চিত হয়েছিল ছন্দে গাঁথা কথার চারিদিকে সুরের মালা জড়িয়ে সেই আনন্দ বাইরে প্রকাশ করবার চেষ্টা শ্রবণে যেন মধুবর্ষণ করে গেল।

চিত্রার পর রায় গাইল। হিন্দি গান। সুন্দর জমজমাট গলা, গাইবার ভঙ্গি চমৎকার। রাগরাগিণীর জ্ঞান আমার খুব টনটনে নয়, কিন্তু মালকোশ বলেই চেনা চেনা ঠেকল। অনাড়ম্বর চেষ্টায় প্রকৃত সাধকের মতো রায় গেয়ে গেল। আনন্দ পেলাম অনেকখানিই, কিন্তু গান যখন শেষ হল তখন আমার মনে হল কী রকম একটা অস্বস্তি সেই আনন্দের গলা টিপে ধরেছে।

চিত্রার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল। জলধি রায়ের অমন অনবদ্য সুর-সৃষ্টির গর্বটা যেন তারই।

বাইরে তখন জ্যোৎস্নার বান ডেকে গিয়েছে। বাগচি প্রস্তাব করল, লনে গিয়ে চায়ের সঙ্গে জ্যোৎস্না উপভোগ করা যাক। চিত্রা বলল, চায়ের সঙ্গে জ্যোৎস্না। আপনি হাসালেন মি. বাগচি। হাসালাম ? কবি ছাড়া জ্যোৎস্নার উপভোগের এমন চমৎকার উপায় আর নেই মিস সেন।

কবি ছাড়া কেন ?

কবির কি দোমনা হবার সাধ্য আছে যে একসঙ্গে চা আর জ্যোৎস্না উপভোগ করবে।

সবাই হাসল।

মিসেস সেন বললেন, হিম লেগে তোমাদের অসুখ করবে। কার্তিকের জ্যোৎস্না উপভোগের জন্য নয়।

বোস হাসিমুখে বলল, ডোন্ট ইনসাল্ট আওয়ার ইযং এজ, মিসেস সেন।

লনে যেতে একপাশে ফুলের বাগান। পথের ধারেই ছোট্ট একটি গোলাপ চারায় প্রকাণ্ড এক রক্তগোলাপ ফুটে আছে দেখলাম। অন্য চারায় অজস্র ফুল কিন্তু সে চারাটির সম্পদ ওই একটি। সর্বাঙ্গে জ্যোৎস্না মেখে নিঃসঙ্গ ফুটে আছে।

বললাম, ভারী সুন্দর ফুলটি তো। কতটুকু চারায় ফুটেছে।

চিত্রা থমকে দাঁড়াল।

ফুলটি তুলে নিয়ে এক মুহূর্ত দ্বিধা করল। তারপর রায়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আপনার গান আজ ভারী আনন্দ দিয়েছে জলধিবাবু, এই ফুলটি আমার হয়ে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

রায় হাত বাড়িয়ে ফুলটি নিয়ে অস্ফুটস্বরে কী বলল বোঝা গেল না।

জ্যোৎস্নার দীপ্তি নিমেষে আমার চোখে ম্লান হয়ে গেল। জেলাসি নয়, ঈর্ষার জ্বালায় মাধুর্য আছে। অপমানের জ্বালায় জ্বলুনি ছাড়া আর কিছু নেই। জ্যোৎস্নালোকে চিত্রার অপূর্ব সুন্দর কৌতুকোজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে কামনা করলাম, এই শরতের জ্যোৎস্না শ্রাবণের মেঘে ঢেকে দিক। জ্যোৎস্না থাকবার কোনো প্রয়োজন আজ আর নেই।

রায়ের হাতের গোলাপটির ওপর চোখ পড়ল, মনে হল আমার সবটুকু রক্ত জমাট বেঁধে ওই ফুলটির সৃষ্টি হয়েছিল, আমার অন্তরের মালঞ্চ হতে চিত্রা সেটিকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। এত গম্ভীর হয়ে পড়লেন যে মি মিত্র ?

চমকে চিত্রার মুখের দিকে চাইলাম। হৃদয়হীন মানুষের নিষ্ঠুরতারও সীমা আছে, নারীর নিষ্ঠুরতার সীমা নির্দেশ করতে ঈশ্বরের বোধ হয় ভুল হয়েছিল। এক মুহূর্তে কর্তব্য স্থির হয়ে গেল। হেসে বললাম, জ্যোৎস্না দেখে ভাব লেগেছে মিস সেন।

কিন্তু এদিকে চায়ের যে শীত লাগবার উপক্রম হল।

অনাবশ্যক হাসি হেসে বললাম, চা তুচ্ছ। এমন জ্যোৎস্না—

রায়ের দিকে নজর পড়ল। তার মুখে হাসি নেই, মুখে বেদনার ছাপ। উপহারের গোলাপটি নাকের কাছে ধরে স্থির ম্লান দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। সহানুভূতিভরা করুণ দৃষ্টি। চোখের দৃষ্টি যে মানুষকে এতখানি লজ্জা দিতে পারে আর অপমান করতে পারে সেইদিনই প্রথম অনুভব করলাম। ইচ্ছে হতে লাগল চায়ের চামচ দিয়ে লোকটার বড়ো বড়ো চোখ দুটি উপড়ে আনি। কিন্তু হাসিমুখেই বললাম, মি. রায়, শুনলাম আপনি নাকি সুন্দর বাঁশিও বাজাতে পারেন। আপনার গান শুনে যারা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছে, বাঁশি বাজিয়ে তাদের একেবারে আত্মহারা করে দিন না ? এমন জ্যোৎস্না, একটু বাজালে কৃতার্থ হব।

চিত্রার মুখের দিকে চাইলাম, আঘাতটা ঠিক পৌঁছেছে কি না। চিত্রার মুখ মুহূর্তের জন্য একেবারে রক্তশূন্য হয়ে গেল। বোঝা গেল, আমার খোঁচাটা সূক্ষ্ম বলে বেজেছেও বড়ো তীক্ষ্ণ হয়ে।

রায় প্রশংসার প্রতিবাদ করল না, বিনয় প্রকাশের চেষ্টা করল না, শুধু বলল, বাঁশি তো এখানে নেই।

নেই ? ও !

পরদিন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলাম।

মি. সেন দেখলাম সেদিন অন্য সকলকে একেবারে বাদ দিয়েছেন, নিমন্ত্রিত আমি একা।

চেয়ারে বসেই বিনা ভূমিকায় বলে বসলাম, কাল রাত্রের গাড়িতে পুরী যাচ্ছি মি. সেন।

চিত্রা চমকে আমার মুখের দিকে চাইল। মিসেস সেন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর উদ্‌বিগ্ন মুখের দিকে চেয়ে হাসি পেল। মিস্টার সেন আর মিসেস সেনের মনোভাব তো আমার অজানা ছিল না।

এমন হঠাৎ ? মিসেস সেন প্রায় কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

হেসে বললাম, বললাম, হঠাৎ নয়, বাড়ি থেকেই ঠিক কবে বার হয়েছিলাম।

পুরীতে থাকব না, ঘুরে বেড়াব। পরের দেশ দেখতে চার বছর কাটিয়ে এলাম, নিজের দেশটা ভালো করে দেখা উচিত।

কবে ফিরবে ?

তার কোনো ঠিক নেই। কোনো প্রোগ্রাম করিনি। যেখানে ভালো লাগবে কিছুদিন থাকব। পাঁচ-ছবছর তো লাগবেই।

পাঁচ-ছবছর।

মৃদু হেসে বললাম, বাড়ি বসেই বা কী করব বলুন ? দূর-সম্পর্কীয় ছাড়া আত্মীয় কেউ নেই, তাদের কাছে থাকার চেয়ে দূরে থাকাতেই ভালো লাগে।

মিস্টার সেন বললেন, এ রকম ঘুরে ঘুরেই জীবনটা কাটিয়ে দেবে নাকি ?

হেসে ইংরেজিতে বললাম, তা কী বলা যায়। কবে কার বাঁধনে ধরা পড়ে যাব ঠিক কী ? কী জানি কখন সে দুর্ভাগ্য হয়, এই বেলা স্বাধীনতাটুকু ভোগ করেনি ! নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলাম।

চিত্রা এতক্ষণ চুপ করেছিল. এবার কিছু বলা কর্তব্য মনে করেই বলল, পুরী কেন ? সমুদ্র তো আপনার দেখা আছে।

তা আছে, সমুদ্র দেখার জন্য নয়। জগন্নাথের দিকেও বিশেষ টান নেই। একজন বন্ধুর অসুখ, কিছু টাকা চেয়েছে। ভাবছি, নিজে গিয়ে দেখে আসি। নাহলে দিল্লি আগ্রার দিকেই যেতাম।

বন্ধুর কথাটা সত্য। সকালে বন্ধুর চিঠি পেয়েছিলাম।

চিত্রা বলল, বন্ধুর কী অসুখ ?

টি বি।

টি বি। তিনজনেই চমকে উঠলেন। চিত্রার মুখ একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। কেন যে গেল সে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করবার ইচ্ছা বা শক্তি দুয়েরই তখন অভাব। এখন সে চেষ্টা করতেও ব্যথা বোধ হয়।

ডিনারের পর মিনিট দশেক বসেই টের পেলাম এবার চিত্রার মা বাবা দুজনেই অন্য ঘরে গিয়ে আমাদের নিরিবিলি কথা বলার সুযোগ দেবেন। কাজের ছুতা করে উঠে পড়লাম। বিদায় নেবার সময় বললাম, যেখানেই থাকি, মিস সেনের শুভ পরিণয়ের সংবাদ পেলেই ছুটে আসব।

চিত্রার বিবর্ণ মুখ একবার আরক্ত হয়েই ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

পুরী পৌঁছে বন্ধুর কাছে যাবার পথে মন্দিব পড়ল। চৌমাথায় গাড়ি যেতেই নেমে পড়লাম। মন্দিরে উঠে অভ্যন্তরের আবছা আলো আর প্রদীপের অন্ধকারের দিকে চেয়ে দশ বছর বয়সের পর কখনও যা করিনি হঠাৎ তাই করে বসলাম। একেবারে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে মনে মনে বললাম, তোমার প্রতি আমার ভক্তির যে নিতান্তই অভাব সে কথা তুমিও জানো আমিও জানি। শতাব্দীর পর শতাব্দী লক্ষ লক্ষ অন্তরের ভক্তি-শ্রদ্ধা তো পেয়েছ, আমার একটুখানি ভক্তি দিয়ে তুমি কী করবে ? যদি পারো নিঃস্বার্থভাবেই এইটুকু দয়া কোরো ঠাকুর. তোমার সৃষ্ট এই আগ্নেয়শিখাগুলিকে আমার নয়ন-পথের অন্তরালেই রেখো।

উঠে দাঁড়াতেই এক পাণ্ডা গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে বলল, মনস্কামনা পূর্ণ হবে বাবু।

তথাস্তু। পাণ্ডাটির মনস্কামনা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করে দিলাম।

বন্ধু আমায় দেখে আনন্দে কৃতজ্ঞতায় কেঁদে ফেলল। অর্থাভাবে এবং রোগেব পীড়নে দেখলাম মরণেব দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

বন্ধুর ব্যবস্থা করতেই সমস্ত দিন কেটে গেল। সন্ধ্যাব পবেই নিশ্চিন্ততাব আবামে বহুকাল পরেই বোধ হয় বন্ধু বিছানায় আশ্রয় নিতেই ঘুমিয়ে পড়ল।

নিস্তব্ধ বাড়িতে বসে থাকতে ইচ্ছা হল না। ধীরে ধীরে সমুদ্রতীরে গিয়ে ফ্ল্যাগস্টাফের কাছে পাকা বাঁধানো একটি আসনে বসে পড়লাম।

সেইখানে বসে চিরবিচ্ছেদেব বেদনা অনুভবের সঙ্গো সঙ্গো নিজের অন্তরের এক অপূর্ব তত্ত্ব আবিষ্কাব করলাম। চিত্রার বূপকে নয়, চিত্রাকেই আমি ভালোবাসি। তীব্র বেদনার মাঝে এই সত্যের অনুভূতি আমায় খুশি করে তুলল।

পূর্ণিমাব লঘু শান্ত জ্যোৎস্নাব সঙ্গো ঊর্মিপাগল উচ্ছ্বসিত সাগরের অপরূপ মিলনেব দিকে চেয়ে স্পষ্ট অনুভব কবলাম পৃথিবীর তুচ্ছ সুখ দুঃখ মিলন বিচ্ছেদের বহু ঊর্ধ্বে আমি চলে গেছি। আমাব পিছনেই কালো ইংবেজি অক্ষরে পুবী লেখা বাড়িটার মাথার ওপরে একটা আলো ঘুরে ঘুরে চারিদিকে সংকেত পাঠাতে লাগল। মনে হল আমার অন্তর-সমুদ্রের কোনো তীরে এমনি একটি মৃদু আলো জ্বলে আমাব দিকহারা মনেব সন্ধানে দিকে দিকে তার ক্ষীণ বশ্মিরেখার সংকেত প্রেরণ করছে। পাগলের মতো মন দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হাবিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিল হঠাৎ সেই সংকেতের অস্পষ্ট অর্থ বোধ কবে থমকে দাঁড়িয়ে সলাজ-সঙ্কিত আনন্দের দৃষ্টিতে সেই আলোটিব দিকে চেয়ে আছে।

ডাক্তার বললেন, পুরীতে উপকার হবে না।

বললাম, চলো বন্ধু, রাঁচি যাব তোমার সঙ্গে।

বন্ধু কুণ্ঠিত হয়ে বলল, ছোঁয়াচে রোগ—

তার একটা হাত চেপে ধরে বললাম, বন্ধুর কাছে বন্ধুর রোগ আবার ছোঁয়াচে হয় নাকি ?

কৃতজ্ঞতায় মৃত্যুপথযাত্রীর চোখে জল এল। হায় রে ! ছলনার ভালোবাসারও এত দাম !

লালপুরে বাড়ি ভাড়া কবলাম। এক মাস পবে বন্ধুটি ইহলোক ত্যাগ করল।

সকালে বাড়ির সামনে বাগানে দাঁড়িয়ে একটি সদ্যফোটা লাল গোলাপের দিকে চেয়ে চিন্তা করছি পরদিনই পশ্চিমে পাড়ি জমাব কি না, চেনা গলার ডাক শুনলাম, মি. মিত্র !

চমকে চাইলাম।

আমার পাশে দাঁড়িয়ে চিত্রা !

বললাম, কী আশ্চর্য ব্যাপার।

আমিও আপনাকে বাগানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। ভাবতেও পারিনি সকালে বেড়াতে বেরিয়ে আপনার দেখা পেয়ে যাব।

কবে এলেন আপনারা ?

কাল সকালে। আপনি ?

মাসখানেক এসেছি। মা-বাবা ভালো আছেন ?

মা-র ভারী অসুখ হয়েছিল। সেই জন্যই তো আমাদের আসা।

এখন মা ভালো আছেন। আসুন না আমাদের বাড়ি ?

আসব ? আচ্ছা।

ঘুরে দাঁড়াতেই নজরে পড়ল সেই গোলাপটি। তুলে নিয়ে এসে চিত্রার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, হঠাৎ দেখা দিয়ে আপনি যে আনন্দ দিয়েছেন মিস সেন, এ ফুলটি আমার হয়ে সে জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

চিত্রার মুখ হাতের ফুলটির মতোই লাল হয়ে উঠল। ফুলটি নিয়ে সুবাস অনুভব করার ছলে সে মাথা নিচু করল।

আমায় দেখে মি. সেন মহাখুশি। মিসেস সেন আরও। মিসেস সেনের চেহারা দেখেই বোঝা গেল কঠিন অসুখ থেকে উঠেছেন।

গল্প চলল।

মিসেস সেন হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, কতদিন থাকবে এখানে ?

চলে যাবার কথা ভাবছি শুনেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমরা এলাম অমনি তুমি চলে যাবে ? তাহলে আমাদের মনে হবে আমরা এসেছি বলেই তুমি চলে যাচ্ছ।

সবিনয়ে প্রতিবাদ করলাম। বললাম, আপনারা এসেছেন জানবার আগেই আমার অর্ধেক জিনিস গোছানো হয়ে গেছে।

চিত্রা হঠাৎ কী ভেবে বলল, কিছুদিন থেকে যান না মি. মিত্র ? কাজ তো নেই, দুদিন পরে বেড়াতে গেলে আর কী ক্ষতি হবে ? আপনি থাকলে বেশ আনন্দে দিন কাটবে।

বললাম, থাকব কী মিস সেন, আপনি কি আমায় থাকতে দেবেন ?

তার মানে ?

আপনি যদি মি. মিত্র বলে ডাকেন তাহলে কী করে থাকি বলুন ?

চিত্রা হেসে বলল, আপনার পছন্দ নয় বুঝি ? কী বলে ডাকব তবে ? জগদীশবাবু ?

হ্যাঁ।

কিন্তু আপনি আমায় মিস সেন মিস সেন করবেন আর আমি আপনাকে জগদীশবাবু বলব, সে ভারী বিশ্রী শোনাবে। আপনি যদি আমায় চিত্রা বলেন, তাহলে রাজি আছি।

নাম ধরে ডাকলে চটবেন না তো ?

চিত্রা হেসে বলল, নাম ধরে ডাকলে চটব না, কিন্তু নাম ধরে ডেকে যদি আপনি বলে কথা কন তাহলে চটব।

মিসেস সেন সে বেলা তাদের ওখানে খাওয়ার জন্যে অনুরোধ জানালেন।

চিত্রা বলল, আমি নিজে রাঁধব জগদীশবাবু।

বাড়ি ফিরে মনে হল, জীবনের পাত্রে সঞ্চিত সমস্তটুকু বেদনা এই ক-ঘণ্টায় উপে গিয়ে সেই শূন্য পাত্র অকস্মাৎ সুধাবর্ষণে পূর্ণ হয়ে গেছে।

বিচিত্র জীবন। বিচিত্র তার দেনা-পাওনার হিসাবনিকাশ।

সন্ধ্যার পর চিত্রা গান শোনাল। রাত্রি দশটা পর্যন্ত তাদেব ওখানে থেকে ফিরলাম। জ্যোৎস্নায় তখন চারিদিক ভরে গেছে। বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে জ্যোৎস্নালোকে অদূরে আবছা মোরাবাদি পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইলাম। বাইরের জ্যোৎস্না আমার অন্তরের জ্যোৎস্নার কাছে তখন ম্লান হয়ে গেছে।

ইজিচেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম যখন ভাঙল, অন্ধকার নেই। ঠিক সামনে গাছপালার ওদিকে বুঝি সূর্য উঠবে, আকাশের গায়ে রংয়ের ছাপ পড়েছে। সোজা হয়ে বসে সিগারেট ধরালাম।

খুব ভোরে উঠেছেন যে।

চিত্রা এসে দাঁড়াল।

বোসো। এখনও উঠিনি।

ওঠেননি মানে ?

মানে, ঘুম ভেঙেছে বটে, কিন্তু বিছানা ছেড়ে ওঠা হয়নি।

এই চেয়ারটাতেই কাল বিছানার কাজ চালিয়েছিলেন বুঝি ? বেশ লোক তো ?

বললাম, ইচ্ছে করে নয়, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তোমার স্নান পর্যন্ত হয়ে গেছে দেখছি।

সকালে স্নান না করলে আমার ভারী বিশ্রী লাগে। উঃ, আকাশটা কী বকম লাল হয়ে উঠল দেখেছেন ?

আকাশ নয়. আমি তখন চিত্রাকে দেখছি। ভেজা ফুলেব মতো মুখখানিতে না-ওঠা সূর্যের আভা লেগে যে সৌন্দর্য সেদিন জেগেছিল. দেখে মনে হয়েছিল কোন পুণ্যে আমাব চোখ দুটির অত বড়ো সৌভাগ্য সম্ভব হল। হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বার হয়ে গেল, তোমাকে যে কী সুন্দব দেখাচ্ছে চিত্রা।

কবির চোখে কী না সুন্দর লাগে বলুন ? বেড়াতে যাবেন ?

চিত্রার সহজ কণ্ঠে অত্যন্ত লজ্জাবোধ হল। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, চলো।

ফিববার পথে হঠাৎ চিত্রা প্রশ্ন কবলে, আপনার কি কোনো অসুখ হয়েছিল ?

না, কেন বলো তো ?

রোগা হয়ে গেছেন।

চিত্রা !

বলুন।

আমার একটা কথা রাখবে ? আমাকে আপনি বোলো না।

চিত্রার মুখ গম্ভীর হল। একটু চুপ করে থেকে বলল. কী যে বলেন। জগদীশবাবু বলা চলতে পারে, তুমি বলা কি সম্ভব ?

সম্ভব নয় ?

আপনিই ভেবে দেখুন সম্ভব কি না। রাগ করবেন না. বুঝে দেখুন।

না, রাগ করব কেন ?

চিত্রা একবার আমার মুখের দিকে চাইল কিন্তু কিছু বলল না। নিঃশব্দে বাকি পথটুকু অতিবাহিত হয়ে গেল।

গেট পার হয়ে বাগানের মাঝামাঝি গিয়েছি. চি.. ডাকল. জগদীশবাবু একটু দাঁড়ান।

দাঁড়ালাম।

রাগ করে আমাদের বাড়ি যাওয়া যেন বন্ধ করবেন না।

রাগ তো আমি করিনি। রাগের কী আছে ?

না থাকলেই ভালো।

বলে চিত্রা চলে গেল। যে কথা বলে গেল সে কথা বলতে সে যে আমায় দাঁড় করায়নি সেটুকু বেশ বুঝতে পারলাম। বুঝে হঠাৎ খুশি হয়ে উঠলাম। মূর্খ আমি, অন্ধ আমি, তাই।

স্থানীয় সিভিল সার্জেনের সঙ্গে বিলাতে পরিচয় হয়েছিল। তিনি আর তাঁর স্ত্রী বিকালে এক রকম জোর করে ধরে নিয়ে গেলেন। যখন ফিরলাম, তখন সন্ধ্যা উতরে গেছে।

ফিরেই চিত্রাদের বাড়ি গেলাম। মিস্টার সেন আর মিসেস সেন বেড়াতে গিয়ে ফেরেননি। চিত্রা এক ইজিচেয়ারে চুপচাপ পড়ে আছে। তার বাঁ পায়ের গোড়ালির কাছে ব্যান্ডেজ বাঁধা।

পায়ে কী হল ?

মচকে গেছে।

কী করে মচকাল ?

সিঁড়িতে পা পিছলে গিয়েছিল। বসুন।

খুব ব্যথা হয়েছে ?

না, সামান্য। মা-বাবা দুজনেই বেরিয়েছেন, একা একা এমন বিশ্রী লাগছিল ! ঠিক সময়েই আপনি এসেছেন জগদীশবাবু।

খুশি হয়ে বললাম, বাইবে চলো, জ্যোৎস্নায় বসা যাবে। ভারী সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে। আজ বোধ হয় পূর্ণিমা।

মাথা নেড়ে চিত্রা বলল, পূর্ণিমা নয় চতুর্দশী, এক কলা এখনও বাকি আছে। যেতে তো ইচ্ছে করছে, কী করে যাই ?

সেও একটা কথা বটে। থাক পায়ে আবার লাগবে।

ডান হাতটি নিঃসংকোচে বাড়িয়ে দিয়ে চিত্রা বলল, ধরুন, হাঁটতে পারি কি না দেখা যাক। এইটুকু তো।

হাত ধরে সন্তর্পণে চিত্রাকে দাঁড় করালাম। বাঁ পায়ের ওপর ভর দেবার চেষ্টা করে বললে, উহুঁ, লাগছে। আর একটু সরে আসুন, ভালো করে ধরি।

স্পন্দিত বক্ষে কাছে সরে গেলাম। চিত্রার শাড়ির প্রান্ত আমার অঙ্গ স্পর্শ করল। তার কেঁশেব সুবাস আমাব চিত্তকে আচ্ছন্ন করে দিল। ডান হাতখানা আমার কাঁধে রেখে শরীবের সবটুকু ভার আমার ওপরে দিয়ে চিত্রা বলল, চলুন।

চলব ? কোথা চলব ? পায়ের নীচে তো মাটি ছিল না। বিশ্ব তখন লুপ্ত হয়ে গেছে, দেহের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠে পাগলের মতো নৃত্য শুরু করে দিয়েছে। অতীত এবং ভবিষ্যৎ নিঃশেষে মুছে গিয়ে কালের মহাশূন্যে কেবল বর্তমানের ক্ষণটি দুলছে। যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত কামনার উষ্ণ নিশ্বাসে উদ্‌ভ্রান্ত সেই ক্ষণটি যেন আমার জন্মজন্মান্তরের সম্পদ,—অতীতকে মুছে নিয়ে, অসহ দ্যুতিময় তৃষ্ণা-যবনিকার অন্তরালে ভবিষ্যৎকে আড়াল করে সেই ক্ষণটি যেন আমার কানে কানে মিনতি করে গেল, নাও, নাও, এইবেলা যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত তৃষ্ণা মিটিয়ে নাও।

সংজ্ঞা ফিরতে দেখলাম আমার দুই বাহুর বেষ্টনে চিত্রা আমার বুকের ওপর লুটিয়ে পড়েছে, আমি তার ওষ্ঠে গালে কপালে পাগলের মতো চুম্বনের পর চুম্বনের রেখা মুদ্রিত করে দিয়ে চলেছি।

চিত্রা যখন মুক্তি পেল তখন তার মুখ মৃতেব মতো বিবর্ণ হয়ে গেছে।

একটা চেয়ারের পিঠ চেপে ধরে সে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

চিত্রা।

যান !

চিত্রা খোলা দরজার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল।

আমার একটা কথা শোনো চিত্রা, তারপর তাড়িয়ে দাও, চলে যাব।

কথা ? যা বলবেন আমি জানি, শোনাবার দাবি ইচ্ছে করে খুইয়েছেন। যান।

শুনবে না ?

না, না, না। আমি লিওনরা নই। আমি দাঁড়াতে পারছি না, পায়ে লাগছে।

সেই দিন যদি আমাদেব দুজনের অদৃষ্টে যে জট পাকিয়েছিল তার সব ক-টি পাক খুলে যেত ! আজ এ বেদনা হয়তো এমন কঠিন, এমন জ্বালাময়, এমন অসহ্য হত না। দূর থেকে দেখতাম তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে সে মিলিত হয়েছে, আমার স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলে সে সুখী হয়েছে। আমার সমস্ত ক্ষতি, সমস্ত লজ্জা, প্রিয়বিরহের সবটুকু বেদনা, ক্ষণিকের ভুলের জীবনব্যাপী অনুতাপ এ সমস্তই যাকে ভালোবাসি সে সুখী হয়েছে এই সান্ত্বনার কিরণসম্পাতে সহনীয় হয়ে উঠত। কিন্তু তখনও বাকি ছিল।

পরদিন সকালেই রাঁচি ত্যাগ কবলাম।

আমার দুর্ভাগ্য, অমন একটা ঘটনার পরেও আমার আশা-দীপ একেবারে নিভে গেল না। সব আশা তো মিটেছে, কিন্তু চিত্রার সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে প্রত্যেকটি ছোটোবড়ো ঘটনা বাববার তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করলাম, যদি কোনো আশা এখনও থাকে ! ক্ষীণ হোক আশা আছে, এ সান্ত্বনা ছাড়া যেন বেঁচে থাকাই অসম্ভব মনে হল।

মুহূর্তের ভুল। ওই ভুলটি না করলে চিত্রা একদিন আমার হত। লিওনরার কথা জেনেও সে দিনের পর দিন আমার কাছে সরে আসছিল। একদিন সত্যকার ভালোবাসাব দাবিতে আমার অতীতের দুর্বলতার কথা তুচ্ছ করে দিয়ে চিত্রা একান্তভাবে আমার হত।

আমার হত !

মনে করতেও রক্তস্রোত যেন থেমে যাবাব উপক্রম হল ! চিত্রা আমার হত, আমার এক মুহূর্তে নিজের হাতে সে সম্ভাবনাকে অসম্ভবই হয়তো করে দিয়ে এসেছি !

পনেরো দিন ধবে ভাবলাম আর জ্বললাম। তারপব মনস্থির হয়ে গেল ! চিত্রাব সঙ্গে একটিবার দেখা করে অন্তরের সবটুকু তার সামনে ধরে দেব। যদি আমার নিমেষের ভুলকে ক্ষমা কবে থাকে, চিরজীবনের মতো শুধু বাংলা নয়, ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাব। এই স্থির কবার পর আমার মন হঠাৎ আশ্চর্য রকম স্থৈর্য লাভ করল। আশা কেবলই আমার কানে গুঞ্জন কবতে লাগল, সে ক্ষমা কবেছে।

উত্তেজনাব মুখে সে যা বলেছে, সেটা সত্য নয়, তার অন্তরের কথা নয়। তার মন শান্ত হয়েছে, নিমেষের ভুলে যে সমস্ত জীবন নিয়ন্ত্রিত করতে নেই এ কথা সে এখন বুঝেছে।

যদি অপমান করে ! অপমান ? শুধু চিত্রাকে নয়, নিজের ভালোবাসাকে যদি আমি অত বড়ো অপমান করতে পেরে থাকি, চিত্রার দেওয়া কোনো অপমানকেই তো অপমান ভাববার অধিকার আমার নেই।

আমার তখনকাব মনের ভাব ঠিক করে বর্ণনা কবা অসম্ভব। কত বিরুদ্ধ চিন্তা, কত অসম্ভব কল্পনা, কত যুক্তি, কত তর্ক দিয়ে যে আমি তখন আমার জ্বালা-ভরা অনুতপ্ত মনের অগ্ন্যুত্তপ্ত আত্মগ্লানির তীব্রতা কমিয়ে আনবার চেষ্টা করছিলাম তার সীমা ছিল না।

চিত্রার সম্মুখে দাঁড়িয়ে মুখ ফুটে একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারব কি না সন্দেহ হল। শেষে চিঠিখানা জোর করে খামে ভরে ফেললাম। মুহূর্তের উত্তেজনা, নিমেষের ভুল ওই সব লিখতে লজ্জা বোধ হল। নিজের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়ে তাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পাবার আশা জানিয়ে, সারা-জীবন যে আমি এই চিঠির জবাবের প্রতীক্ষা করব এই কথা লিখে শেষ করলাম। কত কী লিখবার দুর্দমনীয় ইচ্ছা জাগছিল ! মনে মনে বললাম, ভালোই যদি বাসে আমার অকথিত বাণী তার মনের দুয়ারে পৌঁছবে, মুখ ফুটে বলার প্রয়োজন হবে না।

সে চিঠি তাকে দেওয়া হয়নি। এই পাষাণ-ভরা নদীগর্ভে সে চিঠি হারিয়েছে। তার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি অক্ষর যে এখনও কেঁদে বেড়াচ্ছে, এখানে এলেই আমি স্পষ্ট অনুভব করি।

জগদীশ থেমে গেল। তার চোখে জল নেই, কিন্তু মনে হল, তার চোখের অন্তরালে অনলকণা আর অশ্রুধারা একসঙ্গে বর্ষিত হচ্ছে।

প্রায় দশ মিনিট নিঃশব্দ থেকে জগদীশ আবার শুরু করল।

রাঁচি ফিরলাম। স্টেশন থেকে সোজা চিত্রাদের বাড়ি গেলাম। কেউ বাড়িতে নেই। চাকর জানাল, সকলে হুড্রু গেছে।

হুড্রু রওনা হলাম। চিত্রার পায়ে ব্যথা, এই ক-দিনে কমলেও হয়তো সে ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে প্রপাতের নীচে নামতে পারবে না। মি. সেন আর মিসেস সেন যদি প্রপাতের সৌন্দর্য দেখতে নীচে নামেন, চিত্রা একা থাকবে। সেই হবে আমার সুযোগ। প্রকৃতির উদারতার ছাপ লাগবে চিত্রার মনে। চারিদিকের শান্ত কোমলতা তার অন্তরের কাঠিন্য গলিয়ে দেবে।

তিনজনে এক পাথরে বসে চা পান করছিলেন, আমি দূরে এক পাথরের আড়ালে বসে চেয়ে রইলাম। আধঘণ্টা পরে দুজন লোক সঙ্গে নিয়ে মিস্টার সেন আর মিসেস সেন নীচে চলে গেলেন।

চিত্রা উঠে ধীরে ধীরে প্রপাতের মুখের দিকে অগ্রসর হল।

মিনিট দশেক চুপচাপ বসে থেকে জোর করে উঠে পড়লাম। একটা উঁচু পাথরে উঠে নজরে পড়ল ঢালের ধারে বসে চিত্রা নীচের দিকে চেয়ে আছে।

পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে চিত্রা চমকে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করে ভীত বিবর্ণ মুখে আমার দিকে চেয়ে রইল। বুঝলাম এই নির্জনে অকস্মাৎ আমার আবির্ভাবে চিত্রা ভয় পেয়েছে ! বুকপকেট থেকে চিঠিটা বার করতে করতে দু-পা অগ্রসর হয়ে বললাম, চিত্রা—

অস্ফুট শব্দ করে চিত্রা সভয়ে পিছিয়ে গেল। দাঁড়িয়েছিল একেবারে ধারে। হঠাৎ চিত্রা এক নিমেষে আমার দৃষ্টিপথ থেকে মুছে গেল।

তারপর নিকষকালো অন্ধকারে বিশ্ব ঢেকে গেল। যখন সংজ্ঞা ফিরল তখন—তখন—

শেষের দিকে জগদীশের কণ্ঠ ক্রমেই বিকৃত এবং অস্পষ্ট হয়ে উঠছিল ; হঠাৎ সে সেই পাথরের ওপরেই ঢলে পড়ল। মুখের দিকে চেয়েই বুঝলাম সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে।

আর একটি কথা বললেই এ কাহিনি শেষ হয়। চিত্রা জগদীশকে ভালোবাসত।

আমার পাঠক বিশেষত পাঠিকারা, প্রশ্ন করবেন, কী করে জানলে ?

সেই জলধি রায়। জগদীশের মুখ থেকে তার জীবনের এই শোচনীয় কাহিনি শোনাব প্রায় পাঁচ বছর পরে জলধির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। কী সূত্রে পরিচয় হয়েছিল, বলবার প্রয়োজন নেই।

জলধি চিত্রাকে ভালোবাসত। যেদিন সে তার মনের কথা চিত্রাকে জানায়, চিত্রা ব্যথিত হয়ে তাকে জগদীশের কথা বলেছিল।

ক্ষণিকের দুর্বলতায় জলধি জগদীশের ইউরোপ প্রবাসকালের উচ্ছৃঙ্খলতার কথা জানাতে চিত্রা বলেছিল, সে আমি জানি জলধিবাবু। এ জীবনে আমাদের মিলন সম্ভব হবে কি না ঈশ্বর জানেন। সত্য ভালোবাসা যদি তার বুকে জাগে, ধরা দেব। আর যদি আমার রূপটাই তার কাম্য হয়ে আমার ভালোবাসার অপমান করে তো তার সেই কামনা আমি কোনোদিনই মেটাব না।

দূর আকাশের দিকে স্বপ্নের দৃষ্টি মেলে বলেছিল, তাঁর ভেতরে বড়ো দ্রুত পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছে জলধিবাবু। আমার ভালোবাসা ব্যর্থ হবে না, একদিন আমার রূপকে নয়, আমাকে তিনি ভালোবাসবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জগদীশের বন্ধুর মুখে না বলিয়ে কাহিনিটা এবার আমি নিজেই বলে যাই।

কত দিক দিয়ে অসম্পূর্ণ জগদীশের জীবনের এই ট্র্যাজেডি। জীবন ও জগৎ কত দিক দিয়ে অস্বীকৃত !

যে বলছে জগদীশের জীবন-কাহিনি, সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের যে মানুষটা ছেলেবেলা থেকে ধনীর ছেলে জগদীশের সব চেয়ে আপন, একমাত্র বন্ধু — বাপের টাকায় চরম উচ্ছৃঙ্খলায় বিদেশ চষতে বেরোবার সময় জাহাজে উঠবার আগে যার কাছে বিদায় নিতে জগদীশ কেঁদে ফেলেছিল--- সে এই কাহিনিতে আছে কীভাবে ?

জগদীশের কাহিনিকে করুণরসে ফেনাবার জন্যই যেন তার মানুষ হয়ে জন্মানো, তার হৃদয়-মনের কারবার যেন শুধু সেইটুকু চিন্তা-ভাবনা অনুভূতি নিয়ে যা স্বদেশি ও বিদেশি বিকারে উন্মাদ জগদীশের সত্যিকারের ভালোবাসার মারাত্মক ট্র্যাজেডিকে ফেনায় !

সে এম এ পাস করে চাকরি নিয়ে অল্পবয়সি একটি মেয়েকে বিয়ে করে সাধারণ সংসারী মানুষ হয় শুধু বেপরোয়া হন্নছাড়া বন্ধুর অসাধারণত্বকে, অস্বাভাবিকত্বকে প্রকট করতে।

হুড্রুর জলপ্রপাতে যে নাটকীয় দুর্ঘটনায় জগদীশের প্রেমের সমাধি সে ঘটনা যতই অসাধারণ হোক, একেবারে ধারে দাঁড়িয়েছিল বলেই জগদীশের আকস্মিক আবির্ভাবে শুধু এক পা পিছোতে গিয়ে ভীরু চিত্রা চারশো ফিট নীচে আছড়ে পড়েছিল বলেই ঘটনাটা উদ্ভট অঘটন নয়। এ তো শুধু প্রতীক ঘটনা।

ভাঙাচোরা বাড়ির রেলিংহীন ছাদে দম ছাড়তে গিয়ে ছাদের ধার ঘেঁসে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখার সময় মুখ ফিরিয়ে আচমকা মাতাল গুন্ডা প্রিয়তমকে এগিয়ে আসতে দেখে ভয়ে এক পা পিছিয়ে যেতে চেয়ে নীচে আছড়ে পড়ে মৃত্যুতে মিলিয়ে যাওয়াও তো একই ঘটনা।

জগদীশ ছিল শিক্ষিত মার্জিত মাতাল গুন্ডা। তার অতীত জীবনকে ঘৃণা করেও, তাকে ভয় করেও চিত্রা যে তাকে ভালোবেসেছিল সে দোষ চিত্রার নয়। এইভাবে ভালোবাসতেই তাকে শেখানো হয়েছিল মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হবার দিন থেকে।

যে শেখানো ভালোবাসার আদি-অন্ত ব্যাখ্যা করতে ফ্রয়েড থেকে তথাকথিত কত বড়ো বড়ো পণ্ডিত হিমসিম খেয়ে ব্যর্থ হয়েছেন।

পরদিন সকালেও পাখির কিচিরমিচির ডাকেই প্রবোধের ঘুম ভাঙে

কিন্তু আজ আর তার মনে হয় না যে জীবনে এই প্রথমবার পাখির ডাকে সে জাগল।

জগদীশ অচেতন হয়ে চাটাই-শয্যায় তারই পাশে পড়ে আছে। লুকিয়ে খায়নি। তারই সামনে তৈরি করেছিল অচেতন হয়ে ঘুমানোর দাওয়াইটা।

দেশি-বিলাতি মদ, মহুয়া এবং তারই সঙ্গে আফিং !

ঘুমানোর এই দাওয়াই বানিয়ে খাওয়ার আগেই সে শুরু করেছিল আত্মাকে ধোঁয়ায় মিলিয়ে-মিশিয়ে কাবু করার প্রক্রিয়া। গড়গড়া লাগেনি। হুঁকো লাগেনি। শুধু পুরানো এক টুকরা গামছার ন্যাকড়া। কলকের তলায় লাগিয়ে দুবার তিনবার বুকভরে প্রাণভরে টান দিয়ে সমাপ্ত করা।

ছাপোষা মানুষ প্রবোধ। তার কাছে জীবন আর জগতের মানে বউ আর ছেলেপিলেদের পুষে বাঁচার লড়াই মরিয়া হয়ে চালিয়ে যাওয়া।

চোখ কপালে তুলে সে বলে, মদ-গাঁজা-আফিম একসঙ্গে চালাচ্ছিস ?

অত্যধিক জীবন্ত অত্যধিক প্রাণবন্ত জগদীশ এতক্ষণে এবার প্রথম মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে, ব্যথা অনেক রকম। অনেক রকম ওষুধ দরকার।

আমিও একটু ওষুধ খাই তবে। আমার ব্যথাও কম নয়। তোর জন্য পোস্টাপিসে জমানো ক-টা টাকা তুলে এনেছি বলে শুধু বাপান্ত করতে বাকি রেখেছিল।

প্রবোধ বিলাতি মদের বোতলটা তুলে জগদীশের বিক্ষিপ্ত নেশা-মেশানোর কাচের খালি গেলাসটাতেই অনেকখানি ঢালে।

চুমুক দেবার আগে বলে, এ ওষুধে ব্যথা সত্যি কমবে তো ?

জগদীশ তার গেলাস-ধরা হাত চেপে ধরে।

রাগের বশে ঝোঁকের বশে অভিমান করে এ সব খেতে নেই ভাই। সামলাতে পারবি না। আমি কী রকম মনের জোর খাটিয়ে ব্যথাটা সওয়ার মতো করার জন্য আস্তে আস্তে নেশাটা রপ্ত করেছি তুই ধারণাও করতে পারবি না। দেখলি না যোগী-ঋষির মতো কী রকম আমায় ভয় করে ? যা বলি তাই শোনে ? কিন্তু প্রবোধেরও আজ একটা অদ্ভুত মরিয়া ভাব জেগেছে। জগদীশের তাগিদে আপিস আর ভাড়াটে বাড়ির ধরাবাঁধা জীবন থেকে ছুটি নিয়ে এসেছে ক-দিনের জন্য—আজ মনে হয় তার নিজের তাগিদও কি কম ছিল ?

জগদীশের তাগিদ পৌঁছানোমাত্র এই সুযোগে দু-চারদিনের জন্য মুক্তি পাবার লোভে তার মনও কি কম চঞ্চল হয়ে উঠেছিল ?

এ হিসাবও সে কি কষেনি যে এমনি তার একা কোথাও বেরোনো অসম্ভব, রেবা আর ছেলেমেয়েদের কাছে নিজেকে অতখানি স্বার্থপর প্রতিপন্ন করার সাহস তার নেই।

একা-একা দু-চারদিন বেরিয়ে আসার দাম দিতে আর সুদ কষতে বাধ্য করে ওরাই তাকে নাজেহাল করে ছাড়বে।

কিন্তু জগদীশের ব্যাপার রেবা জানে। জগদীশের জরুরি আহ্বানে একা বেরিয়ে পড়তে চাইলে ওরা কিছু মনে করতে পারবে না।

সেভিংস ব্যাংকে জমানো সামান্য ক-টা টাকা তুলেছে টের পেয়েই কী কাণ্ড রেবা জুড়েছিল !

দেখি না খেয়ে। তুই তিন-চাররকম মিশিয়ে খাচ্ছিস, তোর সয়ে যায়, কাজে লাগে, আমি কি মানুষ নই ? দেখি না এক রকম খেয়ে কী হয়। মরি তো নয় মরব !

বিলাতি বোতল থেকে নিজেই মদ ঢেলেছিস গেলাসে। জীবনে কখনও মদ খায়নি, তামাক সিগারেট টানেনি। সর্দি হলে দু-একটিপ নস্য নিয়েছে।

জগদীশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এক চুমুকে সে গেলাসের মদটা গিলে ফেলে।

গিলতে কষ্ট হয়। গেলার পরেও এমন ভয়ানক কষ্ট হয় যে তার চিরদিনের আয়ত্ত করা রাগ পর্যন্ত যেন বিগড়ে যেতে চায়।

জগদীশের গালে একটা চড় কষিয়ে দিতে ইচ্ছা হয় !

জগদীশের অভ্যস্ত নেশার মর্ম বুঝতে খাবি খেতে খেতে বিলাতি বোতলের নেশাটুকু শুধু খানিকটা দুঃসাহসী পাল্লা দেবার বাহাদুরি দেখাতে গিলে ফেলে প্রবোধ দু-চারমিনিটের জন্য চুপ হয়ে যায়।

মাথা ঘুরতে আরম্ভ করলে চুপ না হয়ে উপায় কী !

জগদীশ বলে, ভাই বেঁচে থাকার কোনো মানে নেই। তুই বিয়ে করা বউ নিয়ে বাঁচিস। কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। তুই যা বলিস যা করিস তাই সই। তুই হলি কর্তা। বউ-ছেলেমেয়ে ঝি-চাকরের মতো

তোর কথায় ওঠে-বসে। তুই কী বুঝবি ভাই আমার প্রাণের জ্বালা ? তুই কী বুঝবি কেন আমি চিত্রাকে চিরজীবনের সাথি করে নিতে চেয়েও যাচাই করে দেখতে গিয়েছিলাম, সে আমার চিরজীবনের সাথি হবার মতো মেয়ে কি না। ভুল করেই গিয়েছিলাম সত্যি কিন্তু চিত্রাই বা আমাকে এমন ভুল বুঝবে কেন, নিজে ভুল করবে কেন ? চিত্রাও তো দিনের পর দিন আমায় যাচাই করেছিল ! আমার ভালোবাসা ধোপে টিকবে কি না, দুদিন পরে তাকে চেবানো আখের ছোবড়ার মতো ত্যাগ করব কি না, বুঝতে চাইছিল।

মাথা ঘোরা থেমে গিয়ে কষ্টবোধ কেটে গিয়ে নিজেকে প্রবোধের তখন অদ্ভুত রকম তাজা মনে হচ্ছিল।

তার মতো বুদ্ধি আর বোধশক্তি এ জগতে কারও আছে সে ভাবতেও পারছিল না।

তোকে ভালোবেসেছিল বলেই যাচাই করতে চেয়েছিল।

সেটাই তো মস্ত ভুল। ভালোবাসব—তবু যাচাই করব, এ ইয়ার্কি চলে না। ভালোবাসা খেলার ব্যাপার নয়। দু-পক্ষের যাচাই করা আগেই হয়ে যায়, নইলে ভালোবাসা জন্মে না। ভালোবাসা জন্মাবার পর আর কি যাচাই করা চলে কীসে কী হবে ? সন্তান জন্মাবার পর মা-বাবার কি হিসাব করা চলে বাচ্চাটাকে রাখব না ফেলে দেব ? কানা হোক, খোঁড়া হোক, সারাজীবন জ্বালিয়ে মারবে বোঝা যাক—সন্তানকে মানতেই হবে।

অনভ্যস্ত নেশার আকাশে উঠে না গেলে প্রবোধ টের পেত, এ জগদীশ তার ছেলেবেলা থেকে চেনা জগদীশ নয় !

গোটাচারেক সিদ্ধ করা মুরগির ডিম দিয়ে যায় সেই মেয়েটা। জগদীশ যেন পিতার মতোই উদারভাবে তার গালটা টিপে দেয়। ক্রমে ক্রমে জগদীশের ব্যক্তিত্ব যেন বনের ধারের এই নির্জন কুটিরে বসে মানস প্রসারিত করে আয়ত্ত করছিল জীবন আর জগৎ—যেন তারই নির্দেশে তারই নিয়মে তারই পরামর্শে জগৎ আর জীবন চলে, জীবনের মানে যেন সেই শুধু জানে।

মরিয়া হয়ে প্রবোধ বিলাতি বোতলটা আরেকবার একটুখানি কাত করে তার গেলাসে। অল্পই ঢালে—এত অল্প ঢালে যে জগদীশের আমোদ পাওয়া নীরব হাসি তার মুখেও হাসি ফুটিয়ে তোলে।

বোতলটা টেনে নিয়ে গলায় কাত করে জগদীশ আবার হাসে। বলে, আসল ভুলটা আমাদের দুজনেরই হয়েছিল এক—ভালোবাসাকে না মেনে যাচাই করতে চাওয়া। আমি আরেকটা মারাত্মক ভুল করেছিলাম। সেটা আমার দোষ। সেই জন্যই তো নিজের ওপর বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে। আর বাঁচতে ভালো লাগে না।

অনভ্যস্ত নেশা তীক্ষ্ণ করে দিয়েছে প্রবোধের বুদ্ধি, একেবারে চাঁছাছোলা বুদ্ধি করে দিয়েছে কিছুক্ষণের জন্য, সে ভাবে, এ তো ভারী সমস্যার কথা হল।

বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে বলে, আর বাঁচতে ভালো লাগে না বলে জগদীশ এ রকম নেশা করে—অথবা এ রকম নেশা করে বলেই তার জীবনে বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে, বাঁচতে আর ভালো লাগে না ?

সে কিছু বলবে, ভেবেছিল জগদীশ। কথা না বলে সে ভাবতে শুরু করায় জগদীশ বিরক্ত হয়ে ওঠে !

প্রবোধ নিশ্চয় নিজের সমস্যার কথা ভাবছে।

তার বউ-ছেলেমেয়ের কথা।

কিন্তু বিরক্ত হয়ে রাগ করে লাভ নেই!

এই প্রবোধকেই তাকে বলতে হবে তার প্রাণের কথা।

স্থানীয় যে ক-জন অসভ্য আদিম মেয়েপুরুষ তাকে যোগী-ঋষির সম্মান দেয় তাদের এ সব কথা শোনানোও অর্থহীন।

তারা অর্থই বুঝবে না তার কথার।

চোলাই আর মহুয়া বেশিমাত্রায় চড়িয়েছে ভেবে দুদিন চোলাই আর মহুয়ার বদলে শুধু দুধ আর ফল দেবে, ডিম আর আতা-পেয়ারা ফল দেবে!

তৃতীয় অধ্যায়

কী দ্রুতগতিতেই যে চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে সাধুবাবা জগদীশের নাম। জগদীশ নামটা নয়। সাধুবাবা নাম। জোয়ান বয়স, এমন টকটকে গায়েব বং। মুখ দেখলেই বুঝতে পারা যায় রক্ষতাটা গায়ের জোরে টেনে আনা হয়েছে, বোধ হয় তার যোগসাধনার প্রক্রিয়া দিয়েই।

ছাই-চাপা আগুনেব মতোই তার মুখে উঁকি-ঝুঁকি মারে রাজপুত্রেব বূপ।

নেশা আর উচ্ছৃঙ্খলতার এত বাড়াবাড়ি এতকাল ধবে চালিয়ে এসেও একেবাবে ধ্বংস করে ফেলতে পারেনি বহুপুবুষ ধরে গড়া তার দেহের বুনিযাদি বনেদ।

তাব বাপের বেলা পর্যন্ত চলে এসেছে শুদ্ধ সাত্ত্বিক কঠোর নিয়মতান্ত্রিক আত্ম-অপচয—মদ বেশ্যা বাইজি পার্ষদ তাবা বরাবর কনট্রোল করে এসেছে শাস্ত্রীয় সংযমে।

শোষণটা ঠিক রাখাব জন্যই এই সংযম।

শোষণের এই সংযমী গরিয়সীতাই কত শতাব্দী ধরে ভাবুক শান্ত সাধারণ শোষিতকে মোহিত দমিত আর ভীবু-কাপুরুষ করে রেখে এসেছে।

জগদীশ ভুলে যায়নি।

একটা শোচনীয় দুর্ঘটনায় চিত্রা জলপ্রপাতে আছড়ে পড়ে তলিযে গিয়ে হারিয়ে গেছে বলেই কি আর নিজের অতীত জীবনকে জগদীশ ভুলতে পারে ?

মা-কে জড়িয়ে ধরে শুতো জগদীশ। মা-ও তাকে জড়িয়ে ধরে শুতো।

রাত একটা দুটোয় বাবা বাড়ি ফিবলে মা কিন্তু কত যত্নে কত সন্তর্পণে মা-ছেলে তাদের দুজনের জড়াজড়ি কবে ঘুমানোতে ছেদ টেনে উঠে যেত।

মা ভাবত, তার বুঝি ঘুমই ভাঙেনি।

মা-ব জন্য তাকে কবতে হত ঘুম ভেঙেও ঘুমিয়ে থাকার ভান।

ঘুমের ভান করা মাথাটা বাগে দুঃখে অপমানে জ্বলে যেত জগদীশের।

মা জিজ্ঞাসাও করত না : বেশ্যা-পার্ষদ-বাইজিদের জন্য ফিরতে রাত হল কি ?

মা শুধু বলত, কিছু খাবে কি ? মাছ মাংস ডিম পরোটা সব তৈরি আছে।

মাছ খাব। কী মাছ আছে ?

খাশুা আছে, ইলিশ আছে, গলদা চিংড়ি আছে। ঝাল আর ঝোল দুবকমই আছে। আর তুমি যে পুঁটিমাছ ক-টা ধরেছিলে, সেগুলো ভাজা করা আছে।

জগুকে দাওনি পুঁটি ক টা ? ওর ছিপে ধরা মাছ ! এক একটা মাছ তুলি, ওর কী ফুর্তি ! ওকে না দিয়ে মাছগুলি আমার জন্য রেখে দিয়েছ ? ছিছি !

আমি কী জানি ? বললে ওকেই দিতাম। পরশু এইটুকু একটা মিরগেল ধবেছিলে, কাঁটায় ভর্তি। তিন রকমের ভালো মাছ রাঁধা হয়েছে, কাঁটা-ভর্তি ওইটুকু মাছ তুমি কি আর খাবে ভেবে—

ওইটুকু মাছ ? আধসেরের চেয়ে ছোটো মাছ তুললে সে মাছ আমি আনি ? জলে ছুঁড়ে ফেলে দি।

আধসেরি মাছ মস্ত মাছ ! তাও আবার মিরগেল। কাঁটা বাছতে বাছতে পিত্তি পড়ে খিদে নষ্ট হয়ে যায়। কানুর মা প্রসাদ দিতে এসেছিল, মাছটা আমি তাই ওকে দিয়ে দিলাম, পুঁটি মৌরলা ছাড়া বেচারার একটু মাছ জোটে না। রাতে বাড়ি ফিবে তুমি এক ঘণ্টার বেশি আমায় বকলে।

বকলাম ? মিছে কথা বোলো না। আমি শুধু তোমায় বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম নিজের ধরা মাছের কাছে কোনো মাছ লাগে না। জগাকে পুঁটিগুলো দিলে না, ভালো ভালো দামি দামি মাছ দিয়েছ বলেই কি ওর মনে কম কষ্ট হয়েছে ভেবেছ ? ওর ছোটো ছিপে ধরা মাছ, নিজে পাঁচ-ছটা তুলেছিল। পুঁটি তোলার কায়দা তো বেচারা জানে না, হঠাৎ একটা তুলতে পারে তো দশটা ফসকে যায়। কী রকম আকুল হয়ে ও আমাকে ওর ছিপে মাছ ধরতে বলেছিল জানো ? সেই মাছ তুমি ওকে খেতে দিলে না ! সোজা কথা বুঝবে না, বুঝিয়ে দিতে গেলে ভাববে বকছি !

বকছই তো। কালও বকেছিলে, আজও বকছ।

কাল একটা কড়া কথা বলেছিলাম তোমায় ? আজ একটা কড়া কথা বলেছি ? জগার মনে কষ্ট দিয়েছ তবু একবার তোমায় আমি গলা চড়িয়ে একটা কথা বলেছি ?

ওকেই বকা বলে—গলা চড়াতে হয় না, গাল দিতে হয় না। রাতদুপুরে একটা সোজাকথা বোঝাতে এক ঘণ্টা লেকচার ঝাড়লে সেটা বকাবকি গালাগালির বেহদ্দ হয়। কাল বোঝালে এক রকম—নিজের ধরা মাছের কাছে কী অন্য মাছ !

জগা পুঁটি খাবার আবদার ধরল—তোমার উচিত কথার লেকচার শুনবার ভয়ে আমি ওকে দু-চারটের বেশি দিতে বারণ করলাম। মাছ মাংস ডিম কত রকমের রাঁধা আছে—রাতদুপুরে বাড়ি ফিরে তুমি হয়তো নিজের ধরা ওই পুঁটির শোকে তিন ঘণ্টা লেকচার ঝাড়বে। বাড়ির রাঁধুনির সামনেই অপমানের একশেষ করবে। সেই লেকচার ঝাড়ছ—জগাকে পুঁটি দিইনি বলে ! রাতদুপুরে এক ঘণ্টা ধরে না বুঝিয়ে বেরোবার আগে দুটো কথা বলে গেলেই হত—পুঁটিগুলো জগাকে দিয়ো ! আমি কথা কইলে তুমি বিরক্ত হও বুঝি ? আমার সঙ্গে কথা বলতেও তোমার ইচ্ছা করে না ?

যতক্ষণ তোমার ঘুম না আসে, যতক্ষণ কথা বলো—ঘুমে মরে গেলেও কথা কই না ? কথা থামিয়ে নিজে ঘুমোবার আগে কোনোদিন ঘুমোতে দেখেছ আমায় ? দুপুররাতে কথা কয়ে কয়ে বকুনি সয়ে সয়ে তোমায় ঘুম পাড়িয়ে তবে আমার ঘুমোনোর ছুটি মেলে।

ডাকাত গুন্ডা প্রজাগুলোকে ঠেকিয়ে বিষয়-সম্পত্তি বজায় রাখা, এদিকে কর্তাদের মন রাখা আর ওদিকে যারা প্রজা খেপিয়ে কর্তাদের ঘায়েল করতে চাইছে তাদের সামলে চলা—এ বুঝি মেয়েলি কাজ ভেবেছ তুমি ? এ কাজে হাঙ্গামা নেই, খাটুনি নেই ? দিনকাল বদলায়নি ? অন্যের হাতে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বাবার মতো ভাঁট হয়ে মদ খেয়ে সব বজায় রাখতে পারছি ভাবছ বুঝি ? দায়টা ঘাড়ে নিয়ে তুমিই চালাও না এবার থেকে। আমি বেহাই পাই।

তোমার দায় নেওয়ার মানে জানি। মেয়েমানুষ বলেই অত বোকা ভেবো না আমায়। তোমাদের তো একটা বংশের জমিদারি। বাপ দিয়ে গেল ছেলেকে, ছেলে সব খুইয়ে শেষ করে দিল। আমার ঠাকুর্দারা তিন শরিক হয়েছিল, আজও তারা দায় সামলাচ্ছে। আমার মামারা পাঁচ শরিক হয়ে এখনও—

তোমার মামারা জোতদার।

তুমিই বা ক-দিন আর জমিদার থাকবে ? রামলালজির দেনাটাই শুধতে পারছ না জমিদারি চালিয়ে। চাইতে চাইতে ঘেন্না ধরে গেল, নয়া ফ্যাশনের সাতনরি হার একটা দিতে পারলে না আজ পর্যন্ত। ললিতবাবুর বউকে চাইতে হয়নি—নিজেই দিয়েছে।

তোমার খালি নালিশ আর নালিশ। আমি আজ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম জানো ?

ওমা, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে ? কোথায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে ? কেন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে ? কী সর্বনাশের কথা ! এতক্ষণ বলোনি আমায় ? তুমি বরং শুয়ে পড়ো, খেয়ে কাজ নেই। পাংখাটা বন্ধ করে দিতে বলি, কেমন ? ছোঁড়াটার নাকি পাংখা টেনে টেনে বুকে কী রকম একটা ঘা হয়েছে—খালি কাশে আর রক্ত তোলে। ওর মা এসে আজ পাংখা টানছে। আমার সন্দেহ হয়েছিল,

আমি বুঝেছিলাম ওর ছেলেটার নিশ্চয় যক্ষ্মা হয়েছে। আমি কিন্তু ওদের কথা দিয়েছি, বাবু সব ঠিক করে দেবে। ওর মা তাই ছেলের হয়ে পাংখা টানতে এসেছে। কী বলব বলো তো ওকে ? না না, তোমায় উঠতে হবে না, তোমায় কিছু করতে হবে না ! আমায় শুধু এক কথা বলে দাও কী করতে হবে। ওকে ছুটি দিয়ে দি ? কী বিশ্রী লাগছে পাংখার হাওয়া। এ হাওয়ায় তোমার ঘুম আসবে না। পাংখা টানা বন্ধ করে বেচারাকে ঘরে যেতে বলছি ! যতক্ষণ না ঘুমোও হাতপাখা দিয়ে মাথায় হাওয়া করব।

এই কথার নাটকের মধ্যে কখন কোন সময় ঘুমিয়ে পড়ত জগদীশ তার নিজেরই খেয়াল থাকত না।

কথাগুলি অবিকল মনে নেই। থাকা সম্ভবও নয়। কথা কাটাকাটির মোট মানে আর ধরনটা শুধু মনে আছে।

ভদ্রভাবে শান্তভাবে তাদের দীর্ঘ কলহের পালা চলত। অল্পবিস্তর মদ খেয়ে বাড়ি ফিরেও ধূর্জটি কোনোদিন মন্দাকিনীকে গলা চড়িয়ে একটা ধমক দিয়েছিল কি না জগদীশ স্মরণ করতে পারে না।

মন্দাকিনীর জন্য গভীর মমতা ছিল ধূর্জটির। তার মধ্যে ফাঁকি ছিল না—সে দরদ ছিল আন্তরিক। অজস্র অসংখ্য খুঁটিনাটি প্রমাণে এ সত্য সন্দেহাতীত হয়ে আছে।

প্রথম বয়সে, সংসারের হালচাল বুঝে উঠতে আরম্ভ করার সময়, মাঝে মাঝে দু-এক পেগ মদ খেতে শুরু করার সময়, জগদীশ ভেবেছিল, মা-র জন্য তার বাবার ওই মমতাই তাকে অসংযত হতে দিত না।

ঠাট বজায় রাখতে হত। পার্ষদ নিয়ে মদ্যপানও চলত, বাইজিও নাচত। কিন্তু ধূর্জটি কোনোদিন বেহুঁশ অভদ্র মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরত না।

ক্রমে ক্রমে টের পেয়েছিল ধূর্জটির ওই সংযমের কারণ ছিল মন্দাকিনীর জন্য তার মমতা নয়, ভয়।

মন্দাকিনীর ভাইদের কাছে, জগদীশের মামাদের কাছে, তার ঋণ জমেছিল পাহাড়ের সমান, প্রয়োজন ছিল আরও ঋণের। মন্দাকিনীকে চটাতে সে সাহস পেত না।

টানটা ছিল খাঁটি।

বোধ হয় সেই জন্যই ও রকম ভদ্রভাবে মার্জিতভাবে মাঝরাতে একটানা উপদেশ ঝেড়ে শান্তি দেবার, গায়ের জ্বালা জুড়োবার প্রয়োজন হত।

মমতা আছে কিন্তু ভয় করতে হয়। একদিন মাতলামি করলে অসভ্যতা করলে মন্দাকিনী সোজা ভাইদের কাছে, নয় মামাদের কাছে চলে যাবে।

তাই দরকার ছিল সংযমের।

সেও কি চিত্রাকে ভয় করত বলেই জীবনে প্রথম অনুভব করেছিল সংযমের প্রয়োজন ? তার অসংযমকে চিত্রা কোনোমতে স্বীকার করবে না জেনে সে সংযত হয়েছিল ?

অতীতে সে যা-ই করে থাক সেটুকু মার্জনা করতে চিত্রা রাজি ছিল কিন্তু বাকি জীবনটা সে একান্তভাবে শুধু তারই অনুগত হয়ে থাকবে চিত্রার মধ্যে এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস জাগাতে না পারলে তাকে পাওয়ার কোনো আশা ছিল না বলেই কি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে হয়েছিল যে চিত্রা তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে ?

সেদিন জানা ছিল না জগদীশের।

সন্ন্যাসী না হতে চেয়েও শুধুমাত্র চিত্রার জন্য নিজের ব্যথার পূজাটা প্রচণ্ড আত্মনিগ্রহের প্রক্রিয়ায় চালিয়ে গিয়ে নিজেকে শেষ করে ফেলার উপায় অবলম্বন করলেও এভাবে আত্মহত্যা সম্ভব করতে পারেনি বরং চড়া নেশার কড়া ওষুধে আত্মবিস্মৃতির সাময়িক বিশ্রামটুকু পেয়ে পেয়েই আত্মা তার আত্মরক্ষা করে ফেলতে পেরেছে।

ব্যথার পূজা ? আত্মহত্যা ?

অথবা আত্মরক্ষা ?

চিত্রা তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল সত্যই কিন্তু জীবনটা বদলে ফেলার প্রয়োজনেই তারও কি চিত্রাকে ভালোবাসার প্রয়োজন হয়েছিল ?

ওই জীবন আর টানতে পারছিল না, একদিন এক মুহূর্তের ঝোঁকে চিত্রাকে বুকে চেপে ধরার মতোই সহজ বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিনা কষ্টে মরণকে বরণ করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল—এই নির্জনে পালিয়ে এসে তাই বাঁচার চেষ্টা ?

প্রত্যেক দিন বিষ খেয়ে বেহুঁশ হয়। কিন্তু একান্তে বসে চিন্তা করার তো বিরাম ঘটেনি।

আগেই বরং আসল চিন্তার সময় জুটত না, সব সময় ব্যস্ত হয়ে থাকত খুঁটিনাটি ঝঞ্ঝাটের চিন্তায়। এখানে সে সব বালাই নেই। নেশা করে একঘুম দিয়ে উঠে কাজ। শুধু কী ও কেন চিন্তা করা, আসল কথাটা ধরবার চেষ্টা করা।

ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সাধু হিসাবে বেশি বেশি নাম ছড়ানো জগদীশকে বিস্মিত করে, একটু শঙ্কাও জাগায়। কী পরিণতি হবে তাকে সাধক-মহাপুরুষ করে তোলার এই প্রক্রিয়ার যার গতিরোধ করার সাধ্য তারও নেই, একমাত্র পালিয়ে যাওয়া ছাড়া।

তিন দিকে ঘিরে আছে আদিম অসভ্য মানুষের গাঁ, তারাই সব চেয়ে বেশি কাছাকাছি।

তারা জগদীশকে ভয় করে, ভক্তি করে। কিন্তু তারাই শুধু নয়। অন্য মানুষও কৌতূহল মেটাতে আর ভক্তি জানাতে আসে দূরের গ্রাম আর শহর থেকে

গ্রাম থেকে আসে চাষাভুষো মানুষ, তারা বড়োই গরিব আর বড়োই অজ্ঞ। অক্ষর-জ্ঞান আছে, রামায়ণ মহাভারত পড়তে পারে, এ রকম লোক গ্রাম থেকে আসে খুব কম।

গ্রামের চেয়ে বেশি ভক্ত আসে খোদ শহর থেকে।

শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের মানুষ।

নানারকম অর্ঘ্য ও উপচার নিয়ে আসে—টাকা-পয়সা প্রণামি দিয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে চায়।

জগদীশ বলে, টাকা পায়ে ছুঁইয়ো না। ওই মাটির হাঁড়িটাতে ফেলে দাও।

উপদেশ চায়। আশীর্বাদ চায়। পরিত্রাণ চায়। অর্থে-আনন্দে সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ চায়।

জীবনে কত যে ব্যর্থতা আব কত যে ঝঞ্ঝাট মানুষের। কত যে সমস্যা আর কত যে বিপদ।

শান্ত নির্বিকার আত্মস্থ জগদীশকে দেখে মনে হয় না যে সে ব্যাকুল কাতর কণ্ঠের আবেদন নিবেদন শুনছে। রোগশোক দুঃখ-বেদনা, শোকতাপে জর্জরিত সাধারণ মানুষের মর্মন্তুদ কাহিনিই হোক আর হাজারপতির লাখপতি হবার চেষ্টা বারবার বিফল হবার কাহিনিই হোক—সে যেন সমান নির্বিকল্পভাবে শোনে।

দুঃখী মানুষকে করুণা করাও মানস সাধনার অঙ্গ। আত্মা যেন তার ডুবে আছে ধ্যানে-সাধনায়।

চেতনার একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র সে যেন কাজে লাগিয়েছে বিব্রত মানুষের কথা শুনে উপদেশ দেবার জন্য।

তাই যদি না হবে, তবে নিমীলিত চোখে এভাবে নিথর নিষ্কম্প হয়ে যোগসাধনায় ডুবে থেকেও কী করে সে প্রত্যেকের কথা শোনে, প্রশ্নের জবাব দেয়, উপদেশ দেয় আর অন্যায় আবদার করলে তিরস্কারে মাথা নুইয়ে দেয় ?

সত্যই তো। একটা কিছু পেয়ে না থাকলে রাজার মতো ধনীর ছেলে এই বয়সে এই জঙ্গলে জংলি মানুষের সঙ্গে অকারণেই কি ডেরা বেঁধেছে !

রবিবার সকাল থেকে ভক্ত সমাগম শুরু হয়।

রবিবার শহরের ভদ্র ভক্তের সমাবেশই হয় বেশি।

হুড্রু বেড়ানো হবে। যুবক সাধক ও মহাজ্ঞানী সাধুকে প্রণাম করাও হবে।

এক রবিবারের ভোরে সপরিবারে আসে প্রতাপ।

কী বিরাট পরিবার !

চার ছেলে। বড়ো তিন ছেলের তেইশটি ছেলেমেয়ে। সাতটি নাতিনাতিনি। বাচ্চাকাচ্চা সমেত আশ্রিত আত্মীয়-আত্মীয়ার সংখ্যা এগারো।

জলপ্রপাত না দেখে এরা অবশ্য ফিরে যাবে না। তবু মনে হয়, বাঙালি যুবক সাধুবাবাকে প্রণাম জানাতেই যেন তারা এসেছে, হুড্রু জলপ্রপাতটা দেখা কলা বেচে যাওয়ার মতোই আনুষঙ্গিক ব্যাপার।

সত্তর পেরিয়েছে প্রতাপের বয়স।

ভ্রূ পর্যন্ত পেকে সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু টের পাওয়া যায় আজও প্রতাপ বিষয়বুদ্ধি, কর্মশক্তি আর সমগ্র পরিবারটির উপর প্রতাপ হারায়নি।

সকলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রতাপ কাঁধের উড়ানিটা গলায় জড়িয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানায় জগদীশকে। সোনার একটা মোহর অর্থাৎ সেকালের একটা গিনি তার পায়ে ছুঁইয়ে প্রণাম করে।

জগদীশ শান্তকণ্ঠে বলে, গিনিটা ওই মাটির ভাঁড়ে ফেলে দাও। কেন যে তোমরা আমায় টাকা পয়সা দিয়ে প্রণাম করতে আসো !

প্রতাপ গদগদ ভাষায় বলে, আপনি আমার শেষ সাধু, শেষ গুরু। আর কারও কাছে যাব না। আপনার উপদেশ শুনে যদি বুঝি উপায় নেই—ভেঙে চুরমার করে দেব সংসারটা।

আমি মারা গেলে সঙ্গে সঙ্গে চুরমার তো হয়ে যাবেই। উপায় নেই বলে আমার খাতিরে কোনোমতে এক সাথে আছে। কী অশান্তি, ওরে বাবা, আমার কী অশান্তি !

কপালে চাপড়াতে গিয়ে প্রতাপ ভোরে কেটে আসা কপালের চন্দনের দাগগুলিতে ভাঙন ধরিয়ে দেয়।

টানতে আর পারিনে বাবা। আছে তো মোটে তিনশো বিঘে জমি, গোটা চারেক বাড়ি আর আশি নব্বুই হাজার নগদ টাকা। কারবারটা টানছি বলে কোনোমতে ঠেকিয়ে যাচ্ছি। রোজগেরে ছেলেগুলো পর্যন্ত ছিনে জোঁকের মতো সেঁটে রয়েছে—ভাগটা না মারা যায়। কী অশান্তি, কী অশান্তি !

মুখ ফিরিয়ে একবার সে তাকিয়ে নেয় তার বিরাট বংশের যে মস্ত অংশটা আজ এখানে উপস্থিত আছে।

কোটিপতির ছেলে তুমি, পার্থিব সুখ ছেড়ে যোগী সন্ন্যাসী হয়েছ। তোমার বাবাও ছিলেন মহাপুরুষ, কত হাজার টাকা আমায় পাইয়ে দিয়েছিলেন ঠিক-ঠিকানা নেই। দেশ-বিদেশের জ্ঞান কুড়িয়ে এই বয়সে সংসার ছেড়ে সাধক হয়েছ। আমার অশান্তি কীসে ঘোচে আমায় বলে দিতে হবে বাবা !

তবু জগদীশ মুখ খোলে না, তেমনি নির্বিকার শান্তদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। গিনিটা প্রতাপের হাতে ধরা ছিল, হাত বাড়িয়ে সেটা সে জগদীশের সামনে মাটিতে রাখে।

এবার জগদীশ মুখ খোলে।

তোমার প্রণামি তো আমি নেব না।

কেন বাবা, কী অপরাধ হল ?

প্রণামির জন্য তুমি সোনা এনেছ ! জান না প্রণামি দিয়ে আমি কী করি ? হাভাতে-হাঘরে গরিবদের বিলিয়ে দিই।

প্রতাপ কাতরভাবে বলে, কিন্তু সোনা দিলে কী দোষ হয় সেটা তো ঠিক—

কাকে দেব সোনাটা ? সোনাটা ভাঙাতে গেলে গরিব বেচারাকে চোর বলে পুলিশে ধরবে না ? ক-টা ছাপা কাগজ আনলেই হত, ক-জনকে দিতে পারতাম !

প্রতাপ হাতজোড় করে বলে, তাই নিন দয়া করে—সোনাটাও থাক। এটা বংশের নিয়ম, গুরুকে সাধুকে ব্রাহ্মণকে সোনা ছাড়া প্রণাম করলে অভিশাপ লাগবে।

নিয়মটা নাকি চালু করে গিয়েছে প্রতাপের পিতাঠাকুর। যা ধরত তাই সোনা হয়ে যেত, গুরু তাই হুকুম দিয়েছিল টাকা-পয়সা শুধু ভিক্ষা দেওয়া চলবে—গুরুকে সাধুকে ব্রাহ্মণকে বা মন্দিরে সোনা ঠেকিয়ে প্রণাম না করলে হয়ে যাবে সর্বনাশ।

প্রতাপ ডাক দেয়, খুব মিষ্টিসুরে ডাক দেয়—ছোটো বউমা, পাঁচ টাকার নোট দাও দিকি পাঁচখানা।

রংচংয়ে শাড়ি আর একরাশি গয়নায় জমকালো করে সাজা বিশ থেকে চল্লিশ পেরোনো বয়সের কয়েকজনের পিছনে ছিল ছোটো বউ ললিতা।

নিজেকে স্বেচ্ছায় খানিকটা আড়াল করেছিল।

সামনে এগিয়ে আসতেই তাকে দেখে জগদীশ চমকে ওঠে, কয়েক মুহূর্তের জন্য ভুলে যায় যে সে যোগী সাধক, তরুণী কোনো স্ত্রীলোককে দেখে বিচলিত হওয়াটা তার একেবারেই উচিত নয়।

একটু বিহ্বল না হয়েও অবশ্য তার উপায় ছিল না।

জলপ্রপাতে হারানো চিত্রা যেন উঠে এসেছে তার সামনে।

শাড়িটা চিত্রার, চিত্রার মতোই তার দুহাতে দুগাছা শুধু চুড়ি।

গায়ের রংয়ে সোনার চুড়ির এমন মিল যে মনে হয় চিত্রার মতোই এই কারণেই সে বুঝি অঙ্গ থেকে বিসর্জন দিয়েছে আভরণের চিহ্নটুকু।

চিত্রার ছাঁচে ঢালা গড়ন।

সেকেলে উথলানো গড়নটা যথাসম্ভব চাপা দেবার জন্য ঠিক চিত্রার মতোই আধুনিকতম সাজসজ্জার কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে।

তবে মুখ একেবারে অন্য রকম।

তার মুখ দেখে জগদীশ স্বস্তি পায়।

চিত্রার মুখের সঙ্গে শুধু রঙের মিল ছাড়া কোনো মিল নেই।

লালিত্য আছে, কোমলতা আছে, লাবণ্য আছে—কিন্তু সবই যেন আছে মুখের তীক্ষ্ণ কাঠিন্যকে খানিকটা আড়াল করে যতটুকু না রাখলে নয় শুধু ততটুকু মেয়েলি ভাব বজায় রাখার জন্য।

চোখে শান্ত সজাগ দৃষ্টি—বুদ্ধির ধারে শাণিত।

পাঁচ টাকার পাঁচটি নোট গুনতে গুনতেই ললিতা একবার শাণিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে নেয় !

তাকে ঠোঁট কামড়াতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে জগদীশ সামলে নেয়।

একটু হতভম্ব প্রতাপকে সে গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে, এই পরম ভাগ্যবতী মা-টিকে তুমি কোথায় পেলে ?

মা-টিকে !

নোট ক-খানা হাত থেকে খসে পড়ে যায় ললিতার।

প্রতাপ মুগ্ধ কৃতার্থ গদগদ হয়ে বলে, আজ্ঞে যা বলেছেন, সব চেয়ে অমানুষ ভেবেছিলাম যে ছেলেটাকে, শেষ পর্যন্ত সেটাই হল মানুষ। পাট নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে নিজে কখনও সাহস পাইনি—শুনেছি অনেক ফাটকাবাজি চলে। ছেলেটা যেমন পাজি তেমনি চালাকচতুর। ভাবলাম ওটাকে পাটের লাইনে ঢুকিয়ে দিয়ে দেখি কী হয়। কথা কি শোনে ? যত বলি, তুই পারিস না পারিস তোর কোনো দায় নেই, বিশ-ত্রিশহাজার যদি যায় তো যাবে। তোকে কিছু বলব না, তুই শুধু একবার কোমর বেঁধে লাগ।

জগদীশ নির্বিকারভাব বজায় রেখে গভীর মনোযোগের সঙ্গে প্রতাপের কথা শোনে। মনের তোলপাড় ওঠা মুখে যাতে ফুটে না ওঠে সে জন্য রীতিমতো তাকে কসরত কবতে হয়।

ছোটোছেলের নাম আলোক। সে কিছুতে নামবে না পাটের ব্যাবসায়ে, সে পড়বে। পরীক্ষা পাস সে করে সত্যি—কোনো রকমে হলেও পাস করে।

একটি সত্যিকারের বিদ্বান ছেলে সারাজীবন চেয়ে আসছে প্রতাপ। মাথাওলা শিক্ষিত যে সব মানুষ চিরদিন সামনে তোষামোদ করেও মনে-প্রাণে অবজ্ঞা করে এসেছে তাকে, তাদের মতো বিদ্বান একটি ছেলে চেয়েছে।

প্রথমে আশাও করেছিল যে আলোক বুঝি তার স্বপ্ন সার্থক করবে।

কিন্তু কলেজের প্রথম পবীক্ষা পাস কবেও আলোক তাকে টের পাইয়ে দিয়েছিল যে তার বিদ্বান ছেলেব স্বপ্ন সার্থক করার কোনো ইচ্ছাই নেই।

পাস কবল। সেই অজুহাতে উড়িয়ে দিল বাবার হাজার দশেক টাকা।

ডেকে গিয়ে প্রতাপ কড়াসুরে জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমাব মনের ইচ্ছাটা কী ?

ছেলে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল, আমি মানুষ হব, বড়ো হব।

সেকেলে চালচলন আমার সয় না।

কৃতার্থ প্রতাপ বলেছিল, আমিও তো তোকে মানুষ করতে বড়ো করতে চাই বাবা ! লাট বেলাটের সঙ্গে তুই সমানভাবে বড়ো বড়ো জ্ঞানের কথা বলবি, ফড়ফড় করে ইংবেজি বলবি, তাই তো আমার সাধ ! তা লেখাপড়ায় মন দিয়ে তো করবি সেটা ? সিগ্রেট খাচ্ছিস, খা। ওটা হয়ে গেছে মুড়ি-মুড়কি, বাচ্চারাও খাচ্ছে। এ বয়সে মদ ধবেছিস কেন ? কী করে তুই বড়ো হবি, মানুষ হবি ? উচ্ছন্ন হয়ে যাবি না ?

ছেলে বলেছিল, মদ ধরিনি তো ? উপায় না থাকলে ওষুধ গেলাব মতো দু-একচুমুক খাই। বড়ো হব, মানুষ হব,—স্মার্ট ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দেব—সেকেলে গেঁয়ো ভূত হয়ে থাকলে হয় ?

দিন দিন ম্লেচ্ছ হয়ে যেতে লাগল ছেলে, দিন দিন যেন ধাতস্থ করতে লাগল সাহেবি মন মেজাজ।

কাজের মানুষ, অনেক দায়—একটা ছেলের বিষয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামায়, সময় কি আছে প্রতাপের ? খেয়ে উঠে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে আধঘণ্টা তামাক টানার অবসরটুকু ভরে রইল বিষাদ আর আপশোশে।

কিন্তু উপায় কী ? যে লাইনে এগোচ্ছে, সেই লাইনেই চলতে দিতে হবে ছেলেকে।

ছেলে কিন্তু মান রেখেছে তার।

কত কাণ্ড করে বিলেত-টিলেত ঘুরে দেড় হাজার টাকার চাকরি বাগিয়েছে, লাটবেলাটদের মহলে তার চলাফেরা।

আজও কিন্তু প্রতাপকে সে বাপের সম্মান দেয়, পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম পর্যন্ত করে।

ললিতাকে সে বিয়ে করেছিল তাকে কিছু না জানিয়েই, রেজিস্টারি আইনে বিয়ে করেছিল। কিন্তু বাপকে সে বলেছিল স্পষ্ট করেই, ইচ্ছা হলে তোমার মতেই আবার আমাদের বিয়ে দাও না ? ধরে নাও না বিয়ে আমাদের হয়নি ? তুমি চাইলে টোপর পরে বর সেজে আবার আমি ওকে বিয়ে করব।

গরিব মামা ছাড়া কেউ নেই ললিতার।

অনেক ভেবে-চিন্তে ছেলের বিয়েটা প্রতাপ মেনে নিয়েছিল, বউ-ভাত দিয়েছিল সমারোহ করে। আত্মীয়স্বজন জানাচেনা যে যেখানে ছিল সকলকে আনিয়েছিল।

ভেবেছিল হাজার পাঁচ-ছয়ে কুলিয়ে যাবে, খরচ হয়ে গিয়েছিল তেরো হাজারের উপর।

রেগে টং হয়ে গিয়েছিল বড়োছেলেরা আর তাদের বউরা।

প্রায় বেধে গিয়েছিল একটা ভীষণ রকম গৃহযুদ্ধ। কত কষ্টে কী কৌশলে যে প্রতাপ সামলে নিয়েছিল বিপদটা।

ভেবে-চিন্তে রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিল।

চিৎকার করে বলেছিল, আমার বুঝি কোনো শখ নেই, সাধ আহ্লাদ নেই ? তোমার বাজে খেয়ালে হাজার হাজার টাকা উড়িয়ে দেবে, একটা ছেলের বিয়েতে একটু আনন্দ কবব তাও তোমাদের সয় না ? কালই আমি উইল করে সবকিছু বিলিয়ে দেব। পরশু কাশী চলে যাব।

সবাই ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল।

তারপরে কঠিন অসুখ হয়েছিল প্রতাপের। এক মাস শয্যাগত হয়েছিল। ললিতা নিয়েছিল টাকা-পয়সা আদান-প্রদানের হিসাবনিকাশের ভার, আর তিনজন ম্যানেজারকে সামলাবার ভার। রোগশয্যা থেকে উঠে কাজকর্ম হিসাবনিকাশ দেখতে বসে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল প্রতাপ।

একটা মাসেই তার মোট লাভের অঙ্ক হাজার পাঁচেক বাড়িয়ে দিয়েছে ললিতা।

হিরের আংটি বা দুল না সোনার হার ?

ললিতাকে কী পুরস্কার দেবে ভাবতে প্রতাপকে রীতিমতো মাথা ঘামাতে হয়েছিল।

ভেবে-চিন্তে ও সব সেকেলে পুরস্কারের প্রথা সে বাতিল করেছিল ললিতার মতো একেলে ছেলের বউ পাওয়ার খাতিরে।

ঘড়ি ধরে নিয়মিত সময়ে ললিতা তাকে ওষুধ খাওয়াতে আসার সময় সে কিছুই বলেনি, শুধু একটু সস্নেহ দৃষ্টিতে তার চোখে চোখে তাকিয়ে খুশির ভাব দেখিয়ে তার হাত থেকে তিতো ওষুধ নিয়ে খেয়েছিল।

পথ্য দেবার সময় বলেছিল, বউমা, তুমি তো আমার ছেলের বাড়া। হিসেবে দেখলাম—ছেলেদের তুমি লজ্জা দিয়েছ বাছা। এই দায়টাই তোমায় আমি দিলাম। এই নাও তোমাব গতমাসের মাইনে।

হিরা বা সোনার গয়নাগাঁটি নয়, ব্যবসায় আসল হিসাবনিকাশ চুরিচামারির ব্যাপার দেখে শুনে মাসে তার পাঁচ হাজার টাকা লাভ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য হাজার টাকার চেক। এবং মাঝে মাঝে এই কাজ করার জন্য প্রত্যেকবার একটি করে চেক পাবে এই প্রতিশ্রুতি !

ললিতা কেঁদে ফেলেছিল।

এমনকী আমি করেছি যে আমায় এত বাড়ালেন বাবা ?

করেছ বইকী। একটা ছেলেকে মানুষ করতে পারলাম না, পয়সা উপায়ের কায়দা শেখাতে পারলাম না। সবার পেছনে শুধু ব্যয়। পাঁচশো টাকা ঘরে আনবে তো উড়িয়ে দেবে হাজার টাকা। পরের মেয়ে ঘরে এসে তুমি আমার আয় বাড়িয়েছ, আমার একমাত্র রোজগেরে ছেলের স্লেচ্ছ হয়ে যাওয়া ঠেকিয়েছ। তুমি অনেক করেছ মা !

নিজের সংসারটিকে নিয়ে হাজির হয়ে জাঁকিয়ে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতাপ নিজের সংসারেব কাহিনি শোনায়, আবার নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলিও করে। তিন ঘণ্টার উপর !

অন্য ভক্তরা এসে কিছু কিছু প্রণামি দিয়ে প্রণাম করে, এক রকম চুপচাপ বসে আছে।

পাঁচখানা পাঁচ টাকার নোট প্রণামি দিয়েছে প্রতাপ, সপরিবারে সে যদি আসর জুড়ে থাকে একটা বেলা, নীরবে দেখা আর শোনা ছাড়া কীইবা করাব বা বলাব থাকে দু-চারআনা থেকে দু-এক টাকা প্রণামি দেনেওলা তাদের !

জগদীশ নীরবতা ভঙ্গ করে হঠাৎ গর্জন করে ওঠে, তুমি শান্তি পাবে না। তুমি মহাপাপী।

সকলে চমকে ওঠে। অস্ফুট কয়েকটা আওয়াজ শোনা যায় ভয়ের, তারপর শ্বাসরোধ করা নীরবতায় থমথম করতে থাকে ভক্তের আসরটা।

বুড়ো প্রতাপ শুধু চমকায় না, ভয় পেয়ে কঁকিয়েও ওঠে না। নিশ্চল নিশ্চুপ হয়ে সে চোখ বোজে।

অনেককাল অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে সে কারবার করেছে।

সে ব্যাপার জানে।

চারিদিকে চোখ বুলিয়ে এবার ধীর উদাত্ত কণ্ঠে জগদীশ বলে, মানুষের চেয়ে টাকার দাম তোমার কাছে বেশি। নিজের ছেলেমেয়ে বউ নাতিনাতনির সঙ্গে পর্যন্ত তোমার টাকার সম্পর্ক। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, টাকা মাটি, মাটি টাকা। তোমার কাছে টাকাই সব। ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশনের—

জগদীশ থামে। মাঝে মাঝে সে লম্বাচওড়া ইংরেজি কথা বলে, অনায়াসে সহজভাবে প্রায় ইংবেজের মতোই উচ্চারণ করে বলে।

বলতে বলতে থেমে যায়।

তাবপব বিদেশি কথা ক-টার সহজবোধ্য বাংলা তর্জমা করে আবার শুরু করে তার কথা।

বলে, পশ্চিমি ম্লেচ্ছ সভ্যতায় এটাই সব চেয়ে বড়ো পাপ। এই পাপে তুমি ডুবে গেছ, টাকা টাকা করে আজও তুমি পাগল।

লাভ বাগানোটাই তোমার কাছে সার কথা।

সহজভাবে সকলের নিশ্বাস পড়ে। সকলে স্বস্তিবোধ করে।

অন্য কোনো বিশ্রী মহাপাপ নয়—প্রতাপ টাকা বেশি ভালোবাসে এই মহাপাপ ! অনেক টাকা আছে তবু আরও অনেক অনেক টাকা চায়—এই পাপে প্রতাপ মহাপাপী !

প্রতাপ চোখ মেলে যেন খুশির সঙ্গেই বলে, কী করব তবে ?

কী করলে আমার অশান্তি যাবে, সংসারটা টিঁকবে ?

প্রায়শ্চিত্ত করো।

কীভাবে করবো প্রায়শ্চিত্ত ?

বলে দেব, বুঝিয়ে দেব। সারাজীবন পাপ করে এক দিনে কী প্রায়শ্চিত্ত হয়, রেহাই মেলে ?

জগদীশ ইঙ্গিত করে।

মোটা জঙ্গুলে কাপড় পরা কালো মেয়েটা কাচের বড়ো গেলাসে ঘন সবুজ পানীয় এনে দেয়। সবুজ না হয়ে নীল হলে হয়তো ললিতা ভাবতে পারত, জীবন-সমুদ্র মন্থন করা বিষ।

এক চুমুকে গেলাস শেষ করে জগদীশ বলে, ধীরে ধীরে বুঝবার চেষ্টা করো, মরার পরেও সংসার টিঁকিয়ে রাখার দায় তোমার নয়। সংসারটা ছত্রখান হয়ে যাবে বলে আসলে তোমার অশান্তি নয়—তোমার টাকাগুলো নষ্ট হবে বলে তোমার এত কষ্ট।

তোমার এমন মায়া টাকার যে আজ যদি বলি আমি তোমার এ মায়া কাটিয়ে দেব—তুমি আঁতকে উঠবে !

আমি সংসারী মানুষ, পাঁচজনকে নিয়ে সংসারে থেকেই মরতে চাই বাবা—সন্ন্যাসী হতে চাই না !

জগদীশ হেসে বলে, দেখলে ? টাকার নেশা কাটবার কত ভয় তোমার ? ভয় নেই, আমি তোমার প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে দিয়ে আসব।

প্রতাপ কৃতার্থ হয়ে বলে, বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন !

তোমার অশান্তি রোগটা সারাতে যাব।

ললিতা ভেবে-চিন্তে জিজ্ঞাসা করে, আপনার ভোগের কী ব্যবস্থা করব ?

জগদীশ হেসে বলে, আমি কি ভোগ করতে যাব ? ভোগের ব্যবস্থা করতে হবে না। এই প্রপাতের জল শুধু রেখো—শুধু জল খাব। এখানকার জল ছাড়া আমি খাই না জানো তো ?

প্রতাপের বাড়ির মেয়েদের কাছে হুবুহু নবীন সন্ন্যাসীর গল্প শোনে নগেনের বাড়ির মেয়েরা।

ললিতা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, প্রথমটা ভড়কে গিয়েছিলাম সত্যি, একদৃষ্টে এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন যেন গিলে খাবেন ! এ কেমন সাধু, মেয়েবউ দেখে ধাত ছেড়ে যায় ? কেন ওভাবে দেখছিলেন, কথার ছলে বাবাকে বুঝিয়ে দিয়ে আমাকেই শেষে লজ্জা দিলেন। আমার মধ্যে নাকি অসাধারণ কিছু আছে, তাই বিশেষভাবে আমাকে লক্ষ করছিলেন। আমার ভেতরটা দেখছিলেন !

ললিতার মুখে বেদনার ছাপ পড়ে।

অনুতপ্ত প্রাণের বেদনার ছাপ। সখেদে বলে বাজে বদ লোকের চাউনি দেখে দেখে সত্যি আমাদের বিশ্রী ম্যানিয়া জন্মে যায়। খাঁটি যোগী সাধকের চাউনিটাও চিনতে পারি না। বাবার সঙ্গে ওনার কথাবার্তা শুনতে শুনতে হঠাৎ আমার খেয়াল হল—আরে, কী বোকার মতো আবোল-তাবোল ভাবছি ! উনি তো গাঁজাখোর ভিখিরি সাধু নন। বড়োলোক বাপের এক ছেলে, কত বড়ো বিদ্বান, বিলাতে পড়তে গিয়েছিলেন, কত বছর ইউরোপ ঘুরে এসেছেন। হাই সোসাইটির কত শত শক্ত সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে উনি মিলেছেন মিশেছেন। সব ছেড়ে যোগসাধনা ধরেছেন, আমার মতো একজনের দিকে উনি তাকাবেন খারাপ চোখে !

সুদর্শনাও অন্য সকলের মতোই অভিভূত হয়ে শুনছিল, হঠাৎ যেন সজাগ হয়ে সে বলে, বড়োলোকের এক ছেলের কিন্তু অনেক রকম পাগলামির রোগ জন্মায়। নানারকম উদ্ভট খেয়াল চাপে। দেশে-বিদেশে হইহুল্লোড় একঘেয়ে লাগল, ওভাবে আর রস মেলে না, তাই খেয়াল হল কিছুদিন যোগী সেজে মজা করা যাক।

সুদর্শনা একটু হাসে।—আমি অবশ্য দেখিনি তোমার যোগী পুরুষটিকে—খাঁটি না শখের যোগী জানি না। তবে এ রকম লোক স্বাদ বদলাতে যোগীও কিন্তু সাজে। বড়োলোকের সেকেলে মুখ্যু ছেলে বিগড়ে গেলে শেষ হয়ে যায়, একালের কিছুই জানে না, পাঁচজন একেলে বন্ধুর সঙ্গে একেলে উচ্ছৃঙ্খলতার মজাটা লুঠতে চায়। তলিয়ে যাবার উপক্রম ঘটলে আর কূলকিনারা পায় না—জানে না তো কীভাবে কোনটা ধরে ভরাডুবি সামলে নেবে। জগদীশবাবুরা একেলে ব্যাপার খানিকটা বোঝেন, সভ্য-জগতের সস্তা মজা লুটতে লুটতে কাবু হলে একেবারে ডিগবাজি খেয়ে সাধু বনে গিয়ে সামলে নিতে পারেন।

সুদর্শনার কথা সবাই শোনে। অনিচ্ছা নিয়েও বাধ্য হয়ে শোনে। তাদের সকলেরই অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী—কেন যে ছিঁটেফোঁটা বিদ্যার স্বাদ দেওয়া হয়েছিল। তাদের শুধু জব্দ করা সুদর্শনাদের কাজ।

একেবারে মুখ্যু করে রাখলে, সেকেলে করে রাখলে, তারা তবু অনায়াসে ঝংকার দিয়ে উঠে সুদর্শনাকে থামিয়ে দিতে পারত বক্তৃতা দিতে শুরু করামাত্র।

কী একটু বিদ্যা চাখিয়েছে, কী একটু স্বাদ দিয়েছে নতুন যুগের জীবনটায়—সুদর্শনা মাস্টারনির মতো উপদেশ আর বক্তৃতা ঝাড়তে শুরু করলে প্রাণটা এমন তড়বড় করে যে শেষ পর্যন্ত না শুনে পারা যায় না।

ললিতা খানিকক্ষণ গুম খেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করে, আমি তো বলিনি, তুমি কী করে জানলে ওনার নাম জগদীশ ?

সুদর্শনা হাসে না।

গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করে, রমলাকে মনে আছে ললিতাদি ?

তোমাদের রাঁচির পাগলা গারদে দিদিকে দেখতে এসে তোমাদের বাড়িতে উঠত ? তোমাদের সঙ্গে কী যেন একটা সম্পর্ক আছে, ঠিক মনে নেই। দিদির কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলত—তোমাদের ওই যোগী সাধু জগদীশবাবুর জন্যই নাকি তার দিদির ওই অবস্থা হয়েছিল, রাঁচির পাগলা গারদে আসতে হয়েছিল।

ললিতা রেগে টং হয়ে বলে, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না। বাবা ছ-মাস চেষ্টা করে একবার বাড়িতে আনতে পারলেন না, সংসারের ভোগে-সুখে ওঁর এমন বিতৃষ্ণা—উনি তোমার বন্ধুর দিদিকে পাগল করেছিলেন। আবোল-তাবোল কথা বললেই হল !

রমলার দিদি খুব সরল আর ইমোশন্যাল ছিল।

সে দোষ কি জগদীশবাবুর ?

কেন উনি ওকে বেচারাকে পাগল করে দিয়েছিলেন !

এ রকম তেজি বিদ্রোহী পুরুষের সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে গিয়েছিল কেন রমলার দিদি ? সামলাতে পারবে না, তবু লোভের বশে পতঙ্গের মতো আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল কেন ? রমলার দিদি করবে বোকামি, শেষকালে নিজের দোষে পাগল হয়ে দায় পড়বে ওই মানুষটার ঘাড়ে !

বাঃ, বেশ লজিক দিচ্ছ তো ! লাভে পড়ার ভান করে রমলার দিদিকে ঠকাল, সে বেচারা পাগল হয়ে গেল, ও বজ্জাতটার দোষ নয় তো কার দোষ ?

বাজে বকিসনে মিছে। বাপের কাঁড়িকাঁড়ি টাকা, আবার এদিকে ভীষণ একেলে। যেমন টাকা, তেমনি স্মার্ট—আবার যেমন চেহারা তেমনি তেজ। রমলার দিদি জীবন পণ করেনি মানুষটাকে বাগাবার জন্য ? জীবনটা নয় নষ্টই হয়ে যাবে ভেবেই জেনে-বুঝে হিসেব করে মানুষটাকে বাগাতে এগোয়নি ? বোকার মতো জীবন পণ করে বাজি খেলেছে, হেরে গেছে। তারপর সে মরে গেছে না পাগল হয়েছে সে কথা আলাদা।

এমন নীরস নিষ্ঠুর উগ্র কী করে হল ললিতা ?

হুড্রু ফলস দেখতে গিয়ে জগদীশের আশ্রম ঘুরে আসার পর কী যেন হয়েছে ললিতার।

গোড়ায় নয়।

জগদীশকে কিছুতেই বাড়িতে আনা যাচ্ছে না টের পাবার পর। নিজে বলেছিল আসবে। ছ-মাস চেষ্টা করেও তাকে আনা গেল না।

ললিতার সমস্ত হিসাবনিকাশ বিচারবিবেচনা ভণ্ডুল হয়ে গেল ! নিজেকে মনে হল বোকা আর বাঁকা। সস্তা আর বুদ্ধিহীনা। লাখটাকা উড়িয়ে ছড়িয়ে দিয়ে, হতে চাইলে নিজেও দু-একবছরেই লাখপতি হতে পারে জেনে, জগদীশ যেন ওই জঙ্গলের ধারে কুঁড়েঘরে দিনরাত্রি কাটাচ্ছে প্রতাপকে বাগাবার জন্য ! যার বাপ রেখে গিয়েছে লাখটাকা, যে একটু আলগাভাবে চেষ্টা করলেই বাগাতে পারে লাখটাকা—সে চাইবে সাধু সেজে অরণ্যের প্রান্তে তপস্যা করার ধোঁকা দিয়ে তার শ্বশুরের ঘাড় ভেঙে কিছু টাকা বাগাতে !

নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে ললিতা।

ছিছি করেছে।

জগদীশের অতীত জীবন টেনে এনে কেউ তাকে ভণ্ড প্রতিপন্ন করতে চাইলে তাই ললিতার এত রাগ হয়।

প্রথম দিন আশ্রমে তাকে মা বলে ডেকে আর তার দিকে বিশেষভাবে তাকানোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে একবার জগদীশ তাকে লজ্জা দিয়েছিল। তাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিতে অস্বীকার করে আবার জগদীশ তাকে জব্দ করেছে—নিজের কাছে ধরা পড়িয়ে দিয়েছে তার অন্তরের হীনতা আর দীনতা।

প্রতাপের সঙ্গে ইতিমধ্যে সেও কয়েকবার জগদীশকে দর্শন করতে গিয়েছিল। জগদীশের শ্রীমুখ থেকে নানালোকের নানা প্রশ্নের জবাবে উপদেশ ও ব্যাখ্যা শুনে এসেছে।

শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে রোমাঞ্চ হয়েছে ললিতার।

খাঁটি সাধক ছাড়া কি কেউ সব বিষয়ের সব কথা এমন স্বচ্ছ ও গভীবভাবে জানতে ও বুঝতে পারে, এমন সহজ সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতে পারে ?

ললিতা ঠিক করেছে—আর বোকামি করা নয়, পাকামি করা নয়। আর বিচার নয়, সন্দেহ করা নয়। এবার থেকে অন্ধ ভক্তি।

কে জানে, নিজের যে বিশ্রী মেয়েলি খুঁতটা আজও সে গোপন রাখতে পেরেছে, আলোককে টের পেতে দেয়নি যে মিলন তার কাছে প্রাণান্তকর অভিশাপের সমান, বিয়ের আগে যে খুঁতের কথা জানা থাকলে জীবনটা সে কুমারী থেকেই কাটিয়ে দিত—হয়তো জগদীশের দয়ায় সেরেও যেতে পারে সেই খুঁতটা !

তাই সুদর্শনা যে দিন থমথমে মুখ নিয়ে এসে প্রায় খোঁচা দিয়ে বলে যে, কপাল খুলেছে তোমাদের। রবিবার সকালে উনি পদার্পণ করবেন তোমাদের বাড়িতে—

ললিতা ভাবতেও পারে না সে জগদীশের কথা বলছে।

সরকারি একজন বৃহৎ ব্যক্তির পদার্পণ করার কথা ছিল তাদের বাড়িতে—মোটে দুদিনের জন্য ফ্লাইং ভিজিট।

ঘণ্টা খানেকের একটা কাজ আছে। গুরুতর ব্যাপার, পাহাড়ি উপজাতীয় মানুষদের সঙ্গে লড়াই করার মতো ব্যাপার। এমনি একটা বিশ্রী বীভৎস অন্যায় করা হয়েছে বুনো অসভ্য মানুষদের উপর যে তারা খেপে যেতে বাধ্য হয়েছে।

বন্দুক-কামানধারী সরকারের বিরুদ্ধে তারা তীর ধনুক খান্ডা ঝান্ডা বর্শা বল্লম নিয়ে রুখে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে।

তুচ্ছ ব্যাপার ! তবু সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার দু-একঘণ্টার মধ্যে ব্যাপার বুঝে মিস্টার দাস সবদিক সামলে রাখার সহজ সরল উপায়টা বাতলিয়ে দিতে পারবেন বটে। তার পরামর্শে বুনো মানুষগুলোকে শান্ত এবং নত করা যাবে বটে—কিন্তু ?

সুদর্শনা মিস্টাব দাসের কথা বলছে ভেবে ললিতা বিরক্তির সঙ্গে বলে, মিস্টার দাস তো রবিবার বিকেলে আসবেন। তিনি আসছেন জরুরি কাজে। তোমার কাছে তার আসাটা এমন জরুরি ব্যাপার কেন হলো ভাই ?

মিস্টার দাসের কথা তো আমি বলছি না।

কার কথা বলছ ?

তোমাদের নতুন গুরুদেবের কথা বলছিলাম। আসবেন বলেও যিনি না এসে এসে, তোমাদের তুচ্ছ করে করে—

ও ! তাই বল। এমন করে তুই কথা বলিস, কী বলছিস বুঝতেই পারি না। মেয়েছেলের পেটে বেশি বিদ্যে হলে বুঝি এমনি কথার ছিরি হয় ?

মোটাসোটা সুদর্শনা রাগ করলেই তার টেবোটেবো ফরসা গালে যেন সিঁদুরে মেঘের ছোঁয়াচ লাগে, নীল শিরার লাল রংয়ের আর্টিস্টিক প্রকাশ ঘটে।

বেত বা চাবুক মারলে নীল শিরায় লাল রক্ত শুধু আঁকতে পারে কালচে দাগ,—সে রকম নয়।

গায়ে পড়ে খোঁচা দিয়ে অপমান করতেই সে এসেছিল, আক্রমণের কায়দা চোখের পলকেই যেন পালটে দেয় সুদর্শনা।

হঠাৎ সে হাতের তালুতে মাথা নামিয়ে মিনিট খানেক শব্দ করে নিশ্বাস নেয়। মাথা তুলে বলে, কী বিশ্রী বদ্ধঘর তোমার ললিতাদি ! এ ঘরে ছেড়ে দিলে কেষ্ট-রাধা প্রেম ভুলে যেত—ঘটে জিয়ানো মাছের মতো হাঁপ কাটত !

ললিতা টের পায় সুদর্শনার সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলেই ঝগড়া বাড়বে। সুদর্শনাকে কি বলা সম্ভব যে কিছুদিন আগেও বিলাত-ফেরত মহাজ্ঞানী মহাপুরুষ ওই মানুষটার জন্য তার কিছুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না ?

সুদর্শনার বিয়ে হয়নি।

ওকে কি বোঝানো যাবে যে এ দেশে কুমারী মেয়ে যা ভাবে, বউ আর মা হতে শুরু করে তাকে ভুলে যেতে হয় আগেকার হিসাবনিকাশ ?

ক্রমে ক্রমে কত বড়ো অসম্ভবকে সম্ভব করার আশা জগদীশ তার মধ্যে জাগিয়েছে, কেন আর কীভাবে জাগিয়েছে, সে সব কথা কি বুঝবে কৃতী ছাত্রী কুমারী সুদর্শনা ?

ছ-মাস সাধ্য-সাধনার পর মহাসাধককে গৃহে পদার্পণ করাতে রাজি করানো গেছে।

জটা নেই। ফোঁটা চন্দন কাটে না। গেরুয়া বসন পরে না। ধুতি লুঙ্গি পায়জামা সব সমান রকম সই। গেঞ্জি বা শার্ট গায়ে চাপায়। গরম লাগলেই খালি গা !

বিরাট বিস্তৃত পাহাড়ি বন। তার ধারে আলপনার ছবির মতো গাঁ। তারই একটা সভ্যতা-বিবর্জিত কুঁড়েঘরে হাজার খানেক বাংলা ইংরেজি সংস্কৃত বই আর এককোণে আধহাত উঁচু থালা বাসন রাখার মাটির বেদিতে মাটির হাঁড়িকুঁড়ির সঙ্গে কয়েকটা কাচের গ্লাস এবং কয়েকটা দেশি-বিলাতি মদের বোতল।

কোথাও কোনো গোপনতা নেই !

শহুরে একজন শিক্ষিত শুদ্ধ সাত্ত্বিক পুরুষ করজোড়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, মদ খান কেন ?

তুমি খাওয়াও তাই খাই। এই জঙ্গলে এসে ধাওয়া করেছ তোমার জীবন-সমস্যার অঙ্ক আমায় কষে দিতে হবে। তুমি অভাব অশান্তির মাতাল, বিলাতি মদ না খেয়ে তোমার মতো নেশাখোরকে লাগসই কথা বলে ভোলাতে পারি না, তাই মদ খাই।

কৃতার্থ হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে গদগদ ভাষায় সে বলেছিল মদ খাওয়া আপনাকে মানায়। বিষপান নীলকণ্ঠেরই কাজ। মদ খাওয়া নিয়ে কত লুকোচুরি লোকের, মস্ত অপরাধ করছি। আপনি বোতল সাজিয়ে রেখেছেন, জিজ্ঞাসার অবকাশ না রেখে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছেন, ও সব আপনার চলে। মহাদেব যেমন কণ্ঠ বিষে নীল করে রেখেছেন সবাইকে জানাতে যে তিনি বিষ খান—বিষ আর অমৃত শুধু তাঁর কাছেই সমান।

মানুষটাকে মনে হয়েছিল পাগল। পরে জানা গিয়েছিল সে একজন নামকরা কবি ও সাহিত্যিক।

চতুর্থ অধ্যায়

জগদীশ শহরে আসবে প্রতাপের বাড়িতে পদার্পণ করবে। শুধু প্রতাপের বাড়িতে নয়, আরও অনেকের বাড়িতে উৎসাহ-উত্তেজনা দেখা যায়।

পাহাড়ের উঁচু শহর।

দার্জিলিংয়ের সঙ্গে তুলনা হয় না। কিন্তু শীতের আমেজ শুরু হতে না হতেই যেন সকাল-সন্ধ্যায় শীত জোরালো হয়ে ওঠে। অকাল বর্ষা নামলে তো কথাই নেই। হাড়কাঁপানি ঠান্ডা পড়ে। সকালে জগদীশ আসবে। রাত্রে শুরু হল বৃষ্টি। যার জের চলল সকালেও।

সকলে হতাশ হয়ে ভাবল, এই আবহাওয়ায় জগদীশ কি আর আসবে ?

গাড়ি পাঠাতে জগদীশ নিষেধ করেছিল। তবু প্রতাপ ভোর রাত্রে গাড়ি পাঠিয়ে দেয়। মনিব নিজে ডাকতে এলেও মাইনে করা ড্রাইভার নন্দ বালিশ থেকে মাথা পর্যন্ত তোলে না, বলে, আজ্ঞে আমার জ্বর হয়েছে, গায়ে-হাতে ভীষণ ব্যথা।

ভাগিনী-জামাই আশ্রিত তরুণকে দিয়েই অগত্যা গাড়ি পাঠাতে হয়। তরুণকে গাড়ি চালাতে দিতে ভয় করে। স্পিডের দিকে ওর এমন বিশ্রী রকম ঝোঁক যে কবে কখন সর্বনাশ ঘটিয়ে বসে ভাবলেই হৃৎকম্প হয়।

ভোর রাত্রে পাহাড়ি উঁচুনিচু রাস্তায় সে কী স্পিডে গাড়ি চালিয়ে জগদীশের আশ্রম ঘুরে ফিরে আসে, অনায়াসে টের পাওয়া শুধু তার যাতায়াতের সময়ের হিসাব কষে।

যাই হোক, অক্ষত গাড়িটা নিয়ে জীবন্ত মানুষটা যে ফিরেছে তাই ঢের।

কিন্তু ব্যাপার কী ? খবর কী ?

আশ্রমে পৌঁছে তরুণ শুনতে পায় এই জল-বাদলার শীতের মধ্যে রাত তিনটেয় জগদীশ গোরুর গাড়িতে শহরে রওনা হয়েছে !

ফিরবার পথে তরুণ নাগাল ধরেছিল গোরুর গাড়িটার।

গাড়ি থামিয়ে জগদীশকে বলেছিল, এখনও তো আদ্দেক রাস্তা বাকি। আমার গাড়িতে নেমে আসুন, চটপট পৌঁছে যাবেন। ছইয়ের নীচে খড়ের বিছানায় আধ-শোয়া জগদীশ মাথা তুলেও তাকায়নি।

বেশ যাচ্ছি ঢকাস-ঢকাস করে। ঠিক সময়ে পৌঁছে যাব।

সকলকে গরম জামা-চাদর বার করতে হয়েছে, গায়ে চাপাতে হয়েছে অকাল বর্ষার অস্বাভাবিক শীতে।

জগদীশ গোরুর গাড়ি থেকে নামে খালি গায়ে আলগা একটা পাতলা সুতির চাদর জড়িয়ে। গাড়ি চালিয়ে এনেছে জিরাই। তার গায়ে মোটা নিরেট চটের মতো বুনো সুতির চাদর।

সবাই ব্যাকুল হয়ে ভাবে যে এই কনকনে ঠান্ডায় জগদীশ উড়ানি গায়ে দিয়েছে, এটা কি বাহাদুরি দেখানো ?

সুদর্শনা সবার আগে মুখ খুলে প্রশ্ন করে, এর কোনো মানে হয় ? ঠান্ডা লেগে অসুখ করবে না ?

জগদীশ হাসিমুখে তাকে অভয় দিয়ে বলে, যার কোনো সুখ নেই, তার কখনও অসুখ হয় ?

সকলে ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে। হ্যাঁ, একটা গুজব তারা শুনেছে বটে।

রক্তজমাট করা খাঁটি শীতের রাত্রি। বনের রাত্রিচর হিংস্র পশু পর্যন্ত আশ্রয়ে মুখ গুঁজে আছে।

কম্বল গায়ে জড়িয়ে জগদীশ রওনা দিত হুড্রু জলপ্রপাতেব দিকে। বরফের মতো ঠান্ডা পাষাণে কুয়াশা-ঢাকা পূর্ণিমার চাঁদের ক্ষীণ আলোয় ভীতিকর রহস্যময় প্রপাতের দিকে চেয়ে বসে থাকত।

একদৃষ্টে। ধ্যানীর মতো, যোগীর মতো, ঋষির মতো।

অন্য সকলে মেতে যায় জগদীশকে নিয়ে, সুদর্শনা জিরাইকে ডেকে নিয়ে যায় নিজেদের বাড়িতে।

বুড়ো বুনো মানুষটাকে আদর করে বসায়, স্টোভ ধরিয়ে চা করে দেয়, খাবার খাওয়ায় !

বাড়ির সকলে প্রতাপদের বাড়ি গেছে জগদীশের বিলম্বিত পদার্পণকে সংবর্ধনা জানাতে।

নিশ্চিন্ত মনে সুদর্শনা প্রশ্ন করে, রাতদুপুবে সত্যি উনি জল-টোরপায় যান ? সারারাত বসে থাকেন ?

জল-টোরপা ! জিরাইয়ের হাসি পায়, বাগও হয়। তবু সে হাসে না, ক্ষমা করে। কে জানে কোথায কার কাছে শুনেছে জলপ্রপাতের বুনো ভাষার নাম, কী শুনে কী বুঝে কীসে জড়িয়ে গিয়ে সুদর্শনার কাছে সে নামটা হযেছে জল-টোরপা !

বুড়ো জিরাই হাসিমুখে চা খায়, কথা কয় না। সুদর্শনা অনর্গল প্রশ্ন করে যায়, জিরাই শুধু মাথা হেলিয়ে হেলিয়ে জানায় যে সব প্রশ্নই সে শুনছে।

তাবপর পৃথিবীর সেরা জ্ঞানীব মতো বলে, বাবার কথায় জল-টোরপা চলে। বাবা বললে নামে, বললে থামে।

সুদর্শনা টেব পায়, মনে মনে জিবাই হাসছে, মানুষের ভৌতিক শক্তিতে অন্ধ বিশ্বাসী বুনো বুড়ো খোকা সেজে তার সঙ্গে রসিকতা কবছে।

এমন আশ্চর্য হযে যায় সুদর্শনা যে রাগ করার কথা তার মনেও পড়ে না। জগদীশকে দেবতার মতো ভক্তি করে কিন্তু জিরাই জানে মানুষের মুখের হুকুমে জলপ্রপাত থামে না, চলেও না।

জগদীশের শিক্ষার ফল ?

অথবা-- ?

তার মুখ দেখে জিরাই এবার নিজে থেকেই তার কৌতূহল মেটায়, জগদীশের কথা বলে। গোড়াব দিকে জগদীশ মাঝে মাঝে মাঝরাত্রে প্রপাতে যেত, পাথরে বসে সাধনা করত। শীত বর্ষা গ্রাহ্য করত না।

ফাঁকি নয়, বানানো গুজব নয়। শুধু জিরাই নয়, আরও পঞ্চাশ-ষাটজন সাক্ষী আছে—নিজের চোখে যারা জগদীশকে মাঝরাত্রে একা প্রপাতের দিকে যেতে দেখেছে, সাত রাত সেখানে বসে যোগসাধনা করতে দেখেছে।

স্টোভটা পাশেই জ্বলছিল। চা-খাবার করতে করতেই জিরাইকে পাশে বসিয়ে সুদর্শনা শুরু করেছিল তার জেরা কবার আলাপ।

কোথা থেকে ভৌতিক বাতাস আসে, পিছনে ঝুলানো শাড়ির আঁচলটা দোলা খেয়ে গিয়ে স্টোভের আগুনে জ্বলে ওঠে।

উবু হয়ে বসেছিল জিরাই, সঙ্গে সঙ্গে হাঁটুতে ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে এগিয়ে কড়া হাতের তালুর চাপড়েই ধরা আঁচলটা নিভিয়ে দেয়।

সুদর্শনা যেন স্বপ্ন থেকে জাগে।

হাতে ছ্যাঁকা লাগেনি তো তোমার ? মলম লাগিয়ে দেব ? জিরাই শুধু মাথা নাড়ে।

সুদর্শনা ভেবেছিল, পনেরো-বিশমিনিটের বেশি লাগবে না জিরাইকে কাছেই নিজেদের খালি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করতে।

এরা এখনও মিথ্যা বলতে শেখেনি, আদিম সত্যের কবলেই এখনও এরা পড়ে আছে। সরলভাবে দরদ দেখিয়ে ডেকে আদর করে ভালোমন্দ খেতে দিলে বুনো মানুষটার মুখ খুলে যাবে।

জানা যাবে মাঘের রাতেও জগদীশের প্রপাতে গিয়ে সারারাত সাধনা করার গুজবটার সত্য-মিথ্যা।

হাতঘড়ির দিকে চেয়ে সুদর্শনা টের পায়, দেড় ঘন্টা কেটে গেছে জিরাইকে জেরা করতে !

মাথাটা ঘুরছিল। অস্বস্তিবোধ হচ্ছিল। কিছুই সে বুঝতে পারল না বুনো অসভ্য মানুষটাকে দেড় ঘন্টা জেরা করে।

জিরাইকে সে বিদায় দেয়।

ছেলে এবার তুমি ফিরে যাও। পথ চিনে যেতে পাববে ?

ছেলে ? ছেলে বানালি ?—-আনন্দের হাসিতে যেন ফেটে পড়ে জিরাই !

জিরাই চলে গেলে খালি বাড়িতে নিজের ঘরে একলা বসে সুদর্শনা ভাবে, কী বুঝতে চেয়ে সে কী বুঝল ? দেহমনটাই বিগড়ে গেল নিজের।

ঝোঁকের মাথায় নয়। আত্মহত্যার নেশায় নয়। জগদীশ তবে সত্যই হুড্রুতে মাঝরাত্রে যেত যোগসাধনা করতে ?

সেই মারাত্মক সাধনা তাকে এমন মহাপুরুষত্ব দিয়েছে যে প্রতাপবাবুরা তাকে একটিবার বাড়িতে আনার জন্য ছ-মাস ধরে সপরিবারে সাধনা করবে ?

তার বাড়ির ছেলেবুড়ো মেয়ে-পুরুষ সকলে যোগ দেয় সেই সাধনায় ?

সারাদিন কাটে রাঁচি শহরে।

কলকাতা লন্ডন থেকে পৃথিবীর এ শহর ও শহর চষে এসে রাঁচি শহরের গা-ঘেঁষা খাঁটি আদিম অরণ্যের মধ্যে অসভ্য আদিবাসীদের সঙ্গে বাকি জীবনটা সংক্ষেপে শেষ করে দিতে দেশি বিলাতি জংলি নেশাটা বেপরোয়া হয়ে চালাতে গিয়েই জগদীশ টের পেয়েছিল এভাবে মরা তার আত্মহত্যা করার চেয়ে সহজ হবে না।

চিত্রার মানের জন্য তার মৃত্যু শুধু কষ্টকর হবে না- -অর্থহীন হবে।

বহুদিন পরে শহরের সভ্য মানুষদের মধ্যে দিনটা কাটাতে কাটাতে বারবার জগদীশের মনে প্রশ্ন জাগে : এইখানেই কি জের মিটবে ? অথবা এমনিভাবে হাত বাড়িয়ে জীবন তাকে আবার টেনে আনবে শহরে ?

পঞ্চম অধ্যায়

দিন দিন আরও বিচিত্র হয়ে ওঠে দর্শনার্থীদের সমাবেশ। ছাত্ররা পর্যন্ত আসতে শুরু করে।

সকলকে সামলায়। সকলের প্রাণকে নাড়া দেওয়ার মতো কথা বলে। দেশ-বিদেশের মানুষ আর দেশ-বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো কথাই যেন তার অজানা নেই।

নগেন ও প্রতাপেরা মিলেমিশে সপরিবারে যেদিন গিয়েছিল তার আশ্রমে সেদিন সে ধর্ম সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছিল কুড়ি-বাইশজন কলেজের ছাত্রকে।

তারাও পৌঁছেছিল কিছুক্ষণ আগেই। সবেমাত্র প্রশ্ন করা শুরু হয়েছিল।

কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে জগদীশ হঠাৎ কড়াসুরে বলে, তোমরা কি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে এসেছ, না, সত্যি তোমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য আছে ?

একটি ছেলে বলে, আমরা সিরিয়াসলি জানতে বুঝতে এসেছি সার ! মুখ দেখেই টের পাওয়া যায় ছেলেটি খুব চালাক-চতুর এবং ভাবুক প্রকৃতির।

এই বুঝি তোমাদের সারের কাছে সিরিয়াসলি জানতে বুঝতে আসার নমুনা ! কী জানতে বুঝতে চাও তাই তোমাদের ঠিক নেই। যার যেমন খুশি এলোমেলো প্রশ্ন করে যাবে আর আমি আবোল-তাবোল বকব ? নিজেরা পরামর্শ করে ঠিক করে আসতে পারোনি কী তোমাদের জিজ্ঞাসা ?

আরেকটি ছেলে বলে : আমাদের অনেক রকম জিজ্ঞাসা কিনা—

এ ছেলেটিও কম সিরিয়াস নয়। তার ব্যাকুল উৎসুক ভাব থেকেই তা টের পাওয়া যায়।

মাস্টারমশাইদের জিজ্ঞাসা কোরো। আমি এলোমেলো প্রশ্নের জবাব দেব না।

চালাক-চতুর ভাবুক ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে বলে, আমাদের ভুল হয়ে গেছে সার। একটু সময় দিন, আমরা প্রশ্নগুলি ছকে ফেলছি।

জগদীশের দিকে পিছন ফিরে তারা গোল হয়ে বসে এবং গুঞ্জরিত মুখরিত হয়ে ওঠে। মনে হয় না জগদীশকে কী প্রশ্ন করা হবে এ বিষয়ে কোনোদিন তারা একমত হতে পারবে !

কয়েক মিনিট পরেই কিন্তু তাদের মুখরতা থেমে যায়। দেখা যায় চালাক-চতুর ভাবুক ছেলেটি আলোচনা চালাবার নেতৃত্ব নিয়েছে। মিনিট পাঁচেক ধরে সে ছোটোখাটো একটা বক্তৃতা দেয়—তারপর অভিজ্ঞ ও দক্ষ নেতার মতো বৈঠকের আলোচনা পরিচালিত করে কাগজে-কলমে সর্বসম্মতিক্রমে প্রশ্ন ছকে জগদীশের দিকে ঘুরে বসে।

বলে, আমাদের প্রধান জিজ্ঞাসা তিনটি। ধর্ম কী ? ভগবান কী ? বিজ্ঞান সত্য না ধর্ম সত্য ? আপনার জবাব শোনার পর হয়তো আমরা আরও দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব।

জগদীশ একটু হেসে বলে, এটা কি তোমাদের ডিবেটিং ক্লাবের মিটিং ? আমি যেটুকু জানি যেটুকু বুঝি বলব—তর্ক করতে পারব না।

আমরা কি তর্ক করতে এসেছি সার ? আপনার কথা শুনতে এসেছি। আপনার কথা কীভাবে নেব, কতটা মানব কতটা মানব না সেটা আমরা ঠিক করব, আপনাকে ভাবতে হবে না।

তোমার কী নাম ?

বরেন দত্ত। আমি গুণময় দত্তের ছেলে।

ফিলজফার গুণময়বাবুর ছেলে ? বেশ, বেশ। কী পড়ছ ?

বি এসসি। ফোর্থ ইয়ার।

প্রতাপ ও নগেনের পরিবার এবং সমবেত অন্যান্য ভক্তেরা নীরবে কলেজি ছাত্রদলটির সঙ্গে জগদীশের আলাপ-আলোচনা শোনে।

তাদের যেন কোনো প্রশ্ন নেই, তারা যেন কোনো আশা নিয়ে আসেনি।

জগদীশ হাসিমুখেই বলে, তোমাদের তিনটে প্রশ্নই অর্থহীন। কেন অর্থহীন জানো ? এ সব প্রশ্নের জবাব তোমাদের কোনো কাজে লাগবে না। এটাই কি ছাত্রদের আসল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে—ধর্ম, ভগবান আর বিজ্ঞানের মিল কতটা ?

জগদীশ মাথা নাড়ে।—ওই প্রশ্নগুলি তো তোমাদের প্রাণের প্রশ্ন নয়, আসল প্রশ্ন নয় !

ছাত্রেরা চুপ করে থাকে। অন্য সকলেও চুপ করে থাকে।

জগদীশকে তারাও খানিকটা জেনে-বুঝে গিয়েছে বইকী। তার প্রশ্নের জবাব দেবার স্টাইল খানিকটা ধরতে পেরেছে বইকী।

তিনটি প্রশ্নের নিগূঢ় প্রশ্নের জবাবে জগদীশ কী বলে শুনবার জন্য সকলেই কান খাড়া করে ছিল। সকলেই কমবেশি হতাশাবোধ করে। জগদীশ কি এড়িয়ে গেল প্রশ্নগুলি ?

এমন তো সে কোনোদিন করে না !

জগদীশের মুখে কৌতুকের হাসি ফুটতে দেখে সকলে আশ্চর্য হয়ে যায়।

কাজেই আমাকে এ সব প্রশ্ন করা তোমাদের চ্যাংড়ামি ছাড়া আর কিছু নয়। কোনোদিন ভাবো না ধর্ম কী—ভাববার দরকার হয় না। ও তো জানাই আছে, ধর্ম মানে কুসংস্কার। ভগবান কী তাও জানাই আছে—তিনি হলেন আঁধার ঘরের বোকা মানুষদের ভোলাবার জন্য আলোর ঘরের মানুষদের কল্পনা—বিরাট একটা ধাপ্পা। বিজ্ঞান তো ডালভাত। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে পড়তে শুনতে দেখতে আকাশে উড়তে, হাতের কাছের সূক্ষ্ম অদৃশ্য জিনিস আর কোটি মাইল দূরের সূর্যের চেয়ে হাজারগুণ বড়ো অদৃশ্য পদার্থ দেখতে—

জগদীশ আবার সকৌতুকে হাসে।

সকলে কৃতার্থ হয়ে নড়েচড়ে বসে। না, এড়িয়ে যাবে কেন। প্রশ্নগুলি কী ধাঁচের বিবেচনা কবতে হবে তো ! জগদীশ ভূমিকা করছে।

ধর্ম দিয়ে যা হয়নি, ভগবান দিয়ে যা হয়নি—বিজ্ঞান তাই করেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেব ব্যাখ্যা করেছে, কীসে কী হয়, কেন হয় মানে বুঝিয়ে দিয়েছে—আবার কাজে করে দেখিয়ে দিয়েছে বিজ্ঞান শুধু কথা নয়, হাতেনাতে বিজ্ঞান নিজেকে প্রমাণ করে করে এগোয়। বিজ্ঞান শুধু জ্ঞান নয়- -বিজ্ঞান।

বরেন মুখ খুলতে যেতেই সে হাত বাড়িয়ে তাকে চুপ করে থাকতে ইঙ্গিত জানিয়ে বলে, বিজ্ঞানের মূল কথাটা মুখস্থ করে জেনেছ, ভেবেছ বৈজ্ঞানিক বনে গিয়েছি। ধর্ম কী, ভগবান কী, না ভাবলেও চলবে। বিজ্ঞানে বাতিল হয়ে গেছে ধর্ম আর ভগবান।

বরেন আবার মুখ খুলবার উপক্রম করতেই সুদর্শনা রেগে গিয়ে প্রায় ধমকের সুরে বলে, চুপ করে থাকুন না পাঁচ মিনিট ? উনি কী বলছেন আগে শুনুন না ? তারপরেই নয় চ্যাংড়ামি করবেন !

জগদীশ খুশি হয়ে বলে, রেগে উঠে না বুঝে ঝোঁকের মাথায় ধমক দিয়ে বলেছ, কিন্তু বলেছ ঠিক কথাই। বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞানের ছাত্রের এ রকম অধৈর্য অস্থিরতা হাতেনাতে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের মতো দেখিয়ে দেয় জগতে আজ ধর্মান্ধতার পাশাপাশি বিজ্ঞানান্ধতাও আছে। তাই তো কষ্ট হল মনে, তাই তো বিদ্বান বুদ্ধিমান নওজোয়ানদের বলতে হল তোমরা আমায় চ্যাংড়ার মতো প্রশ্ন করেছ।

এবার জগদীশ প্রশান্তভাবে হাসে।

বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে জানে না বিজ্ঞানের আসল ভূমিকা কী—এটা কত বড়ো আপশোশের কথা তোমরাই বলো তো ? ধর্মবিশ্বাসকে উৎখাত করা ভগবানকে বাতিল করা—এই কি বিজ্ঞানের কাজ,

বিজ্ঞানের আসল কথা ? বিজ্ঞান কি হিন্দু-মুসলিম ক্রিশ্চান ইত্যাদি ধর্মের বিরুদ্ধে গজানো নতুন আরেকটা ওই জাতের ধর্ম ? বিজ্ঞান জানে মানুষের প্রয়োজনেই ধর্ম, মানুষের প্রয়োজনেই ভগবান— প্রয়োজনটা বাতিল না করে ধর্মবিশ্বাস বা ভগবানকে দুটো যুক্তি দিয়ে আক্রমণ করে বাতিল করার ছেলেমানুষি কি বিজ্ঞানের পোষায় না মানায় ? ও সব মানুষের প্রয়োজন কেন তাই নিয়ে বিজ্ঞান মাথা ঘামায়,—কোনো অবস্থায় কেন মানুষের ভগবান দরকার হয়, কোন অবস্থায় কীভাবে মানুষ নিজেই ভগবান হতে পারে জানবার বুঝবার চেষ্টা করে। ধর্মের সঙ্গে সোজাসুজি কোনো বিরোধ নেই বিজ্ঞানের, বিজ্ঞান কখনও কোনো ধর্মকে গাল দেয়নি, কখনও দেবেও না। ভগবান আছেন কী নেই, বিজ্ঞান তা নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামায়নি, কোনোদিন ঘামাবেও না।

অনেকবার দমিয়ে দেওয়া হয়েছিল বরেনকে, মুখ খুলতে গিয়েও কথা বলতে পারেনি। এবার সে যেন ফেটে পড়ে। চিৎকার করে বলে, বিজ্ঞান ধর্মকে মানে ?

তার এই ঔদ্ধত্যে সমাবেশ গুঞ্জরিত হয়ে ওঠামাত্র হাসিমুখে দু-হাত প্রসারিত করে সকলকে জগদীশ চুপ করিয়ে দেয়।

তোমরা সবাই অস্থির হয়ো না। তোমরা আমায় শিক্ষা দিলে বটে—নতুন শিক্ষা দিলে। বাবার শ্রাদ্ধ করার সময় ঘরের লোকদের সঙ্গে আমার একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের বংশের নিয়ম বাপের শ্রাদ্ধে অন্নসত্র খুলতে হবে--যে আসবে তাকেই তিন দিন ভরপেট অন্ন দিতে হবে। সকলে বারণ করেছিল। ভীষণ দুর্ভিক্ষের কাল, কয়েক শো ভিখারিই তো শুধু আসবে না। দারুণ আকালে তারাও আসবে যারা মরে গেলেও ভিক্ষে করতে বার হবে না কিন্তু বাপের শ্রাদ্ধে কেউ সার্বজনীন নেমন্তন্ন জানিয়েছে শুনলেই সপরিবারে এসে হাজির হবে। আমি কারও কথা শুনিনি, জিদ করে অন্নসত্র খুলেছিলাম। তিন দিনের ধাক্কা সামলাতে সব চেয়ে বড়ো খাস তালুকটা বেচে দিতে হয়েছিল। উপোস করে যারা মরছে তাদের খাওয়ানোর জন্য নয়—নিজের জিদ বজায় রাখার জন্য। যা খুশি করার জিদ বজায় রাখার জন্য তার আগে তিনটে তালুক বাঁধা দিয়েছিলাম, লাখ টাকার মতো ঋণ করেছিলাম। তাতে আমার আপশোশ হয়নি। বাপের শ্রাদ্ধের নিয়ম মানার জিদ রাখতে, তিন দিন যে আসবে তাকেই খাওয়ানোর জিদ রাখতে তালুকটা দিতে হয়েছিল বলে মাথার চুল ছিঁড়েছিলাম।

গুম খেয়ে গেছে আসর। জগদীশ টের পায় সবার মনের মোট কথাটা। প্রসঙ্গ পালটে গেল ? ছেলেরা পুরো জবাব পেল না ? নিজের কথা বলতে শুরু করল জগদীশ।

আবার জগদীশ হাসে।

ধান ভানতে শিবের গীত গাইছি ভাবলে তো সবাই ?

তার হাসি আর প্রশ্নের কায়দায় এক মুহূর্তে মনের মোড় ঘুরে যায় সকলের আবোল-তাবোল কথা কী বলতে পারে জগদীশ—নিজের কথা বলা কি তার পেশা !

কী কথায় কী কথা কেন টেনে এনেছে নিজেই সে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবে নিশ্চয়।

এই জিদের চেহারা হল দুরকম। একটা চেহারা—ফাঁকা অহংকার। লোকে কী বলবে, লোকে কী ভাববে মনে করে কেঁউকেঁউ করছে মনটা—সেটাই প্রকাশ পাচ্ছে লোকের কাছে বাহাদুরি করার চেষ্টায়। তালুক বেচে মাথার চুল ছিঁড়ব, চিরদুর্ভিক্ষের দেশে তবু চালিয়ে যাব তিন দিনের অন্নসত্র। জিদটার আরেক চেহারা হল জ্ঞানের অহংকার। আমি যেটুকু জেনেছি সেটুকুই চরম জ্ঞান। আমরা সবাই জানি অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী, কিন্তু কেন ভয়ংকরী তা জানি না। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান বাড়িয়ে চলার সাধনায় চিরদিন সব চেয়ে বড়ো বাধা হয়ে থেকেছে আমিত্বের অহংকার। আমি যেটুকু জানি সেটা জানাই যথেষ্ট—এই অহংকার। সকলের দিকে চেয়ে কয়েক মুহূর্ত জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থেকে জগদীশ আমোদের হাসিতে শব্দিত হয়ে ওঠে।

ভাবছ তো আমি মানুষের নিন্দা করছি ? দোষ দেখাচ্ছি ? না-বিদ্যা অল্পবিদ্যাওলাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব চেয়ে বড়ো শত্রু বলছি ? বরেনকে বুঝিয়ে দিচ্ছি ওদের অল্পবিদ্যার চ্যাংড়ামিই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব চেয়ে বড়ো বিপদ ? তোমরা ভুল কথা ভাবছ—আমি যা বলতে চাই তার উলটো কথা ভাবছ !

কেউ কথা বলে না।

মানুষের ধর্ম ভগবান জ্ঞান-বিজ্ঞানে সভ্যতা কীসের ওপর দাঁড়িয়েছিল, এখনও দাঁড়িয়ে আছে ? সত্যের ভিত্তি ছাড়া দাঁড়াবার কোনো অবলম্বন ছিল না মানুষের, আজও নেই। সত্যকে ধরেই মানুষ এতদূর এগিয়েছে, আরও এগোবে। তোমার আমার মুশকিলটা কী জানো ? সত্য কী তার নানারকম ব্যাখ্যা শুনি, নিজেরাও নানারকম মনগড়া ভাবার্থ করে নিই। তবে এ বিভ্রান্তি কেটে যাচ্ছে। সত্য কী তাই নিয়ে যে নানারকম ধারণা, এ যুগে আমরা এটাকেও সত্য বলে জানতে পেরেছি, মানতেও পেরেছি। সকলে নয়—কিছু লোকে পেরেছি। সত্য সম্পর্কে ধর্ম আর বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎটা এবার ধরবার চেষ্টা করো। বিজ্ঞান বলে আমরা যতটা জেনেছি ততটাই সত্য,– অনেক সত্য আমরা জানি না। নতুন সত্য জানার পর হয়তো এখন যেটা সত্য বলে জানি সেটা মিথ্যা হয়ে যাবে কিন্তু যতদিন বিজ্ঞানের বিচারে এটা সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে থাকবে ততদিন এটাই আমাদের কাছে সত্য।

বরেন প্রশ্ন করে, কিন্তু কতগুলি মূলনীতিকে বিজ্ঞান কি চিরদিনের জন্য অভ্রান্ত বলে না ? নতুন আবিষ্কারের ফলে আজকের একটা থিয়োরির বদলে নতুন থিয়োরি হতে পারে—এটা বিজ্ঞান মানে। কিন্তু বিজ্ঞান কী বলে না, চিরকাল দুভাগ হাইড্রোজেন আর একভাগ অক্সিজেন মিলে জল হবে, অন্য কিছু হবে না?

না। বিজ্ঞান অমন একগুঁয়ে নয়।

বরেন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

জগদীশ বলে, চিরদিন সীমাহীন অনন্ত এ সব কথার মানেটাই বিজ্ঞানে গ্রাহ্য—সীমাহীনকে মগজে একটা ধারণার রূপ দেবার চেষ্টা বিজ্ঞান করে না। পদার্থের রূপান্তর বিজ্ঞানের একটা সত্য। কাজেই বিজ্ঞান কী করে চিরদিনের কথা বলবে ? একদিন হয়তো হাইড্রোজেন বা অক্সিজেন বলে কিছু পৃথিবীতেই থাকবে না, অন্য কিছু হয়ে দাঁড়াবে। বিজ্ঞান তাই বলে, এখনকার অবস্থা যতদিন থাকবে দু-ভাগ এই হাইড্রোজেন আর এই অক্সিজেন মিলে জলই হবে, অন্যকিছু হবে না।

সুদর্শনা বলে, এবার ধর্মের সত্য আর বিজ্ঞানের সত্যের তফাতের কথা বলুন।

জগদীশের মুখে হাসি দেখা দেয়।—সত্য আবার ধর্মের বা বিজ্ঞানের হয় নাকি ? সত্যকে একভাবে জানা আর মানা হল ধর্ম, অন্যভাবে জানা আর মানা হল বিজ্ঞান। বিজ্ঞান কীভাবে সত্যকে নেয় বলেছি—নতুন সত্য অথবা সত্যের নতুন রূপ আবিষ্কৃত হতে পারে এটা বিজ্ঞান মানে কিন্তু অনাবিষ্কৃত অপ্রমাণিত সত্য বিজ্ঞানের কাছে সত্য নয়। ধর্ম বলে, আমি সমগ্র সত্য জানি, চিরন্তন সত্য জানি। ভগবান বা ভগবানের মতো কোনো সত্যকে মূল ধরে নিয়ে ধর্ম বাস্তব জগতের সত্যকে বিচার আর ব্যাখ্যা করে। সমস্ত ধর্মেই যে অন্য সবকিছুর সঙ্গে মানুষের সামাজিকভাবে বাঁচার নিয়মনীতির বিধান রাখতে হয়, এটা কখনও খেয়াল করেছ বরেন ?

বরেন মৃদু ও কাতরস্বরে বলে, আপনার বুঝিয়ে দেবার প্রসেসটা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি বলে—

আমি তো রাগ করিনি ভাই।

ভাই !

প্রতাপেরা যাকে বাবা বলে ডাকে, কলেজের একটা চ্যাংড়া ছোঁড়াকে সে বলছে ভাই !

জগদীশ গম্ভীর মুখে শান্তকণ্ঠে বলে যায়, তোমার কথাব জবাব দিতেই এত কথা বলেছি। একটা মানুষের নিজের চেতনাতেই কত বিরোধ, একই ভাবেব কত বিপরীত ভূমিকা। তোমার আমার চিন্তায় কত অমিল আছে ভাবো তো ? বিজ্ঞান ধর্মকে মানে বলছি ভেবেই তুমি গেলে চটে ! কেন চটলে শুনবে ? মানা কথাটা মানে তুমি বুঝছ এক রকম, আমি বুঝি অন্য রকম। আমি কোন অর্থে বলেছি বিজ্ঞান ধর্মবিশ্বাস মানে, ভগবান মানে ? যে অর্থে বলা যায় বিজ্ঞান কুসংস্কার মানে, পাপকেও মানে ! ধর্মবিশ্বাস আছে, বিপাকে পড়ে মানুষ ভগবানকে ডাকছে—এই বাস্তব সত্যটাকে বিজ্ঞান উড়িয়ে দেবে কেন ?

বরেনের মুখে হাসি ফোটে।

এবার বুঝেছি !

কুঁড়েতে ফিরতে সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু নেশা শুরু করার জন্য আজ যেন তেমন ব্যাকুলতা নেই।

ধীরে সুস্থে সে নেশা শুরু করে। তাপ্পি এটা-ওটা জোগান দিয়ে যায়, তাকে জিজ্ঞাসা করে রাত্রের খাবার তৈরি করে।

রাত্রে জগদীশ খাবে কি খাবে না কিছুই ঠিক নেই—অধিকাংশ রাত্রেই সে কিছু খায় না।

তাপ্পির পরিপুষ্ট সুগঠিত দেহটার দিকে চেয়ে আজ একটি প্রশ্ন জাগে জগদীশের মনে : নারীদেহের কামনা যে তার একেবারে শেষ হয়ে গেছে, কোনো নারীদেহ স্পর্শ করার কথা কল্পনা কবলেও গভীর বিতৃষ্ণায় সর্বাঙ্গ যে তাব কুঁকড়ে যেতে চায়, চিত্রার জন্য মনোবেদনাই কি তার একমাত্র কারণ ? এই যে কড়া বিষ সে পান করে চলেছে দিনের পর দিন, খাদ্যের জন্য খিদে পর্যন্ত যা নিস্তেজ করে দেয়—তার কি কোনো প্রভাব নেই তার কামনা ঝিমিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ?

টের পাওযা যায় তাপ্পি আজ একটু অস্বস্তিবোধ করছে।

ঠিক বটে, বাত হয়ে গেছে।

সকাল থেকে তাপ্পি তাব সেবা করে সন্ধ্যাব পব পর্যন্ত—ততক্ষণে নেশা চড়ে যায়। তাপ্পিকে সে হুকুম দেয়, এবাব যা, ভাগ।

তাপ্পি চলে যেতে একটু দেরি করলে গর্জন করে ওঠে।

আজ রাত হয়ে গেছে বলেই কি তাপ্পি অস্বস্তিবোধ করছে !

তার ভয়ে ?

অথবা তার মরদের ভয়ে ?

তাপ্পির মরদ কিরপা অন্যের পরামর্শে শহরের মিউনিসিপ্যালিটিতে কাজ করতে চলে গিয়েছিল। তাপ্পিকেও সঙ্গে নিতে চেয়েছিল, তাপ্পি যায়নি।

নোংরা বীভৎস কাজ, কঠিন খাটুনি। কিন্তু জীবন সেখানে বড়ো মজাদার। ধাঙড় মহল্লায় সবাই মিলে নেশা করা, মাঝে মাঝে পোষা শুয়োর পুড়িয়ে হইহুল্লোড় করা—এ সব মজা কি আর ময়লা ঘাঁটার খাটুনি না খেটে মেলে !

স্বভাব বিগড়ে গেছে কিরপার। উপজাতীয় মরদের জীবনযাত্রার রীতিনীতি মেনে চলা তার পোষায় না।

তারা মেয়ে-পুরুষ খেটে খায়, খুশি হলে মরদ মেয়েমানুষকে মারধোর করবে আর সে নিরুপায়ের মতো তা সয়ে যাবে, এ অনিয়মের ধার তারা ধারে না।

শহর থেকে কিরপা নেশার ঝোঁকে তাপ্পিকে গালাগালি করার, চড়চাপড় মারার স্বভাব নিয়ে এসেছে।

জগদীশের কাজ আর সেবা করে তাপ্পি যা পায় তাতেই চলে যায়—কিরপা টের পেয়ে কিছুদিন থেকে শহরে ধাঙড়ের কাজে খাটা বন্ধ করছে। এখানে এসে নিষ্কর্মা হয়ে বসে আছে।

ধাঙড় মহল্লায় উৎসব হবে খবর পেলে তাপ্পির কাছে পয়সা চেয়ে নিয়ে হইচই করে আসতে যায়।

তাপ্পির মুখে এ সব শুনেছিল জগদীশ, জিজ্ঞাসা করেছিল, তাড়িয়ে দিস না কেন ?

কতবার তাড়িয়ে দিয়েছে, কতবার বাপের সঙ্গে ঠিক করে ফেলেছে সামাজিকভাবে বিয়েটা বাতিল করে নেবে—কিন্তু কিরপাকে নিয়ে হয়েছে ফ্যাসাদ।

নেশা কেটে গেলে সে তাপ্পির পা জড়িয়ে ধরে, ক্ষমা না করা পর্যন্ত ছাড়ে না।

তোকে খুব ভালোবাসে, না ?

ভালোবাসার মানে তাপ্পি জানে না, সে নীরবে জগদীশের মুখের দিকে চেয়েছিল।

জগদীশের মনে পড়ে কালও বাড়াবাড়ি করায় কিরপাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কিরপা চলে গেছে তাপ্পি ?

নঃ ! উ যাবেক নাই !

খাবে কী ?

উ জানে !

কিরপাকে বলেছিলি তুই আমার মেয়ে, তুই আমার মা ?

তাপ্পি মুখ বাঁকায়।

তুমার ব্যাটা শহরে ময়লা ঘাঁটে। বদ বনে গেছে।

ঘরের খোলা ঝাঁপটার আড়ালেই বুঝি ছিল কিরপা।

ভিতরে ঢুকে বলে, খুন কবব।

জগদীশ বলে, কব। খুন কর। কাকে খুন করবি ? মোকে না মোর ওই মা-কে ?

খুন করার কোনো আদিম অস্ত্রও কিরপা আনেনি, খালি হাতে খালি গায়ে রুখে এসেছে।

মা ? ও তুমার মা ?

সব মেয়ে আমার মা। এই বেটি হল আমার ঘরের মা।

আমাকে ভাত খাওয়ায়, মদ খাওয়ায়, সামলে চলে।

কিরপার বেশভূষায় অনেক দিন শহরে ধাঙড়গিরি করার ছাপ নেই—পরনে তার বুনো তাঁতে বোনা তুলোর সুতোর চটের মতো মোটা দেড় হাত কাপড়।

শুধু চেহারায় ছাপ পড়েছে শহরের, শুধু মুখের ভাবে।

একলা ঘরে জগদীশ ভাবে, আজ এত ভালো কেন তার মেজাজ ? কই, সারাদিন তো চটেনি দু-একবারের বেশি ! কিরপাকে পর্যন্ত একটা ধমক দিল না !

ষষ্ঠ অধ্যায়

উদ্‌ভ্রান্ত জীবন কি এনে দিয়েছে উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তা আর অনুভূতি ? মাঝে মাঝে জগদীশের এমন উদ্ভট মনে হয় নিজেকে এবং জীবন ও জগৎকে !

বড়ো বড়ো কথা আজও সে ভাবে, সূক্ষ্ম চিন্তা করতে পারে—সব সময় না হলেও। বড়ো কথা, সূক্ষ্ম কথা বলে জ্ঞানী অভিজ্ঞ বিষয়ী এবং বয়স্ক ভদ্রলোকদের ভক্তে পরিণত করতে পারে।

জগদীশ জানে ধন-মান রূপযৌবন শিক্ষাদীক্ষা অনেক কিছু বাতিল করে বনবাসী হয়েছে বলেই শুধু নয়—এ সব ওদের শুধু টেনে আনে তার কাছে।

কিন্তু তেজ আর কথার জোরেই সে ওদের স্থায়ীভাবে বশ করেছে। নইলে বনবাসী সাধু বলে দর্শন করতে এসে প্রণামি দিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করেই ওরা যথেষ্ট হয়েছে ভেবে বিদায় নিত—দু-একজন ছাড়া আর আসত না।

কিন্তু মানে কী সব কিছুর ?

তার প্রেমের মানে ? জীবনের মানে ? বুনো মানুষগুলির বাঁচার মানে ? শহরের মানুষগুলির জীবনের মানে ? বনে আত্মহত্যা করতে এসে ধীরে ধীরে তার সাধু হয়ে ওঠার মানে ?

অতল গভীর এক নতুন হতাশা ঘনিয়ে আসে—যা ভাবাবেশের হঠকারিতায় চিত্রাকে জলপ্রপাতে বিসর্জন দেওয়ার চেয়ে যেন ভয়ানক !

আরও কড়া ব্যথায় যেন ঢের বেশি টনটন করে হৃদয়-মন ! নেশার ঘুম কিছুতেই আর রাতভোর টানা চলছিল না। ভোর হবার অনেক আগে, ব্রাহ্ম মুহূর্তের অনেক আগে ঘুম ভেঙে যায়।

একবারমাত্র সে চেষ্টা করেছিল আবার নেশা চড়িয়ে ভাঙা ঘুম জোড়া দিয়ে আবার একটু ঘুমিয়ে ব্যথার বাতটা পোহাতে। পরদিন প্রায় বিকাল পর্যন্ত দেহমনের অকথ্য বীভৎস যন্ত্রণা তাকে নিজের শরীরের রক্তবাহী শিরা চিরে দেবার অথবা আমগাছের ডালে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়বার জন্য উতলা করে তুলেছিল।

সেই থেকে এমন আতঙ্ক জন্মে গিয়েছে যে রাত দুটোয় নেশার ঘুম ভেঙে গেলেও সে আর ঘুমোবার কৃত্রিম চেষ্টার ধার ঘেঁষে না। ভাবে আর বই পড়ে।

সে রাত্রে কুঁড়েতে বই ছিল মাত্র একখানা--তরুণের লেখা প্রথম কবিতার বই 'ভারতের প্রেতাত্মা।'

নিজেই পয়সা খরচ করে ছাপিয়েছে, বোধ হয় পাসের জোরে বিয়ে করে পাওয়া পয়সায়। সকলে নিন্দা করলেও বইটা খুব বিক্রি হয়েছে—হয়তো সকলের বেশি বেশি নিন্দা করার জন্যই।

ওই বইখানা ছিল।

তরুণ আত্মার প্রচণ্ড আর্তনাদের কান্নায়-ভরা বীভৎস মর্মান্তিক বই—সুন্দরের কল্পনায় রঙিন জীবনকে দাঁতে-নখে ছিঁড়ে ফেলে দেহের রক্তমাংস নাড়িভুঁড়ির স্বরূপ দেখিয়ে জীবনকে অতি-বাস্তব আর সুন্দরকে মৃদুতা মিষ্টতা বর্জিত ভীষণরূপে দেখাবার জন্য লেখা বই।

আর ছিল ঠোঙার কতগুলি টুকরো।

আদিম জঙ্গলের প্রান্তে তার এই বুনো কুঁড়েঘরেও শহরে ছাপানো খবরের কাগজের টুকরা দিয়ে তৈরি করা ঠোঙা পৌঁছে গেছে।

জগদীশ পর্যন্ত টের পেয়ে জেনে গিয়ে আমোদ বোধ করেছে যে খবরের কাগজের দৈহিক গতির পরিণতি মুদিখানায় মাল বেচার ঠোঙায়।

মাঝে মাঝে কখনও-সখনও দু-একটা ঠোঙা ছিঁড়ে জগদীশ দু-একটুকরো খবরে চোখ বুলোত।

সেদিন রাত্রে তরুণের বইটা পড়ে খুঁজে খুঁজে ঠোঙা আর ছেঁড়া ছাপানো কাগজের টুকরো সংগ্রহ করে তন্নতন্ন করে পড়ে রাতটা ভোর করতে চেয়েছিল—

টেরও পায়নি কখন রাত ভোর হয়ে গিয়েছিল। কখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে গিয়েছিল রোদ উঠবার আগের স্নিগ্ধ আলো।

জীবনের বিচিত্র শব্দের ছাপা মন্ত্রে ডুবে গিয়েছিল মরণের ব্যথার নীরবতা।

তারপর দু-মাসের মধ্যে জগদীশের কুঁড়েতে বই জমেছে শ-পাঁচেক।

তিন-চারখানা আস্ত দৈনিক খবরের কাগজ তার কুঁড়েতে পৌঁছায়—অনিয়মিতভাবে। তবে পৌঁছায়।

কী তাড়াতাড়িই যে নাম ছড়ায়। কীভাবে যে বেড়ে চলে ভক্তের ভিড়।

প্রবোধ প্রায় নির্জন দেখে গিয়েছিল বন্ধুর কুঁড়ে—এক বছর পরে সেই কুঁড়েঘরের কাছে তোলা নতুন প্রকাণ্ড আটচালাটা ছুটির দিন ভক্ত সমাগমে জনাকীর্ণ হয়ে থাকে !

আটচালাটা প্রতাপ করে দিয়েছে। জগদীশ থাকে তার আদিবাসীদের ছোটো ভাঙা কুঁড়েটাতেই।

অন্য প্রসঙ্গে ছাড়া ধর্মের কথা ভক্তি-বিশ্বাসের কথা বলে না। চমকপ্রদ অথবা মর্মগ্রাহী কোনো দার্শনিক মতবাদ প্রচার করে না। যখন যে মেজাজে থাকে সেই মেজাজে যা মনে আসে তাই বলে অথবা চুপ করে থাকে, যেমন খুশি ব্যবহার করে সকলের সঙ্গে। নেশার জের টানা মেজাজটা বিগড়ে থাকলে সকলকে ধমকে গালাগালি দিয়ে কিছু আর রাখে না।

তার ধমক-ধামক গালাগালি শহরেব ভদ্র পদস্থ ধনী ভক্তরা পর্যন্ত মাথা নত করে মেনে নেয়। আরও ভক্ত বেড়ে যায়। প্রথমে জগদীশ ব্যাপারটা একেবারেই বুঝতে পারেনি।

সে যোগীও নয়, সাধকও নয় ! বরং অতি অপদার্থ মানুষ। সে তো শুধু চিত্রার জন্যে নিজের অসহনীয় মনোবেদনা নিয়ে কাতরায়, নিজেকে অভিশাপ দেয়, সোজাসুজি আত্মহত্যা করতে পারে না বলেই বেপরোয়া নেশা চরমে তুলে চব্বিশ ঘণ্টার অর্ধেকের বেশি সময় ব্যথাবোধের শক্তি হারিয়ে দিন কাটিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মরে যেতে চায়—সচেতন থাকার সময়টুকু শুধু আবোল-তাবোল এলোমেলো চিন্তা করে। তবু কেন এত প্রত্যাশা নিয়ে এত মানুষ তার কাছে আসে ?

শুধু এই প্রশ্ন নয়।

জগদীশ সব চেয়ে আশ্চর্য হয়ে যায় এই ভেবে, যে মানুষের সমাজ ত্যাগ করে নির্জন অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছে একা থাকার জন্য, অথচ মানুষ এসে ভিড় করে তার নির্জনতা ভঙ্গ করলেও তার খারাপ লাগে না।

বিকালের দিকে সে অবশ্য ভাগিয়ে দেয় ভক্তদের। সন্ধ্যাবেলা এখানে কারও থাকার অধিকার নেই।

রাত্রে বাঘ আসে, অন্য হিংস্র জন্তুরাও আসে—ওই খোলা আটচালায় কারও রাত কাটানো চলবে না।

জগদীশের ভয় নেই, তাকে বাঘে খেলেও কিছু এসে যায় না। কিন্তু সে অন্য কারও প্রাণরক্ষার দায় নিতে পারবে না।

এ বিষয়ে এমনই কঠোর জগদীশ, এমনি নিষ্ঠুরের মতো সে বিকাল হতেই সকলকে খেদিয়ে দেয় যে ব্যাপারটা বুঝতে আর বাকি থাকে না তার ভক্তদের !

সন্ধ্যা থেকে শুরু হবে যোগসাধনা। তাদের মতো অধম ব্যক্তিদের জন্য সারাটা দিন দিতে পারে কিন্তু যোগসাধনায় তো তারা ব্যাঘাত ঘটাতে পারেন না—তাদের জন্যই তো যোগসাধনা !

ভক্তেরা নিজেরাই তার নিয়মের মর্যাদা রাখে। দু-একজন বিভ্রান্ত বদলোক রাত্রে জগদীশ কী করে সচক্ষে দেখতে চাওয়ার অদম্য কৌতূহলে চালাকি করে থেকে যাবার চেষ্টা করলে তারাই তাকে শায়েস্তা করে সঙ্গে নিয়ে যায়।

সন্ধ্যার পর দশ-বারোজন বুনো মানুষ এসে জগদীশেব কুটিরের সামনে জড়ো হয়—তাদের আদিম অস্ত্রশস্ত্রগুলিও নিয়ে আসে।

শীতের রাত্রে আগুন জ্বালায়।

গ্রীষ্মের রাতেও আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থাটা রাখে।

শুকনো গাছ-পাতা ডালপালা দাউদাউ করে জ্বলে উঠলে বাঘ ভালুক হিংস্র পশুরা শুধু যে ভয়ে দূরে পালিয়ে যায় তা নয়, কয়েক দিন আর এদিকে ঘেঁষে না।

তারা কিছু জানতে চায় না, কিছু বুঝতে চায় না। এই পৃথিবী এই জীবন সার কি অসার, মায়া কি বাস্তব, জন্ম-মৃত্যুর রহস্যের আসল মানেটা কী—এ সব কোনো জিজ্ঞাসা তাদের নেই।

নেশা চড়িয়ে জগদীশ একা অন্ধকারে বিপজ্জনক পথ ধরে জলপ্রপাতে যায়, পাথরের গায়ের কত শত বছরের শ্যাওলা-ধরা পিছল পাথরে নির্ভয়ে অনায়াসে পা ফেলে এগিয়ে যায়, প্রমত্তা প্রপাতের জলধারা দু-হাতে তুলে নিয়ে নিজের মাথায় ঢালে।

বাঘ তাকে খায় না। ধারেকাছেও ঘেঁষে না।

তার পা পিছলে যায় না—এমন চড়াই-বড়াই মেশানো নেশা করেও।

মাঝরাত্রি পর্যন্ত চুপচাপ একটা পাথরে বসে থেকে আবার নিবাপদে কুঁড়েতে ফিরে আসে।

এই দেবতা এসে এই কুঁড়েতে ছদ্মবেশে আশ্রয় নিয়েছে বলেই তো এবার শিকাব মিলছে ভালো, ফসল ফলছে ভালো।

শহর থেকে বাবুর দল ভিড় করে এসে কতকিছু কিনে তাদের কত বাড়তি পয়সা দিচ্ছে।

দেবতার ঘরের সামনে দশ বারোজনকে পাহারা দিতেই হবে।

দেবতা কৃপণ নয়।

চোলাই আর মহুয়া রস জিরাইকে দিয়ে যথেষ্ট সরবরাহ করে, তাদের সাধ মিটিয়েই করে।

এ অবস্থায় একদিন সন্ধ্যার পর রত্নাকবের একেবাবে কুটিরের মধ্যে ঢুকে পড়া কী করে সম্ভব হল জগদীশ প্রথমে বুঝতে পারে না। ঠিক পাগলের মতোই চেহারা। উশকোখুশকো চুল, মুখে তামাটে রংয়ের তরুণ বয়সের অগত্ন অল্প গোঁফ দাড়ি, ধবধবে ফরসা। কলারযুক্ত একটা শার্ট এবং হাফ প্যান্ট। জগদীশ রেগে উঠে শান্তি বিঘ্ন করার জন্য তাকে ধমকাতে যাবে, সে বোতাম খুলে শার্টের কলারটা ঢিল করে দিতে দিতে বলে, একটা বই দিতে এসেছি, আমার নিজের লেখা, একটা কবিতার বই।

নেশা তখনও মাথায় চড়েনি।

বিচারবিবেচনা জগৎ-সংসার লোপ পায়নি ক্লান্ত আত্মাব আত্মসম্মোহনের বীভৎসতায়।

জগদীশ বলে, বই ?

রত্নাকর বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার নিজের লেখা একটা কবিতার বই। আপনাকে উপহার দিতে এসেছি।

প্রণামি নয় !

উপহার !

একটা ভয়ংকর কবিতার বই লিখেছে স্পিড-উন্মাদ তরুণ, নিজেকে সে নাস্তিক বলে ঘোষণা করে, তবু সেও প্রণাম করেই বইটা তার পায়ের কাছে রেখেছিল।

জগদীশ মিনিট তিনেক গুম খেয়ে থাকে।

চেতনাকে মন্ত্রবলে আত্মস্থ করার সব চেয়ে তেজি আর জোরালো মেশানো নেশার বাঁশের চোঙাটার দিকে চেয়ে কয়েক মুহূর্তে কত কথাই যে ভাবে জগদীশ, কত কিছুই যে অনুভব করে হৃদয় দিয়ে।

তাপ্পি নীরবে কুঁড়েতে এসে দামি বিলাতি আর দেশি মদের বোতল দুটো তার পাশে মেঝেতে নামিয়ে রাখে।

পাগল আগন্তুক তাকিয়েও দেখে না তাপ্পির দিকে।

দেশি মদের গালা-আঁটা শোলার ছিপি খুলে তাপ্পিই লাগিয়ে দিয়ে যায় বিলাতি বোতলের কর্কের ছিপি।

বোতল তুলে ছিপি খুলে অনেকটা নির্জলা শরাব জগদীশ গলায় ঢেলে দেয়।

কয়েকবার হিক্কা ওঠে। কয়েকবার সে কাশে।

তারপর সে বলে, কী চাও ?

একটু শান্তি চাই।

তুমি জানো না সন্ধ্যার পর আমি কারও সঙ্গে কথা বলি না ?

জানি !

সন্ধ্যার পর ওরা তো কাউকে আসতে দেয় না আমার কাছে ? তুমি কী করে এলে ?

ওদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে এসেছি। একটু বানিয়ে বললাম, আমি আপনার গুরুভাই—গুরুদেবের হুকুমে জরুরি কথা বলতে এসেছি।

রত্নাকর একটু হাসে। তার রুক্ষ মলিন মুখে এমন মরিয়া আর বেপরোয়া দেখায় হাসিটা।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা কী ? এভাবে আমার সঙ্গে দেখা করার মানে ?

পেটে অনেকখানি কড়া ওষুধ পড়েছে, সবে শুরু হয়েছে ক্রিয়া। এবার খানিকটা উদার মনে হয় জগদীশকে।

ওই যে বললাম, একটু শান্তির খোঁজে এসেছি। প্রাণে বড়ো যন্ত্রণা—যদি কোনো উপায় করে দিতে পারেন। আপনি যোগী মানুষ, জ্ঞানী মানুস—আপনার হয়তো জানা থাকতে পারে।

প্রাণে কীসের যন্ত্রণা, কেন যন্ত্রণা খুলে বলো ! শুধু নাম বললে রত্নাকর—

ওটা বানানো নাম। আমার কোনো নামও নেই, পরিচয়ও নেই। আমি একটা ভবঘুরে—তিন বছর ধরে শুধু একটু শান্তির জন্য পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি মহাপাপী, এটাই আমার একমাত্র পরিচয়।

কী পাপ করেছ ?

দুটো মানুষকে খুন করেছি। একটি নির্দোষ মেয়ে আর একটি ছেলেকে। মেয়েটাকে আমি ভালোবাসতাম।

জগদীশ হঠাৎ বজ্রগর্জনে ফেটে পড়ে : আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে এসেছ ? তামাশা করতে এসেছ ? জানো আমি হুকুম দিলে ওরা তোমায় টুকরো টুকরো করে কেটে জঙ্গলে পুঁতে ফেলবে ?

রত্নাকর ভয় পেয়েছে মনে হয় না। সে শুধু একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই জগদীশের ক্রোধে বিকৃত মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ধীরে ধীরে বলে, এত চটবার কারণ কী হল ?

জগদীশ গর্জন করেই বলে, আমি বুঝিনি ভেবেছ ? চেনা লোক কারও কাছে আমার কথা সব শুনে একটু ইয়ার্কি মারতে এসেছ, বুঝি না আমি ?

রত্নাকর খানিকক্ষণ হতভম্বের মতো চেয়ে থাকে।

আপনার ব্যাপার জেনে তামাশা করতে এসেছি ? আপনিও কোনো মেয়েকে ভালোবাসতেন নাকি ? না বুঝে না জেনে জেলাসিতে হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়ে তাকে খুন করেছিলেন নাকি ?

জগদীশ গুম খেয়ে থাকে। ভাবে, জিরাইদের ডেকে বজ্জাতটাকে বেঁধে রাখতে বলবে ?

চিত্রার ব্যাপার নিয়ে তার সঙ্গে সত্যিই তামাশা করতে এসেছে কি না দিনের বেলা সাদা চোখে সেটা যাচাই করে স্থির করবে ওকে নিয়ে কী করা উচিত ?

রত্নাকর আবার তার মরিয়া বেপরোয়া হাসি হাসে।

এ তো বেশ যোগাযোগ হয়েছে ' যোগী আর ভবঘুরেব যোগাযোগ। প্রিযাকে খুন কবে আপনি হয়েছেন যোগী আর আমি হয়েছি ভবঘুরে।

জগদীশ হঠাৎ সুব পালটায়, নবম সুরে জিজ্ঞাসা করে, সত্যি বলছ আমার সঙ্গে তামাশা কবতে আসোনি ?

রত্নাকব আপশোশের আওয়াজ করে বলে, এভাবে এমন সময়ে এ রকম তামাশা করতে কেউ আসে ? যে কবিতা লেখে, আর বন্ধু নিজেব খরচে ছদ্মনামে যার কবিতার বই ছাপিয়ে দেয় ? পাক খেতে খেতে এদিকে এলাম, শুনলাম একজন অল্পবয়সি সিদ্ধযোগী অনেক পাপী-তাপীকে শান্তি দিয়েছেন। ভাবলাম দেখেই আসি, এঁব কৃপায় যদি একটু শান্তি পাই।

বত্নাকর জোরে জোরে মাথা নাড়ে। এতক্ষণের আপনি বলাটা হঠাৎ তুমি বলায় পরিণত করে বলে, না দাদা তোমাব কাছে কোনো আশা নেই। তোমার দ্বারা হবে না। তোমার নিজের জ্বালাই এখনও সামলাতে পারোনি, আমার জ্বালা তুমি জুড়োবে !

সত্তর বছবেব প্রতাপকে জগদীশ প্রথম থেকে তুমি বলেছে, প্রতাপ তাকে মনে-প্রাণেও তুমি বলার কথা ভাবতে পারেনি। গেলাসে খানিকটা রঙিন মদ ঢেলে জগদীশ গেলাসটা এগিযে দিয়ে বলে, হবে ?

না। ও সব সস্তায় কিস্তিমাতেব ধাব ধাবি না। প্রাণের আগুন চাপা দিলে কি নেভে ? ধুঁকে ধুঁকে আবও বেশি দিন জ্বলবে, ধোঁয়ায ধোঁয়ায় কালচে মেরে যাবে প্রাণটা। চিতা জ্বলতে দেওয়াই ভালো। দাউদাউ কবে জ্বলে-পুড়ে ছাই হযে নিভে যাবে।

প্রাণটাকেও পুডিযে ছাই করে দিযে যাবে তো ?

প্রাণ কখনও পোড়ে ? সোনাব মতো যত পোড় খায় তত খাঁটি হয। তিলে তিলে দগ্ধে দগ্ধে কালচে মেবে পোড়ার চেয়ে পুড়ে শেষ হয়ে যাওযা ভালো।

পাগল হওয়া ?

অনেক দিন ধরে পাগল হতে হতে আরও দশজনকে পাগল করার চেয়ে সোজাসুজি পাগল হয়ে যাওয়া ঢের ভালো। নিজের বিষটা নিজেই ভোগ করলাম। আমার জ্বালাটা আমারই রইল।

আমি কিন্তু কাউকে ডাকিনি। লোকে যেচে এসে ঝঞ্ঝাট করলে আমি কী করব ?

ডাকোনি ? সব কিছু ত্যাগ করে বনে এলে, সবাইকে ডাক দিলে না যে দ্যাখো আমার কাণ্ড কারখানা ? আয়-আয় তুতু করে ডাকটাই বুঝি একমাত্র ডাক ? অন্যভাবে ডাকাডাকি নেই জগতে ?

আমার ব্যাপার জানো না তাই—

তোমার ব্যাপার বুঝতে পারছি বইকী। আমি নিজের হাতে প্রিয়াকে খুন করে হয়েছি ভবঘুরে, তুমি যোগী হয়েছো তোমার জন্য তোমার প্রিয়াকে খুন করতে হয়েছে বলে।

মাথা ঘুরছিল জগদীশের। দেশি বোতলটার দিকে হাত বাড়িয়েও সে হাত গুটিয়ে নেয়। হাঁক দিয়ে জিরাইকে ডেকে আনে।

মেশালো বুনো ভাষায় জানায়, গুরুভাইয়ের থাকার ব্যবস্থা করে দাও। কোনো কষ্ট যেন না হয়।

মহুয়ার খাঁটি গ্যাজানো রসের চোঙাটা হাতে নিয়ে জগদীশ এগিয়ে যায জলপ্রপাতের দিকে।

পাহাড়ের গা বেয়ে জলের ধারার হঠাৎ অনেক নীচে ঝাঁপিয়ে আছড়ে পড়ার আওয়াজ চব্বিশ ঘণ্টাই শোনা যায়।

যত কাছে এগোনো যায় ততই যেন গর্জন বাড়ে ঝরনায় আছাড় খাওয়ার।

প্রকৃতি যেন প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে প্রকৃতিজয়ী তাকে পবাজয় মানাতে চাইছে।

ঝাঁপিয়ে পড়বে ? নিমেষে শেষ করে দেবে বাঁচার কষ্ট ? মিশে যাবে চিত্রার সঙ্গে একাকার হয়ে ?

ঝাঁপ সে দিতে পারে অনায়াসেই। মরণ তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে জীবন-মরণেব ছেলেখেলার মতোই।

কিন্তু কোনো মানে হবে কি এভাবে মরার ? মরে গেলে সব ফুরিয়ে যায়, চুকে যায় বাঁচা-মরার হিসাবনিকাশ, শূন্যে মিশিয়ে যাবার পর জল বায়ু আকাশ পৃথিবীতে মিশে যাবার পর জগতে ঘটে চলবে প্রকৃতি আর জীবনের ইতিহাস, মানুষ আর প্রকৃতির একটানা লড়াই, কিন্তু অসংখ্য মৃতের মতো সেও মিলিয়ে থাকবে চেতনাহীন মহাশূন্যে।

জীবন থাকবে পৃথিবীতে।

প্রপাতের জলস্রোতে ঝাঁপ দিলে কয়েক মিনিটে সে চিত্রার মতোই মিলিয়ে যাবে ওই আদিম উপকরণে।

এখনও সে জীবন্ত।

চিত্রা মরেছে।

মরণের চেয়ে বড়ো সত্য জীবনের জানা নেই। মরব জেনেই বাঁচা। মবে মরে মবাকে জয় করে বাঁচাই জীবনের ধর্ম।

যত ভক্ত আসে যায়, এসেছে গিয়েছে, তাদেব স্মরণ কবে মাথায় হাত দিয়ে জগদীশ সেই পাথরে বসে পড়ে যে পাথর-থেকে হঠাৎ তাকে দেখে দু-পা পিছু হঠতে গিয়ে চিত্রা শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছিল।

নেশার ঝোঁকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে মরে চিত্রার সঙ্গে জলবায়ু মাটিতে একাকার হতে চেয়েও জগদীশ ভুলতে পারে না সে জীবন্ত।

মরণকে জয় করে চলাই হল জীবন।

জীবন আর কিছুই নয়।

- সে জীবন্ত। এই জলপ্রপাতে ঝাঁপ দিয়ে সে মরণজয়ী জীবনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে ?

মৃত্যুর হিসাবে পাপপুণ্য সমান, বিশ্বাস রাখা আর বিশ্বাসঘাতকতাও সমান। দুই বিপরীতের সংঘাতই জীবন, জগতে মরণ-বাঁচন।

সে জীবন্ত।

বাঁচার চেষ্টাই তার চরম সার্থকতা--পিঁপড়ে থেকে মানুষের বাঁচার চেষ্টাই একমাত্র ধর্ম।

জীবাণু বীজাণুও যে জীবন জগদীশ তা জানত। কিন্তু সে ভাবে অনুবীক্ষণে দেখা এই সুক্ষ্ম জীবনগুলিই কি শেষ কথা ? এর চেয়ে সূক্ষ্মতর জীবন যে নেই তার প্রমাণ কী ?

জীবন যেমন হোক, জীবনের স্থূল আর সূক্ষ্ম দিক খানিক খানিক জেনেছিল বলেই জগদীশ কিছুতেই সেদিন জলপ্রপাতের উপরের পাথর থেকে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে চিত্রার সঙ্গে একাকার হয়ে ব্যথার পূজা সাঙ্গ করতে পারেনি।

সপ্তম অধ্যায়

বাইবেব লোক হিসাবে ভবঘুবে বত্নাকবই সর্বপ্রথম জগদীশেব আশ্রমে ঠাঁই পেল।

শিষ্য হিসাবে নয়, ভক্ত হিসাবে নয, আশ্রিত হিসাবেও নয় -- এক রকম অতিথি হিসাবে। এবং জগদীশেরই আমন্ত্রণে !

রত্নাকর মোটামুটি তাব কাহিনি বলেছে। প্রেমেব সেই চিবকেলে তিনকোণা ঝঞ্ঝাটের কাহিনি।

ভয়ানক ভাবপ্রবণ আব রাগী ছিল বত্নাকব। হঠাৎ আরেকজনের সঙ্গে মেয়েটার ঘনিষ্ঠতা দেখে মাথা গিয়েছিল বিগড়ে এবং দুজনকেই বিষ খাইয়ে খুন করেছিল।

খুঁটিনাটি জেনে দরকাব নেই জগদীশের, দুজনকে মারাত্মক বিষ খাওযাবার সুযোগ-সুবিধা ছিল বলেই বিষ খাইযেছিল—নইলে অন্য উপাযে খুন কবত, হয়তো গুলি কবে মারত।

ঠিক করেছিলাম নিজেও মরব, কিন্তু দাদা পাবলাম না। কিছুতেই পাবলাম না।

পাগল না হলে আত্মহত্যা কবা যায না। নইলে এত দুঃখ-কষ্ট সয়ে এত মানুষ বেঁচে থাকত ?

পাগল তো হযেই গিয়েছিলাম। নইলে ওদের মারতে পারতাম ?

অন্যকে মারতে পাগল হতে হয না, হিংসা মাথায চড়ে গেলেই মানুষ মাবতে পারা যায়। একটা যুদ্ধে জগতে কত লোক খুন হয জানো না ?

যুদ্ধ আলাদা ব্যাপাব। সৈন্যেবা তো নিজের নিজেব ব্যক্তিগত স্বার্থে শত্রু মারে না।

ব্যক্তিগত স্বার্থেই যুদ্ধ বাধে! সৈন্যরা ব্যক্তিগত স্বার্থেই বাঁচার জন্য যুদ্ধে নামে।

বাঃ ! এটা কী বকম কথা হল ? দেশ আক্রমণ কবলে দেশবক্ষার জন্য সৈনিক হযে যুদ্ধে নামলে সেটা হবে ব্যক্তিগত স্বার্থের ব্যাপাব ?

হবে বইকী। আমার দেশ বাঁচলে আমি বাঁচব—এই তো সোজা হিসাব। এখানে দেশেব স্বার্থ নিজেব স্বার্থ এক হয়ে গেল। শত্রুবাও মানুষ—কিন্তু তখন যত বেশি শত্রুকে খুন করতে পাবব দেশকে তত বেশি বক্ষা করতে পারব। যুদ্ধেব সময যে সৈনিক যত বেশি শত্রু-মানুষ খুন কবতে পাবে তাব তত বেশি গৌবব, নিজেবও তত বেশি অহংকার।

সাবাদিন ভক্তদেব নিয়ে জগদীশ ব্যস্ত থাকে। রত্নাকবেব সঙ্গে কথা শুবু হয় সন্ধ্যার সময—সাবাদিন মহাপুবুষ হয়ে জীর্ণ দীর্ণ দুঃখী মানুষেব ঝামেলা সামলে জগদীশ যখন জীবনের জীর্ণ পুরাতন সিসাকে নিমেযে সোনাব ববণ ধাবণ কবাবার চেষ্টা শুবু কবে। বোতল আর গলায় কাত করে না জগদীশ।

সচেতন থেকে রত্নাকরেব সঙ্গে কথা বলা চালিয়ে যাবার জন্য একটু একটু বিষ খায়, চুমুক চুমুক খায়।

সারা জগতের জীবনসমুদ্র মন্থন করা বিষ এক চুমুক গিলে পেটে নিয়ে নীলকণ্ঠকে হার মানাবার প্রয়োজন যেন তার ফুরিয়ে গেছে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সবে জগদীশ শুবু করেছে নেশার পালা, আজ মেশানো নেশা করবে না, নেশা চড়াবে না এই ইচ্ছা নিয়ে—জিরাই এসে খবর দেয় ললিতা তার দর্শন চায়।

লালিম বিলাতি মদ—কলসিতে এনে রাখা প্রপাতের জল অল্প একটু মিশিয়ে দিতে পাতলা হালকা দামি কাঁচের গেলাসে যেন রঙিন হয়েছে অমৃতের মতো !

একটা চুমুক দিয়ে গেলাস সামনে নামিয়ে রেখে সে বলে, লে আ বেটিকো।

জিরাই একগাল হাসে।

ললিতা কুঁড়েতে ঢুকে হাঁটু পেতে বসে গলায় আঁচল জড়িয়ে তাকে প্রণাম করতে যায়।

তাড়াতাড়ি তুলে না নিলে গেলাসটা উলটে যেত।

এদিকে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ললিতা প্রণাম করে, ওদিকে জগদীশ এক নিশ্বাসে খালি করে দেয় গেলাসটা !

ললিতা মাথা তুলছে না দেখে মিষ্টিসুরে বলে, মা, ছেলেকে বাবা করে আজ মেয়ে হবার মতলব নিয়ে এসেছ ?

ধীরে ধীরে মাথা তোলে ললিতা। ধীর শান্ত কণ্ঠে ললিতা বলে, হ্যাঁ, মেয়ে হয়েই বাবার কাছে এলাম—মতলব নিয়েই এলাম। জগদীশ প্রসন্ন হাসি হেসে বলে, সেটা বুঝেছি। মুশকিল আসানের মতলব না নিয়ে কেউ আসে না আমার কাছে। রোগ শোক দুঃখ বিপদ—আমি যদি সামলে দিতে পারি। যত বলি পারব না, ও সব আমার জানা নেই, তত বেশি চেপে ধরে—তত বেশি কাঁদাকাটা করে।

ললিতা সোজাসুজি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, আপনাব ও রকম সস্তা ভড়ং নেই। ও সব চেয়ে আপনাকে জ্বালাতন করতে আসিনি।

তবে ?

দেহটা নিয়ে পড়েছি মহা বিপদে। বিশ্বাস করুন, আমি জানতাম না। খাই দাই ঘুমাই, দিব্যি সুস্থ শরীর, বিয়ে হবার আগে টেরও পাইনি স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘর-সংসার করার সুখ আমার জন্যে সৃষ্টি হয়নি। জগতের ও সব সুখের জন্য আমার জন্ম হয়নি।

ও সব সুখ চাও না ?

চাই না ? চেয়ে চেয়ে পাগল হয়ে যেতে বসেছি। দেহটা জানিয়ে দিয়েছে ও সুখ আমার কপালে নেই।

মা হতে চাও না ?

ধৈর্য হারিয়ে ললিতা চিৎকার করে ওঠে, হাজারবার মা হতে চাই, হাজারবার হতে চাই।

তবে ?

ললিতা খানিকক্ষণ মাথা হেঁট করে থাকে।

এই নাকি নমুনা অসীম জ্ঞানী পরমসাধক মানুষটার ?

এভাবে এসে এত কথা বলার পরেও বুঝতে পারছে না তার আসল কথা ?

অথবা বুঝেও ভান করছে না-বোঝার ?

সে তো একা নয়।

তার মতো অনেকের কথা শুনতে হয় বুঝতে হয়।

স্পষ্ট করে সে বলেনি তার বিপদের কথা, আভাসে ইঙ্গিতে বলেছে। ধরে নিয়েছে একটু ইঙ্গিত দিলেই মহাপুরুষ বুঝে নেবেন তার আসল সমস্যা !

মাথা না তুলেই মৃদুস্বরে ললিতা বলে, পরশু উনি আসবেন লিখেছেন। ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। আমার দেহে খুঁত আছে উনি জানেন না, বোঝেনও না। আমিও জানতাম না বিয়ের আগে। এখন জানতে বুঝতে দিতে সাহস হয় না—ভাববেন আমি ঠকিয়েছি ! কী করে বসবেন কে জানে ! আমি কী করব বলে দিন—আমায় বাঁচান।

জগদীশ গভীর স্নেহের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়, সে যেন ছোটো কচি মেয়ে এমনিভাবে তার কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। বলে হ্যাঁ, তোকে বাঁচাব। তুই ভীরু নোস, লাজুক নোস, ঢং করিস না—তোকে না বাঁচালে চলে !

কী করব ?

আলোক তোকে ভালোবাসে ?

ভীষণ ভালোবাসে।

বিপন্না বিষণ্ণা ললিতার মুখে ভালোবাসার ভীষণ বিশেষণ জগদীশকে হাসায় না। তাপ্পি যথাসময়ে তার নেশা আর খোরাকের আয়োজন করে দিতে এলে সে গর্জন করে বলে, ছুটি দিইনি তোকে ? বলিনি ছেলে বিইয়ে গায়ে জোর পেলে কাজে আসবি ? ঘরে বসে মাইনে পাবি ?

তার ধমকে বিশেষ কাবু হয় না তাপ্পি।

এত তাড়াতাড়ি কোনোদিন নেশা চড়ায়নি, এত বেশি বিলাতি মাল গেলেনি। নেশা যেন পলকে পলকে লাফ দিয়ে চড়তে থাকে। আসন্ন মাতৃত্বের ভারে তাপ্পির নড়াচড়া মন্থর হয়েছে। ধীরে ধীরে সে টুকিটাকি কাজগুলি সারে—রাত্রে জগদীশের যা কিছু প্রয়োজন হতে পারে গুছিয়ে ঠিকঠাক করে রাখে। আজ শুধু বিলাতি খাচ্ছে দেখে মায়ের মতো স্নেহের সুরে জিজ্ঞাসা করে, মাংস খাবি বাবা ?

মাথা নেড়ে তার প্রশ্নের জবাব দিয়ে জগদীশ ললিতাকে বলে, আমি তোকে পরীক্ষা করব।

ভীতা স্তম্ভিতা ললিতা চেয়ে থাকে।

ভয় কী ? লজ্জা কী ? ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার পরীক্ষা করবে না ?

ডাক্তারের মতো তাকে পরীক্ষা করবে ! ভয়ে ললিতা যেন কুঁকড়ে যায়।

তাপ্পিকে যেভাবে ধমকে দিয়েছিল প্রায় সেইভাবে ধমক দিয়ে জগদীশ বলে, আমাকে তুই মানুষ ভাবিস, পুরুষ ভাবিস ? আমাকে তুই ভয় করিস ! আমার কাছে তোর লজ্জা !

ললিতা উঠে দাঁড়ায়। কাতর কণ্ঠে বলে, আমি আজ যাই বাবা।

জগদীশ গর্জন করে ওঠে, না যেতে পাবি না। আমাকে তুই ঠকিয়েছিস, গেঁয়ো মেয়ের চেয়েও বোকাহাবা লাজুক হয়েও দেখিয়েছিস তুই কড়া মেয়ে, শক্ত মেয়ে। লজ্জায় ভয়ে এতকাল একটা রোগ পুষে রেখেছিস মুখ বুজে। তোর লজ্জা ভয় ভেঙে দেব আজ। তোর রোগ সারিয়ে দেব।

ভীতা চকিতা হরিণীর মতো ছুটে পালাতে গিয়ে কুঁড়ের বাইরে দাঁড়ানো রত্নাকরের গায়ে ধাক্কা লেগে আছাড় খেয়ে ললিতা পড়ে যায়।

কুঁড়েটা জলপ্রপাতের ধারে হলে সেও চিত্রার মতোই জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নীচে আছড়ে পড়ত।

আঘাত লেগে ললিতা অজ্ঞান হয়নি, মূর্চ্ছা গিয়েছিল।

দ্বিধামাত্র না করে রত্নাকর তাকে তুলে কুঁড়ের মধ্যে নিয়ে যায়, মাটির মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে মাথায় জল চাপড়াতে চাপড়াতে বলে, তাপ্পি, ক-টা মেয়েকে ডেকে আন চটপট। মেয়েছেলে ঘিরে আছে দেখে ভরসা পাবে।

আট-নজন নানাবয়সের নিকষ কালো বুনো মেয়েমানুষ রত্নাকরের ইঙ্গিতে কুঁড়ের মেঝেতে বসে, আরও কয়েকজন কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর মূর্চ্ছা ভেঙে যায় ললিতার। উঠে বসে সে বিহ্বল দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকায় !

রত্নাকর হেসে বলে, তুমি এত ভীতু কেন গো বোন ?

খুব তাড়াতাড়িই মূর্চ্ছাভঙ্গের বিহ্বলতা কেটে যায়। নিজেকে এখানে এ অবস্থায় দেখে তাড়াতাড়ি মনে পড়িয়ে নিতে হয় সব কথা।

ললিতা মাথা হেঁট করে।

রত্নাকর এবার অনুযোগ দিয়ে বলে, এত ভক্তি করো বাবাকে, বাবার নিয়ম-নীতির খবর রাখো না ? কত আটঘাট বেঁধে বাবা বিষ খায় জানো না ?

আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

কী করে বুঝবে ? বাপকে চিনবে না, বাপের রীতিনীতি জানবে না, আসবে শুধু আবদার জানাতে। বাপকে রাগিয়ে দেবে, বাপের উগ্রমূর্তি দেখে মূর্চ্ছা যাবে।

ললিতা চুপ করে থাকে।

রত্নাকর ধমকের সুরে বলে, বাবার হুকুমে আমরা একজন-দুজন সন্ধ্যা থেকে সারারাত দুয়ারের কাছে পাহারায় থাকি জানা তোমার উচিত ছিল। বাবা নিজে হুকুম দিয়েছে—কড়া হুকুম। যে মানবে না তার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না বাবার। বিষ খেতে খেতে মাথা বিগড়ে গেলে, বিভ্রম ঘটলে, বাবাকে যেমন করে হোক সামলাতে হবে। মারবার হুকুম আছে, বেঁধে রাখার হুকুম আছে।

কে জানে জগদীশ কিছু শুনছে কি না, তাদের দিকে চাইছে কি না ! মশগুল হয়ে অন্য কথা ভাবতে ভাবতেই সে যেন বিলাতি মদের বোতলটার পাশে সাজানো তাড়ির হাঁড়িটা টেনে নিয়ে হাঁড়ির কানায় মুখ দিয়ে পান করে। তালের গ্যাঁজানো রসে তার বুক ভেসে যায়।

একনজর তাকিয়ে দেখে রত্নাকর বলে যায়, বাবা কি জানেন না বিষের মজা ? নিজেই তাই পাহারা বসিয়েছেন। বিষের ঝোঁকে খারাপ কিছু করতে গেলে যেভাবে পারি ঠেকাবার হুকুম দিয়েছেন ! বলেছেন কী জানো ? বলেছেন, দরকার হলে মেবে ফেলবি !

হেঁট করা মাথাটা নীরবে জগদীশেব পায়ের কাছে মাটিতে ঠেকিয়ে ললিতা নীরবে উঠে দাঁড়ায়।

সে কিছু বলে না, তবু রত্নাকব সঙ্গে গিয়ে তাকে রাস্তায় গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসে।

রত্নাকর ! মাতাল হয়েছি ?

মাতাল ? এই তো সবে শুরু করলে—এইটুকু খেয়ে মাতাল হবে তুমি ? পাঁড়-মাতালদেব অবিশ্যি এক-একদিন একটুখানি খেয়েই খেপে যেতে দেখেছি—ওটা ব্যারাম। বোগটার কী যেন নাম বলে ডাক্তাররা—হঠাৎ হয়। দিব্যি কথা কইছ, মাতাল হতে যাবে কেন ?

জগদীশের মুখেব ভাব প্রসন্ন এবং প্রশান্ত।

আজ খানিকটা বুঝতে পারছি মানুষ নেশা করে কেন। শুধু বিষ দিয়ে বিষ ঠেকানো নয়। আগে তাই খেতাম প্রাণের জ্বালা চাপা দিতে। এখন খাই দায় ঠেকাতে। এতকিছু চাইছে মানুষ-- ছুটকো ভাবনা-চিন্তা বিচারবিবেচনা কাটিয়ে না উঠে চাহিদা মেটাতে পারি না।

তাকে উপলক্ষ করে নিজের সঙ্গে কথা কইছে জগদীশ। আত্মচিন্তা মুখে উচ্চারণ করছে।

উৎফুল্ল হয়ে রত্নাকর জেঁকে বসে।

যেমন ধরো ললিতার এই ব্যাপারটা। না, বেঠিক কিছু বলিনি, বেঠিক কিছু করিনি। বেটিকে ঠিক এ রকম একটা শক দেওয়া দরকার ছিল। বাপ-ভাই-স্বামী আছে, মা-মাসি-শাশুড়ি-বউদি-বোন আছে, ননদ আছে, সবার কাছে এতকাল গোপন করে রেখেছে রোগটা—চুপিচুপি আমার কাছে এসেছে রোগ সারাতে। ভড়কে দিয়ে ঠিক করেছি। প্রতাপ আর আলোককে ধমকে দিলেই বেটির চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু রত্নাকর—রত্নাকর মুখ খোলে না।

ভাবতে ভাবতে জগদীশ আপনমনে বলে, কোথায় একটা ভুল হচ্ছে, ধরতে পারছি না। জানিস, মনে হচ্ছে, আমায় একদিন নেশা ছাড়তে হবে। সংসার স্পেশাল বাপ বানিয়েছে, এ বাপের দায় থেকে আমার রেহাই নেই।

রত্নাকরও তাই বলে।

বলে, দাদা, সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হলেই কি সংসার রেহাই দেয় ? সংসারটাই তো তোমায় সন্ন্যাসী করেছে। তোমার একটা বিশেষ গুণ আছে, ক্ষমতা আছে—খাপছাড়া পাগল মানুষ তুমি। সংসার বলে, সংসারে মানিয়ে চলতে পারছ না, তুমি তবে সংসার ছেড়েই যাও। খুঁটিনাটি দায় থেকে

রেহাই নিয়ে ভাববে যাও ব্যাপারটা কী। আমরাও বুঝতে চাই ব্যাপার—আমাদের চিন্তা করার সময় কই, ভালোমন্দ সবকিছু ঘাঁটবার সুযোগ কই ? সংসারের মজাতেই মজে আছি দিনরাত। তুমি যাও, নিজের খুশিমতো মন্দির থেকে আস্তাকুঁড় চষে বেড়াও, অমৃতের সঙ্গে বিষ খাও, বনে গিয়ে চিন্তা করো— তোমার ছুটি মঞ্জুর। কিছু কিছু যখন জানতে বুঝতে পারবে, আমাদের জানিয়ে দেবার বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা কোবো !

চিন্তা করার চাকর ?

চাকর নয়— দায়িক। সংসারের দরকাবেব দায়টা মেনেছ বলেই না এই জঙ্গলে যেচে এলেও তোমার খাঁটি বিলেতি মালের পয়সাটা জুটে যাচ্ছে।

সুদর্শনা অন্যভাবে এই কথা বলেছিল। শুনে রেগে গিয়েছিল জগদীশ।

বত্নাকর গুরুর মতো বলে : দায় না নিলে, ফাঁকি দিতে চাইলে, ঝোলা কাঁধে ভিক্ষে কবতে বার হতে হত।

আমাব তবে বুজরুকি নয় ?

আরে বাসরে ! এমনভাবে লোকে বুজরুকি চালায ?

এমন জায়গায় এসে ডেরা বেঁধে শুধু চিন্তা-ভাবনা নিয়ে মেতে থেকে ?

নেশা-ভাং তো করি ?

তোমার খুশি হয় কবো ! আর সব তো ত্যাগ করেছ—এভাবে যে বেশিদিন বাঁচবে না সে ভাবনাটা পর্যন্ত ! তুমি নেশা করলে লোকের কী ? জগৎ-সংসার তলিয়ে বোঝার চেষ্টা নিযে দিবারাত্রি মেতে আছ, লোকের কাছে তাই যথেষ্ট।

আজ খেযাল কবে জগদীশ একটু আশ্চর্যই হযে যায যে খোলাখুলি আলাপ-আলোচনার মধ্যে ক্রমে ক্রমে রত্নাকবেব সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা কতখানি বেড়ে গেছে। বিনা দ্বিধায় রত্নাকরের সঙ্গে নিজের সম্পর্কে যে সব কথা নিয়ে আলাপ চালায়, কোনো ভক্তের কাছে ওভাবে ও সব প্রসঙ্গ তোলার কথা সে ভাবতেও পারে না।

ভক্তদের ভক্তি টুটে যাবার আশঙ্কায কি ? রত্নাকবেব সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে নিজের সম্পর্কে বিচাব-বিশ্লেষণ চালাতে পারার আগে এ প্রশ্ন মনে এলে জগদীশেব মুশকিল হত। নিজেব মধ্যে ভক্তদের ভাঁওতা দিয়ে ভুলিয়ে রাখার হীনতা কল্পনা করে বিব্রত হয়ে পড়ত।

রত্নাকরের সঙ্গে অন্য ভক্তদের তুলনা করে সে বুঝতে পেবেছে যে জেনেশুনে ভাঁওতা সে কাউকেই দেয় না। ভক্তদের কাছে এ সব কথা সে এই জন্য বলে না যে ভক্ত যতই বিজ্ঞ আর বুদ্ধিমান হোক, এ সব কথাব মর্ম তাবা বুঝবে না, এলোমেলো উলটো-পালটা মানে করে নিজেবা শুধু বিব্রত হবে।

কাউকে সে ভক্ত হতে ডাকেনি, কাবও কাছে কোনোদিন নিজের অলৌকিক ক্ষমতার ভান করেনি।

তার কোনো গোপনীয়তা নেই, নিজে সে যেমন মানুষ তেমনিভাবে সকলের সামনে আসে। তবু ওরা তাকে ভক্তি করে বলেই ওদেব পক্ষে দুর্বোধ্য তার আত্মবিচাবে বেচারাদের টেনে নামানোর কোনো মানে হয় না।

জগদীশ খানিকক্ষণ রত্নাকরের দিকে চেয়ে একটু ভাবে। রত্নাকর অনেক বোঝে, অল্প কয়েক দিনের মধ্যে তাকেও আশ্চর্যরকমভাবে বুঝে নিয়েছে।

কিন্তু সে যা বলতে চাইছে তার আসল তাৎপর্য কি বুঝবে রত্নাকর ?

অন্য কেউ হলে কথা ছিল, রত্নাকর তার বক্তব্য ঠিকমতো ধরতে না পারলেও অবশ্য আসবে যাবে না।

আমি কিন্তু শুধু নিজের চিন্তাই করেছি বরাবর, কোনো বড়ো কথা নিয়ে মাথা ঘামাইনি।

রত্নাকর একটু হাসে।

তোমার বিনয় সত্যি বৈষ্ণব-মার্কা দাদা! এখানে একলাটি এতকাল শুধু নিজের কথাই ভেবেছ? নিজের কোন কথাটা ভেবেছ? আমি কে, আমি কী, আমি কেন, আমি কোথায়—এ সব কথা?

রত্নাকর আবার একটু হাসে।

নিজেকে নিয়ে যেখান থেকে যে কথা ভাবতে শুরু কর—সংসার এসে যাবেই। আমি কে ভাবতে গেলেও ভাবতে হবে মানুষ কে! আমি একটা মানুষ এখান থেকেই তো ভাবনা শুরু করতে হবে? মানুষ কে না ভেবে কারও বাপের সাধ্যি আছে পাঁচ মিনিট আমি কে এই ভাবনা চালায়! সংসারে জন্মে ভাবতে শিখলে সংসারের কাছে—একলাটি আছ বলেই বুঝি জগৎ-সংসারকে বাদ দিয়ে নিজের কথা ভাবতে পারবে? সমাজ, সংসাব, জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ ঈশ্বর,—নিজের কথা তলিয়ে ভাবতে গেলে সব এসে যাবে। পাপীরও এসে যাবে, সাধুরও এসে যাবে।

তুই এত জানিস, এত বুঝিস, তবু শান্তির খোঁজে এসেছিলি আমার কাছে!

অনেক জানলেই কি হয়? আসল জানাটা জানলাম কই! তুমি আমার চেয়ে অনেক গুণ বেশি জানো, এই ক-টা দিনে আমার কত ভুল-জানা যে শুদ্ধ করে দিয়েছ তার ঠিক-ঠিকানা নেই! কিন্তু প্রথম দিনেই টের পেয়েছিলাম তুমি অনেক জানো-বোঝো কিন্তু আসল কথাটা এখনও জানোওনি, বোঝোওনি। মনে আছে বলেছিলাম, তুমি আমার জ্বালা জুড়োতে পারবে না—নিজের জ্বালায় তুমি নিজেই জ্বলছ!

জগদীশ হেসে বলে, সে কী সোজা জ্বালা রে? জ্বালার চোটে পালিয়ে এলাম, নিজেকে ক্ষয় করে শেষ করব যত তাড়াতাড়ি পারা যায়।

রত্নাকর বলে, দাদা, নিজেকে অত তুচ্ছ কোরো না। নিজেকে সিসা ভাবো, অদ্ভুত দ্রাক্ষা রসায়নে সোনা হয়ে ওঠো। কিন্তু দাদা একটা কথা বোঝো না কেন? তোমার কি শুধু দ্রাক্ষা রসায়ন, দেশি, চোলাই, মহুয়া, সিদ্ধি, গাঁজা দিয়ে সিসার নিজেকে সোনা ভাবার চোট্টামি?

প্রতিজ্ঞা করে সেদিন জগদীশ শুধু মদ খাচ্ছিল। মদের নেশাও মারাত্মক। কিন্তু মদের একটা গুণ আছে এই যে সিসার স্বার্থের পাল্লায় পড়ে সোনারও নিজেকে সিসা মনে করায় বিপদটা মদ ঠেকিযে রাখতে পারে।

জগদীশ বলে, কিন্তু ভাই, আমি তো যোগসাধনাও করি না, ভগবানকেও ডাকি না। আমার কথা আমার ব্যথা কেউ বুঝবে না জগতে। তুমি তো জানোই সব ব্যাপার। নিজের বোকামি পাগলামিতে এই জলপ্রপাতে চিত্রাকে বিসর্জন দিয়েছি বলেই এইখানে এই জঙ্গলের ধারে প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে বিসর্জন দেবার জন্যে ডেরা বেঁধেছি। আত্মহত্যা করতে পারলাম না, ভালোবাসার জন্য আত্মহত্যা করলে ভালোবাসাকেই সস্তা করে দেওয়া হবে বলেই পারলাম না। আমায় কেন এত লোক ভক্তি করে, ভালোবাসে?

জিরাই তাপ্পি কিরপা এবং আরও দশ-বারোজন আদিম মানুষ ভিড় করে আসে। তাপ্পি দুধ আর ফলমূলের ডেলাটা তার সামনে ধরে দেয়।

আজ তাদের সারারাত্রির উৎসব।

জিরাই জিজ্ঞাসা করে, বাবা তু যাবি?

কেনে যাব নাই রে?

সকলের খুশি যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রকাশ পায়।

তারপর জগদীশ খানিকক্ষণ কী ভাষায় ওদের কী বলে যায় একটানা, রত্নাকর বুঝতে পারে না। সকলের ভাব দেখে টের পায় দেবতার কাছে এসে দেবতার কথা শুনে আরও বেশি খুশি হয়ে তারা তাদের আদিম অসভ্য উৎসবের আনন্দে মাততে চলেছে।

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে জগদীশ লাল পানীয়ের কাচের পাত্রটা সরিয়ে রাখে। মাটির গেলাসে চোলাই ঢেলে এক চুমুকে খেয়ে ফেলে।

লাল পানীয়ের কাচের গেলাসটা হাতে তুলে নিয়ে রত্নাকর বলে, আমিও শিষ্য হলাম, ভক্ত হলাম। এই কিন্তু প্রথম আর শেষ। নেশা আমার পোষায় না।

কেন ? খেতে বলেছি তোকে ? মাতলামি-পাগলামি করলে তোকে কিন্তু আমি—

মেরে ফেলবে ? ওদের দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে বনে পুঁতে ফেলবে ? তাই যদি তুমি পারতে দাদা তবে পিরিতের খাতিরে এই বন-গাঁয়ে এসে আত্মসাধনা করতে না ! আজ ক-বছর চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি, তোমার এই জঙ্গলে এসে আমিও ঠেকে যেতাম না।

অর্ধউলঙ্গ বুনো কালো মানুষগুলি একটা উৎসব করবে, তারই প্রস্তুতি চলছে। ওদের কত সামান্য উপকরণ লাগে সকলে মিলে নেচে গেয়ে উৎসব করার জন্য, অথচ কত খাটুনি দরকার হয় ওইটুকু প্রস্তুতির জন্যই !

শিকার করে এনেছে বনের একটা পশু, সেটাকে পোড়াবার আয়োজন চলছে। রত্নাকরের মাথায় ঝিলিক দিয়ে যায় যে এই অসভ্য মানুষগুলি জীবন্ত পশুকে কখনও আগুনে পোড়ায় না।

একটা নিশ্বাস ফেলে রত্নাকর বলে, বছর সাতেক ঘুরে ঘুরে কাটল, কত জ্ঞানী কত মহাপুরুষের সঙ্গে মিললাম মিশলাম। কত দেখলাম কত শুনলাম কত জানলাম কত বুঝলাম। একটা সোজা প্রশ্নের জবাব পেলাম না, সত্যি কি আমি খুনী ? কিংবা আমাকে খুনে বানানো হয়েছে—আমার কোনো দোষ নেই ? ও অবস্থায় সুধা আর গোলোককে খুন না করে আমার উপায় ছিল না ? আগে বরং তেজের সঙ্গে ভাবতে পারতাম, বেশ করেছি, এমন বজ্জাত যে মেয়ে আর যার সঙ্গে তার এমন বজ্জাতি, দুজনকে খুন করাই ছিল আমার মহান কর্তব্য। একটু খামখেয়ালি ছিলাম, পড়াশোনায় যত পারা যায় ফাঁকি দিতাম—ওই মেয়েটার জন্য নিজেকে কলেজে পড়ার বিশ্রী কাজে জেল খাটার মতো উঠে পড়ে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। পাস করে চাকরি না পেলে ওকে পাওয়ার আশাও যে নিমাই—সেটা তো টের পেয়েছিলাম।

রত্না একটু থামে। জগদীশ কথা কয় না।

দিবারাত্রি খেটে পাস করলাম, পাস করে যাতে চাকরি বাগাতে পারি সেজন্য মাঝে মাঝে বড়ো চাকরে একজন আত্মীয়ের বাড়ি গিয়ে মান-অপমান তুচ্ছ করে তার পা চাটতে লাগলাম,—সে কথা ভাবলে আজও বুক ফেটে যায়। মাঝে মাঝে মাথায় ঝিলিক খেয়ে যেত—একটা মেয়ের জন্য কুকুর হলাম ? জগদীশ একদম চুপ করে থাকে। রত্নাকরের দম নেবার অবসরে ঝাল মিষ্টি টক কোনো রকম কথা বলে নিজেকে জাহির করে না।

এ তো ছা-পোষা প্রবোধ নয় যে বুঝে শুনে ধমক দিলেই উলটো সুর গাইবে !

বলতে বলতে মেতে গেছে। আবোল-তাবোল উলটো-পালটা যা খুশি বলুক, সব তাকে শুনতে হবে !

সেও নেশার ঝোঁকে কত আবোল-তাবোল বকে।

নেশা না করেও এক চুমুকে খেয়েই রত্নাকর এমন মেতে গিয়ে বলতে শুরু করলে তাকে বলতে দিতে হবে বইকী, মন দিয়ে শুনতে হবে বইকী তার কথা।

অষ্টম অধ্যায়

দিনের হিসাব চব্বিশ ঘণ্টা।

তার মধ্যে সাত-আটঘণ্টা সে স্রেফ ফাঁকি দেয়, কড়া বিষাক্ত নেশায় মজে থেকে।

সত্যিই কি ফাঁকি দেয় ?

চিত্রাতে এসে সমাপ্তি হল মদ আর মেয়ে নিয়ে তার বিকারের চরম ধিক্কারময় যৌবনের।

সে বিকার কি উত্তরাধিকার ?

সে বিকার কি জন্মগত না নিজের অর্জন করা ?

প্রথম শীতের বাতাস বইছে। মাঠ-বনের চেহারা বদলের সঙ্গে বাতাসে নতুন একটা জীবন্ময় গন্ধ মিশেছে।

আজকাল মাঝে মাঝে দিনের বেলাতেও জগদীশের মধ্যে মরিয়া ভাব জাগে। একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলার প্রচণ্ড ঝোঁক চাপে। রাত্রে নেশা চড়িয়ে সে মরিয়া হয় রোজ—তাকে অনায়াসে সামলে দেয় তাপ্পি আর জিরাইয়া, পায়ে ধরে আরেক চুমুক নেশা গিলিয়ে তার মরিয়া হবার ঝোঁকটাকে ঝিমিয়ে শান্ত করে ঘুম পাড়িয়ে দেয় সে রাতেব মতো।

জগদীশকে আজকাল দিবারাত্রি চিন্তা করতে হয়।

তার জীবনটা কেন এমন বিশ্রী হয়েছিল. কেন আবার শুকনো গাছের ডালপালায় সরস সতেজ হয়ে উঠে নতুন পাতা গজানোর মতো সুশ্রী হয়ে উঠছে জীবনটা ?

কেন শহর আর গ্রামের এত লোক জীবনটা সুশ্রী করার জন্য তার কাছে হত্যা দেয় ?

জীবন তো তবে বিশ্রী হতে পারে না !

অসুখ-বিসুখ ডাক্তার কবিরাজ হাসপাতাল নার্সিংহোম রাঁচি শহরে চেঞ্জে আসা তো আসল জীবন নয়।

চিত্রা জীবনকে অমান্য করে তাকে বশ করতে চেয়েছিল।

জীবনকে অমান্য করে সে চেয়েছিল চিত্রাকে বশ করতে।

একটা ছেলে, একটা মেয়ে। পবস্পরকে বশ করার জন্য তারা পাগল।

এ ব্যাপার তুচ্ছ নয় জগৎ-সংসারের হিসাবি মানুষদের কাছে। মেয়ে যদি ছেলেকে না চায় আর ছেলে যদি মেয়েকে না চায় তবে তো ফুরিয়েই গেল জীবনের কারবার !

বাপে-মায়ে এক রকম পিরিত হয়েছিল, পিরিত হয়েছিল ঠাকুর্দা-ঠাকুমায়। সে পিরিত ভালো লাগেনি, ভালো লেগেছিল লিওনরার তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রেম আর আত্মরক্ষার দুর্গ গড়া।

লিওনরার প্রশ্নটা নানাভাবে নানারূপে এলেও প্রশ্নটা ছিল একই ; তুমি কি পারবে আমার বাকি জীবনটার দায় বইতে ? তোমার মতো পয়সাওলা এ দেশের কোনো জোয়ান আমার দায় ঘাড়ে নিয়ে আমার সাথে পিরিত করতে চাইছে না—তাদের সে ক্ষমতা নেই। তুমি পারবে কি বিলাতি বউকে সারাজীবন সামলাতে ?

সুদর্শনা আর রত্নাকরের মধ্যে তর্ক যুদ্ধ রাগারাগি, মান-অভিমান লক্ষ করতে করতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল জগদীশ।

তার কেবলি মনে হচ্ছিল চিত্রার সঙ্গে এই রকম ছ্যাবলামি করতে গিয়ে সে চিত্রার এবং তার নিজের জীবনটা কীভাবে শেষ করে দিয়েছে, মহাপুরুষ তাকে পুরোধা রেখে ওরাও সেই একই বিরোধ সৃষ্টি করছে নিজেদের মধ্যে।

প্রপাতে ঢলে না পড়ে সুদর্শনা ঢলে পড়বে অকাম্য অসহনীয় জীবনে।

প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত করার মোহে রত্নাকর আত্মবিসর্জন দেবে সুদর্শনার আত্মীয়বন্ধু বর্জন করা সাংঘাতিক ব্যক্তিগত বিদ্রোহাত্মক জীবনের দায় নেবার বিপদ ঘাড়ে নিয়ে।

এদিকে আরও ছড়িয়ে পড়েছে উপজাতীয়দের বিদ্রোহের আগুন। জগদীশের আশ্রমের আশেপাশের গাঁয়েও এসে গেছে। জিরাই-তাপ্পিদের কাছে জগদীশ ব্যাপার শোনে, বিবরণ শোনে।

রত্নাকবের কাছেও শোনে।

আশ্রমে আর যেন মন টিঁকছে না রত্নাকরের, সারাদিন চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়।

সুদর্শনা এসে ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে যায়।

বারবার ফিরে যায়, তবু আবার আসে !

সাবাদিন টোটো করে ঘুরে রত্নাকর সন্ধ্যার সময় আশ্রমে ফেরে শুনে সেদিন তো সে একেবারে সন্ধ্যার সময় এসে হাজির তরুণের সঙ্গে—তার মারাত্মক স্পিডে গাড়ি চালানোর ঝোঁককে গ্রাহ্য না করে !

আজ ঠিক যেন তর্কযুদ্ধ হয় না তাদের মধ্যে, ঘরোয়া ধরনের একটা বচসাই যেন হয়ে যায় ! এবং দুজনকেই যেন রেগে আগুন হয়ে একটু পাশ ফিরে ঘুরে বসে জগদীশের দিকে চেয়ে গুম খেয়ে বসে থাকে।

তবুণ কোথায় যেন আদিবাসীর কুঁড়েতে কাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তার আগামী কবিতার মালমশলা সংগ্রহ করছে কে জানে, জগদীশের সঙ্গে খাতির জমাবার কোনো চেষ্টাই সে করে না। ঝোঁকেব মাথায় একদিন কবিতার বইটা উপহার দিয়ে প্রণাম করেছিল। তারপর একবার জিজ্ঞাসাও কবেনি কবিতাগুলি কেমন লেগেছে !

জগদীশ বলে, রতন, তুমি বাইবে গিয়ে বোসো, সোনার সঙ্গে আমার গোপন কথা আছে।

বত্নাকর নীরবে বেরিয়ে যায়। সুদর্শনা নড়েচড়ে মাথা হেঁট করে বসে থাকে।

জগদীশ বলে, সোনা, জানো তো আমার এখানে কোনো গোপনতা নেই ? রতনকে বললাম বটে তোমার সঙ্গে গোপন কথা আছে কিন্তু ওটা শুধু কথা বলার কায়দা। রতন বুঝে গেছে তোমার সঙ্গে আমি কী বিষয়ে কথা বলব।

সুদর্শনা নিশ্বাস ফেলে বলে, গোপন তো আমিও কিছু করিনি। এমন আবোল-তাবোল আসি, এ রকম ঝগড়া করি, আমি কী জানিনে আপনি সব জানতে বুঝতে পারছেন !

না গো মেয়ে, আমায় সবজান্তা ভেবো না। ললিতার ব্যাপারটা জানো ?

শুনেছি।

ললিতা ভেবেছিল, নেশার ঝোঁকে বুঝি মাথা বিগড়ে গেছে, তাই বলেছিলাম ওকে আমি পরীক্ষা করব। নেশা বইকী নিশ্চয় নেশা। এমনিতে আমার কোনো গোপনতা নেই—কিন্তু নেশা করে সেটা চরমে না উঠলে আমিই কি অতখানি সরল হতে পারতাম ? এমনিতেই আমার লজ্জাঘেন্না ভয়-টয় সব মিলিয়ে গেছে। আমি পাগলের মতো এমন অনেক কিছু করতে পারি তোমরা যাতে লজ্জা পাবে বিব্রত হবে বিপাকে পড়বে, আমার এতটুকু অস্বস্তিবোধ হবে না। কিন্তু কোনোদিন আমি তা করিনি কেন, কোনোদিন করব না কেন জানো ? আমার সব লজ্জা ঘৃণা কাম-টাম পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে, তোমাদের বিব্রত করার অধিকার তো আমার জন্মায়নি ! তোমরা এসেছ একটু স্বস্তি চাইতে, আমি সত্যি তো পাগল নই যে কোমরে এক টুকরো কিছু জড়াবার আলসেমিতে তোমাদের অস্বস্তি ভোগ করাব !

সুদর্শনা মুখ তোলে।

ললিতার কাছে শুনে কিছুই বুঝিনি। ওভাবে কেন এসেছিল, ওর রোগটা কী, কেন আপনি ওকে পরীক্ষা করতে চাইলেন—সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলে আবোল-তাবোল কথা বলে। ব্যাপারটা কী সোজাসুজি বলবে না কিছুতেই। আলোকবাবু যেদিন এলেন সেইদিন ডিনারে বসে তুচ্ছ কথা নিয়ে ঝগড়া বাঁধিয়ে কী কাণ্ডটাই যে করল ললিতাদি। ঠিক যেন পাগল হয়ে গেছে। তারপর ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল না কী করল কে জানে, আমরা কত ডাকাডাকি করলাম—সাড়াও দিল না, শব্দও করল না। আলোকবাবু বাইরের ঘরে রাত কাটালেন।

জগদীশের মুখে মুচকি হাসি দেখে তার বর্ণিতা ললিতার মতোই যেন পাগল হয়ে গিয়ে চিৎকার করে সুদর্শনা বলে, হাসছেন ? অনেকে বলছে আপনিই মাথা বিগড়ে দিয়েছেন ললিতাদির—কোনো একটা মতলব নিয়ে কোনো একটা প্রক্রিয়া খাটিয়ে কিছু করেছেন।

জগদীশ কিছুমাত্র বিচলিত হয় না।

সে তো বলবেই পাঁচজন। নিন্দা ছাড়া প্রশংসা হয় ? ঘৃণা ছাড়া প্রেম হয় ? বেদনা ছাড়া, ব্যাধি ছাড়া আনন্দ হয় স্বাস্থ্য হয় ? একটা আছে বলেই আরেকটা আছে। পরীক্ষা করতে চাইলাম বলেই ললিতা ভড়কে গেল, নইলে আমি বলে দিতে পারতাম কীভাবে রেহাই পাবে। দেহের রোগ, দেহে প্রাকৃতিক একটা গোলমাল, ডাক্তারকে দেহটা পরীক্ষা করতে না দিলে কী করে ডাক্তার সে রোগ সারাবে ?

সুদর্শনা যেন কোনো মহাসত্যের সন্ধান পেয়ে আত্মসমাহিতা হয়ে গেছে এমনভাবে বলে, দেহের বোগ ? ললিতাদির দেহের রোগ ? ওব দেহে তো কোনো রোগ নেই, খুঁত নেই। ও নিজে বলে খুঁত আছে, ডাক্তার কোনো খুঁত খুঁজে পাযনি। আলোকবাবু তো ঠিক করেছেন দু-চারহাজার খরচ করে স্পেশালিস্ট দিয়ে ললিতাদি মানসিক রোগের চিকিৎসা করাবেন।

জগদীশ কোনো ইঙ্গিত করেনি, নিজে থেকে তাপ্পি ঘরে এসে তাকে বিলাতি বোতল থেকে আন্দাজ করে খানিকটা জল মিশিয়ে জগদীশের হাতে তুলে দিয়ে সরে যায়।

জগদীশ টের পায, তাপ্পির ভয় হয়েছে !

বিলাতি মাল না টেনে জগদীশ হয়তো সামলাতে পারবে না সুদর্শনাকে।

গেলাসটা নামিয়ে রেখে জগদীশ বলে, মানসিক চিকিৎসা ? স্পেশালিস্ট দিয়ে ? শরীরের অসুখ মনের চিকিৎসায় সারানো ? তাই তো বলছিলাম, তুমিও যেন ললিতাদির দশা দেখে উলটো পথে চলার জিদ কোরো না।

আমার দাদা ডাক্তার। তিনিও ছিলেন ডিনারে। বাড়ি ফিরে বললেন, ললিতাদির হিস্টিরিয়াও জন্মায়নি, ললিতাদি পাগলও হয়ে যায়নি। আলোকবাবুর সঙ্গে একটা কিছু সাংঘাতিক গন্ডগোল হয়েছে। এতদিন পরে আলোকবাবু এলেন, সাত-আটশো টাকার উপহার দিযে এলেন, হিস্টিরিয়ার রোগীও অন্তত কয়েক দিন সুস্থ শান্ত হয়ে থাকত। দাদা বললেন, ললিতাদি মনে নিশ্চয় ছেলেবেলা থেকে কোনো কমপ্লেকস ছিল—

তোমার ডাক্তার দাদা যাই বলে থাক, তোমার ললিতাদির মন ঠিক আছে। দেহ নিয়ে এত করেও মনটা ঠিক রেখেছে, এমন মা কি সহজে মেলে ? তোমার ডাক্তার দাদার মাথায় গোবর, মিস্টার আলোকবাবুর মাথায় গোবর, ললিতা.. মাথাতেও গোবর—তাই তো এমন ভূতুড়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা হল। ভূতে পেয়েছে হলুদপোড়া দিয়ে সারাও !

সুদর্শনা চুপ করে থাকে। ললিতাদির কী হয়েছে না হয়েছে সে জানে না, স্পেশালিস্ট ডাক্তাররাও বোধ হয় জানে না।

নইলে ললিতা সারাদিন সকলের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে অনেকটা মিলেমিশে, মিলিয়ে মিলিয়ে প্রতাপের টাকাপয়সার হিসাবনিকাশ দেখে শুনে বেশ কাটিয়ে দেয়।

সন্ধ্যা হলেই তার মাথা যায় বিগড়ে। যেমন-তেমন যে কোনো রকম একটা ছুতো ধরে আলোকেব সঙ্গে ঝগড়া করে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়।

ঘুমোয় না।

অনেক রাত অবধি সে যে ঘুমায় না সেটা টের পায় সকলেই।

জেগে থাকে কিন্তু ডাকলে সাড়া দেয় না।

সুদর্শনা আনমনা হয়ে গিয়েছিল। নিজের ব্যাপারটা ভুলে গিয়ে মশগুল হয়ে গিয়েছিল ললিতার রহস্যময় সমস্যার চিন্তায়।

তাপ্পি আবার মহুয়া মেশানো মদ আনে।

জগদীশ পান করে না, সামনে রাখে।

আমার দোষ নেই কিন্তু। আমি তোমার সমস্যাটা নিয়েই শুরু করেছিলাম। তুমিই তোমার ললিতাদির সমস্যা নিয়ে বিভোর হয়ে ওইদিকেই চলতে লাগলে, নিজেকে ভুলে গেলে। অন্যের কথা ভেবে নিজেকে ভুলতে পারো বলেই তোমাকে কিন্তু আমি এত ভালোবাসি মেয়ে !

সুদর্শনা কাতবভাবে বলে, কিন্তু আমার এ বকম হল কেন ? সবাই বলাবলি করছে, আমার মাথা বিগড়ে গেছে। একটা আধ-পাগলা ভবঘুরে ভিখারি—

জগদীশ বলে, তোমাদেরই এ রকম হয়। বড়ো বড়ো কথা ভাববে, বড়ো বড়ো আদর্শ আঁচাবে, কাজে কিছু করবে না। কীভাবে বাঁচা উচিত জানবে এক রকম, জীবনটা করবে অন্য রকম।

সব তালগোল পাকিয়ে যাবে না ?

নবম অধ্যায়

জলধি রায়েবও পদার্পণ ঘটে জগদীশের আশ্রমে।

প্রবোধকে খুঁজে পেতে সঙ্গে নিয়ে আসে। বলে, একটা গুজব শুনলাম। আরও শুনলাম, আপনার বন্ধু প্রবোধবাবুই নাকি গুজবটা ছড়াচ্ছেন। ওনাকে সঙ্গে নিয়েই দেখতে এলাম ব্যাপারটা কী।

সকলকে তুমি বলা অভ্যাস হয়ে গেছে। এই সেদিনও জলধিকে মিস্টার রায় বলে সম্বোধন করেছে, আপনি বলে কথা বলেছে, সে সব যেন খেয়ালও নেই জগদীশের। চুল পাকা ভুরুপাকা অজানা অচেনা প্রতাপ এসেই পায়েব তলায় লুটিয়ে পড়েছিল, শিশুর মতো কাতরভাবে ভক্তিগদগদকণ্ঠে বাবা বলে ডেকেছিল, তাকে তুমি না বলে উপায় থাকেনি।

জগদীশের এটাও খেয়াল থাকে না যে জলধি ভক্ত বা শিষ্য হিসাবে তার কাছে আসেনি।

সাধুবাবার কাছে সে আসেনি। এসেছে জগদীশের কাছে। আগের পরিচয়ের জের টানতে এসেছে।

কেন এসেছে সেটা অবশ্য হঠাৎ বোঝা সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু বোঝা যায় যে তার শুধু নিছক কৌতূহল নয়। কিন্তু প্রবোধকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

শুধু অভ্যাসের বশে যান্ত্রিকভাবে নয়, হাসিমুখে আন্তরিকতার সঙ্গেই বলে, জলধি এসেছ ? বোসো। অন্য কেউ হলে নিয়ম ভাঙার জন্য দূব দূর কবে তাড়িয়ে দিতাম। সন্ধ্যার পর আমি কারও সঙ্গে দেখা করি না। প্রবোধকে সঙ্গে নিয়ে তুমি এসেছ, তোমাদের বেলা আইন ভাঙতেই হবে।

প্রবোধ বোসো।

জলধি বসেও না, কথাও বলে না। তার মুখের ভাব দেখে জগদীশ আমোদ পায়। জলধি চটেছে। ভীষণ চটেছে। তাকে জগদীশ বাপের মতো, মহাপুরুষ সাধুর মতো, এ রকম সহজ অন্তরঙ্গ অভ্যর্থনা জানাবে এটা সে কল্পনাও করতে পারেনি। তাকে খানিকটা ধাতস্থ করার জন্য জগদীশ খানিকটা হালকা ইয়ার্কির সুরে ব'ল, আরে বাবা বোসোই না ! অ্যাদ্দিন পবে দেখা হল, ভদ্রতা করা দিয়ে শুরু করলে আজ শুধু ভদ্রতাই করা হবে। বোসো, বন্ধুব মতো আলাপ শুরু করে দাও। মিস্টার-ফিস্টার, আপনি-টাপনির ভজকট জুড়ো না। ইচ্ছা হলে তুই-তোকাবি চালিয়ে যাও।

প্রবোধের শঙ্কিত ভাব দেখে জগদীশ মনে মনে আরও আমোদ পায়।

জলধি ধীরে ধীরে বসে। চারিদিকে চোখ বুলায। তীক্ষ্নদৃষ্টিতে জগদীশকে দ্যাখে। তারপর খানিকটা সহজ সুরে বলে, শেষকালে এইখানে এসে সাধু সেজেছেন ? ব্যাপারটা কী ?

জগদীশ বলে, সেই চিরকেলে ব্যাপার। মানুষকে ছাড়লাম, সভ্যতা ভুললাম—কমলি কিন্তু আমায় ছাড়ছে না ! এখানে ধাওয়া করে এসে পাকড়াও করেছে।

জলধি আশ্চর্য হয়ে বলে, এই সোজা কথাটা জানতেন না ? অসভ্য জংলিদের বাদ দিয়ে কি মানুষের সভ্যতা ? ওরা দলে দলে না খেয়ে শুকিয়ে মরেছে বলেই তো সভ্যতা আকাশে উড়তে শিখেছে।

মানুষকে আকাশে ওড়াতে সভ্য মানুষও প্রাণ দিয়েছে—অনেকে দিয়েছে। সভ্যতা-অসভ্যতার বিচারটা আমরা গ্রাম আর শহরের মাপকাঠিতে করি কি না-—তাই ভুল হয়ে যায়। শহরের গুন্ডা কি গেঁয়ো বুনো মানুষেব চেয়ে সভ্য ? যুদ্ধ বাধিয়ে চারিদিকে সর্বনাশ ছড়িয়ে সভ্যতাকে দুর্বল করে যারা কুবেরের সঙ্গে পাল্লা দিতে চায়—তারা কি সভ্য ?

এতক্ষণ পিছনে দাঁড়িয়েছিল, এবার রত্নাকর সামনে এসে বসে। জিজ্ঞাসা করে, খবর কী জলধিবাবু ? কেমন আছেন ?

জীবনবাবু, আপনি এখানে ? আমার তো আশ্চর্য লাগছে !

কেন ? আপনি এসে জুটলেন সেটা আশ্চর্য নয়—আমি এলে সেটা খাপছাড়া হবে কেন ?

এঁর সঙ্গে আগে আমাদের জানা-চেনা ছিল। আপনি কি আগে এঁকে চিনতেন ? আপনাকে তো ওই সার্কেলে কখনও মিশতে দেখিনি !

রত্নাকর বলে, জানা-চেনাটা নতুন করে হয় না ? যাদের মধ্যে জানা-চেনা হয়েছে তাদের মধ্যেই সেটা চিবকাল সীমাবদ্ধ থাকে নাকি ? উনি কি আপনাদের আগেকার সেই উঁচু সার্কেলে রয়ে গেছেন—ওঁকে আজ আবার নতুন করে আমাদের সার্কেলটা জানতে চিনতে হচ্ছে না ?

জগদীশ হেসে বলে, অন্যায় অনুযোগ করছ রত্নাকর। পাঁচ বছরের ছেলেকে ছেড়ে বাপ যদি বিদেশে যায় বিশ বছরেব জন্য—বাড়ি ফিরে সে কি চিনতে পাববে ছেলেকে ? একটা একদম অজানা নওজোয়ানের সঙ্গে নতুন করে জানা-চেনা করতে হলে সেটা কি দোষের কথা হবে ? জলধি এসেছে আমার সঙ্গে আগেব পরিচয়ের সূত্র ধবে, তোমাব সঙ্গেও দেখা হয়ে গেছে—কিন্তু আমাকেও চিনতে পারছে না তোমাকেও চিনতে পাবছে না। অনুদাব হয়ো না রত্নাকর, ওকে একটু সমঝে নেবার সময় দাও।

প্রবোধ হাঁ করে চেয়ে থাকে। তার সামনের দুটো দাঁত পড়ে গেছে।

বোঝা যায় অসীম বিস্ময়ের সঙ্গে সে ভাবছে, এই কি সেই জগদীশ ? সেই অস্থির চঞ্চল ভাবোন্মাদ খামখেয়ালি একগুঁয়ে উচ্ছৃঙ্খল জগদীশ ?

এ জগদীশ যে কথা কইছে দিব্যদর্শী ঋষিব মতো।

এমন বোগা হয়ে গেছিস ?

জগদীশের সহজ সাদামাটা ঘরোয়া প্রশ্ন শুনে চমকে উঠে প্রবোধ বড়ো লজ্জা পায়। লজ্জাটা সামলে নিতে তাব খানিকটা সময় লাগে।

বড়ো ঝঞ্ঝাট সংসারে, না ?

জগদীশ হাসিমুখে পুবানো দিনের বন্ধুর মতো অন্তরঙ্গভাবে এ প্রশ্ন কবতে প্রবোধ রেগে যায়।

সাধু হয়ে কী এমন মোটাসোটা হয়েছিস তুই ? সংসারে ঝঞ্ঝাট আছে, তোর সাধুগিরিতে বুঝি ঝঞ্ঝাট নেই ?

চটিস কেন ভাই ? আমি কি তোর সত্যিকারেব সে রকম সাধু ? সাধু হবার কোনো সাধ নিয়ে এখানে ডেরা বেঁধেছিলাম ? দশজনে গায়েব জোরে আমায় সাধু বানিয়েছে—কত বকি-ঝকি তবু শুনবে না। ঝঞ্ঝাট বইকী—বিষম ঝঞ্ঝাট। এই শণের কুঁড়েতে মদ খাওয়ার চেয়ে কলকাতা প্যারি লন্ডনের হোটেলে মদ খাওয়া ঢের সহজ।

কথাবার্তা বলে তর্কবিতর্ক চালিয়ে হারিয়ে যাওয়া পরিচয়কে খানিকটা নতুনভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা জলধির কিন্তু একেবারেই দেখা যায় না। মাঝে মাঝে ছাড়া-ছাড়াভাবে দু-একটা কথা বলে—তাও আবার হয় খোঁচা দেওয়া ব্যঙ্গ করা কথা !—তার মনের জ্বালার ঝালটা বেশ টের পাওয়া যায়। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে জগদীশকে লক্ষ করে, তার কথা শোনে।

হঠাৎ ঝিলিক মারার মতোই তার দৃষ্টি শাণিত হয়ে ওঠে।

জগদীশ একসময় সহজভাবেই বলে, কত লোকেই তো সাধু সেজে মানুষ ঠকাচ্ছে—আমি ঠকাচ্ছি বলেই এত রাগ কি করতে আছে জলধি ? রাগের জ্বালায় তোমার নিজের কষ্টই বাড়ছে !

জলধি রূঢ়ভাবে বলে, আমি কি শিশু যে আপনি সাধু সেজেছেন বলে রাগ করব ? কিন্তু আমি আপনার শিষ্যও নই, ভক্তও নই—আমায় দয়া করে তুমি বলবেন না !

জগদীশ হেসে বলে, সবাইকে আমি তুমি বলি, আপনি বলা আসে না। তুমিও আমায় তুমি বলো না, চুকে যাক। রত্নাকর গোড়ায় আপনি বলত, তারপর তুমিত্বে পৌঁছে গেছে। ক-দিন পরে হয়তো তুই-তোকারি শুরু করবে।

জলধি বলে, ও সব ন্যাকামি আমার আসে না।

আসবে—যাতায়াত করতে করতে আপনা থেকেই আসবে।

সেদিন রাতে আবার জলধি আসে।

তারই ইঙ্গিতে চারজন মানুষ এসে নীরবে জগদীশের কুঁড়েঘরের দাওয়ার সামনে দাঁড়ায়, তাদের তিনজনের হাতে রাইফেল, একজনের হাতে রিভলবার।

গায়ে যেন জোর পায় জলধি।

কে জানে জগদীশের মেজাজটা সে রাত্রে আগে থেকেই ভালো ছিল কিনা অথবা জলধির কাণ্ড দেখে তার মেজাজ ভালো হয়ে যায় !

একেবারে ফৌজ নিয়ে হাজির ? তুমি বলায় এত রাগ হয়েছে জলধি ?

আপনার এই কেন্দ্রটা খুলবাব পর বড়ো বেশি চুরি চামারি হচ্ছে চারদিকে। আপনার দোহাই দিয়ে চোরেরা রেহাই পাবার চেষ্টা করছে। আপনার আশ্রমের নামে ভিজিটরদের ভয় দেখিয়ে টাকা পয়সা আদায় করছে। এ সবের পিছনে আপনি আছেন, আপনিই সবকিছুর জন্য দায়ি। দুঃখের কথা হল, কিন্তু কী করব, আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করতে এসেছি।

গ্রেপ্তার করো।

তাহলে দয়া করে আমার সঙ্গে চলুন।

আবলুশ কুঁদে তৈরি করা শ-তিনেক মেয়ে-পুরুষ আঁধার ফুঁড়ে জড়ো হয় কুটিরেব সামনে।

অস্ত্রধারী চারজনকে তিন দিকে ঘেরাও করে জমাট বাঁধে।

কারও হাতে কোনো অস্ত্র নেই। যে সব আদিম অস্ত্র সম্বল করে তারা বাঘ-ভালুকের রাজত্বে শিকার করতে যায়, সে অস্ত্রগুলি পর্যন্ত সঙ্গে আনেনি।

জলধি একবার গলা খাঁকারি দেয়।

জগদীশ হেসে বলে, প্ল্যান ঠিক করাই ছিল ? কিন্তু এ প্ল্যানে কি সামলাতে পাববে ? তিন-চারশো লোক মরিয়া হয়ে হঠাৎ ঘিরে ধরলে চারটে রাইফেল কী করতে পারে ?

বাগে পেয়ে চুকলি শোনাচ্ছেন ?

খুব নমিত শান্ত মনে হয় জলধির প্রতিবাদ।

বাগে পেয়েছি নাকি তোমাকে ? আমার তো জানাও ছিল না তুমি হঠাৎ এভাবে আসবে। ওরা আমার কথায় ওঠে-বসে। আমাকে জিজ্ঞাসা না করে তোমায় ছিঁড়ে খাবে না, ভয় নেই। ওরা কেন আমায় এত ভালোবাসে জানলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।

বলুন না শুনি।

তোমার সাহস আছে। কী করে ল্যাজ গুটিয়ে পালাবে ভাবছ অথচ দেখাচ্ছ যেন আমার কথা শোনার জন্য তোমার আগ্রহের অন্ত নেই। একটা পেগ চলবে ? সেরা স্কচ।

জলধি হাতের তালুতে তালুতে ঘসে ঠিক যেন জ্বালা ও আপশোশের ফেনা তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে বলে, না।

আড়চোখে সে চেয়ে দ্যাখে, তার জবাব যেন শুনতেই পায়নি এমনিভাবে জগদীশ দামি বিলাতি বোতলের মদ স্বচ্ছ কাচের গ্লাসে ঢেলে তার সামনে এগিয়ে দেয়।

বলে, বোসো না আমার ঘরে। আতিথ্য গ্রহণ না করে আমাকে অপমান করতে পারো—কিন্তু তোমাকে ও রকম ছেলেমানুষ ভাবতে পারছি না।

এক গেলাস জলও জগদীশ গড়িয়ে দেয়।

জলধি হাসবার চেষ্টা করে বলে, জল ভালো তো ? কলেরা হবে না তো ?

ঝরনার জল। প্রপাত থেকে আনা।

যাকগে। আপনি তো আর সাধাবণ মানুষ নন, ছোটোলোকের মতো প্রতিহিংসা আপনি নেবেন না। কিন্তু এইটুকু খেয়ে কি পোষাবে ?

একান্ত অবহেলার সঙ্গে দামি বিলাতি মদের বোতলটা এগিয়ে দিয়ে জগদীশ বলে, ভয় পেয়ো না। কুঁড়েঘরে থাকলেও আমি আতিথ্য জানি। উনিশ-বিশ বছর বয়েস থেকে জানি এক চুমুকের মদ কাউকে অফার করা অসভ্যতা, খেতে না পেয়ে যে মরে যাচ্ছে তাকে দু-চামচ দুধ খেতে দেওয়ার মতো ছোটোলোকামি।

বোতল কাত করে আরও খানিকটা মদ গেলাসে ঢেলে অল্প একটু জল মিশিয়ে কী বকম তৃষার্তের মতো জলধি গেলাসের শেষটা শুষে নেয় দেখে জগদীশ মমতাবোধ করে।

প্ল্যান ফসকে বিপাকে পড়াব রাগে ভয়ে-অপমানে তার গলা যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে বুঝতে কষ্ট হয় না।

সিপাই নিয়ে জলধির আকস্মিক আবির্ভাব আবও রহস্যময হয়ে ওঠে ললিতা ও সুদর্শনার আবির্ভাবে।

ক্রোধে সুদর্শনাব মুখে গাম্ভীর্যের অপূর্ব ব্যঞ্জনা ফুটেছে। রাগে তার সর্বাঙ্গ কাঁপছিল।

আমাদের গালে চুনকালিও দিলেন, আমাদেব বিপদেও ফেললেন। আপনি কেমন মানুষ জলধিবাবু ?

জলধি তখন আকাশ ছাড়িয়েও অনেক উঁচুতে চড়েছে। নিয়মিত নয়, অভ্যস্ত তার নয়, তাই বেশি মাত্রা দবকার হয় না।

প্রথমে হাতজোড় করে। তারপর হাসে। তারপর বিকৃত মুখভঙ্গির সঙ্গে সুদর্শনাকে স্যালুট করে। তাবপর আবার হাসে।

কেন ? কী করেছি ? পুবানো বন্ধু, মহাপুরুষ—একবার দেখা করতে এলাম।

সুদর্শনা গর্জন করে ওঠে, পুবানো বন্ধুব সঙ্গে দেখা করতে আসতে আপনাব চারজন আর্মড গার্ড লাগে ? বাবাকে কী বলে ভুলিযেছেন আমি জানি না ভেবেছেন ? বাবাও অস্বস্তিবোধ করেছিলেন—হুকুম নিয়ে এসেছেন, উপায় নেই, নইলে বাবা গাড়িও দিতে না, গার্ডও দিতেন না। বাবাব রকম দেখেই আমার সন্দেহ হল—আপনিও বাড়ি নেই। জিজ্ঞাসা করতে বাবা যা বললেন শুনেই বুঝতে পারলাম একটা মতলব নিয়ে এসেছেন। ছিছি !

জগদীশ হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করে, বাবা কী বললেন ? বাবার মুখে কী শুনে ব্যাপার অনুমান করে তুমি আমার নতুন মা-কে সাথে নিয়ে আমায বাঁচাতে ছুটে এলে ?

ললিতা ও সুদর্শনা একবার চোখে চোখে তাকিয়ে নেয।

জগদীশের জিজ্ঞাসায় জবাব দেয় সুদর্শনার বদলে ললিতা।

বুনোরা হাঙ্গামা করছে জানেন তো ? জলধিবাবু ব্যাপারটা বুঝতে এসেছেন। কিছুই করবেন না, শুধু আন-অফিসিয়ালি ব্যাপারটা দেখে শুনে বুঝে গিয়ে একটা রিপোর্ট দেবেন। উনি যাতে বিপদে না পড়েন সে জন্য অর্ডার আছে যে উনি চাইলেই আর্মড গার্ড দিতে হবে। আজ দুপুরে আমাদের বাড়ি নেমন্তন্ন ছিল—আজ বাবার জন্মদিন। জলধিবাবু প্রথম থেকেই—ললিতা একটু হাসে।

জলধির ঢুলুঢুলু ভাব দেখে মনে হয় না সে কোনো কথা শুনছে বা বুঝছে।

তার দিকে চেয়ে সংকোচ জয় করে ললিতা বলে যায়, প্রথম থেকেই খালি চিত্রাদির কথা বলতে লাগলেন। কী সব বিশ্রী কথা, চিত্রাদিকে নাকি খুন করা হয়েছে—

জলধি জড়ানো গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, নিশ্চয় খুন করা হয়েছে !

এই গুন্ডাটা খুন করেছে।

ভোররাতে জগদীশের ঘুম ভেঙে যায় !

দিনে প্রবোধ আর জলধি এসেছিল বলে নয়। রাতের নাটকীয় কাণ্ডটার জন্যও নয়। প্রাণে নতুন একটা জিজ্ঞাসা জেগেছিল বলে সে নেশাকে খাতির করেনি।

নেশা আর অভ্যাসের পার্থক্য কতখানি সেটা তো আর তার অজানা নেই।

পেটের গোলমালের জন্য সুদর্শনার মা ছাড়াও তার কয়েকজন ভক্ত নিয়মিত আফিং খায়—কেউ খায় তিল পরিমাণে, কেউ খায় বেশি।

কেউ ওষুধের মতো নিয়মিত আফিং খেলেই তার দুধ খাওয়ার অধিকারটা সংসারে স্বীকৃত হয়।

শিশুদের দুধে সে ভাগ বসালেও তার অপরাধ হয় না। তাই একই ওষুধ খেলেও ওদের মধ্যে কারও বেলা সেটা হয় অভ্যাস, কারও বেলা হয় নেশা।

শেষরাত্রের আবছাওয়া আলো-অন্ধকারে প্রপাতের দিকে চলতে আরম্ভ করেই জগদীশ টের পায় যে ভক্তদের পাহারায় ঢিল পড়েছে।

কয়েক মাস ধরে দিনেরাত্রে যে কোনো সময়ে প্রপাতের দিকে যাওয়া বন্ধ করেছিল বলে ওদের সতর্ক দৃষ্টিতে একটু শিথিলতা এসে গেছে।

আমোদ বোধ করছে জেনেও বুকটা টনটনিয়ে ওঠে জগদীশের। কী দিয়ে সে অর্জন করছে সকলের এই ভালোবাসা ? তাকে পাছে বনের বাঘে-ভালুকে সাবাড় করে সে জন্য এদের এত ভয়, এত সতর্কতা ?

দশম অধ্যায়

জগদীশ জিজ্ঞাসা করে, শান্তি কি কিছুটা পাচ্ছ প্রতাপ ?

অশান্তির ঝাঁঝ কিছু কমেছে ?

প্রতাপ কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে বলে, অনেক কমেছে বাবা। অশান্তির ঝাঁঝে চোখে অন্ধকার দেখেছিলাম। তোমার কৃপায় মতিগতি কত যে বদলে গেছে ছেলেমেয়ে বউমাদের।

জগদীশ হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করে, তোমার সোনার ছেলে আলোক আসে না কেন ?

কয়েক মিনিট মাথা হেঁট করে থাকে প্রতাপ।

ওর হল কাজের মানুষের মতিগতি। কাজের বিষয় ছাড়া কোনো কথা জানতে চায় না, বুঝতে চায় না। বলে কী, কাজ করার, কাজের চিন্তা করার সময় পাই না, আমায় ও সবের মধ্যে টেনো না।

একটু থেমে মুখ তুলে খুশির সঙ্গে বলে, এবার দেখছি ভাব-সাব খানিকটা অন্য রকম। সব তোমার দয়া বাবা—সাধে কি আমি তোমার চরণ সার করেছিলাম শেষবারের মতো। তুমি যদি না দয়া করতে বাবা, আমি ধর্মকর্ম সংসার ছেড়ে দিয়ে বুড়ো বয়সে বেশ্যাবাড়িতে গিয়ে ঠাঁই নিতাম—মদ-বেশ্যা সার করে নরকে যেতাম।

পরম ভক্ত প্রতাপ তার কথা বলার ধাঁচ আয়ত্ত করেছে, মনের চিন্তা হৃদয়ের ভাব মিলিয়ে মিশিয়ে কথা বলার স্টাইল বেশ খানিকটা অনুকরণ করতে শিখেছে।

জগদীশ বলে, তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে ছলনা করেছিলে প্রতাপ। তোমার সোনার ছেলে আলোক আর ললিতার মধ্যে যে মিল নেই এটা গোপন করেছিলে।

হাত বাড়িয়ে জগদীশের পা ছুঁয়ে প্রতাপ বলে, বিশ্বাস করো বাবা, ছলনা করিনি। আমি কিছুই বুঝি না ওদের ব্যাপার। কী বলতে কী বলে ফেলব, উলটো কথা মিছে কথা বলে বসব —এই ভয়ে চুপ করে থেকেছি। চিরকাল সংসারে দেখলাম মিল না থাকলে স্বামী-স্ত্রীতে নানারকম ঝগড়া হয়, অশান্তির সীমা থাকে না। কোনোদিন ওদের মধ্যে মনোমালিন্যের চিহ্নটুকু দেখি না।

সোজা হয়ে বসো প্রতাপ। বারবার পায়ে হাত দিয়ো না। অতিভক্তি যে চোরের লক্ষণ তা তো জানো ?

প্রতাপ আহত হয়ে সোজা হয়ে বসে। জগদীশ বলে, চোখ থাকতে অন্ধ, কী করে দেখবে পাবে সোনার ছেলে আর সোনার বউমার মধ্যে মনোমালিন্যের চিহ্ন ? তোমার সেবা করার জন্য ললিতা স্বামীর কাছে না থেকে তোমার কাছে থাকে, তোমার বিষয়কর্ম ব্যাবসায়ের খুঁত ধরে লাভ বাড়ায়, কী করে তোমার চোখে পড়বে ওদের মনোমালিন্য ?

ওদের মাঝে মাঝে দেখা তো হয় ? রাগ অভিমান কখনও দেখিনি। হাসিমুখে মিষ্টিসুরে কথা কয়—

জগদীশ প্রায় গর্জন করে ওঠে, প্রতাপ ! মনে আছে প্রথম দিন তোমায় বলেছিলাম, তোমার প্রণামি আমি নেব না, তোমার শান্তি জুটবে না ? মনে আছে, প্রায়শ্চিত্ত করতে বলেছিলাম ? এই বুঝি তোমার প্রায়শ্চিত্ত করার নমুনা !

প্রতাপ কাতরভাবে বলে, যা বলছেন তাই তো শুনেছি—

কই শুনছো ? স্পষ্ট বলে দিলাম—লাভের টাকাকে ভগবান না করে মানুষকে এবার ভগবান করো। বড়ো স্কেলে না পারো, নিজের মস্ত সংসারটার মানুষগুলোকে অন্তত বড়ো ভাবো তোমার বিষয়-সম্পত্তি টাকা-পয়সার চেয়ে। শুনে তুমি ভড়কে গিয়েছিলে। ভেবেছিলে, আমি তোমার মধ্যে বৈরাগ্য জন্মিয়ে তোমায় সন্ন্যাসী করে দিতে চাই। মনে আছে বলেছিলাম, লাভের টাকার মায়া কাটিয়ে দিতে চাইলে তুমি ভড়কে যাবে ?

প্রতাপ নীবে চেয়ে থাকে।

মনোমালিন্য চোখে পড়েনি আদুরে ছেলে, আদুরে বউমার ? তোমার সোনার ছেলে ছুটি নিয়ে বাপের বাড়ি এলে তোমার সোনার বউমাটি যে নানা ছুতোয় দু-একদিনের মধ্যে বাপের বাড়ি পালায়—এটা তুমি খেয়াল করোনি বলতে চাও ?

প্রতাপ যেন খুশিতে ফেটে পড়ে ! বলে, মহাপাপী আমি, তাইতো ক-দিন ধরে ভাবছিলাম শেষ জীবনে মরার আগে শেষবারের মতো চরণ সার করলাম, তিনিও কি শেষ পর্যন্ত আমায় ঠকাবেন ? দিব্যদৃষ্টি আছে জেনে যাঁর কাছে এলাম, তাঁকেও জানাতে হবে সব খুঁটিনাটি বিবরণ, তবে তিনি আমার অশান্তি দূর করবেন !

মাথা হেঁট করে প্রতাপ দেশলাইয়ের পোড়া কাঠিটা দিয়ে গোবর-লেপা মেঝেতে খানিকক্ষণ আঁচড় কাটে। তারপর ধীরে ধীরে হলেও জোরে সঙ্গে বলে, সব দেখেছি বাবা। এ তো কোনো সূক্ষ্ম-দর্শন নয় যে বোকাহাবা আমি মোটা চোখে দেখতে পাব না। আলোক ছুটি নিয়ে বাড়ি এলেই দু-চারদিনের মধ্যে বউমা ছুতো করে বাপের বাড়ি চলে যায়। একবার ছুতো হল তার বাপের অসুখ একবার তার দিদিমার শ্রাদ্ধ—

জগদীশ শান্তভাবে বলে, এই তো প্রায় বুঝে গিয়েছ ব্যাপারটা প্রতাপ। আরেকটু বুঝতে তোমার সাহস হয় না কেন ? ভয় পাও কেন ?

কিন্তু সব বার তো এ রকম করে না। যাব যাব বলে—কিন্তু নিজেই শেষ পর্যন্ত আর যায় না। বেশ হাসিখুশিভাবেই থাকে। তাইতো ঠিক বুঝি না বাপ।

তোমার ছেলের তো বোঝা উচিত ?

প্রতাপ চুপ করে থাকে।

মানুষ পাগলের মতো টাকা চায় কেন প্রতাপ ? বালিশের নীচে কোটি টাকার নোট রেখে, টাকা চিবিয়ে খেয়ে কি কোনো সুখ হয় মানুষের ? টাকা দিয়ে সুখ কিনতে হয় বলে বাঁকা মানুষের ধাবণা জন্মে গেছে, টাকাই বুঝি সুখ। দেখতে পাও না, কাটা ছাগলের মতো ছটফট করছে লাখ লাখ টাকার মালিক ? এমন নেশা টাকা রোজগারের যে তোমার সোনার ছেলে জানে না কিছু টাকা খরচ করে চিকিৎসা করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, বউটাকে আর স্বামীর ভয়ে বাপের বাড়ি পালাতে হবে না। তোমার সেবার ছুতো ছেড়ে, তোমার ছেলের সঙ্গে গিয়ে তোমাকে দু-চারটে নাতি-নাতনি উপহার দিয়ে—

প্রতাপ গুম খেয়ে বসে থাকে ঘণ্টাখানেকেরও বেশি।

জগদীশ বলে, আলোককে পাঠিয়ে দিয়ো—ওর সঙ্গে কথা বলব।

কত মানুষ আসে যায়। কত কথা, কত আলোচনা হয়।

জগদীশকে কোনো কোনোদিন খুব বেশি রকম খুশি মনে হয়।

তাকে নিয়ে এমনভাবে পাগল হয়ে গেল মানুষেরা ? কোনোদিন আবার তার মুখ গম্ভীর হয়ে থাকে।

বুনো মানুষ, গরিব চাষি মানুষ, অশিক্ষিত দোকানি, কারবারি মানুষ, অল্পশিক্ষিত ধনী ব্যবসায়ী মানুষ, শিক্ষায় দীক্ষায় টাকায় পয়সায় বনেদি মানুষ, আপিসের কেরানি মানুষ, কারখানার মজুর মানুষ ?

ভেবে মাঝে মাঝে অহংকারে আকাশে উঠে যায় জগদীশের মন। মাঝে মাঝে আতঙ্কের নরকে নেমে গিয়ে আত্মগ্লানির আগুনে দগ্ধ হয়।

কী সে করেছে মানুষের জন্য ?

কিছুই করেনি।

অনেক মেয়ের সঙ্গে খেলা করে একটি মেয়েকে ভালোবেসেছিল—নিজের দোষে তাকে হারিয়ে প্রাণের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে, নেশা করার বিষের আগুনে পুড়তে পুড়তে মরতে চাওয়ার কী অদ্ভুত পরিণাম এটা যে বিচিত্র বিচিত্র মহামানবতা তার কুঁড়েঘরের দরজায় এসে হানা দিয়ে দাবি জানায়—শান্তি দাও, জীবন দাও, বাঁচাও !

রত্নাকর, আমি কী করে মহাপুরুষ হলাম বলতে পার ?

ভালোবাসাকে তুলে ধরতে জীবন-যৌবন ধন-মান বিসর্জন দিয়েছ বলে। আখেরে লাভের আশায় ও সব ত্যাগ করোনি বলে। তুমি খাঁটি ত্যাগী বলে, আদর্শের জন্য ত্যাগ করেছ বলে। একজনকে যে এমনভাবে ভালোবাসতে পাবে, মানুষকেও সে কী রকম ভালোবাসতে পারে তুমি জানো না, তোমার বড়ো বেশি বিনয়।

ভালোবাসাব মানে জানো ? বুঝিয়ে দিতে পার ?

বুঝিয়ে দিতে পারব না। ভালোবাসা নিয়ে তুমি যে কাণ্ড জুড়েছ দাদা, আমরা বেশ কিছুটা ভড়কে গিয়েছি।

আমি তো মহাপুরুষ হবার কোনো চেষ্টা করিনি।

করোনি বলেই মহাপুরুষ হযেছ। জানাই তো আছে যে মহাপুরুষ হবার চেষ্টা করলে সব ভেস্তে যাবে। তাই মহাপুরুষ না হবার চেষ্টায় মহাপুরুষ হয়েছ।

তোর বাঁকা কথা আমি বুঝি না।

চেষ্টা না করেই বুঝবে, এমন কথা বলি নাকি ? বুঝবার চেষ্টাই করো না তা কী হবে ! শিষ্যের কথা গুরু বুঝবে না সেটা তো গুরুর সব চেয়ে বড়ো অপরাধ। গুরু-শিষ্য সম্পর্ক থাকবে—শিষ্যের কথা গুরু বুঝবে না ! গুবুব তো সর্বনাশ হয়ে গেল। শিষ্য গুরু হয়ে গেল।

তোকে আবার শিষ্য করলাম কবে ?

তাপ্পি এসে খবর দিয়ে যায় আজ মহুয়া জুটবে না জগদীশের। বিলাতির সঙ্গে মহুয়া চালিয়ে বড়োই কাহিল হয়ে পড়েছে জগদীশ—তার শবীর ভেঙে পড়ছে।

যত বড়ো সাধু হোক, যত বড়ো যোগী হোক—বুনো মানুষ তাবা ঠিক করেছে আজ থেকে তাকে মহুযা দেওযা বন্ধ।

পরদিন প্রতাপ এসে অপরাধীর মতো বলে, আলোক বলল, নানাকাজে খুব ব্যস্ত—ক-দিন পরে সময় করে আসবে।

ছুটি নিয়ে এসেছে না ? তবু ব্যস্ত ?

প্রতাপ প্রায় কাতরভাবে বলে, ওব মন ও মেজাজটা একটু অন্য রকম বাবা।

জগদীশ হেসে বলে, বেশ তো। গবজ আমার, আমিই কাল গিয়ে তোমার ছেলের সঙ্গে দেখা করব। যত ব্যস্তই হোক, দুপুরে বাড়িতে স্নানাহার করে তো ? বারোটা-একটার সময় বাড়িতে থাকে তো ? আমি সেই সময়ে যাব।

প্রতাপ মাথা হেঁট করে থাকে।

পরদিন সকালেই আলোক আসে—হ্যাটকোট-পরা আলোক। রকম দেখেই টের পাওয়া যায় মরিয়া বাপের খাতিরে অগত্যা বাধ্য হয়ে এসেছে—ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে এসেছে।

জুতো পায়েই কুঁড়েতে ঢোকে।

জগদীশ বলে, এসো। আমি জানতাম তুমি আসবে। বোসো। জগদীশ হুকুম দেয়, সাবকে চৌকি দে জিরাই।

পরক্ষণে হাজির হয় বাঁশ আর বেতে বোনা হাতখানেক উঁচু মোড়া জাতীয় টুলটা।

আর বছর এক ব্যাটা ইংরেজ এসেছিল। লন্ডনে ছিলাম বছর দেড়েক, তখন আলাপ হয়েছিল। আলাপ হতেই প্রথম কথাটা কী বলেছিল জানো ? আমি ভারতকে জানতে চাই, আমি ভারতকে নিয়ে বই লিখতে চাই। ভেবেছিলাম আমায় খাতির করে বলছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে টের পেলাম—ভারত সম্পর্কে ব্যাটার কৌতূহলের সত্যি সীমা নেই।

বাঁশ ও বেতের টুলটায় আলোক সন্তর্পণে বসে। আসনটা বেশ শক্ত টের পেয়ে সে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে পাইপ ধরায়।

বলে, আপনি যে বিলাতে গিয়েছিলেন আমি তা জানি। কয়েক বছর পরে গিয়েও আমি শুনে এসেছি আপানার সব কাণ্ডকারখানার কথা।

সে তো শুনবেই। এককাঁড়ি টাকা নিয়ে বিলাত গিয়ে আমি তো ইংরেজ হবার চেষ্টা করিনি। ভারতের টাকাকে ইংরাজ মেয়েরা কত খাতির করে তাই দেখাতে চেষ্টা করছিলাম।

ইংরেজ মেয়েরা খুব সস্তা দেখে এসে মনের দুঃখে ভারতীয় যোগী বনেছেন ?

না ! দু-একটা সস্তা মেয়ে দেখে অন্য মেয়েদের সঙ্গে মিশেই টের পেলাম—না, টাকা দিয়ে সুবিধা হবে না। এই জঙ্গলে এসে কত বছর ধরে বুঝবার চেষ্টা কবে মেয়েদের সম্পর্কে সাব কথাটা কী জেনেছি জানো ?

মেয়েরা কোনো দেশে সস্তা নয়, মেয়েরা সব দেশে মা। বেশ্যা মানে কী বুঝেছি জানো ? মা হতে অক্ষম কিছু মা অগত্যা বেশ্যা হয়েছে বাপেদের মুখ চেয়ে—মেয়েমানুষকে তারা মা মনে করে, মায়েদের যারা খেতে পরতে দেয়।

আলোক হাতঘড়ির দিকে একনজর তাকিয়ে বলে, আমি ভক্তি জানাতেও আসিনি, তর্ক করতেও আসিনি। বাবার তাগিদে এসেছি। কাজের কথাটা মিটিয়ে দিলেই আমি বিদেয় হতে পারি।

বিদেয় হও ! বাপের টাকা আছে—বাপের খাতিরে অগত্যা বাধ্য হয়ে এসে আমার কথা শুনবে, আমি কি সে জন্য তোমায় ডেকেছি ? বাপের খাতিরে আসতে পারবে অথচ বিরক্তি চাপতে পারবে না—এ রকম সস্তা খাতির করো কেন বাপকে ? আলোকের মুখে হাসি ফোটে।

সে চুপ করে থাকে।

জগদীশ ধীরে ধীরে বলে, আমার চেয়ে তুমি মহাপুরুষ। তোমার পেটে অনেক বেশি বিদ্যা। নিজের স্ত্রীর দেহের খুঁত ধরতে পারো না ? চিকিৎসা করাতে পারো না ? ললিতা আমার মেয়ের মতো—তবু সত্যিকারের মেয়ে নয়, তাই আজ বেঁচে গেলে। তুমি সত্যিকারের জামাই হলে আজ এই মদের বোতল দিয়ে তোমার মাথা ফাটিয়ে দিতাম।

সিগারে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে আলোক বলে, কেন ডেকে পাঠিয়েছেন মোটামুটি অনুমান করেছিলাম। বিরক্ত হয়েছি সেই জন্যই। জানেন না বোঝেন না, সব ব্যাপারে আপনার মাথা গলানো কেন ? আবার সিগারে টান দিয়ে বলে, আপনার মেয়ের দেহে খুঁত ? অনেক স্পেশালিস্ট ডাক্তার দেখিয়েও ধরা যায়নি কোথায় কী খুঁত। তার মানেই খুঁতটা ওর মনে। মানসিক চিকিৎসা করাব বলেই তিন মাসের ছুটি নিয়ে এসেছি। সেদিন রাত্রে একা ললিতা আপনার কাছে এসেছিল, আমি কি জানি না ভেবেছেন ? বাড়ির কারও নজর এড়িয়ে চুপিচুপি স্বয়ং ভগবানকে দেখতে যাবার সাধ্য আছে কোনো মেয়েবউয়ের ? ওর দেহে কোনো খুঁত নেই। ওর অসুখটা মানসিক।

সুদর্শনাও এই কথা বলেছিল—জগদীশ বিশ্বাস করতে পারেনি। ললিতার মধ্যে এ রকম একটা মানসিক রোগ বাসা বেঁধে আছে, নিজের সুস্থ সবল নিখুঁত দেহটার একটা কাল্পনিক খুঁত আছে বিশ্বাস করে স্বামীর ভয়ে দিশেহারা হবার মতো মানসিক রোগ—এখনও সেটা বিশ্বাস হতে চায় না।

সে ধীরে ধীরে বলে, সাধারণ অবস্থায় রোগটার কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না ?

না। আমি আসব জানলে শুরু হয়, ক্রমে ক্রমে বাড়ি আসবার পর দু-চারদিন থাকে—তারপর মিলিয়ে যায়। বাপের বাড়ি যদি পালিয়ে যায়—আমি আসবার দু-তিনদিনের মধ্যেই যায়। ওই পিরিয়ডটা কেটে গেলে সব ঠিক হয়ে যায়।

তোমার কাছে রাখো না কেন ?

আমার সুবিধে হয় না, তাই।

জগদীশ গম্ভীর হয়ে খানিক ভাবে। ধীবে ধীরে বলে, মানসিক রোগটা যখন খুব চড়া সেই অবস্থায় তাহলে ললিতা সেদিন রাত্রে এসেছিল ? তবু আমি ধরতে পারিনি ?

আলোক সহজভাবেই বলে, মানসিক রোগ বলে ধরবার চেষ্টা করেননি, তাই পাবেননি। চেষ্টা করলে আপনিও পারতেন। আলোক আরেকটা সিগার বার করে ধীরে-সুস্থে ধরায়। সিগারটা ভালো করে ধরিয়ে জোরে টেনে একরাশি ধোঁয়া ছাড়ে।

খানিক আগে খোঁচা দিচ্ছিলেন, বাবার টাকা আছে, বাবার খাতিরে তাই বাধ্য হয়ে আমাকে আসতে হয়েছে। খাতিরটা বাবার—সে তো আপনিও জানেন, আমিও জানি। তবে কিনা আপনার জানাটা একটু কাঁ[illegible] [illegible]কম হয়ে গেছে। আপনি ভেবেছেন, বাপের অনেক টাকা আছে, বাপ মরলে ভাগ পাব, তাই বাপের হুকুমে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করতে এসেছি ! আপনার কি জানা আছে, ভাইবোনদের অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছি বাবার টাকা-পয়সা বিষয়-সম্পত্তির অংশ আমি দাবি করব না ?

প্রতাপ জানে ?

জানেন বইকী। জেনেই তো চটে আছেন আমার ওপর। যা ইনকাম হয় তা দিয়ে কী করব ভেবে পাই না, ভাইদের সঙ্গে খ্যাঁচাখেঁচি করে কী হবে ? আমি তাই জানিয়ে দিলাম, আমি ভাগ চাই না, বাবার যা কিছু আছে ভাইরা ভাগ করে নেবে। তারপরই বাবার কী রাগ ! তর্জন-গর্জন করে আমায় শাসাতে লাগলেন, ত্যাজ্যপুত্র করবেন। কী করি, বুড়ো বাপকে তো আর—

জগদীশ হাত বাড়িয়ে দিতেই আলোকও হাত বাড়ায়—ঘনিষ্ঠ রকম করমর্দন হয় দুজনের মধ্যে।

তারপর কয়েক দিন জগদীশ ভয়ানক গম্ভীর হয়ে থাকে—কারও সঙ্গে দেখা করে না। বলে, রত্নাকর, আমি ক-দিন ভাবব। নেশার জন্য কি সেদিন রাত্রে ললিতাকে দেখেও ব্যাপার বুঝতে পারিনি ?

একাদশ অধ্যায়

এত হিংসা কেন জলধির ?

এতকাল পরে কেন এমনভাবে উথলে উথলে উঠল জগদীশের উপর তার অন্ধ ক্রোধ আর বিদ্বেষ ?

চিত্রার জন্য জগদীশের সঙ্গে তার প্রতিযোগিতা ছিল অত্যন্ত মার্জিত। চিত্রা তার মনের কথা জানাবার পর সে বিবাগীও হয়নি, রাগে দিশেও হারায়নি।

শুধু একটু সংযত করে নিয়েছিল চিত্রার সঙ্গে তার বন্ধুত্বের সম্পর্ক, একটু দূরত্ব এনেছিল জগদীশের সঙ্গে পরিচয় মেনে নেওযার ভদ্রতা রক্ষায়।

জগদীশের জন্যই শোচনীয় দুর্ঘটনায় চিত্রার মরণ ঘটেছে জেনেও হিংসায় উন্মাদ হয়ে আঘাত হানতে চায়নি।

জগদীশের ভয়াবহ আত্মনিগ্রহের খবর জেনে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেবার সাধটা কি তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল তার কাছে ? শুধু কৌতূহলের বশে জগদীশকে দেখতে এসে তার কল্পনাতীত রূপান্তর আর মানুষের কাছে সম্মান দেখে, তার হৃদয়-মন শান্ত হয়েছে দেখে, ছোটোলোক ভদ্রলোক মানুষের একটা বিরাট অংশ তাকে আপন করে নিয়েছে দেখে—এতকাল পরে আবাব কি দাউদাউ করে জ্বলে উঠল হিংসার আগুন ?

চিত্রাকে যে এক রকম হত্যা করেছে সে প্রাণান্তকর প্রায়শ্চিত্ত চালিয়ে যাক—তাকে চিত্রার হত্যাকারী ধরেও সমস্ত ব্যাপারটার জন্য আপশোশ করার উদারতা জলধির আছে।

কিন্তু ওভাবে প্রায়শ্চিত্ত চালিয়ে যাবার জন্যই মানুষের কাছে সে প্রায় মহাপুরুষ হয়ে উঠবে, জীবনের সঙ্গে নিবিড়তর যোগাযোগ ফিরে পেয়ে শান্তি পাবে—এটা সহ্য করা কি সম্ভব নয় জলধির পক্ষে ?

তিন মাস পরে তাই সে আবার তোড়জোড় বেঁধে ফিরে আসে আঘাত দিয়ে জগদীশকে চুরমার করে ফেলতে ?

উচ্চপদের সম্মান, ক্ষমতা, দায়িত্ব, শান্ত স্বামীভক্তিপরায়ণা শিক্ষিতা রূপসি স্ত্রী—সব যেন তুচ্ছ হয়ে গেছে তার কাছে !

জগদীশকে আঘাত করা চাই ! চিত্রার মরণকে অতিক্রম করে জীবনের সঙ্গে ভাব জমিয়েছে বলে ওকে জব্দ করা চাই, ধ্বংস করে দেওয়া চাই।

নতুবা জীবন বৃথা।

আদিবাসীদের এলোমেলো বিক্ষোভের আগুন চাপা পড়ে ধিকিধিকি জ্বলছিল। এখানে-ওখানে সীমাবদ্ধ অঞ্চলে হঠাৎ দাউদাউ করে জ্বলে উঠে ঝিমিয়ে যাচ্ছিল। এমন কিছু ব্যাপার নয় যে একটু বিব্রত হবার বদলে কর্তাদের সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতে হবে।

জলধিই নাকি ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে অদূর ভবিষ্যতের সাংঘাতিক পরিস্থিতির কার্য-কারণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে উঁচুতলায় কর্তাদেরও ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছে।

সে যখন এত জানে বোঝে, সে যখন ধরতে পেরেছে জগদীশের আশ্রম থেকে কীভাবে আদিম রহস্যময় কৌশলে চারিদিকে বুনো জংলি মানুষগুলিকে খেপিয়ে তোলার আঁটঘাট-বাঁধা গোপনে

অভিযান চলছে—তাকেই ভার দেওয়া যাক বিক্ষোভ ও অসন্তোষের নিবুনিবু আগুনটা একেবারে ছাই করে ঠান্ডা করে দিয়ে ফুৎকারে শূন্যে উড়িয়ে দেবার।

ক্রোধ আর বিমর্ষতা মেশানো মুখখানায় পাউডার পর্যন্ত ছোঁয়াতে ভুলে গিয়ে সুদর্শনা আসে।

জগদীশকে বলে, আপনি কিন্তু সাবধান থাকবেন।

রত্নাকরকে বলে, তুমি কিন্তু আরও বেশি সাবধান। তুমিই নাকি ওনার দক্ষিণ হস্ত। ওঁকে জেলে দিয়ে যদি কাজ চলে—তোমাকে ফাঁসি দিতে হবে।

জগদীশ হাসিমুখে বলে, দিক না ফাঁসি—আমাদের দুজনকেই দিক। মরবার জন্য কতকাল আমরা ছটফট করছি—বেচারা আমাদের দুজনের এত ঝঞ্ঝাট !

সে হালকা সুরে ব্যাপারটার গুরুত্ব উড়িয়ে দিয়ে সুদর্শনাকে ধাতস্থ করতে চায়, বোঝাতে চায় যে একজন পদস্থ ক্ষমতাবান লোকের প্রতিহিংসার পাগলামিতে ভয় করে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া লক্ষ কোটি গুণ ভালো।

রত্নাকর কিন্তু হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট মানুষের মতো সিধে হয়ে যায়, প্রায় আর্তস্বরে আপশোশের আওয়াজে বলে, ইস ! এই সোজা কথাটা খেয়াল হয়নি আমার ! জ্বলে-পুড়ে মরে যাচ্ছি নিজের যন্ত্রণায়, পাগলের মতো ছটফট কবে ঘুরে বেড়াচ্ছি চারদিকে, যারা বড়ো স্কেলে মানুষ খুন করে তাদের একটাকে মেরে ফাঁসিতে লটকাবার সহজ রাস্তাটা খেয়াল হল না।

অস্ফুট একটা আওয়াজ করে সুদর্শনা। মুখ তার ছাইবর্ণ হয়ে গেছে।

জগদীশ রত্নাকরকে বকুনি দিয়ে বলে, এমনিতেই সোনা ভয়ে-ভাবনায় ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসেছে, ঢং করে কেন ওকে ভড়কে দিচ্ছিস রতন ? যা খেয়াল হবার ছিল না তা খেয়াল হয়নি—সোনার কথা শুনে খেয়াল করে এ রকম করতে হয় ? বড়োদরের একটা খুনেকে খুন করে ফাঁসির সুখ পাওয়ার কথা ভাবছিস মনে করে ওর দম আটকে আসছে দেখতে পাচ্ছিস না ? ঘুরে ঘুরে এত দেখে এত শিখে তোর এটুকু কাণ্ডজ্ঞান জন্মাল না রতন !

জগদীশের বকুনি খেয়ে রত্নাকর সুদর্শনাকে ধমকের সুরে বলে, আমি কি আজকের কথা বলছি ? সে রকম মনের অবস্থা এখন আছে নাকি ? আমি বলছিলাম আগেকার কথা, যখন মরার জন্য পাগল হয়ে উঠছিলাম। তুমি বড়ো ঝগড়াটে, বড়ো অস্থির। একজন একটা কথা বললেই লাফিয়ে ওঠো। এক মিনিট ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারো না, মানুষটার বলা শেষ হয়েছে কি না, আরও কিছু বলবে কি না—

চুপ করো তুমি।

তীক্ষ্ণ মেয়েলি কণ্ঠে ফেটে পড়া পুরুষালি গর্জন।

জগদীশ একটা বই টেনে নিয়ে পাতা ওলটায়।

সুদর্শনার ধমক মেনে নিয়েও রত্নাকর নির্বিকারভাবেই চুপচাপ বসে থাকে। সুদর্শনা অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে জগদীশের দিকে।

তাদের ব্যাপারে হয়তো কিছু বলতেও পারে জগদীশ !

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটার পর জগদীশ বলে, আজকাল আর কবিতা লেখো না রত্নাকর ? ঝোঁক কেটে গেছে ?

কোথাও কিছু নেই হঠাৎ রত্নাকরের কবিতার প্রসঙ্গ টেনে আনা !

রত্নাকর বলে, ঝোঁকটা কেটে গিয়েছিল। আজকাল আবার যেন মাঝে মাঝে তাগিদ বোধ করি।

বলে সে সুদর্শনার দিকে তাকায়। এতকাল তাদের পরিচয় হয়েছে, এতকাল তারা জগদীশের সামনে বসেও কত কথা বলেছে, তর্ক করেছে, ঝগড়া করেছে—সুদর্শনাকে জগদীশ কখনও লজ্জা

পেতে দ্যাখেনি। আজ তার মুখ লাল হয়ে যেতে দেখে জগদীশ একটু হাসে। বলে, তোমাদের একটা কথা বলব, আমার বিনয় ভেবো না। আমিও সংসার ছেড়েছিলাম, রতনও ছেড়েছিল। ওটা স্টার্টিং পয়েন্ট ধরে হিসাব করলে দেখা যাবে রতন অনেক নতুন চিন্তা আর অভিজ্ঞতার খোরাক পেয়েছে, আমি পেয়েছি সামান্যই।

রত্নাকর বলে, কী যে বলো তুমি দাদা ! তোমার সঙ্গে আমার তুলনা !

সুদর্শনা বলে, আপনি সত্যি বিনয় করে এটা বললেন—কিংবা তামাশা করলেন !

জগদীশ বলে, না না, কথাটা সত্যি। এটা বুঝবার পরেই অনেক ব্যাপার আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। বনে গিয়ে হাজার বছর চিন্তা করেও কেউ জ্ঞান বাড়াতে পারে না। আমিও পারিনি।

দুজনে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

সংসার ছাড়ার সময় হয়তো রতনের চেয়ে আমার জ্ঞানবুদ্ধি অভিজ্ঞতা বেশি ছিল, এখনও হয়তো রতন চিন্তার ওজনের হিসাবে আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না—আমি সে কথা বলছি না। আমি বলছি নতুন চিন্তার কথা, জ্ঞান বাড়ার কথা। এখানে পালিয়ে আসার পর আমি কতটুকু নতুন চিন্তা পেয়েছি, কতটুকু জ্ঞান বেড়েছে ? এতকাল একা একা দিনরাত ভেবে ভেবে আমি কী করেছি ? আগে সঞ্চয় করা এলোমেলো চিন্তাগুলি শুধু ঝেড়ে-ফুঁকে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়েছি, মিলিয়ে নিয়েছি, যোগ-বিয়োগ করে কী দাঁড়ায় বার করেছি। তাছাড়া উপায় ছিল না। মানুষকে ছেড়ে জঙ্গলে এসে একলা হওয়া মানেই মনের ভাঁড়ারে ঢুকে ভেতর থেকে খিল এঁটে দেওয়া—ভাঁড়ারে যা ছিল তাই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা। আনকোরা নতুন চিন্তা আসবে কোথা থেকে, জ্ঞান বাড়বে কী করে ? ভবঘুরে হয়েও রতন থেকেছে মানুষের মধ্যে, নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা কুড়িয়েছে, নতুন চিন্তা মনের ভাঁড়ারে তুলেছে।

সুদর্শনা প্রায় কাতরভাবে বলে, তবে কি বলছেন আপনার সাধনা নিস্ফল হয়েছে, নতুন কিছুই পাননি ?

জগদীশ বলে, নতুন কিছু না পেলেও জঙ্গলে আসা নিস্ফল হয়েছে বলব না। এ রকম একলা হয়ে দিন না কাটালে এলোমেলো খেই হারানো চিন্তার যে স্তূপটা জমেছিল সেটা ঘাঁটা হত না, যাচাই করে করে জঞ্জাল সাফ করা হত না, মিলিয়ে জোড়া দিয়ে আসল ভাবনাগুলি স্পষ্ট করা যেত না। এদিক দিয়ে বনে আসা নিস্ফল হয়নি তবে আত্মচিন্তার সুযোগ মিলেছে।

জগদীশ একটু হাসে।

আগে বুঝতাম না তোমরা কেন আমার কথা শুনে খুশি হও—রতন আমায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছে। আত্মচিন্তাও সাধনা বইকী, চিন্তার জট ছাড়ানো কী সহজ ব্যাপার ! নতুন চিন্তা না জুটুক, চিন্তার জট ছাড়িয়েছি। এই সাধনাকে তোমরা সম্মান করো। তোমরা এলোমেলো চিন্তায় হাবুডুবু খাও, আমি চট করে আসল কথাটা ধরিয়ে দিতে পারি।

রত্নাকর সোৎসাহে বলে, দাদা, বলিনি তোমায়, সংসার কাউকে ছাড়ে না, নিজের দরকারে ছুটি দেয় ! হাড়েহাড়ে এটা আমি টের পেয়েছি। সংসার বলে, তুমি পাগলাটে, মানিয়ে চলতে পারছে না—যাও খুশিমতো মন্দির থেকে আঁস্তাকুড় ঘাঁটবে যাও, খুশিমতো চিন্তা করবে যাও, তোমার ছুটি মঞ্জুর। আমরাও জানতে বুঝতে চাই—কিন্তু আমাদের সময় কই, সুযোগ কই ? যখন কিছু জানতে বুঝতে পারবে, আমাদের জানিয়ে বুঝিয়ে দিয়ো !

জগদীশ হাসিমুখে সায় দিয়ে বলে, এবার বুঝলি তো আমার চেয়ে নতুন চিন্তা তুই বাড়িয়েছিস ঢের বেশি ?

এলোমেলো নতুন চিন্তা নতুন অভিজ্ঞতার পাহাড় দিয়ে কী হয় ?

শুধু জমানো চিন্তার জট ছাড়িয়ে নিলেই বা কী হয় ?

সুদর্শনা ঠিক ধরতে পারছে না বুঝে জগদীশ বলে, চিন্তার জট খুললাম—তারপর ? থেমে তো গেলাম সেইখানে। আমিও থেমে গিয়ে পাগল হতে বসেছিলাম—তোমরা এসে পাকড়াও না করলে নির্জনে আপন মনে আত্মচিন্তার শেষ কী দাঁড়াত কে জানে ? তোমরা এলে, নতুন চিন্তা এল, তবেই না আরেকটু বেশি বুঝবার প্রক্রিয়া আবার চালু হল ! জানাটা আলো জ্বালিয়ে রাখার মতো—জ্বেলে যেতে হবে, আলো নেভালেই অন্ধকার।

জগদীশ জোর দিয়ে বলে, না, আত্মচিন্তার জন্য বনে এসে লাভ নেই—ওটা ভালোভাবে হয় না। মানুষের মধ্যে থেকে এটা চালিয়ে গেলে আরও কত জানতে পারতাম।

জগদীশ হাসে।—আমি অবশ্য আত্মচিন্তা করতে আসিনি, এসেছিলাম সুস্থ হতে। সুস্থই বা কই হলাম ? তোমরা এসে বরং খানিকটা সুস্থ করেছ।

বিদায় নিতে উঠে দাঁড়িয়ে সুদর্শনার খেয়াল হয়, যে বিষয়ে সাবধান করে দেওয়ার জন্য সে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে সেই বিষয়টাই চাপা পড়ে গেছে।

এমনভাবে মানুষকে ভুলিয়ে দিতে পারে জগদীশ। জলধির ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জগদীশ প্রায় কিছুই বলেনি।

প্রশ্ন করতেই মুখ একটু বিষণ্ণ হয়ে যায়। ভয়-ভাবনা হয়নি জগদীশের, মনটা খারাপ হয়ে গেছে।

ও কথাই ভাবছি মেয়ে। সবজান্তা ভাব আমাকে—এর এই বিকারের মানে বুঝতে পারছি না। ওর রাগের কারণ হিংসার কারণ বুঝতে পারছি—কিন্তু এমনভাবে মাথায় চড়ে যাবে কেন ? স্বার্থবুদ্ধি বিচারবুদ্ধি তো কম নয় মানুষটার, কাণ্ডজ্ঞানের অভাব নেই। আমাকে ঘায়েল করার সাধ জাগলেও নিজের বিপদের কথা ভাবছে না ? চারিদিকে হইচই পড়ে যাবে কত লোক খেপে যাবে—ওর চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাবেই। কোন বিকার কোথায় চড়লে এভাবে সমস্ত বিচার তুচ্ছ হয়ে যায় ধরতে পারছি না।

রত্নাকর বলে, আগের জেলাসিটাই হয়তো—

জগদীশ মাথা নাড়ে।—জেলাসি তোমার কাছে একটা ভয়ংকর ব্যাপার। তুমি জেনে রেখেছ জেলাসি মানুষকে দিয়ে সব করাতে পারে—হঠাৎ ঠেকে গিয়ে জগদীশ বলে, পরে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব, কেমন ?

রত্নাকর সুদর্শনার দিকে চেয়ে বলে, এখুনি বলো না দাদা—পরে কেন ? তোমার সোনাকে আমার কীর্তির কথা জানাতে কি বাকি রেখেছি ? তবে আর কী শিখলাম তোমার কাছে !

অন্যকে বলি না বলি এসে যায় না—ওর কাছে গোপন করতে পারি সে সব কথা !

জগদীশ খুশি হয়ে বলে, আবার দেখলি তো, আমি সবজান্তা নই, ভুল করেছিলাম ? সোনাকে সব যদি বলেই থাকিস, তবে তো তোদের চরম বোঝাপড়া হয়ে গেছে ! যতই ঝগড়া করিস, তোদের মনের মিল কে ঠেকায় ? আর আমি তোকে বকব না রতন !

রত্নাকর হেসে বলে, না না, মাঝে মাঝে বোকো—নইলে জমবে না। কিন্তু চাপা জেলাসি হঠাৎ জ্বলে উঠে আমার মতো জলধির মাথা খারাপ করে দিয়েছে, এটা ঠিক নয় ?

না, শুধু জেলাসি অতটা চড়ে না, এ রকম বিকার এনে দেয় না। জেলাসি হিংসা নয়, ওতে লড়াই করার জিদ থাকে। আরেকজনকে হার মানিয়ে হটিয়ে দিয়ে জয়ী হবার ঝোঁক থাকে। জেলাসি খারাপ নয়, অনিয়ম নয়। জেলাসি ছাড়া প্রেম জমে না। প্রেম না জমলে জীবনের ধারা চালু রাখার ঝঞ্ঝাট পোয়াতে ক-জন রাজি হবে ? অন্য বিকার থাকল সেটাই জেলাসির ঝাঁঝে চড়ে গিয়ে মানুষকে উন্মাদ করে দেয়।

রত্নাকর আরও উৎসাহিত হয়ে বলে, কথাটা তো ঠিক বলেছ মনে হচ্ছে ! আরেকটা নতুন পাঠ তো শিখালে ! হুঁ, ঠিক কথা, আরও কত জ্বালায় যে তখন জ্বলছিলাম, কতভাবে পাগল হয়ে

উঠেছিলাম খেয়াল করিনি তো ! আরও অনেক কিছু ছিল, ক-দিন আগে মা মরে গিয়েছিল—বিনা চিকিৎসায়, বিনাযত্নে।

হঠাৎ যেন অন্য মানুষ হয়ে যায় জগদীশ। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। মুখের ভাব অন্য রকম হয়ে যায়। এতক্ষণ বসে বসে কথা বলছিল, এবার উঠে এসে তাদের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়।

এবারে বুঝেছি। তুই আমাকে আবার সূত্র ধরিয়ে দিলি রতন ! জলধি একা এসেছে, না !

সুদর্শনা বলে। একাই এসেছেন বলা যায়, শুধু মেয়েটাকে সঙ্গে এনেছেন। ওর একটি ছেলে, একটি মেয়ে, ছেলেটিকে নিয়ে ওর স্ত্রী ভিন্ন থাকে—

বুঝেছি—রতন ধরিয়ে দিতেই অনুমান করেছি। খুব সুন্দরী, একটু সেকেলে বউ না ?

সুদর্শনা চমৎকৃতা হয়ে বলে, কী করে জানলেন আপনি ?

এটা জানা কঠিন কী। আমাকে উপলক্ষ করে চিত্রার শোকটা বিকার হয়ে মাথায় চড়ে যাবার কারণ থাকবে তো। ওর বেলা কারণটা থাকবে ওর সাংসারিক জীবনেই।

কয়েক মুহূর্ত জগদীশ গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়ে নিথর নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

তারপর আবার একটা নিশ্বাস ফেলে, ঠিক যেন মেয়ে-জামাইকে বিদায় দিচ্ছে এমনি স্নেহের সুরে বলে, আচ্ছা, এবাব তোমরা এসো, রাত হয়ে গেছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

দিন দিন অশান্তি বাড়ে। অস্বস্তি তীব্র হয়।

এত ভয় ভক্তি বিশ্বাস ভালোবাসার প্রতিদানে কী সে দিচ্ছে মানুষকে প্রতিদান ?

কতগুলি ছাঁকা কথা। আর ফাঁকা উপদেশ।

যদি সত্যও হয় রত্নাকরের কথা, একটি মেয়ের পার্থিব প্রেমকে উপলক্ষ করে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক চিন্তা ও অভিজ্ঞতা মন্থন করতে করতে সে যদি সন্ধান পেয়ে গিয়েও থাকে অমৃতের, জর্জরিত উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের কাজে লাগায় যদি মূল্যবান হয়ে উঠে থাকে তার মুখের কথা—সেটাও তো শেষ কথা নয়। সে তো মনে মনে জানে ভক্তদের প্রশ্রয় দেবার আরেকটা কারণ—তারই অতি বাস্তব প্রয়োজনের কারণ।

ওরা শুধু ভক্তি করে না, পয়সাও দেয়। নেশা করতে মোটা রকম পয়সা লাগে।

সে অবশ্য ফেলে ছড়িয়ে রেখে এসেছে অনেক টাকা, কিন্তু সে তো নগদ টাকা নয়। কিছু অংশ উদ্ধার করতেই অনেক হাঙ্গামা পোয়ানো দরকার।

নেশার খরচের চেয়ে ঢের বেশি টাকা আসছে প্রণামিতে।

সে চায় না।

কিন্তু সকলে দেয়। এবং সে জানে যে ওরা পয়সা দেবে। ওরা প্রণামি দেবে জানে বলেই এমন নির্ভয়-নিশ্চিন্ত মনে সে মহাসমারোহে নেশার পাল্লা চালিয়ে যেতে পারছে।

আবার এটাও তো সত্য নয় যে শুধু প্রণামির প্রয়োজনেই সে ভক্তদের বরদাস্ত করে এসেছে প্রথম থেকে।

ওরাও তো তাকে কম খাটিয়ে নেয় না।

কম ভাবায় না। কম বকায় না।

সব মিলিয়ে ব্যাপারটা তবে কী ?

এ প্রশ্ন আর শুধু প্রশ্ন থাকে না। কূলকিনারা পেতে শুধু ভেবেই কুলোনো যায় না। একটা যন্ত্রণায় দাঁড়িয়ে যায়। দিন দিন বেড়ে চলে সেই যন্ত্রণাবোধ।

অস্থিরতা, বদমেজাজ, অন্যমনস্কতা, কথা বলার মধ্যে আগের চেয়ে অনেক বেশি তীব্র তীক্ষ্ণ ও গভীর ব্যাকুলতা, কথা বলতে বলতে হঠাৎ নির্বাক নিশ্চল সমাহিত হয়ে যাওয়া—এ রকম অনেক ধরনের লক্ষণের মধ্যে ভক্তদের কাছে প্রকাশ পায় যে কোনো একটা বিষম রকম প্রক্রিয়া চলছে জগদীশের মধ্যে।

কেন ঘটছে আর কী ঘটছে তারা বোঝে না।

অনেক দিন প্রাণপণে সংযম রক্ষা করে সুদর্শনা সকলের সামনে ধমক খাবে জেনেও জিজ্ঞাসা না করে পারে না : আপনার শরীরটা কি ভালো যাচ্ছে না ?

কী চিন্তায় বিভোর হয়েছিল জগদীশ সেই জানে, রেগে উঠে ধমক দেওয়ার বদলে মেঘ কেটে গিয়ে একঝলক রোদ ছড়িয়ে পড়ার মতো হঠাৎ তার মুখে হাসি ফোটায় সকলে পরম স্বস্তিবোধ করে।

ললিতাও সাহস করে বলে বসে, আমরা বড়ো ভাবনায় পড়ে গেছি। সাধনার কোনো নতুন স্তরে উঠবার সময় কি— ?

সমস্ত মুখ দিয়ে প্রশান্ত হাসি হাসে জগদীশ। কপালের চামড়ার দুটি কুঞ্চিত রেখায় পর্যন্ত যেন হাসি ঝলক মারে।

পরম স্বস্তি আর পরম আনন্দে উদ্‌বেল হয়ে ওঠে সকলের মন।

উৎসুক হয়ে ওঠে।

এতগুলি মন আর সবকিছু ভুলে গিয়ে মনোযোগ দেয় জগদীশে।

না জানি জগদীশ কী অপূর্ব আশ্চর্য কথা বলবে, শুনতে শুনতে উত্তেজিত জর্জরিত দেহমন রোমাঞ্চিত হতে হতে কাটিয়ে উঠবে দুঃখ-বেদনা, হীনতা-দীনতা-বোধের অভ্যস্ত বাঁধন, সুমহান অনুভূতির আনন্দসাগরে সাঁতার কাটার সুযোগ মিলবে।

যতক্ষণের জন্যই হোক !

জগদীশ মুখ খোলে।

শহরের ঘরে ঘরে বিদ্যুতে আলো জ্বালায়, শহরে আলো জ্বালা কত সহজ। সুইচটা টিপতেই ঘর আলো হয়ে যায়। শহরে একদিন সন্ধ্যা নেমেছে। নামকরা একজন বড়ো অধ্যাপক দশটা ক্লাসে হিট, লাইট, ইলেকট্রিসিটি ব্যাখ্যা করে করে বাড়ি ফিরে নিজের বই গাদা-করা ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে রইলেন গালে হাত দিয়ে। ঘর অন্ধকার। এখন কী করা যায় ?

সুদর্শনা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, আমি বুঝেছি আপনি কী বলবেন !

জগদীশ হাসিমুখেই মাথা নাড়ে, তুমি ভূমিকাটুকু বুঝেছ—আসল কথা বোঝোনি। আসল কথাটা তুমিই আমায় বুঝিয়েছ। না জেনে না বুঝে মায়ের স্নেহে মেয়ের ভক্তিতে ব্যাকুল হয়ে একটা প্রশ্ন করে বুঝিয়ে দিয়েছ।

খুব বড়ো একজন ডাক্তারের আজ এই আসরে প্রথম পদার্পণ ঘটেছিল।

প্রতাপই টেনে এনেছিল তাকে।

মাঝে মাঝে মৃত্যুভয় দেখিয়ে কয়েক দিন ওষুধপত্র খাইয়ে নিয়মে চালিয়ে প্রতাপকে মরণ ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে বেঁচে থাকতে সে সাহায্য করে।

ডাক্তার সেন হেসে বলে, মায়েরা আর মেয়েরাই বুঝি সাধককে প্রেরণা দেন ? বাপেরা আর ছেলেরা কোনো কাজে লাগে না ?

গম্ভীর হয়ে যায় জগদীশের মুখ। বলে, অন্য কাজে লাগে—সাধনার কাজে লাগে না।

কেন ?

বাপ আর ছেলে শুধু যাচাই করে—আদায় করে। তাদের শুধু ছাঁকা বিচার, ছাঁকা বিবেচনা—দায়দায়িত্ব কর্তব্য-কর্তালি ভাগাভাগির সম্পর্ক। ছেলে বিয়োবার সাধ্য নেই, পুরুষের, তাই বাধ্য হয়ে মেয়েদের শুধু মা হবার দায়টা দিয়েছে। একবার মা হবার বছরখানেকের সাধনা কী ব্যাপার তুমি ডাক্তার হয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনেও অনেক কিছু জানো না ডাক্তার ! নারীপুরুষে মিলন হল, ডিম্বকোষে প্রাণের পত্তন হল—

ছেলেমানুষি দুষ্টামিভরা হাসি মুখে ফুটিয়ে রেখে খানিকক্ষণ সকলের মুখে চোখ বুলিয়ে নিতে নিতে সে সশব্দে হেসে ওঠে।

আরে না না, ভয় নেই। অশ্লীল কথা বলব না। অত বোকা আমি নই। আমি কি একটা মেডিকেল কলেজের মড়াকাটা ঘর বানিয়েছি যে কথার ছুরিতে মেয়ে-পুরুষের দেহ কেটে কেটে তোমাদের দেহ চেনাব ? তোমরাও এক-একটা দেহের মালিক আমি ভুলে গেছি ভেব না। দেহের ঝঞ্ঝাট নিয়ে অনেকবার ডাক্তারের কাছে গিয়ে প্রণামি দিয়ে ধন্না দিয়েছ তাও আমি জানি। তোমাদের বলিনি বুঝি আমি ডাক্তার হতে বিলাত গিয়েছিলাম ?

মেয়েদের কে একজন বলে, ওমা ! তা তো জানতাম না ! পুরুষদের একজন বলে, ডাক্তারি শিখতে বিলেত গিয়েছিলেন ! জগদীশ গম্ভীর হওয়ামাত্র সকলে নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

ছোটোলোক চাষাভুষো একটা মুখ্যু মেয়ের মা হবার সাধনা কী ব্যাপার আমরা হিসাবে ধরি না বুঝি না বলে, ডাক্তাররা খেয়াল করে না বলে আমাদের এই অবস্থা। ডাক্তার জেনেছে মেয়েরা নিছক

মা হবার যন্ত্র—ভাঙা কুঁড়ে থেকে রাজার বাড়িতে প্রত্যেক মা কী সাধনা চালায় সে খবর কি ডাক্তার রাখে ? দু-চারবার ফরসেপ দিয়ে বাচ্চা টেনে বার করে দু-চারটা মা আর বাচ্চাকে বাঁচিয়ে ডাক্তার ভাবেন সৃষ্টিরহস্য বুঝে গিয়েছি। আমাদের এই তিপ্পাইয়ের মা সেদিন ভোরবেলা কতগুলি ফুল দিয়ে আমায় প্রণাম করল। দেখেই বুঝলাম একটা গোলমাল হয়েছে নিশ্চয়। প্রণাম করে মাথা তুলতে তুলতেই একটা অদ্ভুত আওয়াজ করল। ঘরে ফেরার চেষ্টা করতেই—আমি একধমকে থামিয়ে দিলাম, বিছানায় শুইয়ে দিলাম। অনেক মা-মেয়ে জুটে গেল পাঁচ মিনিটের মধ্যে। এক ঘণ্টার মধ্যে চেঁচাতে চেঁচাতে কালো কুচকুচে একটা বাচ্চা প্রসব করল তাপ্পির মা।

ডাক্তার সেন একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে, এর মরালটা কী ? আমরা কি জানি না স্বাভাবিক ডেলিভারিতে মায়েদের বিশেষ কষ্ট হয় না ? বড়ো অপারেশন করার সময় রোগীকে অজ্ঞান করতে হয় কেন তার মানে বুঝি না ? আমরা কি চোখ-কান বুজে যন্ত্রের মতো ডাক্তারি চালাই ? ফরসেপস দিয়ে দু-চারটে বাচ্চাকে টেনে বার করে এনে মা আর বাচ্চাটাকে বাঁচিয়ে দেওয়া কি আমাদের অপরাধ ?

অপরাধ ? দু-চারটে মা-কে আর বাচ্চাকে এভাবে বাঁচিয়ে দিতে পারো বলেই তো যারা আমায় সওয়া পাঁচআনা প্রণামি দিয়ে কাজ সারতে চায় তারা তোমার দক্ষিণা দেয় বত্রিশ টাকা। কিন্তু দু-চারটে মা আর দু-চারটে বাচ্চাকে বাঁচাবার জন্য কি তুমি বত্রিশ টাকা প্রণামির গুরুঠাকুর হয়েছ ? হাজার হাজার মা আর বাচ্চা মরুক বাঁচুক তোমার কিছু এসে যায় না ?

এ তো নীতিকথা টেনে আনলেন ! হাজার হাজার মা আর বাচ্চা বিনা চিকিৎসায় মরলে আমারও এসে যায় বইকী, কিন্তু—

জগদীশ প্রশান্তভাবে বলে, আমিও তাই বলছি। এসে যায় কিন্তু একজন ডাক্তার কী করবে ?—ও দায় রাষ্ট্রের, রাষ্ট্রই ব্যবস্থা করতে পারে। ঠিক কথা। আমি শুধু তোমার এসে যাওয়ার কথাই বলছি। এসে যায়—কিন্তু তোমার একার কিছু কর'র সাধ্য নেই। দরিদ্র মূর্খের দেশ বলে তো পেশাটা তুমি দাতব্য করতে পার না—দু-চারজন করলেও ক-টা মা আর বাচ্চার মরণ ঠেকাবে। কিন্তু এটাই কি সব কথা ? এসেই যদি যায়—শুধু ওইটুকুই বুঝে শেষ হয় ?

সকলে প্রতীক্ষা করে।

জগদীশ গলা চড়িয়ে বলে, না, ওইটুকুই বুঝে শেষ হয় না। সত্যই যদি এসে যায়, আরও অনেক কিছু না বুঝে চলে না। দারিদ্র্য আর অশিক্ষার দেশ কেন বুঝতে হয়—বুঝতে হয় কারা কীভাবে দেশকে এ অবস্থায় রেখেছে। দেশের লোকের বাঁচার রকম হালচাল না বুঝে আবার ও সব বোঝা যায় না। দেশের লোকের দেহমনের ধাত জানা থাকলে তোমরা কি বিজ্ঞান শিখে এমন অজ্ঞানের মতো প্রয়োগ করতে ডাক্তার ! তিপ্পাইয়ের মা-র বেলা গোলমাল হলে, ফি দিয়ে তোমায় ডেকে পাঠালে তুমি কি বিবেচনা করতে যে ফরসেপ দেখেই ওর মা হয়ে বাঁচার সাধ ফুরিয়ে যাবে, টেনে বার করা বাচ্চাটাকে নিজেই হয়তো প্রপাতে গিয়ে বিসর্জন দিয়ে আসবে ?

আসর থমথম করে।

জগদীশ হেসে বলে, পদ্ধতিটা বৈজ্ঞানিক হলেই কী হয় ? প্রয়োগটাও বৈজ্ঞানিক হওয়া চাই। তাই বলছিলাম, হাজার হাজার মা আর বাচ্চা মরে বলে মনে যদিইবা একটু বেদনাবোধ করো—সেটাকে এসে যাওয়া বলে না ডাক্তার। এসে গেলে কোনো অবস্থায় কী রকম ধরনের কোনো মানুষটার উপর প্রয়োগ করছ এটা খেয়াল করে বিদ্যা প্রয়োগ করতে—দেশটাকে আর দেশের মানুষকে জানতে বুঝতে বাধ্য হতে। তবু যে তোমাদের বিদ্যার প্রয়োগ এতটা সফল হয় কেন জানো ? অজ্ঞান মানুষ না জেনে না বুঝে তোমাদের ব্যবস্থা খানিক খানিক অদলবদল করে খাপ খাইয়ে নেয় বলে। এতে বিপদও ঘটে—ঠিকমতো নির্দেশ না মানার জন্য তোমরা রাগ কর, গাল দাও,

আপশোশ কর। কিন্তু খেয়াল কর না যে শুধু রোগটা না ধরে মানুষটাকেও যদি ধরতে, তাকে বুঝে সে বুঝতে পারে মানতে পারে এমনভাবে নির্দেশ দিতে, তাহলে গোলমাল হত না।

জগদীশ চুপ করলে ডাক্তার সেন ধীরে ধীরে বলে, এবার বুঝেছি আপনার কথাটা। ও সব খানিক খানিক বিচার করতে হয়—কিন্তু বিচারটা যে এতখানি গুরুতর ব্যাপার সেটা তলিয়ে বুঝিনি।

ভক্তেরা বিদায় হয়। থেকে যায় ললিতা ও সুদর্শনা। সুদর্শনা ক্ষোভের সঙ্গে বলে, আজেবাজে লোক এসে আপনাকে—

রত্নাকর বলে, আজেবাজে লোক মানে ? তোমার মনের মতো না হলেই বুঝি লোক আজেবাজে হয়ে যায় ?

জগদীশ বলে, তোমরা একটু বাইরে গিয়ে তর্ক করো দিকি—

মায়ের সঙ্গে আমি কথা সেরে নিই।

তারা বাইরে গেলে ললিতাকে বলে, তোমার খুঁত কি সেরে গেছে মা ?

না। আপনি সারিয়ে না দিলে সারবে না।

সে রাত্রে পাগলের মতো ছুটে এসেছিলে—আজ তো তোমায় বেশ তাজা দেখাচ্ছে ? তোমার ভয়-ভাবনা নেই, খুশির ভাব দেখছি। দু-তিনরাত একলা ঘরে খিল দিয়েছিলে, এখন তো তাও দাও না।

মুখখানা বিষণ্ণ করবার চেষ্টা করে ললিতা মৃদুস্বরে বলে, আপনি যে খানিকটা সারিয়ে দিয়েছেন ? একেবারে সারেনি কিন্তু কী করব ? একটু মানিয়ে তো চলতেই হবে, তাই সয়ে যাচ্ছি ?

জগদীশ স্থিরদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, ধীর গলায় প্রশ্ন করে, সেদিন রাত্রে যে তুমি এসেছিলে, আমায় মাতাল মনে হয়েছিল ?

ললিতা তাড়াতাড়ি বলে, মাতাল ! না না, তাই কখনও মনে করতে পারি ! আমিই তো ভয় পেয়ে গেলাম।

জগদীশ ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত রেখে স্নেহের সুরে বলে, তোমার অসুখ আমি একেবারে সারিয়ে দেব। তোমার জন্য আমি নিজের মস্ত একটা অসুখ ধরতে পেরেছি, তোমার অসুখ ভালো করে না দিয়ে পারি ?

ললিতা জিজ্ঞাসা করে, আপনার কী অসুখ বাবা ?

পরে শুনো—আগে মনটা স্থির করি কীভাবে নিজের চিকিৎসা করব।

হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে জগদীশ বলে, তোমাকে সারাতে আমি কিন্তু কোনো ক্রিয়া-ট্রিয়া করব না—সোজাসুজি তোমার চিকিৎসা করব না। আলোক তোমার যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করছে—ওই চিকিৎসায় তোমায় সারিয়ে দেবে। আমার যা করার করব, ডাক্তারকেও বলে দেব কী করতে হবে। তোমার অসুখের চিহ্নটুকু থাকবে না।

ললিতা খুশি হয়ে হাসিমুখে চেয়ে থাকে।

ভোররাত্রে একদল পুলিশ নিয়ে বড়ো অফিসার দত্ত আশ্রম ও গাঁয়ে হানা দেয়—সঙ্গে আসে জলধি।

গাঁ ঘিরে রেখে তন্নতন্ন করে খানাতল্লাসি চালানো হয়।

রত্নাকরকে গ্রেপ্তার করা হয় সঙ্গে সঙ্গে।

তার নামে ওয়ারেন্ট ছিল।

দত্ত জগদীশকে বলে, এর আসল নাম জীবন, খুনি আসামি, শুনলাম আপনি জেনে-শুনে ওকে আশ্রয় দিয়েছেন।—

জেনে নয়, শুনে।

যাই হোক, ওকে আশ্রয় না দিলে হয়তো হঠাৎ এভাবে সার্চ করতে আসতে ইতস্তত করতাম। তেমন কোনো পজিটিভ সূত্র আমরা পাইনি। আসল উদ্দেশ্য ওকে অ্যারেস্ট করা—সার্চ ফর্মাল ব্যাপার।

জলধির দিকে চেয়ে জগদীশ বলে, নিজে হানা দিয়ে নিজের হাতে আমায় গুলি করে মারার সাধ মেটাতে পারলে না জলধি—এত চেষ্টা করেও আশেপাশে বুনোদের খেপিয়ে অজুহাত তৈরি করতে পারলে না ? আমার হুকুমে ওরা উসকানিতে সাড়া দেয়নি—নইলে হয়তো খেপত।

দত্ত আশ্চর্য হয়ে তার কথা শোনে।

জগদীশ আবার বলে, তবে ঘা তুমি সত্যই দিলে জলধি,—আমার ছোটোভাইকে ফাঁসি দেবার ব্যবস্থা করলে !

জোড়াখুনের দায়ে গ্রেপ্তার হয়েও রত্নাকরের বিশেষ ভাবান্তর দেখা যায়নি, জগদীশের ক্ষোভ দেখে সে সশব্দে হেসে ওঠে। পাগল হলে দাদা—কীসের ফাঁসি ? ফাঁসি দেওয়া অমনি মুখের কথা ! কত তদন্ত কত কাণ্ডকারখানা হল, পুলিশ চার্জশিট দিতে পারেনি। এই ভদ্দরলোকের কারসাজিতে আবার জড়ালেই ফাঁসি হয়ে যাবে ? দ্যাখো না ক-দিন লাগে তোমার ভাইটির ফিরে আসতে !

জগদীশ বিদ্রূপ করে বলে, তাই বলো ! ও সব চুকে যাবার পরে তুই ভবঘুরে হয়েছিলি !

রত্নাকর হাসে, তবে কী ? ফাঁসি যাবার সুযোগ পেলে ছাড়তাম নাকি ? আমি নিজে পুলিশকে হেলপ করেছি—তবু প্রমাণ খাড়া করতে পারিনি। মরবে জেনে দুজনে যদি পরামর্শ করে এমনভাবে মরে যে কেউ বিশ্বাস করবে না তাদের খুন করা হয়েছে, খুনির মুখের কথা কেউ শোনে ? বেশি জিদ করতে পাগল বলে ডাক্তার দেখাবার ব্যবস্থা হয়।

দত্ত প্রশ্ন করে, নাম ভাঁড়িয়েছেন কেন ?

ভাঁড়াব না ? খুনে বলে চাদ্দিকে নাম ছড়িয়ে ছেড়ে দেবেন—ও নাম নিয়ে আমি যাই কোথা !

অনেকের কাছে বলেন কেন খুন করেছেন ?

খুন করেছি বলেই বলি। অনেকের কাছে নয়, দু-চারজনের কাছে।

জগদীশ জলধির দিকে চেয়ে বলে, বিকারটা সারিয়ে নাও না জলধি ? চিকিৎসা করলেই তোমার মনের ব্যারাম সেরে যাবে। নিজেও সুখী হবে, তোমার স্ত্রীর জীবনটাও নষ্ট হবে না।

জলধি বলে, কী বকছেন পাগলের মতো ? আমার মনের কোনো রোগ নেই।

জগদীশ নিশ্বাস ফেলে বলে, তা বটে। তোমার মতো রোগীরা যদি জানত নিজের রোগ আছে, তাহলে তো রোগটাই সেরে যেত !

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রতাপকে ডেকে জগদীশ বলে, একটা দায় নাও। একটা কাজের কাজ করো। আটচালাটা তুলে দিয়ে তুমিই আমায় এদিকে ঝুঁকিয়েছ। আটচালায় চলবে না। আমি এখানে মস্ত হাসপাতাল গড়ব—মনের রোগীর হাসপাতাল। পাগলের হাসপাতাল শহরেই আছে, এখানে করব মানসিক রোগের হাসপাতাল।

প্রতাপ বলে, হাসপাতাল !

হাসপাতাল কথাটা পছন্দ না হয়—নাম দিয়ো চিকিৎসাকেন্দ্র, আরোগ্য নিকেতন—কিংবা শুধু সংশোধন !

প্রতাপ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, ওটাই খাশা নাম হবে—সংশোধন ! জগদীশ বলে, তোমার বিষয়বুদ্ধি পাকা—তুমি পারবে। অ্যাদ্দিন যারা বেআইনি ভোগ-দখল করছে তাদের খাজনা সুদ ভাড়া এ সব মাপ করেও শুধু জমি তালুক বাড়ি বেচেই লাখের মতো ন্যায্য পাওনা হয়। হাজার পঞ্চাশ ষাটের মতো লগ্নি করা আছে। লাখ দেড়েকের মতো বিমা আছে—পাকা।

কদ্দিন প্রিমিয়াম বন্ধ ?

যদ্দিন তোমাদের এখানে আছি ! মা-র হাজার ত্রিশেক টাকার গয়না বন্ধক আছে, সুদটা নিয়ে একটু যদি মারামারি করতে পার প্রতাপ—

প্রতাপ সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করে, ব্যাংকের সুদ না মহাজনের সুদ ? মহাজনের সুদের হিসাবে দিয়ে থাকলে অ্যাদ্দিনে গয়নার দামের চার-পাঁচগুণ পাওনা হয়ে গেছে মহাজনদের।

জগদীশ হেসে বলে, ব্যাংকেই বাঁধা আছে। বললাম না লগ্নিতে অনেক হাজার ছড়ানো আছে ? বাবা ছিলেন জমিদার, আড়তদার মহাজন—বাবার ছেলে আমাকে তুমি এতই বোকা ভেবেছ যে মায়ের গয়না বাঁধা দিতে মহাজনের কাছে যাব ! হঠাৎ বিপদে পড়ে দিশেহারা হয়ে টাকায় মাসে দু-পয়সা সুদ দিতে রাজি হয়ে কত লোক সুদও দিতে পারে না, গয়নাও ছাড়াতে পারে না,—এ সব কি আমার অজানা প্রতাপ ? ছেলেবেলা থেকে বাবা আমাকে এ সব হিসাবনিকাশ বিচারবুদ্ধি শেখাননি ?

প্রতাপ গদগদ হয়ে বলে, সব দিকে সব হিসাব না জেনে বুঝেই কি তুমি দেবতা হয়েছ বাবা ! মহাজন মাসে টাকায় দু-পয়সা সুদ নেয় তাও তোমার জানা !

খানিকক্ষণ এলোমেলো কথা চলে। জগদীশ নিজেই এলোমেলো কথার পালা শুরু করে। প্রতাপকে একটু ভাবতে দিতে হবে বইকী, হিসাবনিকাশ কষে দায় ঘাড়ে নিয়ে লাভ কী হবে লোকসান কী হবে একটু সমঝে দেখার সুযোগ না দিলে চলবে কেন ?

ভক্তি করে বলেই তো বিপাকে ফেলা যায় না প্রতাপকে।

জগদীশ বুঝিয়ে বলে, দেড়-দুলাখ টাকার দায় চাপাচ্ছি—লাভের হিসাব ভুলে যাও প্রতাপ। লাভ তোমার হবে। আমার যত হাজার টাকা উদ্ধার করবে, হাজারে তোমার একশো বখরা।

মুখের গোমড়া ভাব কাটে না প্রতাপের।

হাজারে একশো ?

ললিতা উঠে এসে প্রতাপের কানে কানে কী বলে সেটা বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয় না জগদীশের।

হাজারে একশো কি কম হল ? টেন পার্সেন্ট ! ভালো কাজের জন্য টাকা তোলাচ্ছি, ভোগের জন্য নয়। রাজি হয়ে যাও, আপত্তি কোরো না।

প্রতাপ মরিয়া হয়ে বলে, যাক হাজারে একশো পঁচিশ করে দাও, দ্যাখো, দায়টা আমি কেমন পালন করি !

বেশ তো, তাই নিয়ো। দায় যে কঠিন আমি জানি। দেড় লাখ যদি আদায় করতে পারো, হাজারে একশো পঁচিশ তো পাবেই, মোট হিসাবে দশ হাজাব বেশি পাবে।

গভীর রাত্রে ঘুম আসতে শুরু করার সময় রত্নাকর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, দায়টা আমায় দিলেই হত ?

তুই পারবি না। তোর বিষয়বুদ্ধি নেই।

ন্যায্য পাওনা তো তোমার ? করতাম নয় মরতাম—তোমার ন্যায্য পাওনা আদায় করে আনতাম।

জগদীশ হাসে।—মরেও পারতিস না রে, এতকাল ঢিল দিয়ে পাওনা আদায় করা অত সহজ নয়। মরণপণ করে লেগে গেলাম আর অন্যের খপ্পরে যাওয়া ন্যায্য পাওনা পেয়ে গেলাম, সংসারে অত ন্যায় খাটলে ভাবনা ছিল নাকি ? তুই মরলে এ জগতে কার কী এসে যায় ? এ জগতের কার সস্তা দায়টা তুই ঘাড়ে নিয়েছিস ? তোর বাহাদুরি তো সব দায় এড়িয়ে চলা, আমার কাছে ধন্না দেওয়া !

পরদিন প্রতাপ প্রায় সপরিবারে হাজির হয়।

বলে, দায় নিলাম।

বিরক্ত জগদীশ কথা বলে না।

ফোকলা মুখে একগাল হেসে প্রতাপ বলে, না না সে জন্য আসিনি। বুঝিয়ে দিতে এলাম যে দাযটা সত্যি নিযেছি। সংসারের সকলের ঘাড়ে দায় চাপিয়েছি। বুঝিয়ে দিয়েছি—এ দায় যদি না উদ্ধার করতে পারে চুলোয দেব ঘবসংসার !

দায় নিয়ে তোমার কাজ নেই প্রতাপ !

প্রতাপ তো ছেলেমানুষ নয় ! সে চুপ করে থাকে। প্রায তার সমগ্র পরিবারটি একে একে জগদীশের পায়ে মাথা নত করে প্রণাম করে সরে যায়।

প্রতাপ ধীর গম্ভীরভাবে বলে, রাগের কারণটা বুঝেছি বাবা, কিন্তু কী করব উপায় নেই। যে কাজ যত কম খরচে উদ্ধার করতে পারি—এটা একেবারে ধাত দাঁড়িয়ে গেছে। অন্যভাবে তো পারব না, ভেতরে জোর পাব না। তুমি আমার কিপটেপানা সারিয়ে দিয়েছ, সত্যি দিয়েছ। সকলকে ভোগে বঞ্চিত করে টাকা জমানোর ব্যারামটা সারিযে দিয়েছ কিন্তু বিষয়কর্ম চালাবার ধাতটা তো বদল করে দাওনি—অন্য কাযদায় পারব কেন ?

জগদীশ এবার হাসিমুখে বলে, তুমি আমায় হার মানালে প্রতাপ। ঠিক কথা, তোমার কায়দায় তোমার বিষয়বুদ্ধি খাটিয়ে আমার টাকা উদ্ধার করতে পারবে বলেই তো তোমায় দিয়েছি। তুমি লাভটা বড়ো করে দেখছ ভেবে রাগ হয়েছিল। প্রতাপ হেসে বলে, তোমার কাজ উদ্ধার করে দিয়ে সত্যি কি আর লাভ করব বাবা ? অত বড়ো পাষণ্ড কি আর আমায় তুমি রেখেছ ? আমি যা পাব সব তোমারই হাসপাতালের ফান্ডে জমা দেব।

সন্ধ্যাবেলা রত্নাকর বলে, প্রতাপ তোমার কেমন ভক্ত দাদা ? তোমার টাকাকড়ি উদ্ধার করে দিয়ে লাভ মারতে চায় ? হাজারে একশো লাভে খুশি নয়, তোমার সঙ্গে দরাদরি করে একশো পঁচিশ বাগিয়ে নিল !

তুই বুঝবি নে। বললাম না তোর বিষয়বুদ্ধি নেই। আমার টাকায় ভাগ বসিয়ে প্রতাপ লাভ করবে না—সে সাহস ওর নেই। প্রতাপ হিসাব করছে আমি অন্যদিকে অন্যভাবে ওকে কত লাভ পাইয়ে দেব—ছেলেমেয়েদের আনুগত্য পাইয়ে দেব, সম্মান পাইয়ে দেব। আমার টাকায় লাভ মারলে ভয়ানক পাপ হবে না ওর !

কমিশন আদায় করছে কেন তবে ?

লোকসান ঠেকাতে। প্রতাপ কি আর নিজে ছুটোছুটি করবে টাকাপয়সা বিষয়-সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য ? কাজ করিয়ে নেবে অন্যকে দিয়ে, নিজে শুধু হাল ধরে থাকবে, চাল মারবে, কৌশল খাটাবে। তাতে তো খরচ আছে। তাই একটু মার্জিন রেখে হাজার করা পঁচিশ টাকা আবদার ধরে আদায় করে নিয়েছে।

ধরো যদি হিসেবের চেয়ে বেশি আদায় হয় ? তোমরা দুজনে হিসাবপত্র করে লাখ দেড়েকের আশা ছেড়ে দিয়েছ। যদি ওর একটা মোটা অংশ আদায় হয় ? নাম তো তোমার কম ছড়ায়নি দাদা, প্রতাপ সেটা কাজে লাগাবেই। তোমার মতো সাধুসন্ন্যাসী মহাপুরুষের টাকা মেরে দিয়েছে জানতে পারলে দশজনে কী রকম ছিছি করবে, ভবিষ্যতে কী রকম মুশকিলে পড়বে, এ সব তো বলবেই। তাছাড়া, পাপের ভয়ও দেখাবে। অন্যের ঘাড় ভেঙে হজম করা যায়—তোমার টাকা কি হজম হবে ? তোমার কি সহজ ক্ষমতা ? পারমিট-ফারমিট জোগাড় করেও লাভের ভরা জাহাজ তোমার শাপেই হয়তো ভরাডুবি হয়ে যাবে মাঝ-দরিয়ায় !

জগদীশ সশব্দে হেসে ওঠে।

বারবার বোঝালাম না তাকে, তোর বিচারবুদ্ধি আছে, বিষয়বুদ্ধি নেই। প্রথম যুক্তিটা বেশ খাড়া করলি, প্রতাপ আমার নাম নিয়ে কৌশল খাটাবে ! কিন্তু আমি গোসা করে শাপ দিলে ভগবান ওদের লাভের জাহাজ মাঝ-দরিয়ায় ডুবিয়ে দেবে—এ কৌশল প্রতাপ খাটাবে না। এ কথা বলেই তুই প্রমাণ দিলি তোর বিষয়বুদ্ধি নেই।

রত্নাকরকে কখনও রাগতে দ্যাখেনি জগদীশ। তার ভাবভঙ্গি কথাবার্তা থেকেই টের পাওয়া যায় সে ভীষণ চটে গেছে !

জগদীশের পায়ের কাছে কয়েকবার মেঝেতে মাথা ঠোকে। যোগাসনে বসার মতো মেরুদণ্ড সিধা করে বসে বুনো কার্পাসি চটের শার্টের তলাটা তুলে মুখ মোছে।

পৃথিবীর গায়ে জড়ানো মোটে মাইল পাঁচেকের মতো যে বায়ুস্তর আছে তার সবটা এক নিশ্বাসে শুষে নেবার মতো গভীর একটা নিশ্বাস ছাড়ে।

বলে বুঝিয়ে বলো দাদা। বাপ বলিনি, দাদা বলেছি তো ! কী বললে ছোটোভাইটিকে বুঝিয়ে বলো।

জগদীশ স্নেহের দৃষ্টিতেই তার দিকে চেয়ে থাকে। তার মুখের হাসিখুশি ভাবের এতটুকু পরিবর্তন ঘটে না।

রত্নাকর মরিয়া হয়ে বলে, আজ একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। বিনে মাইনের আশ্রমের ম্যানেজার, হেডক্লার্ক, স্টোরকিপার, ক্যাশিয়ার গেটকিপার—সব পোস্টে খাটিয়ে নিচ্ছ। আসল কাজের বেলা আমায় বাদ দিয়ে প্রতাপকে খাতির করা কেন ? আমি কি ভেসে এসেছি ?

ভেসে আসিসনি ? সাত-আটবছর এদিক-ওদিক ভাসতে ভাসতে এখানে এসে ঠেকিসনি ? কী করে তোকে বোঝাব বল ! তুই কি বুঝতে চাইছিস ! সুদর্শনা উশকে দিয়েছে, তুই আবদার ধরেছিস, জিদ করছিস।

রত্নাকর একটু নুয়ে যায়।

সত্যি সত্যি সর্বজ্ঞ হয়ে গেছ নাকি ?

সর্বজ্ঞ হতে হয় ? চোখের সামনে দেখছি না তোদের ব্যাপার-স্যাপার ?

জগদীশ হাসে।

ছিলি ভবঘুরে, হয়েছিস আমার কুঁড়েঘর আর আটচালাটার দারোয়ান। দুজনে একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে সাহস পাচ্ছিস না—কেবলই হিসেবনিকেশ ঝগড়া আর পরামর্শ চালিয়ে যাচ্ছিস !

রত্নাকর খানিক চুপ করে থেকে সোজাসুজি অবুঝ আবদারের সুরেই বলে, কাজটা সোজাসুজি আমায় দিলে দোষ কী হয়, সোজা করে বুঝিয়ে দাও না ! লেখাপড়া শিখেছি, কবিতার বই লিখেছি, বোকাহাবা তো নই !

জগদীশ এবার গম্ভীর হয়ে বলে, তবু তুই পারবি না। প্রতাপ যেখানে কায়দা করে প্যাঁচ কষে চাপ দিয়ে ভয় দেখিয়ে লোভ দেখিযে কাজ আদায় করবে—তুই সেখানে সোজাসুজি তেতে গিয়ে বলবি—কই গো, জগদীশবাবুর ন্যায্য পাওনাটা উগরে দাও, নইলে খুন করব ! আঁটঘাট বেঁধে প্রতাপের আদায় করতে নামার রকম দেখেই সবাই টের পাবে—একেবারে ঘুঘু লোক, ওর সঙ্গে ইয়ার্কি চলবে না। একটা আপস করবে। জানিস না বুঝিস না, কোনোদিন ছ্যাঁচড়ামির ধার ধারিসনি—এ কাজ কি তোকে দিয়ে হয় রে রতন ?

রত্নাকর মুখভার করে চুপচাপ বসে থাকে।

জগদীশ হেসে বলে, ভাবিস কেন ? এতবড়ো একটা মহাপুরুষের লেজ ধরেছিস, তোদের একটা গতি হবে না ? প্রতাপ ওদিকে আমার টাকাপয়সা উদ্ধার করুক, তুই এদিকে আদায়পত্র বাড়া, চাঁদা তুলতে শুরু কর-

হাসিমুখে হালকা সুরে বললেও টের পাওয়া যায় জগদীশ তামাশা করছে না।

চাঁদা ?

চাঁদা। একটা ফান্ড খুলে কোমর বেঁধে চাঁদা তুলতে লাগতে হবে। একটা সত্যিকারের আশ্রম করব--মানসিক রোগের চিকিৎসার আশ্রম। পাকাবাড়ি হবে, ডাক্তার থাকবে, নার্স থাকবে—

রত্নাকর পলকহীন চোখে চেয়ে থাকে।

জগদীশ বলে, ভাবলাম কী জানিস ? আমি যদি এলোমেলোভাবে কথা বলে ব্যক্তিত্ব খাটিয়ে ভাঙা মনে জোড়াতালি দিতে পেরে থাকি, তোর মতো ডবল খুনে ভাবুক ভবঘুরের প্রাণের জ্বালা জুড়িয়ে আবার সংসারি করতে পেরে থাকি,—দু-একজন ডাক্তারের সঙ্গে মিলেমিশে নিয়মমতো চেষ্টা করলে কত বিগড়ানো মনকে শুধরে দিতে পারব !

রত্নাকর উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, এই জন্য টাকাকড়ি উদ্ধারের সাধ জেগেছে ! আমি ভাবছিলাম—

জগদীশ বলে, আমিও ভাবছিলাম তোরা কী ভাবছিস—কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করিস না কেন ! এদিকে জিজ্ঞাসার অন্ত নাই—হঠাৎ আমার দেড় লাখ দু-লাখ টাকার দরকার পড়ল কেন, কারও মনে সে প্রশ্ন জাগল না ?

আজকাল প্রায় রোজই রত্নাকরের সঙ্গে সুদর্শনার তর্ক আর ঝগড়ায় খণ্ডযুদ্ধ বাধছিল।

অন্যেরা উপস্থিত থাকলে কোনো বিষয়ে খানিকটা কথা কাটাকাটি হয়ে যায়, তার বেশি গড়ায় না। জগদীশ এবং আশ্রমের যারা ঘরোয়া লোক হয়ে গেছে তাদের সামনে তর্ক শুরু হলেই সেটা দাঁড়াচ্ছিল কথার যুদ্ধে।

হঠাৎ দেখা যায়, তর্ক তাদের বাধছে ঠিকমতোই কিন্তু সেটা ঝগড়ায় পরিণত হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে।

আপসে নয়—দুজনে যেন মিলেমিশে তর্ক করে পরস্পরকে আরও ভালো করে বুঝবার প্রয়োজনে।

জগদীশ বলে, ব্যাপার কী রে ? হাসপাতালের টাকায় মোটা ভাগ বসাবার মতলব আঁটছিস নাকি ? দেড়লাখ দু-লাখের ব্যাপারে নামছি, তোদের হিস্সে হবে বলেছি—অমনি বুঝি ঠাউরে নিয়েছিস রাজারানির হালে থাকার হিস্সে হল ?

রত্নাকর মুখ খুলতে যাবে, সুদর্শনা ধমক দিয়ে বলে, চুপ !

হেসে জগদীশকে বলে, যেমনভাবেই বলুন, আমরা আর চটব না। আমরা বুঝে গিয়েছি। আমরা আপনাকে সাধু মনে করি ভাবেন বুঝি ? কোনোদিন ভাবিনি। শুধু কথা বলতেন, তেমন যেন ভালো লাগত না। যেমন হোক কাজে নামছেন, আমরা অমনি মজা পেয়েছি। দুজনে কোমর বেঁধে খাটব,—কে কী করব পরামর্শ করছি কি না, তাই আর ঝগড়া হচ্ছে না।

জগদীশ হাত বাড়িয়ে সুদর্শনার গালটা টিপে দেয়।

এত উপদেশ না ঝেড়ে আরাম-বিলাস চাইবি না বললেই চুকে যেত।

গাল-টেপা হাতটাকে সরে যেতে না দিয়ে দুহাতে চেপে ধরে রেখে ছোটো মেয়ের মতোই ঠোঁট ফুলিয়ে সুদর্শনা বলে, আরাম-বিলাস চাইব না মানে ? নিশ্চয় চাইব। আরাম-বিলাসের ব্যবস্থা ছাড়া নিজেদের সভ্য মানুষ ভাবব কী করে ? শুধু রাজা-মহারাজারাই আরাম-বিলাস ভোগ করবে, আমরা ভেসে এসেছি ? তবে তোমার কাজ যদ্দিন না উদ্ধার হয় তদ্দিন আমরা নেংটি পরে ইলুবীজ খেয়ে দিন কাটাতে রাজি আছি। জগদীশ রত্নাকরের দিকে তাকায়। হাত তার বন্দী হয়ে আছে মেয়ের মতো সুদর্শনার দুটি পেলব মেয়েলি হাতের মুঠোয়।

রত্নাকর বলে, সামলে দেব, কাজ হবে, ভেবো না। কতগুলি নিয়ম চালু করতে হবে। সে সব আমরা ঠিক করে নেব, তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমাকেও কিন্তু মানতে হবে আমাদের নিয়ম।

কিছু কিছু নিয়মও চালু হয়েছে রত্নাকর ও সুদর্শনার চেষ্টায়। আগে ছিল শুধু একটা নিয়ম—সন্ধ্যার সময় জগদীশ নেশা শুরু করলে জিরাই তাপ্পি রত্নাকরেরা ক-জন ছাড়া অন্য কারও জগদীশের কাছে যাওয়া ছিল বারণ।

এখন দুপুরে জগদীশের খাবার পর (ভক্তেরা বলে ভোগ) দু-ঘণ্টা জগদীশের বিশ্রামের সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

আশ্রমের ঘরোয়া মানুষ ছাড়া কেউ কাছে যেতে পারবে না জগদীশের।

এখানে বাস করার প্রথম অনুমতি জুটেছিল রত্নাকরের। যখন খুশি আসার এবং জগদীশের কাছে যতক্ষণ খুশি বসার অধিকার জুটেছে সুদর্শনার।

অন্য ভক্ত অসময়ে এলে জগদীশ রেগে গিয়ে বলে, সারা সকাল বকবক করেছি, আরও বকাতে চাও ? চারদিকে ঘুরে প্রকৃতির শোভা দর্শন করো না বাবু, তৃপ্তি পাবে। আমায় দর্শন করে একফোঁটাও পুণ্য হবে না।

রত্নাকর বলে, প্রতাপ ও দিকে টাকাগুলো উদ্ধার করে আনছে, চাঁদাও উঠছে মন্দ নয়। প্রণামির টাকা গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দেবে ?

না, আর বিলোব না। এলোমেলো ভিক্ষা দিয়ে ক-টা গরিবের দুঃখ দূর করব ? তার চেয়ে দশটা প্রাণের জ্বালা জুড়িয়ে, লোকের এত দারিদ্র্য কেন বুঝিয়ে দিলে, কীসে মানুষের দুঃখ-দারিদ্র কমবে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিলে ঢের বেশি কাজের কাজ হবে !

কাজের কাজ !

কাজের কাজে জগদীশের মন ঝুঁকেছে !

কোথায় স্থাপন করা হবে জগদীশের আশ্রম—মানসিক ব্যাধির হাসপাতাল ? এখানে ? এই বনের ধারে বুনোদের গাঁয়ে ? না, আশ্রম হবে লোকালয়ে, শহরের কাছে।

শহরের কাছে শান্ত নির্জন স্থানে জমি কিনে যেদিন ভিত্তিস্থাপনের উৎসব হল সেদিন সন্ধ্যায় ভক্তদের বুক ভয়ে কাঁপিয়ে দিয়ে কী কাণ্ডটাই যে জগদীশ করল !

নতুন কেনা জমিতে তিনটি কুঁড়ে তোলা হয়েছে—পরদিন জগদীশ বনের মায়া প্রপাতের মায়া কাটিয়ে বিদায় নিয়ে ওখানে চলে যাবে, জিরাই তাপ্পিরা কয়েকজন সঙ্গে যাবে।

কয়েকজন ভক্ত আজ রাত্রে এখানে থাকার অনুমতি পেয়েছে।

আগের দিন জগদীশ নেশা করেনি। মাঝরাত্রি পর্যন্ত ছটফট করে ভাঙা ভাঙা একটা তন্দ্রার মধ্যে বাকি রাতটা কাটিয়ে দিয়েছিল।

রত্নাকর দ্বিধার সঙ্গে বলেছিল, এ রকম হঠাৎ বন্ধ করলে দাদা ?

হঠাৎ বন্ধ না করলে এ সব বন্ধ করা যায় ?

বিকাল থেকেই জগদীশের যেন কেমন কেমন ভাব। সন্ধ্যার পর হঠাৎ একসময়—সাপ ! সাপ !—বলে আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠে ভয়ে দিশেহারার মতো সে কাঁপতে আরম্ভ করে।

দেখা যায়, তার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে। তারপর শুরু হয় তার আবোল-তাবোল কথা, এলোমেলো চিৎকার আর ছটফটানি। ঠিক জ্বর-বিকারের রোগীর মতো করতে থাকে।

সব চেয়ে স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায় মরণের আতঙ্কটা ! আশেপাশের ভক্তরাই নাকি তাকে খুন করার মতলব এঁটেছে দা. কুড়াল, টাঙ্গি এ সব এনেছে তাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলার জন্য !

সুদর্শনা গায়ে হাত দিয়ে বলে, গা তো ঠান্ডা !

প্রতাপ বলে, ডাক্তার আনা উচিত।

প্রতাপের গাড়ি ডাক্তার আনতে শহরে ছুটে যায়, রত্নাকর জগদীশকে বলে, একটু খাবে ? বিলাতি একটু খাও না।

জগদীশ কাতরভাবে বলে, না না, মরে যাব। কে যেন বোতলটার মধ্যে বড়ো বড়ো কাঁকড়া বিছে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমায় মারতে চায়।

ডাক্তার আসে। পরীক্ষা করে, বলে, ডিলিরিয়াম ট্রেমেন্স। বেশি ড্রিঙ্ক করলে হয়, হঠাৎ ড্রিঙ্ক বন্ধ করলেও এ রকম হয়।

পরদিন জগদীশ বলে, তোমরা কাজকর্ম চালিয়ে যাও—আমি কিছুদিনের জন্য ছুটি নিলাম। বিষ খাওয়া রোগটা সারিয়ে ফিরে আসব। এ এমন বিষ ! খেলেও কাবু করে, মনের জোরে খাওয়া বন্ধ করলেও কাবু করে !

কোথায় যাবে জগদীশ ?

হাসপাতালে যাব। মনের জোরের টোটকা চিকিৎসা বুঝি না আমি। ডাক্তার যা বলবে, যা করবে।

জগদীশ প্রশান্তভাবে হাসে।

সবাই প্রমাণ দেখলে তো, আমি যোগী নই, সিদ্ধপুরুষও নই। নইলে মদ ছাড়তে হাসপাতালে যেতে হয় !

ললিতা হাসিমুখে বলে, আমরা বুঝি জানি না ভেবেছেন বাবা ? আমার অমন রোগটা সারিয়ে দিলেন, ইচ্ছা করলে ও সব আপনি ছাড়তে পারেন না ! আসলে নিজের জন্য আপনি বিশেষ শক্তি খাটাবেন না—দশজনের মতো চলবেন। আপনি আমাদের শেখাচ্ছেন।

সকলে হাসিমুখে চেয়ে থাকে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরির একটি পৃষ্ঠার অংশ

লাজুকলতা

লাজুকলতা প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

লেখকের কথা

এই সংকলনেব অধিকাংশ গল্প গত তিন-চাববছবেব মধ্যে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। একটি গল্প সংকলনে মূল একটি সূত্রেব ভিত্তিতে, অর্থাৎ সমাজজীবনেব কোনো একটি বিশেষ সময়েব বিশেষ অবস্থাব ছোটো ছোটো কাহিনিব মধ্যে যে মিলটা স্বভাবত থাকে তাকে আশ্রয় কবে গল্প চয়ন কবা আমি বাঞ্ছনীয় মনে কবি।

এই সংকলনেও সেই চেষ্টাই কবেছি। কতটা সফল হয়েছে আমাব বিচার্য নয়।

লেখক

কলকাতা
কোজাগবি পূর্ণিমা ১৩৬০

লাজুকলতা

তমাললতার লজ্জার বহর দেখে সবাই অবাক হয়ে যায়।

এ যুগে শহরবাসী শিক্ষিত একটা মানুষের বউ যে এমন লাজুক হতে পারে এ যেন ধারণাই করা যায় না।

তমাল নিজেও নাকি কিছুকাল স্কুলে যাতায়াত করেছিল !

শ্বশুর শাশুড়ি গুরুজন নেই, বছর পাঁচেকের একটি ছেলে আর তিন বছরের একটি মেয়ের মা, তবু সব সময় সে যেন লজ্জায় জড়সড় হয়ে থাকে, নিজেকে মানুষের চোখের আড়ালে লুকিয়ে রাখতে পাবলেই সে যেন বাঁচে।

বীরেনের দোতলা বাড়ির একখানা ঘরে সম্প্রতি তারা শহরের অন্য এলাকা থেকে উঠে এসেছে। বাড়িতে ঘর ভাড়া দেবার কোনো প্রয়োজন বা ইচ্ছা বীরেনের ছিল না। যতীনের উপর এটা তার অনুগ্রহ দেখানোই বলা যায়।

বীরেনের বড়োছেলে হেমাঙ্গের সঙ্গে যতীনের পরিচয়ের সুযোগে এই সুবিধাটুকু যতীন আদায় করেছে।

একটা ঘর ভাড়া নিয়েই সে বাস করছিল শহরের অন্য এলাকায় এবং ভাড়াটে নিয়মিত ভাড়া দিয়ে ঘর দখল করে থাকলে তাকে উঠিয়ে দেবার ক্ষমতাও বাড়িওলার থাকে না—তবু কেন যে সে ওই ঘবখানা ছেড়ে দিয়ে বিপন্ন হয়ে এ বাড়িতে আরেকটি ঘর ভাড়া নিয়ে উঠে এল, হেমাঙ্গও ভালো বুঝতে পারেনি।

বিপন্ন বন্ধুর প্রতি এই দয়া প্রদর্শনে বাড়ির লোকেরা মোটেই খুশি হয়নি হেমাঙ্গের উপর।

বন্ধুত্ব ছিল কেবল হেমাঙ্গ ও যতীনের মধ্যে, এ বাড়িতে ভাড়া করে উঠে আসার আগে তমালকে কেউ দেখেনি। তাকে দেখে বরং তাদের মুখ বেশ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু তমাললতার ভীরুতা ও লাজুকতার বাড়াবাড়িতে অনেকে তাজ্জব বনে গেলেও মুখের অন্ধকার অনেকটা কেটে গিয়েছে বাড়ির লোকের।

বীরেনের বড়োমেয়ে সুচারুকে তার স্বামী নেয় না। সে অবশ্য মুখ বাঁকিয়ে বলে, ঢং !

বলে, মাগির সব ন্যাকামি আর বজ্জাতি। অত লজ্জা কেউ দেখায় না, উনি তাই বেশি করে লজ্জা দেখিয়ে দশজনের নজর টানেন। এ যেন বুঝতে দেরি লাগে কারও। আমার বুড়ো বাপকে দেখে তুই কোন লজ্জায় আধহাত ঘোমটা টানিস ?

কিন্তু বাড়ির এবং পাড়ার বুড়োবুড়িরা পছন্দ করে তমালেব প্রায় বেহায়াপনার মতো লাজুকপনা। এ রকম চালচলনই তো মানায় গেরস্তঘরের জোয়ান বয়েসি বউয়ের। মুখে রা নেই, ফটাংফটাং যখন তখন ঘর থেকে বেরিয়ে পাড়া চষে বেড়ানো নেই, পুরুষকে তফাতে রেখে আড়ালে রেখে চলায় এতটুকু ঢিল নেই।

হেমাঙ্গের সঙ্গে সে নাকি আগে কথা বলত।

হেমাঙ্গ তারই জের টেনে তার সঙ্গে দু-চারবার কথাবার্তা বলবার চেষ্টা করেছে—কিন্তু তমাল মুখ ফেরায়নি, মুখ খোলেনি।

ছেলেকে দিয়ে হেমাঙ্গের কথার জবাব দিয়েছে।

হেমাঙ্গের বুড়োবুড়ি মা-বাপ ফেলেছে স্বস্তির নিশ্বাস।

কিন্তু হেমাঙ্গের কলেজে পড়া ছোটোবোন সুমায়া বলেছে, তোমরাও যেমন ! এ রকম উদ্ভট খাপছাড়া রকমসকম দেখে কোথায় আরও ভড়কে যাবে, তোমরা খুশি হয়ে উঠলে !

বুড়ি সুভদ্রা বলে, তুই বুঝবিনে। তুই কেবল একপেশে বিচার শিখেছিস। খাপছাড়া বটেই তো, এ রকম খাপছাড়া লজ্জা কোনো বউয়ের দেখা যায় আজকাল ? কিন্তু একটা খাপছাড়া অবস্থায় পড়েছে বলেই নিশ্চয় এ রকম খাপছাড়াভাবে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। তুই তলিয়ে সব জেনেছিস ওদের ভেতরের ব্যাপার ? না জেনেই চটাংচটাং কথা কইছিস। আমরা টের পেয়েছি তাই আমরা বলছি, বেশ করছে।

কী টের পেয়েছ ?

সে তুই বুঝবিনে, অত কথায় তোর কাজ নেই। যতীনের অনেক দিন চাকরি নেই খবর রাখিস ? দেখায় যেন চাকরি করে, কিন্তু আমরা টের পেয়ে গেছি। সাধে কি ঘর ছেড়ে বন্ধুর বাড়ি ঘর ভাড়া নিয়েছে ? সেখানে ভাড়া বাকি পড়লে মালপত্র আটক রেখে খেদিয়ে দিত। বন্ধু তো আর তা পারবে না। মানুষটা মরিয়া হয়ে উঠেছে—বউটা নিজেকে বাঁচিয়ে চলবে না ?

সুমায়া হঠাৎ যেন বিদ্যুতের ঝলকানি চেয়ে দেখেছে এমনিভাবে চোখ পিটপিট করতে করতে বলে, ও !

যতীন একটু ঝাঁঝালো হাসির সঙ্গেই বলে, ভবেশবাবুর মা ডেকে তোমার প্রশংসা শোনালেন। তোমার মতো খাঁটি বউ নাকি পাড়াতে আর নেই। তা, কথাটা সত্যি। ওনার নাতিবউয়ের সঙ্গে তুলনা করলে সত্যি তোমার তুলনা মেলা ভার !

কালো টানা চোখ তুলে ঝিলিক মেরে চেয়েই তমাল চোখ নামায়। পাতলা ঠোঁটের অপূর্ব কারসাজিতে একটু রহস্যময় হাসিরও ঝিলিক খেলিয়ে দেয়।

যতীন সারাদিন চাকরি এবং রোজগারের সন্ধানে টোটো করে ঘুরেছে। দেহমন দুইই তার শ্রান্ত এবং ক্লান্ত। মুখটা যেন স্থায়ীভাবে বেঁকেই আছে।

হতাশায় মন বাঁকা হয়ে যাওয়ারই বোধ হয় এটা প্রকাশ্য লক্ষণ। কেবল চাকরি করার অধিকার নয়, সংসারের কোনো অধিকার খাটাবার ক্ষমতাই যেন তার নেই।

বউটা পর্যন্ত তার হুকুম মানে না।

মুখ আরেকটু বাঁকিয়ে সে বলে, সেদিন নীরেনবাবুও বলছিলেন, তুমি তো ভাগ্যবান পুরুষ যতীন ! এই ভেজালের যুগে খাঁটি সহধর্মিণী পেয়েছ। চুলদাড়ি সব সাদা হয়ে গেছে, নইলে একটা চাপড় কষিয়ে দেবার কথা ভাবতাম।

গামছা লুঙ্গি হাতে দিয়ে তমাল মৃদুস্বরে বলে, ভবেশবাবু নীরেনবাবুদের বলো না একটা চাকরি জুটিয়ে দিক। পাড়ার একমাত্র খাঁটি বউটির যে সিঁদুর কেনার পয়সা নেই ?

যতীন সচকিত হয়ে তার মুখের ভাব দেখবার চেষ্টা করে। সত্যই কী এমন তীব্র তীক্ষ্ণ রসিকতা করছে তমাল অথবা আপনা থেকে বেরিয়ে এসেছে কথাগুলি তার মুখ দিয়ে ?

কিন্তু ইচ্ছা বা প্রয়োজন হলেই তমালের মুখ দেখা অত সহজ ব্যাপার নয় তার স্বামীর পক্ষেও। কথা বলতে বলতে তমাল নত হয়ে মাথা নামিয়ে তার জুতোজোড়ার ধুলো ঝাড়তে শুরু করেছিল। পুরানো হয়ে গেছে ভালো দামি জুতোজোড়া—একটা প্রায় সুনিশ্চিত চাকরির আশায় মরিয়া হয়ে কেনা হয়েছিল।

এবার ছিঁড়ে যাবে।

তবু এই জুতো পায়ে দিয়েই কাল আবার তাকে বার হতে হবে চাকরির খোঁজে।

হেমাঙ্গ গিয়েছিল বন্ধুর সঙ্গে সিনেমা দেখতে। সে বাড়ি ফেরে রাত নটার পর।

যতীন খেয়ে উঠে চৌকির বিছানায় বসে পান চিবোতে চিবোতে মেঝেতে ছেলেমেয়ের বিছানায় মশারি খাটিয়ে গুঁজে দেওয়ার কাজে-রত তমালকে দেখছিল।

হেমাঙ্গকে ডেকে বলে, এত রাতে ?

হেমাঙ্গ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বাঁকা চোখে তমালের দিকে চেয়ে বলে, সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম।

বোধ হয় সদ্য সদ্য সিনেমা থেকে বাড়ি ফিরেছে বলেই সস্তা পচা নোংরা ছবির আমেজটা মনে রয়ে গেছে। নইলে এভাবে পরের বউয়ের দিকে তাকানো তার ধাত নয়।

ভালো বই ?

একদম বাজে বই।

ঘরে এসো না ? একটু শুনি ছবিটার কথা। আমিও একবার দেখব ভাবছিলাম। সাড়ে নটার শো দেখা যায়, না ?

তমাল তাড়াতাড়ি মেঝেতে ছেলেমেয়ের বিছানায় টাঙানো মশারির ওপারে চলে যায়। আড়ালে জানালায় বসে বোধ হয় তাকিয়ে থাকে বাইরের বিদ্যুতের আলোয় সাজানো শহরতলির গেঁয়ো আঁধারের দিকে।

হেমাঙ্গ হঠাৎ যেন চেতনা পায়। বলে, বড়ো খিদে পেয়েছে ভাই। পেটটা জ্বলে যাচ্ছে।

বলেই সে চলে যায় ঘর ছেড়ে।

যতীন গিয়ে চুলের মুঠি চেপে ধরে তমালের।

হারামজাদি, ঘরে ভদ্রলোক এলে তার সঙ্গে একটু ভদ্রতাও করতে পারিস না ?

তমাল শান্ত মৃদু কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় বলে, আমার কিন্তু দাঁত আছে। চুল টেনে যত ব্যথা দিচ্ছ, দাঁত দিয়ে কামড়ালে তার চেয়ে দশগুণ বেশি ব্যথা পাবে।

যতীন তার চুল ছেড়ে দেয়। সে জানে তার লাজুক বউ কামড়ে তার মাংস তুলে নিতে পারে।

মোটে দুমাস আগের অভিজ্ঞতা এত তাড়াতাড়ি কি ভোলা যায়।

তমালকে দেখেই রাধাশ্যামের হয়েছিল কৃষ্ণভাব। পরদিন থেকে যতীনকে দেড়শো টাকার চাকরির নিয়োগপত্র সই করে তার হাতে তুলে দিয়েছিল।

কিন্তু সিঁড়ির তলার রান্নাঘর থেকে গায়ের জোরে তমালকে শোবার ঘরে রাধাশ্যামের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করতে গিয়ে তমালের ধারালো দাঁতে ঘাড়ের কাছে খানিকটা মাংস উঠে গিয়েছিল যতীনের।

ঘা-টা সেরেছে।

তমালের দাঁতের ভয় কমেনি।

সুমায়া এবং ঘরের পাশের দু-তিনটি অল্পবয়সি মেয়ে-বউয়ের যেন বিশেষ দরদ দেখা দিয়েছে তমালের জন্য। তারা সুমায়ার বন্ধু বলেই কি না কে জানে !

সুমায়ার দরদটাই সব চেয়ে বেশি।

কলেজ থেকে ফিরে বইখাতা সে আগেও টেবিলে ছুঁড়ে দিত। এটা তার চিরকালের বই রাখার কায়দা। আজকাল গায়ের বিশেষ শাড়ি-জামাগুলি পর্যন্ত প্রায় ওইভাবে খুলে ছড়িয়ে ফেলে ঘরোয়া বেশে তমালের নিচু ছোটো রান্নাঘরের দরজায় বসে পড়ে।

কলেজে কাঠের ডেস্ক-টেবিলে বসে অধ্যাপকদের মুখস্থ-করা লেকচার শুনতে শুনতে তার যেন শুধু ডেস্ক-চেয়ারে বসা নয়—ডেস্ক-চেয়ারি সভ্যতা সম্পর্কে পর্যন্ত বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে !

সে যেন তাই মাটিতেই আলুথালু বেশে অসভ্যের মতো বসে স্বস্তি পেতে চায়। তমালের এগিয়ে দেওয়া সাতরঙা উলের বোনা আসনটা সে তাই গুটিয়ে রাখে।

তমাল নিজে বুনেছিল আসনটা। সাতটা আদিম রং দিয়ে। তার জীবনেও যখন রং ছিল তখন।

তবে আজ মনে হয়, যতীনের ক্লিষ্ট ফ্যাকাশে মুখে যেন শুধু এই বীভৎস ঘোষণা যে বেঁচে থাকার মধ্যে কোনো রস নেই, রং নেই—অথচ তার অধীনস্থা নারীটি তারই ঘরের কোণে সাত রকম রং দিয়ে আসন বুনেছে অতিথি অভ্যাগত আত্মীয়স্বজন ঘরে এলে বসতে দেবার জন্য !

এ যেন আকাশের মতোই উদারতা ঘরের কোনার লাজুক বউটির। জীবনের সব সুখ আর উত্তাপের সূর্যকে ঢেকে দিয়ে নামে জীবনের ঘন কালো দুঃখের বর্ষা, আবার একফাঁকে মেঘ সরিয়ে অস্তায়মান সূর্যের আলোয় আকাশে সাতরঙা রামধনু রচনা করে।

তাকে বসতে সাতরঙা আসন এগিয়ে দেয়, কড়াই নামিয়ে কেটলি চাপিয়ে জল ফুটিয়ে চা করে দেয় কিন্তু সুমায়ার জীবনের উপর বিতৃষ্ণা আর বিরাগ যেন তারই উপর ঘনীভূত হতে থাকে।

তমালের তৈরি করা চায়ে চুমুক দিয়ে মুখ বাঁকিয়ে সে বলে, তুমি অন্যায় করছ ভাই। তুমি অন্যায়কে প্রশ্রয় দিচ্ছ।

তমাল বলে, বাপের খাও-পরো, কুমারী মেয়ে, তুমি বুঝবে না। আমি অন্যায় ঠেকাচ্ছি, লড়াই করছি।

এ রকম সেকেলে বউপনা দিয়ে ?

আর যে কোনো উপায় নেই ভাই ? হয় এ রকম সেকেলে বউপনা, নয়তো মরার বাড়া বেহায়াপনা।

তুমি বোকা। তুমি ভুল করছ। সেকালেও আমরা এ রকম বউ ছিলাম না, একালেও আমরা বেহায়া হয়ে যাইনি। তুমি একজনকেই আঁকড়ে থাকবে। এটা নিয়ম নয়, রীতি নয়, নীতিও নয়।

তমাল শান্তভাবেই বলে, কিন্তু আইন যে—মোটা বাস্তব আইন। একবার ভাঙলেই আমায় একেবারে শেষ করার সুযোগ পেয়ে যাবে। বাঁচার অন্য কোনো রকম উপায় থাকলে কেউ সাধ করে এই মরণদশা আঁকড়ে থাকে ?

গায়ে গায়ে লাগানো পাশের বাড়ির একতলার একখানা ঘরের ভাড়াটে বিলাসের বউ প্রমীলা যেন গঙ্গায় স্নান করতে অথবা সিনেমা দেখতে ঘর থেকে বেরিয়ে আনমনে পথ ভুলে তমালের রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়।

বলে, কী হচ্ছে ?

সেও সাতরঙা উলের আসন ঠেলে দিয়ে মেঝেতে বসে। গায়ে তার রঙিন শাড়ি জড়ানো আছে।

তমাল বলে, উঠে আসাটা কি ভালো হল ভাই ?

প্রমীলা হাসবার চেষ্টা করে বলে, এ জন্মে ওঠা-হাঁটা আব হবে কি না কে জানে ? টাকা জোগাড় করে বারোটা-একটায় ফিরবার কথা। বউকে যে হাসপাতালে বাঁচতে পাঠাবে সে কি আর পাঁচটা নাগাদ আপিস করছে ? তার মানেই টাকা জোগাড় হয়নি ! ভাবলাম, আমি তো একটা একেলে বউ ? ঘরের কোণে মুখ গুঁজে মরি কেন ? পাশের বাড়ির সেকেলে বউটার সঙ্গে দুটো কথা কই মরার আগে।

প্রমীলার মুখ দেখেই বোঝা যায়, গায়ে তার তিন-চার ডিগ্রি জ্বর। আজকালের মধ্যে কঠিন একটা অপারেশন না হলে তার মরণ সুনিশ্চিত। সেই ব্যবস্থার শেষ চেষ্টা, চরম চেষ্টা, করতে বেরিয়েছিল বিলাস। তার ফেরার কথা ছিল বারোটা-একটার মধ্যে।

সুতরাং বেলা পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে বোঝা গিয়েছে চেষ্টা তার ব্যর্থ হয়েছে।

সুমায়া মাথা হেঁট করে থাকে।

প্রমীলা দরজায় ঠেস দিয়ে গা এলিয়ে বসে চোখ বুজে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, ঘরে শুয়ে থাকতে যন্ত্রণা হচ্ছিল, মরে যাচ্ছিলাম যন্ত্রণায়। উঠে এসে তোমার ঘরে বসে যন্ত্রণা কমে গেছে ভাই।

তমাল বলে, গলার হারটা ক-ভরির ? হাতের চুড়িগুলি ? মরার পর শ্মশানে পোড়াতে নিয়ে যাবার আগেই ওগুলো কিন্তু জ্যান্ত মানুষেরা খুলে নেবে ভাই।

সুমায়া যেন চাবুক খেয়ে মাথা তোলে।

হেমাঙ্গ বাথরুমে বৈকালিক স্নানের জন্য জলের আশায় অপেক্ষা করছিল। জলের মালিকদের দয়া হলে জল দু-চার বালতি হয়তো এসেও যেতে পারে কলটার মুখ দিয়ে।

সুমায়া তাকে ডাকে। বলে, চট করে জামাকাপড়টা পরে এসো দিকি। এই হারটা বেচে টাকা নিয়ে এসো। একে এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

লাজুক তমাল আজ কথা কয় হেমাঙ্গের সঙ্গে ! মুখ তুলে চেয়ে বলে, হাসপাতালে নেবার ব্যবস্থাই করুন না আগে ? হারটা তো রইল।

প্রমীলার পাশের ঘরের ভাড়াটে নন্দা তাকে খুঁজতেই এসে দাঁড়িয়েছিল।

নজর এড়িয়ে প্রমীলা কখন উঠে এসেছে সে টেরও পায়নি। বোধ হয় ভালোই হয়েছে টের না পেয়ে। টের পেলে হয়তো সখীত্বের জোরে তাকে ঘরে আটকে রাখত স্বামীর অপেক্ষায় মরবার জন্য।

নন্দা স্মার্ট মেয়ে, লাজলজ্জার ধার ধারে না। পাড়ার বদ ছোঁড়া আর প্রৌঢ়বয়সি লোকেরা যে সব মেয়ে-বউয়ের দিকে লালসা ভরা চোখে তাকায় নন্দার বয়স তাদের চেয়ে বেশি হবে না। পাড়ার যে কোনো বদ ছোঁড়াকে যে কোনো সময়ে ঘরে বসিয়ে একা আলাপ করতে সে সর্বদাই রাজি কিন্তু অন্য মেয়ে বউদের হাত চেপে ধরার সুযোগ খুঁজে যে হয়রান হয় সেও সাহস করে নন্দার সঙ্গে কথা কইতে এগোয় না।

নন্দা নির্ভয়ে সমানভাবে ভদ্রভাবে আলাপ করবে। ইয়ার্কি দিতে গেলে হয়তো দ্বিধামাত্র না করে গালেই মেরে বসবে একটা চড় !

ভীরু মেয়ে না হলে বজ্জাতি করেও সুখ নেই।

নন্দা বলে, তোমার না খুব লাজুক বলে বদনাম ? তুমিই দেখছি একটা ব্যাটাছেলেকে হুকুম দিয়ে ছুঁড়িটাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করলে। ওর স্বামীটা কী করে আমরা সবাই তার অপেক্ষায় হাত গুটিয়ে আছি।

সুমায়া বলে, আমরা যে নিয়মে চলি—ব্যাটাছেলের ছকে দেওয়া নিয়ম ছাড়া চলতে জানি না। লাজুক হবার দরকার হলেও আমরা যে লাজুক হতে লজ্জা পাই।

হেমাঙ্গ অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এলে তারা ধরাধরি করে প্রমীলাকে গাড়িতে তুলে দেয়। সঙ্গে যায় সুমায়া আর নন্দা।

বউকে হাসপাতালে নেবার টাকা জোগাড় করতে না পেরে সময়মতো ঘরে না ফিরলেও বিলাস একসময়ে ফিরে আসে, প্রতিদিনের মতো চাকরির চেষ্টায় বেরিয়ে যতীন একেবারেই ফিরে আসে না।

পরদিন সকালে নন্দা তমালের কাছে আসে। মনে হয় লজ্জায় সে যেন মরে যাচ্ছে !

বলে, শেষকালে আমারই কপালে তোমায় খারাপ খবর জানাবার দায় চাপল।

তমাল বলে, কপালের কথা বাদ দাও। রোজ খারাপ খবর শুনবার জন্য অপেক্ষা করছি অনেক দিন ধরে।

তাই নাকি ! তবে ভণিতা না করেই বলি। যতীনবাবু একটা দোকানের ক্যাশ ভাঙতে গিয়ে ধরা পড়েছেন।

তবু ভালো। জেলে খেতে-পরতে পাবে। আত্মহত্যা করেনি, এই অনেক ভাগ্যি।

যাবার সময় উঠানে দাঁড়িয়ে নন্দা হেমাঙ্গের সঙ্গে কথা বলে। দুজনেই তাকিয়ে দ্যাখে ছেলেমেয়েকে শুকনো রুটি খেতে দিতে গিয়ে তমালের আজ ঘোমটা খসে পড়েছে!

নন্দা চলে যাবার পর হেমাঙ্গ দরজায় এসে দাঁড়ালেও সে যেন ঘোমটা দিতে ভুলে যায়।

হেমাঙ্গ বলে, আপনি এবার কী করবেন ? যতীন যাই করুক, আমাদের কিন্তু একটা দায়িত্ব আছে।

তমাল বলে, আপনাদের কীসের দায়িত্ব ? আমার দায় আপনাদের ঘাড়ে চাপাবার জন্যই উনি আমায় এখানে টেনে এনেছিলেন। আপনারা ভদ্রলোক তাই ওনার সায় পেয়েও আমাকে বিব্রত করেননি। আমার ব্যবস্থা এবার আমিই করে নেব।

কী ব্যবস্থা করবেন ?

দেখি কী করা যায়।

কাছের বস্তি থেকে পঞ্চু দুবেলা এ বাড়িতে খাটতে আসে। কলতলায় সে বাসন মাজছিল। তাকে ডেকে তমাল জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের ওদিকে ঘর পাওয়া যাবে ভাই ?

পঞ্চু চমৎকৃত হয়ে বলে, তা পাওয়া যেতে পারে।

কাজ সেরে যাওয়ার সময় আমায় ডেকে নিয়ে যেও। ঘরটা দেখে ঠিক করে আসব।

পঞ্চুর কাছে খবর পেয়ে বাড়ির সকলে ভিড় করে আসে।

সুচারু বলে, কেন বাছা, বস্তিতে উঠে যাবে কী জন্যে ? তুমি এ ঘরে থাকলে কি আমরা ফতুর হব !

তমাল বলে, এত ভাড়া কোত্থেকে দেব ?

সুভদ্রা বলে, ভাড়া তুমি পাঁচ-দশটাকা যা পারো দিয়ো। না দিতে পারলে এখন বাকি রেখো, সময় ফিরলে দেবে।

তমাল মাথা নেড়ে বলে, না, ও রকম জোড়াতালি দিয়ে কোনো ব্যবস্থা হয় না।

দুদিন পরে পাড়ার লোক তাজ্জব হয়ে তাকিয়ে দ্যাখে বিখ্যাত লাজুক বউ তমাললতা মাথার কাপড় কোমরে বেঁধে ছেলেমেয়ের সঙ্গে নিজেই বাসনকোসন বিছানাপত্র বয়ে নিয়ে বস্তিতে উঠে যাচ্ছে মাথা উঁচু করে !

লজ্জাহীনা বেহায়ার মতো !

উপদলীয়

একদিন সকালবেলা প্রশান্ত নতুন একটি লেখা আরম্ভ করে একমনে লিখে যাচ্ছে, বাইরের এক ছোটো শহর থেকে একজন তার সঙ্গে দেখা করতে এল।

প্রশান্ত নামকরা লেখক এবং দরজায় খিল এঁটে জগৎকে বর্জন ও নিজেকে ঘরের কোনে নির্বাসিত করে সাহিত্যচর্চায় সে অবিশ্বাসী। লেখার সময় লোকজন প্রায়ই তাঁর কাছে আসে।

সে তাতে খুশিই হয়।

লেখার ব্যাঘাত ঘটার বদলে তাতেই তাঁর লেখা আরও জমে।

মানুষটিকে চেনা চেনা মনে হল। প্রশান্ত অনেক সভাসমিতিতে যাতায়াত করে, নানা উপলক্ষে বহুলোকের সঙ্গে তার সাময়িক পরিচয় ঘটে। একজনকে দেখে এ রকম চেনা চেনা মনে হওয়া নতুন ব্যাপার কিছুই নয়।

আগন্তুক নিজের পরিচয় দিল। তার নাম সুবিনয়, বাস ওই ছোটো শহরে, ওখানে নূতন একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়া হয়েছে, সে তার সম্পাদক। সামনের শনিবার তাদের শহরে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, সকলের ইচ্ছা এবং দাবি প্রশান্ত সেই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবে।

প্রশান্ত বলতে গেল, দেখুন—

আপনাকে যেতেই হবে। আমাদের ওখানে প্রতিক্রিয়া কী জোরালো আপনি ধারণা করতে পারবেন না। আপনি না গেলে আমরা দাঁড়াতে পারব না।

যেতে আমার অনিচ্ছা নেই। কিন্তু সময় করে উঠতে পারব না।

কিন্তু সুবিনয় নাছোড়বান্দা।

আপনাকে একটু সময় করে যেতেই হবে। আপনারা যদি শুধু কলকাতার বড়ো বড়ো মিটিংয়ে যান, আমরা দাঁড়াই কোথায় ? আমরা বহুদিন থেকে আপনাকে নেবার চেষ্টা করছি, দুবার আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। এবার না বললে শুনব না।

দুবার ফিরিয়ে দিয়েছি ? এত জায়গা থেকে ডাক আসে—

একটু কষ্ট করে চলুন। ওখানকার সমস্ত লোক আপনাকে দেখার জন্য, আপনার কথা শোনার জন্য উৎসুক হয়ে আছে। আমরা এখনও ঘোষণা করিনি কিন্তু মুখে মুখে ছড়িয়ে গেছে যে আমরা আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।

প্রশান্ত একটু চিন্তা করে বলে, আপনাদের যখন এত আগ্রহ, আপনাদের স্নেহের খাতিরে যেতেই হবে।

সভাসমিতির সময় নিয়ে বাংলায় একটা অদ্ভুত, সর্বজনবিদিত প্রকাশ্য ফাঁকি গড়ে উঠছে—সর্বত্র। সভা যারা ডাকে তারা হিসাব করেই আধঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা হাতে রেখে সভার সময় ঘোষণা করে, সভায় যারা আসে তারাও সেই হিসাবেই আসে।

একটা নিয়ম দাঁড়িয়ে গেছে।

বিষ্ণুপদ নামে একটি যুবক প্রশান্তকে নিতে এসেছিল। পথে তাকে প্রশান্ত বলে, এটা হল একটা রোগের উপসর্গ। যাঁরা সভা ডাকেন আর যাঁরা সভায় আসেন তাঁদের মধ্যে একটা কৃত্রিম দূরত্বের লক্ষণ। এ দূরত্ব যদ্দিন না ঘুচছে, হাজার চেষ্টা করেও ফাঁকিটা দূর করা যাবে না।

বিষ্ণুপদ মৃদু হেসে সায় দেয়।

তোমাদের টাইম ক-টায় ?

বিষ্ণুপদ পকেট থেকে একটা ছাপানো হ্যান্ডবিল তার হাতে দেয়। সব চেয়ে বড়ো হরফে তার নাম ছাপানো হয়েছে। সভার স্থান গোবিন্দ মেমোরিয়াল হল, সময় বৈকাল পাঁচটা।

বিষ্ণুপদ জানায় তারা শুধু ছাপা হ্যান্ডবিল বিলি করেনি, হাতে লিখে অনেক পোস্টারও চারিদিকে লাগিয়েছে।

সব চেয়ে বড়ো হরফে তার নাম ছাপানোর জন্য নয়,—নামের মোহ তার কেটে গেছে অনেক দিন আগেই—অনুষ্ঠানটি সফল করার জন্য এদের উৎসাহ ও প্রচেষ্টা প্রশান্তকে খুশি করে। সভায় বহুলোকের সমাবেশটাই তার কাম্য। এ রকম অনুষ্ঠানের সার্থকতার দিক থেকে তো বটেই, সেটাই প্রথম আর প্রধান কথা, তার নিজের দিক থেকেও বটে।

তার অসম্ভব খাটুনি। অল্পলোকের ছোটো সভায় বলতে দাঁড়িয়ে তার মনে হয়, এতখানি সময় লেখার পিছনে দিতে পারলে তার বক্তব্য আরও কত বেশি মানুষকে সে পড়াতে পারত।

চারটের পর ট্রেন ছোটো স্টেশনটিতে পৌঁছায়।

প্রশান্তকে অভ্যর্থনা করার জন্য কয়েকজন স্টেশনে অপেক্ষা করছিল। খানিক কথাবার্তার পর তারা সাইকেল রিকশায় গোবিন্দ মেমোরিয়াল হলের দিকে যাত্রা করে। যেতে যেতে প্রশান্ত লক্ষ করে, বেশ আঁটোসাটো ঘনবদ্ধ ছোটোখাটো শহরটি। আশেপাশে কয়েকটা কারখানার চিমনি মাথা উঁচু করে আছে।

এখন সভায় গিয়ে বসে লাভ নেই। সাড়ে পাঁচটার আগে সভার কাজ আরম্ভ হবে না, ছ-টাও বেজে যেতে পারে। গোবিন্দ মেমোরিয়াল হলটি বেশ বড়ো। ফেস্টুন ও পোস্টার দিয়ে ভালো করে সাজানো হয়েছে। হলের পিছনের দিকে ছোটো লাইব্রেরি ঘরটিতে বসে প্রশান্ত অপেক্ষা করতে করতে সভার উদ্যোক্তা দু-তিনজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে।

আধঘণ্টা পরে মাইক ফিট করার আওয়াজ কানে আসায় একটু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে, মাইক এনেছেন ?

মাইক ছাড়া কি মিটিং হয় আজকাল ?

এরা তবে সভায় বহুলোক সমাগম আশা করছে। প্রশান্ত খুশি হয়। এই তো চাই। বৃহত্তম জনতার সঙ্গে আত্মীয়তাই তো প্রগতির আসল কথা।

জনসমাবেশের কলরবের সঙ্গে বহুদিন থেকে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। পৌনে ছ-টা বাজে অথচ হলে যে বেশি লোক জমেছে লাইব্রেরি ঘরে বসে তা টের পাওয়া যায় না।

আরও কয়েক মিনিট পরে সভার কাজ আরম্ভ করার জন্য হলে এসে প্রশান্ত প্রায় স্তম্ভিত হয়ে যায়।

ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ মিলিয়ে হলে শ্রোতার সংখ্যা পঞ্চাশের বেশি হবে না। আরও বিশ-পঁচিশজন এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছে, সভার কাজ আরম্ভ হলে আসন গ্রহণ করবে।

সভার একজন উদ্যোক্তাকে সে জিজ্ঞাসা করেন, কী ব্যাপার ? একেবারেই তো লোক হয়নি ? সে জবাব দেয়, সংস্কৃতির ব্যাপারে একেবারে উদাসীন এখানকার লোক।

অথবা আপনাদের সংস্কৃতির ব্যাপারে উদাসীন ?

আমরাই তো এখানে সংস্কৃতি করি !

জবাবটা মোটেই তার পছন্দ হয় না। স্থানীয় লোক সংস্কৃতির ব্যাপারে একান্ত উদাসীন হলে এবং শুধু এরাই সংস্কৃতি করলে—কাদের নিয়ে কাদের জন্য কী সংস্কৃতি এরা করে বোঝা বড়োই কঠিন।

সভাপতির আসনে বসে সে মুষ্টিমেয় শ্রোতাদেব দিকে তাকায়। আশ্চর্য, দুর্বোধ্য লাগে ব্যাপাবটা তার কাছে। এর চেয়ে কত ছোটো জায়গায় সভায় গিয়েছে, হ্যান্ডবিল পোস্টার মাইকের সমারোহ ছাড়াই এর বিশগুণ লোক সভায় হাজির হয়েছে। সংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীন হোক—যদিও সেটা কী রকম উদাসীনতা সে কল্পনা করতে পারে না—তাঁর নামের কোনো আকর্ষণও কি এই শহরের লোকের কাছে নেই ? এ তো বিনয় বা অহংকারের কথা নয়—নামকরা সাহিত্যিকের নামের আকর্ষণ একটা স্বাভাবিক বাস্তব সত্য। যে লোকটা বই লিখে এত নাম করেছে লোকে তাকে স্বভাবতই দেখতে চায়, তার কথা শুনতে চায়। অথচ এত পোস্টার হ্যান্ডবিল সত্ত্বেও এ সভায় যত লোক এসেছে তার অর্ধেকের বেশি উদ্যোক্তা এবং সংগঠনের সঙ্গে কোনোও না কোনোভাবে যুক্ত ধরে নিলে সাধারণ শ্রোতার সংখ্যা দাঁড়ায় নামমাত্র।

প্রশান্ত একটু ঝিমিয়ে যায়, অস্বস্তিবোধ করে। এমন একটা ধাঁধায় পড়ে গেলে নিরুৎসাহ না হয়ে অস্বস্তিবোধ না করে মানুষ পারবে কেন !

অনেকটা যন্ত্রের মতো সভার কাজ চালিয়ে যায়. দেরিতে সভা আরম্ভ করার অজুহাতে প্রোগ্রাম ছেঁটে ছোটো করে দেয়, অল্পকথায় ভাষণ দিয়ে সাড়ে সাতটার মধ্যে কাজ শেষ করে ফেলে।

আটটার গাড়িতে সে ফিরে যাবে।

সাইকেল রিকশায় স্টেশনের দিকে চলতে চলতে দূর থেকে তার কানে ভেসে আসে লাউড স্পিকারের ক্ষীণ আওয়াজ। রিকশা যত এগিয়ে যায় স্টেশনের দিকে লাউড স্পিকারের বক্তৃতার আওয়াজ তত স্পষ্ট হয়।

ওখানে কী হচ্ছে ?

তাকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে যে ছেলেটি সঙ্গে যাচ্ছিল, সে বলে, একটা মিটিং হচ্ছে।

মিটিং ? কীসের মিটিং ?

দুর্ভিক্ষ, চোরাকারবার, ব্যক্তিস্বাধীনতা এই সব নিয়ে।

প্রশান্ত একটা নিশ্বাস ফেলে।

পরম স্বস্তির নিশ্বাস। না, বাস্তব হঠাৎ অবাস্তব হয়ে যায়নি, সত্য হঠাৎ ধাঁধায় পরিণত হয়নি। সব ঠিক আছে।

স্টেশনের কাছাকাছি এসে ভিড় ঠেলে রিকশা এগোতে পারে না, তাদের নেমে যেতে হয়। স্টেশনের কাছে ফাঁকা মাঠে বিরাট এক জনসমাবেশ হয়েছে, রাস্তায় পর্যন্ত ভিড় উথলে এসেছে। স্টেশনে নামবার সময় মাঠটা ফাঁকা দেখে গিয়েছিল।

প্রশান্তও ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে। বক্তৃতা শোনেন।

আপনার গাড়ির কিন্তু দেরি নেই।

পরের গাড়িতে যাব।

এদিক-ওদিক

দুজনে প্রতিবেশী, সমবয়সি এবং বন্ধু। কিন্তু জীবনটা দুজনের গতি নিয়েছে দুদিকে। মাধব মেকানিকের কাজ শিখে ঢুকেছিল মোটর-মেরামতের কারখানায়, সে সেইখানে সেই কাজেই লেগে আছে। শরৎ লেগেছিল অল্প বেতনের একটা কেরানিগিরি চাকরিতে, বিনা নোটিশে ছাঁটাই হয়ে সে দিয়েছে ছোটোখাটো একটা মনোহারি দোকান।

মাধবের মোটর-মেরামতি কারখানার কাছাকাছিই তার দোকান, তাদেরই বাড়িব দিকে যাবার গলির মোড়ে বড়ো রাস্তার উপব একটা মুদিখানার পাশে।

মুদিখানাটা বুড়ো নগেনের। দোকান খোলার সময় শরৎ ঘোষণা করেছিল আশেপাশের কাউকে আর কোনো সাধারণ বা শৌখিন জিনিস কিনতে শহরে ছুটতে হবে না, শহরতলির তার এই দোকানে কলকাতার দামে সকলে সব জিনিস পাবে।

জোর গলায় বলেছিল, সকলে পরখ কবে দ্যাখো। মাল আনার খরচ হিসেবেও যদি দুটো পযসা বেশি ধরেছি প্রমাণ করতে পারে কেউ, সকলেব সামনে নিজের কান কেটে ফেলব।

মাধব বলেছিল, কেন ? কিছু কিনতে শহরে যাওয়া-আসার খবচ নেই ? তোমার দোকানে পেলে লোকে খুশি হয়ে দু-চারপয়সা বেশি দেবে না !

শরৎ হেসে বলেছিল, ও হিসাব ভুল। কত লোককে কত ধান্ধায় শহরে যেতে হয় দেখিস না ? কাজে যাবে দরকারি জিনিসটা কিনে আনবে—নিজের আনবে অন্যের আনবে। জিনিস আনতে বেশি খরচ লাগবে কেন ?

মাধব ভেবেচিন্তে বলেছিল, তাহলে কলকাতার দরে দিলেও দামি মাল তোব দোকানে কেউ কিনবে না। শহরের বড়ো দোকান থেকে কিনবে।

দেখা যায় মাধবের কথাই ঠিক।

লোকে সাবান, চিরুনি, চা, খাতা, পেন্সিল এ সব টুকিটাকি জিনিস কেনে তার দোকান থেকে, কিন্তু একটু বেশি দামি জিনিসেব দরও জিজ্ঞাসা করে না—দু-একজন ছাড়া। চেনা লোক যাবা তাকে খুব উৎসাহ দিয়েছিল, তারাও ও সব জিনিস কলকাতা থেকে কিনে আনে।

দামি জিনিস দোকানে রাখা বন্ধ করতে হয়েছে শরৎকে।

শহরের দরে জিনিস বেচার নীতিও তাকে ছাড়তে হয়েছে।

নগেন বলেছিল, তবেই আপনি দোকান চালিয়েছেন দাদা ! শুধু মাল আনার খরচ নাকি ? শহরের বড়ো দোকানে ধারে কারবার নেই, আপনাকে ধার দিতেই হবে। আদায় করা কী ঠেলা, টের পাবেন। কিছু টাকা আটকে থাকবেই সব সময়, লগ্নি টাকার মতো। সুদ যদি না ধরেন তবে লাভ করবেন কী ?

শরৎ জোরের সঙ্গে বলেছিল, আমি কাউকে ধার দেব না, ঘবের লোককেও নয়।

বুড়ো নগেন ফোকলা মুখে হেসেছিল।

ধারে মাল বেচতে হয়েছে শরৎকে, হিসাব করে দু-চারপয়সা দাম বেশিও ধরতে হয়েছে। ধারে মাল না দিলে অর্ধেকের বেশি খদ্দের তার দোকানে আসবে না, খানিক তফাতে রসিকের দোকানে যাবে। রসিক ধারে দেবে।

চাকুরে বাবু মাসের শেষের দিকে এসে চায়ের একটা প্যাকেট চায়, প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বলে, মাসকাবারে দামটা দেব।

চায়ের প্যাকেটটা তখন তাকে ধারে দিতেই হবে। কারণ, সত্যই তার হাত খালি, শাকপাতাব দৈনিক বাজারটা ক-দিন কী দিয়ে চালাবে তাই তাকে ভাবতে হচ্ছে।

মেয়েরা ছেলেকে পাঠাচ্ছে দোকানে, ছেলে জিনিস নিয়ে বলছে, বাবা এসে দাম দেবে।

যারা চাকুরে নয়, এলোমেলোভাবে যাদের রোজগার, যাদের বেশ কিছুদিন পরে পরে থোক টাকা রোজগার, বরাবর নগদ কিনে এসে হঠাৎ কোনো কারণে সাময়িকভাবে যে নগদ কিনতে পারছে না, তাদেরও ধার দিতে হয়।

বছরখানেক দোকান চালিয়ে কাবু হয়ে পড়েছে শবৎ। যা কিছু সম্বল ছিল সব ঢেলেছে এই দোকানে, এক বছর দোকান চালিয়ে লাভ হওয়ার বদলে গেছে লোকসান।

শুধু ওই ধার দেওয়ার জন্য।

কয়েকজনের কাছে বহুকাল অনেক বাকি পড়ে আছে, চেষ্টা করে টাকা আদায় করতে পারেনি।

কানু আর নগেন দুজনেই সাবধান করে দিয়েছিল, ধারে মাল দিতেই হবে কিন্তু লোক বুঝে দিয়ো—সময়মতো হোক দেরিতে হোক, টাকাটা যেন আদায় হয়।

এক বছরে অভিজ্ঞতা জন্মেছে অনেক, কিন্তু আজও সে বুঝতে পারে না ওই লোক বুঝে ধার দেওয়ার নীতিটা কী !

কে জানে সুভদ্রা ভাণ্ডারের রসিক কোন মাপকাঠিতে লোক বুঝে ধার দিয়ে দোকান চালিয়ে লাভ কবছে।

যাদব দোতলা বাড়ির মালিক, বেশ বড়োলোকি চালে তার সংসার চলে, সে একদিন দোকানে পা দেওয়ায় কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল শরৎ।

যাদব প্রায় হুকুমের সুরে বলেছিল, একটা হিসেব খোলো আমার নামে। বাড়িতে হাজার জিনিসের দরকার, খুচখাচ পয়সা দেবার ঝঞ্ঝাট পোষায় না আমার। আমি স্লিপ পাঠাব, বিশ-ত্রিশ টাকা হলে হিসাব পাঠিয়ে দিয়ো।

উল্লসিত হয়ে উঠেছিল শরৎ। এত বড়ো একজন খদ্দেব পাওয়া সহজ ভাগ্যের কথা !

দশ-বারোদিনেই ত্রিশ টাকার উপরে উঠে গিয়েছিল যাদবের কাছে পাওনা।

শরৎ সংকোচে নিজেই গিয়েছিল হিসাব নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে টাকা মিটিয়ে দিয়ে যাদব তার উল্লাস বাড়িয়ে দিয়েছিল শতগুণ।

মনোহারী দোকান হলেও শরৎ তেল মশলা ঘি ইত্যাদি কয়েকটা মুদিয়ালি জিনিসও দোকানে রাখে। যাদব সব রকম জিনিসের জন্যই তার দোকানে স্লিপ পাঠায়।

মাসে প্রায় শ-খানেক টাকার মাল কেনার খদ্দের !

মাস তিনেক ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটাকার হিসাব দাখিল করামাত্র টাকা মিটিয়ে দিয়ে যাদব সেদিন বিরক্তি প্রকাশ করেছিল, তুমি বড়ো জ্বালাচ্ছ আমাকে। মাসে দশবার হিসাব পাঠালে অসুবিধা হয না আমার ? একেবারে মাসকাবাবে হিসাব দেবে।

আজ্ঞে ছোটো দোকান, মাল আনাতে হয়—

তবে কাজ নেই, আমি অন্য কোথাও হিসাব খুলব।

বেশ, মাসে মাসেই হিসাব দেব আপনাকে।

মাসকাবারে একশো তেইশ টাকা সাত আনা তিন পয়সার হিসাব নিয়ে হাজির হলে যাদব বলেছিল, আজ তো তোমায় টাকা দিতে পারছি না। সাত তারিখে পাবে।

জিনিসের প্রয়োজন যেন আচমকা বেড়ে যায় যাদবের সংসারে। সাত তারিখের মধ্যে দু-দফায় আড়াই সের করে পাঁচসের তেলই নিয়ে যায় যাদবের চাকর।

দুশো টাকার কাছে গিয়ে পৌঁছায় তার কাছে শরতের দোকানের পাওনা।

সাত তারিখে গিয়ে শরৎ যাদবের দেখা পায় না। চাকর জানায় বাবু বড়ো ব্যস্ত, টাকা পাঠিয়ে দেবেন।

সে টাকা আজও আদায় হয়নি !

নিজের দোতলা বাড়ি, দামি আসবাবে সাজানো বৈঠকখানা, বাড়িতে চাকর আছে, মেয়েরা সাজপোশাকে শহরতলিকে লজ্জা দিয়ে বেড়াতে যায়, সিনেমায় যায়—লোক বুঝে ধার দেবার হিসাবটা এ ক্ষেত্রে সে কী হিসাবে খাটাত ?

নগেন বলে, আমি কী ছাই জানি তোমার কাছে ধারে মাল নিচ্ছে ? ধারে কাউকে দেবে না বললে, আমি ভাবলাম নগদ নিচ্ছে বুঝি। মোর সাঁইত্রিশ টাকার পাওনা দেয়নি পাঁচ মাস।

শরৎ অবাক হয়ে বলে, মোটে সাঁইত্রিশ টাকা ?

কাজে যাওয়ার পথে দু-পয়সার নস্য কিনতে মাধব দোকানে এসেছিল। সে বলে, তোমার দ্বারা দোকান চলবে না। ভদ্দরলোকের ছেলে, চাকরি-বাকরি করোগে। এতটুকু দোকান তোমার, কী হিসেবে একজনকে তুমি দুশো টাকার মাল ধারে দিলে ? সে রাজা হোক, লাটসাহেব হোক—তোমার তো ছোটো দোকান ? ধারে এত টাকার মাল তুমি দেবে কেন ?

নগেন বলে, ঠিক কথা, ন্যায্য কথা। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট। ভাবলে যে মস্ত খদ্দের, মোটা লাভ হবে। তোমার মতো বোকাদের ঠকিয়েই ওর যত চাল, যত বড়োলোকামি।

শরৎ ম্লানমুখে বলে, তোমার সাঁইত্রিশ টাকা আদায় হয়েছে দাদা ?

অনেক কষ্টে হয়েছে। রাস্তায় পেয়ে একদিন রেগেমেগে চেঁচিয়ে আচ্ছা করে গালাগালি দিলাম। জানি তো লোক দেখানো চালটাই আসল, চাল নষ্টের ভয়ে তটস্থ। ধমক দিয়ে বললে, চেঁচাচ্ছ কেন ? আমি কী জানি তোমার দোকানে বাকি আছে ? বাড়ি ফিরেই তোমার টাকা পাঠিয়ে দেব।

ফোকলা মুখে নগেন হাসে।

পাঁচ মাসে কতবার তাগিদ দিয়েছি, বাবু জানেন না দোকানে বাকি আছে। সেই দিন সন্ধ্যাবেলা পাওনা পেয়ে গেলাম।

হাসি মুছে যায় নগেনের মুখের। বলে, তবে কিনা, মোকে জব্দ করতে চায়। অনেক বড়ো বড়ো ঝঞ্ঝাটে সময় পায় না, নইলে অ্যাদ্দিনে মোর ভারী অনিষ্ট করত।

শুধু এ রকম নয়। সুনীল চাকরি করছিল, মাসের কুড়ি-বাইশ তারিখ থেকে সে ধারে মাল নিত। যা নিলে নয় শুধু সেই রকম মাল। দোকানে বাকি যত কম হয় তারই জন্য যেন তার প্রাণপণ চেষ্টা।

পরের মাসে দু-তিন তারিখে এসে বাকি পাওনা মিটিয়ে দিত। বলত, এ মাসে তোমার কাছে আর ধারে কিছু কিনব না। তুমি বড়ো বেশি দাম ধরছ জিনিসের।

শরৎ বলত, ধারে দিতে হলে দাম দু-একপয়সা বেশি ধরতে হয়, বোঝেন তো ?

সাত-আটমাস এমনি নিয়মিতভাবে সুনীল তার দোকানে ধার করেছে, মাইনে পেয়েই মিটিয়ে দিয়েছে সব পাওনা। ছাঁটাই হবার পর কথাটা গোপন রেখে মাসকাবারে সে বলেছিল, এ মাসের মাইনে পেতে কয়েক দিন দেরি হবে।

আনায়াসেই সে আরও কয়েক দিন যাদবের কায়দায় বেশি বেশি মাল নিয়ে বাকি পাওনাটা বাড়িয়ে দিতে পারত—কয়েকটা দিন চালিয়ে দেবার মতো জোগাড় করে রাখতে পারত তেল মশলা ইত্যাদি দরকারি জিনিস।

কিন্তু সে আর এক পয়সাও বাকি কেনেনি।

বাকি টাকাটাও শোধ দিতে আজ পর্যন্ত আসেনি। ছেলেমেয়ে নিয়ে তার কী অবস্থা শরৎ জানে। তাগিদ দিতে প্রাণ চায় না। এ তো জানা কথাই যে তাগিদ দিয়ে লাভও কিছু নেই।

এমনি আরও কতজন।

কেউ হয়তো পনেরো-বিশটাকা বাকি রেখেছে। কিন্তু মাসে পাঁচ টাকার মাল কিনছে। কোনো মাসে পাঁচ টাকা ধার বেড়ে যায়, কোনো দশ মাসে পাঁচ টাকা ধার কমে যায়।

বাকি না বাড়িয়ে নিয়মিত জিনিস কিনছে। এরা না কিনলে দোকান তার বন্ধ করতে হবে।

যাদব আর তারই মতো শাঁসালো পাঁচ-ছটি খদ্দের মোটা টাকা বাকি রেখে দোকানে কেনাকাটাই প্রায় বন্ধ করেছে। দোকান তার চালু রয়েছে এই পাঁচ-দশ-বিশটাকা বাকিওলাদের জন্য।

বাকি শোধ না করতে পারার লজ্জায় ওরা নগদ দিয়ে যা কিছু কিনতে পাবে, তার দোকান থেকেই কেনে। টাকা প্রতি সে দু-পয়সা দাম বেশি ধরছে জেনেও কেনে।

রতন ধারে প্রায় পনেরো টাকার মতো। বয়স তার বিশ বছরের বেশি নয়, পাঁচজনের একটা অচল সংসার চালু রাখতে না পারলেও ধ্বংস হওয়া ঠেকিয়ে চলছে।

সে সরলভাবে বলে. আপনার ধারটা নিশ্চয় দেব শরৎদা, দু-একমাসের মধ্যে দেব। বউদি ছেঁড়া কাপড় পবে আছে আজ দেখেছি। কদ্দিন বাদে রায়বাবুদের ওই পুকুবের কোনায় পেযারা গাছে উঠেছি, বউদি এসে বললে আমায় দুটো পেয়ারা দেবে ? দেখলাম শাড়িটা ন-শো জায়গায় ছিঁড়ে গেছে—ন-শো জায়গায় সেলাই হয়েছে।

রতন দুটো সিগারেট কেনে। একটা সযত্নে পকেটে রেখে একটা ধরিয়ে জিজ্ঞাসা করে, আমার টাকা ক-টা বাকি আছে বলেই কি বউদিকে একটা শাড়ি দিতে পারছ না শরৎদা ?

এভাবে যে কথা বলে, ব্যবহার করে, পনেরোটা টাকা বাকি আদায়ের জন্য তাকে কি গাল দেওযা যায় ?

যাদবদের মতো শাঁসালো লোকদেব কাছে সে যখন দেড়শো-দুশো টাকা বাকি আদায়ের জন্য সবিনয়ে সসংকোচে ভিখারির মতো দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়, দেখা হবে না শুনেও রাগ না করে ফিরে আসে ?

দোকান বন্ধ করে সে যখন বাড়ি ফেরে, পাড়ার ঘরে ঘরে ঘুম তখন ঘনিযে এসেছে, তাব তিনটি ছেলেমেয়ে অচেতন হয়ে গেছে ঘুমে। শিবানীও হাই তুলছে ঘনঘন।

শিবানীর পরনে সত্যই ছেঁড়া কাপড়, মাধব মিছে বলেনি।

মনোহারী মনিহারি দোকান করতে তার গযনাগুলিও লেগেছে, তার শুধু ছেঁড়া শাড়ি দিয়ে লজ্জা নিবারণের সমস্যা নয়।

শিবানী বলে, এখন খাবে ?

শুকনো রুটি আর ছেঁচকি তো ? খাবখন। তুমি এতক্ষণ কী করছিলে ?

শিবানী মুখ বাঁকায়।

কী আবার করব ? ওরা খানিকক্ষণ পড়ল, তারপর খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। কারও পেট ভরে না। খালি বলে. আরেকটা রুটি দাও, একটু চিনি দাও—কোথেকে দিই বলো তো ? রোজ আমার ওপর রাগ করে ঘুমোয।

শরৎ কথা বলে না।

রমা এসেছিল, ওর সঙ্গে কড়ি খেললাম। ও বেচারাবও সময কাটে না। মাধববাবু কাজ থেকে এসে আবার বেরিয়ে যায়, মিটিং-ফিটিং করে নটা-দশটায় ফেরে। কিন্তু তবু কী হাসিখুশি মেয়েটা, রোজ রোজ এসে প্রাণ জুড়িয়ে দিয়ে যায়। ও না এলে আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যেতাম !

একেই বলে তিরস্কার। একেই বলে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়া।

মাথা ঘোরে। শরীরে বিশ্রী অস্বস্তি আর অস্থিরতা। দোকানটার প্রথম দিকে মালপত্রে ভরাট একটি জমজমাট চেহারা ছিল, আজকাল কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। অনেক রকম জিনিস টাকার অভাবে দোকানে এনে রাখা যায় না। খদ্দের ফিরিয়ে দিতে হয়।

হঠাৎ একদিন বিকালের দিকে হ্যাট কোট পরা যাদব দোকানে এসে তাকে আশ্চর্য এবং অভিভূত করে দেয়।

যাদব বলে, তুমি দুশো টাকার মতো পাবে না ? কাল সকালে গিয়ে টাকাটা নিয়ে এসো।

বুকটা ধড়াস ধড়াস করে। সেই যেন মস্ত একটা অপরাধ করেছে যাদবের কাছে, এতগুলি টাকার পাওনাদার হয়ে।

যাদব বলে, এক টিন সিগারেট দাও তো। এক পাউন্ড চা দাও। ভেজিটেবল ঘিয়ের দশ পাউন্ড টিন নেই ? আচ্ছা পাঁচ পাউন্ড টিন একটা দাও। আরও তিন-চারটে জিনিস যাদব নেয়। হাতের সুদৃশ্য চামড়ার কেসটির ভিতর থেকে একটা কাপড়ের থলি বার করে জিনিসগুলি তার মধ্যে ভরে নিয়ে চলে যায়।

বলে যায়, কাল যেয়ো—দশটা নাগাদ।

শরৎ দাঁড়িয়ে থাকে পুতুলের মতো। অচেনা একজন খদ্দের এসে নতুন চকচকে একটা দোয়ানি বাড়িয়ে দিয়ে বলে, দুপয়সার নস্যি দিন তো।

শরতের যেন চমক ভাঙে।

নগদ দামে দুপয়সার নস্যের খদ্দেরকে বিদায় করেই সে বন্ধ করে দোকান ! এগিয়ে যায় হরেনের মোটরগাড়ির মস্ত হাসপাতালটার দিকে।

প্রতিদিন কিছুক্ষণের জন্য রমা না এলে শিবানী নাকি পাগল হয়ে যেত। মাধবের সঙ্গে খানিকক্ষণ দহরম-মহরম না চালালে সেও আজ পাগল হয়ে যাবে।

কারখানায় একটা শূন্যে তোলা গাড়ির তলায় আধশোয়াব মতো বাঁকা হয়ে বসে মাধব গাড়িটার হৃৎপিণ্ডে কী একটা অপাবেশন চালাচ্ছিল।

নিশ্চয় কঠিন অপারেশন।

শরৎ ডাকতে মাধব বলে, দাঁড়া।

বলে প্রায় বিশ মিনিট নিঃশব্দে একমনে ইঞ্জিনটার চিকিৎসা চালিয়ে যেন চটেমটেই উঠে আসে।

গজগজ করতে করতে বলে, ব্যাটারা যত ধ্যাধ্যেরে পচা-মরা গাড়ি এনে দেবে—মাধব সারিয়ে দাও !

কেন, গাড়িটা তো নতুন মনে হচ্ছে।

গাড়ির বাইরেটা নতুন রং করা, ইঞ্জিনটা ঠাকুর্দার চেয়ে বুড়ো রদ্দি জিনিস।

হরেন মোটা চুরুট টানতে টানতে এসে বলে, কাল গাড়িটা ছাড়া যাবে তো মাধব ? অন্যের বেলা যাই হোক, ধীরেনবাবুকে কিন্তু চটানো যাবে না।

মাধব বলে, কালকেই ছেড়ে দেবেন গাড়ি। বলবেন গাড়িটার যেন শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করেন।

হরেন চটে বলে, কী রকম ?

মাধব বলে, মানুষ মরে গেলে ডাক্তার তাকে বাঁচাতে পারে ? তার তখন শ্রাদ্ধ করতে হয়। এ গাড়িটা মরে ভূত হয়ে গেছে।

হরেন খানিকক্ষণ কটমট করে তার দিকে চেয়ে থেকে বলে, তুমি আমাকে ডোবালে মাধব ! আমার অবস্থাটা বোঝো না কেন ?

হরেনের সিগারের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন একটানে বিড়িটা পুড়িয়ে ফেলে মাধব বলে, বুঝতে দ্যান না, তাই বুঝি না। যাকগে বাবু, কাল হপ্তা পাইনি আজ দিয়ে দিন।

শরৎ লক্ষ করে জন ত্রিশেক মিস্ত্রি কারিগর খানিক তফাতে এলোমেলোভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এমনভাবে দাঁড়িয় আছে যেন সারা সপ্তাহ কাজ করেও হপ্তা পাবার জন্য তাদের এতটুকু ব্যগ্রতা বা উগ্রতা নেই।

হরেন একবার মাধবের দিকে একবার ওদের দিকে তাকায়।

আজ বোধ হয় হবে না।

আজ চাই বাবু।

হরেন মিনিটখানেক চুপ কবে থেকে কর্মচারীকে বলে, সুধীর—এদের হপ্তা দিয়ে দাও। সেই টাকাটা থেকেই দাও।

তেলকালি মাখা হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি ছেড়ে ধুতি আর শার্ট পবে মাধব শবতের সঙ্গে রাস্তায় নামে।

বলে, দোকান ফেলে এ সময় এলি ?

শরৎ বলে, দোকান আর চালাব না। যাদববাবু ফের আজকে প্রায় দশ টাকার মাল ধাবে নিয়ে গেল।

নিয়ে গেল ? না তুই দিয়ে দিলি ?

শরৎ চুপ করে থাকে।

মাধব বলে, কাল দশটায় যেতে বলেছে তো ? কাল ছুটি আছে, আমি তোর সাথে যাব।

বেলা দশটায় যাওযার কথা ছিল, মাধব নটার আগেই শরৎকে ডেকে নিয়ে যাদবের বাড়ি যায়।

দরজা খুলে চাকর বলে, এখন বাবুর সঙ্গে দেখা হবে না।

অর্থাৎ যাদব দেখা করবে না। জানালা দিয়ে দেখা গিয়েছিল যাদব বাইরের ঘরেই বসে আছে।

মাধব কথা না বলে চাকরের পাশ কাটিযে বৈঠকখানায় ঢুকে যায়, পিছনে যায় শরৎ।

যাদব কটমট করে তাকায।

মাধব ধীরেসুস্থে একটা চেয়াব টেনে বসে বলে, ওর কাছে আমি তিনশো টাকা পাব যাদববাবু। আপনি আজ ওর দোকানের পাওনা মিটিয়ে দেবেন বলেছেন, তাই সাথে এলাম। বন্ধুকে টাকা ধার দেওয়া কী ঝকমারি কাজ বলুন দিকি ? ঘরে আমাব রেশন আনাব পযসা নেই।

যাদব একবার মাধবের দিকে, একবার শবতের দিকে তাকায়।

আজ হবে না। কাল দেব।

আজকেই চাই বাবু।

যাদব খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে উঠে ভিতরে চলে যায়। ফিরে এসে পঞ্চাশটা টাকা শরৎকে দিয়ে বলে, আজ এর বেশি দিতে পারছি না। বাকিটা সামনের সপ্তাহে দেব।

শরৎ বলে, আবার সামনের হপ্তায় ?

মাধব বলে, যাকগে। তাই দেবেন, দুজনেই আসব। বাকিটা সব একেবারে না পারেন, এমনি পঞ্চাশ-ষাট করে মিটিয়ে দেবেন কয়েক দফায়।

বাইরে গিয়ে মাধব বলে, আর কার কাছে বাকি আছে, চ ঘুরে আসি। হয়েছিস দোকানদার মানুষ, মেয়েমানুষের মতো করিস কেন বল দিকি ?

এপিঠ-ওপিঠ

সকালের ডাকে চিঠিখানা আসে।

অবনী তখন কয়েকটা টাকার সন্ধানে বেরিয়েছে। অন্যভাবে সন্ধান পাওয়া অবশ্য মস্ত একটা যদির কথা, পকেটে তাই তমালেব আরেকটা সোনার জিনিসও নিয়ে গেছে।

এমনি না পেলে ওটা বাঁধা রেখে বা বিক্রি করেই টাকা আনবে। টাকা আজ চাই-ই, নইলে ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে তাদের উপোস একেবারে বাঁধা।

টাকা না আসা পর্যন্ত যে উপোস থামবে না। কাল রাত্রি পর্যন্ত অন্যভাবে চেষ্টা করে আজ সকালে অগত্যা সোনার জিনিসটা নিয়েই বেরোতে হয়েছে অবনীর।

বেরিয়েছে বলেই কার্ডখানা তমালের হাতে পড়ে। কে কী লিখেছে দেখে এবং চিঠিখানা পড়ে খানিক অবাক হয়ে থাকার পব সেটা তমাল নিজের ভাগ্য বলে ভাবে।

এতদিন পরে নিজে থেকে রমণী ভাইকে চিঠি লিখেছে ! সংক্ষিপ্ত হলেও চিঠি ! বহুদিন তাদের কোনো খবর পায় না, তাই কুশল জানতে চেয়েছে।

তবু এ তো রমণীর যেচে লেখা চিঠি। এ চিঠি হাতে পড়লে অবনীর মনস্থির করে ফেলতে আর এক মুহূর্তও দেরি হয় না।

তাদের সকলকে টেনে নিয়ে অবনী তাব বড়োভাইয়ের বাড়িতে তুলবে। চাকবি পাওয়ার আগের দিনগুলিব অপমান আব নির্যাতন, বড়োজা বেলার ঝাঁটা মারা ব্যবহাবে রোজ তার কাঁদাকাটা, চাকরিটা পাবার পর তাদের ফোঁস করে ওঠা আর দুভাই দুজায়ের মধ্যে অকথ্য কুৎসিত ঝগড়াব পর তাদের চলে আসা--সব অবনী ভুলে যাবে।

এ চিঠি পাবার দরকার হয়নি, এভাবে রমণীর জানাবাব দরকার হয়নি যে পুবানো বিবাদ সে ভুলে গেছে কিন্তু ছোটোভাইকে ভুলে যায়নি—এমনিতেই ও সব তুচ্ছ হয়ে গেছে অবনীব কাছে।

শুধু তার জন্যে পারেনি, নইলে এক মাস আগেই সে তাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে মাথা নিচু করে ভিখারিব মতো দাদার আশ্রয়ে গিয়ে উঠত।

কাল রাত্রেও এই নিয়ে তাদের ঝগড়া হয়ে গেছে। আজ থেকে যে সুনিশ্চিত উপোস শুবু হওয়াব কথা ঠেকাবার ব্যবস্থা কবতে না পেবে শ্রান্তক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরে একটু ছেঁচকি দিয়ে শুকনো দুখানা বুটি খাবাব পব।

অবনী বলেছিল, তোমাব কেবল ফাঁকা বাহাদুরি ! মায়ের পেটের ভাই, গুরুজন, তার কাছে দু-একমাস আশ্রয় নিলে কী এমন আসে যায় ? তোমার মান ধুয়ে জল খেলে বাচ্চাদের পেট ভরবে ?

বাচ্চাদের পেট ! তার যেন পেট ভরাবার প্রয়োজন হয় না, তমালেরও নয় !

অবনী আরও বলেছিল, তোমাদের বোঝা টেনে টেনে আর কিছু করতে পারছি না। দুমাস একটু রেহাই পেলে একটা কিছু ব্যবস্থা করতে পারতাম।

সবই ঠিক কথা। কাঁহাতক আর এভাবে টানতে পারে মানুষ ? আজ আট মাসের উপর চাকরি নেই, রোজগার নাই।

কিন্তু এ অবস্থাতেও তমাল কী করে ভুলবে দীর্ঘদিন ধরে অবনীর মায়েব পেটের ভাই আর তার বউয়ের ব্যবহার, অবনী একটা চাকরি পাওয়ামাত্র ওদের সঙ্গে তাদের ব্যবহার ?

আজ বিনাদোষে হলেও সেই চাকরি খুইয়ে কী করে আবার ফিরে যাবে ওই চাকুরে ভাইয়ের বাড়ি ? বেলা যে কীভাবে মুখ বাঁকিয়ে তার দিকে তাকাবে শুধু এইটুকু ভাবতে গেলেই যে গায়ে তার বিছার কামড় লাগে !

তার চেয়ে গাছতলা ভালো। না খেয়ে মরা ভালো।

সে তাই অবনীকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যে এটা তার মানের কথা নয়। ভাইয়ে ভাইয়ে সম্পর্কটা যদি তাদের সাধারণ হত, সাধারণ স্বাভাবিকভাবে তারা আর দশটি ভাইয়ের মতো ভিন্ন হয়ে যেত, সে হত একেবারে আলাদা ব্যাপার।

কীভাবে তাদের বিচ্ছেদ হয়েছিল সেটা ভাবতে হবে। ভাই বলেই কি আর জোড়া লাগে ? গিয়ে কোনো লাভ নেই। বরং রাস্তার লোককে রমণী আশ্রয় দেবে, তাদের লাথি মেরে তাড়াবে।

রমণী না তাড়াক, বেলা নিশ্চয় ঝাঁটা মেরে দুয়ার থেকে তাদের বিদায় করে দেবে।

এ যুক্তি না মেনে পারেনি অবনী। তবু তার কথা মেনে নিয়েও ঝগড়া করেছিল।

কাবণ যুক্তি তো সে চায় না। সে উপায় চায়, রেহাই চায়, বাঁচতে চায়।

লাথি মাবুক, ঝাঁটা মাবুক, সব সয়ে সে মায়ের পেটের ভাইয়ের বাড়ি দু-চারটা মাস মাথা গুঁজে পড়ে থাকতে রাজি। কোনো দিকে আর কোনো উপায় দেখতে পাচ্ছে না।

এ চিঠি হাতে পড়লে অবনীকে আর ঠেকানো যাবে না।

তার গয়না বেচতে যেতে হয়েছে এটা দুর্ভাগ্য কিন্তু ভাগ্যে সে পিয়নের চিঠি বিলি করার সময়েই বাইরে গিয়েছে। ভাগ্যে চিঠিখানা হাতে পেয়েছে সে।

অবনীকে এ চিঠি সে দেখাবে না। যে আত্মহত্যা করতে ব্যাকুল তাকে সে উসকানি দেবে না।

অন্তরের ঝাঁঝে কান দুটি ঝাঁঝাঁ করে তমালের।

বোঝা।

তার গয়না বেচে বেচে সংসার চালাচ্ছে, তবু সেই হয়েছে অবনীর বোঝা !

দুটো পয়সা রোজগাব কবার কোনো উপায় যদি তার থাকত !

এই জ্বালা আর আপশোশ তার চিন্তাকে ধীরে ধীরে অন্যভাবে জারিয়ে আনে।

তাব রোজগাবেব উপায় ?

জোয়ানমদ্দ শিক্ষিত বোজগেরে মানুষটাব কোণঠাসা নিরুপায় হয়ে রোজগারের ফিকিরে ঘুরছে আট-নমাস---বোকা হাবা ঘরেব কোণার বউ সে—তার বোজগারের উপায় !

কচি কচি দুটো ছেলেমেয়েব মা সে, তাব রোজগারের উপায় !

শীর্ণ অপুষ্ট খোকন আর খুকুমণির লাবণ্যহীন করুণ মুখ দুখানির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না তমাল।

ওদের জন্য কিছুই করার ক্ষমতা তার নেই।

হিন্দুস্থানি এক গোয়ালা বাড়িব সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন দুধেব বালতি হাতে করে, তার কাছ থেকে ধারে এক পোয়া দুধ কিনে সে আজ ওদের খাইয়েছে। গম্ভীর মুখে দুধ নিয়ে বলেছে, বাবুকা পাশ দাম পাবে।

ঠিক হ্যায়।

ঠিক যে কিছুই নেই ও গোয়ালা তো তা জানে না। ভেবেছে, বউ পোষে, কাজেই বাবু নিশ্চয় মস্ত বাবু না হলেও অনায়াসে এক পো দুধের দাম শোধ কবার মতো বাবু নিশ্চয় !

এটুকুর বেশি তার কিছুই করার ক্ষমতা নেই।

আজ যেন প্রথম সে বোধ করে নিজের অসহায়তা আর অক্ষমতা। আজই প্রথম যেন তার হঠাৎ খেয়াল হয় যে ছাঁটাই হলেও অবনীই একা তাদের আট-নমাস খাইয়ে এসেছে, উপোস করতে

দেয়নি। তার গয়না বেচেছে এবার নিয়ে কয়েকবার—কিন্তু স্বামীরা স্ত্রীর গয়না তো মদ আর রেসের খরচেও উড়িয়ে দেয়।

সে এতটুকু সাহায্য করেনি অবনীকে !

অবনী পড়েছে বিপাকে অথচ সে চেয়েছে অবনীকে তার নিজের খুশিমতো চালাতে। আশ্রয়ের জন্য আবার বেলার দুয়ারে গিয়ে দাঁড়ানো তার কাছে মরার বাড়া অপমান বলে হয়তো তাদের বাঁচাবার জন্য অবনীর ঠিক করা একমাত্র উপায়টাই সে বাতিল করে দিতে চায়। নিজেও মরতে চায়—অবনী আর ছেলেমেয়ে দুটোকেও মারতে চায়।

ভাবতে ভাবতে কত তাড়াতাড়িই যে মনের ভাব একেবারেই বদলে যায় তমালের !

খানিক আগেও সে ভাবছিল ভাগ্যে অবনী বেরিয়েছিল, ভাগ্যে পিয়ন তার হাতে চিঠি দিয়েছে—এই ভাগ্যটাকেই বাতিল করার জন্য তমাল যেন উন্মুখ উৎসুক হয়ে থাকে।

অবনী গয়না বেচে বাজার করে বাড়ি ফেরামাত্র তার হাতে রমণীর পোস্টকার্ডটা তুলে দেয়।

তার গয়না-বেচা পয়সায় অবনী পোয়াটেক মাছ কিনে এনেছে, সেদিকে পর্যন্ত তার নজর যায় না।

পনেরো দিন পরে তারা আজ মাছ খাবে !

অবনী চিঠিটা পড়ে। পড়ে ছেঁড়া পাঞ্জাবির পকেটে গুঁজে রেখে দেয়। সারাদিন এ বিষয়ে সে কোনো কথাই বলে না।

তার গয়নাটা এবার বেচেই দিয়েছে অবনী। সেই টাকায় সে আজ এনেছে ভালো মাছ আর তরকারি, সারা হপ্তার রেশন।

অন্য কথা অনেক বলেছে। আসল কথা পকেটে রেখে দিয়েছে।

বেশ। তাই ভালো। চতুর্থ দফায় তার গয়না বিক্রি করে সামলে নিয়ে তাকেই যদি বাতিল করতে চায় অবনী—করুক !

রাত্রে শুতে যাবার সময় তাকে ডেকে বুকে নিয়ে আদর করে অবনী।

করুক !

তারপর অবনী বলে, শোনো, দাদার চিঠির মানে বুঝেছ ?

আমি কি বুঝতে পারি এ সব ?

নিজের দাদা। গুরুজন। আমি যাইনি, কিন্তু কারও কাছে নিশ্চয় শুনেছে আমার দুরবস্থার কথা। তাই এই চিঠিখানা না লিখে থাকতে পারেনি। ভাই মরে যাবে—বড়োভাই গুরুজন কখনও তা সইতে পারে ?

তাহলে কালকেই আমরা ওবাড়ি যাচ্ছি ?

না। ক-টা দিন কোনো রকমে চালিয়ে মাসকাবারে যাব। মাইনের মোটা টাকাটা হাতে থাকবে, দাদা খুশিই হবেন আমরা গেলে।

অবনীর সিদ্ধান্ত মেনে নেবার পর আর কিছুই বদলায় না। হঠাৎ কেমন অর্থহীন হয়ে যায় ঝিমানো নিস্তেজ জীবনটা।

দিনের পর দিন চাকরি খুঁজতে বার হওয়া, এভাবে ওভাবে কিছু খুচরো রোজগারের চেষ্টা করা আর একেবারে অচল হলে তমালের গয়নায় হাত দেওয়া, যেটুকু না হলে বাঁচাই যায় না সেটুকু ছাড়া সব কিছু প্রয়োজন বাতিল করে দেওয়া—এ কী জীবন ?

তবু কী যেন একটা ছিল ওইভাবে প্রাণপণ করে কোনো রকমে টিঁকে থাকা আর আশা করে দিন কাটানোর মধ্যে, তিতো হলেও একটা স্বাদ ছিল জীবনের—হঠাৎ যেন সেই কটু বিশ্রী স্বাদটুকু পর্যন্ত চলে গিয়ে ভোঁতা অর্থহীন হয়ে গেছে বেঁচে থাকা।

আজ মাসের তেইশ না চব্বিশ তারিখ কে জানে। মাসকাবারের বেশি দেরি নেই।

মাসকাবারে এই অসম্ভব লড়াই শেষ করে তারা গিয়ে উঠবে রমণীর আশ্রয়ে।

বাঁচার লড়াই সেখানেও শেষ হয়ে যাবে না। কিন্তু বেঁচে থাকার মানে যেন ফুরিয়ে গেছে আজ থেকেই।

এখানে থেকে নিজেদের বোঝা নিজেরা বয়ে মরে গেলে তার মধ্যে এতটুকু গৌরব না থাক বাঁচার জন্য লড়াই করতে করতে মরে যাবার মানেটুকু থাকত জীবনের।

অবনী বলে, কেন এও তো লড়াই। দরকার হয়েছে নিচু হয়ে অপমান সইতে যাচ্ছি।

অন্যভাবে নিচু হও না, অপমান সও না ? চলো বস্তির একটা সস্তা ঘরে চলে যাই। তুমি কুলি খাটবে, আমি ঝি-গিরি করব।

পাশের বাড়ি থেকে চেয়ে আনা খবরের কাগজটা থেকে মুখ তুলে অবনী একটু হাসে। বলে, আসলে তোমার কী হয়েছে জানো ? বউদির কাছে কী করে নত হবে ভেবে তোমার দম আটকাচ্ছে। তুমি ঝি-গিরি করতে পারবে, সব কিছু সইতে পারবে—শুধু জায়ের কাছে মান খোয়াতে পারবে না।

ছেঁচকি রাঁধার জন্য কুমড়োর টুকরোটা কুচিকুচি করে কাটতে কাটতে তমাল বলে, কে জানে। হয়তো তাই হবে। আমার মাথার ঠিক নেই, কিছুই বুঝতে পারছি না। তাই তো রাজি হলাম। শেষকালে নিজের সস্তা একটু মানের জন্য তোমাদের মারব !

অবনী তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে, অত ভেবো না। আমরা কি চিরকালের জন্য গলগ্রহ হতে যাচ্ছি ? দুদিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। দাদাও এটা বোঝে নইলে নিজে থেকে চিঠি লিখত ?

তমাল একটু ভেবে বলে, তুমি কি চিঠি লিখে জানাবে, না নিজে একদিন দেখা করতে যাবে ?

আমি কিছুই করব না। দোসরা তারিখে আমরা সবাই মিলে একেবারে গিয়ে উঠব।

খবর না দিয়ে ?

অবনী সায় দেয়। বলে, মুখ বুজে থাকো, বুঝলে ? কাউকে কিছু জানিয়ে দরকার নেই। বাড়িওয়ালা টের পেলে কিন্তু হাঙ্গামা করবে—সব মাটি হয়ে যাবে।

তার মানেই তারা চোরের মতো পালিয়ে যাবে। এখান থেকে চোরের মতো পালিয়ে গিয়ে চোরের মতোই আপনজনের বাড়িতে গিয়ে উঠবে।

এতদিনে জীবনে খাঁটি বিতৃষ্ণা জন্মে যায় তমালের।

দোসরা সকালে সে জিজ্ঞাসা করে, কখন যাবে ?

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে যাবে ! কতই যেন সমারোহ তাদের দুপুরের খাওয়া-দাওয়ায় !

পাশের ঘরের মহিম মাইনে পেয়েছে পয়লা তারিখে। সকালে বাজারে গিয়ে মাসের শেষের দিকের তুলনায় সে যেন সমস্ত বাজারটাই কিনে এনেছে মনে হয়। আধসের কাটা মাছ এনেছে, দুবেলাই আজ ওরা মাছ খাবে।

সাতজনে খাবে। তবু তমালের মনে হয়, যেতেই যখন হবে, সকালবেলা চলে গেলেই ভালো হত। কী রাঁধবে ভেবে চোখে জল আসত না। ছ্যাঁচরামি করে ভাসুরের ঘাড়ে গিয়ে ওঠার বিড়ম্বনায় চোখে যদি জল আসে, খেয়ে গেলেও আসবে না খেয়ে গেলেও আসবে।

তাই, বেলা নটা নাগাদ বাড়ির সামনে ভাড়া গাড়িটা দাঁড়াতে দেখে এবং সেই গাড়ি থেকে রমণী ও বেলাদের নামতে দেখে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে তাকে ভাবতে হয়, ভাগ্যে সকালবেলাই তারা বেরিয়ে পড়েনি।

মাথা ঘুরে গেছে তমালের। চিঠির জবাব না পেয়ে রমণী সপবিবারে তাদের মান ভাঙাতে এসেছে ! অবনীর অনুমান যদি সত্যি হয়, রমণী যদি জেনে থাকে তাদের চরম দুরবস্থার কথা। হয়তো তাহলে তাদের নিয়ে যেতেই এসেছে।

কিন্তু কী বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে ওদের সকলের ?

কী রকম সসংকোচে স্খলিতপদে বাড়িতে ঢুকছে ?

রমণীর হাতে ছিল একটা সুটকেশ, ছেলেমেয়েদের হাতে তিনটি ভর্তি থলি। সেগুলি বারান্দায় নামিয়ে রেখে তারা ঘরে ঢোকে।

অবনী রমণীকে বলে—দাদা বসুন।

তমাল বেলাকে বলে, বসুন দিদি।

তারা চৌকিতে বসে। দেহে যেন প্রাণ নেই এমনিভাবে বসে। ছেলেমেযেবা মাদুরে বসে আড়ষ্টভাবে।

আড়ষ্টতা তমালদেরও এসেছে। ভাইয়ের দুববস্থার খবর জেনে নিজেবাই তাদেব নিতে এসেছে—এই আশার ঝলক প্রায় মিলিয়ে গিয়েছে। তাদের অবস্থা জানলে এভাবে সবাই মিলে কী আব তাদের নিতে আসত !

রমণী বলে, আমবা—

এটুকু বলেই থেমে যায়।

অবনী বলে, তাই বলছিলাম। এমন হঠাৎ—?

রমণী হঠাৎ মুখ তুলে বলে, তোমাব কাছে কিছুদিন থাকতে এসেছি। এক বছর চাকবি নেই, অসুখে ভুগছি, দিন আর চলে না, তাই—

নতমুখী বেলার দিকে চেয়ে তমাল হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না !

পাসফেল

খবরের কাগজে খবর বেবিয়েছে যে একটি ছেলে আত্মহত্যা করার জন্য বিষ খেয়েছিল, এখন সংকটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে আছে। ছেলেটি আই এ পরীক্ষা দিয়েছিল। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবার কয়েক দিন পরে সে বিষ খায়।

নীরেন আর বিমল একসঙ্গে পরীক্ষার ফল জানতে যায়। এক কলেজ থেকে পরীক্ষা না দিলেও দুজনে তারা এক পাড়াতে থাকে। ম্যাট্রিক তারা দিয়েছিল এক স্কুল থেকেই, এক কলেজে দুজনে সিট পায়নি।

পাসের কৃতিত্বে অনেক তারতম্য ছিল দুজনের। নীরেন খুব ভালোভাবে পাস করেছিল। বিমলের ফলটা সে রকম হয়নি।

এবার কী হয়েছে কে জানে ! যে রেটে ছাত্রদের ফেল করিয়েছে ভাগ্যবিধাতারা ! পাসের পার্সেন্টেজের খ... শুনে পিলে চমকে গিয়েছিল নীরেনেরও।

কে জানে এই জন্যেই এবার প্রাণেশ একটু দমে গিয়েছে কিনা, যে রকম আগ্রহ নিয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে ছেলের সঙ্গে ম্যাট্রিকের রেজাল্ট জানতে ছুটেছিল, এবার আর তার সে রকম কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি।

একটু আশ্চর্যই হয়ে গিয়েছে নীরেন। বাপ যে কীভাবে তাকে দুবছর কলেজে পড়িয়েছে, পরীক্ষার খরচ জুগিয়েছে, সেটা তার অজানা নয়। মা-র গয়না বিসর্জন দিতে হয়েছে তাকে পড়িয়ে পাস করাবার জন্য।

অথচ এবার যেন পরীক্ষার ফলাফল জানবার জন্য তেমন ব্যাকুলতা তার নেই। আগ্রহ আর উৎকণ্ঠার অবশ্য অভাব নেই, ছেলের পাসফেলের খবর জানা সম্পর্কে তার পক্ষে উদাসীন হওয়া সম্ভব নয় কিন্তু কেমন যেন স্তিমিত, নিস্তেজ ভাব।

শুধু প্রাণেশের নয়। বাড়ির সকলেরই ব্যাকুলতা যেন এবার অনেক কম। একটু চিন্তিত গম্ভীর ভাব সকলের।

বিমল বলে, পাসের পার্সেন্টেজ জেনে ভড়কে গেছে। এত ছেলে কচুকাটা হয়েছে, তুই যদি না বাদ গিয়ে থাকিস ! আমাদের বাড়িতে তো ধরেই রেখেছে আমি এবার নির্ঘাত কুপোকাত।

তুই আবার যা অসুখে ভুগলি।

বিমলের ফেল করার সম্ভাবনার কথা ভেবে নীরেন এবাব বেশ একটু ভড়কে যায়। এতক্ষণ এ দিকটা তার খেয়াল হয়নি। বিমলের সঙ্গে আসা তার উচিত হয়নি। যে রকম অল্প ছেলে এবার পাস করেছে, তাতে বিমলের এবার সত্যই পাস করার আশা কম। যদি দেখা যায় সে পাস করেছে আর ও পারেনি, একসঙ্গে বাড়ি ফিরতে কী বিশ্রী লাগবে দুজনেরই !

নিজের পাসের খবর জেনেও খুশি হবার উপায় থাকবে না।

দেখা যায় অনুমান তার মিথ্যে হয়নি। সে পাস করেছে, বিমল করেছে ফেল।

মুখখানা ম্লান করে রাখতে হয় বিমলকে। আরও অনেকে যারা রেজাল্ট জানতে এসেছিল, ছাত্রছাত্রী এবং তাদের আত্মীয়বন্ধু, তাদেরও কারও মুখে যেন উল্লাসের ছাপ পড়েনি। নীরেনের মতো

যে ক-জন সুখবর জেনেছে তাদের সকলের সঙ্গেই যে বিমলের মতো ফেল করা বন্ধু আছে তা নয় কিন্তু এত বেশি মুখে ক্ষোভ ও বেদনা ফুটেছে যে দু-চারটি মুখের আনন্দের জ্যোতি হারিয়ে গেছে তার আড়ালে। পাস যারা করেছে তারাও এত ফেল কবা ছেলেমেয়ের মধ্যে অস্বস্তিবোধ করছে বইকী !

বিমল একটু হাসে। হাসি তো নয়, যেন প্রাণের জ্বালার একটা ঝলক।

বাস্‌। স্টুডেন্ট লাইফ খতম হয়ে গেল।

আরেকবার—?

খেপেছিস ? এমন জানলে কলেজেই ভর্তি হতাম না। পড়ার নামে দুবছর সকলের রক্ত শুষেছি। কেউ যদি বাদ যায়নি, সবাইকে ভুগতে হয়েছে। বাচ্চা বোনটা তো মরেই গেল। আমার কলেজে পড়ার চাপ না থাকলে মরত না, নিশ্চয় মরত না।

নীরেন ভয় পেয়ে যায়। যা ভেবেছিল ঠিক তাই হল। বন্ধুর বিবাট ও বিকট ব্যর্থতার আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় প্রথম ধাক্কাটা এখন তাকেই সামলাতে হবে।

সে কাতরভাবে বলে, এতটা বাড়াস নে ভাই, এত ছেলে তো ফেল করেছে। একবার ফেল করলে কী হয় ?

পড়াশোনা জন্মের মতো খতম হয়। দুটো বছর সকলের আর নিজেব প্রাণপাত কষ্ট মাঠে মারা যায়। পাস করলে পড়তাম। কোনোদিকে তাকাতাম না। রাত্রে বাবা ঘুমোন কি না, মা-র হার্ট ক্ষয় হচ্ছে কি না, ভাইবোনেরা খেতে পরতে পাচ্ছে কি না, কিচ্ছু চেয়ে দেখতাম না। কিন্তু এত করেও যখন ফেল করেছি, এ তামাশার মধ্যে আমি আর নেই।

বিমলদের বাড়িটা আগে পড়ে। বাড়ির কাছাকাছি এসে বিমল বলে, মরি বাঁচি কবে বাবা আরেকটা চান্স আমায় দেবেন। নিজেই হয়তো বলবেন, এত টাকা গেল, সময় গেল, এনার্জি গেল, আরেকটা বছর চেষ্টা করেই দ্যাখো। নইলে তো সবটাই লোকসান। কিন্তু আমি আব পড়ছি না। এ জুয়াখেলায় চান্স নিতে আমি রাজি নই।

নীরেন চুপ করে থাকে। অস্বস্তিবোধ করতে করতে এতক্ষণে তার মনে হতে থাকে যে পাস করে সে যেন সত্যই নৈতিক আর সামাজিক একটা অপরাধ করে বসেছে। মানুষের জীবন নিয়ে ভাগ্যের খেলায় জুয়া আর জুয়াচুরিতে জিতে গেছে।

বাড়ির সামনে এসে বিমল বলে, এক মিনিটের জন্য আয়। খবরটা জানিয়ে যা।

না ভাই। আজ নয়।

কিন্তু বিমল এক রকম জোর করেই নীরেনকে বাড়িতে ধরে নিয়ে যায়। সাগুর সসপ্যান উনুন থেকে নামিয়ে রান্নাঘর থেকে বিমলের মা, আদ্দেক সাবান মাখা ছেঁড়া ভিজা শাড়িটা তাড়াতাড়ি শতজীর্ণ ভিজা শেমিজটার উপরে জড়িয়ে ফাঁকা কলতলা থেকে বিমলের সতেরো মাস বয়সের বড়ো অবিবাহিতা দিদি এবং এদিক-ওদিক থেকে বিমলের ভাইবোন আর বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটেদের দু-চারজন মেয়ে-পুরুষ এসে তাদের ঘিরে দাঁড়ায়।

বিমল বলে, আমি ফেল করেছি না। নীরেন পাস করেছে।

ভূপেন তিন দিন জ্বরে শয্যাগত ছিল। সে ছেলের গলার আওয়াজটাই শুনতে পেয়েছিল, কথা বুঝতে পারেনি।

চেঁচিয়ে বলে, বিমল ফিরেছে নাকি ? ফেল করেছে তো ?

বিমলের সতেরো মাস বয়সের বড়োদিদি, বিমলের কলেজে পড়ার খরচ জোগাবার অজুহাতে যার বিয়ে স্থগিত রেখে আসা হয়েছে এ পর্যন্ত, সে নীরেনকে বলে, তুমি পাস করেছ ? আমাদের খুশির সীমা রইল না। খাইয়ে দিতে হবে কিন্তু বলে রাখলাম। বিমলটা ফেল করেছে তাতে—

ঘরের ভিতর থেকে ভূপেন জ্বরাক্রান্ত রুগ্‌ণ ক্ষীণ শরীরের সবটুকু জোর খাটিয়ে আবার চেঁচিয়ে বলে, বিমল ফিরে এসেছে না ? ফেল করেছে তো ?

বিমলের মা তাকে খবর জানাতে ভিতরে যায়। ফেল করা অভিমানী ছেলের সঙ্গে যেন বুঝে শুনে কথা বলে, এ বিষয়ে তাকে সাবধান করে দিতে যায়।

বিমলের দিদি নীরেনকে বলে, বিমলটা ফেল করেছে তাতে আর কী হয়েছে বলো ? অমন ঘরে ঘরেই তো ফেল করেছে। ফেলটাই যখন বেশির ভাগ ছেলে করেছে তখন ফেল করাতে লজ্জার কী আছে ! তুমি বরং বাড়ি চলে যাও। সবাই তোমার পাসের খবর জানতে উতলা হয়ে আছে। মাসিমাকে বলো যেন মিষ্টি আনিয়ে রাখেন।

বিমল বলে, আমায় সান্ত্বনা দিতে পাসফেল সব সমান করে দিলি যে দিদি !

না, সমান কখনও হয় ? বলছি আজকাল ফেল করাটাও দোষ নয়, লজ্জারও নয়।

বিমলের মা বলে, না পারলে উপায় কী।

এ বাড়ির অন্য ভাড়াটে কমলবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে বিমলের দিদির খুব ভাব আছে, সে সমর্থনের সুরে বলে, তা নয়তো কী ? আমার ভাই আর ভাগনে দুজনে ফেল করেছে।

সকলে সহজ করে দিতে চায় বিমলের ব্যর্থতার ক্ষোভ, মুছে নিতে চায় তার প্রাণের জ্বালা। তার মধ্যেই ফুটে বেরোয় সকলের ভয় আর উদ্‌বেগ। বিমল চিরদিন বড়ো অভিমানী ছেলে, চিরদিন একরোখা। ফেল করার প্রতিক্রিয়ায় সে এখন কী করে বসে এটাই দাঁড়িয়েছে সকলের সবচেয়ে বড়ো দুর্ভাবনা।

আরেকবার আরও জোরের সঙ্গে নিজেকে অপরাধী মনে হয় নীরেনের। একজনেরও এ পরীক্ষায় পাস করা উচিত হয়নি। সামান্য কিছু ছেলে পাস করেছে বলেই না বিমলের মতো গাদা গাদা ছেলের ফেল করাটা দাঁড়িয়েছে ফেল করায় !

টলতে টলতে বিছানা ছেড়ে উঠে এসে ভূপেন দরজা ধরে দাঁড়ায়। নীরেনকে সে চোখেও দেখতে পায় না—সে পরের ছেলে, যদিও প্রাণেশ তার অনেক দিনের বন্ধু এবং নীরেন সেই বন্ধুর ছেলে।

সকলে মুখের দিকে তাকায়, কেউ কিছু বলার আগেই শান্ত গম্ভীর গলায় বিমলের বাবা বলে, বিমল ফেল করেছিস তো ? বেশ করেছিস !

বৈঠকখানা বলে কিছু নেই। বাইরের সরু রোয়াকে দাঁড়িয়ে প্রাণেশ একজন মাঝবয়সি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিল। তারই আপিসের সুজনবাবু।

তাকে দেখে নীরেন একটু আশ্চর্য হয়ে যায়। প্রাণেশ যে আপিস যায়নি তার মানে বোঝা কঠিন নয়, ছেলের পরীক্ষার খবরটা সদ্য সদ্য জানার জন্য একটা দিন আপিস কামাই করছে। কিন্তু সুজনও আপিস কামাই করে তার বাবার সঙ্গে গল্প জুড়েছে কেন ?

সুজন প্রশ্ন করে, কী খবর হে ?

একা বাড়ির কাছে এসে এতক্ষণে নীরেন মুখে একটু হাসিখুশি ভাব আনতে পেরেছিল পাস করার আনন্দের স্বাদ পাচ্ছিল। সুজনের প্রশ্নে তার মুখ হাসিতে ভরে যায়।

পাস করেছি।

কী রকম পাস করেছে শুনে নিয়ে সুজন বলে, বাঃ ! বাহাদুর ছেলে ! এই ফেলের বাজারে এত ভালোভাবে পাস করা তো সোজা ব্যাপার নয় !

প্রশংসার লজ্জায় বিমল মাথা নামায়। এতক্ষণে সে প্রথম অনুভব করতে পেরেছে পরীক্ষা পাসের রোমাঞ্চ—দুটি বছর গরিবের ছেলের প্রাণপাত কষ্ট করে সফল হওয়ার উত্তেজক সুখ।

বিমল ফেল করে শুধু তাকে দমিয়ে রাখেনি এতক্ষণ, কেমন হতাশায় প্রাণ ভরে দিয়েছিল। আশা আর স্বপ্নে আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ভবিষ্যৎ।

কিন্তু প্রাণেশ কিছু বলে না কেন ? প্রাণের হাসি ও গর্বে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না কেন ?

বিমল পাস করতে পারেনি বাবা।

প্রাণেশ আপশোশ করে না, সংক্ষেপে বলে, পারেনি ? পাস করেই বা কী করত।

বাপের মন্তব্য শুনে নীরেন থ বনে যায়। যে ছেলে সদ্য সদ্য ভালোভাবে পরীক্ষা পাসের সুসংবাদ নিয়ে এসেছে তাকে এমন কথা শোনানো ! বিমলের ফেল করা আর ছেলের পাস করা ব্যাপারটাই যেন বিশেষ কোনো মূল্য নেই প্রাণেশের কাছে।

অথচ তাকে পাস করানোর জন্য সে গায়ের রক্ত জল করেছে।

সুজনের কাছে পেলেও বাপের কাছে ঠিকমতো অভিনন্দন না পেয়ে নীরেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই ভিতরে যায়। সেখানে অবশ্য ত'র অভ্যর্থনা জোটে দিগ্‌বিজয়ীর মতোই—ছোটো ভাইবোনেদের কাছে।

সকলে তারা হইহই চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। তেরো বছরের বোন রেখা উঠানে গিয়ে চেঁচিয়ে উপর তলায় খবর পাঠিয়ে দেয়, বকুলদি ! ও বকুলদি ! দাদা পাস করেছে !

এক মিনিটের মধ্যে উপরতলার ভাড়াটে দীনেশের মেয়ে বকুল নেমে আসে। এবার সে ম্যাট্রিক দিয়েছে।

হাসিমুখে হাতটা নীরেনের দিকে বাড়িয়ে বলে, ছুঁয়ে দাও, পাসের ছোঁয়াচ লাগিয়ে দাও। ছোঁয়া লেগে আমিও যদি উতরে যাই।

মা এতক্ষণ কথা বলেনি ! তার মুখের হাসি আর চোখের গর্বভরা চাউনিতেই নীরেনের প্রাণ ভরে গিয়েছিল। তবু সে অনুযোগ দিয়ে বলে, তুমি তো কিছু বললে না মা ?

কী আবার বলব ? আমি জানতাম তুই পাস করবি। আমার গয়না ধার নিয়েছিস, পাস করে শোধ দিবি না !

সকলের সামনে তার গয়না বিক্রির কথা বলায় নীরেন ক্ষুব্ধ হয়। সত্য সত্যই একদিন সে কি শোধ দেবে না মায়ের গয়না, নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে নিতে পারলে মায়ের সুখের ব্যবস্থা করবে না সকলের আগে ? আজকের বিশেষ দিনটিতেও গয়না দিতে হওয়ার কথাটা মা পর্যন্ত ভুলতে পারে না।

যেটুকু আনন্দ আর উত্তেজনা জেগেছিল বাড়িতে তার পাস করার খবরে, এত কষ্টে তাকে পাস করানোর জন্যে, কত তাড়াতাড়িই সেটা ঝিমিয়ে নিস্তেজ হয়ে এসে একেবারে ফুরিয়ে যায় ! নীরেন ভেবেছিল, প্রাণেশ ভেতরে এলে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে একচোট জল্পনা-কল্পনা চলবে। কিন্তু প্রাণেশ ঘরে এসে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ে, ছেলের সম্পর্কে তার কথা বলবার উৎসাহই আর দেখা যায় না।

তার মা বলে, সুজনবাবু কী বলল ? মাইনে বাড়িয়ে দেবে ?

প্রাণেশ বলে, আজ তো শুধু টোকেন স্ট্রাইক হল। এরপর কী হয় দেখা যাক।

তাই বটে ! পাসফেলের চিন্তায় মশগুল হয়ে থেকে নীরেন ভুলেই গিয়েছিল যে তার রেজাল্ট জানার আগ্রহে প্রাণেশ আপিস কামাই করেনি, আজ তাদের আপিসে স্ট্রাইক।

কিন্তু তাই বলে তার বিষয়ে কথা বলা কি বারণ ? আজও শুধু দেনা আর সংসারের অভাব অনটনের কথাই হবে দুজনের মধ্যে ? রেখা আজ সকালেও কান্নাকাটি করেছে, তার একটাও আস্ত জামা নেই। মুদি দোকানে কিছু টাকা না দিলে এবার হয়তো গলায় গামছা দিয়ে অপমান করবে,

মাসকাবারে একটা পাঞ্জাবি না করলে আর আপিস করা সম্ভব হবে না প্রাণেশের—আজও চলবে চিরদিনের এই একই কথার পুনরাবৃত্তি ?

নীরেন নিজেই বলে জানো, বাড়িতে একটু হেলপ পেলে আমি হয়তো প্লেস বাগাতে পারতাম। নিজে নিজে পড়ে হয় না।

প্রাণেশ আর নীরেনের মা কথা বন্ধ করে এক মুহূর্ত ছেলের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। দুজনেই নিশ্বাস ফেলে একসঙ্গে।

অভিমান পাক দিয়ে ওঠে নীবেনেব মধ্যে। এদের যখন আগ্রহ নেই, থাক। যার আগ্রহ আছে তার সঙ্গেই আলোচনা করা যাক আজ পাস করাব মধ্যে তার কোন ভবিষ্যৎ সূচিত হল।

উপরে গিয়ে সে বকুলের সঙ্গে কথা বলে। বকুল সাগ্রহে তার কথা শোনে। বি এ-তে সে আবও ভালো বেজাল্ট করবে। এবার আরেকটু শক্ত হবে, লোককে বুঝিয়ে দেবে যে উঁচুদিকের পরীক্ষায় কোনো ছেলে যদি ভালো রেজাল্ট কবতে চায় সংসারের দশটা বাজে কাজের ঝামেলা তার ঘাড়ে চাপলে চলে না।

বকুল বলে সত্যি।

বিকালে নীরেন পাড়ার চেনা লোকেব বাড়িতে যায়। যে বাড়ি থেকে কেউ পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেছে সে বাড়ি বাদ দিয়ে। পরের দিনটা আত্মীয়স্বজনের বাড়ি ঘুরে কাটিয়ে দেয়। বাড়িতে যে উদাসীনতা তাকে ব্যথিত করেছিল, সেটা কেটে যায় বাইরের মানুষের সাদর অভিনন্দনে।

ট্রামবাসে‌র খরচের জন্য একটা টাকা চাওয়ায় প্রাণেশ যে কড়া কথাটা বলেছিল তার দুঃখও তলিয়ে যায় দশজনেব প্রশংসা শুনে এবং দশজনকে নিজের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা শুনিয়ে।

দিন তিনেক পরে প্রাণেশ তাকে বলে, তুমি বড়ো হয়েছ, সংসারের কথাটাও এবার তোমার একটু ভাবতে হয়। কী দিনকাল পড়েছে বুঝতেই পাবো।

এটা কীসের ভূমিকা বুঝতে না পেরে নীবেন চুপ করে থাকে।

প্রাণেশ বলে, বিমল চাকরির চেষ্টা করছে। তোমারও এবার রোজগারের চেষ্টা দেখতে হবে, নইলে আব চলে না।

আর পড়াবে না আমায় ?—আর্তনাদেব মতো শোনায় নীরেনের কথাটা।

কোত্থেকে পড়াব ? আই এ পড়াতেই দেনা করেছি, তোমার মায়ের গয়না বেচেছি। বি এ পড়াবার ক্ষমতা কী আছে আমার ?

মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয় নীরেনেব। জগৎ হয়ে যায় অন্ধকার, ভবিষ্যৎ জীবন হয়ে যায় অর্থহীন।

ঘরের কোণে তার পড়ার টেবিলটির সামনে চুপচাপ বসে সে কাটিয়ে দেয়।

বিকেলে বকুল এসে সব শুনে বলে, সর্বনাশ। তবে কী হবে ?

তার প্রশ্নের জবাব দিতেই যেন রাত্রে নীরেন বিষ খায়।

নীরেনের আত্মহত্যার জন্য বিষ খেয়ে হাসপাতালে যাওয়ার খববটাই খবরের কাগজে বেরিয়েছে। পবীক্ষার ফল বার হবার তিনদিন পরে যে সে বিষ খায় তারও উল্লেখ আছে খবরে। কিন্তু নীরেন যে ফেল করেনি, পরীক্ষায় খুব ভালোভাবে পাস করেছিল—এটা খবরে লেখা ছিল না !

কলহান্তরিত

একটা মেয়েলি কলহের পরিণামে এমন সংকট সৃষ্টি হতে পারে ? তিনশো লোকের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা ভেস্তে যেতে বসে ? এ যেন কল্পনা করা যায় না।

তিনশো মানুষ আজ কতকাল ভাগ হয়ে আছে তিন ভাগে, তিনটি ইউনিয়নে। এতকাল পরে যদিও বা দেখা দিয়েছে তিনটে ইউনিয়ন একটা হয়ে যাবার সম্ভাবনা, দুজন স্ত্রীলোকের ঝগড়া আবার সব নষ্ট করে দিতে বসেছে।

গোকুলের সাথিরা হাসবে না কাঁদবে ভেবে না পেয়ে শুধু বলে, কী আপশোশ ! কী আপশোশ !

মালিকপক্ষ আর দীনেশেরা কয়েকজন হাঁপ ছেড়ে বলে, বাঁচা গেল। লাগ বাবা রাবণ বিভীষণ, আরও জোরসে লাগ !

গোকুলদের এবং দীনেশদের ইউনিয়ন দুটি বেসরকারি। এ দুটি ইউনিয়নের জন্যই অবশ্য সম্ভব হয়েছে এবং টিকে আছে মালিকপক্ষের নিয়ন্ত্রিত আইনসম্মত তৃতীয় ইউনিয়নটি। সকলেই জানে যে বেসরকারি ইউনিয়ন দুটি কোনো রকমে মিলে গেলেই ইউনিয়ন দাঁড়িয়ে যায় একটা—কর্তাদের গড়া লোক দেখানো ফাঁকির বদলে কর্মীদের নিজেদের আইনসম্মত ইউনিয়ন।

দীনেশ মিল চাইত কিন্তু মিলতে রাজি হত না। সে বলত, বেশ তো তোমাদের ইউনিয়নটা ভেঙে দাও। আমাদের সঙ্গে ভিড়ে পড়ো।

কিন্তু এ তো জানাই আছে যে এটা বাজে কথা। এভাবে ত্রিভুজ ভেঙে সরলরেখা করা গেলে অবশ্য গোকুলদের কোনো আপত্তি ছিল না। দীনেশরা ইউনিয়ন চালাবে মানেই সেটা হবে কর্তাদেরই বশংবদ ইউনিয়ন, এখনকার মতো সোজাসুজি আইনসম্মত ইউনিয়নটা দখল করে থাকার বদলে ওভাবে বশে রাখতে পেলে কর্তারা খুশিই হবে।

তবু, তাতেও আপত্তি ছিল না, কর্মীরা যদি একসাথে দাবিদাওয়া নিয়ে লড়াই করার সুযোগ পেত। যতই পিছিয়ে থাক সে রকম অচেতন তো আর নয় মানুষগুলি আজ।

কিন্তু সে সুযোগ জুটবে না।

তেমন দেখলে দীনেশরা ফাটল ধরিয়ে দেবে, আরেকটা বেসরকারি ইউনিয়ন গড়ে আসল ইউনিয়ন ফিরিয়ে দেবে কর্তাদের দখলে।

সার হবে শুধু গোকুলদের ইউনিয়নটা ভেঙে দেওয়া ! দীনেশ কাঁচা-পাকা চুলে হাত বুলোতে বুলোতে মুচকি হেসে হরেনকে বলত, গোকুল শালারা বোঝে ছাই। এ দেশটা কি সোভিয়েট হয়ে গেছে, খাওয়া-পরার ভাবনা নেই ? এ দেশে যে করে খেতে হবে ব্যাটারা তাই ভুলে মেরে দিয়েছে। তুই নিজে যদি নাই বাঁচলি তোর বাপের নাম কীসে থাকে রে বাবা !

হরেন জোয়ান মানুষ, একটু গম্ভীর আর বড়োই মেজাজি। সব কথায় সায় দিতে পারত না, মুচকি হাসিতেও নয়। গভীর আপশোশের সঙ্গে বলত, সত্যি বড়ো অভাগা দেশটা।

তার মানে দীনেশ বুঝত অন্য রকম।

একটু গোঁয়ার একটু ভোঁতা কিন্তু সাদাসিধে সরল মানুষটা। ঘোরপ্যাঁচ সে তলিয়ে বুঝত না, মাথাও ঘামাত না। ইউনিয়নের প্রতি তার সহজ আনুগত্য ছিল মস্তবড়ো অবলম্বন।

নিজের মতো করে বললেও সে প্রায় দীনেশের কথারই প্রতিধ্বনির মতো বলত, ইস! আমাদের ইউনিয়ন ভেঙে দেব—অত খায় না ! আরও জোরদার করব আমাদের ইউনিয়ন, পরেশবাবুদের হটিয়ে দিয়ে আমরা মেজরিটি হব।

দীনেশ বলত, তা না তো কী ? তুমি আমি আছি কী করতে ?

দীনেশ পাকা ঝানু লোক, কাজের লোক—কিন্তু শুধু তাই দিয়েই কি লাগাম ধরে রাখা যায় আজকালকার দিনে। হরেনকে সকলে বিশ্বাস করে, ভালোবাসে। সে নিজেও জানে না ইউনিয়নে তার কতখানি প্রভাব, তার কথাকে সকলে কতটা মূল্য দেয়।

দীনেশ ভাবে, ভাগ্যে জানে না !

ভাগ্যের কথা কিনা তাই ভয়ও বেশি। গোকুলের সঙ্গে হরেনকে অনেকক্ষণ কথা কইতে দেখে আতঙ্ক হয় !

ওর সাথে তোমার অত গুজগাজ কীসের ?

একটা ঘর খালি আছে বলছিল। ঘর বদলাও ঘর বদলাও করে বউটা পাগল করে দিলে দীনেশদা।

ঘর ? আমি তোমায় ভালো ঘর খুঁজে দেব।

কিন্তু সে ভরসা কে বসে থাকবে ? ঘর একটা খালি হয়েছে, নগদ নগদ দখল করাই ভালো। তার তো আর নিজের জন্য গোকুলের সঙ্গকে ভয় করার কারণ নেই দীনেশের মতো যে ঘরের খবরটা গোকুল দিয়েছে বলে আর ও বাড়িতে গোকুলও আরেকটা ঘরে থাকে বলে সুযোগটা বাতিল করে দেবে।

রত্না কেবল বলে, তুমি তো বাইরে দিন কাটাও, দম আটকে আমি যে মরলাম ?

শুধু ছোটো নয়, স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার ঘর। অন্য ঘরে আরশোলা না তাড়ালে এই ঘরের কোণে এসে আশ্রয় নেয়। দুবেলা পৃথিবীর সব উনুন আর চিমনির ধোঁয়া যেন এই ঘরে ঢুকতে ভালোবাসে !

সস্তা ছিল। ভালো ঘরে টাকা বেশি লাগবে। কিন্তু উপায় কী ? মাসে দু-চারদিন যে মাছ খেত সেটা নয় বাদ যাবে। আরও দু চারটে প্রয়োজন নয় ছাঁটাই হবে জীবন থেকে।

একবাড়িতে কাছাকাছি দুখানা ঘরে গোকুল আর হরেনের ভাব হতে সময় লাগে। গোকুল তাকে কথা বলে বাগিয়ে নেবে এ ভয় কিছুমাত্র না থাকলেও গোকুল যে বিরোধী ইউনিয়নের লোক, এটা হরেন ভুলতে পারে না।

বাড়ির অন্য ভাড়াটেদের সঙ্গে আলাপ করে, দু-একটা গা-ছাড়া কথা বলে সে গোকুলকে এড়িয়ে যায়। তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার চেষ্টা গোকুলেরও কিছুমাত্র দেখা যায় না। হরেনকে সে খাতির করে খালি ঘরখানায় ঢোকায়নি। অন্যের কাছে খবর পেয়ে হরেন শুধু ঘরটা সম্পর্কে তার কাছে খবরাখবর জেনে নিয়েছিল।

দুপক্ষের তাগিদ থাকে সে আলাদা কথা, কাছাকাছি এসে বাস করছে বলেই নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলার সময়ই বা কই মানুষের, সে রকম মনের অবস্থাই বা কই ! তাদের মতো মানুষের বইবার সাধ্য ছাড়িয়ে অনেক বেশি ভারী হয়ে উঠেছে জীবনযাত্রার বোঝা—খাদ্য বস্ত্র আনন্দ অবসর সব কিছু ছেঁটে প্রায় সাফ করে আনার পরেও ! একদিকে এই অসম্ভব বাঁচার লড়াই, অন্যদিকে এমন করে বাঁচার অভিশাপ শেষ করার লড়াই। সময় কই মানুষের !

গোকুলের বউ রাণীর সঙ্গে রত্নার ভাব কিন্তু জমে ওঠে খুব তাড়াতাড়ি। আবার অল্পদিনেই তাতে ফাটল ধরে যায়।

রাণীর চেহারা ভালো। গড়নটি তার সেই ধরনের যা চোখ টেনে এনে নিজেকে দেখায়। স্বাস্থ্য ভালো, পেট ভরে না, তাই ভালো তরকারির বদলে বেশি করে সস্তা শাকপাতা আব রুটি খেয়ে খেযে রোগা হবার বদলে তার দেহে একটা বিপরীত প্রক্রিয়া ঘটেছে। ভিতরে দুর্বলবোধ কবে অথচ দেহটি বেশ সবল এবং পুষ্ট—আসলে সেটা খাঁটি পুষ্টির ধাপ্পামাত্র—একটু ফেঁপে ওঠা।

রত্না কাঠির মতো রোগা। রাণীকে দেখেই মনে মনে সে মুখ বাঁকিয়েছিল।

হরেনকে বলেছিল, কী বেশ্যাটে বেশ্যাটে চেহারা, মাগো !

হরেন বলেছিল, সে কী ? বেশ্যারা ও রকম ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে নাকি ?

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাও দেখেছ ?

রত্না একটু হিংসুটে আব স্বার্থপর। জীবনে সুখশান্তি স্বচ্ছলতা থাকলে হয়তো স্বভাবের এ সব খুঁত চাপা পড়ে থাকত, দুঃখদুর্দশার চাপ মনটাকে আরও বাঁকিয়ে দিয়েছে। এ তো ত্যাগ নয়। ইঙ্গিত করলে লাখপতিরা ঝুলি ভরে দিতে ছুটে আসবে যে ত্যাগের মাহাত্ম্যে, এ স্রেফ কদর্য বাস্তব দাবিদ্র্য। এ দাবিদ্র্য হয় মানুষকে বীর লড়ায়ে করে তোলে নয় মনুষ্যত্ব নষ্ট করে দেয়। দারিদ্র্যই মানুষের সেরা শত্রু।

গরিবের খাঁটি বন্ধুও অনেক সময় ভুল করে দারিদ্র্যকে তুলে ধরে। শোষক ধনী অমানুষ বলেই যেন শোষিত গরিবেরা মানুষ হয় শুধু তারা গরিব বলেই !

কত দরদিই যে ভুলে যায, লড়াই মনুষ্যত্ব দেয গরিবকে, তার দারিদ্র্যটা নয়।

অভাব স্বভাবকে নষ্ট করবেই। মানুষের যে সদগুণ নিছক কুসংস্কাব আব ফাঁকি শুধু সেগুলিব গোড়া খোঁড়ে না—সেটা তো মঙ্গলের কথাই—মনুষ্যত্বও কুরেকুরে খায়। এটা ঠেকানোও আবেকটা লড়াই গরিবের।

রত্না নিজেই ভাব করে। ভাব করতে হয। শুধু যে একটা কলে জল নেওযা বাসন মাজা থেকে সব কাজ সারতে হয় দুজনকে এমন তো নয়, একই ঘুপচির মধ্যে দুজনকে পাশাপাশি— প্রায় ঘেঁষাঘেঁষি করে—রাঁধতেও হয়।

দুখানা ঘরের এটাই রান্নার ঠাঁই। এখানে না পোষায় নিজের ঘবেব মধ্যে বান্না কব ।

রত্না বলে, তোমাব উনানে ভাতটা একটু চাপাই ভাই ? তবকাবি হবে না, কিছু ভেজে দি চটপট। কাজে যাবে কী খেয়ে ?

রাণী বলে, চাপাও।

সে বিরক্ত হয়। তার লোকটাও যে একই সময় একই জায়গাতে কাজে যাবে, এটা বত্নার খেযাল নেই ? শুধু নিজের সুবিধা খোঁজে ! কিন্তু তাই বলে ঠিক শোধ নিতে নয়, প্রয়োজন বলেই বাণী তাকে দুফালি বেগুন দিয়ে বলে, তোমার সাথে ভেজে দিযো ভাই।

রত্না বিরক্ত হয়। দু-দণ্ড উনানটা চেযেছে বলে যেন পেযে বেসেছে ! বেগুন ভাজতে তেল লাগে না ?

দুজনের ভাব একটু গড়ে উঠতে না উঠতে এমনি কত যে খুঁটিনাটি ঘা লাগতে শুরু হয় !

তা হোক, ছোটো ছোটো বিরোধ নিযে শুরু হোক, পরে একদিন ভেঙে পড়বে জানা থাক। তাদের ভাব করা থেকেই গোকুল আর হবেনের মধ্যে দূরত্ব ঘুচে যাবার সূচনা হয।

যে যার স্বামীর কাছে গল্প করে অপরজনের দোষগুণ মতিগতি আর ঘরসংসারের কথা। শুনতে শুনতে দুজনেই তারা অনুভব করে যে স্ত্রীরা তাদের খুব ঘনিষ্ঠ হয়েছে, পবস্পরকে দুজন তারা খুব বেশি পছন্দ করুক আর না করুক !

দেখা হলে ঘরসংসারের ব্যাপার নিয়ে কথা বলার তাগিদও অনুভব করে দুজনে।

হরেন বলে, জল নিয়ে তো বিষম ব্যাপার হল ! আপনার স্ত্রীরও নাকি মশাই নাইবার জল জোটেনি শুনলাম ?

গোকুল বলে, আর বলেন কেন। কোনটা জুটছে উচিতমতো ? এতদিন খেঁচাখেঁচি করে পাঁচটা টাকা আদায় কবতে পারলেন ?

এটা সাম্প্রতিক ব্যাপার। ঘটনাটা হরেনকে পীড়ন করছিল। গোকুলেরা অনেক বেশি দাবি তোলে, দীনেশের চেষ্টায় দাবিটা শেষ পর্যন্ত সস্তায় রেশনের কাপড় অথবা পাঁচ টাকা মাগগি ভাতা বেশি দেবার দাবিতে দাঁড় করানো হয়।

বাইরে রেশনের কাপড় দেওয়া হচ্ছে এই যুক্তিতে যেন ফুতকারে উড়িয়ে দেওয়া হয় দাবিটা।

হরেন বলে, কী করে হবে ? শুধু অমিল আর মিলেমিশে কী করা যায় সে বিষয়ে বড়ো বড়ো বুলি কপচানো।

গোকুল মন্তব্য করে, তোমরা মেয়েমানুষেবই বাড়া বুঝলে ? তোমাদের মতো দশা হলে সতীনেবা এ ঝগড়া ভুলে যায়।

হরেন হেসে বলে, আমাদের কোনো ঝগড়া নেই।

এমনিভাবে আরম্ভ হয় গোকুল আর হরেনের কথার আদানপ্রদান, ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট আর সুনির্দিষ্ট হয়ে আসে তাদের কথা। দুদিন আগে যে বিষয়ে আলাপ শুরু হলে হয়তো দুজনে ঝগড়া বেঁধে যেত, দুদিন পরে সেই বিষয়েই তারা প্রাণ খুলে আলাপ করে।

আলাপ থেকে তর্কও বেধে যায়। বোঝাপড়ার যে সরু সুতো টানতে গেলেই ছিঁড়ে যেত, নতুন নতুন সুতো জড়িয়ে পাকিয়ে সেটা শক্ত হয় দিন দিন।

ওই যে পাঁচ টাকা ফসকে গেছে, তোমায় আমায় আদায় করতে পারব ?

শুধু ওটা ? আবও আদায় করতে পারব।

হরেন ভাবনায় পড়ে যায়, দিন দিন সে যেন রীতিমতো ভাবুক হয়ে ওঠে। দেখে বড়োই ঘাবড়ে যায় রত্না। তার কাছে মানুষটা মুখ গোমড়া করে কী যেন ভেবেই চলে শুধু, ওদিকে রাণীর সাথে দিব্যি হেসে কথা কয়।

গা-জ্বালা কবে রত্নার।

হবেনের মনস্থির করাটা যেন আচমকা ঘটে যায়। হঠাৎ একদিন যেন ঝোঁকের মাথায় সে ঠিক কবে ফেলে যে দীনেশকে ছেড়ে গোকুলদের সঙ্গে ভিড়ে যাবে। সকলের জন্য একটা জোরালো ইউনিযন গড়ে তোলাই উচিত।

আসলে তার প্রকৃতিটাই এ রকম। একগুঁয়ে সোজা মানুষ, একটা কাজ উচিত ভাবলে তাই নিয়ে টালবাহানা করা একেবারেই তার ধাতে নেই।

দীনেশ প্রায় খেপে গিয়ে বলে, আগেই বলিনি তোকে ও শালার সাথে অত মিশিস না, তোকে বিগড়ে দেবে, তোর সর্বনাশ করে ছাড়বে।

হরেন চোখ পাকিয়ে বলে, নেশা কবেছ নাকি দীনেশদা ? তুই তোকারি শুরু করে দিলে ?

নিজের পায়ে কুড়ুল মারছ, তাই বলছি। ওদের সাথে ভিড়লে আখেরে মঙ্গল নেই জেনে রেখো। এ সব বুদ্ধি ছাড়ো, আমি বরং চেষ্টা করে আ... কটা প্রমোশন বাগিয়ে দিচ্ছি।

তুমি বড়ো ইয়ে মানুষ দীনেশদা !

মউচাকে ঢিল পড়ার মতো কর্মীদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। উত্তেজিত জটলা আর পরামর্শের অন্ত থাকে না। বহুদিন ধরে মনেপ্রাণে সকলেই যা চেয়ে আসছে, এতদিন পরে এবার কি সম্ভব হবে সেটা ?

নিরাশাবাদী বিপিন বলে, আরে ধেত ! তেলেজলে কখনও মিশ খায় ? সব ভেস্তে যাবে দেখিস।

কিন্তু মুখে হতাশার কথা বললে কী হবে। বিপিনেরও উৎসাহ জেগেছে। সে যেচে গিয়ে হরেনকে বলে আসে, আমি তোমার সাথে আছি ভাই।

ইউনিয়নের সভায় সরাসরি তাদের ইউনিয়ন ভেঙে দিয়ে গোকুলদের ইউনিয়নে যোগ দেবার প্রস্তাবটা দীনেশ ঠেকাতে পারে কিন্তু হরেনের সংশোধিত প্রস্তাবটা ঠেকাবার ক্ষমতা তার হয় না।

সংশোধিত প্রস্তাবে বলা হয় যে তাদের দুটি বেসরকারি ইউনিয়ন একসাথে পাঁচশো কর্মীর সভা ডেকে নতুন ইউনিয়ন গড়বে যে ইউনিয়ন বর্তমান আইনসম্মত ইউনিয়নের স্থান দাবি করবে এবং দাবি নিয়ে লড়াই চালাবে।

এ প্রচেষ্টাকে নষ্ট করার অপচেষ্টা যথাসাধ্য চলতে থাকে। সে তো চলবেই। কিছু গড়তে গেলে লড়তে হবেই। ভেঙে দেবার এই প্রাণপণ চেষ্টার ফলে যদি শেষ পর্যন্ত ভেস্তেও যায় গড়ে তোলার চেষ্টা, সে হবে আলাদা কথা। ল'ড়ায়ে হারজিত আছে।

কিন্তু বিপদ যে এল সম্পূর্ণ অন্যদিক থেকে ! একটা মেয়েলি কোঁদল খাটুয়েদের নিজস্ব নতুন ইউনিয়ন গড়ার আশা নির্মূল করে দিল—দিল একেবারে শেষ মুহূর্তে।

সকালবেলাই রাঁধতে রাঁধতে প্রচণ্ড ঝগড়া বেঁধে গেল রত্না আর রাণীর মধ্যে—অসাবধানে রাণীর গরম হাতায় রত্নার গায়ে ছেঁকা লেগে যাবার ফলে।

কুৎসিত গালাগালি করেই গায়ের জ্বালা মিটল না রত্নার—তার তো শুধু গরম হাতা থেকে গায়ে একটু ছ্যাঁকা লাগার জ্বালা নয় ! পেটের ছেলের বোঝাটাও দিন দিন তার ক্ষীণ দুর্বল শরীরটার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

দিশেহারা হয়ে রাণীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে আঁচড়ে তার গায়ে রক্ত বার করে দেয়। রাণী ঠেলে না দিলে বোধ হয় কামড়েও দিত।

রাণীরও ভিতরের দুর্বলতা আর অস্থিরতাবোধ বেড়ে চলেছিল প্রতিদিন। ঠেলাটা সেও একটু দিশেহারা হয়েই দিয়ে বসে।

উনানে ডালের কড়াইয়ের উপর পড়ে যায় রত্না, গরম ফুটন্ত ডালে গায়ের অনেকটা জায়গা তার ঝলসে পুড়ে যায়।

তাদের চেঁচামেচি শুনে দু-চারজন ব্যাপার দেখতে এসেছিল, রত্নার আর্তনাদ শুনে আরও কয়েকজন ছুটে আসে। ধরাধরি করে রত্নাকে তারা তার ঘরে নিয়ে যায়।

রাণী ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। কোনোদিকে তাকাবার বা কী ঘটেছে দাঁড়িয়ে দেখবার সাধ্য তার ছিল না। বুকের মধ্যে ধড়ফড়ানির সঙ্গে মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে জগৎটা অন্ধকার হয়ে আসছিল।

ব্যাপারটা শুধু এ পর্যন্ত গড়ালে ভাবনা ছিল না। কিন্তু বাজার করে ফিরে রত্নার অবস্থা দেখে আর তার মুখে ব্যাপার শুনেই মাথায় যেন আগুন ধরে যায় রগচটা হরেনের। প্রচণ্ড আক্রোশে গোকুলের ঘরে গিয়ে গলা ফাটিয়ে সে গালাগালি দিতে আরম্ভ করে রাণীকে।

রত্নাকে দেখতে যাবে বলেই রাণী প্রাণপণ চেষ্টায় কোনো রকমে উঠে বসেছিল। কিন্তু উঠে দাঁড়াবার জোর পায়নি। হঠাৎ ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

গোকুল যখন ফিরে এল, ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করছে। বাড়ির অন্য ভাড়াটেরা ডাক্তার এনেছিল।

ডাক্তার বিদেয় নেওয়া পর্যন্ত গোকুল চুপ করে রইল। তারপর সোজা গিয়ে হরেনের গালে বসিয়ে দিল এক চড়।

অসভ্য জানোয়ার ! মেয়েদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে, তুই পুরুষ হয়ে মেয়েছেলেকে মারতে যাস ! তোকে আমি খুন করব।

ঘটনাটা মঙ্গলবারের। সভা ডাকা হয়েছিল শনিবার বিকালে।

কিন্তু আর কী লাভ আছে সভা ডেকে ? সমস্ত সম্পর্ক চুকেবুকে গিয়েছে গোকুল আর হবেনের মধ্যে। আক্রোশে ফুঁসছে দুজনে। দেখা হলে রাগে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়।

বোঝা যায, এ ভাঙন আর জোড়া লাগার নয়। হবেনেব নাম করলে গোকুল বলে, ও বজ্জাতটার নাম কোরো না আমার কাছে। জানোয়ারটাকে খুন কবে আমাব ফাঁসি যাওয়া উচিত ছিল।

গোকুলের নাম শুনলে হরেন কটমট করে তাকায়। দাঁতে দাঁতে ঘষে একটা অকথ্য শব্দ উচ্চারণ কবে।

শুধু বন্ধুত্ব ভেঙে গেলেও কথা ছিল। দুজনে একেবাবে শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে পবস্পবের !

শনিবার বিকালে মিটিং বসে বটে কিন্তু কারও মধ্যে উৎসাহ জাগে না। দীনেশ শুধু মহোৎসাহে সিগাবেট টানে আব তার নিজের লোকেদের সঙ্গে ফিসফাস গুজগাজ পবামর্শ চালায়।

কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। মুখ তাব হাঁ হয়ে যায় এক অদ্ভুত ব্যাপাব দেখে।

গোকুল আব হরেন কথা কইতে কইতে হলে ঢুকছে ! বিবাদ কি ওদের মিটে গেল ? দশ মিনিট আগেও যারা পবস্পবকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল ?

এ কি ম্যাজিক ?

মিটিং শেষ হলে উচ্ছ্বসিত আনন্দ কোলাহলের মধ্যে গোকুল আব হবেন বাইবে আসে। মুখ ফিরিযে নিয়ে দুজনে দুদিকে সরে যায়।

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বিপিন হরেনকে বলে, গোকুলকে ডাকো, চা-টা খাওয়া যাক।

হবেন বলে, ও শালাব নাম কোরো না আমাব কাছে।

গোকুলও তার বন্ধুকে বলে, ও বজ্জাতটার নাম কোবো না আমার কাছে। ওকে খুন কবিনি— আমাব এ আপশোশ যাবাব নয়।

গুন্ডা

গুন্ডা সুশীলের বৈঠকখানা।

ঘরখানায় আসবাবপত্রের সমাবেশে যেমন সাজানো-গোছানোর কায়দায় তেমনি নানা বিচিত্র রুচির অদ্ভুত মিলন ঘটেছে। রুচির এই খাপছাড়া বিকারটাই চোখে পড়ে সকলের আগে। কল্পনা নেই, নানারুচির সস্তা খিচুড়ি।

দেয়ালে বহু ছবি—শিবাজী, পরমহংস থেকে গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, জহরলাল, সুভাষচন্দ্র, রাণি ভিক্টোরিয়া থেকে মাউন্টব্যাটেন দম্পতি, চার্চিল থেকে হলিউডের প্রায় ন্যাংটো স্টার বেনামি এবং জটাধারী সন্ন্যাসী থেকে বাসুকীনাগের দড়ি দিয়ে দেবতা ও দানবের সমুদ্রমন্থন। এ সব হল কাগজে ছাপা ছবি। এ সব ছাড়াও কার্পেটে রঙিন সুতো আর উলে তোলা হরিণ ও বাজের মাথা আছে, 'পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ', 'অহিংসা পরম ধর্ম', 'পতিই সতীব সব' ইত্যাদি নানারকম বচন আছে। একদিকে জোড়াখাটে ফরাশ পাতা, তাকিয়াগুলিতে ঝালর দেওয়া ; অপর দিকে স্টিল প্লেটে ও ফ্রেমে গড়া অতি আধুনিক সোফা চেয়ার কিন্তু এ পাশের দেয়াল ঘেঁষে আবার নিছক একটা সাদাসিদে কাঠের বেঞ্চি, কয়েকটা সস্তা হাটবাজারি বেতের মোড়া। একটা সাধারণ আলমারি আর দামি বুকসেলফে বিচিত্র মলাটেব শ-তিনেক বই ! এইগুলিতেই ধুলো জমেছে বেশি। রকমারি মলাটের শোভা ছাড়া বইগুলির সমাবেশ ঘটার মানে বোঝা অসম্ভব। শ্রীমতী সুশীলা দেবী নামে কোনো এক অজানা মেয়েকবির স্বামীর পয়সায় সোনালি জ্যোতির চমক লাগানো হরফে ছাপানো 'চাঁদ ছিল' কাব্যটির পাশেই আমেরিকায় প্রকাশিত জুতাব ব্যাবসা সম্পর্কে মোটা একখানা ইংরাজি বই।

মেঝেব খানিক অংশ জুড়ে দামি কার্পেট, পুকুরের মিহি পাঁকের মতো কোমলতায় আধ-হাত পা ডুবে যায়। কার্পেটের পাশেই একটি সাধারণ মাদুর, তাতে গোটা দুই ওয়াড়হীন তেলচিটে তাকিয়া। দরজার কাছে পা মোছার জন্য বিছানো আছে—দুটি ছেঁড়া নোংরা বস্তা !

সকাল এখন সাড়ে সাতটা। ঘরে এত আসবাব থাকতে সুশীল একটা সাধাবণ সস্তা ক্যাম্বিসের ক্যাম্প চেয়ারে বসে আছে। তার হাতে একটি ছোটো সাইজের দু-পৃষ্ঠা বাংলা সংবাদপত্র—ছাপার হরফগুলি বেশ বড়ো বড়ো।

সুশীলের বয়স হবে চল্লিশ—সবল স্থূল জবরদস্ত চেহারা, চর্বিতে মেটে রং। দাড়ি কামানো, ফড়িংয়ের ডানার মতো একজোড়া সুন্দর গোঁফ আছে—সুশীলের কাছে যা যমজ ছেলের চেয়ে প্রিয়।

সুশীলের যমজ ছেলে ছিল। বিয়েকরা বউয়ের সন্তান !

দেয়ালের ছবিগুলির মধ্যে সে ইতিহাস রক্ষিত আছে। শুকনো মালা জড়ানো বিবর্ণ অস্পষ্ট দুটি ফটো সুশীলের অতীত দাম্পত্য জীবনের স্মৃতি হিসাবে দেয়ালে ঠাঁই পেয়েছে। অস্পষ্ট হলেও বউয়ের ফটোটি দেখে বোঝা যায় শাড়ি গয়না সিন্দুর চন্দনে জবুথবু একটি বালিকা চেয়ে আছে ড্যাবড্যাবে চোখে। বউকে সুশীল বড়ো ভালোবাসত ! বাসর-রাত্রে ভয়ে সুশীলের বুকে একেবারে অজ্ঞান হয়ে গিয়ে সুশীলকে সে মনেপ্রাণে বশ করে ফেলেছিল !

যমজ ছেলে দুটি বিয়োতে তার প্রাণ যায়।

ছেলে দুটি বেঁচেছিল প্রায় আট বছর। একসঙ্গে একদিনে দুজনে তারা কলেরায় মারা যায়। তাদের ঝাপসা ফটোয় কলকে ফুলের মালা জড়ানো আছে।

সন্তর্পণে পা ফেলে মৃণালিনী এসে দাঁড়ায়। সে চাকরানি না আশ্রিতা না আত্মীয়া অথবা নিছক বেশ্যা চেহারা দেখে বুঝবার উপায় নেই। পরনে চওড়া লালপাড় ধোপদুরস্ত মিলের শাড়ি কিন্তু বহরে বেশ খানিকটা খাটো, হাঁটু পেরিয়ে গোড়ালি অবধি যেতে যেতে মাঝপথে হাল ছেড়েছে। মুখখানা শুকনো, বঞ্চনা লাঞ্ছনার ছাপমারা বিবর্ণতা,—প্রাণপণ ধৈর্যের চেষ্টায় কালিমারা মুখের সে চামড়ায় বয়সের চিহ্নটা কিন্তু কুড়ি-বাইশের বেশি উতরাতে পারেনি। হাজার অত্যাচারও যে মানুষের মুখে বার্ধক্য আনতে পারে না, তার মুখটি যেন তার চরম সাক্ষ্য।

মৃণালিনী। (মৃদুস্বরে) কী বলছেন ?

সুশীল। এককাপ চা দাও।

মৃণালিনী। কড়া করব না নরম করব ?

সুশীল। মাঝারি রকম করো।

মৃণালিনী। (পাংশুমুখে ভীতস্বরে) মাঝারি রকম চা তৈরি করা আছে।

সুশীল। (উদার উদাস কণ্ঠে) মাঝারি রকম চায়ের নামে সেও এমনি ভড়কে যেত। একটু এদিক-ওদিক হলে কড়া নয় নরম হয়ে যায়। তোমারও ভাবনা হচ্ছে, না ? ভাবনা কী, ভাবনা কী ! মন-টন কী আর ভালো আছে সকালবেলা ? যেমন হোক করে দাও। সংসারে আর মন নেই, বুঝলে ? সংসার আর ভালো লাগে না।

মৃণালিনী। (সুশীলের বউয়ের ফটোর দিকে চেয়ে) কী কচি ছিল মুখখানা। ছবিতেও যেন ঢল-ঢল করছে।

সুশীল। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) পাপে ভরা সংসার, ও সব মানুষ বাঁচতে আসে না। দুদিন জড়িয়ে জড়িয়ে বেঁধে নিজে চলে যায়। চিহ্ন দুটোকে পর্যন্ত থাকতে দিল না, কাছে টেনে নিল।

মৃণালিনী। (ধরা গলায়) সত্যি, ভাবলেও কান্না পায়।

সুশীল। কাঁদছ ? কাঁদলে তো তোমায় বেশ দেখায় !

মৃণালিনী। চা আনি।

মৃণালিনী ভিতরে যায়। বাইরে থেকে ঘরে ঢোকে বেলা। মোটাসোটা ফরসা ও সুন্দরী, সাজসজ্জায় ঝলমল, গায়ে হিরার নমুনাও আছে। চেহারা প্রসাধন ও সাজসজ্জা সহজেই চিনিয়ে দেয় সে সমাজের কোন স্তরের কী ধরনের মানুষ।

বেলা। ছিছি ! এই নাকি তোমার নতুন পিরিত ? কী পছন্দ, বলিহারি যাই !

সুশীল। বড়ো ভালো মেয়েটি। সাত চড়ে মুখে রা নেই।

বেলা। তবে তো ভালো হবেই। চড় খেয়ে রা না কাড়লে আমিও ভালো মেয়ে হতাম। পাটরানি করেছ নাকি শুনলাম ?

সুশীল। কীসের পাটরানি, একটু মায়া পড়ে গেছে, বাস্। চালান করেই দিতাম, গোঁসায়ের সাথে দরদস্তুর হয়ে গিয়েছিল। দুদিন বেঁধেবেড়ে খাওয়াল, বেশ রাঁধে। ভাবলাম, আছে থাক। তাছাড়া, বড়ো নিরীহ গোবেচারা স্বভাব, কে বলবে স্কুলে পড়েছে। গোঁসায়ের কাজে লাগবে না, শেষকালে গাল দেবে আমায়।

বেলা। এ তো ভালো কথা নয় ! এই বয়সে তুমি শেষকালে প্রেমের ফাঁদে আটক পড়লে ? খবর শুনে আমরা তো থ বনে গেছি বাবা। মেজাজ-টেজাজ পর্যন্ত নাকি তোমার শুধরে গেছে !

সুশীল। শুধরে গেছে মানে ?

বেলা। একেবারে নাকি দয়ামায়ার অবতার হয়ে দাঁড়িয়েছ। মিষ্টি মিষ্টি কথা কও, উঠতে-বসতে দরদ জানাও। মাইরি বলছি, সবাই বলাবলি করছে, তুমি নাকি শান্তশিষ্ট ভদ্দরলোকটি বনে গেছ।

সুশীল। ভদ্দরলোক ছিলাম না ?

বেলা। তাই বলেছি আমি ? কোঁদল করছ কেন গো ? এ আবার শিখলে কোথা ? একটা ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে শেষে এমন দশা করলে তোমার !

সুশীল। হিংসা হচ্ছে নাকি ?

বেলা। (নিজের গালে চড় মেরে মুখ বাঁকিয়ে) মরণ আমার, হিংসা হবে ! তোমার ও দরদের মুখে নুড়ো জ্বেলে দি।

সুশীল। তবে দোষটা কী হল ? একজনকে করলাম বা একটু দরদ আহ্লাদ। বউটাকেও তো একদিন করেছি, সম্পর্ক তো তুলে দিইনি তোমাদেব সঙ্গে তখন।

বেলা। (গালে হাত দিয়ে) ওমা, তাই নাকি ব্যাপার ! বউটার মতো লাগছে ছুঁড়িটাকে ? তেমনি কথায় কথায় ভয়ে মুচ্ছো যায়, না ?

মৃণালিনী এক হাতে চায়ের কাপ অন্য হাতে চিনির পাত্র নিয়ে ঘরে আসে। বেলা একান্ত দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ করে। সুশীল মুচকে হেসে আড়চোখে তার দিকে তাকায়।

মৃণালিনী। আপনার চা এনেছি।

সুশীল। চা এনেছ ? লক্ষ্মী মেয়ে। আজ চা ভালো হলে তোমায় সোনার দুল গড়িয়ে দেব।

মৃণালিনী। চিনি কম দিয়েছি।

সুশীল। (চায়ের কাপ হাতে নিয়ে) কেন ?

মৃণালিনী। চিনি আর চামচ এনেছি, একটু একটু মিশিয়ে দেব। রাগ করবেন না—

বেলা মুচকে হাসে। সুশীল চোখ পাকিয়ে চেয়ে কাপে চুমুক দিয়ে মুখ বাঁকায়।

সুশীল। একেবারে চিনি দাওনি।

মৃণালিনী। একটু দিয়েছি, কম দিয়েছি। চিনি বেশি হয়ে গেলে মারবেন।

সুশীল। কী !

মৃণালিনী। (একটু পিছিয়ে গিয়ে) মারবেন না কিন্তু ! চিনি মিশিয়ে ঠিক করে দিচ্ছি।

সুশীল। (গর্জন করে) মারব ? বজ্জাত হারামজাদি মাগি, সকালবেলা তুই এমন কথা বলছিস আমাকে ! আমি মেয়েমানুষকে মারি ? মেয়েমানুষের গায়ে আমি হাত তুলি ? এক চাপড়ে গাল ফাটিয়ে দেব না তোর ! আমি কী অসভ্য চাষা না মজুর যে মেয়েমানুষকে মারব ? এমন কথা বলিস তুই, তোর এত বড়ো স্পর্ধা ! (বলতে বলতে রাগ চড়ছে, মুখ চোখ বিকৃত হয়ে গেছে) নে হারামজাদি নে ! (পায়ের চটি খুলে মারল) আমি মেয়েলোককে মারি !

বেলা। (হেসে গড়িয়ে পড়ে) চিনির কৌটা আমাকে দাও। আমি চিনি মিশিয়ে ঠিক করে দিচ্ছি।

সুশীল। (গজরাতে গজরাতে) না খেয়ে শুকিয়ে মরছিল, কুড়িয়ে এনে সুখে রেখেছি, তার মুখে কথা কী !

বেলা। (হাত বাড়িয়ে চিনির কৌটা আর চামচ নিয়ে) আমার জন্য এক কাপ চা করে আনো তো লক্ষ্মী মেয়ে !

মৃণালিনী ভিতরে যায়। সুশীলের চায়ের কাপে চিনি নাড়তে নাড়তে বেলা খিলখিল করে হাসে।

বাহিরে ঘরে

সকালবেলা সদানন্দ রেশন আনতে বেরিয়েছে। গোমড়া মুখটা যেন রাগে আর গায়ের জ্বালায় থমথম করছে। একটা ব্যাঙাচিকে ছেঁড়া চটি-পরা পায়ে থেঁতলে থেঁতলে এমন করে মারে যেন লাথি মেরে মাথা ভাঙছে কোনো অসহায় বিপন্ন শত্রুর।

রোয়াকে উবু হয়ে বসে গায়ের জ্বালায় জোরে জোরে বিড়িতে টান দিয়ে কাশছিল লক্ষ্মীপতি। সে কাশতে কাশতে প্রশ্ন করে, নতুন কোনো আইডিয়া নাকি আনন্দদা ?

রাস্তার কল থেকে জল-ভরা বালতি দুটো দুহাতে ঝুলিয়ে আসতে আসতে হাঁপ ছাড়বার জন্য বালতি দুটো রাস্তায় নামিয়ে হাঁপাচ্ছিল রোগা রুগ্ণ মাঝবয়সি রমানাথ। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলে, নতুন রকম কিছু নাকি ? হাসতে হাসতে পেটটা ফাটাবেন না যেন বলে রাখছি আনন্দদা।

রাত তিনটেয় উঠে পড়ছিল গোপাল। পরীক্ষায় পাস করবে না জেনেও পড়ছিল। উনানের ছাই কর্পূর আর পটাশ পারম্যাঙ্গানেটের ঘন রঙিন জলে গুলে কাদা করা খড়ি মাটির ঘরোয়া সস্তা খাঁটি স্বদেশি পেস্ট দিয়ে বিলাতি ব্রাশের সাহায্যে দাঁত মাজতে মাজতে সে সামনে এসে পথ আটকে দাঁড়ায়। বলে, সকালবেলাঃ নতুন আইডিয়া মাথায় এসেছে ? ইউ আর এ বেটার ভাঁড় দ্যান গোপালভাঁড় আনন্দদা !

তার গালে একটা চাপড় কষিয়ে দেওয়া উচিত ছিল সদানন্দের।

কিন্তু চটবার উপায় তো তার নেই। সে কখনও চটে না বলে, সব সময় হালকা হাসি তামাশা নিয়ে সকলের সঙ্গে ইয়ার্কি ফাজলামি করে জীবনের দুঃখদুর্দশার দিকটা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয় বলে অনেকে তাকে রীতিমতো হিংসা করে। এ তো সহজ ক্ষমতা নয় আজকের দিনে একটা সংসারী মানুষের পক্ষে !

সে তাই ভাঁড়ামির সুরেই বলে, সহজে কী হতে পেরেছি রে ভাই ! ভাঁড়ামির পরীক্ষায় ফেল করতে করতে বেটার ভাঁড় হয়েছি !

গোপালের মুখ লাল হয়ে যায় কিন্তু অন্য সকলে হাসে।

লোকে সত্যই আশ্চর্য হয়ে যায়। যে দিনকাল, যে অবস্থা মানুষের, সামান্য উপার্জনে সংসার চালিয়েও কী করে সদানন্দ জীবনটা এমন হালকাভাবে নিতে পারে !

কেউ কেউ বলে, গায়ে একদিন ছুঁচ ফুটিয়ে দেখলে হত ব্যথায় মুখ বাঁকায় কি না !

বুদ্ধিমানেরা বলে, কী বুদ্ধি তোমাদের ! মনটা হাসিখুশি রাখার সঙ্গে শরীরের কী সম্পর্ক ? যোগী সাধক মানুষ—সর্বদা আনন্দে থাকে। তাই বলে দেহে যন্ত্রণা হলে কাতরাবে না ?

এই নিয়েও মতবিরোধ আছে। কেউ তাকে বলে যোগী সাধক, কেউ বলে ভাঁড়।

দু-চারজনে পাগলও বলে থাকে !

রেশনের দোকানে দাঁড়িয়ে সে ভয়ার্ত সুরে সকলকে জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ মশায়, আপনারা আমাকে দেখতে পাচ্ছেন তো ? আমি আছি তো ?

এ যে তার নতুন তামাশার ভূমিকা সবাই তা জানে। সকলে মুচকে হাসে।

সকালবেলা ঈশ্বরের নাম করতে গিয়ে বড়োই খটকা লেগেছে মনে। ঈশ্বর আছেন কী নেই আমি তা নিয়ে মাথা ঘামাই না মশায় ! মুশকিল হল, আমি আছি কী নেই সেটা যে শুধু ঈশ্বর জানেন ! আমি তবে জানব কী করে ? মহা ভাবনায় পড়ে গেছি তাই।

একজন বলে, নাই বা রইলেন. অত ভাবনা কী ?

ওরে বাপরে ! ভুয়ো রেশনকার্ডের দায়ে ধরা পড়ব না ? বলতে বলতে একগাল হাসে।

এবার ধরেছি হিসেবটা। ঈশ্বর আছেন আমি যে এটা জানি, সেটাই প্রমাণ যে ঈশ্বরও জানেন আমি আছি। আমি যদি না থাকব তবে কী করে জানব একমাত্র ঈশ্বরই জানেন আমি আছি কী নেই ? কাজেই আমি আছি। সত্যি আছি তো ?

কয়েক মুহূর্ত ভয়ার্ত দিশেহারা মানুষের মুখভঙ্গি অপূর্ব অভিনয়ে ফুটিয়ে তুলে, বিহ্বল নেশাখোরের মতো উপস্থিত সকলের মুখ, রাস্তা, সামনের বাগানবাড়ি আর আকাশের দৃশ্যমান অংশটুকুতে চোখ ঘুরিয়ে এনে নিজের পেট চাপড়ে হোহো শব্দে সে হেসে ওঠে।

আছি আছি, আমি আছি ! রেশন নিতে এসেছিলাম আমি ভুলেই গেছিলাম বাবা ! পেটে খিদেটা ছোবল মারছে সাতাশ কোটি সাপের মতো ! আমিই যদি না থাকব, তবে কীসের রেশন, কীসের খিদে !

হাসতে হাসতে সেনেদের পাঁচ বছরের মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে বলে, তুইও রেশন নিবি বউ ? একলা এসেছিস ? মোটে শ-খানেক বছর আগে তোকে যে অসতী বলে ডুবিয়ে মারত বউমণি, ভুলে গেছিস ? কুলীন বামুন আমি, তোকে টাকা নিয়ে বিয়ে করে বলে যেতাম, খবরদার, বাকি জীবন সতী থাকবি। পাঁচ-ছবছর বয়স হয়েছে, বাকি মোটে আর তিরিশ-চল্লিশটা বছর। আমাকে ধ্যান করে এ ক-টা দিন কাটিয়ে দিবি, বুঝলি ?

সকলে আবার হাসে। রেশনের দোকানে রেশন নিতে এসে হত্যা দিয়ে দাঁড়িয়েছে বলেই হাসতে তো তারা ভুলে যায়নি।

ছোটো মেয়েটির মাথায় পিঠে বাপের মতো হাত বুলোতে বুলোতে সে একেবারে যাত্রাদলের ভাঁড়ের মতো ভঙ্গি করে বলে, আপনারা তো জানেন না, আপনাদের কী বলব ! সেদিন একটা মেয়ে আমায় বিয়ে করতে এসেছিল !

সে মুচকে মুচকে হাসে। সকলে উৎসুক আগ্রহে তার রসিকতার আসল কথাটুকুর জন্য প্রতীক্ষা করে। হাসবার জন্য প্রস্তুত হয়েই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে। তারা জানে যে রসিকতার ভূমিকা শুধু তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য—এবার সে যা বলবে তাতে না হেসে উপায় থাকবে না তাদের।

পরপর সাজানো রেশনকার্ডগুলি নিয়ে যে বেচারা এ খাতায় ও খাতায় সে খাতায় এটা-ওটা সেটা টুকে নিয়মরক্ষা করছিল—সে পর্যন্ত কলমটা উঁচিয়ে ধরে অপেক্ষা করে।

সেও তো পাড়ারই ছেলে।

সে হাসির গাম্ভীর্য দিয়ে মুখটা হাস্যকরভাবে গম্ভীর করে বলে, ভারী সুন্দরী মেয়ে। কম খেয়ে ক্ষীণাঙ্গী হয়েছে। শাড়িখানা পরেছে এমন কায়দা করে যেন সিনেমায় চাকরি খুঁজতে বেরিয়েছে। আমাকে সোজাসুজি বললে, দ্যাখো, তুমি বাপের সম্পত্তিও ভোগ করবে আবার মাসে মাসে চাকরি করে সে টাকাও মাসে মাসে খরচ করবে, অথচ ব্যাচেলার হয়ে থাকবে—এটা বেআইনি কাজ। তোমাকে এভাবে সমাজের সর্বনাশ করতে দেওয়া যায় না। আমাকে বিয়ে করতে হবে। নইলে তোমার নামে কেস করব।

একটু থেমে মুখ গম্ভীর করে বলে, সে কী বিপদ ভাই ! গলা জড়িয়ে ধরে আর কী ! কী করি ? শেষকালে গলা চড়িয়ে গিন্নিকেই ডাকলাম—ওগো বাঁচাও, শিগগির এসো—সর্বনাশ হল।

সশব্দে হাসিতে ফেটে পড়ে রেশনার্থী বালক যুবক বৃদ্ধেরা।

খদ্দরের শায়া ব্লাউজের উপর রেশন-বিগর্হিত সুপারফাইন শাড়ি গায়ে জড়ানো মোটাসোটা মহিলাটি বলে, আপনাকে থামে বেঁধে চাবকানো উচিত !

সে বলে, কেন ? আমি তো মন্ত্রীদের গাল দিইনি।

সকলে আরেকবার হাসে।

মহিলাটি আরও চটে বলে, আপনি মেয়েদের অপমান করেছেন।

সে যেন আঁতকে ওঠে। মুখে ভয় আর হতাশার ভাবটা হাস্যকর রকম প্রকট হয়ে পড়ে।

এ কী বলছেন ? কী সর্বনাশ ! মেয়েরা যে আমার মা !

এবার কেউ হাসে না। ভদ্রমহিলা মুখ ফিরিয়ে ঝামটা দিয়ে বলে, ভাঁড় !

বরুণ বলে, মিসেস দাস, আপনি ওঁকে চেনেন ?

মিসেস রেণুকা দাস শুধু মুখ বাঁকায়।

বরুণ বলে, উনিই আমাদের সদানন্দবাবু।

তাতে কী হয়েছে ?

রাগ করবেন না, ইনি অতি সদাশিব লোক। কাউকে ইনি খোঁচা দেন না—এমনিই হাসান ! আজকালকার দিনে পাড়ায় একজন হাসাবার মতো লোক থাকা কী সহজ ভাগ্যের কথা !

লোকে না খেয়ে মরছে, ন্যাংটো হয়ে থাকছে, তখন ভাঁড়ামি সয় মানুষের ? তাও আবার মেয়েদের নিয়ে ইয়ার্কি !

সদানন্দ গম্ভীর হয়ে বলে, এখানে আরও মহিলা উপস্থিত আছেন, তারা কিন্তু রাগ করেননি।

রেণুকা ছাড়া যে পাঁচজন স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিল তাদের কেউ মহিলা বলে না। দুজন হিন্দুস্থানি স্ত্রীলোকের কাপড়ে স্পষ্ট ছাপ লাগানো আছে যে তারা নতুন বাড়ি তুলবার সময় চুন-বালি বয়, অন্য তিনজন বাঙালি স্ত্রীলোককে দেখেই বোঝা যায় পেট চালাবার জন্য তারা ঝি-গিরি ধরনের কাজ করে।

এবার কেউ শব্দ করে হাসে না, নীরব হাসিই সকলের মুখে খেলে যায়। রেণুকার মুখ হয়ে যায় আরও বেশি লাল।

রেশন-ক্লার্ক বরুণ তাড়াতাড়ি রেণুকার কার্ড কখানা আগে লিখে কেষ্টকে বলে, আগে এঁরটা মেপে দাও—হাত চালাও একটু।

সদানন্দ দুহাতে নিজের কান মলে বলে, নাঃ, আর ভাঁড়ামি নয়। এবার থেকে রেশন নিতে এসে চোটপাট করতে হবে—তাড়াতাড়ি পেয়ে যাব, সকলের আগে।

রেণুকা তীব্রদৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়।

গায়ে পড়ে সে সদানন্দকে শাসন করতে গিয়েছিল বলে কারও সহানুভূতি জাগে না। কেবল মাঝবয়সি আদিত্যের ক্লিষ্ট মুখটা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দেখায়।

সে বলে, আমাদের রুচি বড়ো নেমে গেছে। সস্তা নোংরামি আর ভাঁড়ামি ছাড়া পছন্দ হয় না। সিনেমাগুলি তো নিয়ম করে বিষ খাওয়াচ্ছে দেশের লোককে !

কলেজের ছাত্র রঞ্জন বলে, পয়সা দিয়েও বিষ খায় কেন দেশের লোক ?

সদানন্দ বলে, ও বিষ খেলে যে মজার নেশা হয় রে দাদা ! পা টলে না, খানায় পড়তে হয় না, দিব্যি মজার নেশা জমে।

সকলে হাসে। আদিত্য নামকরা মাতাল। আর কোনো দোষ নেই, বাড়িতেই মদ খায়। যে আনন্দ জীবনে নেই সন্ধ্যা হলে সেই আনন্দের সন্ধানে মদ গিলতে শুরু করে। নেশা বেড়ে গেলে প্রায়ই সে বাড়িতে একটা হইচই হট্টগোল সৃষ্টি করে।

সদানন্দ নিজের মুখে হাত চাপা দেবার ভঙ্গি করে বলে, আর না, এবার এই মুখ বন্ধ করলাম, একেবারে বাড়ি গিয়ে খুলব। আর একটি কথা নয়। একটা শব্দ যদি আর উচ্চারণ করি, নিজের মাথা খাব।

একটু পরেই বলে, দেখলেন তো মশাইরা, ভদ্রলোকের এক কথা। বলেছি মুখ বন্ধ, আর কী আমি কথা কই !

মুখ থেকে হাত সরিয়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, দুত্তোর ! কত কথা বলে ফেললাম। ভদ্রলোকের এক কথা, নিজের মাথাটা এখন আমি খাই কী করে ? নাগাল পাব না যে !

হাতে থলি ঝুলিয়ে চেনা লোকের সঙ্গে ঠাট্টাতামাশা করতে করতে হাসিমুখে সদানন্দ বাড়ি ফেরে। সদর দরজার চৌকাঠ ডিঙিয়েই হাসিটা তার মিলিয়ে যায়।

নির্মলা কুমড়ো কুটছিল, রেশনের চাল আর গম-ভরা থলি দুটো প্রায় তার গায়ের উপর ধপাস করে নামিয়ে দিয়ে মুখ বিকৃত করে বলে, নাও পিন্ডি গেলো সবাই।

নির্মলা বঁটিটা সরিয়ে রেখে ঝংকার দিয়ে বলে, হাত কেটে যেত না ?

সদানন্দ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, কাটে তো না কোনোদিন ? একটু রক্ত বেরিয়ে তেজ কমত।

নির্মলার গলা চড়ে যায়।—কী তেজ আমার তুমি দেখলে শুনি ? সকালবেলা গায়ে পড়ে ঝগড়া শুরু করেছ ?

সকালবেলা এককাপ চা জোটে না আমার। রেশনের দোকানে ধন্না দাও, বাজারে যাও—

ওই তো চা করা রয়েছে, খেলেই হয় !

সদানন্দ গর্জন করে বলে, ঠান্ডা চা খাব নাকি ?

নির্মলাও গর্জে ওঠে, চেঁচিয়ো না ষাঁড়ের মতো। গরম করে দেব না বলেছি ?

আধভিজা কাপড়ে ষোলো বছরের মেয়ে মায়া এসে দাঁড়ায়।

একটা কাপড়-কাচা সাবান এনে দাও বাবা।

সদানন্দ তীব্রদৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়।

এখনও সাবান দিসনি কাপড়টাতে ? কখন শুকোবে ? কী পরে আপিস যাব ?

সাবান নেই তো আমি কী করব ?

ভোরবেলা সে কথা বলতে পারনি হারামজাদি ?

সদানন্দ মেয়ের গালে ঠাস করে চড় বসিয়ে দেয়।

মায়া চেঁচিয়ে কাঁদে।

নির্মলা তর্জন করে।

সদানন্দ গজরায়। তখন নড়ে ওঠে বাইরের কড়া।

দরজা খুলে সদানন্দ দ্যাখে, হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে রেশনের দোকানের সেই রেণুকা দাস।

একটু দরকার ছিল। আপনি তখন রাগ করেননি তো সদানন্দবাবু ?

সদানন্দবাবু অমায়িকভাবে হেসে বলে, রাগ তো আপনার করার কথা।

না না, আমি রাগ করিনি।

ঘরে এসে রেণুকা বসে।

একটা খবর পেয়ে এলাম। আপনি নাকি ঘর দুখানা ছেড়ে দিচ্ছেন ? খোলাখুলি কথা বলি, কেমন ? শুনলাম দু-মাসের ভাড়াটা দিয়ে আমি ঘর দুটো নিতে পারি।

সদানন্দ বিমর্ষ চিন্তিত মুখে বলে, ঘর দুটো ঠিক ছেড়ে দেবার কথা ভাবিনি, একখানা ঘর সাবলেট করব ভাবছিলাম। তা, আপনি যখন বলছেন—

চিকিৎসা

ফুটপাথের ধার ঘেঁষে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল। দেখেই টের পাওয়া যায় শহুরে মেয়ে। অর্থাৎ মফস্বল থেকে শহরে নতুন আমদানি নয়। রাজপথে চলার তার অভ্যাস নেই, খুব অন্যমনস্ক হয়ে থাকলেও অবচেতনা তাকে আপনা থেকে কতকগুলি সতর্কতা পালন করায় না, এটা বিশ্বাস কবাও কঠিন।

অথচ বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সে কোনোদিকে না তাকিয়ে হঠাৎ রাস্তায় নেমে কয়েক পা এগিয়ে যায়।

স্কুল-কলেজ আপিস যাবার সময় বাজপথে দ্রুতগামী গাড়ির যে দুমুখী স্রোত চলছিল। একেবারে তারই একটা ধারার মধ্যে !

মস্ত সেলুন গাড়িটা তাকে চাপা দিয়ে আহত বা নিহত করলে কারও কিছু বলার থাকত না। এমনভাবে যে চলন্ত গাড়ির সামনে এসে পড়ে, প্রাণপণে ব্রেক কষেও বাঁচাবার সময় বা ফাঁক রাখে না, সোজাসুজি তাকে চাপা দেবার অধিকার নিশ্চয় সে গাড়ির চালকের আছে।

কিন্তু গাড়িও মানুষ চালায় কিনা এবং জগতে এত সমারোহের সঙ্গে ছোটো ও বিরাট স্কেলে মানুষ মারা হ্যে থাকলেও মানুষকে বাঁচাতে চাওয়াটাই মানুষের ধাত কিনা, দুর্ঘটনাটা তাই হয়ে যায় একটু অন্য রকম।

ভাবনা-চিন্তার তো সময় ছিল না, সেলুন গাড়ির মোটাসোটা বেঁটে ড্রাইভারটি যা করে তার পিছনে নিজেকে বিপন্ন কবেও মানুষকে বাঁচাবার প্রকৃতিগত ঝোঁকটাই ছিল বলতে হবে।

তাছাড়া আর কোনো ব্যাখ্যাই হয় না তার কাজের। দাঁতে দাঁত চেপে ব্রেক কষার সঙ্গে সে ডাইনে হুইল ঘুরিয়ে দেয। বাঁয়ে ফুটপাতে মানুষের ভিড়। একজনকে বাঁচাতে গিয়ে দশজনকে মাবা বা জখম করার মানে হয় না। মেয়েটি ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়ে। গাড়িটা ধাক্কা দেয় চলন্ত ট্রামটাব গায়ে।

অদ্ভুত একটা আর্তনাদের মতো আওয়াজ ওঠে একসঙ্গে অনেকগুলি গাড়ির ব্রেক কষায়।

সেলুন গাড়িটার পিছনে আসছিল লম্বাটে পুরানো বড়ো একটা গাড়ি। ব্রেক কষেও সেটা এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সেলুনটাব উপরে।

পিছনের সিটের এক দিকের কোণে যে প্রৌঢ়বয়সি ভদ্রলোকটি বসেছিল, চোট লেগে সে অজ্ঞান হয়ে পাশের সুন্দরী মেয়েটির কোলে ঢলে পড়ে—সিনেমার চমকপ্রদ ঘটনার মধ্যে আসল রসালো দৃশ্যটির মতোই !

কী বিরাট ছন্দে কী গতিতে শহরের এই রাজপথে জীবনের স্রোত বয়ে চলেছিল, কী বিচিত্র অদ্ভুত ছিল হেঁটে চলা ট্রামে-বাসে গাদাগাদি করা নানাআকারের নানাধরনের ছোটোবড়ো নতুন পুরানো মোটর গাড়িতে চাপা রিকশা-সাইকেলে বসা মানুষগুলির বিভেদ আর সামঞ্জস্য—ব্যাঘাত ঘটে থেমে যেতেই যেন সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ট্র্যাফিক বন্ধ।

পুলিশ আসেনি, অ্যাম্বুলেন্স আসেনি কিন্তু লোকারণ্য সৃষ্টি হয়ে গেছে. সে অরণ্য ভেদ করে সাইকেলটিরও এগিয়ে যাবার সাধ্য নেই।

বাসের ড্রাইভার কন্ডাক্টর নিত্যই দেখছে এ রকম দুর্ঘটনা। একটা ফাঁক পেলেই হুস করে বেরিয়ে যেত ঘটনাস্থল পিছনে ফেলে। তাদের টাইমের সার্ভিস। দেরি হলে জরিমানা—কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়। আপিস টাইমে আধঘণ্টা রোজগার বন্ধ থাকলে মালিক বড়ো চটে যায়। বলে, চোখ-কান নেই ? সেন্স নেই ? অ্যাকসিডেন্ট ঘটলে ট্র্যাফিক বন্ধ হলে আধঘণ্টা এক ঘণ্টা কাবার হয়ে যাবে

খেয়াল নেই ? হুস করে বেরিয়ে যেতে পারলে না ? পাশের রাস্তায় ঢুকে একটু ঘুবে আসতে পারলে না ? বাস কিনে হয়েছে ঝকমারি। তোমাদের পেটেই সব যায় !

বোঝাই বাস, মাল বোঝাই লরি, মাল বোঝাই নিতে যাবার খালি লরি, উগ্র অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। পারলে যেন জনতাকে পিষে বেরিয়ে চলে যাবে।

পুলিশ না এলে তো আর সে সাহস সম্ভব নয়। শুধু ফোঁসে আর গর্জায়।

জনতা রাস্তা ছাড়ে না।

তারপর পুলিশ আসে। অ্যাম্বুলেন্স আসে।

সামান্য ব্যাপার। শুধু একটু ঠোকাঠুকি হয়েছে চলতি কয়েকটা গাড়ির।

কেউ মরেনি।

দুর্ঘটনার কারণ সেই মেয়েটার বাঁ হাতটা শুধু গুঁড়ো হয়ে গেছে আর ভেঙেছে দুটো-একটা পাঁজরার হাড়। সেলুন গাড়ির মোটাসোটা বেঁটে ড্রাইভারের ঘাড়টা শুধু একটু মচকে গেছে। বেশি রকম মুচড়ে গেছে বলেই জ্ঞান হারিযেছে, নইলে আঘাত তার তেমন মারাত্মক কিছু লাগেনি। কোথাও কাটেনি, রক্তপাত ঘটেনি।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি কেন জ্ঞান হারিয়েছে বোঝাই যায় না। বোধ হয় দেহযন্ত্রে কোনো বিকৃতি আছে। হঠাৎ আঁতকে উঠলেই অজ্ঞান হয়ে যায়। নইলে এত সামান্য একটু ঝাঁকানিতে কেউ এভাবে অচেতন হয় না।

ওই গাড়ির ড্রাইভারের চোট লেগেছে বরং অনেক বেশি। কপালের পাশেব দিকটা অবশ্য দেখতে দেখতে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে ভদ্রলোকের। কিন্তু একফোঁটা রক্তপাত যার ঘটেনি তাকে আহত বলা যায় কোন যুক্তিতে !

কেউ মবেনি, রক্তপাত হয়নি, সুতরাং সামান্য দুর্ঘটনাই বলতে হবে।

মিনিট কুড়িও লাগে না রাজপথটির ধাতস্থ হতে।

তারপর ঠিক আগের মতোই অবিরাম গতিতে মানুষ ও গাড়ির চলাচল দেখে মনে হয়, দুর্ঘটনার চিহ্ন কেন, স্মৃতি পর্যন্ত যেন উপে গিয়েছে।

সামনে খানিকটা ফাঁক পাওয়ায় পিছনের যে গাড়িটা ব্রেক কষে থামবাব সুযোগ পেয়েছিল, কারও এতটুকু চোট লাগেনি, তার ড্রাইভার জীবন ফুটপাথে চুপচাপ দাঁড়িয়ে বিড়ি টানে।

একটার পর একটা।

ভূপেশ বলে, দাঁড়িয়ে বইলে যে জীবন ? গাড়িতে স্টার্ট দাও, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

জীবন একটা ঢোঁক গেলে।

সন্ধ্যা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে, তোমার মুখ এ রকম শুকনো দেখাচ্ছে কেন ?

প্রাণপণ চেষ্টায় মুখের ভাব স্বাভাবিক রাখবার চেষ্টা করতে করতে জীবন বলে, ও কিছু নয়। শরীরটা আজ ভালো নেই।

ধীরে ধীরে এগিয়ে সে গাড়িতে ওঠে। ভেতরে তার যে কী ব্যাপার চলেছে, মাথা ঘুরছে বুক ধড়ফড় করছে, সর্বাঙ্গ কাঁপছে এটা ওদের জানতে দেওয়া যায় না।

একটা দুর্ঘটনা ঘটবার এতক্ষণ পরেও যার ভেতরে এমন ব্যাপার চলে, তাকে গাড়ি চালাবার ভার দিয়ে নিজেদের জীবন বিপন্ন করতে ওরা সাহস পাবে না, আজকেই মাইনে হাতে দিয়ে বলবে, ভালোয় ভালোয় বিদেয় হও !

এমনি ওরা তাকে পছন্দই করে ড্রাইভার হিসাবে, তার সাধারণ কথাবার্তা চালচলনও অপছন্দ নয় ; কিন্তু সে জানে মাঝে মাঝে তার মুখ যে খুব শুকনো আর বিষণ্ন দেখায়, অত্যন্ত অন্যমনস্ক হয়ে থাকে, ডাকলে কখনও চমকে উঠে খানিকক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে—এ সব লক্ষ করে ওদের মনে একটা খটকা লেগেছে।

একবার যদি টের পায় তার সত্যিকারের অবস্থা আর একদিনও ওরা তাকে বাখবে না।

ভূপেশ আর সন্ধ্যাকে আপিসে পৌঁছে দিয়ে ভূপেশ বলে, আজ আর আমাদের গাড়ির দরকার নেই। বাড়িতে ওরা কোথায় যাবে বলছিল, গাড়ি নিয়ে যাও।

গাড়ি নিয়ে ফিরে গিয়ে জীবন অনেকক্ষণ শুয়ে থাকে। খেয়ে দেযে আবাব বিছানা নেয়, কিছুক্ষণের জন্য একটু তন্দ্রাও আসে, তবু বাড়ির মেয়েদের সিনেমায় নেবার জন্য গাড়ি বার কবার সময় তার বুক কেঁপে কেঁপে ওঠে, সর্বাঙ্গ কেমন অবশ হয়ে আসে। দাঁতে দাঁত লাগিয়ে গ্যারেজে গিয়ে গাড়িতে উঠতে হয়।

সন্ধ্যায় বাড়িতে আসে অতিথি, হাসি-গল্প-গানে ড্রয়িংরুমটা যেন আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। বাইরে বাগানে দাঁড়িয়ে জীবন ভাবে, চোরাবাজারে টাকা করেও জীবনটা ওরা হাসি-আনন্দে ভরে তুলতে পাবে, কারও কিছু চুরি না করেও তার জীবনটা এমন দুঃখময় কেন ?

শাড়ি-গয়নায় চোখে ধাঁধা লাগিয়ে মেয়েরা বেরিয়ে আসে। ভূপেশের স্ত্রী প্রৌঢ়া সুপ্রিয়াও যেন নিজের মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেজেছে।

তার দি-ে চেয়ে জীবন কিছুক্ষণের জন্য তার নিজের চিন্তা ভুলে যায়। ভাবে, ভূপেশ যে সন্ধ্যাকে শুধু তাব বাড়ি থেকে তুলে নিজের আপিসে নিয়ে যায না, সিনেমা-হোটেলেও নিয়ে যায়, ফিরিঙ্গি পাড়ায় ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া করা সাজানো ঘরেও নিয়ে যায়, এটা জানলেও কি তুমি এ রকম সেজেগুজে হাসিমুখে সিনেমায় যেতে পারতে ?

জীবনের মাথা ঘোবে।

বুকেব মধ্যে ঢিপঢিপ করে। হঠাৎ ধড়াস কবে ওঠে হাত-পা কাঁপে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে। জল খেয়ে লাভ হয় না। জলে গলাও ভেজে না, তৃষ্ণাও মেটে না।

বেশি জল খাওয়ার দরুণ শুধু আরেকটা অস্বস্তি বাড়ে।

খিদে পায় এলোমেলোভাবে। কখনও অসহ্য চনচনে খিদে পায়, কখনও ভোঁতা হযে যায়। ভালো হজম হয় না। আর হয় না ঘুম।

নিয়মিতভাবে নয় কিন্তু পালা করেই তার দুঃখের দিনগুলি আসে।

ক-দিন ভালোই আছে, শরীবটা তাজা বোধ করছে, মনে অনুভব করেছে ফুর্তির ভাব, জগৎটাকে মনে হচ্ছে খাসা জায়গা, জীবনটা মনে হচ্ছে আনন্দময়—স্বপ্নের মতোই যেন কেটে যায় এ অবস্থাটা, দুঃস্বপ্নেব মতোই যেন শুরু হয় অস্বস্তি যাতনাবোধ অনিদ্রা আর আতঙ্কের দিনগুলি।

চেনা ডাক্তারকে দিয়ে তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করানো হয়েছে দেহটা এবং বক্ত থুথু ইত্যাদি সব কিছু।

কোনো খুঁত পাওয়া যায়নি।

রোগটা বোধ হয় আপনার মানসিক।

মানসিক কী রোগ ?

সেটা স্পেশালিস্ট বলতে পারবেন। আমার মনে হয় আপনি খুব দুশ্চিন্তা করেন।

শরীরটা বিগড়ে যায় কেন এছাড়া আমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই। কোনো ঝঞ্ঝাট নেই।

আপনি একবার কুমুদবাবুকে কনসাল্ট করুন।

কুমুদের ফি ভীষণ মোটা। তবে ডাক্তারি বিদ্যায় বা যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করায় তার ফাঁকি নেই।

প্রথম দিন প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ধরে কুমুদ নানাভাবে এই কথাটাই তাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল যে কারণ না জেনে বোগের চিকিৎসা করাব সাধ্য ভগবানের থাকতে পারে কিন্তু রক্তমাংসের মানুষ ডাক্তারের নেই এবং কোনো কথা গোপন করলে রোগের কাবণ খুঁজে বার করবার সাধ্য ডাক্তারের হয় না।

কোনো কথাই সে গোপন কবেনি কুমুদের কাছে। বলেছে, আমার জীবনে কিছুই গোপন করার নেই। অল্পবয়সে দু-একটা ছেলেমানুষি হয়তো করেছি, তারপর ভুলটুলও হয়তো কবেছি দু-একটা। কিন্তু সে সব এমন ব্যাপার নয় যে আপনাকে বলতে পাবব না।

কুমুদ প্রশ্ন করেছে, সে জবাব দিয়ে গেছে। ছেলেবেলা থেকে তার নিজের জীবনের কথা, বাড়ির লোকের কথা বন্ধুবান্ধবের কথা সব বিষয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন।

একদিনে হয়নি, অনেক দিন যেতে হয়েছে কুমুদেব কাছে।

এটা সম্ভব হয়েছে কুমুদের কাছে তাকে যে পাঠিয়েছে তারই মধ্যস্থতায়।

শংকর ডাক্তার কুমুদের পরিচিত, তারই অনুরোধে কুমুদ তার পাওনাটা জীবনের কাছ থেকে মাসে মাসে কিছু কিছু করে নিতে রাজি হয়েছে।

শংকর জোর দিয়ে কুমুদকে বলেছে, একবারে সব টাকা দিতে হলে সে চিকিৎসা চালাতে পারবে না। ওকে আমি অনেক দিন থেকে জানি, মানুষটা সত্যি অনেস্ট। আপনার পাওনা এক পয়সা মারা যাবে না।

প্রথমে একটু উদাসীনভাবে আরম্ভ করলেও কয়েক দিন জিজ্ঞাসাবাদেব পর তার অসুখটা চিকিৎসা করতে কুমুদের যেন বিশেষ আগ্রহ দেখা দিয়েছে।

প্রশ্নগুলি অবশ্যই চিকিৎসার পদ্ধতি অনুসারে সাজানো কিন্তু জীবনেব কাছে ভারী এলোমেলো ঠেকে। কিন্তু ভালো করে তার রোগটা বুঝবার জন্য কুমুদের আগ্রহ সে টের পায়।

আশা জাগে জীবনের। কুমুদের মতো ডাক্তার এতখানি আগ্রহের সঙ্গে এত যত্ন নিয়ে যখন তার চিকিৎসা করছে, হয়তো সেরে যাবে তাঁর দুর্বোধ্য অসুখ—ভিতরে আড়াল-করা অসুখ।

দু-তিন রকম ওষুধের ব্যবস্থাও করেছে কুমুদ। একটু খিদে বেড়েছে, মোটামুটি ঘুমও হয়।

সে রকম কষ্টকর হয়ে ওঠে না মাথা ঘোবা, বুক ধড়ফড় করা, গলা শুকিয়ে যাওয়া।

এইখানেই কিন্তু থেমে গেছে উন্নতি। আগের মতো কষ্টকর না হলেও অসুখটা তার রয়ে গেছে।

কেমন বিচলিত মনে হয়েছে কুমুদকে।

একদিন সে স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থেকে বলে, তুমি নিশ্চয় আমার কাছে কোনো গুরুতর কথা গোপন করছ।

গুরুতর কথা ডাক্তারবাবু ? কোনো সামান্য তুচ্ছ কথাও গোপন করিনি।

কুমুদ মাথা নাড়ে।

আমি স্পষ্ট ধরতে পেরেছি তোমার মধ্যে একটা কঠিন অশান্তি আছে, জোরালো সংঘাত চলছে। ব্যাপারটা না জানালে তো তোমায় সারাতে পারব না।

সে তো এই অসুখটার জন্য। আগে অশান্তি ছিল, কোনো কাজ ছিল না বলে, বড়ো দুরবস্থা হয়েছিল। ক-বছর ভালো মাইনের কাজ কবছি, এক রকম চলে যায়। এখন এই রোগটা ছাড়া আমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই।

কুমুদ বলে, না। অসুখের জন্য তোমার আসল অশান্তিটা নয়—ওই অশান্তিটার জন্যই তোমার অসুখ। এতে কোনো ভুল নেই, এটা ধরতেও আমার অসুবিধা হয়নি। এটার রকমটাও আমি ধরতে

পেরেছি ঠিক। গোপনে মানুষ খুন করার মতো খুব বড়ো রকম একটা পাপ করলে যেমন প্রতিক্রিয়া হয়, সেই ধরনের ব্যাপার। তোমার জীবনে নিশ্চয় একটা বড়ো রকম গোপন দিক আছে, নইলে এ রকম হতেই পারে না। আমাদের বিজ্ঞানের হিসাব ভুল হবার নয়। তোমার জীবনে গোপন দিক আছে এটা আমার আন্দাজ নয়। ডাক্তার যেমন স্পষ্ট লক্ষণ পেলে বলে দিতে পারে রোগীর শরীরে কী অসুখ, তেমনি স্পষ্ট লক্ষণ থেকে আমি তোমার ভেতরের ব্যাপারটা ধরেছি, এতে ভুল হওয়া অসম্ভব।

জীবন হাঁ করে চেয়ে থাকে। তার জীবনের একটা বড়ো গোপন দিক আছে, মানুষ খুন করার মতো সাংঘাতিক দিক, অথচ সে নিজেই তার কোনো খবর রাখে না !

কুমুদ বলেছে, এভাবে গোপন করলে তো চিকিৎসা সম্ভব নয়। গুরুতর ব্যাপার একটা আছে, ভেতর থেকে চাপ দিচ্ছে, তার লক্ষণগুলি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ব্যাপারটা কী না জানলে তো চিকিৎসা করতে পারব না, তোমার রোগও সারবে না !

জীবন ব্যাকুলভাবে বলে, বিশ্বাস করুন, আমি কোনো কথা গোপন করিনি।

কুমুদ অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে বলে, যদি ক্রিমিনাল কিছু হয়, বিপদে পড়ার ভয়ে বলতে বাধছে, তাহলে তোমায় আবার বলছি যে তুমি মস্ত ভুল করছ। তোমাকে বিপদে ফেলা যায় এমন কিছুই আমি জানতে চাই না। কারও নামধাম, কোথায় কবে ব্যাপারটা ঘটেছিল, এ সব আমার জানবার দরকার নেই। এ সব পয়েন্ট তুমি গোপন রাখতে পারো, বানিয়ে বলতে পারো। আমি শুধু জানতে চাই ব্যাপারটা কী ধরনের আর কীভাবে তার জের চলছে।

একটু থেমে কুমুদ আবার বলে, যেমন ধরো তুমি একটা খুন করেছিলে। কবে কাকে কীভাবে খুন করেছিলে তোমায় বলতে হবে না। আমায় শুধু জানাবে কেন খুনটা করতে হয়েছিল, এখনও তার জেরটা চলছে কেন। তুমি সত্যি খুন করেছ বলছি না কিন্তু। আমি তোমায় শুধু এটুকু বোঝাতে চাইছি যে খুন করে থাকলেও আমায় যেটুকু জানালে আমি তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারব না—আমায় সেইটুকু শুধু জানাও। যদি অন্যায় প্রেমের ব্যাপার হয়, আমাকে শুধু এইটুকু বলবে, আর কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবে যা থেকে আমার জানার সাধ্যও হবে না কার সঙ্গে তোমার অন্যায় প্রেম চলেছে।

জীবন ক্ষুব্ধস্বরে বলে, আপনি যেন ধরেই নিয়েছেন আমি মস্ত একটা পাপ করেছি, এখনও তার জের টানছি।

আমাকে সেটা ধরে নিতেই হবে। নইলে চিকিৎসা শাস্ত্রটা মিথ্যা হয়ে যায়। আমার হিসাবে পাপ নয়, তোমার কাছে পাপ। এই বিকারটা তোমার মধ্যে আছে। তা ন' হলে এ রকম অসুখ তোমার হতেই পারে না। ওটার চিকিৎসাই আমাকে করতে হবে।

জীবন হতাশ হয়ে বলে, আপনি কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না, কী বলব বলুন। ছোটোখাটো পাপকর্ম করেছি বা করছি বলে তো আমার জানা নেই !

কুমুদ গম্ভীর গলায় বলে, তাহলে আর টেনে কাজ নেই। তোমার কাছে আমার যা পাওনা আছে সেটা আর তোমাকে দিতে হবে না।

তাকি হয় ডাক্তারবাবু ! অ্যাদ্দিন চিকিৎসা করলেন, আপনার পাওনা টাকা আপনাকে দেব বইকী !

এ জীবনে আর অসুখটা সারবার আশা সে রাখে না।

কুমুদের মতো ডাক্তার যদি রোগ ধরতে না পেরে এমন আবোল-তাবোল কথা বলে, জীবনে বিশেষ কোনো অন্যায় কোনো দিন না করে থাকলেও গায়ের জোরে দাঁড় করায় যে কোনো গুরুতর

অন্যায় করার জন্যই তার এই রোগ, তাহলে আর সে কার কাছে যাবে, রোগ সারবার আশা করবে ?

শংকর ডাক্তার দেহটা সব রকমে পরীক্ষা করেও কোনো কারণ খুঁজে পায়নি। কুমুদ ডাক্তার তার মনকে পরীক্ষা করে বার করল এক কল্পিত কারণ। তার দেহ খুঁজে মন খুঁজে যদি সঠিক কারণটা না পাওয়া যায়, তবে আর আশা করা যায় কী করে ?

এটা তাহলে কোনো রোগ নয়। এ রকম যে তার হয় এটাই তার ধাত।

এই অস্থিরতা, কষ্টবোধ, অনিদ্রা অরুচি এ সমস্তের যে আক্রমণ হয় সেটা তার রক্তমাংসে জড়িয়ে আছে। চিকিৎসায় এর আর কোনো প্রতিকার নেই।

বড়ো একটা দাঁও মেরে মোটা টাকা লাভ করে ভূপেশ একটা ঝকঝকে নতুন গাড়ি কেনে। কিন্তু এমন সুন্দর দামি নতুন গাড়ি চালাবার আরাম, অন্য অনেক ধ্যাড়ধেড়ে গাড়ির ড্রাইভারদের ঈর্ষাতুর দৃষ্টি, দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি, কিছুই যেন খুশি করে না জীবনকে। কলকাতার রাস্তায় নতুন গাড়ি চালাতে তার যেন আরও বেশি ভয় করে, অস্বস্তিবোধ হয়।

সন্ধ্যা উচ্ছ্বসিত হয়ে গাড়ির এবং ভূপেশের রুচির প্রশংসা করে। এই গাড়ি চেপে আপিসে যাওয়া-আসার আনন্দে আরামে ও গর্বে যেন প্রকাশ্য পথেই নেতিয়ে পড়তে চায় ভূপেশের গায়ে।

বোধ হয় এই জন্যই অথবা পুরানো হয়ে যাওয়ায় তাকে আর ভালো লাগছিল না বলে অথবা অন্য একজনকে পছন্দ হয়েছে বলে, কাজের চাপ আর সময়ের অভাবের অজুহাতে ভূপেশ সন্ধ্যাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আপিস যাওয়া আর তাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া বন্ধ করে দেয়।

নলিনীকে আপিসে চাকরি না দিয়েই বিকালের দিকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে সিনেমায় হোটেলে যায়।

সুপ্রিয়া আর তার ছেলেমেয়েদের সাজসজ্জার চাকচিক্য, সিনেমা দেখা, বন্ধুদের বাড়িতে এনে হইচই করা বেড়ে গেছে।

সকলেই ফূর্তিতে ডগমগ—অন্তত বাইরে থেকে দেখলে তাই মনে হয়। মুখ শুধু শুকনো আর ক্লিষ্ট জীবনের।

বাড়ির সবাই নতুন গাড়ি চেপে মজা করতে যেতে চায়।

বড়োছেলে মোহিত আর মেজোমেয়ে নলিনী দুজনেই সেদিন সকালে ভূপেশের কাছে প্রায় একসঙ্গে দরবার করতে যায় যে দুপুরবেলা দুঘণ্টার জন্য গাড়িটা চাই।

ভূপেশের বড়োমেয়ে মোহিনী বিধবা।

ভূপেশের কাছে প্রথমে গিয়েছিল নলিনী। টের পেয়েই মোহিত তাড়াতাড়ি গিয়ে হাজির হয়।

বলে, আমার আজকে গাড়ি চাইই বাবা।

নলিনী হেসে বলে, আমি আগেই বাগিয়ে নিয়েছি।

দুজনে বেধে যায় প্রচণ্ড কলহ। যেন আঁচড়াআঁচড়ি কামড়াকামড়ি হয়ে যাবে !

ভূপেশ এক ধমকে তাদের ঠান্ডা করে দিয়ে বলে, আজ একজন কাল একজন নাও না ? গাড়ি কিনে ঝকমারি হয়েছে। এমন কী জরুরি কাজ তোমাদের যে আজ গাড়ি না হলেই চলবে না ! তুই তো বন্ধুদের নিয়ে বেড়াতে যাবি, মোহিত যখন বলেছে ওর জরুরি কাজ আছে, আজ ওই গাড়ি নিক। তুই কাল বেরোস।

ভূপেশ ধমক দিয়ে কথা কইলে ছেলেমেয়েরা আর মুখ খুলতে সাহস পায় না। সেকালের রাজার হুকুমের মতোই তার কথা সকলে নীরবে মেনে নেয়।

তখন ধীরে ধীরে আসে মোহিনী। বিধবার সাদা বেশেও যে এমন চাকচিক্য আনা যায় তাকে না দেখলে ধারণা করা কঠিন।

সে ম্লানমুখে বলে, বাবা, আমি আজ নতুন গাড়িটা নিয়ে একটু বেরোব। আজ ওনার মৃত্যুদিন। ওঁর মা-ভাইবোনেদের সঙ্গে দেখা করে আসব।

ভূপেশ বলে, ট্যাক্সিতে গেলে হয় না ?

না আমার গাড়িটা চাই।

তবে আর কথা কী।

ভূপেশ মোহিত আর নলিনীকে বলে, তোমরা কাল-পরশু গাড়ি পাবে। এ রকম সিরিয়াস ব্যাপারে আমি তো মোহিনীকে না বলতে পারি না।

মোহিনী উদাসীনার মতো বলে, আমায় একশোটা টাকা দিয়ো বাবা।

বাপের একশো টাকা নিয়ে বাপের নতুন গাড়িতে চড়ে মোহিনী বার হয়।

এ রাস্তাটা চওড়া এবং এটার নাম রোড, দেশের একজন নমস্য ব্যক্তির নামে। কিন্তু একটা দিক বন্ধ এ রাস্তাটার।

বড়ো রাস্তার মোড়ে পৌঁছবার আগেই জীবন জিজ্ঞাসা করে গাড়ি কোন দিকে যাবে।

মোহিনী মুচকে হেসে বলে, যেদিকে তোমার খুশি।

জীবন বলে, কোথায় যাবেন না বললে—

মোহিনী বলে, বললাম তো, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে আমি সেইখানেই যাব। সোজা কথা বুঝতে শেখো। এখানে গাড়ি থামিয়ে রেখো না, পাড়ার লোক দেখছে।

পিছনের সিট থেকে সামনে ঝুঁকে একশো টাকার নোট সে জীবনের বুক পকেটে গুঁজে দেয়।

নিশ্চিন্ত মনে সিটে বসে বলে, রাত দশটা হোক এগারোটা হোক, গাড়ি নিয়ে ফেরবার জন্য ভেবো না। আমি সামলে দেব, তোমার কোনো দোষ হবে না। বলব যে একটু সভা-টভা হয়েছিল, স্মৃতিপূজা হয়েছিল তাই ফিরতে পারিনি।

বুকপকেট থেকে নোটগুলি বার করে জীবন মোহিনীর কোলে ছুঁড়ে দেয়। বলে, আমার মাথা ঘুরছে, গা গুলোচ্ছে, চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছি না। চালাতে পারব না। আজ গাড়ি চালাতে গেলেই অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাবে।

গাড়ি ঘুরিয়ে আনার জন্য বড়ো রাস্তায় তাকে যেতে হয়। বড়ো রাস্তায় গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে সে মোহিনীকে নামিয়ে দিয়ে গ্যারেজে গাড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে !

গায়ের জ্বালায় বানিয়ে বানিয়ে মোহিনী কী বলে সেই জানে, খানিক পরেই ভূপেশ জীবনকে ডেকে পাঠায়। জীবন গিয়ে দ্যাখে রেগে একেবারে আগুন হয়ে আছে ভূপেশ।

সে গিয়ে দাঁড়াতেই যা-তা গালাগালি করে পায়ের চটি খুলে হাতে নেয়।

কিন্তু জীবনের মুখ আর হাত থেমেও যায় আচমকা। সে বোধ হয় কল্পনাও করেনি যে নিরীহ শান্ত প্রকৃতির জীবন এমনভাবে বুখে উঠতে পারে।

মাথা উঁচু করে জীবন বলে, আমারও মুখ আছে, পায়ে জুতো আছে, সেটা ভুলবেন না।

কী স্পর্ধা মানুষটার !

কিন্তু আর গালাগালি দিতে সাহস হয় না ভূপেশের। তার বড়োছেলে বলে, তোমায় আমরা পুলিশে দেব।

জীবন বলে, তা দিতে পারেন। একটা কিছু মিথ্যা দাঁড় করালেই হল। সেটা আপনাদের জানা আছে।

ভূপেশ বলে, তুমি এই দণ্ডে বেরিয়ে যাও।

আমার মাইনে চুকিয়ে দিন।

মাইনে পাবে না।

জীবন ধীরে ধীরে বলে, দেখুন, একটা কথা ভুলবেন না। গাড়ির ড্রাইভার অনেক ভিতরের কথা জেনে যায়। আমি অনেক ব্যাপার জানি, ফাঁস করে দিলে বেশ মুশকিলে পড়বেন।

মাইনে নিয়ে ছোট্ট সুটকেশ আর বিছানার বান্ডিল হাতে জীবন রাস্তায় বেরিয়ে যায়।

কোথায় যাবে ঠিক নেই, আরেকটা চাকরি জুটিয়ে নিতে কতকাল লাগবে জানা নেই, কিন্তু রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়ে জীবন মনেপ্রাণে একটা অদ্ভুত রকম স্বস্তি অনুভব করে।

ভিতরে একটা বিশ্রী কষ্টকর চাপ যেন হঠাৎ কমে গেছে, একেবারে হালকা হয়ে গেছে দেহমন !

এত স্পষ্ট হয় অস্বস্তি কেটে গিয়ে স্বস্তিবোধ করাটা, একটা দুঃসহ বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের আনন্দ, যে জীবন সত্যই আশ্চর্য হয়ে যায়।

একটা সস্তা হোটেলে গিয়ে ওঠে। তক্তপোশে বিছানাটা পেতে ঠিকঠাক করে নিতে নিতে ওই আরামটাই যেন গাঢ় ঘুম হয়ে তার চোখে ঘনিয়ে আসে।

বিছানায় শোয়ামাত্র গভীর ঘুমে সে অচেতন হয়ে যায়। সন্ধ্যাবেলা ঘুম ভাঙতে মনে হয় শুধু স্বস্তি নয়, একবেলা ঘুমিয়ে শরীর মন যেন আশ্চর্য রকম তাজা হয়ে উঠেছে।

পরদিন সে কুমুদেব কাছে যায়।

বলে, ডাক্তারবাবু, আপনি ঠিক বলেছিলেন। আপনাদের কী ভুল হতে পারে ! আমি সত্যি একটা মস্ত পাপ করছিলাম কিন্তু নিজেকে অন্য রকম বুঝিয়েছিলাম বলে ধবতে পাবিনি পাপ করছি।

কুমুদ বলে, এখন ধরতে পেরেছ ?

জীবন সায় দেয়।

পেরেছি বইকী। প্রায় চার বছব ধবে আমি একটা মহাপাপী বদলোকের কাছে চাকরি করছিলাম। প্রথমে তবু প'দে ছিল, তারপর কত রকম অকাজ কুকাজ যে করেছে, কত লোকের ঘাড় যে ভেঙেছে ! বাড়ির ছেলেমেয়েগুলি পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে বজ্জাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি সব জেনেও নিজেকে কী বোঝাতাম জানেন আমি ড্রাইভার, আমি খেটে পয়সা রোজগার করছি, ও লোকটা কী কবছে না করছে আমার তা দেখবার দরকার কী ! কাল একটা ব্যাপার ঘটায় আমাকে কাজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কী উপকাবটাই যে করেছে তাড়িয়ে দিয়ে। এখন বুঝতে পারছি ওদের অত বজ্জাতি আমার সইছিল না। গাড়িতে চেপে হাজার হাজার লোকের ঘাড় ভাঙার ব্যবস্থা করতে যাবে, গরিব নিরুপায় মেয়ের সর্বনাশ করতে যাবে—গাড়ি চালাব আমি কিন্তু ভাবব যে আমি তো কিছু করছি না—সে হয না।

কুমুদ একটু হাসে।

জীবন বলে, আর চিকিৎসার দবকার হবে না। আমার রোগ আরাম হয়ে গেছে।

মীমাংসা

রাত নটার সময় গম্ভীর চিন্তিত মুখে পঙ্কজ বাড়ি ফেরে।

আজ আর কাগজের আপিসে বসে থাকতে ইচ্ছা হল না। এত আশা করে বেরিয়েছিল যে টাকার ব্যবস্থা বোধ হয় হয়ে যাবে, সম্ভব হবে সংকট কাটিয়ে উঠে কাগজটা চালু রাখা।

ভূদেবের মুখ দেখেই সে অনুমান করেছিল, আশা তার পূর্ণ হবে না। টাকার জন্য ভূদেবের যে চেষ্টা সফল হবে মনে হচ্ছিল, সেটা নিশ্চয় ভেস্তে গেছে !

ভূদেব অবশ্য প্রথমেই বলেছিল, এ পার্টি টাকা দিতে রাজি আছে। ভূদেবের মুখ আর বলার ভঙ্গি দেখে তবু পঙ্কজ আশা করতে ভরসা পায়নি।

ভূদেবের পরের কথায় জানা গেল যে তার আশঙ্কাই সত্য। ঈশ্বরলাল টাকা দিতে রাজি আছে, কিন্তু কেবল তাদের শর্তে নয় আবও একটা শর্ত সে চাপাতে চায়। কাগজের পলিসি সে খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করবে।

এই শর্তে তার টাকা নেওয়া যায় কী করে। আজ তিন বছর যে নীতি অনুসরণ করে, তারা দুই বন্ধু প্রাণপণ চেষ্টায় কাগজটা চালিয়ে এসেছে, সেই নীতিই যদি বদল করতে হয়, তার চেয়ে কাগজ বন্ধ করে দেওয়াই ভালো।

তাব মুখ দেখে ছোটোবোন কল্যাণী একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে, টাকার ব্যবস্থা হল না দাদা ?

না। দেশের স্বার্থের বদলে ওদের স্বার্থ দেখবার পলিসি নিলে টাকা দেবে।

জামাকাপড় ছেড়ে স্নান করে পঙ্কজ সবে বাথরুম থেকে বেরিয়েছে, কল্যাণী বলে, বিভাদি একটা চিঠি দিয়ে গাড়ি পাঠিয়েছে দাদা।

পঙ্কজ খাম খুলে চিঠি পড়ে। দুলাইন চিঠি—বিভার বড়ো বিপদ পঙ্কজ যেন এখুনি একবার যায়।

বিভাদি কী লিখেছে ?

পঙ্কজ চিঠিখানা তার হাতে দেয়। চিঠি পড়ে কল্যাণী বলে, নিশ্চয় গুরুতর কিছু ঘটেছে। নইলে এমনভাবে ডেকে পাঠায় ? খোঁড়া মেয়েটার কথা ভাবলে এমন কষ্ট হয় !

পঙ্কজ বাইরের ঘরে গিয়ে বিভার বাবা নগেনের ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে, কী হয়েছে ?

বিপিন বলে, কিছু তো হয়নি। আমায় চিঠি দিয়ে আপনার কাছে আসতে বললেন। আমি কাগজের আপিস হয়ে আসছি। দিদিমণি আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।

পঙ্কজ বলে, আজ আমি যেতে পারছি না। দিদিমণিকে গিয়ে বোলো, কাল সময় করে যাব।

কল্যাণী যেন স্তম্ভিত হয়ে যায়।

একটা খোঁড়া মেয়ে এমন করে বিপদের কথা লিখে যেতে বলেছে, তুমি যাবে না দাদা ?

কাল গেলেও চলবে। তেমন জরুরি ব্যাপার হলে কী বিপদ, সেটা খুলে লিখত।

চিঠিতে লেখা যায় না, এমন হতে পারে তো ! মেয়েদের কত কী হয়।

পঙ্কজ বোনের মুখের ভাব দেখে একটু হেসে বলে, মেয়েরা আবার সামান্য কারণে পাগলও হয়।

খেয়ে উঠে পঙ্কজ সিগারেট টানে, তাদের কাগজটা বাঁচিয়ে রাখার উপায়ের কথা ভাবে। ভূদেবও টাকা দিয়েছে, খেটেছে কাগজটার পেছনে, কিন্তু তার মতো প্রাণপাত করেনি। কাগজটা তুলে দেবার কথা ভাবলে জীবনটা যেন শূন্য হয়ে যাবে মনে হয়।

কত মানুষের কত টাকা অকেজো হয়ে পড়ে আছে কিন্তু তার কাগজটা চালু রাখার জন্য কিছু টাকা লাগাতে সবাই নারাজ। বিভার বাবা নগেনেরও কত টাকা, খোঁড়া কুৎসিত একটা মেয়ে ছাড়া তার কেউ নেই, কিন্তু কাগজটার জন্য টাকা ধার চাইলে বা কাগজের অংশ কিনে নিতে বললে সে ঘাড় নাড়বে।

ঘুম আসবে না, তবু শুয়ে পড়ার কথা ভাবছে এমন সময় তাকে আশ্চর্য করে দিয়ে বিভা নিজেই এসে হাজির হয়। কষ্টে গাড়ি থেকে নেমে লাঠি ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ভেতরে আসে।

আপনি তো গেলেন না, আমি নিজেই এলাম !

বয়স হবে তেইশ-চব্বিশ, দুটি পায়ের পাতাই তার দুমড়ানো। মুখখানা লাবণ্যে কমনীয় মনে হতে পারত, কিন্তু অতিরিক্ত কালো রোমের জন্য সব লাবণ্য মাটি হয়ে গেছে।

পঙ্কজ বলে, এতই জরুরি ব্যাপার ?

বিপদে পড়েছি, জরুরি নয় ?

কল্যাণী জিজ্ঞাসা করে, কী হয়েছে বিভাদি ?

বিভা বলে, তুই পরে শুনিস ভাই। পঙ্কজদার সঙ্গে আমি একটু পরামর্শ করে নিই।

কল্যাণী ভিতরে চলে গেলে বিভা কোনো রকম ভূমিকা না করেই সোজাসুজি তার বিপদেব কথা পাড়ে। বলে, বাবা আবার আমার বিয়ের ব্যবস্থা করছে। বাবার আপিসেই কাজ করে, আপনি বোধ হয় চেনেন—নাম হল রমেশ সরকার।

পঙ্কজ বলে, চিনি। ছেলেটির স্বভাব ভালো।

বিভা ফুঁসে ওঠে, ছাই ভালো। টাকার লোভে বড়োলোকেব খোঁড়া কুৎসিত মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে, সে আবার ভালো ! এদের চেয়ে হীন অমানুষ আর হয় ?

রাগ সামলে বিভা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, আপনি আমায় বাঁচান পঙ্কজদা। কালকেই বোধ হয় আশীর্বাদ করতে আসবে।

নগেনবাবুকে জোর করে বলো না তোমার অনিচ্ছার কথা ?

বিভা একটু হতাশার হাসি হাসে।

বলতে বাকি বেখেছি নাকি ? রেগে কেঁদে কতরকমভাবে কতবার বলেছি। বাবা আমার সব কথা শোনে, বিয়ের ব্যাপারে শনুবে না। আপনিই তো বলেন ছেলেটার স্বভাব ভালো, স্বাস্থ্য ভালো, দেখতে শুনতে ভালো—এ সুযোগ বাবা কিছুতেই ছাড়বে না।

একটু থেমে বিভা মুখ বাঁকিয়ে বলে, বাবার কী হয়েছে আমি জানি। বাবার মনে ভয়ানক আতঙ্ক—বয়স হয়েছে, আমি পাছে কিছু করে বসি। বিয়ে হলে আমার স্বাদ-আহ্লাদ মিটবে, আবার কিছু যদি করেও বসি আসবে যাবে না।

বিভা তীব্র জ্বালাভরা হাসি হাসে।

ভালো ছেলে কিনে আনবে তবু আমি বিয়ে করতে চাই না, এতে আরও বেশি ভয় হয়েছে বাবার। নিশ্চয় কিছু গোলমাল আছে ভেতরে। আমায় যে বিয়ে করবে সে টাকার জন্যই করবে, এ রকম লোকের কথা ভাবলেও যে আমার ঘেন্না হয়, গা ঘিনঘিন করে, বাবা এটা বুঝবে না।

পঙ্কজ বলে, কী করে বুঝবেন ? উনি তো জানেন টাকার জন্যই মানুষ সব করে। তুমিও বুঝতে না, কেনা বর পেয়ে খুশিই হতে, কলেজে পড়ে পাঁচজনের সঙ্গে মিলেমিশে তোমার মাথাটা বিগড়ে গেছে।

শুধু সে জন্য নয়। আপনার কাছে পড়ার জন্যেও। আপনার কাছেই শিখেছি, খোঁড়া হলে কুৎসিত হলেই কারও জীবন ব্যর্থ হয় না, জীবনটা সার্থক করার, সুখী হবার অনেক উপায় আছে।

পঙ্কজ খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, শিখেছ অনেক কিছু, শুধু মনের জোরটা শিখতে পারোনি। পারলে এ রকম পাগলের মতো ছুটে আসতে হত না।

বিভা নীরবে চেয়ে থাকে।

পঙ্কজ বলে, এই বয়সে তোমার মতো মেয়ের বিয়ে জোর করে কোনো বাবা দিতে পারে ? এ দিকে বিয়েটাকে বলছ ভয়ানক বিপদ, বিয়ে হলে তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে—অথচ সেটা ঠেকাবার জন্য একটু কাঁদাকাটার বেশি কিছু করতে পারো না। বিপদ কঠিন হলে কঠিন ব্যবস্থা করতে হবে না ?

বিভা চেয়েই থাকে।

পঙ্কজ সিগারেট ধরায়। বিভা লক্ষ করছিল আজ সে ঘনঘন সিগারেট ধরাচ্ছে।

বাবাকে জানিয়ে দাও, বুঝিয়ে দাও যে বিয়ে তুমি কিছুতেই করবে না, মরে গেলেও নয়। সে জন্য যা করা দরকার করতে প্রস্তুত হও।

কী করব ?

পঙ্কজ এবার হাসে।

এখনও জিজ্ঞেস করছ কী করবে ? কত কী করার আছে। কিছুদিনের জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়ি কিংবা হোটেলে গিয়ে থাকবে। নগেনবাবু যতক্ষণ না কথা দেবেন যে, তোমার বিয়ের চেষ্টা কববেন না, বাড়ি ফিরতে রাজি হবে না।

ও !

তুমি সত্যি বিয়ে করবে না, এটা টের পেলে কি আর নগেনবাবু চেষ্টা কববেন ? কিন্তু তোমাকেই শক্ত হয়ে সেটা বুঝিয়ে দিতে হবে তো ওঁকে ?

বিভা বলে, বুঝেছি। ভাগ্যে আপনার কাছে এসেছিলাম।

ভিতরে গিয়ে বিভা মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে। পঙ্কজের মা-র প্রশ্নের জবাবে জানায় সে খেয়ে এসেছে।

কল্যাণীর কাছে পঙ্কজের কাগজের সমস্যার কথা শুনে আপশোশ করে বলে, ইস ! বাবা যদি একটু কম কৃপণ হত ! কাগজ-টাগজের ব্যাপার বোঝে না কিনা, এ দিকে টাকা লাগাতে তাই ভয় পায়।

একটু আনমনা মনে হয় বিভাকে। মেয়েদের খাওয়া হয়ে যাবার পরেও সে উঠবার নাম করে না।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাথরুম থেকে ঘুরে এসে কল্যাণী বলে, তুই কোন বিছানায় ঘুমাস ভাই ?

কল্যাণী তার বিছানা দেখিয়ে দিলে, সে একেবারে শুয়ে পড়ে।

বলে, আমি আজ তোর কাছে ঘুমাবো। ড্রাইভারকে বলে আয় তো গাড়ি নিয়ে চলে যাক। বলিস কালকেও গাড়ি নিয়ে আসবার দরকার নেই।

কল্যাণী খুশি হয়ে বলে, তুমি থাকবে আমাদের বাড়ি ? কী ভাগ্যি !

কার ভাগ্যি সে তুই বুঝবি না !

ঘণ্টাখানেক পরে অবশ্য গাড়ি আবার ফিরে আসে, নগেনকে নিয়ে।

অন্য ঘরের আলো নিভে গিয়েছিল, আলো জ্বলছিল শুধু পঙ্কজের ঘরে। সে বাইরে গিয়ে দরজা খুলে নগেনকে ভিতরে আনতে আনতে অন্য ঘরের আলোও জ্বলে ওঠে।

নগেন রেগেছে টের পাওয়া যায়।

পঙ্কজকে সে বলে, কী বুদ্ধি মেয়েটার ! কাল সকালে আশীর্বাদ করতে আসবে, আজ রাত্রে ও এখানে থেকে গেল, আবার বলে দিয়েছে, কালকেও গাড়ি আনবার দরকার নেই।

পঙ্কজ বলে, বিভা কল্যাণীর সঙ্গে শুয়েছে। আপনি ও ঘরেই চলুন।

কল্যাণী আর বিভা দুজনেই উঠে বসেছিল।

নগেন ভূমিকা না করেই বলে, কাল সকালে আশীর্বাদ হবে, তুই এখানে থেকে গেলি কী রকম ?

বিভা বলে, কাল আশীর্বাদ বলেই থেকে গেলাম।

নগেন প্রাণপণে নিজেকে সংযত রেখে বলে, পাগলামি কোরো না। আমার সঙ্গে ফিরে চলো। তোমার মা ওদিকে উতলা হয়ে আছেন।

বিভা বলে, আমি যাব না। তুমি বুঝতে পারছ না। আমি ছেলেমানুষ নই, ছেলেমানুষি করেও তোমায় বারণ করিনি। বলছি আমার বিয়ে-টিয়ে হতে পারে না, আমি মরে গেলেও হতে দেব না, তুমি কিছুতেই শুনবে না আমার কথা। অগত্যা কী করি, বাড়িই ছাড়তে হল আমাকে।

নগেন বাক্যহারা হয়ে থাকে।

বিভা বলে, তুমি যদি রাগ করে আমায় ত্যাগ করো, করবে। আমি নিজের ব্যবস্থা করে নেব। আমি গায়ে বিষ্ঠা মাখতে পারব, কিন্তু তোমার কেনা মানুষকে বিয়ে করতে পারব না।

নগেন রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলে, তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

বিভা বলে, হলে কী করব ? আমার মাথা নিয়েই চলতে হবে তো আমাকে।

রাগরাগি করে নরম হয়ে বুঝিয়ে অনেকক্ষণ মেয়ের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে নগেনকে অগত্যা ফিরেই যেতে হয়।

বিভার ঘুম আসে না। কল্যাণীরও নয়।

বিভা বলে, আমার নয় মাথা গরম হয়েছে বুক ধড়ফড় করছে, ঘুম আসছে না, তোর কী হল ?

কল্যাণী কাতরভাবে বলে, মাঝরাতে দাদা ছাদে পায়চারি করছে। কী না করেছে দাদা কাগজটার জন্য। এমন একটা খাঁটি কাগজ, টাকার অভাবে তুলে দিতে হবে।

বিভা বলে, সত্যি। ভাবলেও কষ্ট হয়।

সকালে চা খাবার সময় পঙ্কজের মুখে রাত জাগার ছাপটা স্পষ্টই দেখা যায় কিন্তু দুশ্চিন্তার ছাপটা যেন কম মনে হয়।

চা খাওয়া হলে পঙ্কজ বলে, কল্যাণী, তুই একটু ও ঘরে যা তো, বিভার সঙ্গে আমার একটু দরকারি কথা আছে।

কল্যাণী চলে গেলে পঙ্কজ বলে, আমিও এক বিপদে পড়েছি জানো তো ? কাগজটা নিয়ে ?

বিভা বলে, শুনলাম। ঠিক এই সময়টা বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল, নইলে অন্তত চেষ্টা করে দেখতাম !

পঙ্কজ শান্তভাবে বলে, তুমি আমার কাগজটাকে বাঁচাতে পার।

বিভা আশ্চর্য হয়ে চেয়ে থাকে।

পঙ্কজ বলে, টাকার জন্যে তোমায় যদি বিয়ে করতে দাও।

বিভার মুখ হাঁ হয়ে যায়। সে কথা বলতে পারে না।

পঙ্কজ বলে তোমার জন্য ঠিক প্রেম হয়তো আমার নেই, কোনোদিন কোনো মেয়ের জন্য থাকবে বলেও মনে হয় না। তবে তোমাকে আমি স্নেহ করি। এই মমতা তুমি পাবে।

বিভা কাতরভাবে বলে, আপনি আমায় বিয়ে করবেন ?

দোষ কী ? তোমার বাবাও খুশি হবেন।

কিন্তু আপনার যে খোঁড়া কুচ্ছিত বউ হবে !

পঙ্কজ বলে, তা হোক না। কাগজটা বাঁচাতে পারলে খোঁড়া বউয়ে আমার আপত্তি নেই।

বিভা মাথা নত করে থাকে।

পঙ্কজ ধীরে ধীরে বলে, তবে একটা খুব গুরুতব কথা আছে। আমার ওপর তোমার ঘেন্না জন্মাবে কি না।

বিভা মাথা তুলে বলে, না। টাকার লোভ তো আপনার নয়, কাগজটার জন্য, আদর্শের জন্য। আমার বরং—

কথাটা তার গলায় আটকে যায়।

তোমার বরং ?

আমার ববং ভক্তিই বেড়ে যাবে।

বিভা একটু হাসে।

সুবালা

ভোরে অঘোরদের বাড়ি দুধ আনতে গিয়ে রোজই পঙ্কজ বউটিকে দেখতে পায়। অঘোরদের বাড়তি ফেলনা ছোটো চালাঘরটা কিছুদিন হল ভাড়া নিয়েছে—দুমাসের ভাড়া আগাম দিয়ে। কোলে একটি বছরখানেকের ছেলে। সঙ্গে থাকে কেবল বুড়ি দিদিমা।

বুড়িকে প্রথম দিন দেখে পঙ্কজ শিউরে উঠেছিল। খড়িতোলা কালচে লোল চামড়ায় ঢাকা একটা যেন কঙ্কাল, বয়সের ভারে সে জীবন্ত কঙ্কালটা আবার বাঁকা হয়ে গেছে। মাথায় ধোঁয়াটে রংয়ের জট, ছানি-পড়া চোখ। এই বয়সে এই দেহের ভার বয়ে সে উদ্‌বাস্তু হয়ে এসেছে নতুন আস্তানার খোঁজে ! হয়তো এই যুবতি নাতনিটার জন্য অথবা যে ক-টা দিন বেঁচে থাকবে সেখানে তাকে দেখবার কেউ নেই বলে।

সুবালা সায় দিলে বলে, হ। আত্মীয়কুটুম যাগো ভরসায় ছিলাম, তারা পলাইয়া আইবো, আমরাও লগে আইলাম। করুম কী।

নদীর দেশের মেয়ে, সুবালার গায়ের মেটে রংটা যেন পলি-পড়া নদীর বুকের ভিজা চরের মতো সরস আর মসৃণ। লাবণ্য যেন চোখ জুড়িয়ে দেয়। গরিবের মেয়ে গরিবের বউয়ের দেহে এ লাবণ্য কোথা থেকে আসে, কীসে সম্ভব হয়, পঙ্কজ তা জানে। সেও ওই নদীর দেশেরই মানুষ।

সারাবছর ভাত হয়তো জুটত না পেট ভরে। কিন্তু পাড় ঘেঁষা নদীর জলে খালে ডোবায় মেয়েরাও কুঁড়ো জালে ধরতে পারত কুচোমাছ, অনেক রকম জলচর জীবের ছানা আর কাউটা-কাছিমের ডিম। বিষহীন মোটা মোটা জলের সাপ একটা দুটো। পেঁয়াজ আর খানিকটা লংকাবাটা দিয়ে রাঁধলে মাছ মাংসের শোক ভোলা যেত। কলমি পলাশ কচু ইত্যাদি অনেক রকম শাকপাতা যত খুশি কুড়িয়ে আনলেই চলত। ঘরের চালায় ফলত লাউকুমড়া। বিনা পয়সায় কিংবা সামান্য দামে মিলত কয়েক রকম ফল।

দু-একমুঠো চাল জোগাড় হলেই চালিয়ে নেওয়া যেত পুরানো আদিম উপায়ে শরীর পোষণ।

একখানা পুরানো শাড়ি আলগা করে গায়ে জড়ানো থাকে। ছেলেকে মাই নিয়ে দাওয়ায় শুইয়ে ঘর ঝাঁট দেয়, গামছা পরে বাসন নিয়ে ঘাটে যায়, গা ধুয়ে বালতি আর মেটে কলসিতে জল আনে দু-তিন দফায়।

একটু কম মনে হয় তার লজ্জাবোধ।

দু-তিনজন মানুষ দুধ নিতে এসে দাঁড়িয়েছে, দুধ দুইতে দুইতে অঘোর তার দিকে তাকাচ্ছে, এটা যেন সে খেয়ালও করে না। খেয়াল করলেও বোধ হয় গ্রাহ্য করে না।

পঙ্কজ জানে, গ্রাম কেন, শহরতলিতেও যে সব এলাকায় মেয়েদের খোলা ডোবা পুকুরই একমাত্র অবলম্বন, শহরের মেয়েদের মতো শ্লীলতা বজায় রেখে চলা তাদের পক্ষে সম্ভবও নয়, এটা নিয়মও নয়। অবস্থার সঙ্গে মানিয়েই তো চালচলন হবে মানুষের। কিন্তু এই বয়সে এতটা শিথিলতাও আবার নিয়ম নয়। ডুমুরের মতো দু-তিনটি ছেলেমেয়ে হলে, বয়স আর একটু বেশি হলে, আশেপাশে চালাঘরগুলির পুরানো বাসিন্দা ও উদ্‌বাস্তুদের সঙ্গে সুবালার চালচলনও চমৎকার মানিয়ে যেত।

ছেলে কোলে সুবালা দাওয়ায় বসলে তার পাকা গিন্নি পাকা মায়ের মতো বসার ভঙ্গি দেখে দেখে, মুখের উদাস নির্বিকারভাব দেখে, পঙ্কজের অস্বস্তি কেটে যায়।

অঘোরের দুধ দোয়া আর ডুমুরের পোয়া পোয়া দুধ মেপে দেওয়া দেখতে দেখতে সে হয়তো জগৎসংসার ভুলে গিয়ে ভাবছে, ছেলেটার জন্য এক ফোঁটা দুধ কিনতে পারলে ভালো হত।

দুধ দোয় অঘোর, দুধ মেপে দেয় তার বউ ডুমুর।

অঘোরকে সে একবোরেই বিশ্বাস করে না। এক টাকা সের সামনে দোয়া দুধ, শ্যামবাবুর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে সে মাপার কায়দায় তাকে একপো দেড়পো করে দুধ বেশি দিয়ে দিত। মাসে দশ-বারো টাকার দুধ বেশি দিয়ে খুশি থাকত চার-পাঁচটা টাকা পেয়ে। যা পায় তাই তার লাভ !

কে জানে অন্য বাবুদের সঙ্গেও এ রকম বন্দোবস্ত ছিল কি না। টের পাবার পর ডুমুর আজকাল দুধ দোয়ার সময় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে, নিজে দুধ মাপে। যে মন্দ মানুষ বউয়ের ঘাড়ে খায় আর চোরাবাজারি একটা বজ্জাত লোকের ফুটফরমাস খেটে হাতখরচার পয়সা কামায়, এমনি নেমকহারামই সে বোধ হয় হয়।

ভদ্দরলোকদেরও বলিহারি যাই, ডুমুর বলে ঝংকার দিয়ে, সোয়ামিকে দিয়ে ইস্তিরির ঘরে চুরি করতে পিবিত্তিও হয়।

অঘোরের সামনেই সে বলে।

অঘোর কখনও মুখ বাঁকায়, কখনও মুচকে একটু হাসে।

তাড়াতাড়ি ঘরের কাজ আর রাঁধাবাড়া সেরে মুখে দুটি গুঁজে ছেলে কোলে কোথায় যেন চলে যায় সুবালা সারাদিনের মতো। বুড়ি দিদিমা একলাই ঘরে পড়ে থাকে।

পঙ্কজ আজ তাড়াতাড়ি বার হয়েছিল, পথে একটা কাজ সেরে আপিস যাবে।

সুবালাও ছেলে কোলে বাসের জন্য কাছে এসে দাঁড়ায়।

কই যাইবা ?

কামে যাবু। কাম না করলে খামু কী ?

সেই শাড়িখানাই তেমনি আলগা করে পরা, বোধ হয় আর কাপড় নেই। পথে বার হবার জন্য সিঁথিতে সে বেশি করে সিঁদুর দিয়েছে, কপালে স্পষ্ট করে বড়ো ফোঁটা এঁকেছে।

পঙ্কজ সহানুভূতির সঙ্গে সায় দিয়ে বলে, তা তো বটেই। তোমার সোয়ামি কই ?

সুবালা মুখ বাঁকিয়ে বলে, কে জানে উপায়ের ধান্ধায় কোন চুলায় গেছে।

খানিক চুপ করে থেকে বাস আসছে দেখে পঙ্কজ হঠাৎ প্রশ্ন করে তুমি কী কাম করো ?

সুবালা বলে, করি এটা-ওটা যা পাই।

টের পাওয়া যায়, কী কাজ করে স্পষ্ট জানাতে সে নাবাজ।

পুরো আপিস টাইমের মতো ভিড় না হলেও বাসে কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে। পঙ্কজকেও দাঁড়াতে হয়। সুবালা বসে লেডিজ সিটে।

বসে পঙ্কজকে চমৎকৃত করে দিয়ে বুকের কাপড় সরিয়ে ছেলের মুখে মাই গুঁজে দেয়। গাড়ি বোঝাই পুরুষের মধ্যে নয়, সে যেন বসে আছে নির্জন ''রের কোণে, এমনি সহজ নির্বিকারভাবে মুখ তুলে শান্তদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

পঙ্কজ বুঝতে পারে এটা তার পুরুষদের তুচ্ছ করা, অবজ্ঞা করা নয়। এতগুলি পুরুষের দৃষ্টিপাত তার কাছে অতি সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার, সূর্য যেমন বাসের জানালা দিয়ে তার গায়ে রোদ ফেলছে আলো ফেলছে, তেমনি সাধারণ ব্যাপার—এ জন্য বিব্রত বা বিচলিত হবার কোনো কারণ তার নেই।

বুক ফুলে ওঠে পঙ্কজের। এ তো গেঁয়োমি, অসভ্যতা বা অশ্লীলতা নয়, এ যে বিদ্রোহ ! তার দেশের এই কচিমাটি যেন ইংরেজি মার্কিনি নোংরামি ও অশ্লীলতা প্রচারের বিরুদ্ধে বাস্তব কার্যকরী প্রতিবাদ—বিদ্রোহের একটি জীবন্ত প্রতীক।

তোমরা সিনেমায় পার, রং-বেরং শখের পত্রিকায় পার, গোপন পুস্তিকা, গোপন ফটোতে পার—দাম নিতে পার, স্বার্থের খাতিরে পার।

আমি মা এই চিন্তায় নিজের যৌবন ভুলে গিয়ে সন্তান গায়ের রক্ত জল করা মধু পান করানোর প্রয়োজনে পার কি, এমন সহজ স্বাভাবিক জোরের সঙ্গে তেজের সঙ্গে ?

সুবালা কী কাজ করে সেদিনই যে নিজের চোখে দেখে জেনে যাবে পঙ্কজ কল্পনাও করেনি।

নিজের কাজে সে নেমে যায় আগেই। কাজ সেরে আবার বাসে উঠে যেতে যেতে বড়ো একটা চৌমাথার কাছে বাস দাঁড়ালে সে দেখতে পায় পাশের রাস্তায় চৌমাথার কিছু তফাতে ফুটপাতে বসে গামছা বিছিয়ে ছেলেকে সামনে ধরে সুবালা ভিক্ষা করছে।

পথেঘাটে দেখা হলে বাড়িতে এলে আশেপাশের মেয়েরাও জানতে চায় সারাদিন সুবালা কোথায় থাকে, কী করে। কীভাবে সে দিন চালাচ্ছে জানবার জন্য উদ্‌বাস্তু অসহায়া মেয়েদের দেখা যায় আরও বেশি কৌতূহল।

রুগ্‌ণ স্বামী আর তিনটি বাচ্চা নিয়ে বিব্রত ইছামতী প্রায় ধন্না দেয় তার কাছে।

বলে, চাউল আইনা বেইচা পারি না আর টানতে। আনার খরচ, ঘুষ—মাঝে মাঝে চাউল কাইড়াও লয়। আমারে কইয়া দে—তুই যা করস আমিও তাই করুম।

সুবালা বলে, তুমি পারবা না দিদি, তাছাড়া আমার কামে লাভও বেশি নাই।

ইছামতী বাঁকা চোখে তাকায়।—পারুম না ক্যান ? লাভ হইব না ক্যান ? বয়স নাই চেহারা নাই বইলা ?

সুবালা দুঃখের হাসি হাসে।—দ্যাখো না সারাডা দিন বাইরে কাটাই ? সোয়ামিরে ফেইলা পোলাপালগো ফেইলা তুমি পারবা ? আমি ভিক্ষা করি, গতর খাটাই, যেমন সুবিধা। তুমি যা নিয়া আছ তাই নিয়া থাকো।

ডমুরও কৌতূহল প্রকাশ করে। বলে, সত্যি, কোথায় যাও, কী কর সারাটা দিন ? আমায় বললে দোষ নেই। মেয়েছেলে বিপাকে পড়েছ, যেভাবে পার রোজগার করবে—বাছবিচার থাকলে চলবে কেন ? তুমি বদ কাজ করো জানলেও আমি তোমার নিন্দা করব না ভাই।

বলে, বেরোজগেরে পুরুষগুলি পাজির একশেষ। নইলে এমনভাবে তোমার দায় এড়িয়ে পালায় !

সুবালা বলে, সে ক্যান পালাইবো ? পলাইয়া আইছি তো আমি ! কাম নাই উপায় নাই, মাথা গেছে খারাপ হইয়া—যত চোট আমার উপরে। তুমি তো দিদি সুখেই আছ, সোয়ামি কত খাতির কইরা মন জোগাইয়া চলে।

ডুমুর বলে, খেতে-পরতে দিচ্ছি, খাতির করবে না, মন জোগাবে না ?

সুবালা মাথা নাড়ে। আমিও খাওয়াইতাম ভিক্ষা কইরা। জ্বালা য্যান বেশি হইত, পুরুষ হইয়া আমার রোজগার খাইব ! আরও বেশি ঝাল ঝাড়ত আমার উপরে।

ডুমুর একটু আশ্চর্য হয়ে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। বলে, অ ! মানুষটা তবে অভিমানী ? সেটা খারাপ নয়। অবস্থা পালটালে এ সব মানুষের মাথা আবার ঠিক হয়ে যায়।

মুখ বাঁকিয়ে বলে, পা-চাটা নরম চোর ছ্যাঁচোরের চেয়ে তো ভালো !

তারপর একদিন যথারীতি সকালবেলা ছেলে নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সুবালা অসময়ে দুপুরবেলা ফিরে আসে। দেখা যায়, কোলে তার ছেলে নেই, মুখ থমথম করছে।

ডুমুর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে, কী হল ? ছেলে কই ?

নিয়া গেছে।

নিয়া গেছে ? কে নিয়ে গেল ?

যার ছেলে সেই নিছে।

না, হরেন গায়ের জোরে ছিনিয়ে নিয়ে যায়নি। সুবালা কি তাহলে ছেড়ে কথা কইত ? এতদিন শহরের পথে পথে ঘুরছে সে কি আর জানে না মেয়েদের জোর কীসে ? চেঁচিয়ে লোক জড়ো করল ছেলে কেড়ে নিয়ে পালাবার সাধ্য আর হত না হরেনের। হয়তো থানা পুলিশ হত, সে তো পরের কথা।

বেলা প্রায় বারোটা নাগাদ হঠাৎ কোথা থেকে হরেন এসে হাজির। শান্তভাবে নরমভাবে কথা বলছিল, ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর করছিল। তারপর বলছিল যে এই দুপুররোদে ছেলেটা ফুটপাতেই পড়ে রয়েছে, ওর গলা শুকিয়ে গেছে বোধ হয়। কাছের ওই খাবারের দোকান থেকে একটু দুধ খাইয়ে আনবে।

ডুমুর বলে, বোকা মেয়ে, সঙ্গে গেলে না ?

সুবালা বলে, গেলাম না ?

সুবালা বলে, গেলাম তো।

দুধ খাওয়াবে বলেই ছেলেকে নিয়ে হরেন চলতে আরম্ভ করেছিল, কাপড়টা গুটিয়ে পয়সাগুলি আঁচলে বেঁধে নিতে একটু পিছিয়ে পড়েছিল সুবালা। তার কি ধারণা ছিল হরেনের কী মতলব।

কোন গলিতে ঢুকে কোন দিক দিয়ে কোথায় যে চলে গেল হরেন ! পাগলিনির মতো চারিদিকে ছুটাছুটি করে লোককে জিজ্ঞাসা করে কোনো আর হদিস পেল না সুবালা।

বুড়ি ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করে, পোলারে কই থুইয়া আইলি ?

কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে কথা না কইলে সে বুঝতে পারে না। সুবালা ছেলের খবর জানাতেই সে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে শুরু করে।

সুবালা আবার তার কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে ধমক দিয়ে বলে, পোলা মরছে নাকি যে কাঁদ ? বাপের লগে পোলা গেছে, কাঁদনের কী ? অমঙ্গল ডাইকা আইনো না কইলাম !

দেখা যায়, সুবালা আজ কাঁধে ফেলে রাখার বদলে আঁচল গায়ে জড়িয়েছে। বোধ হয় শূন্য বুক ঢাকবার জন্য।

কয়েকটা দিন আশায় আশায় সুবালা বার হয়, সেইখানে গিয়ে ফুটপাতে কাপড় বিছিয়ে বসে থাকে—যদি মানুষটা ফিরিয়ে এনে দেয় ছেলেকে।

এখনও মাই খায় ছেলে। আজ পর্যন্ত একদিন মাকে ছেড়ে থাকেনি। মা-র জন্য নিশ্চয় সে কঁকিয়ে কঁকিয়ে কাঁদবে ! এতটুকু শিশুর কান্না, নিজের ছেলের কান্না কি সহ্য হবে হরেনের ?

সহ্য হবে কি অতটুকু বাচ্চাকে সারাদিন সামলে চলার ঝঞ্ঝাট ?

ডুমুর বলে, পাগল হয়েছ ? তাই কখনও পারে ? বড়োজোর এক দিন কি দুদিন। বাপ বাপ বলে তোমার কাছে ফিরিয়ে এনে দেবে।

সারাদিন রাস্তায় অসংখ্য মানুষ চলাচল করে হরেনের জন্য চোখ-কান পেতে রাখে সুবালা। দু-একপয়সা ভিক্ষে তাকে কে দিচ্ছে না দিচ্ছে, গায়ে পড়ে ভাব করতে চেয়ে কে কী বলছে না বলছে, কোনো দিকেই তার মন যায় না।

দিন দশেক পরে হতাশ হয়ে সে বেরোনো বন্ধ করে।

বলে, তবে আর ক্যান ভিক্ষা করুম ? এবার থনে গতর খাটাই।

পঙ্কজের স্ত্রীর ছেলেপিলে হবে। আর দু-একমাস পরে সে একটি রাঁধুনি রাখার কথা ভাবছিল। সুবালা কাজ খুঁজছে শুনে সে তাকে অবিলম্বে বহাল করতে চায়।

সুবালা বলে, আপনারা বেরাম্ভন, নীচ জাতের রান্না খাইবেন ?

পঙ্কজ বলে, রাখো তোমার জাত। কত সুখে আছি, তার আবার জাতবিচার !

সুবালা দুবেলা পঙ্কজের বাড়ি রেঁধে দিয়ে আসে, নিজে ওখানেই খায়। বুড়ি দিদিমার বয়সের কঠিন রোগ, বয়স ঠেকিয়ে ওর বেঁচে থাকার পথ্য তৈরি করে দেওয়ার কোনো হাঙ্গামাই নেই। জল ছাড়া প্রায় কিছুই সহ্য হয় না বুড়ির।

সুবালা ডুমুরকে বলে, আমি ঠিক শোধ নিমু। অন্যেরে দিয়া এই প্যাটে পোলা জমাইয়া কোলে করুম।

ডুমুর বলে, একশোবার—করিস না কেন ? কারও সঙ্গে থাক না—সতীশ, নকুল আরও ক-টা মানুষ তো ওত পেতে বসে আছে। একজনের সঙ্গে ভিড়ে যা, খেটে খেতে হবে না তোকে।

সুবালা বলে, থাকুম—বুড়িটা মরুক ? আরও কাহিল হইয়া পড়ছে, এই জলহাওয়া সয় না। আর কয়দিন ? বুড়ি চোখ বুজলেই পুরুষ নিয়া থাকুম।

তারপর আবার একদিন আচমকা হরেন এসে হাজির হয় ডুমুরের বাড়িতে। ছেলেকে উঠানে নামিয়ে দিয়ে বলে, সুবালা নাই ?

না।

গেছে কই ?

তার গায়ের নতুন শার্ট, পরনের ফরসা ধুতি দেখে ডুমুর হেসে ফেলে। অজানা অচেনা মানুষটা সম্পর্কে তার ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যা হয়নি। অবস্থা একটু বদলাতেই, কোনো রকমে দুটো পয়সা উপায়ের ব্যবস্থা হতেই, মনমেজাজ বদলে গেছে মানুষটার। বউয়ের আস্তানা খুঁজে বার করে নিজেই হাজির হয়েছে ছেলেকে কোলে নিয়ে !

তার হাসি দেখে ভড়কে গিয়ে হরেন শুধোয়, সুবালা থাকে না এখানে ?

ডুমুর বলে, না। সুবালা ওদিকে সতীশ দাসের ঘরে থাকে।

হরেন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে।

ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে ডুমুর জিজ্ঞাসা করে, আপনি কে হন সুবালার ?

হরেন জবাব দেয় না।

তখন ডুমুর বলে, আপনাকে চিনেছি, তাই একটু তামাশা করলাম। সুবালা আছে।

দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে দিয়ে বলে, বসুন, সুবালাকে ডেকে আনছি। সুবালা এক ভদ্দরলোকের বাড়ি রান্না করে।

বাচ্চাটাকে কোলে নিয়েই ডুমুর সুবালাকে ডাকতে যায়।

একলা ফিরে এসে বলে, সুবালা আসছে।

বেলা তখন প্রায় ন-টা। সুবালা আসে না কিন্তু ঘরে যেন বোনের জামাই এসেছে এমনিভাবে হরেনকে ডুমুর সমাদর করে—অঘোরকে দিয়ে খাবার আনিয়ে চা আনিয়ে খাওয়ায়।

বলে, আপনাকে ঠেকানো উচিত কিন্তু কী করি। মায়া পড়ে গেছে মেয়েটার ওপরে।

দুঘণ্টা পরে পঙ্কজের বাড়ি রান্না খাওয়ার পাট সাঙ্গ করে সুবালা ফিরে আসে।

অঘোর বেরিয়ে গিয়েছিল। ডুমুর বলে, আমিও একটু পাড়া বেড়িয়ে আসি ! তোমাদের বোঝাপড়া হোক।

শেমিজের ওপর ডুমুর কোরা শাড়ি পড়েছে। সিঁথিতে বা কপালে তার সিঁদুর নেই।

ছেলেকে কোলে নিয়ে সে চুপচাপ সামনে বসে থাকে।

হরেন কাতরভাবে বলে, ওকে একটু মাই দাও।

ধীরে ধীরে শেমিজেব বোতাম খুলে সুবালা ছেলের মুখে মাই তুলে দেয়। মাই টানবার চেষ্টা করতে করতে মুখ বাঁকিয়ে বাচ্চাটা একবার কেঁদে ওঠে, তারপর আবার মাই খাবার চেষ্টা করতে গিয়ে কচি দাঁতে প্রাণপণে কামড় বসিয়ে দেয়।

সুবালা বলে, উঃ !

আবার সে ধীরে ধীরে শেমিজের বোতাম এঁটে দেয়।

তার স্তনের দুধ শুকিয়ে গেছে।

হবেন নিজে থেকেই তাব কৈফিয়ৎ দেয়, বলে, পোলাবে নিয়া তুমি ভিখ মাগবা আমি সইতে পারি নাই।

সুবালা ধীরে ধীরে বলে, ভিখ না মাগলে পোলারে বা আমারে বাঁচা দেখতা না।

হরেন বলে, তা বুঝি না ? তবু গাও য্যান জ্বইলা যাইত। কিন্তু পোলারে নিয়া গিয়া কী ফ্যাসাদে পড়লাম কী কমু তোমাবে। রাঙামাসি মাই দিল কয়দিন– -

অ ! বাঙামাসি মাই দিছে !

কযদিন মাই দিযা কয় কী, আমি পাবুম না। আমার মাইয়ারে মাইরা তোমার পোলারে দুধ দিতে পাবুম না। আমাগো নাদ ভাত খাওয়া পেট ভইরা তবে পারুম। আমি মানুষ না ছালি, খাইয়া দুইটারে মাই দিমু ? তারপর সেইখানে তোমারে খুঁজতে গেছিলাম।

গেছিলা ?

হ। দিন পনর বাদে রাঙামাসি যখন বিগড়াইয়া গেল। তোমারে পাই না। কী বিপদ। মরিয়া হইযা কিছু পযসা বোজগারের ব্যবস্থা কবলাম।

তার শার্ট আর ধুতির দিকে চেয়ে সুবালা জিজ্ঞাসা করে, কী ব্যবস্থা করলা ?

হরেন বলে, কইলকাতায় কত উপায় পযসা বোজগারের। আমরা ক্যান যে বোকার মতো ভিক্ষা করছি আর খয়রাত চাইছি।

ওইটুকু চালাব মধ্যেই দীর্ঘকাল পবে ছেলেকে পাশে নিয়ে তারা পাশাপাশি শোয়। বুড়ির ঘরের কোণে পড়ে থাকা না থাকা সমান কথা, চোখেও দ্যাখে না, কানেও শোনে না।

মাঝরাত্রে পুলিশ হানা দিযে হরেনকে ধরে নিয়ে যায়। শহরে অজস্র সম্পদ থাক, অন্যের টাকা ছিনিয়ে নিযে নতুন শার্ট আর ফবসা ধুতি পরতে চাইলে চলবে কেন !

অনেক খোজাখুঁজি এবং হরেনকে মারপিট কবেও টাকাগুলি কিন্তু পুলিশ পায না।

পুলিশ হাতকড়া দিয়ে তাকে নিয়ে যায়। যাবার সময় মুখ ফিরিযে হরেন বলে, ভিখ মাইগো না। আমাগো অপরাধ নাই, ভিখ মাইগা অপরাধী সাইজো না। তার চেয়ে মবণ ভালো।

অসহযোগী

রমেনের বাবা হর্ষনাথ ধনেশগঞ্জের মস্ত আড়তদার।

বছরখানেক আগে রমেনকে সে তার পিসতুতো ভগিনীপতি সূর্যপদর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল—ছেলেটাকে একটু শান্তশিষ্ট ভদ্র বানাবার আশায়। রমেন একেবারে মারাত্মক রকম দুরন্ত হয়ে উঠেছিল, কিছুতেই সে তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছিল না। দু-তিনবার কোর্টে পর্যন্ত তাকে দৌড়তে হয়েছিল ছেলের জন্য। শেষে রমেন যখন একদিন ম্যাজিস্ট্রেট মি. বসুর ছেলেকে মেরে রক্তারক্তি করে দিল, তখন সে পরিষ্কার বুঝতে পারল যে এ ছেলেকে সামলে চলা তার সামর্থ্য নয়। এ ছেলে তার সর্বনাশ করবে। যুদ্ধের বাজারে কতভাবে কত কামাচ্ছে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে চটালে রক্ষা আছে !

দামি দামি ভেট নিয়ে তিনি সটান গিয়ে হাজির হল একেবারে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়িতে, মার-খাওয়া ছেলেটির জন্যই উপহার রইল দুশো টাকার। লুটিয়ে পড়ল মিসেস বসুর পায়ের তলে, প্রার্থনা করল রমেনের নিস্তার। ছেলের সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা করবে আগেই ভেবে ঠিক করে ফেলেছিল, তাই বিনা দ্বিধায় জানিয়ে দিল যে, ভয় পেয়ে রমেন কোথায় পালিয়ে গেছে, ফিরে এলে খুঁটিতে বেঁধে তাকে চাবকে লাল করে দেবে।

সেই দিনই রমেনকে নিয়ে সে কলকাতা রওনা হয়ে গেল, ছেলেকে সূর্যপদর জিম্মা করে দেবার জন্য।

রমেনের মা একটু আপত্তি করেছিল !

উনি স্বদেশি-টদেশি করেন শুনেছি, খোকাকে আবার না বিগড়ে দেন।

হর্ষনাথ বলেছিল, স্বদেশি না ছাই ! জেলে যেত না স্বদেশি করলে ? ও সব টাকা উপায়ের ফিকির। ছেলেদের নিয়ে দলটল সমিতি-টমিতি করে চাঁদা তুলবার জন্য। মাস্টারিতে কি কারও পেট চলে ?

শহরতলিতে সূর্যপদর বাড়ি। এক রাত্রির বেশি হর্ষনাথ থাকতে পারেনি। তার কত কাজ ধনেশগঞ্জে। সূর্যপদকে সব জানিয়ে অনুরোধ করেছিল, ছেলেটাকে তোমায় মানুষ করে দিতে হবে ভাই। শুধরে দিতে হবে।

সূর্যপদ হেসে বলেছিলেন, দেবে। ছেলেকে তোমার মানুষ করে দেব।

একটা শর্ত করেছিল সূর্যপদ যে এক বছরের মধ্যে রমেনকে ধনেশগঞ্জে নেওয়া চলবে না আর সোজাসুজি রমেনকে টাকা পাঠোনো চলবে না। হর্ষনাথ রাজি হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।

রমেনের খরচের জন্য পঞ্চাশ টাকা দিতে চাইলে সূর্যপদ মোটে পঁচিশ টাকা নিয়েছিল।

বলেছিল, আমি গরিব মাস্টার, তোমার ছেলের খরচ চালাবার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু পঁচিশ টাকার বেশি খরচ ওর লাগবে না।

পরের মাসে হর্ষনাথ পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়েছিল। কয়েক দিন পরে পঁচিশ টাকা ফেরত আসায় খুশি হয়ে রমেনের মাকে বলেছিল, না, লোকটা সত্যি ভালো। ছেলেটাকে শুধরে দিতে পারবে বলে মনে হয়।

এক বছর পরে পুজোর ছুটিতে রমেন বাড়ি এল।

তার পরিবর্তন দেখে প্রথম ক দিন হর্ষনাথ পরম খুশি। যেমন চেহারায় কথায় ব্যবহারেও তেমনি সে শান্তশিষ্ট ভদ্র হয়ে এসেছে। উশকোখুশকো ঝাঁকড়া চুল ছোটো ছোটো ছাঁটা কিন্তু তাও আঁচড়ানো, জামাকাপড় সস্তা দামের কিন্তু দিব্যি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—মুখখানা হাসিখুশি, কথা মিষ্টি, চালচলন নম্র। গুণ্ডার মতো চেহারা নিয়ে সারাদিন সে টোটো করে ঘুরে বেড়াত, খেলা আর মারামারি নিয়ে মেতে থাকত এমনি সে চঞ্চল ছিল এক বছর আগে, অকাজের পর অকাজ না করলে তার স্বস্তি ছিল না। একটা কথা কোনোদিন সে কারও শুনত না। সে চাপল্য, শয়তানি আর অবাধ্যতা কোথায় উড়ে গেছে।

সারাদিন বাইরে ঘুরে বেড়ায়, এই যা একটু দোষ। কিন্তু কোনো অপকর্মের খবর না পেয়ে এবং বাড়ি ফিরলে ছেলের দেহে বা কাপড় জামায় দুরন্তপনার চিহ্ন না দেখে হর্ষনাথ নিশ্চিন্ত হন। ভাবে এতদিন পরে দেশে এসেছে, পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে হয়তো আড্ডা দিচ্ছে সাধ মিটিয়ে। ওতে আর কী আসে যায়?

দিন সাতেক পরেই কিন্তু মনে তার খটকা লাগে।

আড়ত থেকে ভাত খেতে বাড়ি ফিরে দ্যাখে কী, শ তিনেক দুর্ভিক্ষের কাঙালি মেয়েপুরুষ ছেলেবুড়ো বাড়ির পাশে ফাঁকা বটগাছতলায় পাত পেতে ভাত খাচ্ছে। পরিবেশন করছে রমেন আর তারই বয়সি পঁচিশ ত্রিশটি ছেলে।

দেখে মুখ হাঁ হয়ে যায় হর্ষনাথের।

বাড়ি[illegible] গিয়ে ধপাস করে বসে পড়ে ছেলেকে সে ডেকে পাঠায়।

এ সব কী হচ্ছে?

রমেন তখন উৎসাহে ফুটছে। ওদের খাওয়াচ্ছি বাবা। কত হিসেব করে খাওয়াতে হচ্ছে জানো। কদ্দিন ধরে খায় না, বেশি খেলেই মরবে। তা কী বোঝে ব্যাটারা? সবাই চেঁচাচ্ছে—আরও দাও, আরও দাও। সামলানো দায়।

চাল ডাল সব পেলি কোথা?

মা দিয়েছে।

রমেনের মা ভয়ে ভয়ে বললেন, আহা আবদার ধরেছে, খাওয়াক না। সবাই আশীর্বাদ করছে। ভালো হবে।

ভালো হওয়াচ্ছি।

বাড়ির ভাঁড়ারটাই প্রায় ছোটোখাটো একটি গুদামঘর। আগে হর্ষনাথ রমেনের মা র কাছ থেকে ভাঁড়ারের চাবি সংগ্রহ করলেন। তারপর বটতলার খাওয়া শেষ হলে সকলকে হাকিয়ে দিলেন।

আঁধার নেমে এল রমেনের মুখে। সে বলল, আমি ওদের সাত দিন রোজ খাওয়ার কথা বলেছি বাবা। তারপর ওরা গাঁয়ে ফিরে যাবে।

চুপ কর, বেয়াদপ কোথাকার। সাত দিন ধরে খাওয়াবে। আমাকে ফতুর করার মতলব।

দিন যায়। প্রতিদিন চারিদিকে অসহায় ক্ষুধিতের কান্না হু হু করে বেড়ে যেতে থাকে। রমেন আর হাসে না। খেতে বসে ভাত ছড়িয়ে উঠে যায়। দুধ পড়ে থাকে দুধের বাটিতে, সন্দেশ পিঁপড়েয় খায়।

হর্ষনাথ রাগ করে বলে, কী জ্বালা বাপু। কেন হয়েছে কী?

সবাই না খেয়ে মরে যাবে, তুমি কিছু করবে না বাবা?

দিলাম যে কুড়ি মন চাল রিলিফে?

কুড়ি মন। তোমার আড়তে হাজার হাজার মন চাল রয়েছে। সবাই ছিছি করছে বাবা। সবাই আমায় ঘেন্না করছে তোমার ছেলে বলে।

চুপ কর ! বেয়াদব কোথাকার !

দুদিন রমেনকে খুঁজে পাওয়া যায় না। রমেনের মা কেঁদেকেটে অস্থির হয়। মনে মনে যথেষ্ট শঙ্কিত হলেও হর্ষনাথ বাইরে মুখ গম্ভীর করে থাকে। রাগে ভয়ে দুশ্চিন্তায় তাঁর মেজাজটা যায় বিগড়ে। ভাবে, রমনে ফিরলে মেরে তাকে আস্ত রাখবে না। দুদিন পরে রমনে ফিরলে তার চোখের চাউনি দেখে দুটো ধমক দিতেও কিন্তু তাঁর সাহস হয় না। কেমন এক খাপছাড়া অদ্ভুত দৃষ্টিতে রমেন আজকাল তাঁর দিকে তাকাতে আরম্ভ করেছিল, দেখে তাঁর কেমন ভয় ভয় করে।

কোথা গিয়েছিলি না বলে ?

অনাথবাবুর সঙ্গে সাতগাঁয়ে।

অনাথবাবুর সঙ্গে ! তার পরম শত্রু অনাথবাবু। এই সেদিন যার জন্য প্রায় হাজার মন চাল গুদামে তোলার বদলে বাঁধা দামে বিক্রি করে দিতে হয়েছে তাকে !

রমেন আবেদন আর আবদারের সুরে বলে, কী অবস্থা হয়েছে তুমি ভাবতে পারবে না বাবা। তুমি এক কাজ করো বাবা। যে দামে কিনেছিলে, এক টাকা লাভ রেখে চাল বেচে দাও। তোমার তো লোকসান হবে না, কত লোক বাঁচবে ভাবো দিকি !

লোকসান হবে না, না ? চল্লিশ টাকার জায়গায় চোদ্দো টাকায় বেচলে লোকসান হবে না, কী হিসেব তুই শিখেছিস ? কথাটা হর্ষনাথ উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে।

তখন রমেন বলে, তাহলে তোমার সব চাল আমি বিলিয়ে দেব, বাবা। আগে থেকে বলে রাখলাম। তোমায় আমি মানুষ খুন কবতে দেব না।

ছোটো মুখে বড়ো কথা বলিসনি, থাবড়া খাবি।

বলে রাখলাম। দেখো।

ছেলেমানুষের হালকা কথা, কে তা মনে রাখে ? আড়তে তার কত লোকজন, গুদাম তালাবন্ধ, চাইলেই কী আর চাল বিলিয়ে দিতে পারবে বমেন—পঞ্চাশজন বন্ধু আর অনাথবাবুকে সঙ্গে নিয়ে এলেও নয়।

সে জন্য হর্ষনাথের ভাবনা হল না। ছেলের পাগলামি দেখে মনটা শুধু খারাপ হয়ে গেল। কী কুক্ষণেই ছেলেকে মানুষ হতে পাঠিয়েছিল সূর্যপদর কাছে ! এর চেয়ে ছেলেটা শয়তান গুণ্ডা থাকাও ভালো ছিল—বয়স বাড়লে আপনি শুধরে যেত।

দিন কতক পরে হর্ষনাথ ব্যাবসার কাজে তিন দিনের জন্য বাইরে গেল। আড়তে বলে গেল, রমেন এসে গোলমাল করলে যেন ভালোভাবে শাসন করে দেওয়া হয় আর অনাথ এসে হাঙ্গামা করলে যেন সোজা পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেওয়া হয। একবার থানাটাও ঘুবে গেল, অনাথ কীভাবে তার ছেলের মাথা বিগড়ে দেবাব চেষ্টা করছে জানিয়ে দেবার জন্য।

পরদিন সকালে আড়তে ও আড়তের সামনে হইহই কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। নিতাইচরণ আড়তের প্রধান কর্মচারী, বাবু নেই বলে আড়ত খুলতে লোক পাঠিয়ে নিজে একটু বেলা করে হেলতে দুলতে এসে দ্যাখে কী, প্রায় শ-পাঁচেক লোক জমা হয়েছে আড়তের সামনে। তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে নিতাইচরণের চক্ষুস্থির ! আড়তের যে কোণে হাজার টিন তেল ছিল পরশু পর্যন্ত, সেখানে মেঝেতে তেল আর ময়লার পুরু পাঁকের ওপরেই আড়তের সবাই বসে আছে। তফাতে হর্ষনাথের দুনলা বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে রমেন। রমেনের সমবয়সি ছেলেতে আড়ত বোঝাই।

আসুন নিতাই কাকা। গুদামের চাবিটা দিন তো।

চাবি ? চাবি কোথা পাব ? চাবি তোমার বাবার কাছে।

তাহলে ওখানে গিয়ে বসুন। দরজা ভাঙতে হবে।

রমেনের এক বন্ধু তার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে তেলের গাদায় ধপ করে বসিয়ে দেয়।

রমেন বলে, এই বন্দুক নিয়ে একজনের ঠ্যাং খোঁড়া করে দিয়েছিলাম মনে আছে তো ? কেউ কোনো ফন্দিফিকির চালাকি করবার চেষ্টা করবেন না। সত্যি সত্যি গুলি করব কিন্তু।

সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে রমেন ওদের পাহারা দেয় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। দেড়শো ছেলে গুদাম থেকে চাল বার করে বিতরণ করে। কাছে ও দূরের অনেকগুলি গাঁ থেকে হাজার হাজার লোক আসে চালের জন্য। রমেন গাঁয়ে গাঁয়ে ঢ্যারা পিটিয়ে দিয়েছিল।

পুলিশ দু চারজন আসে কিন্তু ঢুকবার চেষ্টা করে না বরং ভিড় আর হাঙ্গামা নিয়ন্ত্রণে কিছু কিছু সাহায্যই করে। ভোরে রমেন নিজে গিয়ে থানায় খবর দিয়ে এসেছিল, তার বাবা আজ চাল বিতরণ করবেন ! এই মর্মে বড়ো বড়ো কয়েকটা ইস্তাহারও আড়তের বাহিরে টাঙিয়ে রেখেছিল।

সন্ধ্যার সময় চাল শেষ হল।

খবর পেয়ে পরদিনই হর্ষনাথ ফিরে এল। ছেলেকে সামনে রেখে গুম খেয়ে রইল। তার কান্না পাচ্ছিল !

আপদ

চাল নেই ? বাঃ, বেশ !

সকালবেলা কী শুভ সংবাদ ! স্বাধীনতা পাওয়ার বাসি পচা সংবাদটার মতো। জর্জর প্রাণে আরেক দফা জ্বর এনে দেয়।

রাত্রে নলিনী খবরটা চেপে গিয়েছিল। আপিস ফেরত কেরানি বেচারাকে তখন ও খবরটা আর জানিয়ে লাভ কী। কালোবাজারে ছাড়া চাল নেই। হলই বা সে সরকারি কেরানি, স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকারের বেতনভুক্ত। রাতারাতি চাল-বাড়ন্ত সমস্যার সমাধান করার সাধ্য তার নেই। নলিনীর মতে, সরকার স্বাধীন বলেই কেরানিদের দাসত্বের ডিগ্রি চড়েছে। তার যুক্তি আর ব্যাখ্যা একটু তির্যক ও রসালো হয়, কারণ সে কথাগুলি রসিকতা করেই বলে। এত চড়া তার ক্ষোভ যে বেশি তেতে লোহা জ্যোতির্ময় হওয়ার মতো তার প্রাণের জ্বালা ব্যঙ্গ হয়ে বিচ্ছুরিত হয় !

আমি কী করব ? নলিনী আলগোছে বাঁকা হাসি হেসে বলে, তোমরা স্বাধীন হয়েছ, আমরা তো হইনি। আমরা ঘরের কোণে হাঁড়িই ঠেলছি। হাঁড়ি চড়াবার ব্যবস্থা তোমরাই বাদ দিয়েছ, আমরা করব কী ?

কেউ যেন তাকে কিছু করতে বলেছে ! এই রকম ঢং হয়েছে নলিনীর কথার—শুধু আজকাল নয়, অনেক দিন থেকে। আগে অন্য কথায় ঠোকর দিত, আজকাল কথায় কথায় এই স্বাধীনতার কথা তুলে খোঁচায়। কথা আরম্ভ করে আমি দিয়ে, পরক্ষণে তা দাঁড়ায় আমরা ও তোমরার ব্যাপারে ! সে যেন কণাদ রায়ের বউ নয়, তার ছেলেমেয়ের মা নয়, তার সংসারের গিন্নি নয়, সে ভিন্ন একটা জাতের এবং কণাদ অন্য একটা জাতের প্রতিনিধি।

ঘরে চাল নেই এ কি নতুন কিছু ব্যাপার ? প্রায়ই একরকম চাল থাকে না, প্রায় সকলের ঘরেই। নলিনী এমনভাবে খবরটা দেয় যেন তারই পরামর্শে গভর্নমেন্ট ঘরে ঘরে চালের অনটন ঘটিয়েছে, লোভী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চাল, আটা, কাপড়চোপড় শিকেয়, তোমার সরকারি ষড়যন্ত্রে সেও যেন একজন অংশীদার। সেই যেন এই বিশ্বাসঘাতকের জগতে সবার সেরা বিশ্বাসঘাতক।

ঘরের কোণে হাঁড়ি ঠেলে বলে ? অন্যদের হাতের কাছে পায় না, একমাত্র পুরুষ তাকেই পায় বলে ?

কিন্তু তাকে পুরুষ মনে করে কি নলিনী ? কথা শুনে সন্দেহ জাগে ! আজকেই চাল ফুরোলো ? বিষ্যুদবার পর্যন্ত যেত না ?

পেট বাড়েনি দুটো ?

বাড়িতে লোক বাড়েনি, পেট বেড়েছে দুটো। পেট ? কথার কী ছিরি নলিনীর। পাকিস্তান থেকে দুজন আত্মীয় এসে ঘাড়ে চেপেছে বটে এবং তাদের পেট ভরাতে হওয়ায় রেশনের আইনি চাল-আটা মঙ্গলবারেই শেষ হয়েছে। রেশন কার্ড সংগ্রহের হাঙ্গামা চুকলে আশা করা যায় ভবিষ্যতের সপ্তাহে আবার বিষ্যুদবার পর্যন্ত সরকারি বরাদ্দ খাদ্য টানা চলবে। শুক্রবার সকালে নলিনী মনে করিয়ে দেবে ঘরে এক দানা চাল নেই, একগুঁড়ো আটা নেই—তার আগে নয়। সে চোরাবাজারে যাবে না চালের সন্ধানে। বারবার এই কথা ভেবে বুকে বল পাওয়া যাবে যে মোটে তিনটি দিন, শুধু আজ কাল পরশু, শুক্র, শনি আর রবিবারটা চোরাচালে কোনো রকমে চালান—হিসবে করে, আরও কম খেয়ে, কোনো রকমে।

সোমবারে আবার রেশন মিলবে !

নলিনী মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছে ইট সুরকি সিমেন্টের নতুন গাঁথনিটার দিকে। বাড়ির পাশে কী তাড়াতাড়ি যে গড়ে উঠছে সিনেমা হাউসটা। ওষুধের নেশার মতো সস্তা আনন্দের জলো দুটি ঘণ্টার জন্য বিব্রত অতিষ্ঠ মানুষ পয়সা দিচ্ছে, সে লাভে ভাগ বসাতে এক দিন দেরিও যেন সইবে না।

তাড়াতাড়ি গড়ে তোলো, রোশনাই জ্বালো, দুয়ার খুলে দাও—কিছু একঘেয়ে ন্যাকামি, কিছু রেডিয়োমার্কা মাছি-ওড়া সুরের ভনভনানি, কিছু দেশপ্রেম আর বিপ্লবী নায়ক-নায়িকার বাসরঘরের বিপ্লবে সমাপ্তি, এরই জন্য ভিখারির মতো মেয়েপুরুষ এসে ভিড় করুক টিকিটঘরের দরজায়।

নিজের চিন্তায় চমক লাগে কণাদের—এ তার স্বকীয় নয়, নলিনীই এমনি করে বলে। চোখে কি জল নলিনীর ! না চকচক করছে মনের জ্বালায় ?

কী ভাবছ জানি, নলিনী ভারী গলায় বলে, নিজের পেটে পুরিনি আমি সব। কাল রাত্রে উপোস গেছে আমার।

আচমকা মুখ ফিরিয়ে সে মুচকে হাসে, মেয়েরা উপোস দিলে আগে মাছের একটা আঁশ দাঁতে কাটত। মাসের ন-দশ তারিখ হলে মাছের গন্ধও আসে না বাড়িতে। কী করি বলো ? তোমরা স্বাধীন হয়েছ -

থলি দাও। দুটো দিয়ো, বাজারটাও সেরে আসব।

থলি নিয়ে কণাদ পালিয়ে যায়।

কিছুদিন আগেও কণাদ বোঝাত, তর্ক ও রাগারাগি করত। শেষে বলত, তুমি কী বুঝবে, তুমি মেয়েমানুষ, তোমার ত্যাগ নেই, ধৈর্য নেই, তুমি স্বার্থপর !

সম্প্রতি সে আর উৎসাহ পায় না। যত সহজ ভেবেছিল অত সহজ নয় ব্যাপার, না স্বাধীনতার প্রশ্ন, না তার প্রতি নলিনীর অদ্ভুত জ্বালার মানে বোঝা।

ছোটোভাই চেঁচিয়ে পড়ছে, এমন চেঁচিয়ে সেও একদিন পড়ায় মন বসাত আলস্য কাটাত। পূর্ববঙ্গের পলাতকা আত্মীয়া দুটি, মা ও মেয়ে, স্যাঁতস্যাঁতে উনানটুকুর কোণে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরামর্শ করছে—সবাইকে খেতে দিয়ে নলিনী যে কাল না খেয়ে ছিল সেই বিষয়ে কি ? অথবা নিজেদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ? কাকিমা আর খুকিকে এখানে রেখে রমেশকাকা ছেলেকে নিয়ে হোটেলে উঠে যে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছে সে জন্য কণাদের কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না। তবু কাকিমা আর খুকিকে তার মারতে ইচ্ছা হচ্ছে।

এত সকালেই সিনেমা হাউসটার কাজ শুরু হয়ে গেছে, সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ চলবে।

মিস্ত্রি আর কুলিরা কী রকম মজুরি পায় ? ভালোই পায় নিশ্চয়, দিন ভালোই চলে নিশ্চয়, নইলে কথায় কথায় স্ট্রাইক করার এত তেজ কোথায় পেত ! হলদে কার্ডে ওদের রেশন পর্যন্ত বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে দেশের এমন সংকটের সময়ে। ভবিষ্যৎ গড়বার বা ভাঙবার এই সন্ধিক্ষণ, ওরা যদি শুধু আদায় করার ফিকির ছেড়ে এই দুর্দিনে---

এ যেন মুখস্থ করা চিন্তা, তোতাপাখির মতো শুধু আবৃত্তি করা নিজের মনে, পরের কাছে। নিজের মনও আর সায় দিতে চায় না। ইট গেঁথে গেঁথে নতুন দালান উঠেছে, তার এতদিনের পুরানো বিশ্বাসের ইমারত পড়ছে ভেঙে ভেঙে। ভালোই যদি দিন চলে, সুখস্বাচ্ছন্দ্য আর তেজ যদি বাড়ে, উদয়াস্ত খেটে কেন মরবে মানুষ ?

নিজেই কি সে খাটত ?

এ সব কথা শুনে নলিনী বলে, বোকো না বেশি। এতটুকু আশা-ভরসা থাকলে মানুষ যেন কষ্ট সইতে নারাজ হয়। ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আধপেটা খেয়ে প্রাণপাত করে না মানুষ একটু সংস্থানের

জন্য ? মানুষ ভূত কিনা সুখে থাকতে নিজেকে কিলোবে। ত্যাগ ত্যাগ করে তোমরা সবাইকে সন্ন্যাসী বানাতে চাইছ।

তোমরা ! তাকে তোমরা ছাড়া সম্বোধন করতে নলিনী ভুলে গেছে। দেশকে ভালোবাসে বলে নলিনী বড়ো শ্রদ্ধা করত তাকে, নিজেকে উজাড় করে উন্মুখ অতল ভালোবাসায় তার জীবন ভরে রাখত। নলিনী ভুলে গেছে আজও সে দেশকে ভালোবাসে।

কত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছে, কত অল্পদিনে !

যুদ্ধ, বোমার ভয়, দুর্ভিক্ষ হাসিমুখে হেলায় পিছনে ঠেলে দিয়েছে, কীসের সমস্যা কীসের কী, তুমি আছ আমি আছি ! একটি মেয়েকে জন্ম দিতে সব ভুলে গেছে নলিনী।

তবু তাকে এতভাবে বাঁচিয়ে চলে কেন নলিনী ? রাত্রে কেন তাকে জানায় না ঘরে চাল নেই, সে না খেয়ে পেটের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে পাশে এসে শুয়েছে ? আদর করতে চেয়ে কাছে টানায় খানিকক্ষণ সে কাঠ হয়ে শুয়েছিল. হাত সরিয়ে দিয়েছিল। কত দুঃখ আর ক্ষোভের সঙ্গে নলিনীকে তখন তার মনে হয়েছিল স্বার্থপর, এখন নিজের সেই জ্বালার কথা ভেবে লজ্জায় কণাদের মরে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেতে সাধ যায়। সারাদিন খেটে মেয়েকে মাই খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে নলিনী শুয়েছিল অন্য দিনের মতোই, সে টেরও পায়নি, যে তার একমুঠো ভাত জোটেনি। তারপর নিজেই নলিনী পাশ ফিরে তার গলা জড়িয়েছিল। এটাও তার নলিনীর স্বার্থপরতাই মনে হয়েছিল।

সকালে এখন আকাশে সূর্য উঠেছে, নোংরা রাস্তায় মানুষের ঠাসাঠাসি ভিড়, বাজারে তার পাশে দাঁড়িয়ে নলিনীর মতোই রোগা ফোলা চোখ মুখ, আলুথালু কুৎসিত শিথিল ভঙ্গিতে শাড়ি জড়ানো বস্তির একটি সস্তা বেশ্যা আধপোয়া কুচোচিংড়ি কিনছে। ভগবান আছেন বলে আর ভরসা নেই কণাদের, সত্য আর আদর্শও হয়তো নেই, তবু কণাদ নিজের কাছে স্বীকার করে যে এখনও নলিনীকে সে স্বার্থপর বলেই ভাবছে। নলিনী জানে তার জন্যই তার সব, বর্তমানের খাওয়া-পরা ও ভবিষ্যতের সুখস্বাচ্ছন্দ্য আরামবিরাম। তাকে শুধু বাঁচিয়ে রাখতে নলিনী তাকে রাত্রে চালের কথা না বলে তাকে ঘুমোতে দেয়, তাকে বেশি চটান উচিত নয় ভেবেই উপোসি অবশ দেহটাকে পাশ ফিরিয়ে শীর্ণ হাত দুটিকে তার গলায় জড়িয়ে দেয় ! সে বাঁচলে, সে খুশি থাকলে তবেই নলিনীর স্বার্থ বজায় থাকবে।

নিজের এ চিন্তায় সে কোনো গলদ খুঁজে পায় না। কিন্তু নলিনী স্বার্থপর—এই সত্যটা নিজের অপরাধের মতো তাকে পীড়ন করে। এ স্বার্থপরতায় দোষ কোথায় নলিনীর ?

এটাই তো নিয়ম সংসারের, বাস্তব জগতের ! ঘরে ঘরে সব নলিনীদের বেলাতেও তো একই হিসাব। স্বামীর কাছে ভাতকাপড় আর আশ্রয় চাইবে, স্বামীকে স্নেহযত্ন করবে—এর মধ্যে অনিয়মটা কী ?

গলদ কি তারই মূল্যবোধে ?

নলিনী তাকে উপলক্ষ করে তার মন সকলকে আজকাল খোঁচায় বলে, চারিদিকের দুরবস্থার জন্য দায়ি করে বলে, সংসারের চলতি নিয়মে নলিনীর চলাটাও একটা খুঁত হয়ে উঠেছে তার কাছে ?

আ মরণ !

চাপা মেয়েলি গলা তীব্র ভর্ৎসনায় ফোঁস করে উঠে কণাদের চমকে দেয়। তার মুখ লাল হয়ে যায়।

ভাবনায় তলিয়ে গিয়ে সে শুধু ভুলে যায়নি যে এটা বাজার, সেই সস্তা বস্তির বেশ্যাটির দিকে যে হাঁ করে বিহ্বলের মতো চেয়ে আছে এটাও খেয়াল ছিল না !

স্বাধীনতা

চাকরিটা সইয়ে নিতেই মাস তিনেক কেটে যায়। কোনো দিকে তাকাবার অবসর পায় না।

চাকরি করা মানেই তো শুধু চাকরি করা নয়।

রাশি রাশি ব্যবস্থার প্রয়োজন যেন তার চাকরিটার জন্যই ওত পেতে ছিল, চাকরি পাওয়ামাত্র একান্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। কত দিকে কত যে তাদের অভাব এতদিন নিরুপায় হয়ে মেনে নিতে হওয়ায় যেন ঠিকমতো আঁচ করা যায়নি, চাকরি নিয়ে এবার কোনটা ছেড়ে কোনটা মেটাবে, কারটা আগে কারটা পরে মেটাবে, হিসাব করতে বসে যেন দিশেহারা হয়ে যেতে হয় !

অভাবের প্রচণ্ড খরায় যেন খাঁখাঁ করছিল চারিদিকে, বেতনের পশলা বর্ষণ শুষে যাওয়ার রকম দেখেই কেবল তার প্রচণ্ডতা আঁচ করা যায়।

অভাব যে মানুষের অভাববোধ ভোঁতা করে দেয় সেটা আশীর্বাদ না অভিশাপ কে জানে !

কান্তার মতো হিসেবি মেয়ে পর্যন্ত বেশ খানিকটা ভড়কে গিয়ে ভাবে, ও বাবা ! তিনশো টাকার চাকরি পেয়ে সে তবে একেবারে স্বর্গ রচনা করার স্বপ্ন দেখেছে !

সেই সঙ্গে এ কথাও ভাবে, ইস কী অবস্থাতেই এতদিন তবে আমাদের কেটেছিল ?

এটাও সে টের পায় যে তাকে খুব শক্ত হতে হবে। তার তিনশো টাকার চাকরি থেকে সবাই যে রকম আশা করেছে মাসে মাসে হাজার টাকা হলেও সে আশা মেটানো যাবে কি না সন্দেহ !

হরিপ্রসন্ন পর্যন্ত যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় মাসের বেতন পেতেই হরেন কাকার কাছে তিনশো টাকা দেনার একশো টাকা শোধ করে দিয়ে এসেছে।

প্রায় দুবছর পড়ে আছে দেনাটা, শোধ করতে হবে বইকী। কিন্তু একটু তো সবুর করতে হয়, চারিদিকে সামঞ্জস্য বজায় রেখে আস্তে আস্তে দেনাটা শোধ করবার ব্যবস্থা করতে হয় ?

আত্মীয়ের কাছে দেনার জের টানতে লজ্জা করে বলে এক দিকে সব ঢেলে দিল চলবে কেন ? মা-র গয়নাগুলি যে বাঁধা রয়েছে আর মাসে মাসে সুদ গুনতে হচ্ছে !

হরেন কাকা সুদ নেয় না, দুদিন সবুর করলেও তার কিছু আসবে যাবে না—গয়না বাঁধার টাকাটাই বরং আগে শোধ করা উচিত ছিল। সুদ গোনা থেকে রেহাই পাওয়া যেত, গয়না ক-টা ছাড়িয়ে আনা যেত।

নাঃ, তাকেই শক্ত হতে হবে। সবাই ভাববে চাকরি পেয়ে মেজাজ গরম হয়েছে কান্তার। কিন্তু ভাবলে আর উপায় কী !

অনিলের কথা সে ভুলতে পারেনি।

অনিলকে নয় অনিলের কথাটাকে।

অমন কত অনিলকে সে চেনে। কয়েকজনকে বহুকাল ধরে বেশ ভালোভাবেই চেনে। একটু খাপছাড়া ঘটনার মধ্যে অনিলের সঙ্গে দেখা হয়েছে বলেই সে ধপাস করে তার প্রেমে পড়ে যাবে, কিছুতেই তাকে ভুলতে পারবে না, তাকে ভেবে ভেবে বিনিদ্র রাতগুলি দীর্ঘনিশ্বাসে ভরে উঠবে—বানানো রসিকতা হিসাবে ছাড়া এর কোনো মানেই হয় না !

খাঁচায় বন্দী আবেগ আর ভাবালুতা খাইয়ে পোষ মানানো মেয়েরা অবশ্য বোঝে না এ রসিকতা—খাপছাড়া কোনো ঘটনা বা অ্যাকসিডেন্ট ছাড়া কোনো একটি অনিলের কাছাকাছি এসে দুমিনিট দুটো কথা বলাই তাদের কাছে অসম্ভব অবাস্তব স্বপ্ন হয়ে থাকে। এদের কাছে সম্ভব আর

বাস্তব করতে তাই নিরানব্বুইটি উপন্যাসে নায়ক-নায়িকা কাছে আসে আর প্রেমে পড়ে খাপছাড়া ঘটনা বা অ্যাকসিডেন্টের সাহায্যে !

সাধে কি কান্তা দু-একটি ছাড়া উপন্যাস পড়তে পারে না, তার হাই ওঠে। খাপছাড়া ঘটনা জগতে ঘটেছে, অ্যাকসিডেন্ট সর্বদাই। ক-লাখ জীবনে কীভাবে কেন ঘটে আর পরিণাম কী দাঁড়ায়।

চাকরিটা ফসকে যাওয়ায় তার বাড়ির মানুষের হাঁড়িমুখ আর মায়ের কান্নাকাটি—অনিলের এই কথাগুলি সে ভুলতে পারে না, বারবার মনে পড়ে যায়।

অনিল ঝোঁকের মাথায় তার বাড়ি এসে হাজির হয়েছিল। তারও মাঝে মাঝে ঝোঁক চাপত অনিলের বাড়ি গিয়ে দেখে আসতে যে বাড়ির মানুষেরা কী বলছে আর করছে অনিলের অবস্থা সত্যই কী রকম দাঁড়িয়েছে।

চাকরি অনিলের পাওয়া উচিত। ইতিমধ্যেই পাওয়া উচিত। চাকরি সে পেয়েছে কি না কে জানে।

সত্যকথা বলতে কী, অনিল চলে যাবার পর তার কোয়ালিফিকেশনেব বিবরণ মাধবের কাছে শুনে কান্তা বেশ খানিকটা মরমে মরে আছে। তার কোনোই দোষ নেই, সংসারের সাধারণ নিয়মনীতিব বাইরে বলা যায় এমন কোনো সম্পর্কই মাধবের সঙ্গে তার গড়ে ওঠেনি, গরিবের ঘরের মেয়ে হয়েও অসীম কষ্ট সয়ে আর প্রাণপাত চেষ্টা করে একটা চাকবি বাগানো ছাড়া আব কোনো অপবাধই সে কারও কাছে করেনি।

তবু যেন সর্বদাই মনে হয় সে একটা অনিয়মের জীবন্ত নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাকে ব্যবহাব করা হয়েছে একটা দুর্নীতির সমর্থন আর প্রশ্রয় হিসাবে। মাধবের শুধু স্নেহের দাবি- সে সুখী হোক। আজ পর্যন্ত তার বেশি কিছু সে চায়নি তার কাছে।

কতবার কত সুযোগ গেছে, ঘরে এবং বাইরে। মাধব তার দিকে মুহূর্তেব জন্য অন্যভাবে একটিবার তাকাযনি পর্যন্ত !

কান্তা জানে যে অনেকে অনেক রকম ভাবছে। অনিল হয়তো বেশি করেই ভাবছে।

কিন্তু এ রকম ভাবনা ওদেরই কুৎসিত মানসিক হীনতা দীনতার পরিচয়ে দাঁড় কবিয়ে দিয়েছে মাধবের চালচলন, কথা ও ব্যবহার।

তাকে চাকরিটা করে দিতে মাধবকেও সংঘাত সইতে হয়েছে বইকী। চাকরি করে দেবাব ক্ষমতা কি মানুষ আকাশ থেকে পায়, অনায়াসে পায় !

কয়দিন ভারী খুশি মনে হচ্ছিল মাধবকে, বোজ এসে চা খেয়ে গল্প করে যেত।

হঠাৎ বন্ধ হল তার আসা।

কান্তা আপিস করে নিজেই খবর নিতে গেল অসুখ হয়েছে নাকি !

সত্যই যেন অসুখ হয়েছে মাধবের। অসুস্থ মানুষের মতোই থমথম করছে তার মুখ।

মনে আঘাত লেগেছে মাধবের—কঠিন আঘাত লেগেছে।

মাধব সখেদে বলে, ছিছি, কী বিশ্রী এই জগৎ, কী ছোটোলোক মানুষগুলি ! গরিব মধ্যবিত্তের মেয়ে তুমি কত কষ্টে মানুষ হতে লড়ছ দেখে মায়া হল, তোমায় একটা চাকরি করে দিলাম, তার মানে বাঁদররা বলছে কিনা—ছিছি !

কান্তা কী বলবে ভেবে পায় না। দুঃখ ক্ষোভ মায়া অভিমানে হৃদয়টা তার আলোড়িত হয় বলেই চুপ করে থাকে।

মেয়ে বলেই তাকে এভাবে তুচ্ছ করা সম্ভব হয়েছে, মাধবের এভাবে আহত হওয়াটাও তারই অপমান। তার সঙ্গে জড়িয়েই নিন্দা রটেছে মাধবের অথচ তাকে বাদ দিয়ে সবটা আঘাত লেগেছে তার অভিভাবক মাধবের !

মাধব নিজেই আবার বলে, তুমি আর আমার কাছে বেশি ঘনঘন এসো না কান্তা। ছমাস এক বছর তোমার আমার দেখা-সাক্ষাৎ কম হলেই লোকের ভুল ধারণাটা কেটে যাবে।

কান্তার মুখ লাল হয়ে যায়।

হার মানলেন ?

হার মানিনি। লোকে ভুল বুঝল আমাকে। কেষ্ট বাধার দেশ তো। একটা মেয়েকে চাকরি দিলেই বজ্জাত হতে হয়। এমন হবে বুঝতে পারিনি কান্তা।

তাকে চাকরি দিয়ে মাধব আজ আপশোশ করছে !

আমি রিজাইন দেব ?

মাধবের মেরুদণ্ড সোজা হয়ে যায়। ধমকের সুরে বলে, চাকরি করে দিয়েছি, চাকরি করে যাও। লোকে কী বলে না বলে সেটা সামলাব আমি। তুমি রিজাইন দিতে যাবে কেন ?

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক গুরুজনের ধমকের সুর। কান্তা একটা ঢোক গেলে।

অভিভাবকত্বের একটা নতুন রূপ ক্রমে ক্রমে প্রকট হচ্ছিল মাধবের কথায়, ব্যবহারে—চাকরিটা করে দেবার ঠিক পর থেকে।

ধমকের সুরটা আজ প্রথম শুনল।

এ পর্যন্ত কথার নতুন ভঙ্গি আর সুরটা হয়েছে খুব বাধ্য নিরীহ মেয়েকে গুরুজনের এটা-ওটা করতে বলা—একেবারে নিশ্চিন্তভাবে বলা যে কথা সে নিশ্চয় শুনবে, অবাধ্য হবার সাহসই পাবে না।

রীতিমতো অস্বস্তিবোধ করতে শুরু করেছিল কান্তা। কতখানি তাকে বাধ্য হতে হবে মাধবের, কত দিক দিয়ে মাধব তার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না।

কান্তার কাছে যতই তেজ দেখাক মাধব, তার মনের একটা স্থায়ী আতঙ্ক আবার নাড়া খেয়েছে এ ব্যাপারে। এ আতঙ্ক তার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে ক্রমে ক্রমে, মানুষ তাকে কী চোখে দেখে সে বিষয়ে নিজের ধারণা আর বিশ্বাসে এই রকম ঘা লাগার ফলে।

মেয়েদের উপকার করে প্রতিদান মানুষ আদায় করে নেয়, কিন্তু সে অনিয়ম। এই অনিয়মটাই কি তবে এত বড়ো সত্য হয়ে উঠেছে যে তার মতো মানুষের সম্পর্কেও লোকে এ রকম ভাবতে পারে ?

ক্ষমতা খাটিয়ে অনাত্মীয়া সুন্দরী একটি মেয়েকে চাকরি করে দিয়েছে—এটুকু জানাই যথেষ্ট। এইটুকুই একেবারে অকাট্য প্রমাণ। যে চাকরি দিয়েছে সে মানুষটা কেমন বিচার করারও প্রয়োজন নেই। কী সংঘাতিক কথা !

এই প্রৌঢ়বয়স পর্যন্ত সে কি প্রমাণ দিয়ে আসেনি সংযম আর চরিত্রবলের ? কান্তাকে চাকরি করে দেবার বিশেষ ক্ষমতা হয়তো তার আয়ত্তে এসেছে দেশটা স্বাধীন হবার পর, কিন্তু খেলা করার সাধ থাকলে মূল্য দিয়ে মেয়ে কেনার ক্ষমতা যৌবনে তো তার কম ছিল না। কত বন্ধু কত নটী কতভাবে তার সংযম ভাঙাবার চেষ্টা করেছে। ভদ্রঘরের বিপন্না অসহায়া কত মেয়ে-বউ তার কাছে এসেছে সাহায্য চাইতে, আজও আসে—একটু খারাপ ইঙ্গিত পর্যন্ত করা চলে এমন কোনো আচরণ কি কেউ দেখেছে কোনো দিন ?

রামচন্দ্রের মতোই লোকে তাকে একনিষ্ঠ একপত্নীক চরিত্রবান মানুষ বলে জানে।

নৈতিক কঠোরভাবে এই খ্যাতি পর্যন্ত তার মিথ্যা দুর্নাম ঠেকাতে পারল না ?

সোজা হিসাব এ রকম ভুল হয়ে গেলে তো বিপদের কথা।

আদর্শবাদী সংযমী ন্যায়নিষ্ঠ কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক মানুষের কাছে চিরকাল এই ভয়টাই সবচেয়ে ভয়াবহ হয়ে থাকে—জগৎসংসার বুঝি এক অনিয়মের খপ্পরে গিয়ে পড়ল, মানুষের কাছে বুঝি মূল্যহীন হতে চলল আদর্শ উচ্চচিন্তা ন্যায়পরায়ণতা নিয়মনীতি ইত্যাদি।

নিজের সুবিধাবাদী ধারণা ও বিশ্বাস ছাড়া তো অবলম্বন নেই আত্মকেন্দ্রিক মহৎ মানুষেরও, তাই নিজের হিসাব ও বিচারে যা হওয়া উচিত দাঁড়ায় তার বদলে বাস্তবে অন্য রকম হলে এ সব মানুষের আতঙ্ক জন্মে যায়।

আগে থেকে আরও অনেক ব্যাপারে জমা হয়েছে ভয়, এবার নাড়া খেয়েছে সবটাই। বেড়াতে বেড়াতে কান্তাদের বাড়ি চা খেতে যাওয়ার সাহস তার হয়নি ক-দিনের মধ্যে।

কিন্তু কান্তার কাছে তো প্রকাশ করা চলে না ভয়, তাই একেবারে ধমক হয়ে বেরিয়ে আসে তার তেজ দেখানোটা।

তার কর্তালিপনা কোথায় চড়বে ভেবে কান্তা অস্বস্তিবোধ করছে টের পেলে এই আতঙ্কই আবার নাড়া খেত মাধবের।

ভালো চেয়ে সুপরামর্শ দেওয়াকে কান্তা ভাববে চাকরি করে দেওয়ার প্রতিদানে তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ—এ কী ভয়ানক অনুচিত কথা !

সে কি দীর্ঘকাল ধরে পরিচয় দেয়নি তার মহৎ উদার হৃদয়ের ? অন্যের কথা দূরে থাক, আর্দালি পিয়ন চাকরবাকরকে পর্যন্ত সে অন্যায়ভাবে শাসন করে না। পছন্দ না হলেও নিজের মেয়ের কত চালচলন কত মতামত সে নীরবে বরদাস্ত করে যায়। সে কিনা হুকুম চালাবে কান্তার উপর !

মাধবকে কেউ বলে দেবার নেই, বলে দিলেও সে মানবে কি না সন্দেহ যে নিজের মেয়ে তার অনেক ইচ্ছা অনেক মত মানে না বলে, মেয়েকে হুকুম মানাবার ক্ষমতা নেই বলে সত্যসত্যই সে সুযোগ পেয়ে নিজেব অনেক মত আর ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে শুরু করেছে কান্তার ঘাড়ে।

আগে যে সব কথা নিয়ে কান্তা নিঃসন্দেহে তার সঙ্গে তর্ক জুড়ত, এখন এ সব কথা উঠলে সে যে আর তর্ক করে না এবং মাধব তাতে খুশি হয়—এটাই তো তার অকাট্য প্রমাণ !

প্রতিদান সে নিতে শুরু করেছে বইকী—অন্যভাবে না নিয়ে নিচ্ছে আনুগত্যেব প্রতিদান।

কান্তা ধীরে ধীরে বলে, আপনি ক-দিন যাননি। আমিও কি আসা-যাওয়া বন্ধ করব ?

মাধব বলে, নিশ্চয় না। মিথ্যা দুর্নামের ভয়ে মেলামেশা বন্ধ করব কেন ? মাঝেমধ্যে আমি যাব, তুমিও তেমনি আসবে যাবে। মেলামেশাটা শুধু কমিয়ে দেব আমরা। আর কিছু নয়। লোকে তো আর বুঝবে না মেয়ের মতোই তোমায় আমি স্নেহ করি।

একটু থেমে বলে, ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছিলাম। আমি বুঝতে পারছি, দিন দিন নোংরা হয়ে যাচ্ছে মানুষের মন।

আগের চেয়ে ঢের বেশি ছোটোলোক হয়ে গেছে মানুষ, মায়ের এই কথাটা মানতে পারে না কান্তা। কিন্তু সে প্রতিবাদও করে না।

বাড়ির অন্য মানুষগুলির ভাবও আজ যেন কেমন কেমন।

সেটা আশ্চর্য কিছুই নয়। তাকে নিয়ে মাধবের নামে কুৎসা রটেছে সেটা তো আর সহজ ব্যাপার নয় এদের কাছে।

কী করছ মৃদুলা ?

কিছু না কান্তাদি।

বাড়িতে এলেই যে হাসিমুখে সানন্দ অভ্যর্থনা জানায়, আজ সে গোমড়া মুখে চেয়ে থাকে কান্তার নতুন জুতোর দিকে।

পরশু নতুন বাড়িতে উঠে যাচ্ছি, একবার যেয়ো।

যাব।

মৃদুলার মা গৌরী এ ঘর থেকে ও ঘরে যাবার সময় একবার চোখ তুলে তাকায়, তবু যেন দেখতে পায়নি এইভাবে তার সঙ্গে একটিও কথা না বলেই চলে যায়।

মাধবের বড়োজামাই শচীন তাকে দেখে যেন মুচকি হাসিটা চাপা দেবার জন্যই মুখে হাতের তালু ঘষে দাড়িতে আঙুল বুলোতে বুলোতে নির্বিকার উদাসীনভাবে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকার ভান করে।

নীচে নামবার সময় সিঁড়ির মাঝামাঝি মুখোমুখি হয়ে যায় কান্তা আর অমলা। অগত্যা দুজনকেই দাঁড়াতে হয়।

কান্তা জিজ্ঞেস করে, শরীর কেমন আছে ?

ওই এক রকম। ওষুধ গিলছি।

তার মুখের ভাবেও স্পষ্ট ঘোষণা যে ক্ষমা নেই তোমার। অমলাকে শরীর কেমন আছে জিজ্ঞাসা করে আগে কোনোবার রক্ষা থাকেনি। একটানা ফিরিস্তি শুনতে হয়েছে শরীরে তার গ্লানি, কোন কোন ডাক্তার চিকিৎসা করছে, ওষুধ পথ্যের কী ব্যবস্থা হয়েছে ইত্যাদি সব কিছুর।

এই মুখরতাই একটা লক্ষণ তার রোগের। কান্তার উপর গভীর বিতৃষ্ণা রোগের লক্ষণটাকে পর্যন্ত যেন আজ চাপা দিয়ে দিয়েছে।

কে যে কার পাশ কাটিয়ে নীচে নামে উপরে ওঠে ঠিক বোঝাই যায় না।

কিন্তু নীচের তলায় নেমে গেলে কান্তার সঙ্গে যেচে খানিকক্ষণ কথা বলে মাধবের বিধবা বোন শান্তিময়ী। ধীরে শান্তভাবে কথা বলে। সব সময়েই অত্যন্ত নিরুদ্‌বেগ মনে হয় তাকে।

বয়স মাধবের চেয়ে দু-তিনবছর মোটে কম হবে। মাজা রং, ঋজু নিটোল হালকা দেহ। একরাশি চুলের মধ্যে এখানে ওখানে কয়েকটা সাদা চুল উঁকি দিচ্ছে। পরনে ধপধপে সাদা ধুতি আর জামা।

তাকে দেখে আর তার কথা শুনে মনে হয় শান্তিময়ী নামটি তার সার্থক। গোমড়া মুখে নয়, নিশ্চিন্তভাবে সে জিজ্ঞাসা করে, খবরের কাগজেও নাকি কেচ্ছা বেরিয়েছে ?

প্রশ্ন শুনে কান্তা ভড়কে গিয়ে বলে, না না, খবরের কাগজে কিছু বেরিয়েছে বলে তো শুনিনি।

তবু ভালো। কে যেন বললে খবরের কাগজেও নাকি কায়দা করে আইন বাঁচিয়ে নাম পর্যন্ত ছাপিয়ে দিয়েছে। শুনে থেকে কেবল তোমার কথা ভাবছিলাম—কী দশা হত তোমার তাহলে ?

এই জ্বালাতেই জ্বলছিল মনটা। মাধব শুধু বলেছে নিজের কথা - তার মতো মানুষের নামেও এমন বিশ্রী মিথ্যা বদনাম রটে, এও জগতে সম্ভব হল ! নোংরা কুৎসিত হয়ে গেছে মানুষের মন—নইলে মাধবকেও মানুষ খারাপ ভাবতে পারে।

মাধবের নামে কুৎসা রটেছে বলে আহত বিক্ষুব্ধ হয়েছে বাড়ির অন্যান্য সকলের মন। সে এই কুৎসার কারণ বলে সকলে কুরিয়ে কুরিয়ে চেয়েছে তার দিকে, তার সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলতে অস্বীকার করেছে।

দুর্নাম যেন একা মাধবের।

এ মিথ্যা দুর্নামে যেন তার কোনো ক্ষতি নেই, তার কোনো আপশোশের কারণ নেই।

জাতে সে মেয়ে, যতই পাস করুক আর মোটা মাইনের চাকরি বাগাক, সমাজে স্ত্রীজাতীয়া জীব হিসাবে তার পরিচয় মোটেই ফুরিয়ে যায়নি। ফুরিয়ে যাবার কথাও নয়।

সে তো সত্যই স্ত্রীলোক।

পুরুষের চেয়ে দুর্নাম যে তার পক্ষে কত বেশি ভয়ানক ব্যাপার, এ বাড়ির কেউ যেন সেটা খেয়াল করাও দরকার মনে করেনি।

তাকে চাকরি দিয়ে মাধব বিপাকে পড়েছে—এ জন্য তার দিকটা গণ্যই নয়।

সে যেন পতিতার শামিল হয়ে গেছে এদের কাছে, তার সামাজিক সুনাম দুর্নাম মানমর্যাদার কোনো প্রশ্নই যেন ওঠে না।

একমাত্র শান্তিময়ী তার দিক টেনে কথা বলেছে। সহানুভূতির স্পর্শ পেয়েই কান্তার হৃদয়ের জ্বালা আগুনের মতো জ্বলে ওঠে।

আমারই সব দোষ তো ? আমি জানি—আমি জানি ! আপনার দাদাকে আমি রিজাইন দেবার কথা বলেছি খবর রাখেন ?

শান্তিময়ী শুধু বলে, ছি ! বিপদে পড়লে তোমাদেরও যদি মাথা বিগড়ে যায়, হিস্টিরিয়া হয় সাধারণ মেয়েরা কার দিকে চাইবে ?

কী কথায় কী কথা এল। মানুষের মনের নোংরামির অভিযানে সেও অংশ নিয়েছে এই নালিশের বদলে বলা যায় যে নোংরামির কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্য মেয়েরা তার মতো মেয়ের মুখ চেয়ে আছে, তার দায়িত্ব অনেক ! কান্তা তাই চুপ করে থাকে।

তার তো হিস্টিরিয়া রোগ নেই যে নিজের কথা, ন্যায়সঙ্গত নালিশের কথা হলেও নিজের কথা বলার জন্য জগৎসংসার তুচ্ছ করে দেবে, যেহেতু মাধব আর তার বাড়ির অন্য লোকেরা তার দিকটা খেয়াল করেনি !

নরম হলে চলবে না।

কী করতে বলছেন ?

কান্তা ধীর গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করে।

শান্তিময়ী তার হাত ধরে নিজের ঘরে নিয়ে যায়। টেনে নিয়ে যায় না। কারণ কান্তা তার মনোভাব টের পেয়ে হাত ধরামাত্র তার সঙ্গে চলতে শুরু করে।

ঘরে একটি লোহার চৌকিতে ধপধপে বিছানা। আর কোনো আসবাব নেই। বিধবা বলেই মাধব বোনকে ঘর দিয়েছে ছোটো, ঘরে একজনের শোবার মতো কাঠ বা লোহার চৌকি পাতলে আর কোনো আসবাব আনা সম্ভব হয় না।

কয়েকটা টুল আছে। আর আছে একটি বুকশেলফ। টুলটাকে চৌকির নীচে ঠেলে দিয়ে শান্তিময়ী মেঝের মুক্ত অংশটুকুতে ছোটো একটি চীনা মাদুর বিছায়।

বলে, এসো আমরা আয়েস করে বসি।

পা ছড়িয়ে বসে বলে।

দাদা বুঝি তোমায় খুব ভড়কে দিয়েছে ?

ওনার বদনাম হল—

শান্তিময়ী খিলখিলিয়ে হাসে। হাত বাড়িয়ে কোণ থেকে পানের বাটা টেনে নিয়ে পান সেজে একটু দোক্তা দিয়ে মুখে পোরে।

পিক ফেলে এসে বলে, তুমি বড়ো বোকা মেয়ে। দাদা কি তোমার জন্যে তোমায় চাকরি দিয়েছে ? দাদার মধ্যে কত রকম ভাবের লড়াই টের পাও না ! নিজের ভাবে নিজের দায়েই চাকরি দিয়েছে তোমায়। কিন্তু সে তো গেল ভিন্ন কথা। তোমার নিজের কথা ভাবছ না তুমি ? নিজের ভালোমন্দের হিসেব, দাদার এ দিকে ঠিক আছে, তোমার হিসেবটা তুমি করছ না ?

নিজেকে এই প্রশ্ন করার জন্যই প্রাণটা যেন ছটফট করছিল, কিন্তু প্রশ্নটা স্পষ্ট করে তুলতে পারেনি। কীসে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল স্বাধীন চিন্তা। মুগ্ধ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে কান্তা শান্তিময়ীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

শান্তিময়ী আবার বলে, দাদার আবার বদনাম কীসের ? হোমরাচোমরা ব্যাটাছেলে, এ সব বদনামে তার কী এসে যায় ? লোকে বরং তারিফ করবে। কিন্তু তুমি বাচ্চা মেয়েছেলে, সুনাম বদনামে তোমার জীবন ওলোট পালোট হয়ে যাবে। ঠান্ডা মাথায় নিজের দিকটা ভালো করে ভাবো—

মাথাই গুলিয়ে যাচ্ছে, ভাবব কী।

মেয়েমানুষের মাথা গুলিয়ে গেলে চলে ? একটা সোজা কথা তো বুঝতে পারছ ? বদনামের ফলে হয়তো ওই মাধববাবুটি ছাড়া সারাজীবনে তোমার আর গতি থাকবে না। ঘরে ঘরে বউগুলির যে দশা তোমারও প্রায় তেমনি দাঁড়াবে।

হতাশা নয়, একটা ক্ষোভ নিয়ে কান্তা বাড়ি ফেরে। অনেক ব্যাপারে অনেকবার বুকটা তার জ্বালা করেছে, কিন্তু এ ক্ষোভ অন্য ধরনের, এ ক্ষোভ আর মিটবে না।

সে স্ত্রীজাতীয়া তাই, এত কষ্টে এত চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে স্বাধীনভাবে রোজগার করবার অধিকার এ সমাজে তার জন্মগত নয় এই ক্ষোভ ঘুচবার নয় —পুরানো অভ্যস্ত নালিশটাই আবার নতুন করে তীব্রভাবে নাড়া খেলেও ধীরে ধীরে আবার থিতিয়েও যেতে পারত। শান্তিময়ী দরদের সঙ্গে তাকে সতর্ক করে দিয়েছে যে সুনাম দুর্নামের ব্যাপারে সে যে নিরুপায় অসহায়া নারী এটা যেন সে ভুলে না যায়। মনের মোড়টাই ঘুরে গিয়েছে কান্তার।

না, আসল কথা মোটেই তা নয়। বদনামে মাধবের কিছু আসে যায় না, মুশকিল শুধু তার এটা একেবারে ভিন্ন ব্যাপার।

আসল গলদটা হল এই যে মাধব কেন তাকে চাকরি দেয়, চাকরি দেবার ক্ষমতা পায়। এ একটা কুৎসিত অনিয়ম। অনিলকে অথবা তাকে মাধব বেছে নিয়েছে সেটা প্রশ্ন নয়, মাধবের সঙ্গে তার খারাপ সম্পর্ক আছে কি নেই সেটাও আলাদা ব্যাপার, খেয়ালখুশিতে মাধব যে চাকরির জন্য যাকে ইচ্ছা বেছে নিতে পারে এটাই হল নিয়মনীতির আসল ব্যভিচার।

এ ব্যাপারে সে যখন অংশ নিয়েছে, সে ও ব্যভিচারিণী বইকী ! নইলে সত্যই কি কায়িক ব্যভিচারে দুর্নাম তার খুব বেশি আসে যায়, এতখানি বিচলিত হবার প্রয়োজন ঘটে ? সে কি গেঁয়ো মেয়ে না শহরেও যে বিরাট সংখ্যক মানুষকে গেঁয়োজীবন আঁকড়ে থাকে সেও রয়ে গেছে তাদের স্তরে —এতটুকু বিচ্যুতিতেও পাড়ায় যাদের নিয়ে কানাকানি চলে আর মেয়ে বলেই সে কানাকানিকে তারও ভয় করতে হবে !

শান্তিময়ী আটকে রয়ে গেছে তার যৌবনের দিনগুলিতে। তার ধারণাই নেই কীভাবে বদলে গিয়েছে রোজগেরে মেয়েদের জীবনসংগ্রামের পরিবেশ পর্যন্ত !

ক্ষোভ নিয়ে বাড়ি ফিরেই কান্তা টের পায়, সকলের মধ্যে গভীর অসন্তোষ। মাসকাবার হয়েছে সে মাইনে পেয়েছে কিন্তু বাড়ির প্রায় প্রত্যেকের কতক দাবিদাওয়া যে এখনও সে মেটায়নি !

নিরুদ্দেশ

মঞ্জু বাপের বাড়ি যায় না প্রায় তিন বছর। অপমানে অভিমানে যায় না। বছর তিনেক আগে তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে মাসখানেক বাপের বাড়ি থাকতে গিয়েছিল। তার বাবা যোগেশ তাদের জন্য কিছু খরচ চেয়েছিল জামাই বিনয়ের কাছে। বড়োই আহত আর অপমানিত বোধ করেছিল মঞ্জু।

দিনকাল বড়োই খারাপ কিন্তু অবস্থা তো নেহাত খারাপ নয় তার বাপের। যোগেশ নিজে মোটা বেতনে চাকরি করে, মঞ্জুর বড়োভাই অনিলও ভালো চাকরি পেয়েছে। আগের মতো না হলেও মোটামুটি সুখে-স্বচ্ছন্দেই তাদের দিন কাটে। মেয়ে বছরে একটা কী দেড়টা মাস থাকতে এলে তাব কাছে খরচ চাওয়া !

মুখে কিছুই বলেনি মঞ্জু। ঝগড়াঝাঁটি কবেনি। করলে বোধ হয় তার অপমান অভিমানের জেরটা তিন বছর গড়াত না।

বিনয়কে সে বলেছিল তুমি কাল-পরশুই ফিরে যাও। গিয়ে একশো টাকা বাবাকে পাঠিয়ে দিয়ো। দিন দশেক পরে এসে আমাদের নিয়ে যাবে। লিখবে তোমার অসুবিধা হচ্ছে।

মোটে দিন দশেক থাকবে ? তাহলে টাকা পাঠাব কেন ?

ছি ! এত ছোটো করো না মন। বাবাকে নয় একশোটা টাকা এমনিই দিলে, অত হিসেব কেন ? আর তো দিতে হবে না কোনোদিন। এ জীবনে আমি আর বাপের বাড়ি আসব না।

মা-বোন, বাপ-দাদা অনেকবার যেতে লিখেছে, যোগেশ আর অনিল নিতেও এসেছে কয়েকবাব-নানা অজুহাতে মঞ্জু যায়নি।

ছোটোবোনের বিয়েতে পর্যন্ত যাযনি।

বিনয়ের হাতে একজোড়া কানের দুল পাঠিয়ে দিয়েছে। বিনয়কে পরিষ্কার বলে দিয়েছে, এক রাত্রির বেশি সে যেন তার বাপের বাড়িতে বাস না করে, শালির বিয়ের ফুর্তিতে যেন মেতে না যায় !

অনিল অবশ্য একরাত্রিও থাকেনি। চাকরির অজুহাত জানিয়ে সন্ধ্যার পরেই বিদায় নিয়েছে শ্বশুরবাড়ি থেকে।

মাঝে মাঝে আজকাল মনটা কেমন করে ওঠে মঞ্জুর। কয়েক দিনের জন্য বাপের বাড়ি ঘুরে আসবার সাধটা উত্তাল হয়ে ওঠে। মনে হয়, একটা ফাঁকা ছেলেমানুষি অভিমানের বশে বোকার মতো সে মাঝে মাঝে কিছুদিনের মা-বাপ-ভাইবোনের সাহচর্যের আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে চলেছে—অতি তুচ্ছ অতি নগণ্য একটা মনগড়া কারণে। সে ঝগড়া করেনি। খোলাখুলিভাবে এতটুকু তিক্ততা সৃষ্টি করেনি—তিক্ততা যেটুকু সৃষ্টি হয়েছে সেটা বরং বারবার নেবার চেষ্টা করলেও সে নানাছুতোয় বাপের বাড়ি যায়নি বলেই।

ও বাড়ির মানুষেরা হয়তো খানিকটা আঁচ করেছে তার মনের কথা, সেবার এক মাস দেড় মাস থাকতে গিয়ে বিনয়ের কাছে খরচ চাওয়ার পর মোটে দিন দশেক স্নান গম্ভীর মুখে কাটিয়ে ফিরে যাওয়ার পর তিন বছর এক দিনের জন্য বাপের বাড়ি পা না দেবার কারণ কতকটা নিশ্চয় আন্দাজ করেছে।

কিন্তু ওটাই যে তার আসল কারণ, তার মন যে বিগড়ে গেছে ওই একটি কারণে, সেটা থেকে গেছে তারই মনের গহনে—ওরা কল্পনাও করতে পারেনি।

বিয়ের পর ছ-সাতবছর যখন খুশি বাপের বাড়ি গেছে, যতদিন খুশি থেকেছে, খরচ দেবার কথা কেউ বলেনি। এই আগুন-লাগা চড়াবাজারে তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে সে এক মাসের বেশি আরাম করতে গিয়ে থাকলে তার বাবা যদি ভাসাভাসাভাবে তাদের জন্য কিছু খরচ চেয়েই থাকে তার স্বামীর কাছে, তাতে তো তার কোনোই অপমান ছিল না !

সে আজ অনায়াসে কয়েক দিন বাপের বাড়ি ঘুরে আসতে পারে। সকলে খুশি হবে। কিন্তু কী করে যায় মঞ্জু ?

সে রকম আগ্রহের সঙ্গে বাপ-ভাই তো তাকে যেতে বলে না।

ওদেরও তো মান-আপমান অভিমান আছে, ধৈর্যের সীমা আছে ? বছরের পর বছর ওরা কি তাকে তোষামোদ করে চলবে। দয়া করে বাপের বাড়ি আয়, ক-দিন থেকে যা ? অথচ ওরা বেশ একটু আগ্রহের সঙ্গে জোরের সঙ্গে নিতে না চাইলে এখন নিজের মান বজায় রেখে যাওয়াও সম্ভব নয় মঞ্জুর পক্ষে। নিজের অপমান অভিমানের কি ফাঁদেই আটক পড়ে গেছে মঞ্জু !

বিনয় বলে, কী হল তোমার ? দিন দিন এ রকম মনমরা হয়ে মুষড়ে যাচ্ছ ? কাহিল হচ্ছ ?

মঞ্জু জোর করে হেসে বলে, দেখেছ নজর করে ? ভালোবাসা আছে মনে হচ্ছে যেন !

এত সহজে কথাটা এড়িয়ে যাবার সুযোগ বিনয় তাকে দেয় না। বলে, কাহিল নয় খানিকটা হলে, সেটা বুঝতে পাবি। মাছ-দুধ পাচ্ছ না, রেশনের চাল সইছে না। কিন্তু এত মনমরা হয়ে যাচ্ছ কেন ? মেজাজ এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে কেন ? অভাব বাড়ুক, সে জন্য রোগা হও আপত্তি নেই ! কিন্তু গাছতলা সার করতে হলেও মনমেজাজ বিগড়ে যাবার মানুষ তো তুমি নও।

মঞ্জু স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, ধীরে ধীরে ঠোঁট কামড়ায়। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

বিনয় বলে, অ ! ব্যাপার গুরুতর, সেটা ধরেছি ঠিক। ব্যাপার কী তাও যেন বুঝতে পারছি মনে হচ্ছে !

মঞ্জু সেলাই করা রঙিন শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে মাথা নাড়ে, এটা বুঝতে পারবে না কিছুতেই।

বিনয় একটা বিড়ি ধরিয়ে বলে, যদি পেরে থাকি ? বলব তোমার কী হয়েছে ? বাপের বাড়ি যাবার জন্য মন কেমন করছে, খারাপ লাগছে।

মঞ্জু একেবারে থ বনে যায়।

তুমি কি ম্যাজিক জানো ?

আজ্ঞে না। এটা বোঝা মোটেই কঠিন নয়। ঝঞ্ঝাট ঝামেলা এ সবেরও তো রীতিনীতি আছে—বেশি দিন চললে ও সব পুরানো হয়ে যায়। দুঃখকষ্ট তোমার গা সওয়া হয়ে গেছে—নতুন বড়ো রকম কোনো মুশকিলে পড়নি। বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে এ যা ছেলেমানুষি কাণ্ড করেছিলে, সেটার জের টানতে পারছ না। তাছাড়া তোমার মুষড়ে পড়ার আর কোনো কারণ থাকতে পারে না।

মঞ্জু খানিক চুপ করে থেকে বলে, আমার তো খারাপ লাগছে অনেক দিন থেকেই, অ্যাদ্দিন কিছু বলনি যে ?

বিনয় বলে, আমি কি বেশি দিন টের পেয়েছি ? কত ঝঞ্ঝাটে থাকি বুঝতে পারো তো !

বুঝতে পারি না ? কী চেহারা হয়েছে তোমার চোখে দেখতে পাই না আমি ?

বিনয় একটু হাসে।—দেখতে পাও বলেই তো পনেরো দিনের ছুটি নিয়েছি। তোমাদের নিয়ে পনেরো দিন শ্বশুরবাড়ির জামাই আদর ভোগ করে মোটা হয়ে ফিরে আসব।

অন্য অবস্থায় মঞ্জু নিশ্চয় রাগ করত। তাকে কিছু না জানিয়ে বিনয় তাদের নিয়ে পনেরো দিন তার বাপের বাড়ি থেকে আসবার সব ঠিক করে ফেলেছে ! সে কি এতই তুচ্ছ যে তার সঙ্গে একটু পরামর্শ করাও দরকার মনে করল না।

কিন্তু বিনয়ের ওই একটি কথা তাকে দমিয়ে দেয়। পনেরো দিন বিনয় তার বাপের বাড়িতে জামাই আদর ভোগ করবে, বিশ্রাম করবে !

শরীর সারানোর কথাটা তামাশা। পনেরো দিন জামাই আদর কেন লাটসাহেবি আদর ভোগ করলেও শরীরটা তার আগের মতো জোরালো হবে না, সে জন্য কয়েক মাসের তোড়াজোড় চাই।

তবে বিশ্রাম পাবে। ছুটিটা এখানে কাটালে তার শুধু আপিসের কাজ থেকে বিশ্রাম, অন্য সমস্ত ঝঞ্ঝাট বজায় থাকবে। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে পনেরোটা দিন হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে বসে কাটাতে পারবে।

মঞ্জু তাই শুধু বলে, এভাবে যেচে যাওয়া কি ঠিক হবে ?

বিনয় বলে, কতবার এসে এসে সাধাসাধি করে গেছে ভুলো না। যেচে গেলেই বরং এখন উদারতা দেখানো হবে, তুমি নিজে থেকে ওদের দোষ ক্ষমা করেছ।

সত্যই খুশি হয় মঞ্জুর বাপের বাড়ির মানুষেরা। আদরযত্নের একেবারে সমারোহ লাগিয়ে দেয়, তিন বছরের পাওনা যেন পুষিয়ে দিতে চায়।

মঞ্জু ভাবে, কী বোকার মতো রাগ করেছিলাম এদের ওপর !

হাসি আনন্দ গল্পগুজবের মধ্যে দীর্ঘকালের ভুলবোঝাবুঝি যেন শূন্যে মিলিয়ে যায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। এক দিনে মঞ্জু যেন সজীব হয়ে ওঠে।

বিনয় নিশ্বাস ফেলে গভীর। স্বস্তির নিশ্বাস। তাকেও যেন বেশ চাঙ্গা মনে হয়।

মঞ্জু কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলে, তুমি সত্যি আমার যে কী উপকারটা করলে ! তোমার জন্যই আসা হল, নইলে বাকি জীবনটা হয়তো মিথ্যা রাগ নিয়ে মিছিমিছি জ্বলে পুড়ে কাটত।

বিনয় পরম খুশির সঙ্গে বলে, আমিও বেঁচেছি তোমাদের মিটমাট হয়ে গেল।

মঞ্জু কি জানত তার হাসি আনন্দের জেরটা ঠিক দুটি দিনের বেশি চলবে না !

ঠিক দুদিন তার পরম শান্তিতে কাটে। তৃতীয় দিন সকালে চা-খাবার খেয়ে ফরসা জামাকাপড় পরে দুখানা আধময়লা ধুতি আর একটা পাঞ্জাবি কাগজে পুটলি করে বিনয়কে বেরোতে দেখে মঞ্জু জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাচ্ছ ?

জামাকাপড়টা লন্ড্রিতে দিয়ে আসি।

তোমার যাবার কী দরকার ?

যাই, একটু হাঁটাও হবে।

সেই যে হেঁটে বেড়িয়ে আসার উদ্দেশ্যে বিনয় বার হয়, আর সে ফিরে আসে না। বেলা বাড়ার সঙ্গে শুরু হয় বাড়ির লোকের অস্বস্তিবোধ, ক্রমে ক্রমে সেটা দাঁড়িয়ে যায় দুর্ভাবনায়।

দিন কাটে রাত আসে ভোর হয়, বিনয় ফেরে না। এভাবে কিছুক্ষণের জন্য একটা মানুষ বেরিয়ে গিয়ে বাড়ি না ফিরলে খোঁজখবর নেবার জন্য যা কিছু করা দরকার সবই করা হয়।

যোগেশ বলে, অ্যাকসিডেন্ট হয়নি, তাহলে জানা যেত।

এইটুকুই সকলের ভরসা। দুর্ঘটনা ঘটে থাকলে তার খবরটা অজানা থাকে না।

মঞ্জু একটা ঢোঁক গেলে। বলে, আমি ফিরে যাই বাবা। আমার এখানে আসা নিয়েই একটা কিছু গোলমাল হয়েছে। ও বাড়িতে ফিরে গেছে মনে হয়।

অনিল বলে, দাঁড়া, আমি খবর নিয়ে আসছি।

চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। ওবা থাক।

অনিলের সঙ্গে মঞ্জু একা ও বাড়িতে যায়। দেখা যায় তাদের ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে দুটি।

অন্য ঘরের ভাড়াটেদের কাছে খবর পাওয়া যায়, বিনয় আগের দিন সকালে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য এসেছিল। বাড়িওলাব সঙ্গে বিনয়ের ভাড়া নিয়ে ঝগড়া হয়, বিনয় দবজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে যাবার পর বাড়িওলা আবেকটা তালা এঁটে দিয়েছে।

বাড়িভাড়া নিয়ে ঝগড়া ?

মঞ্জু যেন আকাশ থেকে পড়ে !

বাড়িওলা বসিকের বাড়ি কাছেই, মঞ্জুও চেনে। অনিলকে নিয়ে সে ব্যাপার বুঝতে চায়।

অনিল জিজ্ঞাসা করে, আপনি এদের দরজায় তালা লাগিয়েছেন কেন ?

রসিক বলে, ভাড়া না মিটিয়ে মালপত্র নিয়ে যাতে পালাতে না পারেন এই জন্যে !

ক মাসের ভাড়া বাকি ?

তিন মাস হয়ে গেছে।

মঞ্জু আর অনিল মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। অনিল রসিককে বলে, তালা খুলে দিন। আজকেই সব ভাড়া পাবেন।

ঘবে ঢুকে ধপাস করে খাটে বসে পড়ে মঞ্জু বলে, এ কী রকম ব্যাপাব হল ? তিন মাস ভাড়া বাকি পড়েছে আমি কিছু জানি না !

অনিল বলে, তুই বোস, আমি ব্যাংক থেকে ঘুবে আসি।

মঞ্জু একটু ভেবে বলে, এক কাজ কবো, ব্যাংক হয়ে ওর আপিসটা ঘুরে এসো। আপিসে খবর নেওযা উচিত।

রাস্তায় অনিল ট্যাক্সি নেয। ব্যাংকে টাকা তুলে বিনয়েব আপিসে খবর নিয়ে বাড়ি ফিরতে তার দুঘণ্টার বেশি সময় লাগে না। খবর কী ? না, পাঁচ মাস আগে আপিস থেকে বিনয় ছাঁটাই হয়েছিল।

মঞ্জু বিহ্বলের মতো বলে পাঁচ মাস আগে ! রোজ নিয়মমতো আপিস করেছে। পনেরো দিনের ছুটি নিয়েছে বলল।

তাহলে কি অন্য আপিসে ঢুকেছে ?

মঞ্জু ম্লান গম্ভীর মুখে বলে, আমায় না জানিয়ে ? ছাঁটাই হবার কথাটা নয় চেপে গিয়েছিল, আরেকটা কাজ পেলে জানাত না ? আমি এবার বুঝেছি ব্যাপার। আর উপায় ছিল না, আমার দায় তোমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে সরে গেছে !

অনিল একটু ভেবে বলে, লজ্জায় স'রে গেছে সেটা বুঝতে পারি—কিন্তু এভাবে নিরুদ্দেশ হযে কেন ? একটা চিঠি লিখে তোকে তো জানিযে যেতে পারত !

মঞ্জু বলে, তাও বুঝলে না ? পাঁচ মাস টেনেছে, আমায় টের পেতে দেয়নি আশা করছিল এ ক-দিনের মধ্যে যদি কিছু করতে পারে, সামলে নিতে 'রে।

অনিল বলে, আহা, নিরুদ্দেশ হল বলেই আমরা জানতে পাবলাম। ওখানে থেকে উপায়ের চেষ্টা করলে আমরা তো টেরও পেতাম না।

মঞ্জু বিষণ্নমুখে একটু হাসে।—সে রকম মানুষ কি না, এ অবস্থায় শ্বশুরবাড়ির অন্ন ধ্বংস করবে। তাহলে আগেই গিয়ে সাহায্যের জন্য হাত পাতত।

পাষণ্ড

বাজার থেকে ফিরে জামাটা খুলে বিপিন খালি গায়ে বাইরের রোয়াকে গিয়ে বসে। বর্ষার গুমোট গরমে হেঁটে বাজার করে আনতে জামাটা ঘামে ভিজে গায়ের সঙ্গে সেঁটে গিয়েছিল।

বাইরে বসে গায়ের ঘামটা শুকিয়ে নেবে।

হাতপাখাটা ছিল মেয়ের হাতে। ভিতরে বসলে মেয়ে হাওয়া করতে এগিয়ে আসবে। মেয়ের অযাচিত সেবায় বিপিন আজকাল বড়োই অস্বস্তিবোধ করে।

হতভাগি মেয়ে। আগের জন্মে বোধ হয় অনেক পাপ করেছিল, এ জন্মে তাই এক পাষণ্ডের হাতে পড়ে একেবারে নষ্ট হয়ে গেল জীবনটা।

মাস শেষ হয়ে এসেছে। বাজার থেকে নামমাত্র মাছটুকু আনাও আজ ক-দিন বন্ধ রয়েছে। মাছ এত ভালোবাসে রাধা, মাছ ছাড়া মুখে তার ভাত রোচে না। কোথায় রোজগেরে স্বামীর ঘরে দুবেলা মাছ-ভাত খাবে, সর্বস্ব খুইয়ে গরিব বাপের খাড়ে এসে চেপে শাকপাতা ডাঁটা চিবিয়ে দিন কাটাচ্ছে।

রাধা আজ প্রায় এক বছরের বেশি বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু মেয়েটার দুর্ভাগ্য আর পাষণ্ড জামাইটার চিন্তা আজও অভ্যস্ত হয়নি বিপিনের। প্রাণের জ্বালা আরও বেড়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন।

মানুষ এমনভাবে বখে যেতে পারে, এত নীচে নামতে পারে অধঃপতনের পথ ধরে ? চাকুরে ছেলে ভালো ছেলে বলে কত আশা করে যথাসর্বস্ব খরচ করে মেয়েটাকে ওর হাতে তুলে দিয়েছিল। বিয়ের পরেও তিন-চারবছর টের পাওয়া যায়নি টাকা-পয়সা স্বভাব চরিত্র কী রেটে সে উৎসন্ন দিতে বসেছে, বিসর্জন দিচ্ছে মনুষ্যত্ব। টের পাবার পর মোটে দুবছর লেগেছে চরম অবস্থায় পৌঁছতে।

স্বাস্থ্য গেছে, চাকরি গেছে, একে একে রাধার গয়না গেছে—সব চেয়ে দামি যে আত্মীয়বন্ধু দশজনের বিশ্বাস, তাও গেছে।

সবাই হাল ছেড়েছে, তারা ছাড়তে পারেনি। সকলকে ঠকানো থেকে চুরি-চামারি পর্যন্ত শুরু করেছে জেনেও আশা ছাড়া যায়নি।

হয়তো এ ঝোঁক কেটে যাবে। হয়তো চৈতন্য হবে।

কিন্তু কপালটাই মন্দ যে মেয়ের, তার স্বামীর বেলা কি আর সে অঘটন ঘটে ? যে মানুষ ছিল সে অমানুষ হলেও আবার মানুষ হয় ?

রাধার সব যাওয়ার পর তাকে আর ছেলেমেয়ে দুটিকে সমীর আবর্জনার মতো ফেলে গেছে এখানে। তবু তাদের রেহাই দেয়নি।

সে ধূর্ত। সে টের পেয়েছে তাদের এই নিরুপায় আশা—হয়তো সে শুধরে যাবে। এখন তো সে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে এ পথে কত সুখ। বাড়িতে গেলে আত্মীয়বন্ধু কুকুরের মতো দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। বদ উপায়ে কোনো রকমে দুটো পয়সা হাতে এলে বদ খেয়ালে দুদিনে তা উড়ে যায়, আবার সম্বল করতে হয় রাস্তা। এবার হয়তো সে নিজেকে সংশোধন করবে।

যতদিন এই আশাটুকু বজায় রাখা গেছে, মাঝে মাঝে এসে নানা ছুতায় দশ-পনেরোটা করে টাকা বাগিয়ে নিয়ে গেছে সমীর।

তার এই অমানুষিক নির্লজ্জতাই অবশেষে একেবারে শেষ করে দিয়েছে তাদের শেষ আশাটুকু।

পরেরবার সমীর এলে বাইরের দরজা থেকেই তাকে বিদায় করে দিতে হয়েছে।

রাধা নিজেই বলেছে : না বাবা, আর প্রশ্রয় দিয়ো না। এখন থেকে মনে করো আমি বিধবা হয়েছি।

আবার আজ সমীরকে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে ঘামে ভেজা শরীরটা বিপিনের ঠান্ডা অবসন্ন হয়ে আসে।

আরও কদর্য কুৎসিত হয়ে গেছে সমীরের চেহারা। কোটরে-বসা চোখে একটা ঝিমানো ভাব, মুখে ঘর্মাক্ত ক্লেদের মতো শ্রান্তি মাখানো।

বিপিন প্রায় কাতর অনুনয়ের সুরে বলে, আবার কী চাও বাবা ? মাসের শেষে আমার হাতে একটি পয়সাও নেই—

আগে কোনোবার করেনি, আজ সমীর তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে।

বলে, আজ্ঞে টাকা চাই না। আপনার মেয়ের সঙ্গে একবার দেখা করব। ক-টা দরকারি কথা আছে।

বিপিন ভাবে, কে জানে এ আবার কী নতুন চাল ? আবার কী চালাকি খাটাতে এসেছে জামাই ?

মুখে বলে, একটু দাঁড়াও, জিজ্ঞেস করে আসি।

জিজ্ঞাসা ওকে করতে হয় না। রাধা সমীরকে জানালা দিয়ে আসতে দেখেছিল, দরজায় আড়ালে দাঁড়িয়ে তার কথাও সব শুনেছে। কবে কখন আবার তার স্বামী তার বাবাকে ঠকাতে আসবে বলে সে কি সারাদিন জানালায় চোখ-কান পেতে রাখে ?

রাধা বলে, বাবা, বলে দাও, দেখা করে কাজ নেই, আমি দেখা করব না।

কী বলতে চায় একবার শুনলে হত না ?

না। কোনো লাভ নেই। নতুন কী মতলব করেছে, বানিয়ে বানিয়ে কত রকম কী বলবে, মাথাটা ঘুরে যাবে আবার। আগেরবার বলেছিল, আমার লুকানো কিছু নেই ? এবার সেটা বাগাতে এসেছে। মিথ্যে অশান্তি করে লাভ নেই, বাবা।

চলে যেতে বলব ?

তাই বলো। নিজেকে বিধবা ভেবেছি, তাই আমার ভালো।

বিপিন অপরাধীর মতো বলে, রাধা তো তোমার সাথে দেখা করবে না বাবা।

দেখা করবে না ?

মাথা নত করে সমীর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। বিপিন টের পায় এ পাশের ও পাশের আর সামনের বাড়ির জানালা দিয়ে অনেকগুলি কৌতূহলী মুখ উঁকি দিচ্ছে।

তার জামাইয়ের বিষয় জানতে কারও বাকি নেই। মেয়ে তার এখানে তার বাড়িতেই আছে, তবু মেয়ের জামাই এসে কীভাবে দরজা থেকে ফিরে যায় দেখবার জন্য তাদের ঔৎসুক্যের সীমা নাই।

এ দৃশ্য যেন সিনেমার সস্তা গল্পের চেয়ে রসালো।

বিপিনও মাথা হেঁট করে।

মুখ তুলে সমীর বলে, আমি শুধু পাঁচ মিনিট কথা বলেই চলে যাব।

বিপিনকে জবাব দিতে হয় না।

জানালা দিয়ে অদৃশ্য রাধার স্পষ্ট জবাব আসে, আমি বিধবা হয়েছি। ভূতের সঙ্গে আমি এক মিনিটও কথা বলতে চাই না।

সমীর চোখ তুলে জানালার দিকে চায়। কিন্তু রাধাকে দেখতে পায় না।

মাথায় ঝাঁকি দিতে গিয়ে সে যেন নিজের শীর্ণ দেহটাকেও ঝাঁকানি দেয়। ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের কোঁচা তুলে মুখে চাপা দিয়ে কয়েকবার কাশে। তারপর আবার বিপিনের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে নীরবে ধীরে ধীরে চলে যায়।

তখনও বিপিনের গায়ের ঘাম শুকোয়নি।

দিন দশেক পরে বিকালের ডাকে একখানা পোস্টকার্ড আসে সমীরেব। পেনসিলের অস্পষ্ট লেখা কিন্তু পড়া যায়।

সে শিয়ালদহ স্টেশনে পড়ে আছে। তার সমস্ত অপরাধ যেন সকলে ক্ষমা করে। সম্ভব হলে ছেলেমেয়ে দুটিকে শেষবারের মতো দেখতে চায়।

এই পরিণতিই ঘটে সমীরদের। সে জাতবজ্জাত নয়, বেপরোয়া ঔদাসীন্যের সঙ্গে যারা পাপের পথে হাঁটতে শুরু করে মোটর হাঁকায়, তাদের ধাতুতে সে গড়া নয়। পাপ তার পেশা নয়, নেশা। স্বাভাবিক সুস্থ জীবন আয়ত্তে থাকলেও অসুস্থ জীবনের অস্বাভাবিক তীব্রতা উন্মাদনা বিষাক্ত ভয়ানক নেশার মতোই তার মতো মানুষকে ধ্বংস করে দেয়।

রাধার মা কেঁদে ফেলে।

রাধার হাত-পা থরথর করে কাঁপছিল। কিন্তু মুখে সে বলে : আঃ, থামো না। এ আরেকটা মিথ্যে চালও তো হতে পারে ? ও মানুষটার কোনো কথায় বিশ্বাস আছে ?

মা-র কান্না থেমে যায়। সেটা অসম্ভব নয়, ছলচাতুরী মিথ্যা আব প্রতাবণার মতলব ভাঁজতে সে যে কত বড়ো ওস্তাদ তার পরিচয় সমীর ভালোভাবেই দিয়েছে বটে।

তবু মেয়ের দিকে চেয়ে মা অবাক হয়ে থাকে। তার সেই মেয়ে বাধা, কারও একটু আঙুল কেটেছে দেখলে যার কান্না আসত, এই চিঠি পেয়েও আজ সে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মতো।

বিপিন আফিস থেকে ফিরে আসে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। চিঠি দেখে তাব শুকনো মুখে বিহ্বলতা নেমে আসে।

একবার তো যেতে হয় তাহলে ?

তুমি অস্থিব হয়ো না বাবা। কতবাব তোমায় ঠকিয়েছে—মনে নেই ?

তাই বলে তো মরতে দেওয়া যায় না ?

তাই কি যায় ? আমরা যাব চলো, কিন্তু তোমায় শক্ত থাকতে হবে। আগে বুঝবে সত্যি লিখেছে কি না, তারপর যা হোক ব্যবস্থা করবে। ব্যাকুল হয়ে ওব কোনো ফাঁদে আমরা আর পা দেব না।

বিপিনও অবাক হয়ে মেয়ের মুখেব দিকে চেয়ে থাকে। সত্যই পাষণ্ড সমীব, নইলে এমনভাবে কেউ মানুষের বিশ্বাস নষ্ট করে যে রাস্তার ধারে মৃত্যুশয্যায় পড়ে থাকার সংবাদ জানিয়ে পত্র লিখলেও নিজের স্ত্রীর সন্দেহ থেকে যায়—এ তার প্রতারণার আরেকটা কৌশল হওয়া অসম্ভব নয় !

কিন্তু যাই ভাবুক আর যাই বলুক, ভিতরটা যে রাধার কাঁপছে সেটা টের পাওযা যায়। ঢোঁক গিলতে গিয়ে দু-একবারের চেষ্টায় গিলতে পারে না। ছোটো ছোটো নিশ্বাস ফেলে, আতঙ্কের চাপে তার শ্বাসযন্ত্র খানিকটা আড়ষ্ট হয়ে এসেছে।

অসহায় নিরুপায় উদ্‌বাস্তু মানুষে ভরা শিয়াদহ স্টেশন। শিশু থেকে বুড়ো, মেয়েপুরুষ, ছোটো বড়ো পরিবার, একলা মানুষ। এদের মধ্যে খুঁজে নিতে হবে সমীরকে।

চারিদিকে তাকায় আর রাধা ভাবে সমীরকে নয় নিজের চোখে এখানে এসে শেষশয্যা পাততে হয়েছে, এরা কার কাছে কী করেছিল ? কী পাপে এদের এই পরিণাম, এই শাস্তি ?

একপ্রান্তে সমীরকে পাওয়া যায়। একটা কাপড়ের পুঁটলি মাথায় দিয়ে সে শতরঞ্চিতে শুয়ে ছিল। তাকে দেখেই তার অবস্থা সম্পর্কে সমস্ত সন্দেহের মীমাংসা হয়ে যায়।

বিপিন নাম ধরে ডাকতে সে অতিকষ্টে চোখ মেলে তাকায়। খানিকক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে বিহ্বলের মতো চেয়ে থাকে। গায়ে হাত দিয়ে দেখা যায়, জ্বর নেই।

আমাদের চিনতে পারছ না ?

একটু মাথা নেড়ে সমীর সায় দেয়।

অগত্যা বাড়িতেই তাকে আনতে হয়। জামাকাপড় ছাড়িয়ে বিছানায় শুইয়ে দিতে হয়, তারই ছেলেমেয়ের দুধটুকু গরম করে খাইয়ে দিতে হয়, ডেকে আনতে হয় ডাক্তার।

ডাক্তার পরীক্ষা করে জানায়, আর কিছু হয়নি, একটু দুর্বল।

একটু ? রাধা ঠোঁট কামড়ায়।

রাত বাড়ে। চারিদিক নিঝুম হয়ে আসে।

সমীরকে খাটে শুইয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে রাধা মেঝেতে নিজের শোয়ার ব্যবস্থা করেছে। অনেক দিনের খাট। যখন সে নিজের মেয়েটার মতো ছোটো ছিল, মা-র সঙ্গে এই খাটে শুয়ে ঘুমোত।

রাধার ঘুম আসে না। আকাশপাতাল ভাবে। কতকাল পরে স্বামীকে ঘরে পেয়েছে, খাটে শুয়ে ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে এপাশ-ওপাশ করছে। কিন্তু রাধার মনে আশা নেই, আনন্দ নেই, স্বস্তি নেই। অন্ধকার ভবিষ্যতের চিন্তা আর অতীতের স্মৃতি যন্ত্রণার মতোই চাপ দিচ্ছে মাথার মধ্যে।

স্টেশনে পড়ে থাকলে হয়তো মরে যেত। এবারের মতো সমীর মরবে না। কিন্তু কী লাভ হবে তাতে ? এমনিভাবে কে কতবার ঠেকিয়ে রাখবে তার অপমৃত্যু ? আপনজনের আশ্রয়ে আপনজনের সেবাযত্নে মৃত্যু ঠেকিয়ে সুস্থ হয়ে উঠে সে তো আপন হবে না। অশান্তিতে আবার সে অসহ্য করে তুলবে জীবন। আবার তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে বাড়ি থেকে।

কিছুদিন পরের এই আগামী ঘটনার কথা কল্পনা করে রাধা শিউরে ওঠে।

কেন তাদের খবর দিতে যায় সমীর, শেষ দেখা দেখতে চায় ছেলেমেয়েকে ? কেন সে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে উদ্‌বাস্তুদের মধ্যে নীরবে মরে গিয়ে তাদের রেহাই দেয় না ?

ঘরের আলোটা জ্বলে ওঠায় রাধা চমকে ওঠে। খাট থেকে নেমে সমীর নিজে আলো জ্বেলেছে !

ধড়মড় করে উঠে বসে রাধা। পলকহীন চোখে চেয়ে থাকে। সন্ধ্যাবেলা যাকে ধরাধরি করে গাড়ি থেকে নামিয়ে খাটে শোয়াতে হয়েছিল, নিজে নিজে সে উঠে দাঁড়িয়েছে সাধারণ সুস্থ মানুষের মতো।

নিজে নিজে সে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খাচ্ছে !

নতুন এক আতঙ্কে বুক কেঁপে যায় রাধার। কে জানে কী মতলব নিয়ে এই কৌশলে সমীর বাড়িতে ঢুকেছে, রাতদুপুরে এখন মতলব হাসিল করবে।

জল খেয়ে সমীর একটু তফাতে বিছানায় বসে। ছেলেমেয়ের গায়ে একবার হাত বুলায়।

বলে : ভেবেছিলাম, দু-তিনদিন সময় নিয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ হব। কিন্তু আর ছলনা ভালো লাগছে না। তোমার সঙ্গে কথা না কয়ে চুপচাপ পড়ে থাকতে পারলাম না।

আবার তুমি আমাদের ঠকালে ?

ঠকিয়েছি, কিন্তু এবার আমার মতলব ভালো।

রাধা চুপ করে থাকে।

বিশ্বাস হয় না ? না হওয়াই উচিত। কিন্তু কাল তোমার বিশ্বাস হবে। সকালে আমি নিজেই চলে যাব। টাকাও চাইব না, কিছু চুরিও করব না।

এ রকম করার মানে কী ?

মানে ? মানেও তুমি বিশ্বাস করবে না আজ। আমি জীবনের মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করছি। তোমাদের কাছ থেকে একটু মনের বল জোগাড় করতে এসেছি। মনটা বড়ো দুর্বল হয়ে গেছে রাধা।

কে জানে এ আবার কোন নাটকের ভূমিকা ? রাধা চুপ করে থাকে।

সমীর বলে, অনেকবার পাঁক থেকে উঠবার চেষ্টা করেছি, পারিনি। কীসে কাবু হতাম জানো ? হতাশায়। নিজেকে যে শুধরে নেব সে তো অল্পে হবে না, দুদিনে হবে না। যা ভেঙেছি আবার তা গড়তে হলে অনেক দিন ধরে অনেক কষ্ট করতে হবে। এটা ভাবলেই মাথা ঘুরে যেত। ভাবতাম আমার পক্ষে আর তা সম্ভব নয়। উদ্‌বাস্তু আমার হতাশা ভেঙে দিয়েছে।

উদ্‌বাস্তুরা ?

সমীর সায় দেয়।

অনেক দিন থেকে পথে পথে ঘুরছি তো। সারাদিন পয়সা উপায়ের ফন্দিফিকির নিয়ে ঘুরি, রাত্রে স্টেশনে ওদের মধ্যে শুয়ে থাকি। দেখলাম কী জানো ? যথাসর্বস্ব গেছে, ছেলেমেয়ে নিয়ে কী করবে জানা নেই, কিন্তু কী মনের জোর ! হাল ছেড়ে ভেসে যাবে না কিছুতেই, একদিন আবার সব ঠিক হবে। যতদিন কষ্ট করতে হয় করবে। কেউ সাহায্য করে ভালো, না করলে নিজেরাই চেষ্টা করবে উঠতে। ওদের সঙ্গে মিশতে মিশতে আমারও মনের মোড় ঘুরে গেছে রাধা। ওরা পারলে, আমি কেন পারব না ? ওরা হাল ছাড়েনি, আমি কেন ছাড়ব ?

মিথ্যাকে সত্যের মতো বলার অভিনয়ে সমীর অনেকবার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। বারবার ঠকেও আবার বিশ্বাস করতে হয়েছে সে কথা। কিন্তু আজ যেন তার কথায় একটা সহজ সরলতার নতুন সুর শোনা যায়।

বহুকাল পরে আবার স্বামীর সঙ্গে মাঝরাত্রে এক ঘরে বসে কথা বলতে বলতে নতুন আশার ক্ষীণ গুঞ্জনের সুর ওঠে রাধার মনে।

কিন্তু—

এ সব কথা চিঠিতে লিখলেই পারতে খোলাখুলি ? এ রকম ছলনা করা উচিত হয়নি।

তোমরা কি বিশ্বাস করতে ?

প্রথম প্রথম নাই বা করতাম ? সত্যি তুমি যদি আবার ভালো হও আমরা কি অবিশ্বাস করব ? তোমার সুমতি হোক এটাই তো আমরা মানত করছি দিনরাত।

রাধা চোখ নামায়, আপশোশের সঙ্গে বলে, তোমার মন বাঁকা রয়ে গেছে, তুমি ভালো হবে কী করে ?

দমে যাবার বদলে সমীর উৎসাহিত হয়ে বলে, কী আশ্চর্য, তুমিও এটা ভেবেছ ? খাটে শুয়ে শুয়ে ঠিক এই কথাটা ভাবছিলাম। তোমাদের একটু দেখব, মনের জোর পাব, সে জন্য তোমাদেরই যে ধাপ্পা দিচ্ছি এটা খেয়ালও হয়নি আগে। কেমন একটা উত্তেজিত অস্বাভাবিক অবস্থায় ছিলাম, এখানে আসার পর ধীরে ধীরে সেটা কেটে গেল। তখন বুঝতে পারলাম, এটা করা আমার উচিত হয়নি। তাই তো উঠে পড়লাম, তোমার সঙ্গে ছলনার জের টানব না।

ছেলের গায়ে হাত রেখে সে আবার বলে, আমি যা চেয়েছিলাম পেয়ে গেছি রাধা।

পরদিন সকালে সমীরকে চা আর খাবার দিয়ে রাধা বলে, তুমি তবে এখানেই থাকো, কাজের চেষ্টা করো।

সমীর বলে, না। তোমাদের আদরে মন নরম হয়ে যাবে। আমি ভাবছি, কোনো উদ্‌বাস্তু কলোনিতে গিয়ে হোগলার কুঁড়ে তুলে থাকব। মাঝে মাঝে এসে তোমাদের দেখে যাব।

হরফ

হবফ প্রথম সংস্কবণেব প্রচ্ছদচিত্র

১

কলম আর চলতে চায় না।

অচল হয়ে আসা কলমটাকে জোর করে চালাতেও, মনপ্রাণ সতেজে বিদ্রোহ করে ওঠে।

কলম রেখে নিজের পেটটাকে দুবার থাপড়ে দিয়ে পেটটাকে উদ্দেশ্য করেই মানব বলে, কেন বাবা গোল বাধাচ্ছ ? নিজের ক্ষতি নিজে করছ ? আর ঘণ্টা দু-তিন চুপচাপ থাকলে লেখাটাও শেষ হত, আজ রাতে তোমায় খুশি করার ব্যবস্থাও হত !

নিজের পেটের উপরেই যেন একটু অনুকম্পার হাসি হেসে, মুখ বাঁকিয়ে মানব একটা বিড়ি ধরায়। মস্ত একটা হাই তুলে ধোঁয়া ছাড়ে।

সকালে রবির দোকানে বসে খেয়েছিল দুখানা টোস্ট আর দু-কাপ চা। আরও কিছু খাওয়া যেত অনায়াসেই। রবি তাকে ধার দেয় না, আগের পাওনাটা শোধ হয়নি। কিন্তু ক-দিন নগদ পয়সায় চা টোস্ট খেয়েছে—আজও রবি ধার দিয়েছিল, খেয়ে উঠে দামটা নগদ মিটিয়ে দেবে ভেবে।

আবার বাকি রাখছে শুনে রবি অপমানের সুরে যেভাবে বিরক্তি প্রকাশ করেছিল, আর কিছু বেশি খেলেও সেইভাবেই বলত : আগে না জানিয়ে, ধারে খাবেন না মানুবাবু !

তবু সে আরও কিছু খাওয়ার লোভটা সম্বরণ করেছে—সারাদিন আর কিছু জুটবে কি না, জানা না থাকলেও করেছে।

একবারে বেশি বোঝাই নিয়ে লাভ নেই। খিদে যথাসময়ে তার পাবেই। বেশি খেলে লাভের মধ্যে, শুধু লেখার ধারটা তার একটু ভোঁতা হয়ে যাবে—হয়তো কলম বন্ধই রাখতে হবে কিছুক্ষণ।

দুপুরে খেয়েছে পুরো চার পয়সার মুড়ি-মুড়কি। অলিকে পর্যন্ত একটু ভাগ না দিয়ে রসিয়ে রসিয়ে, চিবিয়ে চিবিয়ে, একলা খেয়েছে। তেল আছে প্রায় আধশিশি—আজ দুদিন চারবেলা, সে রান্না করেনি।

আলস্য করে নয়। চাল ডাল তরকারি কয়লা কাঠ, কিছুই ঘরে নেই, ও সব কিনে-কেটে রাঁধতে গেলে, একবেলাতেই হাতের পয়সা ক-টা ফুরিয়ে যেত বলেও বটে—রান্না করার সময়টা লেখাটার পিছনে ঢালতে পারবে বলেও বটে।

অলি টের পেয়ে ঘরে এসে দামি ছেঁড়া তোশকের বিছানাটা ঝেড়ে দিয়েছিল, ময়লা কুটকুটি চাদরটা তুলে নিয়ে বলেছিল, সাবান দাও না, কেচে আনি ? বড্ড ময়লা হয়েছে।

অলি জানত, তার সাবানও নেই, সাবান কেনার পয়সাও নেই—তবু বলেছিল।

একমুঠো কিন্তু তাকে সে ভাগ দেয়নি। সে জানত কম করে হলেও খেসারির ডাল আর পুঁই চচ্চড়ি দিয়ে অলি ঘণ্টাখানেক আগে ভাত খেয়েছে।

দিঘল জোরালো দেহের পেটের ক্ষুধার দেবতা, পুরো চার পয়সার মুড়ি-মুড়কি ভোগ পেয়ে খুশি হয়নি। বেলা পড়ে আসতে আসতে সতেজে গুড়গুড় করে ডেকে উঠেছে।

তবু কাজ এগিয়ে চলছিল। উপোসি পেটের তেজি খিদেয় আরও সাফ হয়ে গিয়েছিল মাথা, আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল কল্পনা।

এতক্ষণে খিদে খতম করেছে কলম চালানো।

পেটে হাত বুলিয়ে যেন আদর করেই মানব বলে, আমার কলম তুমি একেবারে থামাতে পারবে না বাছাধন। এত চেষ্টায় মাথায় ঝিমঝিম শুরু করিয়েছ, আস্তে আস্তে তুমিই আবার ঝিমিয়ে

যাবে। আবার আমি কলম চালাব জোরসে ! দু-ঘণ্টা লেখা থামিয়ে নিজের পুজোয়, নিজেই তুমি বাবা বাদ সাধলে।

অনেক বন্ধু আছে মানবের। ঠিক বন্ধু বলতে মানুষ যা বোঝে এবং সমাজ-সংসারে, যে মানে মানা হয়।

নিয়মনীতি সেই সনাতন।

যার কাছে মানুষের আবরু দরকার হয় না।

না দেহের, না মনের।

বউ নেই।

বউ সে পাবে কোথায় ? এই খোলার ঘরের বস্তিতেই দেহী হিসাবে বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে পাঁচ-ছটা। মানব ঘটক পাঠালেও তারা তার কাছে মেয়ে দিতে রাজি হবে না !

ওরা জেনে গিয়েছে। না জেনে ওদের চলে না। ওরা জানে সে ইচ্ছা করলেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে ফিরে যেতে পারে তার মামার বাড়িতে, দিদির প্রাসাদে কিংবা তার গন্ডা দুই কাকা-জ্যাঠা-মামা-মেসোর, দোতলা একতলা পোড়া ইটের পাকাবাড়িতে।

লাঞ্ছনা দেবে, গঞ্জনা দেবে, ভদ্রভাবে অপমান করবে, বাড়ির স্কুলে-পড়া ছোটো ছেলেটা পর্যন্ত—কিন্তু খেতে দেবে মাছ-দুধ-ভাত।

বাড়িতে যে আছে সে আপন হোক অতিথি হোক—নিজেরা যা খাবে তাকেও তার সমান ভাগ দেবে, এ নীতি আজও অচল হয়নি।

ওরা জানে না যে তাকে বাড়িতে রাখতে তার আত্মীয়স্বজনের কত ভয়। তাকে ভয় নয়, তার জন্য ভয়।

কে জানে কখন পুলিশ আসে !

উমাকান্তই বোধ হয় সব চেয়ে বেশি মেলামেশা করে তার সঙ্গে, খালেকের চেয়ে বেশি।

বন্ধু সে নিশ্চয় নয়, কারণ বয়সে অনেক বড়ো, গুরুর মতো বেশ খানিকটা শ্রদ্ধা আছে—মাঝে মাঝে মনে হয় যে, ভক্তিও বুঝি আছে। সমানে সমানে ছাড়া খাঁটি বন্ধুত্ব হয় না, এ তো জানা কথাই। উমাকান্ত অনুযোগ দিয়ে বলে, তুমি একগুঁয়ে পাগল। অধিকার নিয়ে বড়ো বড়ো কথা বলবে, কাজে পিছু হটবে। তোমার অধিকার নেই আপনজনের ঘাড় ভেঙে খাবার ? খেতে দিক, নয় রোজগারের ব্যবস্থা করে দিক ! তা তুমি যাবে না। তোমার মতো হাবা দেখিনি আমি আর।

সেই সকালটি চিরদিন স্মরণীয় থাকবে।

ভোরে কাকা এল।

অপরাধীর মতো।

নইলে এত কষ্ট করে এত ভোরে কেন আসবে ?

বস্তি অবশ্য তার অনেক আগেই জেগে গেছে।

কলের ভোঁ শুনতে হবে তো, আট ঘণ্টার জন্য, ওভারটাইমের জন্য ঘর ছাড়ার আয়োজন করতে হবে তো, খাটতে যেতে হবেই গো !

কাকা এসে প্রথম কথাই বলছিল, বস্তির নামমাত্র উঠানে, সামনাসামনি দাঁড়িয়ে : বড়ো হবার চেষ্টা করছ, করো। বিপ্লব করছ করো। আমার কিছুই বলার নেই। জ্যৈষ্ঠ মাসের সাতাশ তারিখে আশালতার বিয়ে দিচ্ছি। তোমার ইচ্ছে হলে যেয়ো, ইচ্ছে না হলে যেয়ো না। কোনো হাঙ্গামায় জড়িয়ে বুড়ো কাকাকে ঝঞ্ঝাটে ফেলো না।

মানব শুধু শুনেছিল। কথা কয়নি।

সামিয়কভাবে তার কলম থেমে গেছে।

কম্পোজিটব কালাচাঁদেব মেযে আত্তি তাকে দেখাতে আসে, বাপেব কলম চালাবাব নমুনা।

কলম নয, পেনসিল।

প্রুফ তোলা একখণ্ড কাগজে লেখা, কযেক লাইন ছডা।

ভোববেলা নাকি ঝগডা বেধেছিল, আত্তিব মা আব কালাচাঁদেব মধ্যে—ভোব মানে এক বকম শেষ বাত্রে।

খানিকক্ষণ গুম খেযে থেকে, প্রদীপ জ্বেলে নিজেব মনে চুপচাপ কাগজে আঁচড কেটে গেছে কাজে যাবাব বেলা পর্যন্ত।

আত্তি হেসে বলে, বাবাকে একটু লিখতে শেখাও না মানুবাবু? বাবাব এমন লেখাব শখ।

কাটাকুটিব অন্ত নেই, তবে মোটামুটি পডা যায। কালাচাঁদেব হাতেব লেখা, গোটা গোটা

কান্তবাবুব গল্প কম্পোজ কবিতে কবিতে একটি স্থান, কৃষ্ণেব বডো ভালো লাগিল। গযনাব জন্য বউ আবদাব ধবিযা ঝগডা কবিতেছিল, প্রসন্ন তাহাকে বলিল যে তুমি অসতী, সতীত্বেব পবীক্ষায তুমি ফেল কবিযাছ। শ্রীবামেব সঙ্গে বনবাসে গিযা, সীতাদেবী কি কোনোদিন শাডি গযনা চাহিযা স্বামীব সঙ্গে ঝগডা কবিযাছিল।

প্রহ্লাদকে ডাকিযা কৃষ্ণ বলিল কান্তবাবু এবাব গল্পে খুব দামি কথা লিখিযাছেন খুব খাঁটি কথা। কিন্তু কথাটা খোলসা কবেন নাই।

জাযগাটা কৃষ্ণ পডিযা শোনাইল। তাবপব বলিল, সকলেই জানে সীতাদেবীব সতীত্বেব পবীক্ষা হইল অগ্নিপবীক্ষা। তাহা সত্য নয। বসন ভূষণ সব ত্যাগ কবিযা, স্বামীব সহিত তিনি বনে গিযাছিলেন কোনোদিন কিছু চাহি[illegible] অশান্তি কবেন নাই। ইহাই আসল পবীক্ষা। কান্তবাবু ইহা খোলসা কবেন নাই লোকে বুঝিবে না।

প্রহ্লাদ হাসিযা বলিল কান্তবাবু ইহা বলিতে চাহেন নাই, ইহা তোমাব মনগডা কথা। বউদিদি কাপড গযনা চাহিযা ঝগডা কবিযাছে বুঝি?

মানব জিজ্ঞাসা কবে কালাচাঁদ কদ্দুব পডেছে জানো?

হ্যাঁ, জানি বইকী। বাবা কতবাব গল্প শুনিযেছে। ইশকুল থেকে বেবোবাব পবীক্ষাটা, না? সেটাতে ফেল মেবেছিল। বাবা বলে, ফেল মাবব না? তোব ঠাকুদ্দাদা বোগে ভুগল আট মাস, সব ঝঞ্ঝাট আমি পোযাইনি? খেতে না পাওযাব অবস্থা— বলতে বলতে বাবাব মুখ-চোখ কী বকম হযে যায, যদি দেখতে মানুবাবু।

বুঝেছি। তাবপব?

ঠাকুদ্দা কাকে ধবে বাবাকে পবীক্ষা দেওযালে। বাবা ফেল মেবে গেল। ঠাকুদ্দা বাবাকে ছাপাখানাব কাজ শিখতে ঢুকিযে দিলে।

আত্তি সগর্বে বলে, ঠাকুদ্দা ছাপাখানাব হেড ছিল, জানো?

ছাপাখানাব হেড বলতে ঠিক কী বুঝায আত্তিব ধাবণা নেই। কিন্তু মানব জানে ছাপাখানায যাবা হবফ চালে আব সাজায, তাদেবই হেড ছিল কালাচাঁদেব বাবা।

তোব বাবা যদি সুযোগ সুবিধা পেত আত্তি—

বোগা কিন্তু এত বডো ঢ্যাঙা মেযে কালাচাঁদ যে যাব তাব কাছে পাব না কবে ঘবে বেখেছে, এটাও একটা জ্যান্ত প্রমাণ বইকী যে, সুযোগ-সুবিধা পেলে কালাচাঁদ অনেক কিছু কবতে পাবত।

কালাচাঁদেবও লেখাব শখ?

অনেকেব হঠাৎ ঝোঁক চাপে—লেখক হব। কিন্তু খেযাল থাকে না লেখক হতে হলে শিখতে হয, লিখতে হয।

লিখতে শিখতে হয।

লিখতে শেখাটাই ভযংকব কষ্টকব ব্যাপাব। গোডাব দিকে আবও বেশি।

মনের গাছে, লেখক হবার ঝোঁকের ফুলটাই ঝরে যায় অনেকের।

অনেকের ঝরে যায় অঙ্কুরে।

অনেকের কচিফল বোঁটা শুকিয়ে খসে পড়ে।

কয়েকজন ফল ফলায়। ফল ফলিয়েও, ফল পাকানোর ধৈর্য আর কষ্ট তাদের সকলের সয় না। সাহিত্যে সফলতা অর্জনের দাম নিতে এদিক-ওদিক ছিটকে যায়।

দাম তার পায়।

টাকার দাম।

তাই দিয়ে তারা, আত্মীয়বন্ধু পাড়ার লোকের কাছে, বিশেষ ব্যক্তি হয়ে থাকে—বিশেষ ব্যক্তিরা তাদের সাহিত্যিক প্রতিভার নিষ্ফল পরিণতি পয়সা দিয়ে কিনে নেয়। বেশ মোটা টাকা দেয় সস্তা সিনেমায় লাগাতে পারলে।

এ সব তো গোড়ায় খেয়াল ছিল না তারও। কেন তবে ঝোঁকটা তার কেটে যায় না, সাধটা ভোঁতা হয়ে যায় না ? কেন সে সহজ পথ বেছে নিতে পারে না লেখক হবার ?

লেখা সম্পর্কে কারও সঙ্গে কোনো রকম আপস করার কথা ভাবলে কেন তার গা ঘিনঘিন করে, মনে হয় তার চেয়ে মরাও ভালো ?

অনায়াসে যেতে পারে ভূপতির আপিসে কিংবা বাড়িতে। দু-চার পয়সার মুড়ি-চিড়ে খেয়ে দিন কাটাবার অবস্থা যাতে না হয়, বা দু-চারআনা ট্রাম-বাসের পয়সার অভাব না ঘটে, সে কায়দা না শিখেই সে এই বয়সে লেখক হিসেবে নাম করতে পেরেছে।

একবার গিয়েছিল ভূপতির আপিসে।

কীভাবে সে তার লেখকত্ব গুণটা কিনতে চায় তারই নিয়মকানুন জানার জন্য।

সবকিছু না জানলে না বুঝলে, কি লেখক হওয়া যায় ?

বিষ কী না জেনে, শুধু অমৃত পান করে কেউ লেখক হয় ? বিষ বর্জন করে শুধু অমৃত নিয়ে মেতে থেকে, জগতে আজ পর্যন্ত কোনো লেখক জগৎকে ফাঁকি দিতে পারেনি।

সব জানতে হবে লেখককে। বস্তির ড্রেন থেকে রাজপ্রাসাদের ড্রইংরুম পর্যন্ত।

মাঝখানেরও সমস্ত কিছু।

ভূপতি বলেছিল, খেতে পাচ্ছ না ? তোমায় তো আগেই বলেছি আমি ! কাব্যি-রোগ সারিয়ে আমার আপিসে ঢুকে পড়ো। ভালো পোস্ট—দেড়শো টাকা মাইনে।

একুশ বছর বয়েস।

গল্প তার পৌঁছে দিতে হয় না সব মাসিকপত্রে—দুটো সেরা মাসিকপত্র থেকে তার গল্প চাওয়া হয়—গল্প দিলেই দাম !

বইও বেরিয়েছে দুটো। প্রকাশক নিজের খরচে ছাপাবে, তাই খুশি না হয়েও একজনকে নগদ একশো, আর আরেকজনকে দেড়শো টাকায় বই দুটো বিক্রি করেছে !

গল্পের জন্য নগদ নয়—কিন্তু দাম তো ! গল্প বেরোবার পর নগদ দাম—দশ টাকা থেকে পনেরো টাকা।

কী উদারতা সাহিত্যিক কর্ণধারদের মোটা টাকা দিয়ে, মাসিকপত্রের কর্ণধার করা খ্যাতনামা পুরুষদের ! মহাপুরুষ—তাই ভুলে যায় তাদেরও একদিন অল্পবয়স ছিল, বাপ-দাদা খাতিরের লোক

হলেও সাত রাত্রি জেগে লেখা গল্পটার জন্য দশটা টাকা পেয়েছিল—প্রিয়তমাকে এক দিনের বেশি সিনেমায় নিতে পারিনি, সাত দিনের দিবারাত্রি খেটে রোজগার করা দশটা টাকায় !

ভেবে-চিন্তে মানব তার ঘনিষ্ঠতম সম্পাদক, মহেশের বাড়ি যায়।

মানব বলে, ও বেলা আপিসে গেলে সব টাকাটা আগাম হবে ?

নিশ্বাস ফেলাটা মানব শুনতে পায়।

সেদিন কি আছে রে ভাই ?

স্নেহ আর জ্বালা-মেশানো অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সেদিন যে আর নেই, মানবই যেন সে জন্য দায়ি। সেদিন মানে বছর পাঁচেক আগের কথা—মানব যখন গল্প লেখা শুরু করে।

নতুন প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট ধরিয়ে মহেশ উদারভাবে বলে, যাকগে। আমার দুঃখের কথা শুনে তোমার পেট ভরবে না। বাড়িতে এলে, চা দিলাম না, খাবার দিলাম না—কী করি বলো ভাই ? একজোড়া শাড়ির জন্য খেপে আছে, এককাপ চায়ের কথা বলতে গেলেই আরও খেপে গিয়ে কামড়ে দেবে।

একটু থেমে বলে, সিগ্রেটটা ধরাও।

ধরাব !

মহেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলে। ভিতর থেকে নিশ্চয় শোনা যায়।

দু-কাপ ধোঁয়াটে পানীয় আসে বিনা হুকুমে !

চা দিয়ে চন্দ্রা উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে, আমি এঁর নতুন গল্পটা পড়েছি বাবা। ওঁর গল্পটা যে ভালো তুমি ঠিক ধরেছ। তুমি ছাড়া আর কেউ সাহস করে ছাপাতো ? ছাই ছাপাতো !

চা খায়।

এ কথা ও কথা বলে, পকেট থেকে তিনটে টাকা বার করে মহেশ বলে, পকেট থেকেই দিলাম ভাই, কবি কী ! তোমারও তো অচল অবস্থা। বিল পাশ হলেই আমরা মাইনে পাব, তুমিও তোমার বাকি টাকাটা পাবে।

ঘরে শুয়ে বসে সাদা কাগজের বুকে কলমের আঁচড়ে অক্ষর সাজিয়ে যাওয়া, আর প্রেসে সারাদিন শুধু বসে থেকে ছক-কাটা ঘরগুলি থেকে অক্ষর আর সাংকেতিক চিহ্ন বেছে বেছে সাজিয়ে যাওয়া।

সোজা, বাঁকা, টানা—নানারকম হাতের লেখার পাণ্ডুলিপির দিকে চোখ রেখে।

এতগুলি অক্ষর !

স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, দাঁড়ি, কমা, কোলন, সেমিকোলন ইত্যাদি।

ভাবতে হয় না, খুঁজতে হয় না—যন্ত্রের মতো হাত গিয়ে টপটপ তুলে এনে, সাজিয়ে যায় সিসার অক্ষর।

গোড়ায় কালাচাঁদ পাণ্ডুলিপির প্রতিটি বাক্যের মানে খানিকটা বুঝবার চেষ্টা করত—

কাজ এগোত না একদম।

তবে ভুল অনেক কম হত।

আজকাল চোখ-কান বুজে যন্ত্রের মতো অক্ষর সাজিয়ে সে যা গাঁথে—ফার্স্ট প্রুফের রূপ নিয়ে সস্তা কাগজে ছাপা হয়ে, সেটা ফিরে আসে অসংখ্য সংশোধনে কণ্টকিত হয়ে।

তাকেই আবার মিলিয়ে মিলিয়ে সংশোধন করে আবার নতুন করে অক্ষর সাজাতে হয়।

আগে হাতে লেখা কপি পড়ে মানে বুঝে অক্ষর সাজাবার সময়, এখনকার চেয়ে ফার্স্ট প্রুফে তিন-চারভাগেরও কম ভুল থাকত—বেশি কপি সাবাড় করতে না পারলেও, তার কম্পোজ করা ম্যাটারে দুবারের বেশি প্রুফ তোলার দরকার হত না।

কিন্তু তাড়াতাড়ি কপি শেষ না করলে তো চলবে না, দৈনিক যত বেশি গেলি প্রুফ তুলে দিতে পারবে কপি খতম করে, তত বেশি সে বিবেচিত হবে কাজের লোক বলে।

চোখ-কান বুজে তাই আজ তাকে অক্ষর সাজাতে হয় দ্রুতগতিতে।

পাণ্ডুলিপির শব্দগুলি শুধু দেখবার চেষ্টা করে।

বুঝতে না পারলে, যেমন মনে হয় তেমনি সাজিয়ে যায়।

উমাকান্তের লেখা প্যাঁচালো প্যাঁচালো—এমন সরল মানুষটার এমন প্যাঁচালো হাতের লেখা !

শিক্ষিত সাহিত্য-রসিক কম্পোজিটার বলে তাকেই দেওয়া হয় উমাকান্তের বইয়ের কপি।

মলাটে রাজপুত বীরের ছবি-আঁকা, লাইনটানা ছেলেমেয়েদের স্কুলে ব্যবহার্য দুআনা দামের বিশ-পঁচিশটা খাতায় কালির আঁচড়ে ভর্তি করা কপি।

উমাকান্তের নিজেরই সংশোধিত ফার্স্ট প্রুফ ফিরে এলে আজও এমন হাসি পায় কালাচাঁদের !

উমাকান্ত লিখেছিল 'মহা মহিমামণ্ডিত মানুষ'—অক্ষর সাজিয়ে সে ফার্স্ট প্রুফে ওটাকে দাঁড় করিয়েছিল 'মদ মেয়েমানুষ বর্জিত কানাই' !

এ রকম আরও যে কত হাস্যকর ভুল সে করে !

উমাকান্ত প্রেসে আসে।

কী রকম প্রুফ দিচ্ছেন ? আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দিচ্ছেন নাকি ?

ধনদাস সবিনয়েই জবাব দেয়, যতটা পারছি দিচ্ছি। একটু যদি স্পষ্ট করে লেখেন, একটু যদি কম তাড়াতাড়ি কম জড়িয়ে লেখেন—

সে অমায়িকভাবে হাসে।

আমিই আপনার লেখা পড়তে পারি না—মুখ্যু কম্পোজিটারদেব সাধ্য কী বলুন ?

উমাকান্তের রাগত মুখ দেখেও হেসে আবার বলে, একটা কাজ করেন না কেন ? একটা লেখা ছাপিয়ে দেবার জন্য কত ছোকরা কত বুড়ো তো আপনাকে জ্বালিয়ে মারছে। ওদের কাউকে দিয়ে লেখাটার একটা ফেয়ার কপি যদি করিয়ে দেন –

উমাকান্ত নিশ্বাস ফেলে।

উমাকান্ত সস্তা একটা সিগারেট ধরায়।

এক পয়সা দাম।

উমাকান্ত গোটা তিনেক হাই তোলে। বলে, ফেয়ার কপি করতে দিলে ফেরত পাব বইটা ? নিজের শালাকে চারশো পাতার একটা উপন্যাসের ফেয়ার কপি করতে দিয়েছিলাম—বলেছিলাম, অন্তত তোমার দুটো গল্প, দুটো ভালো কাগজে ছাপিয়ে দেব। আজ চার বছর পাত্তা পাচ্ছি না, হারামজাদা শালাটার।

ধনদাস আমোদ বোধ করে বলে, কলেজি ছাত্র---রোজগার করে না। শ্বশুরবাড়ি গিয়েও পাত্তা পান না শালাটার ?

পাই না।

সে কী কথা ? রাত নটা-দশটায় একবার গেলেই হয় !

গিয়েছি না ? কড়া নাড়লাম—দু-চারবার কে কে বলার পর দুয়ার খুলে শালি খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল—জামাইবাবু এসেছেন, জামাইবাবু !

তারপর ?

বৈঠকখানায় শালাটা পড়ছিল, চোখের সামনে গিয়ে তুরুক করে দোতলায় উঠে গেল। সোজাসুজি তো চোর বলতে পারি না, নিজের বউয়ের মায়ের পেটের ভাইকে — দোকান থেকে আনা দামি খাবার মুখে দিতে দিতে শুধোলাম, নন্দকে দেখছি না !

কোথায় গেছে, আসবে এখুনি।

দোতলায় পালিয়ে গেল, দেখলাম যেন ?

কই না তো !

সহধর্মিণী এগিয়ে এলেন। বললেন, দুদিনের জন্য বাপের বাড়ি এসেছি, ফিরে গিয়ে তোমার হাঁড়ি ঠেলব— বাপের বাড়ি এসেও যদি আমার ভাইকে নিয়ে গোলমাল করো—ভাইয়ের কাছ থেকেই পটাসিয়াম সাইনাইড চেয়ে খেয়ে সব জ্বালা জুড়িয়ে দেব বলে রাখছি !

হরদম এ রকম কথাবার্তা শুনেও কালাচাঁদের লেখার সাধ জাগে।

মাঝে মাঝে সাধ ঝিমিয়ে যায় মিলিয়ে যায়।

ছোটোবড়ো কত লেখকের কত টুকরো টুকরো লেখা পড়ছে আজ কত কাল ধরে—কেটে কেটে পড়ছে। হরফে, চিহ্নে, ভাগ করে করে পড়ছে। তবু মাঝে মাঝে চোখে পড়ে গেছে দু-চারটে ভাবী মজার লাইন, অদ্ভুত আশ্চর্য লাইন, খাপছাড়া উদ্ভট লাইন ! কম্পোজ বন্ধ করে তখন পড়বার সময় নয়--কাজের শেষে ঘরে নিয়ে গেছে হাতের লেখা কাগজ ক-টা, আগাগোড়া পড়েছে।

জেগেছে কৌতূহল।

বই ছাপা হবার পর, বাঁধাই হয়ে বাজারে বেরোবার আগে—ছাপা ফর্মাগুলি এক সেট কালাচাঁদ ঘরে নিয়ে গেছে, শ্রান্তি ক্লান্তির আক্রমণ ঠেলে তার ডিবরির আকারের ছোটো টেবল ল্যাম্পটার আলোয় রাত জেগে পড়ে শেষ করেছে— না কাটা, না সাজানো, ফর্মাগুলি।

কাটার উপায় নেই, বই না হোক— প্যামফ্লেটের আকারে এক একটা ফর্মা যে পড়বে সে উপায় নেই।

যেমন ছিল তেমনি অবস্থায় ফর্মাগুলি ফেরত দিতে হবে।

ভাঁজ খুলে ঢাউস কাগজটার উলটো-পালটা করে সাজানো নম্বর দেওয়া পৃষ্ঠাগুলি, তাই উলটিয়ে পালটিয়ে পড়তে হয়।

উলটো-পালটা কিন্তু এলোমেলো নয়। নিখুঁত হিসাব করেই কাগজটার দু-পৃষ্ঠায় এমনভাবে সাজানো যে ভাঁজ করলে বইয়ের ষোলোখানা পাতা, পরপর সাজানো হয়ে যাবে।

ডিবরির মতো ছোটো ল্যাম্পটাতেও আলো জ্বলে না সব দিন, তেল থাকে না।

মানবের ঘরে সসংকোচে গিয়ে দাঁড়ায়।

পেটে খাওয়ার পয়সায় টান পড়লেও মানব উজ্জ্বল আলো জ্বালে।

কম আলোতে মানবের দৃষ্টি নাকি ঝাপসা হয়ে যায়।

চশমা দরকার, কেনার পয়সা নেই। আলোটাই তাই সে উজ্জ্বল করে, কয়েক আনার কেরোসিন কিনে।

এসে বসে পড়ছি—আপনার লেখার অসুবিধা হবে না তো মানুবাবু ?

তুমি চুপচাপ পড়বে—লেখার অসুবিধা হবে কেন ?

মানব হাসে।

বলে, আমার কি শখের লেখা, লোকের প্রাণে সুড়সুড়ি দেবার লেখা ? আমি হাটেবাজারে বসে লিখতে পারি। তুমি একটা লোক চুপচাপ বসে পড়বে, তাতেই আমার লেখার ব্যাঘাত হবে !

২

কবে প্রথম জেগেছিল লেখার সাধ ! আত্তির মা-কে বিয়ে করার আগে না পরে ! কিছুই মনে নেই কালাচাদের।

সাধটা অনেক দিনের এইটুকুই তার খেয়াল আছে।

সাধটা মনে মনে কয়েক বছর পুষে রাখবার পর, বোধ হয় তার প্রথম চেষ্টা শুরু হয়েছিল লিখবার।

নতুন কেনা দোয়াত-কলম দিয়ে উমাকান্তের মতো একটা নতুন কেনা পাতলা খাতাব, লাইন-টানা পাতায়। সে লেখা আজও সযত্নে তোলা আছে।

নিজে লেখার কথা ভাবা স্বপ্ন, তার কাজ শুধু হরফ সাজানো. উমাকান্তের লেখা কপি কম্পোজ করার সময় যন্ত্রের মতো করে গায়।

তাছাড়া উপায় নেই।

হাতে লেখা কপির মানে বুঝে অক্ষর সাজাতে গেলেই হয়ে যাবে কম্পোজিটারের দফারফা।

কাজের সময় চিন্তাশক্তিকে কুণ্ডলীপাকানো যান্ত্রিক ঘুম থেকে একটু জাগালেই, হয়ে যাবে ঘণ্টা হিসাবে খেটে মোট হিসাবের গেলি তুলে দিতে না পারা।

মোট গেলির মোট পরিমাণ সিসার অক্ষরাদি, তাকে সাজিয়ে গেঁথে দিতেই হবে মোট সময়ের মধ্যে—

নইলে জরিমানা, মজুরি আটকানো, বরখাস্ত।

উমাকান্তের কপি ঘরে নিয়ে গিয়ে হরফ কষা বাদ দিয়ে, বিশ্রী বাঁকা হস্তাক্ষরের লেখা কপিগুলো ঘরে নিয়ে গিয়ে, যে প্রাণপণ চেষ্টায় শব্দ ধরে ধরে, কথা ধরে ধরে, এগিয়ে খানিকটা বুঝবে মোট কথাটা কী আছে, কীভাবে লিখেছে, তারও উপায় নেই।

প্রুফের সঙ্গে গেঁথে ফিরিয়ে দিতে হয় হাতে লেখা কপি। সে কপি আর ফেরত আসে না।

হাতে লেখা কপি সযত্নে স্টিল ট্রাংকের দুর্গে তুলে রাখবে—ভবিষ্যতের হিসাব কষে।

কে জানে হয়তো একখানি তার হস্তলিখিত ম্যানাস্ক্রিপ্টের দাম হাজার টাকা, দশ হাজার টাকা—

কত রকমের লেখক আর কবির যে আবির্ভাব ঘটে ছাপাখানায় !

শখের কবি, শখের বই ছাপতে আসে। মহেশ উপদেশ দিয়ে কালাচাঁদকে প্রস্তুত করে রাখে। কারণ, কবি নিজে কম্পোজিটারকে বুঝিয়ে দিতে ভালোবাসে, কীভাবে তার বইটি ছাপা হবে। শুধু প্রুফ দেখে বুঝিয়ে তার স্বস্তি নেই। আলাপ করে বুঝিয়ে দিতে হবে। তালিম দিয়ে মহেশ বলে, যা বলেন মন দিয়ে শুনবে, কাজ বন্ধ রেখে।

কালাচাঁদ আগে তৈরি করা খৈনিটুকু কাগজ থেকেই মুখে ঢেলে জিব দিয়ে নীচের ঠোঁটের ফাঁকে ঠেলে দেয়।

হরফ বেছে, সিসার হরফ সাজানোর হাতে খৈনি তুলে মুখে দিতে সাহস হয় না—কে জানে একটু সিসা ভিতরে গেলে কীভাবে ফেটে বেরোবে ফোঁড়ায় ফোঁড়ায়, নয়তো চর্মরোগে !

কালাচাঁদ আরেকবার তাকায় মহেশের দিকে।

মহেশ আরেকবার শ্রান্তমুখে মাথা হেলিয়ে তাকে জানায়—কাজ বন্ধ করে আলাপ করবে মানুষটার সঙ্গে, বুঝলে ? নইলে বাবু চটবেন !

এ হুকুম নতুন নয়। প্রেসে যারা কাজ জোগায়, পয়সা দেবার কারণস্বরূপ হয়, মনের খুঁতখুঁতানি থেকে তারা এসে কাজের ক্ষতি করিয়ে কম্পোজিটারকে খুঁটিনাটি নিয়ে অনাবশ্যক ও অকেজো উপদেশ দিতে চাইলে উপায় কী !

ঢালাও হুকুম দেওয়াই আছে যে এ ক্ষেত্রে ভদ্রভাবে নম্রভাবে সবিনয়ে কথা বলাটাই কম্পোজিটারের কাজ।

ছাপার ব্যাপারে যত অজ্ঞ হোক, যত হাস্যকর উপদেশ ঝাড়ুক, পাকা কম্পোজিটারের বিদ্যা ফলানো চলবে না। এমনভাবে তাকে প্রকারান্তরে কাজটা করার কথা বলতে হবে যেন অভিমানে ঘা না লাগে।

ভাগ্যে এ রকম লেখক কবির সংখ্যা বেশি নয় !

ভাগ্যে তারা অধিকাংশই ছাপার ব্যাপারে মহেশের সঙ্গে কথা বলেই সন্তুষ্ট থাকে !

নইলে কালাচাঁদের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। কারণ, খুঁতখুঁতে ওই সব বাবু লেখক কবিদের সঙ্গে কারবার চালাতে হয় তাকেই।

কিন্তু চালু হুকুম আজ আবার এমন বিশেষভাবে জোর দিয়ে জারি করা হল কেন ?

বেশ একটু কৌতূহলের সঙ্গেই কালাচাঁদ কবির প্রতীক্ষা করে।

জহর এলে সে সত্যই আশ্চর্য হয়ে যায়। চেহারা পোশাক চালচলনে জহর একেবারেই তাদের মতো নয়, এত কাল নানা বয়সের নানা ধরনের যে সব কবির এই প্রেসে পদার্পণ ঘটেছে।

নিখুঁত চেহারা, নিখুঁত বেশ, সৌম্য শান্ত ভাব।

পুরু ঘন নীলাভ প্যাডের কাগজে কবিতাগুলি লেখা হয়েছে যেন হরফের আলপনা কেটে, ছবির মতো হরফ সাজানো ছবি এঁকে।

কী করে টের পায় কে জানে, ধনদাস তার কাঠের ঘুঘলি থেকে বেরিয়ে আসে।

হাসিমুখে বলে, এলেন তবে সত্যি !

জহর বলে, হ্যাঁ, এলাম। ছোটো প্রেসেই ছাপাব বইটা।

ছোটো প্রেস বলছেন ? বছরে প্রায় হাজার দুই ফর্মা মেকআপ হয়।

প্রথম বইটা যে প্রেসে ছাপিয়েছিলাম সেখানে একটা ফর্মাই পঞ্চাশ হাজার থেকে দু-তিন লাখ ছাপে।

ধনদাস জহরকে অপদস্থ করে না। বুঝিয়ে দেবার চেষ্টাও করে না যে ফর্মা কত রকমের হয় এবং বাংলা গল্প কবিতার ফর্মা পঞ্চাশ হাজার ছাপার কল্পনা পাগলেও করে না !

সে হেসে বলে, চাইলে আপনার বইটা পঞ্চাশ হাজার ছাপতে কি অরাজি আছি ! আপনি নিজেই বললেন দেড় ফর্মার বই, দেড় হাজার ছাপবেন। পঞ্চাশ হাজার ছাপুন না, দেখুন, কী রকম সস্তা হয়ে গেছে ছাপা খরচ !

লেখক গ্রাহকদের বসার জন্য মহেশের টেবিল-ঘেরা চেয়ারগুলির মধ্যে সব চেয়ে ভাঙা, সব চেয়ে জোড়াতালি দেওয়া চেয়ারটাতে ধনদাস বসেছিল। বসেই টের পেয়েছিল চেয়ারের অবস্থাটা।

কত সতর্ক হয়ে কত সাবধানে নিজের প্রেসের ছাপার কাজের এবং নিজের কাগজের সম্পাদকীয় দপ্তরের চেয়ারটাতে সে যে বসেছে সকলেই সেটা টের পায়।

এ রকম চেয়ার যে তার ছাপাখানায় থাকে সে জন্য সে কাউকে দোষী করতে পারবে না, কারণ নতুন চেয়ারের কথা তাকে বারবার বলা হয়েছে। কাল হয়তো ব্যবস্থা হবে।

জোড়াতালি ব্যবস্থা। তার বেশি কিছু নয়।

জহরের মুখের ভাব দেখে ধনদাস হালকা হাসি হাসে। বলে, এ সব হল ব্যাবসার কথা, প্রচারের কথা। আপনি হলেন কবি মানুষ, এ সব নিয়ে আপনার মাথা ঘামিয়ে কী দরকার মশায় ? কবিতা লিখবেন, অর্ডার দেবেন, যেমন বলবেন তেমনি ছাপিয়ে দেব। আমাদের কাজটাই তো তাই, আপনাদের প্রচার সহজ করা।

বলেই সে ডাকে, কালাচাঁদ !

কালাচাঁদ হরফ সাজানো ফেলে ধীরে ধীরে উঠে এসে নীরবে দাঁড়ায়, মুখে আত্মপ্রত্যয়ের ভাব ফুটিয়ে রাখে।

ধনদাস বলে, কপিটা ওর হাতে দিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবেন যান। দেখবেন, যেমন কপি দিয়েছেন তেমনি প্রুফ গিয়েছে। একটু এদিক-ওদিক পাবেন না।

সিল্কের ফিতায় জড়ানো কবিতা লেখা দামি নীলাভ কাগজগুলি কালাচাঁদের হাতে দিয়ে জহর প্রায় ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করে, যেমন দিয়েছি ঠিক সেই রকম পারবে তো সাজাতে ?

আগে দেখি !

সন্তর্পণে কালাচাঁদ জহরের হাতে লেখা কবিতার স্লিপগুলি এক এক পাতা করে উলটে যায়—কবিতাগুলি না পড়ে এবং না বুঝেই হিসাব করে যায়, কীভাবে ছাপানো সম্ভব, এই ছবি করে করে এঁকে লেখা হরফে রচিত দেড় ফর্মা দু-ফর্মার মতো কবিতার বইটা !

প্রায় দশ মিনিট সময় লাগায়। সবাই অধীর হয়ে ফেটে পড়তে চেয়েও অগত্যা চুপ করে থাকে।

শেষ পাতা উলটে সে মাথা নেড়ে বলে, টাইপে এ রকম হবে না, ব্লক করতে হবে।

ধনদাস জহরকে বলে, সে আমরাই সব করে দেব, ভাববেন না। তবে কিনা খরচটা—

কাজ বন্ধ করে কালাচাঁদের সঙ্গে কথা বলতে হলেও মানব রাগে না, বিরক্তিও বোধ করে না।

জিজ্ঞাসা করে, তোমার নাকি গল্প উপন্যাস কম্পোজ করার ঝোঁক বেশি ? অন্য বই ধরলে কাজ সুবিধে হয় না ?

কালাচাঁদ প্রায় সলাজ হাসি হেসে বলে, কেমন একটা বদ অভ্যেস জন্মে গেছে। ও সব বই নীরস খটমট লাগে, তেমন হাত চলে না।

এখন কী চালাচ্ছ ?

কালাচাঁদ বেশ রসিয়েই জহরের কবিতার বইয়ের গল্প শোনায়, বলে, ছেলেখেলার লেখা কবিতা—একটা লাইনের মানে বোঝা দায় !

মানব বলে, মানুষের নিজের লেখা সন্তানের মতো দামি।

তাই তো দেখলাম। কোন পাতায় হেডিং দেওয়ার পর কতটা ফাঁক যাবে, কোন লাইন ভেঙে ভেঙে বেঁকে বেঁকে চলবে—সে এক অদ্ভুত ব্যাপার ! আদ্দেকের বেশি ব্লক হবে।

বাদ দাও। বাবুকে সিরিয়াস কোন কাজ দিতে বলো।

কী করে বাদ দেব ? স্পেশাল ডিউটি। কর্তা বলেছেন, একটা কমা সেমিকোলন এদিক-ওদিক হলে, একটা হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ই গোলমাল হলে আমাকে বিদায় করে দেবেন।

সাহিত্য কম্পোজ করার ঝোঁক চাপার মুশকিলটা দেখলে তো ? যারা প্রাণ দিয়ে লেখে, বাজে শখের লেখা নিয়ে তাদের যে কী ঝামেলা ! ঠিক মেথরের মতো জঞ্জাল সাফ করতে করতে লেখা চালিয়ে যেতে হয়। যে লেখাটা নিয়ে তোমার স্পেশাল ডিউটি, এগুলিই সব চেয়ে বিশ্রী জঞ্জাল।

লেখার শখটা খারাপ নাকি মানুবাবু ? শখ না হলে এত কষ্ট করে সবাই আপনারা লেখেন কেন ? কেউ তো বলেনি যে লিখতে হবেই ! অন্য কাজ করলে হয়।

স্বাধীনতার জন্য দেশের কত লোক প্রাণ দিয়েছে, কত লোক জেল খেটেছে জানো তো ? কী দরকার পড়ে তাদের জেল খাটায়, প্রাণ দেবার ? অন্য কাজ করে নিজে বেঁচে বাপের নাম বজায় রেখে গেলেই হত !

কথাগুলির তাৎপর্য অনুভব করে কিন্তু স্পষ্ট মানে ঠিক ধরতে পারে না বলে কালাচাঁদ চুপ করে চেয়ে থাকে।

মানব হেসে বলে, ধরো আমি একজন সত্যিকারের লেখক। আমি কি শখের জন্য লিখি ? আমি লিখি প্রাণের তাগিদে। না লিখে উপায় নেই বলে লিখি। কত লোকের কত শখ তো মেটে না। লেখাটা শখের ব্যাপার হলে কেউ এত কষ্টও করত না, জগতে সাহিত্য বলে কিছু সৃষ্টিও হত না।

কালাচাঁদ অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে চুপচাপ ভাবে।

তারপর গভীর হতাশার সুরে বলে, মুখ্যু হওয়া কি অভিশাপ মানুবাবু—অল্প একটু বিদ্যের স্বাদ পাওয়া ! শখের এত রাবিশ লেখা ছাপা হচ্ছে—

শুধু শখের লেখা নয় কালাচাঁদ, লেখার বাজারে মুদি দোকানির মালের মতো লেখাও ঢের ছাপা হচ্ছে পয়সার জন্য।

মনে হয়, কিছু জানি না, কিছুই বুঝি না, বৃথাই মোদের জন্ম।

তোমাদের জন্ম বৃথা হয়ে থাকলে, আমাদের লেখাও বৃথা হয়েছে কালাচাঁদ। মুখ্যু তোমাদের জন্ম বৃথা ধরে নিয়ে, পণ্ডিত আমরা যারা লিখতে চাই, তাদের জন্মও বৃথা হয়ে যায়।

বটে নাকি ?

তবে কী ? তোমাদের বাদ দিয়ে স্বাধীনতার জন্য জেলখাটা প্রাণ দেওয়া পর্যন্ত বাতিল হয়ে গেছে। তোমাদের বাদ দিয়ে লেখক হবার ফ্যাশনও গেছে শেষ হয়ে। তোমরা দেশের সাধারণ মানুষ, বেশিব ভাগ মানুষ, তেমরাই তো আসল দেশ।

আত্তির তীক্ষ্ণ গলা শোনা যায়, মা বলছে, কাজে যাবে না বাবা ?

মানবের সস্তা পুরানো টাইমপিসটার বিবর্ণ ডায়েলের দিকে একনজর তাকিয়েই কালাচাঁদ যেন আঁতকে ওঠে !

হায় সব্বোনাশ ! এমনিতে লেট হবে, সরোজবাবু ও দিকে এসে বসে থাকবে। কর্তা আজ তাড়াবেই আমাকে।

মানব তাকে অভয় দিয়ে বলে, ঘড়িটা বিশ মিনিট ফাস্ট চলছে—ভয় পেয়ো না। সূর্য কোথায় দেখে বেলা আঁচ করে আত্তি রোজ তোমায় যেমন তাগিদ দেয়—আজও তাই দিয়েছে। তুমি এ ঘরে আছ, শুনতে পাবে কি পাবে না ভেবে গলাটা আকাশে চড়িয়ে দিয়েছে।

মিনিট দশেক আরও তবে বসে যাই ?

অনায়াসে। আত্তি তিনবার তাগিদ দিলে তবে তো রোজ তুমি নাইতে যাও ? আত্তি ঠিক আরও দুবার চেঁচাবে।

কালাচাঁদ আনমনে বলে, ভারী চালাক চতুর হয়েছে মেয়েটা। যার তার হাতে দিতে মন চায় না। তবে না দিয়ে উপায় নেই আর। বয়েসের আন্দাজে বড্ড বেশি বেড়ে গিয়েছে।

মানব টের পায় আত্তির কথা কালাচাঁদ আনমনে বলেছে, সে বলতে চায় অন্য কথা। মানব নীরবে প্রতীক্ষা করে।

খানিক উশখুশ করে কালাচাঁদ কাঁচুমাচু করে বলে, অল্প লেখাপড়া শেখা কেউ যদি চেষ্টা করে, আপনাদের মতো লিখতে পারবে ?

নাঃ।

একটা নিশ্বাস ফেলে কালাচাঁদ।

ব্যাপারটা বুঝে চেষ্টা করলে তুমি কিন্তু লিখতে পারো ভাই, পেটে তোমার যতই কম বিদ্যা থাক।

কালাচাঁদ নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসে।

বড়ো বড়ো বিদ্বান লেখকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লিখতে চাইলে কিন্তু পারবে না, চেষ্টা করতে গেলে দু-একবছরে টি বি জন্মে যাবে, ছ-মাস আট মাসে মরবে।

তবে—?

কালাচাঁদের উৎসুক চোখে উৎসাহ যেন জ্বলজ্বল করে !

তবে, তোমার চেয়েও যারা মুখ্যু, তুমি যেটুকু জানো তার হাজার অংশও যারা জানে না বোঝে না, তাদের জন্য যদি লেখো—তবে কম বিদ্যা নিয়েও লিখতে পারবে।

মানব হঠাৎ হেসে ওঠে।

নোবেল প্রাইজ পাবার জন্য যাবা লেখে তুমি মাথা ঘামিয়ে তাদের সঙ্গে পাল্লা দেবার কথা ভাবছ নাকি ?—

ধাতস্থ হয়ে কালাচাঁদও হেসে বলে, মুখ্যু বলে কি আমি অমন মুখ্যু মানুবাবু !

মানব একটু সর্দির ভাব টের পেয়েছিল—গা ম্যাজম্যাজ করার ভাবটাও।

উপবাসে উপকার হবারই কথা।

কিন্তু একদিনেই দাঁড়িয়েছিল নিদাবুণ সর্দিকাশিতে। নাক বন্ধ মগজটা পর্যন্ত যেন সর্দিতে টসটস করছে। চোখ মেলে চাইতে গেলে চোখ টনটন করে। মুখ দিয়ে নিশ্বাস নিতে নিতে হাঁপধরা টুসটুসে ফুসফুসটা নেতিয়ে ঝিমিয়ে পড়তে চায়।

কোন ফাঁকে আত্তি এক মগ চা নিয়ে এসে হাজির হয়েছে সে টেরও পায়নি।

আদার রস মেশানো গবম চা।

যেচে আদা-চা দিতে আসার আগে জড়ানো শাড়িটা যথাসম্ভব ঢিল করেছে আত্তি। শ্রান্তিতে মুখ-চোখ যেন প্রতিবাদের ছবির মতো হয়েছে। অন্য দিনের মতোই মুখ—দেহটা খেটে খেটে সারা হয়ে গেলে যেমন মুখ হয়। লুকিয়ে চুপিচুপি আদা-চা এনে দিয়েছে কিন্তু চোখ-মুখে তার এতটুকু ভাবান্তর নেই।

তার সর্দি হয়েছে এটা জানতে হয়, আদা-চা করে আনতে হয, উপায় কী !

সে যেন গ্রাহ্যও করে না এই হিসাব যে, মানবের নিদাবুণ সর্দিকাশি হয়েছে এ সংবাদ জানতেও কেউ তাকে বলেনি, সংবাদ জেনে আদা-চা তৈরি করে এনে দিতেও কেউ তাকে বলেনি !

আত্তি প্রায় আদেশের সুরে বলে, ধীরে ধীরে গরম গরম চুমুক চুমুক খান। বেশি খাবেন না একেবারে, জিভ পুড়ে যাবে, লাভ হবে নাকো। ধীরে ধীরে খান—একটু একটু চুমুক দিযে গরম সইয়ে খান।

মানব এক হাতে চায়ের মগটা নেয়, অন্য হাতে আত্তির হাত ধরে।

মগটা নামিয়ে রেখে আত্তিকে সে বুকে টেনে নেয়।

আত্তি নড়ে না, সাড়াও দেয় না, প্রতিবাদও জানায় না। কাঠ হয়ে থাকে।

মানবও কয়েক মুহূর্ত নির্বাক নিষ্কম্প হয়ে থেকে আত্তিকে ছেড়ে দিয়ে চায়ের মগটা তুলে নিয়ে চৌকিতে বসে।

আত্তি নীরবে বেরিয়ে যায়।

মানব ভাবে কেন পারলাম না ?

মায়া করে বলেই কি ? মায়া কাটিয়ে যতই নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচারী হয়ে উঠতে সাধ হোক না কেন, মায়া তাকে চরমে উঠতে দেয় না !

ভীতা ব্যথিতার নীরব প্রতিবাদ তাকে কাবু করে দেয় ! কী করে পারা যাবে এদের সঙ্গে ! যারা এত নরম, অথচ এমন কঠিন !

সারাদিন ছটফট করে মানব সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, আত্তিব কাছে তাকে ক্ষমা চাইতে হবে।

হোক বস্তিবাসী গরিব কম্পোজিটারের মেয়ে ! অসভ্যতা করার জন্য তার ক্ষমাপ্রার্থনা ওর পাওনা হয়েছে।

প্রায় তখন সন্ধ্যা।

আত্তির মা রাত্রি সাড়ে তিনটে নাগাদ উনান ধরিযে বেঁধে ফেলে দুবেলার রান্না—পচা চাল, পচা আটা, ঘাসপাতা যা কিছু জোটে দুবেলার মতো। নইলে একবেলাই খায়।

মানব ভেবেছিল, আত্তির কাছে ব্যাপার শুনে সবাই রেগে টং হযে আছে, মুখ সকলের অন্ধকার দেখবে।

সে ফিরলেই আত্তির মা ছেঁড়া ময়লা শাড়ির আঁচল কোমবে জড়িয়ে তাকে গাল দিতে আর শাপ-মন্দ করতে শুরু করবে।

আত্তি বোয়াকে বসে আটা চালছিল। তার মানে ও বেলা দুবেলাব রান্না হযনি, আটা জোগাড় কবে এ বেলার জন্য রুটি পাকানো হচ্ছে।

আত্তি একগাল হেসে নীরব অভ্যর্থনা জানায।

কী ঝকঝকে তকতকে দাঁতগুলি তাব !

হেসে কিন্তু আত্তি আড়ালে পালায় !

লাবণ্যহীন চর্বিবিহীন কী আঁটোসাটো গড়ন ! কতবার দেখেছে তবু আজ যেন আবাব প্রথম চোখে পড়ল।

কাল হাত ধবে বুকে টানার সময়ও খেয়াল ছিল না। ভালো খেতে না পেয়েও তার দেহটা এত সুন্দর কী করে হল ?

শুধু দেহ সুন্দব নয়, কী করে এত পবিষ্কার হল তার মন ?

আত্তির মা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, তাড়াতাড়ি চটের টুকরোটা পেতে তাকে বসতে দেয়।

আসন হিসাবেই ভাঁজ করে রাখা হয়েছিল ছেঁড়া চটের টুকবোটা।

অপরাধীর মতো সে বসতেই আত্তির মা বলে, এত বোকাহাবা হয়েছে মেয়েটা ! নষ্ট হাবামজাদিদেব মতো। আপনজন একটু বেশি আদব করলেই দফা নিকেশ। মানুষের আদর চেনে না। চিনবেই বা কী করে ? বাপের সঙ্গে তো দেখা সাক্ষাৎ দু-চারমিনিটের—

বলতে বলতে সে হাঁকে, আত্তি ! মুখপুড়ি !

আত্তি এলে বলে, পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম কর মুখ্যু মেয়ে !

মানব হাসিমুখে বলে, আদর কবছিলাম বুঝতে পারনি কেন বলো দিকি আমায় ?

অমন আদব ভালো লাগে না। আলতো আদব সবাই কবতে চায়।

৩

উমাকান্ত ভোরে ওঠে।

লিখতে গিয়েই দেখা গেল, কলমটা চরম ধর্মঘট ঘোষণা কবেছে। কাগজে একটা আঁচড় কাটতে রাজি নয়।

পেনটার পেটে জবরদস্তি কালি ভরে, নিবটাকে জবরদস্তি ঠিকঠাক করে সৃষ্টির প্রেরণায় গদ-গদ আনন্দের প্রসব বেদনাকে চরমে ফাঁপিয়ে তুলে লেখার তাগিদে লিখতে গিয়ে দেখা গেল, কলমের

কালি-ভরা মোটা পেট আর দামি ধাতু দিয়ে গড়া নিবের সূক্ষ্ম মুখের মধ্যে ঘটে গিয়েছে সাংঘাতিক এক বিরোধ আর অসহযোগিতা !

কলম মাথা খুঁড়ে মরতে চাইছে সাদা কাগজের প্রশস্ত বুকে, ওই কাগজের বুকে ঘুরে ঘুরে শোষিত হয়ে নিজেকে ক্ষয় করে ফেলতে চাইছে নিবের সূক্ষ্ম মাথা, কিন্তু পেটের আর মাথার অসহযোগিতায় একটা আঁচড় টানা যাচ্ছে না !

নূতন একটা কলম কিনতেই হবে।

সস্তায় বেশ ভালো রকম একটা কলম। গল্প লিখতে যে কলম সহায় হবে, বাধা হবে না।

পুতুল শুনে আকাশ থেকে পড়ে !

লেখা হয়নি গল্পটা ? টাকা দিয়ে নিয়ে যায়নি লেখাটা ? টাকা দিয়ে যাবে না আজকালেব মধ্যেই? খোকনটা তবে মরবে ঠিক করেছ তো ?

আমায় দোষ দিচ্ছ কেন ?

দায় নিয়েছ তুমি, দোষ দেব কাকে ?

সব দায় আমার ? তোমার কোনো দায় নেই ?

আমার দায় তো আমি পালন করছিই। রাঁধছি, বাড়ছি, খাওয়াচ্ছি পরাচ্ছি, জামাকাপড় কাচছি, বার্লি করছি, ওষুধ খাওয়াচ্ছি, গরম জল করে সেঁক দিচ্ছি, ঘায়ে মলম লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধছি, তোমার আদরের কুকুরটাকে পর্যন্ত খেতে দিচ্ছি—

পুতুল কেঁদে ফেলে।

কেঁদে ফেলেনি দেখাবার জন্য হেঁচে কেশে আঁচলে মুখ মুছবার ছলে একটু আড়ালে সরে যায়।

পরস্পরের সংঘাতে প্রেম সৃষ্টি করার মজায় মজে থাকা যায় না পাঁচ মিনিটের বেশি।

লেখার ব্যবস্থা করতেই হবে—ভাবতে হবে কী ব্যবস্থা করা যায় ! উমাকান্ত বসে বসে ভাবে।

ওদিকে ছেলেমেয়ে ক-টা আর্ত চিৎকারে জগৎ ফাটিয়ে দিচ্ছে।

তার কলম ভাঙার রাগে তার সঙ্গে ঝগড়া করে পুতুল ওদের কোন অজুহাতে পিটিয়ে দিয়েছে কে জানে !

পুতুল আবার আসে।

গায়ে তার অলংকার বলতে প্রায় নেই।

কানের ফুটোটা কানপাশার ভারে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছিল বলে সেটাও পুতুল বাক্সে তুলে রেখে দিয়েছিল। সেই কানপাশা সামনে ধরে তেজের সঙ্গে বলে, যাও, বিক্রি করে কিনে নিয়ে এসো দামি একটা কলম। লেখো তোমার গল্প। সোমবার রেশন না আনলে হাঁড়ি চড়বে না এ কথাটা দয়া করে মনে রেখো।

উনানে হাঁড়ি চড়াবার জন্য আমি গল্প লিখি নাকি ?

হাঁড়িই যদি না চলবে তবে মিছে কলম চালানো কেন ?

হাজার হাজার ঘরে হাঁড়ি চড়ে না বলে, ওদের নিয়ে গল্প লিখব বলে।

কী হয় ওদের নিয়ে গল্প না লিখলে ? কে তোমায় মাথার দিব্যি দিয়েছে ওদের নিয়ে গল্প লেখার জন্য ? নিজের ঘরে হাঁড়ি চড়ে না, যাদের হাঁড়ি চড়ে না তাদের নিয়ে গল্প লেখার শখ !

উমাকান্ত আর তর্ক করে না। পুতুলের সঙ্গে ভাগাভাগি করে দেড় কাপ চা খায়।

কী চরমে যে উঠে গেছে পুতুলের চা খাবার নেশা !

তার লেখার নেশার সঙ্গে যেন পাল্লা দিয়ে চালাতে চাইছে চা খাবার নেশাকে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে !

পুতুলের ভাঙাচোরা দেহে আসন্ন মাতৃত্বের ভাব দেখতে দেখতে, তার মুখের লাবণ্যহীনতার বিদ্রোহ দেখতে দেখতে উমাকান্ত আত্মজ্ঞানের আরেক পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

পুতুলকে ভেঙে ভেঙে দমিয়ে দমিয়ে কাহিল করা যাবে। প্রচণ্ড আঘাতে চুরমার করে দেওয়া যাবে। কিন্তু তার নিজের মনের মতো পছন্দমতো নতুন করে গড়ে নেওয়া যাবে না !

কারণ, পুতুলও নিজের কায়দায় তাকে খেলিয়ে রাগিয়ে ভুলিয়ে মন জুগিয়ে হেসে কেঁদে রাগ অভিমান করে, তাকে নিজের মনের মতো পছন্দমতো করে নেবার লড়াই চালাচ্ছে।

লড়াই সে শুধু একাই করে না।

পুতুলও লড়াই করতে জানে।

আবেগের সুরে উমাকান্ত বলে, থাকগে। ও সব ব্যাপার তুমি বুঝবে না। কাল সকালে লেখাটা নগদ মজুরি দিয়ে নিতে আসবে। কলমটা বিগড়ে না গেলে আজ রাতের মধ্যেই লেখাটা রেডি করে ফেলতে পারতাম।

পুতুল রান্নাঘরে ফিরে যায়। জামা গায়ে দিয়ে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে উমাকান্ত গভীর আপশোশের সুরে বলে, নতুন কলম দিয়ে কেমন লেখা বেরোবে কে জানে !

চটপট, বিস্বাদ সাদা গরম বিশ্রী আটার লেচিগুলি, বেলতে বেলতে মুখ না তুলেই পুতুল বলে, বাঃ, বেশ ! বিলাতি কলম বিগড়োলেই লেখক মশায়ের দফা শেষ। কত বড়ো লেখক, বিলাতি কলম দিয়ে দিস্তা দিস্তা কাগজে লিখে লিখে কলম পিষে পিষে, কাগজ-কলমে দেশের চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করে দিচ্ছিলেন। কলমটা বিগড়ে গিয়ে মুশকিলে পড়েছেন।

কলম ছাড়া লেখা যায় নাকি—শুধু হাতে ?

কেন দোয়াত-কলমে লেখা যায় না ? পেন্সিলে লেখা ফোটে না ? কলম ভেঙেছে, বাড়িতে দোয়াত-কলম নেই, পেন্সিল নেই ?—ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করে না ?

লেচি বেলা শেষ করে কচকচ করে কুমড়োর ফালিটা কাটতে কাটতে পুতুল কথাগুলি বলে। ছেলেমেয়ে খেয়ে দেয়ে স্কুলে যাবে—দশটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফিরে আসবে বিকাল সাড়ে চারটায়।

ডাল তরকারি ছেঁচকি খেতে না দিলে, মাছ পাতে না পাওয়ার অভিমানকে বেত লাঠির শাসনে কাবু না করলে, ওদের কি সামলানো যায় ?

কলম কিনে বাড়ি ফিরতেই ছেলেমেয়ের এলোমেলো অস্থির উদ্ভট কলরবে বিভ্রান্ত উমাকান্ত কয়েক মুহূর্ত নড়তে পারে না।

তারপর—চোখ থেকে প্রাণ থেকে জীবনান্তকর শ্রমের শ্রান্তি কোঁচার খুঁটে মুছে ফেলতে ফেলতে, মানব-দায় ঘাড়ে নেবার সুরে বলে, কী রে ? কী হয়েছে ?

মা যে মরে যাচ্ছে বাবা !

ছেলেমেয়ের আর্তনাদ, শ্রান্তি-ক্লান্তির জের টানা বন্ধ করে দেয়।

উমাকান্ত প্রায় একটা লাফ দিয়ে পৌঁছায়, রান্নাঘরে কয়েকটা চট বিছানো শয্যায় শায়িত পুতুলের কাছে।

উনান জ্বলছে।

হাঁড়িতে ডগবগ করে ফুটছে সহজে ফোটা খাওয়ার বিরোধী, রেশনের পচা দামি চাল—ট্যাঁট্যাঁ করে চেঁচাচ্ছে পুতুলের চটফট দিয়ে তৈরি শয্যায় একটা নতুন সদ্যোজাত মানুষ !

পুতুল বলে, হাসপাতালে পাঠাতে গেলে, তুমি বিকল হবে জানি তো ! ঘরেই তাই চালিয়ে দিলাম। ভাত ফুটতে দেরি আছে, কী বিশ্রী চাল কী বলব তোমায় ! বুনোর মা-কে ডেকে নিয়ে এসো। উনানে কুঁচো কয়লা দিয়ে যেতে বলবে—যেন না নেভে। সারারাত সেঁক দেবে, পাঁচটা টাকা কবুল করো।

পুতুল গা এলিয়ে দেয়। ট্যাঁট্যাঁ করে চেঁচাচ্ছে সদ্যোজাত রক্তমাখা বাচ্চাটা।

পুতুল যেন জীবনকে জন্ম দেবার দাসীত্বপনার রাগে দুঃখে অভিমানে মরতে চেয়ে সন্তানের দিকে পাশ ফিরে শুয়ে তার চোখের সামনে জ্ঞান হারিয়েছে।

উমাকান্ত দ্বিধা করে না। জামা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উমাকান্ত খুন্তি দিয়ে উনানের তলা খুঁচিয়ে আঁচ বাড়িয়ে, উনানে আরও কয়লা দেয়। কেটলি ভরে জল ফুটতে দিয়ে উমাকান্ত তার সবটুকু অনভিজ্ঞতা নিয়েই ডাক্তাব আর ধাত্রীর কাজে লেগে যায়।

ডাক্তার নেই ! ধাই নেই ! অন্য সমস্ত দায় ভুলে না গিয়েও তার ছেলের, ছেলেটার মা-র, প্রাণ বাঁচাতে তাকেই ডাক্তার আর ধাত্রী না হয়ে উপায় কী !

এইটুকু একটা বাচ্চা বিয়োতে কত রক্ত ঢেলেছে পুতুল !

তারপর অবশ্য যেতেই হবে ডাক্তার আব ধাইয়ের খোঁজে—অথবা পুতুলকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

টাকা চাই, টাকা !

পুতুলকে বাঁচাতে টাকা জোগাড় করতেই হবে।

প্রেসের মালিক ধনদাস বসে, কোণের দিকে কাঠের ঘেরা কুঠরিটাতে, প্রেসের খোলা হলেব মধ্যে একটা টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার নিয়ে মহেশেব দপ্তর।

এইখানে বসে সে 'রস সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদনাও করে, প্রেসের কাজ দেখাশোনাও করে।

লেখকদের সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা, কম্পোজিটারদের সঙ্গে কাজের কথা, আর ছাপাব কাজ করিয়ে যারা পয়সা দেবে তাদের বা তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ আপ্যায়ন চালানো,—সব সে একসাথে চালিয়ে যায়।

কোনো কাজেই এতটুকু রোমাঞ্চ নেই।

মানব ও খালেক, মহেশের জন্য অপেক্ষা কর্বছিল, শুকনো মুখে উমাকান্ত এসে চুপচাপ একটা চেয়ারে বসে পড়ে।

একটি কথা বলে না। যেন চেনেই না মানব ও খালেককে !

তারাও চুপ করে থাকে। কে জানে কোন জ্বালায় জ্বলছে উমাকান্তের প্রাণটা !

পদে পদে উমাকান্তের প্রাণের জ্বালা টের পাওয়া যায়।

যখন তখন সে সতেজে বলে, কেন ? এ জগতে কী এমন অপরাধ সে করেছে যে আত্মবিনাশের প্রায়শ্চিত্ত বরণ করতে হবে ?

লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে মানুষের মতোই সে বেছে নিয়েছে তার কর্মজীবনের লাইন !

কেন সে জন্য মানুষ এমন অন্যায় দারিদ্র্যের বোঝা তার উপর এমনভাবে ঠেকাবে ?

লেখকের এত সম্মান দেশ বিদেশে। লেখক হতে চাওয়ার জন্যই তার হল এমন দশা।

লেখক হতে হলে কি সমাজ ছাড়তে হয় ? সমাজের কাছে নিষ্প্রয়োজনীয় জীব হতে হয় ?

যে দেশে দু-চারজন লেখক ছাড়া কারও দিবারাত্রি খেটেও পেট ভরে না, সে দেশের মানুষ কোন লজ্জায় লেখকদের সম্মান দেখায় ?

ছাপাখানায় বসে নিজের বইটার প্রুফ দেখতে দেখতে মুখ তুলে প্রায়ই সে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, ওটাই আসল কথা। লিখে পয়সা জোটে না। দিনরাত মেতে থাকতে হবে, পেট চলবে না। কলকাতায় ভিক্ষে করে বেশি রোজগার হয়। তবু লোকে ভাবে নামের জন্য টাকার জন্য আমরা লিখি। একবার ভাবে না যে তাই যদি হবে, হাকিম বঙ্কিমচন্দ্র বড়োলোক রবীন্দ্রনাথ লিখতে গেলেন কেন ? টাকার তো তাদের অভাব ছিল না !

কথাগুলি মোটেই অসাধারণ নয়, কিন্তু প্রাণের ফুটন্ত জ্বালা যেন উপচে উপচে পড়ে কথাগুলিকে আশ্রয় করে। সম্প্রতি দিন দিন বেড়ে চলেছিল তার কথার ঝাঁঝ, অবুঝের মতো হয়ে উঠছিল তার নালিশ—উমাকান্তের মতো লেখকের মুখে মোটেই যা মানায় না।

অন্যেরা ব্যাপার জানে না, বুঝতে পারে না। লেখক-সুলভ পাগলামি মনে করে। কিন্তু মানবের তো ভালো করেই জানা ছিল—তার পুতুলদির ব্যাপার এবং উমাকান্তের অবস্থা।

সে তাই গভীর উদ্‌বেগ অনুভব করে। কিন্তু সহানুভূতি জানাবার উপায় নেই। উমাকান্তের প্রাণের জ্বালা বেড়ে যাবে, সে রেগে উঠবে।

যে কথা চলছে সেই কথা বলো, তর্ক করো, খোঁচা দাও—সস্তা সমবেদনা জানিয়ো না !

মানব তাই হেসে বলে, লোকে এত সম্মান দিয়েছে, তবুও লোককে দোষ দিচ্ছেন ? কিছু লোক লেখকদের ছোটো ভাবতে পারে—সাধারণ লোকে তা ভাবে না। রাগ করে লাভ কী বলুন, কত লেখক টাকার জন্য কত কী যা তা লিখছে, নিজেকে বিক্রি করছে। ওরা যাদের পা চাটে তারা তো ধরে নেবেই ওলেখকরা মানুষ নয়।

সিসার হরফ বাছতে বাছতে সাজাতে সাজাতেই কালাচাঁদ মন দিয়ে তাদের কথা শোনে।

উমাকান্ত আরও চটে গিয়ে বলে, কারও পা চাটার দরকার হবে কেন লেখকের ? এ অবস্থায় কেন মানুষ লিখবে ?

সবই উমাকান্ত জানে এবং বোঝে। মানব তাই হাসে না। প্রাণের জ্বালায় সেই জানা কথাটা সে যে ভুলে গেছে এটুকু শুধু স্মরণ করিয়ে দেয়।

বলে, মানুষকে কিছু বলার নাছোড়বান্দা তাগিদ থাকলে না লিখে উপায় থাকে না, তাই মানুষ লেখে।

তুমি আমি পেটে না খেয়ে লিখি কেন ?

পেটে খাওয়ার চেয়ে লেখার তাগিদ আমাদের জোরালো বলে !

শখের লেখায় কীসের তাগিদ !

একই তাগিদ—দশজনকে কিছু শোনাব। আসল লেখার তাগিদটা প্রাণের, শখের লেখার তাগিদটা হয় শখের।

এই সব কথাবার্তার মধ্যে ধনদাস হয়তো একবার বাইরে আসে—নিছক একটু ভদ্রতা করতে। মানব ও উমাকান্তের সঙ্গে তার পরিচয় আছে কিন্তু সোজাসুজি অন্য কোনো কারবার নেই।

সব কিছু মহেশের মারফতে চলে।

কেমন আছেন উমাবাবু, মানুবাবু, খালেক সায়েব ?

তিনজনে একটু হেসে তার ভদ্রতার জবাব দেয়।

ধনদাস শ্যেনদৃষ্টিতে চারিদিকে তাকায়। কাজে এতটুকু শিথিলতা ঘটলে সে ধরবেই !

বিশেষভাবে সে কালাচাঁদের দিকে তাকায়। কাজ কামাই করে সে তাদের সঙ্গে কথা বলছিল কি না এই জিজ্ঞাসা চোখে নিয়ে যে তাকায়, সেটা বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না মানব আর খালেকের। ধনদাস কীভাবে সেই জানে, মুখে আচমকা হাসি এনে খালেককে খাতিরের সুরে জিজ্ঞাসা করে, বইটা নিজেই ছাপছেন ভাই ?

এই প্রেসে খালেকের একটি কবিতার বই ছাপা হচ্ছে। পাইকায় তিন ফর্মা সাড়ে তিন ফর্মা হবে। সস্তা কাগজ—ধনদাসের ধারণা কোনো কাগজ ব্যবসায়ীর গুদামে চোখের আড়ালে পড়ে গিয়ে কিছু কাগজ পচে যাবার উপক্রম করেছিল, সন্ধান পেয়ে ড্যাম চিপ দরে কাগজ বাগিয়ে খালেক কবিতার বই ছাপাবার শখ মেটাচ্ছে !

প্রেসের পাওনা আদায় করা সম্পর্কে খটকা ছিল। মহেশ নিজে দায়িক হয়ে আশ্বাস না দিলে, হয়তো কাজটা নিতে সে রাজিই হত না।

একুশ শো বই ছাপছে। পুরনো রং ধরা সস্তা কাগজ, মলাটও হবে কাগজের, একটা দু-রঙের ব্লকের ছোঁয়াচ পর্যন্ত থাকবে না সে মলাটে, শুধু বড়ো হরফে ছাপা হবে বইয়ের নাম, কবির নাম সাধারণ ছোটো হরফে—এই বই ছাপছে একুশ-শো !

টাকা আদায়ের দায় ঘাড়ে নিয়ে মহেশ বলেছিল, কনসেশন রেট দিতে হবে, নইলে কাজটা পাব না।

না পেলাম ?

আলগা টাইপে চালিয়ে দেওয়া যাবে কাজটা। বুনো আর দীনু আধবেলা খাটছে। স্কুল বইয়ের সিজন আসছে—অন্য প্রেস ওদের দুজনকে বাগিয়ে নেবে কিন্তু।

ধনদাস উদারভাবে বলেছিল, দিন তবে ওই রেটটাই। তিন চার ফর্মার ব্যাপার তো, কী আর এমন এসে যায়।

প্রথম ফর্মা ছাপা হওয়া মাত্র খালেক সে ফর্মার টাকা জমা দিয়েছিল—সবটা নয়। দুটাকা হাতে রেখে দিয়েছিল। তবু এটা অভাবনীয় ব্যাপার। বই শেষ না করে এক ফর্মা ছাপিয়েই নগদ টাকা।

এই জন্যই ধনদাস তাকে একটু খাতির জানাতে এসেছে সন্দেহ কী ! এভাবে যে পাওনা মেটায় তাকে সে বড়োই পছন্দ করে।

খালেক বলে, কেউ ছাপাবে না, কী করি। একজন পাবলিশার পেলাম, শুধু কাগজের দামটা দেবে। বই বিক্রি হয়ে কাগজের দামটা শোধ হবার পর লাভের একটা অংশ আমায় দেবে।

ছাপার যন্ত্রের ঘর্ঘর আওয়াজে মুখ গুঁজে কর্মরত অন্য সব হরফ-শিল্পীদের কথা ভুলে গিয়ে ধনদাস হোহো করে সশব্দে হেসে ওঠে।

তার হাসির দমকে চমকে যায় ছাপাখানা।

কিন্তু থেমে যায় না।

হরফ সাজানোর কাজ সকলে করে যায় মাথা গুঁজে।

ধনদাস হাসতে হাসতে বলে, কাগজের দাম দেবে নাকি ? আমি ভাবছিলাম, কাগজ বুঝি আপনি কিনে দিয়েছেন, গুদাম-পচা কাগজ সস্তায় বাগিয়েছেন। তাই তো বলি, কবিতার বই ছাপানোর জন্য এমন রদ্দি কাগজ ! অন্য কারও ঘাড়ে চাপাবার উপায় ছিল না। এ কাগজ পয়সা দিয়ে কেউ কিনত না। ছেলেমানুষ নতুন কবি আপনার ঘাড়ে কাগজটা চাপিয়েছে।

খালেকও হেসে বলে, আজ্ঞে না। আমরা এ কালের কবি, বয়স কম বলেই অত ছেলেমানুষ ভাববেন না। আপনার মতো বুড়োদের চেয়ে আমরা ঢের বেশি পেকে গেছি। কাগজ চেপেছে পাবলিশারের ঘাড়ে, আমার নয়। দোকানে বসেছিলাম, কাগজওলার লোক বলছিল যে এ রকম কিছু রদ্দি কাগজ আছে, যদি কোনো কাজে লাগানো যায়। দাম একটা ধরে দিলেই হবে। আমিও সুযোগ বুঝে কবিতার বইটা ছাপানোর ব্যবস্থা করে নিলাম।

আর সব খরচ তো আপনার ?

আমার বইকী ! তবে নগদ শুধু ছাপার খরচ। বাকি সব বই থেকে উঠে আসবে। কাগজ দেখে লোকে নিন্দা করবে পাবলিশারের, আমার কবিতার নিন্দা তো করবে না !

এমন তেজ আর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে তরুণ কবি কথাগুলি বলে যে, ধনদাসের সশব্দে হাসবার আর সাধ্য থাকে না।

গায়ের জোরে মুখে একটু হাসি ফোটায়।

পিঠ চাপড়ানো সুরে বলে, নাম করুন, বাজারে আগে নাম করুন, কষে ঢাক পেটান। নাম হলে বই ছাপানোর জন্য সাধাসাধি করবে।

খানিক পরে উমাকান্ত আসে।

পুতুল হাসপাতালে গেছে।

সেরে উঠে ফিরে আসবে। কোনো রকমে কয়েকটা দিন ঠেকিয়ে ঠুকিয়ে চালিয়ে যাওয়া।

আজ হাসপাতালে খবর নিতে গিয়ে পুতুলের অবস্থা এবং চিকিৎসার বিবরণ একজন রোগা কালো নার্সের কাছে শুনে, উমাকান্তের মনে হয়েছিল, এবার তার খেপে গিয়ে ভীষণ রকম কিছু একটা আবোল-তাবোল পাগলামি করে, পুলিশের গুলিতে মরে গিয়ে শান্তি পাওয়া দরকার।

কোন ডাক্তার দেখছেন ?

সাদা উর্দি পরা নার্স কবিতা, সাদা টুপি আঁটা মাথাটা উঁচু করে রেখেই বলেছিল, ডাক্তার দাস একজামিন করেছিলেন, তারপর ডাক্তার কেউ দ্যাখেননি। উঁচুক্লাসের দুজন ছাত্রী দেখছিল, আজ তারা রিপোর্ট দিয়েছে যে ডাক্তারকে ইন্টারভেন করতেই হবে। ডাক্তার দাস এলেই যাতে সকলের আগে ওঁকে দ্যাখেন, আমি সে ব্যবস্থা করে দেব।

কবিতা হঠাৎ মাথা তুলে বলেছিল, আমাদের কাউকে দোষ দেবেন না। পেশেন্ট আসে বন্যার মতো। আমরা ক জন ডাক্তার ক-জন নার্স কী করে সামলাব ?

উমাকান্ত তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিয়েছিল, ডাক্তার নার্স আপনারা সোজাসুজি সে কথা বলেন না কেন যে দায় নিতে পারবেন না ? মানুষের প্রাণ নিয়ে খেলা করেন কেন ?

আত্মীয়বন্ধুদের বাড়ি ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে, মরিয়া হয়ে উমাকান্ত ধনদাসের প্রেসে এসেছে শেষ চেষ্টা করার জন্য।

মহেশ বলে, আমায় তো বড়ো মুশকিলে ফেললে তুমি ! বিকালে দেবে বলে প্রুফ নিয়ে গেলে, নিয়ে এলে তিন দিন পরে !

উমাকান্ত বলে, কী করি বলুন ? বউটা ছিল পোয়াতি—হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেল। হাসপাতালে নিতে নিতে রক্ত ঝরে গেল বালতিখানেক। এখনও যায়-যায় অবস্থা।

হয়েছিল কী ?

কিছু না। উচিত ছিল দিনরাত শুয়ে থাকা, সকালে বিকালে সাবধানে ধীরে ধীরে শুধু একটু হেঁটে বেড়ানো—বাসন মাজা ঘর মোছা হাঁড়ি ঠেলা, ছেলেমেয়ের ঠেলা—সব বন্ধ রাখা উচিত ছিল। উচিত কাজ না করার, উচিত ঠেলা সামলাচ্ছে।

ধনদাসবাবু তো এ সব কথা শুনবে না ভাই !

না শুনলে না শুনবে, করব কী ! ছেলেমেয়ের মা-টাকে বাঁচাবার চেষ্টা করব না ? বলেছি বলেই প্রুফ নিয়ে ছুটে আসব—বউটা ওদিক মরুক বাঁচুক ? সিকি টাকাও দেয়নি—আরও সিকি ভাগ দেবে দেবে করে আজ ক-দিন ঘোরাচ্ছে।

কেন যে ও রকম করে—

করুক। আমি চেষ্টায় আছি। একটা পাবলিশার পেলেই এই বইটা যা পাই নিয়ে কপিরাইট বেচে দেব। তারপর যা হয় হবে দেখা যাবে—নয় জেল খাটব দু-চারমাস।

পরের ফর্মার প্রুফটা এখানে বসেই তাড়াতাড়ি দেখে দিতে দিতে সে কথা কয়—খেয়াল করে যে, ধনদাস ঠিক দু-তিনমিনিটের মধ্যে মহেশকে কী বলতে এসে—অর্থাৎ বলতে আসার ভান করে—তাকে দেখে যেন আশ্চর্য হয়ে—অর্থাৎ আশ্চর্য হবাব ভান করে বলে, আপনার বাড়িতে না বিপদ শুনলাম !

প্রুফশিট থেকে মাথা না তুলেই উমাকান্ত বলে, খুব বিপদ।

ব্যাপার বুঝতে দেরি হয় না। সকলেরই জানা আছে কাঠের ফ্রেমের কুঠরিটার কাছাকাছি বাইরের এই টেবিলে বসে মহেশ যার সঙ্গে যে কথা বলে ধনদাস নিজের কামবায বসে সব শুনতে পায়।

তবু নিজে প্রুফ দেখে দিতে এসেছেন ? আপনারা সত্যি কাজের মানুষ ! অসুখ-বিসুখ মরা-বাঁচার জন্য দু-চারদিন সময় নেওয়া যায়। দায়ে কী ফাঁকি দেওয়া যায মশাই !

বিপদে-আপদে পাওনা টাকা না পেলে যে বিপদ ঠেকানো যায় না, সেটা কি ভেবেছেন মশাই !

ধনদাস আহতভাবে একটু রাগের সঙ্গেই বলে, টাকাটা চেয়েছিলেন, চেক তৈরি করে রেখেছি—চট করে এসে নিয়ে যেতে তো পারতেন ? আজ দোষী করছেন আমায় ! নাঃ, আপনারা লেখকেবা বড়ো বেশি কাছাখোলা মানুষ। সামান্য বিপদে-আপদে এমন মাথা গুলিয়ে যায আপনাদের !

উমাকান্ত নীরবে প্রুফ দেখে যায়।

যাক গে। চেকে কাজ নেই। প্রুফটা দেখে যাবার সময় সব পাওনাটাই নগদ নিয়ে যাবেন। বিপদে-আপদে এটুকু না করলে চলবে কেন !

নগদ টাকা !

রস সাহিত্যে তিন মাস ধবে ছ-সাত পাতা কবে করে প্রকাশিত, ধারাবাহিক উপন্যাসটার জন্য, পনেরো টাকা হিসাবে মোট মজুরি পঁয়তাল্লিশ টাকা !

মানব আর খালেকের গল্প কবিতায় থাকে কড়া রকমের বিদ্রোহেব ঝাঁঝ। রস সাহিত্যের মতো কাগজে যে ও রকম লেখার ঠাঁই হতে পারে না, সেটা তাবা নিজেরাই জানে।

ও ধরনের লেখা দিয়ে মহেশকে তারা বিব্রতও করে না।

সামাজিক ব্যাপার নিয়ে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ভরা লেখা হলে, দুঃখদুর্দশার শুধু ছবিটুকু সামনে ধরে দিলেই সার্থক হয় এমন ধরনের লেখা হলে মহেশ আপত্তি করে না, ধনদাসও আপত্তি করে না।

এ সবও বিদ্রোহের রচনা। ধনদাস কিন্তু সেটা ধরতে পারে না একেবারেই ! অথবা বিদ্রোহী লেখক কবিদের নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার আর কোনো উপায় নেই বলে অগত্যা এটুকু সে মেনে নিয়েছে ?

ব্যঙ্গ বিদ্রুপ তো হাসির ব্যাপার, ওতে দোষ নেই—স্বয়ং ভগবানকে নিয়েও তো হাসি-তামাশা করা হয়।

সংসারে দুঃখদুর্দশা আছে, তার বর্ণনাতেও দোষেব কিছু নেই—সে জন্য দায়ী কে, সেটা বিশ্রী রকমভাবে না বলা থাকলেই হল !

এ রকম লেখা লিখলে দোষ হয় না—নীতি হিসাবে এটা মানব আর খালেক মেনে নিতে পারেনি। মহেশের বয়স, অভিজ্ঞতা স্নেহ আর সদিচ্ছাকে শুধু তারা স্বীকৃতি দিয়েছে।

মহেশ বলে, লেখার এটম বোমা বানাতে কে তোমাদের বারণ করেছে ? বানাও, ছড়াও, চাহিদা বাড়াও। লোকে যদি বলে যে ও রকম লেখা না থাকলে আমরা কাগজ ছোঁব না, ও রকম না হলে

বই কিনব না—ধনদাস জোড় হাতে লেখা ভিক্ষে চাইবে। তোমবা চাও নীতিকথা শুনিয়ে ওকে গলিয়ে দেবে। পয়সা ছাড়া ওব কোনো নীতি আছে ? ওর বুচি নীতি আদর্শ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে গায়ে জ্বালা ধরিয়ে লাভটা কী ? ওকে যারা পয়সা দেয়, তাদের বুচি নীতি আদর্শ বদলে দাও--পাঠক-পাঠিকার দিকে তাকাও। পয়সা দিয়ে তাবা যদি এমন গবম লেখা কিনতে চায়, যে কম্পোজ করতে সিসাব হরফ গলে যাবে—

খালেক বলে, কিন্তু অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলতে গেলে লেখক নবম হয়ে যাবে না ? সুবিধাবাদী হয়ে যাবে না ?

মহেশ বলে, সেটা লেখক বুঝবে। অবস্থা তো লেখকের মনেব ফাঁকা সাধকে খাতির করবে না। অবস্থা ভালো নয়, অবস্থা একেবাবে উলটে পালটে না দিলে চলবে না—এ সব হল আলাদা কথা। অন্য বকম অবস্থা হওয়া উচিত বলেই যে অবস্থা আছে, সেটা নেই বলে উড়িয়ে দিলে চলবে কেন ?

মানব বলে, বাস্তবকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না জানি। অবস্থাটা কী, ঠিকভাবে না জেনে অবস্থা বদলাবার ব্যবস্থা করা যায় না, --তাও জানি। কিন্তু খাবাপ জেনেও একটা অবস্থাকে স্বীকার কবা কি উচিত ?

মহেশ একটু হেসে বলে, সোজা কথাটা তোমবা কিছুতেই ধবতে পাবছ না। স্বীকার কবা মানে তোমরা বুঝছ যা কিছু যেমন আছে মেনে নিয়ে স্রোতে ভেসে যাওয়া। চোখকান বুজে নিরীহ গোবেচারির মতো মানিয়ে চলার কথা কি আমি বলছি ? যেমন ধরো, তোমার খুব সর্দিকাশি হয়েছে, একটু জ্বরও বোধ হয় এসেছে। তোমাব যে অসুখ হয়েছে এইটুকু শুধু আমি তোমাকে মানতে বলছি। অসুখটা উড়িয়ে দিলে চলবে না—সর্দি জ্বরে টাইফয়েডেব ইনজেকশন নিলেও চলবে না। উমাকান্ত সব বোঝে, বুঝেও রেগে জ্বলে পুড়ে মবছে। তাতে লাভ কী ?

মানব এবার একটু হাসে।—না, এটা মানতে পাবলাম না। গা পুড়বে তবু জ্বালাটা হাসিমুখে উড়িয়ে দেব ? জ্বলুনি ছাড়া অবস্থা পালটে দেবাব বোধ চাপবে কোথা থেকে ?

এই আলোচনার মধ্যে উদ্‌ভ্রান্তেব মতোই উমাকান্ত এসে দাঁড়ায়।

তাব হাতে একতাড়া লেখা কাগজ।

পুতুল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিবেছে, দুদিন আগে বস সাহিত্যের পরেব সংখ্যাব জন্য উমাকান্ত লেখাও দিয়ে গিয়েছে। কে জানে আবার কী বিপদ ঘটল তার।

ব্যাপাব কী ? পুতুলদি কেমন আছে ?

ভালো নয়। বড়ো বিপদে পড়েছি। সামলে উঠছিল, কীভাবে আবার বিগড়ে গেল ধরতে পারছি না।

তার মুখে নতুন বিপদেব সংক্ষিপ্ত বিববণ শুনে তিনজনেব মুখ গম্ভীর হয়ে যায়।

হবফ সাজানো বন্ধ রেখে নিজের জায়গায় বসে কালাচাঁদও সব শোনে।

ভাবে, বিপদই বটে—টাকা না থাকার বিপদ। নইলে এ আর কী এমন বিপদ দাঁড়াত !

টাকার সন্ধানেই উমাকান্ত বেরিয়েছে, সমাপ্তপ্রায় উপন্যাসটার পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে।

ধনদাস যদি উপন্যাসটা নিয়ে কিছু টাকা দে· !

মহেশ ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারা করে, উমাকান্ত বিহ্বলের মতো চেয়ে থাকে।

ইশারায় কাছে ডেকে মহেশ তার কানে কানে বলে, বিপদের কথাটা সব ফাঁস করবেন না, এখুনি টাকা না হলেই নয় এটা যেন টের না পায়। যদি অবশ্য আপনার না কথাগুলি শুনে থাকে—বোধ হয় শুনেছে। মোট কথা, নবম হবেন না। এখানে না হলে অন্য জায়গায় চেষ্টা করবেন।

উমাকান্ত মুখ বাঁকায়।

খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে মুখের ভাব স্বাভাবিক করার চেষ্টা করতে করতে সে ধীরে ধীরে ধনদাসের কাঠের ঘেরা আপিসটুকুর ভিতরে যায়। সকলে নীরবে প্রতীক্ষা করে থাকে।

ধনদাস অমায়িকভাবে বলে, আসুন আসুন, বসুন ! অনেক দিন বাদে এলেন মনে হচ্ছে। অবিশ্যি যদি এসে মহেশবাবুর সঙ্গে কথা কয়ে চলে গিয়ে থাকেন--

উমাকান্ত স্বস্তিবোধ করে।

ধনদাস তাহলে তার বিপদের বিবরণ শোনেনি ! গলা সে তেমন চড়ায়নি, আরেকটু জোরে না বললে ধনদাস বোধ হয় বাইরের কথা শুনতে পায় না।

একটা নতুন বই এনেছিলাম।

উপন্যাস ? বেশ, বেশ। শেষ করেছেন ?

সামান্য বাকি—ফর্মা দেড়েক।

ধনদাস নীরবে বারকয়েক মাথা দুলিয়ে বলে, যতটা লিখেছেন তাতে কত ফর্মা হবে ?

দশ ফর্মার মতো হবে।

বারো ফর্মার মতো দাঁড়াবে তাহলে ? একেবারে শেষ করে আনলেই পারতেন ! দেড় ফর্মা দু-ফর্মা লিখতে আপনার আর কতক্ষণ ? পাকা হাত, কলম ধরে বসলেই হল।

ভিতরের উদ্‌বেগ প্রাণপণে চেপে রাখবার চেষ্টা কবতে করতে কোনোরকমে উমাকান্ত মুখে মৃদু একটু হাসি ফুটিয়ে বলে, তা কী ঠিক আছে কিছু ! লেখা এসে গেলে দু-তিনদিনে হয়ে যায়, না হলে পনেরো দিনও লেগে যেতে পারে।

একটু চুপ করে থেকে ধীরভাবে বলে, আমার কিছু টাকার দরকার ছিল।

ধনদাস হেসে বলে, টাকার দরকার কার নেই বলুন ? কিন্তু আপনাব পাবলিশারেব কাছে না গিয়ে আমার কাছে এলেন ?

এর জবাবে আসল কথা খুলে বলা যায় না। তাব বইয়ের আসল প্রকাশক দুজন, দুজনের সঙ্গেই অত্যন্ত কড়াকড়ি বন্দোবস্ত এবং নিজেই সেটা সে গড়ে তুলেছে। লিখিত চুক্তির এতটুকু এদিক-ওদিক হলে, হিসাব বা পাওনা টাকা দিতে এক দিন দেরি হলে, ঝগড়া আর রাগারাগি করে দুজনের সঙ্গেই গড়ে তুলেছে একেবারে চাঁচাছোলা শুধু ব্যাবসাগত সম্পর্ক।

এ তো জানা কথাই যে, সুবিধা নিলে প্রকাশক অন্যভাবে সেটা আদায় করে নেবেই। লাভের ন্যায্য বখরা আদায় করার জোর তার থাকবে না।

প্রকাশক দুজনকে মুখের ওপর কতবার যে এ কথা শুনিয়ে অন্য সকলের চেয়ে লাভের ভাগ বেশি আদায় করেছে।

আজ অসমাপ্ত বইটা নিয়ে গিয়ে ওদের কাছে টাকা দাবি করার উপায় তার নেই।

মান অপমানের কথা তুলে আজ গিয়ে হাত পাতলে হয়তো টাকা দেবে না, হয়তো অনেক টালবাহানা করে বিশ-পঁচিশটা টাকা দেবে।

উমাকান্ত বলে, পাবলিশারের সঙ্গে একটু চটাচটি চলছে। তাছাড়া, আপনি একটা বইয়ের কথা বলেছিলেন, তাই ভাবলাম—

এবার মুখ একটু গম্ভীর করে ধনদাস বলে, জানেন তো আমি ঠিক পাবলিশার নই, সুযোগ সুবিধা মতো দু-একখানা বই ছাপিয়ে বার করি। প্রেসের কী আর সেদিন আছে মশাই—বাজার বড়ো খারাপ। কাজ গেছে কমে—কাজ করিয়ে লোকে টাকা দিতে চায় না। কাজ কম থাকলে দু-একজন কম্পোজিটার বসে থাকবে—একটা বই ধরিয়ে দিলাম।

ধনদাস মাথা নাড়ে। বলে, বই বেচে কিছু হয় না—লোক বসে থাকবে, ওই লোকসানটা ঠেকানো। তা চুক্তি-টুক্তি কী রকম হবে ?

আপনি একটা অফার দিন ?

কপিরাইট দেবেন তো ?

উমাকান্ত চমকে ওঠে।

ইতিমধ্যে কোনো ফাঁকে ড্রয়ার খুলে একতাড়া দশ টাকার নোট ধনদাস টেবিলের উপরে রেখেছিল সে টের পায়নি। এবার নজর পড়ায় টাকার তাড়াটার দিকে চেয়ে সে ব্যাকুলভাবে বলে, না না, কপিরাইট দিতে পারব না !

এই তো মুশকিল করলেন। এত খরচ করে একটা বই ছেপে বার করব—হয়তো কাগজের খরচটাই উঠবে না। কপিরাইট পেলে তবু একটা সান্ত্বনা থাকে, লোকসান যাক, বইটা নিজের রইল। আশা থাকে, দু-একখানা করে বেচে বেচে হয়তো পাঁচ দশবছরে খরচটা উঠে আসতে পারে। পাঁচ-দশবছর পরে আপনার আরও নাম হলে বইটা কাটবে, দু-পয়সা লাভও হবে। কপিরাইট ছাড়া বই ছাপা—

মুখে একটা আপশোশের আওয়াজ করে ধনদাস।

তার সামনে টেবিলে তার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি--ও দিকে ধনদাসের সামনে একতাড়া নোট ! ওই নোট, কয়েকটা পেলে পুতুলকে বাঁচানো যাবে। সাদা কাগজের বুকে রাত জেগে দেহ ক্ষয় করে আঁকা হরফের কলঙ্কগুলি থেকে চোখ তুলে ধনদাসের মুখের দিকে চেয়ে মরিয়ার মতো উমাকান্ত জিজ্ঞাসা করে, কপিরাইট দিলে কত দেবেন ?

ধনদাস এক মুহূর্ত ভেবে দৃঢ়কণ্ঠে বলে, না, আপনি আমার কাগজের বাঁধা লেখক, আপনাকে ঠকাব না। ছোটো বইয়ে আমি পঞ্চাশ দিই, বড়ো বইয়ে পঁচাত্তর থেকে একশো। আজ পর্যন্ত কাউকে এর চেয়ে বেশি দিইনি, কিন্তু আপনার কথা আলাদা। আপনার এই বইটার জন্য দেড়শো দেব।

দেড়শো টাকায় একটা আড়াই টাকা তিন টাকা দামের বইয়ের কপিরাইট !

মাথা ঘুরে যায় উমাকান্তের।

এডিশন রাইট নিলে কত দেবেন ?

বললাম তো আপনাকে, এডিশন রাইট নিয়ে এই বাজারে বই ছেপে কী করব ?

উমাকান্ত একটু ভাবে, মিনিট দেড়েক। এত খেটে লেখা বইটা দেড়শো টাকায় ছেড়ে দিলে হয়তো এ যাত্রা বাঁচানো যাবে পুতুলকে কিন্তু ভবিষ্যতে সে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে কী অবলম্বন করে বাঁচবে ?

দু-একঘণ্টায় কী এসে যাবে ?

পুতুলের রক্তপাত হয়তো ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে স্বাভাবিক নিয়মে। পাড়ার দুজন পাঁচ আর সাত সন্তানের জননী এবং চার বছরের এক ছেলের একজন যুবতি মা, যেচে এসে ভার নিয়েছে, ওরা কি আর দু-চারঘণ্টা সামলে রাখতে পারবে না পুতুলের প্রাণটা ?

দেড়শো টাকায় বইটার কপিরাইট বেচে দেওয়ার চেয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে, পুতুলের সঙ্গে তার নিজেরও মরে যাওয়া অনেক ভালো।

উমাকান্ত নীরবে পাণ্ডুলিপির তাড়া হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালে ধনদাস একবার কাশে।

কাগজের পুরানো লেখক, বন্ধু মানুষ—যাগে, পুরো দুশোই নিয়ে যান। বাকিটা কিন্তু তাড়াতাড়ি লিখে দেবেন।

উমাকান্ত পাকা চালবাজ ছ্যাঁচড়া ব্যাবসায়ীর মতো হেসে বলে, একটু ভেবে-চিন্তে দেখি ? চায়ের দোকানে বসে দু-এককাপ চা খেয়ে মনটা স্থির করে আসি ?

এখানেই বসুন না, চা আনিয়ে দিচ্ছি—যত কাপ ইচ্ছা খান, যত ইচ্ছা ভাবুন !

নাঃ, নিজে নিজে একটু ভেবেই আসি আমি। আপনি আছেন তো ?

তার দিকে শ্যেনদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে হাই তুলে উদাসভাবে ধনদাস বলে, তিনটে পর্যন্ত আছি। তিনটের পর একবার বাইরে যেতে হবে, কখন ফিরব ঠিক নেই।

আমি তিনটের মধ্যেই ফিরব।

মহেশের টেবিলের কথাবার্তা যেমন নিচু চাপা গলায় কানে কানে না চললেই, কাঠের পার্টিশনের ও পাশে ধনদাসের কানে পৌঁছায়, তেমনি কাঠের পার্টিশনের ভিতরে ধনদাসের সঙ্গে অন্য লোকের কথাও স্বাভাবিক গলার আওয়াজে হলে, মহেশের খোলা টেবিল ঘিরে বসা মানুষগুলোর কানে পৌঁছায়।

একটু তফাতে সাজানো হরফের বাক্সের সামনে টুলে বসা কালাচাঁদের কানেও খানিক খানিক যায়।

পাণ্ডুলিপি হাতে রাগ দুঃখ, ক্ষোভ, বেদনায়, বিকৃত মুখ নিয়ে উমাকান্ত টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াতেই মানব নিচু গলায় বলে, আমরা সব শুনেছি—কপিরাইট দেবেন না।

উমাকান্তের নিচু গলাতে চরম হতাশার সুর ফোটে।

তোমার পুতুলদি মরবে ? কপিরাইটের মায়ায় ছেলেমেয়ের মা-টাকে মরতে দেব ? দু এক জায়গায় চেষ্টা করে দেখি, নইলে ফিরে এসে বেচে দিতেই হবে কপিরাইট।

মানব বলে, তিনটের আগে কিন্তু আসবেন না। আমরাও বেরোচ্ছি চেষ্টা করে দেখতে।

তার সঙ্গেই মানব আর খালেক বাইরে যায়। রাস্তায় নেমে খালেক বলে, ব্যাকুল হবেন না। তিনটে কেন, পাঁচটা পর্যন্ত আপনার জন্য ধন্না দিয়ে বসে থাকবে। কোথাও সুবিধা না হলে ঘড়ির কাঁটা ধরে তিনটের সময় আসবেন। তার আগেই আমরা ফিরে আসব।

উমাকান্ত বিরক্ত ও বিষণ্ণ হয়ে ভাবে, কী ইয়ার্কি এরা জুড়েছে তার সঙ্গে ? তার এমন বিপদের সময় ? কথা না কয়ে বড়ো রাস্তায় পৌঁছে সে চলতি ট্রামে উঠে পড়ে।

খালেক ওঠে পরের বাসে। মানব একটু দাঁড়িয়ে ভেবে নেয়, কীভাবে টাকার চেষ্টা করবে।

চেষ্টা করা যায় দুভাবে। আত্মীয়বন্ধুর কাছে গিয়ে। তার প্রকাশকটির কাছে গিয়ে।

প্রকাশকের কাছে গিয়ে বোধ হয় লাভ নেই।

তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে বইকী !

প্রকাশক তার একজন—ছোটোখাটো দোকান, পুঁজি কম। তবু সাহস করে নতুন লেখক তার দু-খানা বই ছেপেছে এক বছরের মধ্যে—ধীরে সুস্থে তৃতীয় বইখানা ছাপছে।

বয়সও বেশি নয় তার প্রকাশক হেমাঙ্গের।

প্রুফ দেখছিল, মুখ তুলে বলে, আসুন, বসুন ! আজ তো কথা ছিল না আসার !

একটা দরকারে এসেছি। খুব সিরিয়াস ব্যাপার—মন দিয়ে শুনুন।

উমাকান্তের বিপদের কথা সংক্ষেপে জানিয়ে মানব বলে, উপন্যাসটা নিয়ে নিন না ? এ সুযোগ ছাড়বেন না। রয়ালটির ব্যাপারে উনি খুব কড়া—বিপদটা সামলে দিন, ও সব আমি ঠিক করে দেব। রেট কম হবে, অল্প অল্প করে সুবিধামতো পাওনাটা দিলেই চলবে।

হেমাঙ্গ চড়া পাওয়ারের চশমা খুলে চোখ মুছতে মুছতে বলে, সে তো বুঝলাম—এখুনি কত টাকা চাই ?

গোটা পঞ্চাশেক দিয়ে দিন। কাল পরশু শখানেক জোগাড় করে দিলেই হবে। পারলে দ্বিধা করবেন না, একজন লেখক এ রকম বিপাকে পড়েছেন—

ওই তো বিপদ। নতুন লেখক আপনাদের না ধরে বড়োদের নিয়ে কারবার করলে, ড্রয়ার খুলে সব টাকাই ঝপ করে ফেলে দিতে পারতাম। পনেরো বিশ টাকা আছে কি না সন্দেহ।

তাই দিন—আমার হিসাবে।

হেমাঙ্গের কাছ থেকে পনেরোটা টাকা জোগাড় করে শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত কয়েকজন আত্মীয়বন্ধুর কাছে ছুটোছুটি করতে করতে ঘড়ির কাঁটা দুটো বাজার দিতে এগিয়ে যায়—জোগাড় হয় আর দশটা টাকা !

এরা সবাই সাধারণ অবস্থার আত্মীয়বন্ধু—তার অবস্থাও ওদের ভালো করেই জানা আছে। তাকে টাকা ধাব দেওয়া মানেই টাকা জলে ফেলে দেওয়া।

অপমানে কান ঝাঁঝাঁ করেছে মানবের—তবু দুজন যে মুখভার করে পাঁচটা করে টাকা দিয়েছে সে টাকা হাত পেতে নিয়েছে।

আবও টাকা চাই। পুতুলদিকে বাঁচাতে হবেই। জীবনে কোনোদিন, যে দুজন বড়োলোক আপনজনের বাড়ির চৌকাঠ পার হবে না স্থির করেছিল, তাদের কাছে গিয়ে হাত পাতা ছাড়া উপায় নেই। মানব ভাবে, উপায় যখন নেই, মাথা হেঁট করে বুক ঠুকে কাকার দুয়াবেই গিয়ে দাঁড়ানো যাক।

কাকার বাড়ি গিয়ে মানব শোনে তারা সপরিবারে কাদের বাড়ি বেড়াতে গেছে, ফিরতে সন্ধ্যা উতরে যাবে। বাড়ি খালি নয় তাই বলে। ঝি চাকব রাঁধুনিরা আছে—আর আছে আশ্রিতা মনার মা এবং বিধবা সরমা।

রান্নাঘর ভাঁড়ারেব ভারটা মনার মা-র উপর। মনার মা আদর করে বসতে বলে।

একটি সন্দেশ দিয়ে খাতির জানিয়ে বলে, বাড়িতে এসে না খেয়ে ফিরে গেছেন শুনলে বড়োমা রাগ করবেন।

মানব ভাবে, এমনিই হয় বটে ! এমন আবহাওয়াই এই বাড়ির যে আশ্রিত মানুষেরও মন যায় কুঁকড়ে, তাবের আলমারির তাক ভরা খাবার থাকলেও তাব কাকার জিনিস, প্রাণ ধরে তাকে একটির বেশি দিতে পাবে না !

মনার মা র সহজ হিসাবটা সে বোঝে। একটি সন্দেশ খাইয়ে তাকে বিদেয় করলে কিছু খাবার নিজের ছেলেটাকে খাওয়াতে পারবে। খাবার কাকিমার গোনা গাঁথা, কাকিমা বাড়ি ফিরলে মনার মা বলতে পাববে, মানব এসেছিল বলে খাবার খরচ হয়েছে।

সে হেসে বলে, কী খাব ? কিছুই তো খেতে দিলে না। একটা সন্দেশ লোকে খায় নাকি ?

মনার মা-কে কথা বলার সময় না দিয়ে সবমা তাড়াতাড়ি প্লেটে সাজিয়ে এনে দেয় কয়েক রকম খাবার।

মনার মা-কে ধমক দিয়ে বলে, তোমার বাছা কাণ্ডজ্ঞান নেই—বুঝেও কিছু বুঝবে না। বাবুর ভাইপো এয়েছেন—একটা সন্দেশ দিয়ে আপ্যায়িত করছ !

তুই মাগি বড়ো বাড়াবাড়ি জুড়েছিস। খেদাতে হবে।

তুই খেদাবি মোকে ? ধন্যিধন্যি করব সেই দিন তোকে !

নিজের গালে সশব্দে চড় মেবে সরমা বিকৃত অস্বাভাবিক আওয়াজে হেসে ওঠে !

সম্পর্কের হিসাব ধরলে এরা তারও ঝি-রাঁধুনি। এক ধমকে এদের ঠান্ডা করে দেবার অধিকার তার আছে।

কিন্তু কীসের জোরে সে খাটাবে তার অধিকার ?

তাকে আদর-আপ্যায়ন করার অধিকার এদের হাতে ছেড়ে দিয়ে যে আপনজনেরা বেড়াতে গেছে, তাদের কাছে তার যে কতখানি কদর কিছুই তো এদের অজানা নয় !

ধমক কি দেওয়া যায় এদের ? মানব শুধু বলে, না গো না, আমি কিছু খাব না।

সরমা থমকে যায়। মনার মা ভড়কে যায়।

খাবেন না ? কিছু খাবেন না ? বড়োমা শুনলে যে—

মানব মিথ্যা কথা বলে, পেটে জায়গা নেই। এইমাত্র হোটেলে ভোজ খেয়ে এলাম।

সরমা আর মনার মা, দুজনেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। বাঁচা গেল। তাদের কেউ দোষী করতে পারবে না।

বাকি থাকে দিদি।

কিন্তু মুশকিল এই যে, ভগিনীপতি ইন্দ্রজিৎ কোনোদিন তাকে দুচোখে দেখতে পারে না !

মাধবীর বিয়ের সময় সে ছিল কলেজের নীচের ক্লাসের ছাত্র, তখন থেকেই তার উপর ইন্দ্রজিতের অন্ধ বিদ্বেষ।

মাঝে মাঝে দু-চারদিন দিদির বাড়ি বেড়াতে যেত।

ইন্দ্রজিৎ চশমার ফাঁকে আক্রোশভরা চোখে তার দিকে তাকাত, আর তার দিকে তাকিয়েই তাকাত মাধবীর দিকে। সে দৃষ্টির মানে খুব সোজা—কেন যে তোমার বখাটে বেয়াদপ ভাইটা না ডাকলেও আমার বাড়িতে আমাকে জ্বালাতে আসে !

অত্যন্ত নীতিবাগীশ, নীরস এবং কর্তৃত্বপ্রিয় মানুষ। সে চায় যে সকলে তাকে মেনে চলুক, ভয় করুক—একটু ভক্তিও করুক। শালা-ভগিনীপতির সম্পর্ক হলেও মানব যে তার সঙ্গে ইয়ার্কি দেবে, তার হুকুম গ্রাহ্য করবে না—এটা সে একেবারেই বরদাস্ত করতে পারত না।

আজকাল তো কথাই নেই—মানব এখন তার কাছে আত্মীয়-বিতাড়িত লোফার মাত্র !

ইন্দ্রজিৎ বেতনে ও অন্যান্য প্রকাশ্য দুর্নীতিহীন পে-বিল সই করে মাইনে আদায় করে হাজার দুই টাকা।

এক পাই ঘুষ নেয় না।

অনেক রকম সুযোগ-সুবিধা থাকলেও জীবনে কখনও আলগা পয়সা রোজগারের কথা ভাবতেও পারেনি।

ঘুষ নেওয়ার জন্য একবার দুজন অধীনস্থ অফিসারের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছিল। শাস্তিটা অবশ্য পরে দাঁড়িয়েছিল সামান্য ব্যাপারে, মৌখিক একটা বোঝাপড়ায় যে, তিন বছর ওদের প্রমোশন বন্ধ থাকবে।

বাধ্য হয়ে এই নামমাত্র শাস্তি দিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হওয়ায় রাগের যে জ্বালা হয়েছিল, ইন্দ্রজিতের সারাজীবনে সেটা বোধ হয় জুড়োবে না !

ইন্দ্রজিৎ দাবি করেছিল যে ওদের জেলে দেওয়া হোক।

ওরা গিয়ে ধন্না দিয়েছিল ইন্দ্রজিতের ভারিক্কি রীতিনীতি ও সম্ভ্রান্ত জীবনযাপনের কলকাঠি ছিল যে কর্তাব্যক্তিটি, তার কাছে।

কর্তাব্যক্তিটি যেচে নিমন্ত্রণ নিয়ে এসেছিল ইন্দ্রজিতের বাড়িতে—এক কাপ চা খেতে। ইন্দ্রজিৎও বুঝেছিল ব্যাপারটা সহজ নয়। সেও বাড়িতে মহাসমারোহে আয়োজন করেছিল কর্তাব্যক্তিটির সংবর্ধনার।

মানবকে হুকুম দিয়েছিল, দশ টাকার ফুল কিনে আনো দিকি হগমার্কেট থেকে।

আমি পারব না। ভদ্রলোক আপনার চাকরির হর্তাকর্তা হতে পারেন, আমার কে ? মানুষ-পূজার ফুল আনা আমার দ্বারা হবে না !

ধৈর্য হারিয়ে গর্জন করে উঠেছিল ইন্দ্রজিৎ, ভুলে গিয়েছিল যে মানব দুদিনের জন্য বোনের বাড়ি বেড়াতে এসেছে—তাদের আপ্যায়নটাই তার প্রাপ্য—ধমক নয় !

মানবও গর্জে উঠেছিল, কী বললেন ? এখুনি আমি চলে যাচ্ছি আপনার বাড়ি থেকে।

আত্মীয়স্বজনের কাছে মানবের কদর তখন ফুরিয়ে যায়নি। আত্মীয়-বাহিনীর সঙ্গে তখনও সে এক সামাজিক সূত্রে গাঁথা। ইন্দ্রজিৎ, শালাকে তাড়িয়ে দিয়েছে ! কী সর্বনাশ, সবাই বলবে কী ?

মাধবী হাল ধরে স্বামীকে কড়া সুরে ধমক দিয়ে বলেছিল, কী পাগলামি করছ ছেলেমানুষের সঙ্গে ? ফুল আনাবার আর লোক নেই ?

অনেক বুঝিয়ে ঠান্ডা করেছিল মানবের রাগ।

ইন্দ্রজিৎ পছন্দ না করুক, ভাই বাড়িতে এলে আগে মাধবীর বড়ো আনন্দ হত। মানব, কাকার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর সে বাড়িতে গেলে মাধবীও খুশি হতে সাহস পায় না।

শুধু তাদের মানে না তা নয়, কোথায় থাকে কী করে, কিছুই জানায় না দু-চারমাস।

হঠাৎ একদিন এসে বলে, আমায় কিছু টাকা দাও।

এমনভাবে বলে, যেন মহাজন খাতকের কাছে বাকি সুদ দাবি করছে। বড়োলোকেব বউ, বড়ো বোন, তার কাছে দরকারের সময় টাকা চাইবার অধিকার তার আছে—এ অধিকার না মানতে চাও, দিদিত্বের অধিকারে ইস্তফা দাও, চুকিয়ে দাও সম্পর্ক !

এই নিয়েই কয়েকবার বেশ খানিকটা ঠোকাঠুকি হয়ে গিয়েছিল ইন্দ্রজিৎ আর মাধবীর মধ্যে।

শেষবার লেগেছিল তারই সামনে।

ইন্দ্রজিৎ মন্তব্য করেছিল, তোমাব লোফার ভাইকে দেওয়ার জন্য আমি এত খেটে টাকা রোজগার করি না !

মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল মাধবীব।

রেগে বলেছিল, তোমাব কত আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, কতভাবে সাহায্য চাইতে আসে হিসেব বাখো ? কতজন কতভাবে কত সাহায্য আদায় করে নিয়ে গেছে হিসেব রাখো ? আমার ভাইটা বিগড়ে গেছে সত্যি, তবু আমার ভাই তো ! বিগড়ে যাক আর যাই হোক, ন-মাসে ছ-মাসে বিশ-পঁচিশটা টাকা চায়। তুমি মাইনে পাও দুহাজার টাকা। আমার ভাইকে আমি পঁচিশটা টাকা দেব—তোমাব তাতে আপত্তি কেন ?

বললাম তো আপত্তি কেন ! লোফারদের দেওয়ার জন্য আমি খেটে পয়সা রোজগার করি না।

মানবকে বিশেষ বিচলিত মনে হয়নি।

সে একটু ব্যঙ্গের সুরেই বলেছিল, একটা ভুল করছেন আপনি, আপনাদের মতো নীতিবাগীশ লোকেরা এ রকম সোজা কথা গুলিয়ে ফেলেন। আমি আপনার কাছে আসি না, আসি আমার দিদির কাছে। আপনার টাকায় দিদির অধিকার আছে—দিদি আমায় নিজের টাকা দেয়—আপনার টাকা দেয় না।

একটু হেসে আবাব বলেছিল, আপনি ছোটোলোক। স্ত্রীর কাছে তাব ভাই এলে তাকে অপমান করা যে স্ত্রীকেই অপমান করা—এটুকু জ্ঞানও আপনার নেই। আপনার অপমান আমি গায়ে মাখব না।

ইন্দ্রজিৎ কটমট করে তার দিকে তাকিয়েছিল।

মানব হাসিমুখেই মাধবীকে বলেছিল, তুই কী বলিস দিদি ? আর আসব না তো ?

মাধবী চুপ করেছিল।

তারপর আর আসেনি মানব। মাধবীর কাছে ছোটোভাইয়ের অধিকারের দাবি চিরদিনের জন্য ত্যাগ করেছে। দেখা করার জন্য মাধবী দুবার চিঠি লিখেছে, মানব জবাবও দেয়নি।

কিন্তু এ সব কথা ভাবলে কি চলবে আজ ? না, নিজের মান-অপমানের প্রশ্ন আজ বড়ো করা যাবে না।

মানব ভাগ্য মানে না। কিন্তু ইন্দ্রজিতেব বাড়ির সামনে খান-পনেরো মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার মনে হয়, যারা ভাগ্য মানে আর অনিয়ম মেনে চলে, তারা যেন এতগুলি মোটরের নীরব হর্ন আর নীরব ইঞ্জিনের ভাষায় স্পষ্ট ঘোষণা করছে—দিদির বাড়ি হোক, গেট পার হয়ো না ! দিদিকে না জানিয়ে আজকের দিনে এ সময় তোমার আসা উচিত হয়নি। দিদি রেগে যাবে।

খান পনেরো নতুন পুরানো প্রাইভেট গাড়ি তো শুধু নয়, ট্যাক্সিও কত অতিথি পৌঁছে দিয়েছে ঠিক নেই।

ট্রামে-বাসে চেপে বুদ্ধির কারবারি নরনারীও নিশ্চয় এসেছে কয়েকজন।

মোটর চেপে এসেছে যে জ্ঞানী-বিজ্ঞানী তাদেব সঙ্গে, সমান ভাবের চেয়ে বরং বেশি তেজেব সঙ্গে সূক্ষ্ম বিষয়ে তর্ক ক'রার অধিকার আছে ট্রাম-বাসে চেপে আসা জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের।

তর্কের স্থূল বিষয়ে তাদের হার মেনে নেওয়াটাই নিয়ম।

সূক্ষ্ম বিষয়ে সতেজে তর্ক করে স্থূল বিষয়ে হার মেনে নেওয়াটা তারাও যেন সুখেব সঙ্গে, আরামের সঙ্গে, মেনে নেয়।

এ রকম কত আসরে মানব অংশ নিয়েছে, মজা দেখেছে, মজা করেছে !

দিদি রেগে টং হয়ে যেত তার ব্যবহারে।

এই বেশে এই চেহারা নিয়ে আজ এ সময় সমাগত মার্জিত ভদ্র অতিথিদের মধ্যে তাকে হাজির হতে দেখে মাধবীর মূর্চ্ছা যাওয়া আশ্চর্য নয়।

কিন্তু এ সব চিন্তার অবসর কই ? প্রতিটি মুহূর্ত পুতুলকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে মরণের দিকে—শুধু টাকা থাকলেই যে-মরণকে অনায়াসে ঠেকানো যায় !

আর দ্বিধা না করে মানব ভিতরে যায়। যেখানে চোখ ঝলসানো বেশ আর পরিবেশের মধ্যে নারী ও পুরুষমানুষগুলিকে চেনাই যাচ্ছে না মানুষ বলে !

ইন্দ্রজিৎ কথা বলছিল অদ্ভুত রকমের, ভেলভেটেব মতো দেখতে এবং নিমন্ত্রিত প্রায় সকলেরই অজানা বস্তু দিয়ে তৈরি, স্যুটপরা বিদেশি মানুষটার সঙ্গে। তার দিকে এক নজর তাকিয়ে মাধবীর দিকে চেয়ে মৃদু হেসে ইন্দ্রজিৎ মুখ ফিরিয়ে নেয়।

একটু যে চোখের ইশারা করবে তাকে সে সুযোগও মাধবী পায না।

এই বেশে এইভাবে তার ভাই যে আজ এখানে হাজির হয়েছে, এ দুর্ঘটনা সে সামলে নেবে,—ইন্দ্রজিতের ভাবনা নেই—চোখের ইশারায় এটুকু জানিয়ে দেবার সুযোগও ইন্দ্রজিৎ তাকে দেয় না।

মানবকে এভাবে এসে দাঁড়াতে দেখে সে যে কী রকম আঁতকে উঠেছিল তাও ইন্দ্রজিতের চোখে পড়েনি।

তিন-চারদিন চোটপাট চলবেই। মারধোর কববে না, কিন্তু কথা আর ব্যবহারেব ধারালো অস্ত্রে তার হৃদয়মন কুচিকুচি করে কাটবে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য এ চিন্তাও মনে উঁকি দিয়ে যায় মাধবীর যে চাকর দরোয়ান ডেকে চোর বলে ধরিয়ে দেবে মানবকে !

মারতে মারতে আধমরা করে ওরা যাতে তাকে থানায় গিয়ে জমা দিয়ে আসতে পারে সে ব্যবস্থা করবে !

ইন্দ্রজিৎ খুশি হবে। বেশি রকম খুশি হবে। আজ রাত্রেই হয়তো তাকে সঙ্গে নিয়ে আনন্দ করতে বার হবে রোমাঞ্চকর আনন্দের কোনো কেন্দ্রে, হয়তো কিনে দেবে নতুন রকম শাড়িটা কিংবা গয়নাটা !

কিন্তু পাবা যায কি ? নিজেব ভাইকে স্বামীব দাবোয়ান চাকব দিয়ে মেবে আধমবা কবিয়ে দিয়ে থানায পাঠাতে ? ইন্দ্রজিতেব আগামী কয়েকদিনেব মার্জিত কিন্তু মাবাত্মক আক্রমণ ঠেকাবাব জন্য, তাকে খুশি কবাব জন্য ?

মাধবী তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে ক্ষোভেব সঙ্গে বলে, তুমি এমন দিনে এলে, আব তুমি দিন পেলে না আসবাব ? তুমি জানো না ওব আজ জন্মদিন ?

মানব হেসে বলে, কী কবে জানব ? নেমন্তন্ন কবেছ ? শ-খানেক লোক এসেছে, এবা সবাই তো বন্ধুবান্ধব আত্মীয় নয ? বাইবেব কত লোক নেমন্তন্ন পেল—আমি ভাই হয়ে বঞ্চিত হলাম। আমি সব জানি। গবিবেব মেয়ে বড়োলোকেব টাকাব স্বাদ পেয়েছ –জুতো মাবা পর্যন্ত তুমি সয়ে যাচ্ছ। জুতো সইতে হয বলেই তো ভাইকে আড়ালে ডেকে চুপিচুপি কথা কইতে হয।

কী কবব বলো ? ও যে বোঝে না।

বোঝালেই বোঝে।

বোঝে না তুই নিজেই তো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খেপিয়ে দিয়েছিস ওনাকে। একটু যদি ভালো কাপড় জামা পবে আসতিস, দাড়িটা কামিয়ে আসতিস, কাছে গিয়ে নম্রভাবে মিষ্টি কবে কথা বলতে পাবতিস–

হঠাৎ যেন অন্ধকাবে আশাব আলো দেখতে পেয়ে আকস্মিক উত্তেজনায মাধবীব হাত পা কাঁপতে থাকে।

নেই ' ; না তুই ? চ তোকে খুব দামি স্যুট পবিয়ে দিচ্ছি। স্যুটটা পবে চুলটা একটু আঁচড়ে এসে সকলেব সঙ্গে মেশ না তুই ? আগে শুধু ওনাব কাছে গিয়ে খুব নম্রভাবে মিষ্টি কবে বলবি-

পুতুলদি ওদিকে পলেপলে মবছে। নিজেব দিদি এদিকে জুড়েছে বাযনা। মানব ভূমিকা কবে না। সোজাসুজি বলে, আমায কিছু টাকা দে দিদি।

টাকা ? ভাইকে টাকা দিয়েছে জানলেই তো ইন্দ্রজিৎ আবও বেগে আগুন হয়ে যাবে। তাব পাঁচশো টাকাব শাড়িতে, দেড়হাজাব টাকাব গযনাতে ইন্দ্রজিতেব শুধু খেলিয়ে খেলিয়ে দেবি কবাব আপত্তি––ভাইকে বিশ-পঁচিশটা টাকা দিলেই ইন্দ্রজিৎ খেপে যায।

মানব আবাব বলে, আমায শ খানেক টাকা দিতেই হবে।

মাধবী মিষ্টিসুবে বলে, আমাব হাতে পাঁচ দশ টাকাব বেশি থাকে না জানিস তো ? কী জন্য চাইছি জানালে উনি অবশ্য টাকা দেন।

কিছু একটা বানিয়ে বলে চেয়ে আনো।

বিশ্বাস কববে ? অত হাবা নাকি ' তুই এলি অমনি আমাব অন্য ব্যাপাবে টাকাব দবকাব পড়ল ? চেয়ে বেখে দেব—ক দিন বাদে এসে নিয়ে যাস।

আমাব এখুনি দবকাব। যা আছে তাই দিয়ে দাও। আমাব নিজেব জন্য নয। ওই যে লেখক আছেন উমাকান্তবাবু ?—ওঁব স্ত্রী বিনা চিকিৎসায মবে যাচ্ছে '

মবে যাচ্ছে ?

কযেক মুহূর্ত চুপ কবে দাঁড়িয়ে থেকে মাধবী পনেবোটা টাকা এনে দেয। একগাছি সোনাব চুড়ি তাব হাতে দিয়ে বলে, টাকা আব নেই --এটা বেচে দিবি যা।

প্রায চাবটেব সময উমাকান্ত প্রেসে ফিবতেই মহেশ বলে, দেবি কবলেন কেন এত ? মানব খালেকেবা কিছু টাকা জোগাড় কবে এনে আপনাব জন্য তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা কবল—তাবপব আপনাব বাড়িব দিকে ছুটে গেছে।

উমাকান্তের মুখে কালি পড়ে গেছে, চোখ রাঙা।

সূর্যের কিরণ রাত্রিকে নাশ করেছিল ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ।

এখনও সূর্য অস্ত যায়নি।

ক-দিন আগের কথা ! তার সন্তানকে জন্ম দিতে পুতুল যেদিন সকালে রক্তপাত শুরু করেছিল ! পুতুলের সঙ্গে ঝগড়া করে যেদিন সে গিয়েছিল বাজার আর রেশন আনতে, বাড়ি ফিরে নিজের চেষ্টাতেই বন্ধ করেছিল পুতুলের রক্তপাত, আর মনে মনে হাজারবার আপশোশ করেছিল যে, রেশন না আনলে অন্তত ডাক্তার ডাকার পয়সাটা হাতে থাকত !

হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে পুতুল আবার বেসামাল হবার পর ক-ঘণ্টাই বা কেটেছে ? ক-ঘণ্টার মধ্যে এ রকম হয়ে যেতে পারে একটা সুস্থ লোকের চেহারা !

রক্তবর্ণ চোখ মেলে উমাকান্ত মহেশের দিকে তাকায়।

ক্ষয়ে যাওয়া ফেলনা ঃবফের সিসা গলিয়ে তৈরি করা কাগজ-চাপাটা তুলে, মহেশের মাথাটা ফাটিয়ে দেখার ঝোঁক সামলাতে এমন মনের জোর খাটাতে হয় তার !

কথা না বলে সে ধনদাসের কাঠের কুঠরিতে যায়।

পাণ্ডুলিপিটা টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, দু-শো টাকাই দিন !

ধনদাস গম্ভীর মুখে বলে, দেখুন, ভেবে-চিন্তে দেখলাম, দু-শো পারব না। দেড়শো নিয়ে যদি পারেন তো দিয়ে যান—নইলে কাজ নেই।

তাই দিন।

তৈরি ছিল টাইপ করা স্ট্যাম্প-মারা চুক্তিপত্র।

ধনদাস জানত সে ফিরে আসবে !

পনেরোটি দশ টাকার নোট গুণে দেয় ধনদাস।

নোটগুলি হাতে পেয়েই উমাকান্ত পকেটে পুরতে যাচ্ছে দেখে বলে, না না, গুনে নিন--টাকা পয়সার ব্যাপারে ছেলেমানুষি করবেন না।

দেড়শো টাকা পকেটে নিয়ে ঘরে যখন সে ফেরে, শীতের সূর্য পশ্চিম আকাশে আড়ালে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

বাড়ির সামনের সিঁড়িতে দেড়বছরের বাচ্চা মেয়েটাকে কোলে নিয়ে মানব, আব তিন বছরের ছেলেটাকে পাশে নিয়ে খালেক বসেছিল।

ভেতরে একটা ঘরে আট বৎসরের মেয়েটা যেন কান্নার সুরে সুরে গান গাইছে।

সবই বুঝতে পারে।

তবু উমাকান্ত যেন জীবন মরণের ব্যাপারটাকেই ঋষির মতো উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করে, মরে গেছে, না ? ভালোই হয়েছে—মরে বেঁচেছে।

মানবের চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল কি ঝরে পড়ল, তার কোলে শোয়ানো পুতুলের গর্ভে জন্মানো তার বাচ্চাটার গায়ে ?

খালেক কি চোখ মুছল ছেঁড়া শার্টটার হাতায় ? পুতুলের মরণে ওদের চোখে জল এল, তার চোখটা শুধুই জ্বালা করছে কেন ?

চোখ মুছে খালেক ক্ষোভের সুরে বলে, কিছুতে বাঁচাতে পারা গেল না।

মানব বলে, আপনার ভরসায় না থেকেই ডাক্তার আনলাম—ইস্ ! আর দুঘণ্টা আগে যদি ডাক্তার আনা যেত ! ডাক্তারবাবু যাবার সময় বলে গেলেন, আপনাকে ফাঁসি দেওয়া উচিত।

মানব জোরে শ্বাস টানে। বলে, ফাঁসি হওয়া উচিত আমার। আমিই আপনাকে ধনদাসের টাকাটা নিতে বারণ করলাম। টাকাটা নিয়ে তাড়াতাড়ি এলে—

উমাকান্ত হাঁফ টানার মতো কয়েকবার নিশ্বাস নেয়, একটা অদ্ভুত বিকৃত আওয়াজে বলে, তোমার কোনো দোষ নেই। আমি নিজেই তো অন্য চেষ্টা করতে বেরোলাম।

উমাকান্ত চোখ বোজে।

হঠাৎ সে যেন পাথরের মূর্তি হয়ে যায়, তারপর কাটা গাছের মতো হঠাৎ আছড়ে পড়ে যায়।

সিঁড়ির কোনায় লেগে কেটে গিয়ে, মাথা থেকে গলগল করে রক্ত বার হয়।

কে জানে ফুটো হয়েছে না একেবারে ফেটে গেছে তার মাথার খুলিটা !

মানব গলা চড়িয়ে ডাক দিতেই একজন পক্ককেশা বিধবা এবং একজন প্রৌঢ়বয়সি সধবা তাড়াতাড়ি বাইরে আসে।

মানব বলে, বাচ্চা দুটোকে সামলান। তোর রুমালটা দে তো খালেক !

রুমালটা ভাঁজ করে উমাকান্তের মাথার ক্ষতয় বসিয়ে, পরনের কাপড়ের আঁচল থেকে ব্যান্ডেজের মতো ফালি ছিঁড়ে, মাথায় আনাড়ির মতো পেঁচিয়ে মানব বলে, অ্যাম্বুলেন্স ডেকে এনে ব্যবস্থা করতে করতে পুতুলদির মতো ফিনিস হয়ে যাবে। আয় খালেক, ধরাধরি করে ডাক্তার দাসের ডিসপেনসারিতে নিয়ে যাই।

ডাক্তার দাসের পক্ককেশী বিধবা মা চেঁচিয়ে বলে, তোদের ডাক্তার দাস যে সাত দিন জ্বরে শয্যাগত রে !

মানব বলে, কম্পাউন্ডার সলিলবাবু আছেন তো ডিসপেনসারিতে ? শুধু রক্তপাত ঠেকানো— উনি সেটা পারবেন। তারপর দেখা যাবে।

এদিকে ধনদাস মহেশকে কামরায় ডেকে পাঠায়।

এটা সে করে কদাচিৎ।

কিছু জানতে চাইলে, কোনো বিষয়ে নির্দেশ অর্থাৎ হুকুম দিতে চাইলে, নিজেই সে মহেশের কাছে যায়।

উদ্দেশ্যহীনভাবে প্রেসের এদিক-ওদিক একটু ঘুরে দেখে বেরিয়ে যেন, খেয়ালের বশেই মহেশের টেবিলে একটা হাত রেখে দাঁড়ায়।

সে এসে দাঁড়ালে মহেশ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় না, বলে প্রথম প্রথম তার রাগ হত ! কিন্তু ফাঁকা রাগের ধার সে ধারে না।

মানুষটা বিদ্বান বুদ্ধিমান সাহিত্য-রসিক, সাধারণ মাইনে-করা কর্মচারীর মতো মনিব সামনে এলে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখানো তার জানাও নেই, ধাতেও নেই। মনিব হলেও এটুকু বুঝতে হবে বইকী, মানতে হবে বইকী !

মহেশ এসে বসলে ধনদাস বলে, উমাবাবুর কানে কানে আপনি কী বলছিলেন ?

মহেশ আশ্চর্য হয়ে যায়। এই কুঠুরির আড়ালে থেকে ধনদাস শুধু তাদের কথাবার্তাই শোনে না, আড়াল থেকে লুকিয়ে কে কী করছে না করছে তা জানবার ব্যবস্থাও তার আছে !

মুখ কিন্তু গম্ভীর হয়ে যায় মহেশের।

আমার ব্যক্তিগত কথা। গোপনীয় কথা।

ধনদাস কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলে, উমাবাবুর কানে কানে কী বলেছেন শুনবার জন্য আপনাকে ঠিক ডাকিনি। আপনার নিজের ব্যাপার কার কানে কী বলবেন না বলবেন, তা দিয়ে আমার দরকার কী ? আপনি গুণী লোক, আপনার কদর আমি জানি, কোনো রকম অপমানজনক ব্যবহার কোনোদিন পেয়েছেন আমার কাছে ?

তারপর সে অমায়িকভাবে একটু হাসে।—তবে কী জানেন, একটা কথা আপনাকে বলে রাখি—আমার এখানে কাজ করলে আমার স্বার্থটা সব সময় দেখতে হবে। আপনি তা দ্যাখেন, তবু একবার জানিয়ে রাখলাম। এ বিষয়ে আমি খুব কড়া।

এর নাম ফার্স্ট ওয়ার্নিং !

মহেশ সায় দিয়ে বলে, সে তো বটেই, এ কোনো দোষের কথা নয়। যার চাকরি করব তার স্বার্থহানি ঘটাব, এটা কে বরদাস্ত করবে ?

অনেকে এই সোজা কথাটা বোঝেন না কিনা, সেটাই বড়ো আপশোশের কথা হয়ে দাঁড়ায়। কালাচাঁদ কাজ ভালোই করছে, না ?

ওর সাথে পাল্লা দেবার মতো কেউ নেই আপনার প্রেসে। তবে মানুষটা একটু খেয়ালি ধরনের। পাঁচ-দশমিনিট, হয়তো চুপচাপ বসেই রইল কাজ বন্ধ করে। আমি কিছু বলি না - বলে লাভ হয় না। হাত যখন লাগায়—আধঘণ্টা সুবিধে দিয়েও—মধুভূষণ এদের ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়।

৪

হোঁচট খেয়ে আছড়ে পড়ে মহেশের কোমরে চোট লেগেছে ভীষণ।

বাপ রে ! মা রে !—বলে কাতরেও উঠেছে কয়েকবার।

তারপর খানিকক্ষণ গুম খেয়ে থেকে যেন জগতের সব রকম গভীরতম শোকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অদ্ভুত রকম করুণ কণ্ঠে বলে : হায় রে কপাল সরকারি রেশন, পয়সা দিয়ে চুরি করতে যাব – নিজের ভাঙা ঘরের পচা চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে আছাড় খেয়ে কোমর ভাঙলাম !

মলয়া ছুটে এল। তাকে জড়িয়ে ধরে তুলবার চেষ্টাটা, তার ভাঙা কোমরে ব্যথা না দিয়ে কীভাবে করবে ঠাহর পাচ্ছিল না—আছাড় খাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে তার ইয়ার্কি দেওয়ার কথা শুনে রেগে গিয়ে ঝংকার দিয়ে ওঠে, রসিকতাটা নয় পাঁচ মিনিট পরেই শুরু করতে ? নিজের ভাঙা কোমর নিয়েও তুমি ইয়ার্কি দিয়ে রসিকতা করতে পারো— ধন্য তুমি ! সত্যি কি ভেঙেছে কোমরটা ? না এমনি চোট লেগেছে ?

বেশ মানুষ তুমি—দিব্যি আছ ! সরকারি রেশন আনতে যেতে, হোঁচট খেয়ে আছাড় খেলে কারও মাথা আস্ত থাকে ? বিধবা যদি না হতে চাও তো চটপট ডাক্তার ডাকাও।

কী আবোল-তাবোল কথা বলছ ? কোমরে চোট লেগেছে বললে, আবার বলছ মাথায় চোট লেগেছে !

কোমরে চোট লাগার ব্যথাটা কোথায় লাগে গো ? কোমরে ব্যথা লাগে, চোট পায় মাথাটা। কোমরের ব্যথাবোধ আছে নাকি ? একটু রসিয়ে বললাম ভাঙা কোমরের ব্যথায় মাথাটা ফেটে যাচ্ছে—মোটে বুঝলে না তুমি রসিকতাটা !

তোমার রসিকতা বুঝবার সাধ্য আমার নেই। আছাড় খেয়ে কোমর ভাঙার ব্যথা নিয়ে যে রসিকতা চালাতে পারে -তার রসিকতা বুঝবার মতো মাথা বিধাতা আমায় দেয়নি !—

বুড়ো বয়সে পা পিছলে পড়ে গিয়ে কোমরে চোট লাগলে দিন তিনেক আপিস কামাই করা যায়।

কাঁদাকাটা করে চিঠি পাঠিয়ে নিরুপায়তা জানিয়ে আরও দুদিন ব্যথিত কোমরটাকে বিশ্রাম দেওয়া যায়।

তারপরেই আসে ভদ্রতাপূর্ণ চরমপত্র ! জমাদারের বদলে কালাচাঁদের হাতে পাঠানো হয়।

পত্রের মর্মকথা এই মহেশের কোমর ভেঙে গেছে জেনে, দু-একমাসের মধ্যে মহেশ বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না জেনে, ধনদাস বড়োই দুঃখিত হয়েছে। সে আশা করে শীঘ্রই মহেশ সেরে উঠবে। কিন্তু রস সাহিত্য কাগজটা তো বার করতে হবে নির্দিষ্ট দিনে ? দু তিনমাস ছুটি নিয়ে মহেশ কোমরের ব্যথা সারাতে চাইলে কি ধনদাস আপত্তি করবে ? আজ দশ বছরের বেশি মহেশ তার হয়ে কাজ করছে। মহেশ তো অনায়াসেই জানিয়ে দিতে পারে যে অন্য কাউকে দিয়ে এক সংখ্যা বা দু সংখ্যা রস সাহিত্য বার করা হোক, তারপর মহেশ সুস্থ হয়ে গিয়ে দায় নেবে।

মহেশ বিছানায় শুয়ে জবাব লেখে, কোমরের ব্যথা অনেক কম। একবার ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, তাই দেরি হবে। আজকেই মহেশ প্রেসে যাবে।

মলয়া একেবারে যেন নোতিয়ে গিয়ে বলে, পারবে যেতে ? উঠেই তো দাঁড়াতে পারছ না।

আজ কি আর সত্যি সত্যি যাব রে পাগলি ? ওটা হল জানিয়ে দেবার কায়দা যে ঠিক সময়ে গিয়ে কাগজ আমি ঠিক বার করে দেব।

মলয়া ঝংকার দিয়ে বলে, সবার সাথেই তোমার রসিকতা।

কাতরানি থেমেছে কিন্তু মুখ দেখেই টের পাওয়া যায় যে মহেশের কোমরের ব্যথা বেশ জোরালো।

তবু সে রসিকতা করে জবাব দেয়, রস যে আমার বেশি গো – রস নিয়েই মজে আছি নইলে রস সাহিত্যের সম্পাদক হয়ে এতকাল চালাতে পারতাম ?

যেমন কাগজ তোমার রস সাহিত্য তেমনি তুমি সম্পাদক।

ভালোমন্দ সব রকম কথায় ঝংকার দিয়ে উঠুক, উঠতে বসতে কলহ করুক, ছোটোবড়ো সব ব্যাপার মহেশের হালকা রসিকতায় উড়িয়ে দেবার কায়দার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সব সময় সব ব্যাপারে সব কথায় খ্যাঁচখ্যাঁচ করার কায়দায় লড়াই চালাক-- মলয়া উদয়াস্ত খাটে।

উদয় থেকে শুরু করে সূর্য অস্ত যাওয়ার পরেও খাটে অনেক রাত্রি পর্যন্ত।

কারণে তো খাটেই, অকারণেও খাটে।

যে কাজ সংক্ষেপে সারা যায় সেই কাজ সবিস্তারে করা তার স্বভাব, হাতে কাজ না থাকলে তার হাঁপ ধরে যায়। মেয়েরা কোনো কাজে সাহায্য করতে এলে সে ঝংকার দিয়ে ওঠে, ঢাকা দরদ দেখিয়ে আমার ব্যাপারে তোরা মাথা গলাবি না বলে দিচ্ছি।

আহত মহেশের সেবাও করে মরিয়া হয়ে। সংসারের কাজ কমিয়ে বাকি সময় সে অবিরাম তার কোমরে সেঁক আর মালিশ চালিয়ে যায়, তাড়াতাড়ি মহেশকে সারিয়ে তুলে আপিসে গিয়ে কাজ করে মাস মাইনে আনার মতো জোরদার করে তুলতে সে যেন কোমর বেঁধেছে---প্রাণ দিয়ে সে সামলাবে স্বামী আর সংসারকে।

মেয়েদের সংসারের কোনো কাজে নাক গলাতেও দেয় না, মেয়েদের দিকে ফিরে তাকাবার সময়ও মলয়া পায় না।

দুই মেয়ে, চন্দ্রা এবং মন্দ্রা।

মন্দ্র থেকে মন্দ্রা চন্দ্রাই জোর করে নিজের নামে মিলিয়ে নাম রেখেছিল আদরের বোনটির।

মহেশ বলেছিল, মন্দ্র কথাটার মানে জানিস না খুকু ? মেঘের গম্ভীর ধ্বনি, মৃদঙ্গ। অভিধান না মানিস সে জন্য নয়– সরু গলায় এমন চেঁচিয়ে কাঁদে, এমন খিলখিল করে হাসে, ওর তুই মন্দ্রা নাম রাখলি ?

আমার নামের সঙ্গে মিলেছে, একটা মানে আন্দাজ করা যায়, তাই ঢের। তুমি বলো না লাগসই অন্য একটা নাম ?

মহেশ দু-একটা নাম বলেছিল কিন্তু চন্দ্রার পছন্দ হয়নি ! চন্দ্রার পর আর মেয়ে জন্মাবে না, আর নামকরণ করতে হবে না, এ রকম আশা থাকলেও কোনো ভরসা অবশ্য অবশ্য ছিল না। মেয়ে দিয়েই যখন শুরু হয়েছে, একগন্ডা দেড়গন্ডা মেয়েব আশঙ্কাই তার ছিল। কিন্তু নাম রাখা নিয়ে মহেশ কখনও মাথা ঘামায়নি।

চন্দ্রা চলন্তিকার পাতা উলটে এলে মহেশ বলেছিল, তোর নাম কিন্তু চন্দ্রা নয়—চন্দ্রাবতী। মন্দ্রাবতী বড্ড বেখাপ্পা হবে।

চন্দ্রাবতী নয়, আমাব নাম চন্দ্রা। তুমি নাম রেখেছ, বাতিল কবব না একেবারে। বতী-টতী লাগিয়ে কী দরকার ? চন্দ্রা বললেই লোকে বুঝবে আমি মেয়ে।

তারপর হাসিমুখে বলেছিল, কী নামটাই ঠাকুর্দা রেখে গেছেন তোমার, বলিহারি যাই। আগে নয় মহেশ বলতে মহাদেব বোঝাত,—শরৎবাবু মহেশ গল্প লিখবার পর কী মানে মনে আসে বলো তো সবার ? ঠাকুর্দার ওপর এমন রাগ হয় আমার !

মহেশও হাসিমুখে বলেছিল, বুঝেছি। ক্লাসের মেয়ে খোঁচা দিয়েছে, না ? আজকালের মধ্যেই দিয়েছে নিশ্চয় ! মহেশ গল্পটা পড়ান হচ্ছে বুঝি ? কার গায়ে জ্বালা ছিল, এই সুযোগে ঝাল ঝেড়েছে !

চন্দ্রা খুশি হয়ে বলেছিল তুমি কী করে বুঝলে বাবা ? একেবারে ঠিক ধরেছ ব্যাপারটা ! ঝরনা তো আমায় দু-চোখে দেখতে পারে না—কে জানে আমি ওর কী ক্ষতি করেছি ! ক্লাসে গল্পটা পডান হচ্ছে, উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, মহেশ কথাটার মানে বুঝিয়ে দিন। মহেশ মানে তো মহাদেব, একটা ষাঁড়েব এ নাম রাখা হল কেন ? চন্দ্রার বাবার নামও আবাব মহেশবাবু। ক্লাসেব সব মেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল বাবা !

মহেশ কড়া সুব করে বলেছিল, তুমি মিছে কথা বলছ—ক্লাসেব সব মেয়ে হাসেনি, হাসতে পারে না। সকলেব সঙ্গে তো ছেলেমানুষি ঝগড়া হয়নি তোমাব ! কিছু মেয়ে হেসেছিল, কিছু মেয়ে ঝরনার অসভ্যতায় ভীষণ চটে গিয়েছিল।

ঠিক বলেছ ! রাধার খুব ভাব ছিল ঝরনার সঙ্গে, আমার সঙ্গে মিশতই না। ক্লাস শেষ হলে, যাচ্ছেতাই বলে ঝরনার সঙ্গে ঝগড়া করলে, —আড়ি হয়ে গেল দুজনার।

একটু থেমে চন্দ্রা বিস্ময় আব কৌতূহলেব সঙ্গে বলেছিল, কিন্তু তুমি কী করে ঠিক ঠিক সব জানলে ঘরে বসে ?

সম্পাদককে সব জানতে হয়।

চেয়ারে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে পাকা চুল তুলে দিতে দিতে চন্দ্রা বলেছিল, তাই বুঝি চুল পেকে যাচ্ছে ?

মহেশ কয়েক দিন প্রেসে না যাবার ফলে একটা যোগাযোগ ঘটে যায়। ভাগ্যচক্র নয়, কোমরে চোট না লেগে কোনো অসুখ হয়ে বা অন্য কারণে মহেশ কাজে হাজিরা দিতে কামাই করলেও যোগাযোগটা ঘটত।

ঘটনার সঙ্গে গাঁথা হয়ে হয়েই ঘটনা ঘটে থাকে।

শখের কবি ও লেখক জহরের কবিতার বইটি বার হয়েছে। মহেশকে একখানা বই উপহার দিতে দুদিন প্রেসে গিয়ে তার দেখা না পাওয়ায় সে তার বাড়িতেই আসে।

মহেশের সঙ্গে তার আগে থেকেই পরিচয় ছিল কিন্তু রস সাহিত্যের আপিসেই মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হত, মহেশের বাড়িতে তার এই প্রথম পদার্পণ।

চন্দ্রার সঙ্গে তার আলাপ হয় এবং তাকে তার অদ্ভুত রকম ভালো লেগে যায়।

একেবারে যাকে বলে প্রথম দর্শনে প্রেমের সূত্রপাত ঘটা।

একটা দিন বোধ হয় কোনো রকমে ধৈর্য ধবে থাকে। পরদিন ব্যথিত কোমরটা নিয়ে কোনো রকমে প্রেসে হাজিরা দিতে গিয়ে মহেশ তাকে তারই প্রতীক্ষায় বসে থাকতে দেখতে পায়।

বিশেষ কোনো ভূমিকা না করেই জহর বলে, আমি আপনার মেয়েব সঙ্গে ভালো করে মিশতে চাই। আপনার কোনো আপত্তি নেই তো ?

মহেশ বলে, আমার আপত্তি হবে কেন ? আমার তো পর্দানশিন বোকা মেয়ে নয়।

জহর উচ্ছ্বসিতভাবে বলে, অনেক মেয়ের সঙ্গে চেনা আছে, আপনার মেয়ের মতো একজনের মধ্যে এমন প্রাণশক্তির সঙ্গে এমন গভীর ভাব আব কারও মধ্যে দেখিনি।

মহেশ আশ্চর্য হয়ে বলে, আমার কোন মেয়েটার কথা বলছ ? চন্দ্রা তো খুব ধীর শান্ত মেয়ে—ভাবুক বলা যেতে পারে, খুব সেনসিটিভ, ওর মধ্যে তুমি প্রাণশক্তি দেখতে পেলে ? সত্যিকারের জীবন্ত বলতে গেলে ছোটোটাকে বলতে হয়—সব সময় অস্থির চঞ্চল।

জহর হেসে বলে, আমি চন্দ্রার কথাই বলছি। আপনারা ভুল হিসাব ধরেন—খুব দুরন্ত আর অস্থির হলেই কি বেশি জীবন্ত হয় ? রোগা ছেলেমেয়েরাই বেশি দুষ্টু হয় দ্যাখেন না ? প্রাণশক্তি আছে বলেই আপনার বড়োমেয়ে এত সেনসিটিভ অথচ শান্ত।

মহেশ বলে, তাই নাকি ! প্রাণচঞ্চল কথাটার মানে তোমবা কবিরা তবে এই বোঝ ?

জহর একেবারে ডঠে-পড়ে লাগে।

তার যেন সবুব সইবে না, যত তাড়াতাড়ি পারা চন্দ্রার হৃদয়মন জয় করতে হবে।

তার বাড়াবাড়িতে সকলে হাসাহাসি করে, বলাবলি করে যে কবি লেখকেবা সত্যিই পাগলেব জাত !

চন্দ্রা লজ্জা পেয়ে দিন পনেরো পবেই জহরকে বলে, কী আরম্ভ করেছেন ? আপনার কোনো বুদ্ধি-বিবেচনা নেই।

জহর বলে, আমার মতলব কিন্তু ভালো। তোমাব জন্য ছেলে খোঁজা হচ্ছিল, সে হিসাবে আমি একেবারে বাজে নই। বাড়ির অবস্থা ভালো, চাকরিটাও মন্দ করছি না। কবি হলেও স্বভাব কেউ মন্দ বলতে পারবে না।

অন্য দিকে তাকিযে চন্দ্রা বলে, আমার পিছনে না লেগে বাবাকে বললেই হয়।

তোমাব বাবাকে জানিয়েই তোমার পেছনে লেগেছি।

চন্দ্রা মুখ ফেরায় না, গলা চড়ায় না, মৃদুস্বরে প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে বলে, আপনি তো ভীষণ মানুষ ! ছেলের অভিভাবক হোক আর ছেলে নিজেই হোক, এক দিন কী বড়ো জোর দুদিন মেয়েকে দেখে-শুনে পরীক্ষা করতে এসে পছন্দ নয়তো অপছন্দ করে যায়। আপনি আজ পনেরো দিন ধরে রোজ এসে মেয়ে পছন্দ করছেন !

খানিকক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে থাকে জহর। সামনে রাখা দু নম্বর চায়ের কাপ ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জুড়িয়ে যায়।

তারপর হঠাৎ সে বলে, আমি কি তবে ভু.. করলাম ?

কী করে বলব ?

না, আমি ভুল করিনি। তুমিই আমায় ভুল বুঝেছ। পছন্দ তোমায় আমি প্রথম দিনেই করেছিলাম—শুধু পছন্দ করা নয়, ভালোবেসেছিলাম।

এবার মুখ ফিরিয়ে চোখ তুলে তাকিয়ে চন্দ্রা একটু হেসে বলে, তাই বুঝি দিনের পর দিন যাচাই করে চলা ? আমায় নিয়ে দশজনের হাসাহাসির ব্যবস্থা করা ?

জহর আবেগের স্বরে বলে, বললাম না তুমি আমায় ভুল বুঝেছ। তোমায় পছন্দ করিনি—ভালোবেসেছি। এতদিন কোনো মেয়েকে চাইনি, বাকি জীবনে তুমি ছাড়া কোনো মেয়েকে চাইতে পারব না। কিন্তু আমরা কবি-মানুষ, আমরা ভালোবাসার ব্যাপার জানি—

কোনো মেয়েকে ভালো না বেসেই- ? এবার বুঝলাম ভালোবাসা নিয়ে কবিরা কী রকম আন্দাজি কারবার চালান !

খোঁচা খেয়েও জহর যেন খুব খুশি হয়ে ওঠে।

না, তা নয়। অল্পবয়সে দু-একটা মেয়ের সঙ্গে ছেলেমানুষি ভালোবাসা নিয়ে পাগলামি করেছি বইকী ! বেশি না বুঝে থাকি, এটুকু বুঝে গিয়েছি যে একপক্ষে ভালোবাসা হয় না। তোমায় যদি শুধু পছন্দ করতাম, তোমার পিছনে লাগতাম না। তোমার বাবার সঙ্গে কথাবার্তার ব্যবস্থা করে তোমায় পাবার ব্যবস্থা করতাম। ভালোবেসে ফেললাম বলেই মুশকিল হয়েছে। একপক্ষে ভালোবাসা হয় না, তোমার মধ্যে একটু ভালোবাসা না জাগিয়ে---অন্তত তুমি আমাকে পছন্দ কর কি না জেনে—

চন্দ্রা মুচকে হাসে।

ভালোবাসার প্রমাণ মেয়েরা কী করে দেবে জানি না। পছন্দ করার প্রমাণ কিন্তু যথেষ্ট দিয়েছি। নইলে এত জ্বালাতন বরদাস্ত করতাম ? এত পাগলামি সইতাম ? সবাই হাসাহাসি করছে দেখেও এতদিন চুপ করে থাকতাম ?

শুধু সহ্য করা ?

আমি কচিখুকি নই। আমিও দু-তিনবছর কবিতা লিখেছি, বাবা এখানে ওখানে কয়েকটা ছাপিয়েও দিয়েছেন। আপনি তো তবু নিজের পয়সায় নিজের কবিতার বইটা বার করলেন, আমার কবিতাগুলি মাসিকের ছেঁড়া কাগজে মুদি দোকানে মশলা প্যাক করছে।

তুমি কবিতাও লিখেছ জানতাম না।

কবিতা লেখা বুঝি তোমাদেরই একচেটিয়া ?

জহর যেন পরম খুশি হয়ে হাসে, টেবিলে সজোরে এক চাপড় মেরে জুড়িয়ে যাওয়া চায়ের কাপের অর্ধেকটাই উছলে ফেলে দেয়।

এবার বুঝে গেছি। তোমরাও স্বাধীনতা চাও ! আমাদের এত কালের এমন ছাঁকা ভালোবাসাও তাই মানা চলছে না। সত্যি কথাই—আমরা আজও সত্যি তোমাদের ভালোবাসার দাম কষছি কতখানি তোমরা সতী-সাবিত্রী হতে পারবে তারই ওজনে।

আরেক কাপ চা আসে। এনে দেয় মন্দ্রা, মুখখানা হাস্যকর রকম গম্ভীর করে আসে। জহর তার গাল টিপে দিয়ে বলে, গাল ফোলা কেন ?

মন্দ্রা বলে, আমিও কিন্তু কচিখুকি নই। গাল টেপা জমা রইল, একদিন উশুল করব।

করবেই তো, সুদে আসলে করবে। ও গালটাও টিপে দিই, ঋণ বাড়ুক।

মন্দ্রা চলে গেলে, জহর বলে, তোমার কবিতাগুলির কপি ঠিক আছে ?

আছে না ? আরও গোটা ত্রিশেক কবিতা লেখা আছে। ছাপাতে ভালো লাগেনি বলে ছাপাইনি।

গয়না না দিয়ে, আমার বইটার চেয়েও ভালো করে তোমার কবিতার বইটা ছাপিয়ে বিয়ের রাতে উপহার দিলে, খুশি হবে তো ?

খুশি হব না ? কিন্তু তুমি পারবে কিনা কে জানে ! হিরা জহরতের গয়নায় আমায় মুড়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল একজন, বাবা সামলে নিল। টাইফয়েডে আমি মর-মর বলে কাটাল মাসখানেক, টাইফয়েড থেকে সেরে উঠে আমার মাথা বিগড়ে গেছে বলে আমাকে বোম্বাইয়ে জ্যাঠার কাছে চেঞ্জে পাঠিয়েছে বলে আরও ক-মাস ঠেকিয়ে রাখল। টাকায় সুবিধা হবে না টের পেয়ে তারপর বাঁদরটা হাল ছাড়ল।

জহর বলে, জ্যাঠা মানে তো রাজীববাবু ?

চন্দ্রা বলে, নামেই জ্যাঠা। বাবা সত্যি সত্যি কয়েক মাসের জন্য পাঠাতে চেয়েছিল। আমিই গেলাম না। ও রকম বড়োলোক জ্যাঠার বাড়ি ঝি হিসাবে ছাড়া যেতে পারি ? জ্যাঠা কোনোদিন মানবে ভাইঝি বলে ? বাবাকে একটুকু সাহায্য করবে না, শুধু চাইবে পায়ে এসে প্রণাম করো।

কাজে যাবার সময় মহেশ এসে একটু দাঁড়ায়,—খানিকটা বাঁকা হয়ে।

আছাড় খেয়ে শুধু চোট লাগার ব্যথা এতদিন থাকার কথা নয়। অন্য কোনো গোলমাল ঘটেছে পঞ্চাশ বছরের পুরানো দেহটাতে।

চন্দ্রা বলে, না গেলে হয় না ? কামাই করো না দু একদিন !

জহর বলে কাগজ তো বেরিয়ে গেছে ?

মহেশ বলে, আমার কি শুধু কাগজ বার করার কাজ হে ? প্রেসের কাজও দেখতে হয়। বসো তোমরা—আমি চললাম।

জহর বলে, ফেরার সময় প্রেসে আপনার সঙ্গে দেখা করে যাব।

খানিক পরেই একগাদা বইখাতা হাতে মন্দ্রা এসে দাঁড়াল।

বলে, বাবা বেরিয়ে গেলেন, আমিও স্কুলে চললাম, বোকা দিদিটাকে কে পাহারা দেবে ?

জহর হেসে বলে, আমি পাহারা দেব। সারাজীবন পাহারা দেবার চাকরি দিতে তোমার দিদি রাজি হয়েছে, মন্দ্রা !

মন্দ্রাও হেসে বলে, আহা মরি, কী বিনয় ! দিদির আবার রাজি অরাজি !

কেউ অবশ্য ভাবেনি এভাবে এমন আচমকা চন্দ্রার এত ভালো বিয়ে হয়ে যাবে—যদিও ব্যাপারটা মোটেই অভাবনীয় নয়। এ রকম ভালোবাসার বিয়ে সংসারে হরদম হচ্ছে।

জহরের তাড়াহুড়ো করাটাও এমন কিছু সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার নয়। কোনো মেয়েকে ভালোবেসে ফেললে তাড়াতাড়ি তাকে পাওয়ার ঝোঁকটা কবি-লেখক ছাড়াও অনেকেরই দেখা যায় !

তবু তাদের জানা চেনা বেশির ভাগ মানুষেরাই কিনা কোনো কোনো ভাবে সাহিত্য-জগতের সঙ্গে জড়িত, লিখতে এবং চিন্তা করতে প্রেমের মাধ্যমটাকে বুদ্ধি দিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি ও বিচার-বিশ্লেষণ করতে অভ্যস্ত---অনেকেরই তাই, তাদের ভালোবাসার বিয়েটা অসাধারণ মনে হয়।

প্রথম পরিচয়ে প্রেম হওয়া নয়---ওটা যে অতি সাধারণ ব্যাপার যুগ যুগ ধরে ওটা অসংখ্যবার বাস্তব জীবনেও ঘটেছে---কবি-লেখকেরা হরফ সাজিয়ে সেটা অসংখ্যবার প্রমাণও করে গেছে।

কিন্তু জহরের মতো একজন সুমার্জিত কবি-লেখকের পক্ষে ভালোবাসাটা গড়ে উঠতে না দিয়ে, পাকতে না দিয়ে, মিলনের ছেদ টানাটা খাপছাড়া লাগে অনেকের কাছে।

মহেশের আয়োজন সামান্য কিন্তু বিয়েতে সমারোহ হয় প্রচুর। বহুলোকের সঙ্গে মহেশের পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা—তাদের সকলকে সেকেলে লুচি-পোলাও মাছ-মাংসের ভোজ খাওয়াবার সাধ্য তার নেই। না করলে নয় বলেই বাছা বাছা আত্মীয়কুটুম্ব বরযাত্রী কিছু লোককে ও রকম ভোজ খাইয়ে চেনা মানুষদের সে চা, বিস্কুট, চানাচুরের আসরে নিমন্ত্রণ করে।

ভোজ খেতে এসে আত্মীয়কুটুমেরা চন্দ্রাকে উপহার দেয় সোনারুপার সিঁদুর কৌটা থেকে প্রসাধন সামগ্রী, শাড়ি বা হালকা গয়না—চায়ের আসরে নিমন্ত্রিত নিমন্ত্রিতেরা প্রায় সকলেই বইয়ের উপহার বৃষ্টি করে।

একটা আলমারি ভরে গিয়ে বেশি হবে—এত বই !

এমন জমাট বাঁধে চা-খাবাবেব প্রীতি-সম্মেলনেব আসব যে, মনে হয চন্দ্রাব বিয়ে উপলক্ষে বুঝি একটা বড়ো বকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলেছে।

প্রাণখোলা হাসি-তামাশা, আলাপ-আলোচনা, গানবাজনা ও সংক্ষিপ্ত সবস বক্তৃতায, প্রাণেব বসে জমজমাট হয়ে ওঠে সে আসব।

কতকাল পবে যে মলযাব মুখে হাসি দেখা গিয়েছে।

তাব কলহ আব মহেশেব হালকা বসিকতাব সম্পর্ক যেন বদলে গিয়েছে চন্দ্রাব বিয়ে ঠিক হবাব দিন থেকে।

সর্বদা দুজনে মিলে মিশে পবামর্শ আব বিচাব বিবেচনা।

হৃদযবাবু জহবেব জ্যাঠা না কাকা গো ? জ্যাঠাই হবে বোধ হয। দাবি দাওযাব এই লম্বা ফর্দ পাঠিয়েছে। শুধু গযনাই চেয়েছে হাজাব তিনেক টাকাব।

সে জন্যে ভেবো না, তুমি বস সাহিত্য নিয়ে ভাবে মেতে থাকো। ও সব আমি হিসেব কবেছি। জহবকে পবিষ্কাব বলেছি গযনা কানে হাতে গলায পাঁচশো টাকাব বেশি দিতে পাবব না।

মলযা লজ্জিতভাবে হাসে।

কী অদ্ভুত ছেলে জানো ? আমাব কথা শুনে একেবাবে নিশ্চিন্তভাবে বললে, আমি তোমাব মেয়েকে বিয়ে কবছি মা —গযনাগাঁটি দেনাপাওনাব ব্যাপাব বুঝবে অন্যেবা। আপনাবা যা দেবাব দেবেন, আমিও আপনাদেব হয়ে হাজাব টাকাব শাড়ি গযনাব ব্যবস্থা কবে মুখবক্ষা কবব। আমি বেগে উঠতে কী বলেছিল জানো ? বাগবেন না, ওটুকু বুঝবাব মতো বুদ্ধি আমাব আছে। আমি কি আজকেব কথা বলছি ? আজ তো আমি পবেব ছেলে, এক মাস পবে যখন জামাই হব, তোমায মা বলে ডেকে তোমাব পক্ষ হয়ে তোমাব মেয়েকে দিলে তো আব দোষ থাকবে না।

মহেশ যেন একটু চিন্তিতভাবেই বলে, সাংসাবিক জ্ঞানবুদ্ধি বড়ো কম ছেলেটাব। সব সময ভাবেব বশে চলে।

মলযা হেসে বলে, ওতে কী আসে যায। বুদ্ধি তো আছে—সাংসাবিক জ্ঞানবুদ্ধিও নিজে থেকেই গজাবে।

সে তো গজাবে কিন্তু কীভাবে গজাবে সেইটা তো ভাবনাব কথা।

বিয়েব পব সব ঠিক হয়ে যাবে।

বিয়েব ওই বিশেষ আসবটিকে সব চেয়ে বেশি সবগবম কবে বাখে, মানব আব অপর্ণা।

মানবেব চেয়ে বযস কিছু বেশিই হবে, বিয়ে হয়েছে। চন্দ্রা যে স্কুলে পড়ত এবং মন্দ্রা এখন যে স্কুলে পড়ে, সেই স্কুলেব শিক্ষিকা।

লেখিকা হিসাবে তাকে আবিষ্কাব কবাব গৌবব চন্দ্রা দাবি কবে থাকে। ক্লাসে একদিন অপর্ণা ছোটো একটি খাতা ফেলে গিয়েছিল, সেই খাতায ছিল মেয়েদেব জন্য তাব লেখা ছোটো একটি প্রবন্ধ।

লেখাটি পড়ে চন্দ্রা খাতাটি হাতে নিয়ে, অপর্ণাব কাছে গিয়ে বলেছিল, এ লেখা আপনাকে ফেবত দিচ্ছি না অপর্ণাদি। ভাবী সুন্দব হয়েছে লেখাটা—বাবাব কাগজে ছাপিয়ে দেব।

অপর্ণা সহজে বাজি হযনি। লেখা তো ছাপা হবেই না, মাঝখান থেকে মহেশ ভাববে যে সোজাসুজি নিজে চেষ্টা না কবে ছাত্রীকে দিয়ে বাজে লেখা ছাপিয়ে নেবাব চেষ্টা কবছে।

মিছামিছি কেন লজ্জা দেবে চন্দ্রা ?

আপনাব আবাব লজ্জা কী ?

চন্দ্রা একবকম জোব কবে লেখাটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে মহেশকে পড়তে দিয়েছিল। তাবপব অনেক লেখা বেবিয়েছে অপর্ণাব, বই বেবিয়েছে, নাম হয়েছে।

মাঝে মাঝে চন্দ্রা সগর্বে বলত, আমাব জন্য আপনি লিখতে শিখলেন অপর্ণাদি।

অপর্ণা বলত, না, তোমাব বাবাব জন্য। প্রথম লেখাটা ছেপেছিলেন বলেই তো আবও লেখাব উৎসাহ পেলাম।

প্রথম লেখাটা কে এনে দিয়েছিল বাবাকে? কে জোব করে বলেছিল লেখাটা ছাপতেই হবে? বললেই হল বাবাব জন্য।

অপর্ণা হেসে বলত, বাজে লেখা হলে তুমি ধবেছ বলেই বুঝি উনি ছাপতেন?

বাজে লেখা হলে আনতাম নাকি? লেখাটা ক্লাসে ফেলে গিয়েছিলেন, আমি পড়ে দেখলাম সুন্দব লেখা--নইলে কে জানত আপনি লিখতে পাবেন? আমি আপনাকে আবিষ্কাব করেছি।

অপর্ণা হেসে বলেছিল, আচ্ছা আচ্ছা, বই যদি ছাপি তোমাব নামে উৎসর্গ কবব।

প্রথম বইখানায় সত্যই সে চন্দ্রাব কাছে ঋণ স্বীকাব করে চন্দ্রাব নামে বইটি উৎসর্গ করেছে।

গল্প উপন্যাসেব চেয়ে মেয়েদেব জন্য লেখা অপর্ণাব ঘবোয়া প্রবন্ধগুলিব আদব হয়েছে বেশি।

মনস্তত্ত্ব এবং যৌনবিজ্ঞান ঘটিত ব্যাপাব পর্যন্ত, সে সবল সহজভাবে অল্পকথায় বুঝিয়ে দিতে পাবে।

ধনদাসেব কাগজে তাব লেখা ছাপানো নিয়ে মাঝে মাঝে একটু অসুবিধায় পড়তে হয় মহেশকে।

যৌন বিষয়েও এমন অনেব কথা সে সোজাসুজি লিখে বসে যে একটু অদলবদল না করে ছাপানো যায় না।

অপর্ণা বলে, দোষ কী? সোজা স্পষ্ট বলাই তো ভালো। এ সব বিজ্ঞানেব কথা বেখে ঢেকে ঘুবিয়ে পেঁচিয়ে বলতে গেলেই ববং নোংবা হয়ে যায়।

মহেশ বলে, কোন কাগজে লেখা যাচ্ছে সেটা হিসাব করে দেখতে হবে তো।

মানবও তাকে সমর্থন করে। বলে, নিশ্চয়ই। সোজা স্পষ্ট কথা শোনাটা আগে না শিখিয়ে হঠাৎ বলতে গেলে মানুষ চমকে যাবে না, ভড়কে যাবে না? সাধাবণ ঘবেব মেয়েবা দবকাব হলে সোজাসুজি অনেক কথা বলাবলি করে— আপনাব চেয়েও ববং গোটা গোটা করে বলে। কিন্তু তাদেব বলাব একটা ধবন আছে। আপনাব লেখাব ধবনটা একেবাবে অন্য বকম বলে তাদেব কাছে নোংবা ঠেকবে আপনি অনেক মার্জিতভাবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বললেও লাগবে।

অপর্ণাব সঙ্গে কথায় কথায় মানবেব তর্ক বাধে--কোনো বিষয়েই দুজনেব মতেব যেন মিল নেই।

আসলে কিন্তু তা নয়।

অনেক মূল বিষয়ে মতেব তাদেব তফাত থাকে না—তাবা তর্ক করে আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটি ব্যাপাব নিয়ে।

অপর্ণা তর্ক করুক তাব লেখাব কোনো কোনো জায়গা দবকাব মতো সংশোধন কবাব অনুমতি মহেশকে দেওয়া আছে।

আজও মানব আব অপর্ণা তর্ক জুড়ে দেয় - বিয়েব প্রীতি সম্মেলনেব আসবে মানানসই হবে এমনিভাবেই অবশ্য জুড়ে দেয়। বিষয়টাও হয় লাগসই —প্রেমেব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

অপর্ণা জহরকে বলছিল, কাজটা ভালো করলেন না। কবি-লেখকরা প্রেমে পড়বে, একবার ছেড়ে দশবার পড়বে, কিন্তু ভালোবেসে বিয়ে করা তো তাদের উচিত নয় !

কথাটা লুফে নিয়ে মানব হাসিমুখে বলে, সে কী কথা ! আপনি যে একেবারে উলটো গাইছেন ! শুধু কবি-লেখকদেরই বরং দশবার প্রেমে পড়ে দশটা বিয়ে করার স্পেশাল অধিকার থাকা উচিত— প্রত্যেকটা বউকে পুষবার জন্য স্পেশাল পেনশনের ব্যবস্থা থাকা উচিত। প্রেম ছাড়া বিয়ে হয়, কিন্তু বিয়ে ছাড়া প্রেমের মানে হয় ?

সকলে হাসে।

অপর্ণাও হেসে বলে, বোঝা গেল একেবারে ছেলেমানুষ রয়ে গেছেন। একবার প্রেমেও পড়েননি, একবার বিয়ে করার মজাও টের পাননি—আইন করে আপনাকে লিখতে না দেওয়া উচিত ! প্রেম আর বিয়েতে যে, তেল আর জলের মতো খাপ খায় না, দুটো একেবারে বিপরীত ব্যাপার, এটুকু না জেনেই কলম ধরেছেন !

প্রৌঢ় লেখক অনিমেষ মন্তব্য করেন, ঠিক কথা ! নইলে ওর লেখা অমন কড়া হয়—গল্প-উপন্যাস দিয়ে বিপ্লবের চেষ্টা চালায় !

চন্দ্রার বান্ধবী সন্ধ্যা বলে, আমরা প্রতিবাদ করছি—ওঁর লেখায় সত্যিকারের বাস্তব প্রেমের অনেক গন্ধ আছে। আপনাদের ফেনানো প্রেমের গল্পের চেয়ে ওঁর প্রেম ঢের বেশি জোরালো। চুপ করে গেলে চলবে না মানুবাবু, অপর্ণাদির কথার জবাব দিতে হবে ! আমরা শুনতে চাই।

মানব হাসিমুখে চারিদিকে তাকিয়ে বলে, উনি তামাশা করে কথাটা বলেছেন। নইলে মনোবিজ্ঞান নিয়ে, যৌনবিজ্ঞান নিয়ে এত লিখেছেন, উনি কি সত্যি জানেন না, তেল আর জলের মতো বিপরীত বলেই প্রেম আর বিয়ের মধ্যে, একটা বাদ দিয়ে আরেকটার মানেই হয় না ?

প্রৌঢ় অনিমেষ আমোদে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, দেখলে তো, ডায়ালেকটিকস ঠিক টেনে এনেছে !

সকলে সশব্দে হেসে ওঠে।

আসর যখন এমনিভাবে হাসি-আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছে তখন এসে দাঁড়ায় উমাকান্ত।

হাসি কথা একেবারে থেমে যায়। পুতুলের শোচনীয় মরণের বিবরণ প্রায় সকলেরই জানা ছিল না, অনেকের এটাও জানা ছিল যে ভেবে-চিন্তে উমাকান্তের দিক বিবেচনা করেই তাকে মহেশ আহ্বান জানায়নি।

মহেশ অভ্যর্থনা জানিয়ে বলে, এসো উমাকান্ত, বসো !

উমাকান্ত শান্তভাবেই বলে, বসা উচিত নয়, তবু বসব। চন্দ্রার বিয়েতে আমি একটা নিমন্ত্রণ পেলাম না !

মহেশ অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে বলে, কী জানো, আমরা ভাবলাম এই সেদিন—

মহেশ থেমে যায়। উমাকান্ত বসে এবার একটু হাসে—সত্যই হাসে ! বলে—জানি, আমার মানসিক অবস্থা বিবেচনা করেই আমায় বলেননি। তাই তো যেচে এলাম।

তার মাথার ব্যান্ডেজ তখনও খোলা হয়নি।

৫

মাস ছয়েক কেটেছে চন্দ্রার বিয়ের পর।

চন্দ্রা কিছুদিন বাপের বাড়ি থাকতে আসে। জহর নিজেই তাকে পৌঁছে দিয়ে যায়—সকালে। সারাদিন থেকে, মন্দ্রার সঙ্গে মিষ্টি ইয়ার্কির লড়াই চালিয়ে, জামাই-আদর ভোগ করে, বিকালে সে বিদায় নেয়।

সকলের কাছ থেকেই দুটো দিন থেকে যাবার অনুরোধ আসে। কিন্তু জহরের নাকি জরুরি কাজ, থাকার উপায় নেই।

মন্দ্রা মিনতি করে বলে, কবির আবার জরুরি কাজ থাকে নাকি জামাইবাবু ? আচ্ছা বেশ দুদিন না থাকতে পারেন, আজকের রাতটা শুধু থেকে যান !

বলে সে একটু মুচকে হাসে, বউ থাকবে যেখানে, সেখানে দিনটা কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলা কি চলে যেতে আছে ? এটুকু বুদ্ধিও নেই ? কাল সকালে যাবেন। দুপুরের জামাই-ভোজ না খেতে চান— সকালে চা খাবার খাইয়ে ছেড়ে দেব।

জহর হেসে বলে, তোমার সঙ্গে এক বাড়িতে রাত কাটাতে বলছ ? জানই তো নিজেকে সামলাতে পারব না, রাতদুপুরে চুপিচুপি ঘুম ভাঙাতে যাবই—দিদি দিদি, চোর চোর, বলে চেঁচিয়ে আমার দফাটি সারবে। বেশ মতলব করেছ জব্দ করার !

কথা দিচ্ছি চেঁচাব না, চুপ করে থাকব।

এখন আর কথা দিয়ে লাভ কী ? তোমার দিদি তো শুনে ফেলল, ও কি আর রাত্রে ঘুমোবে ভেবেছ ? সারারাত জেগে পাহারা দেবে।

ছ-মাসের মধ্যে নানা উপলক্ষে এবং বিনা উপলক্ষে কয়েকবার চন্দ্রা দু-চারদিনের জন্য বাপের বাড়ি এসে থেকে গিয়েছে—নিজের শাড়ি গয়নার সৌভাগ্যে বেশ একটু লজ্জিতভাবেই যেন এসেছে।

মন্দ্রার জন্য প্রতিবার দামি শাড়ি আর আর অন্য নানারকম উপহার নিয়ে এসেছে।

এবার [illegible] যেন একটু কেমন কেমন ভাব !

মন্দ্রার জন্যও এবার সে কিছুই আনেনি।

সন্ধ্যার পর মলয়া বুটি সেঁকে, মন্দ্রাকে সরিয়ে দিয়ে চন্দ্রা বুটি বেলে দিতে বসে।

মলয়া বারবার তাকায় মেয়ের দিকে, বারবার একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে থেমে যায়।

চন্দ্রা বলে, পোড়া পোড়া করছ কেন বুটি ?

খুন্তি দিয়ে চাটুতে বুটি দুটো উলটে দিতে দিতে মলয়া বলে, মা-র কাছে কিছু লুকোতে নেই জানিস তো ?

লুকোচুরির কী আছে ?

চাটু নামিয়ে রেখে মেয়েব সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে বসে মলয়া বলে, কিছু হয়নি তো ? কোনো রকম গন্ডগোল করে আসিসনি তো ? বেঘবে বেখাপ্পা জামায়ে পড়েছিস, তোর জন্যে ভেবে ভেবে রাত্রে আমার ঘুম হয় না !

চন্দ্রা মুখ তোলে না। বুটি বেলতে বেলতেই বলে, কিছু হয়নি, কিছু হয়নি, কিছু হয়নি ! নিশ্চিন্ত হয়ে রাতে ঘুমিয়ো। একটা কী বিষম রকমের বই লিখবে, শুধু লেখা নিয়ে দিনরাত মেতে থাকতে হবে, তোমার মেয়ের দিকে মন গেলে, শুধু বই লেখা নিয়ে মাতা যাবে না—তাই দু-একমাসের জন্য তোমার মেয়েকে বাপের বাড়ি বেড়াতে পাঠিয়েছে।

মলয়া খানিকটা স্বস্তি পায়, একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। মুখভার করে বলে, বাবা, বই লেখার জন্য বউকে বাপের বাড়ি পাঠাতে হয় !

মন্দ্রা বলে, কবি-জামাই এনেছ ভুলে যাও কেন ? কবিদের কখন কোন ভাব, কখন কোন ঠাট, তার কি কিছু ঠিক আছে ?

ছ মাস কেটে যায়।

চন্দ্রাকে নেবার কথা তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরাও বলে না, জহরও বলে না।

জহর মাঝে মাঝে আসে—সকালের দিকে। সারাদিন থাকে, মন্দ্রার সঙ্গে হাসি-তামাশা চালায়, যথারীতি জামাই-আদর ভোগ করে, বিকালে কিংবা সন্ধ্যার পর বিদায় নিয়ে চলে যায়।

তার জরুরি কাজ আছে।

মন্দ্রা বলে, আচ্ছা বেশ, তাই সই, আর ক দিন লাগবে কাজটা চুকতে ? যদ্দিন লাগুক, আরও একটা দিন নয় বেশি লাগাবেন। বাড়াবাড়ি করবেন না জামাইবাবু !

জহর অন্যমনে কী ভাবে।

মন্দ্রা রেগে বলে, আপনার কোনো বুদ্ধি-বিবেচনা নেই। হয় আপনি ছেলেমানুষ, নয় গোমুখ্যু। জামাই আসে, রাতে না থেকে চলে যায়—মা বাবার কী রকম লাগে বোঝেন না ? আত্মীয়বন্ধু পাড়া প্রতিবেশীরাই কী ভাবে ? দিদির কথা নয় বাদ দিলাম- আপনাদের মধ্যে কী হয়েছে আপনারাই জানেন, দিদিকে শাস্তি দিচ্ছেন বুঝতে পারছি।

জহর তাড়াতাড়ি বলে, না না, শাস্তি কেন দেব ?

মন্দ্রা আরও রেগে বলে, এভাবে আসেন কেন তবে ? রাত্রে থাকতে না পারলে আর আসবেন না।

জহর বলে, তাই বটে, এ দিকটা তো আমার খেয়াল হয়নি ! সবাই যে নানারকম ভাববে মনেই পড়েনি একেবারে।

মন্দ্রা ব্যঙ্গ করে বলে, তা মনে পড়বে কেন, আকাট মুখ্যু কবি যে !

জহর একটু হেসে বলে, আচ্ছা বেশ, বুদ্ধিমতী শালির কথাই মানলাম, আজ থেকে যাচ্ছি। এবার থেকে যেদিন আসব থেকে যাব।

খুশির সীমা থাকে না মন্দ্রার।

সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, এই তো লক্ষ্মীছেলের মতো কথা ! বইটা শেষ হতে কদ্দিন লাগবে বললেন না তো !

তা কি বলা যায় ? লেখার কাজের কিছুই ঠিক থাকে না।

পরদিন চন্দ্রার মুখখানা ম্লান দেখায়। জহর তখনও ঘুমোচ্ছিল। অনেক দিন পরে স্বামীর সঙ্গে রাত কাটিয়েছে, রাত জাগার জন্য মুখ শুকনো দেখাতে পারে, ম্লান দেখাবে কেন ?

সকলের তাকাবার রকম দেখে দেখে চন্দ্রা নিজে থেকেই বলে, বই লেখা সত্যি বড়ো বিশ্রী কাজ। কেমন অন্যমনস্ক ভাব, সারারাত উশখুশ করেছে, ঘুমোতে পারেনি – প্রায় শেষরাত্রে ঘুমিয়েছে। একটা কিছু অসুখ-বিসুখ না হয়ে যায় !

মন্দ্রা একসময় চন্দ্রাকে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করে, কী রকম অন্যমনস্ক ভাব দিদি ? তোকে বুঝি আদর-টাদর করেনি ?

আরে না, ও সব নয়। কতবার তো বলেছি আমাদের মধ্যে ও সব গোলমাল কিছু হয়নি। বই লেখা নিয়ে হয়েছে যত ঝঞ্ঝাট।

দিন সাতেক পরে শনিবার বিকালে ছোটো একটি সুটকেস নিয়ে জহর আসে এবং দু-রাত্রি থেকে যায়।

পরদিন সকালে আরও শুকনো, আরও ম্লান দেখায় চন্দ্রার মুখ।

মেজাজও যেন একটু খিটখিটে হয়ে গেছে।

কালও ঘুম হয়নি জহরের ?

ঘুমিয়েছে—ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়েছে।

ওষুধটা যে মদ সে কথা চন্দ্রা আর খুলে বলে না।

জহর মাঝে মাঝে আসে দু-একটা দিনরাত্রি থেকে চলে যায়—কিন্তু এতটুকুতে কেউ খুশি নয়।

প্রায বছব পূর্ণ হতে চলল ভালোবেসে বিয়ে কবা বউকে বই লেখাব অজুহাতে বাপেব বাড়ি ফেলে বেখেছে –এ কী অদ্ভুত ব্যাপাব।

চন্দ্রা শুকিযে যাচ্ছে, দিন দিন আবও খিটখিটে হযে উঠেছে তাব মেজাজ।

মন্দ্রাব উপবেই তাব মেজাজটা যেন বেশি বকম বিবূপ।

মন্দ্রা যে অশান্ত তডবডে মেয়ে এটা যেন তাব সহ্য হচ্ছে না, উপদেশ দিয়ে ধমক দিয়ে শাসন কবে, সে যেন তাব প্রকৃতি সংশোধন কবতে উঠে পডে লেগেছে।

মন্দ্রাব মেজাজও বিগডে যায়, দুই বোনে উঠতে বসতে ঝগডা বাধে।

চন্দ্রা বলে, আগেকাব দিনকাল নেই জানিস তো ? এভাবে বিগডে যাস নে ছোটোবোনটি আমাব।

এভাবে বোলো না দিদি। ছোটোবোনটিকে অন্য সময আদব কোবো। যা বলতে চাও—সোজা কবে স্পষ্ট ভাষায বলো।

কেন তুই যখন-তখন বাইবে চলে যাবি, হইচই কবে বেডাবি, পডাশোনায মন দিবি না ? বডো হসনি ? এত অবাধ্য হবি কেন ?

তুমিই বলো কেন ? এত উপদেশ ঝাডবে কেন তুমি ? মা বাবা থাকতে আমাব জন্য তোমাব এত মাথাব্যথা কেন ? এত টাকা খবচ কবে বাবা তোমাব বিযে দিলেন, এখনও দেনা শোধ দিতে পাবেননি জামাইবাবু কেন তোমায নেয না, কেন বাপেব বাড়ি ফেলে বাখে ? আমাব পিছনে না লেগে, এ [illegible] কেন নিয়ে মাথা ঘামালেই হয।

সশব্দে গালে চড পডত।

মন্দ্রা জানত, তাই দুহাতে দিদিব হাতটা পাকডে নিয়ে ঠোঁট উলটে বলে, মন খুলে যদি কথাই না কইতে পাবিস, এত উপদেশ ঝাডতে কেন আসিস দিদি ?

হাত ছাড।

গালে চড মাববি না, বললেই ছাডব।

চড মাবব না।

মন্দ্রা দিদিব হাত ছেডে দেয।

বলে, দিদি, কেন এত বকিস ? কেন এত উপদেশ ঝাডিস ? আমাবও তো তোব মতো দশা হবে দু চাববছব পবে।

সন্ধ্যাব পব মাঝে মাঝে মহেশেব বাড়িতে কয়েকজন লেখক লেখিকাব ছোটোখাটো বৈঠক বসে।

মানব ও খালেকও কোনো কোনো দিন উপস্থিত থাকে।

নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনায, শিল্প-সাহিত্য নিয়ে তর্ক বিতর্কে বৈঠক জমজমাট হয়ে ওঠে শুধু চুপচাপ বিষণ্ণ উদাস মুখে বসে থাকে চন্দ্রা – অবশ্য স্বেচ্ছায সেদিন সে বৈঠকে হাজিব থাকে।

খানিক বসে থেকে ঠিক যেন বিবক্ত হয়েই উঠে যায। অন্য ঘবে একা একা সে কী কবে কে জানে।

সাহিত্য সম্পর্কে তাব বিতৃষ্ণা প্রকাশ পায খুব স্পষ্টভাবেই।

কবি জহবেব স্ত্রী, পবস্পবকে পছন্দ কবে তাদেব ভালোবাসাব বিয়ে—সাহিত্য প্রসঙ্গ উঠলে তাব কিনা জাগে বিতৃষ্ণা।

অপর্ণা একদিন সোজাসুজি মহেশকে জিজ্ঞাসা কবে, চন্দ্রাব ভাবসাব এ বকম কেন ? ওব কী হয়েছে ?

তখন কেবল মানব উপস্থিত ছিল।

কে জানে কী হয়েছে ! কিছুই বুঝতে পারি না—নিজেও কিছু বলে না।

অনেক দিন এসে রয়েছে, না ?

ন-দশমাস হল।

জহরবাবু নিতে চান না ?

তেমন তাগিদ দেখছি না। বড়ো ভাবনায় পড়েছি মেয়েটাকে নিয়ে। নেমন্তন্ন করলে তো আসেই, জহর নিজে থেকেও মাঝে মাঝে আসে, দুজনে দিব্যি কথাবার্তা বলে, কিছুই বোঝা যায় না। জহর বলে একটা জরুরি কাজের নাকি খুব চাপ পড়েছে।

অপর্ণা একটু চিন্তা করে বলে, ঝগড়াঝাঁটি হয়নি মনে হয়—কোনো ভুল বোঝার পালা চলছে !

মানব এতক্ষণ মুখ বুজে ছিল, এবার সে বলে, ভুল বোঝা নয়—অমিল। বিয়ের আগে ভুল বোঝা ছিল, এখন সেটা অমিল দাঁড়িয়েছে।

অপর্ণার মুখের ভাব দেখে মানব একটু লজ্জা পায়, বলে আমার অবশ্য এ সব বিষয়ে কিছু বলা সাজে না—

অপর্ণা বলে, সাজে—তবে অভিজ্ঞতা নেই কিনা তাই ভুল বোঝা আর অমিলে তফাত করে বসছেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝা মানেই অমিল। ছোটোখাটো বিষয়ে অমিল থাকলে এসে যায় না—বরং থাকাই ভালো, আসল মিলটা তাতে আরও জমে। বড়ো ব্যাপারে বা গোড়ার ব্যাপারে অমিল থাকলেই মুশকিল হয়। কিন্তু চন্দ্রার তো জানা উচিত কোথায় মিলছে না ?

মহেশ চিন্তিতভাবে বলে, চন্দ্রা ঠিক করে কিছুই বলতে পারে না। ইচ্ছা করে বলে না কি না কে জানে ! শুধু বলে যে কোনো রকম মনোমালিন্য হয়নি, কিছুই ঘটেনি, আপনা থেকে জহর নাকি কেমন বদলে গেছে, কেমন একটা ছাড়া-ছাড়া ভাব এসেছে। সেটা অবশ্য আমরাও বেশ ধরতে পারি বুঝতে পারি।

চন্দ্রা কি জহরকে অনাদর করে ?

মহেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

যার আদর কমে যাওয়ায় মেয়েটা শুকিয়ে যাচ্ছে, খিটখিটে মেজাজ হয়েছে, তাকে অনাদর করে বলি কী করে ? এখন আর তেমন নেই কিন্তু আগে জহর এলে খুব খুশিই হত। জহরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—সেও ঠিক চন্দ্রার কথাই বলে। কিছুই নাকি ঘটেনি, চন্দ্রাই নাকি কী রকম বদলে গেছে—কেমন একটা ছাড়া-ছাড়া ভাব এসেছে।

অপর্ণা বলে, এ তো ভারী সমস্যার কথা হল ! এ বলে ওর ছাড়া-ছাড়া ভাব এসেছে, ও বলে এর ছাড়া-ছাড়া ভাব এসেছে। তাহলে আর সন্দেহ কি যে একটা গুরুতর ভুল বোঝার পালা চলেছে ?

মানব বলে, আমি আবার মুখ খুললাম। এ রকম না হলে আর সমস্যা থাকত কীসের ? আমি খানিকটা ব্যাপার বুঝেছি। খুব মোটা আর বাস্তব ব্যাপারে অমিল দেখা দিয়েছে—বোঝাপড়া করে নিতে দুজনে লজ্জা পাচ্ছে, ভয় পাচ্ছে। দুজনেই ভাবছে, যদি আরও খারাপ হয়, যদি আরেকজনের মন আরও বিগড়ে যায় !

অপর্ণা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মানবের মুখের দিকে তাকায়, একটু বিস্ময়ের সঙ্গে বলে, আপনার বয়স বেশি নয়, বিয়েও করেননি—আপনি এত সব জানলেন কী করে ?

এ সব জানা আর কঠিন কী ? দুজনেই রোমান্টিক প্রকৃতির, গোড়ায় দিব্যি মিল ছিল, ধীরে ধীরে অমিল দেখা দিল। এ বলে ও বিগড়ে গেছে, ও বলে এ বিগড়ে গেছে---দুজনের একটা বাস্তব সম্পর্কের ব্যাপার ছাড়া এ রকম হতে পারে ?

অপর্ণা সোজা প্রশ্ন করে বসে, কী ধরনের বাস্তব সম্পর্কের কথা বলছেন ?

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক—স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক ! ঠিক কীভাবে কী অবস্থা দাঁড়িয়েছে অনুমান করা যায় না—কিন্তু এটুকু বোঝা যায় যে এই সম্পর্ক নিয়ে দুজনের ধারণা দুরকম, কিছুতে খাপ খাচ্ছিল না। দুজনেই কিছুদিন তফাতে থেকে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করবে ভাবছিল। জহর চন্দ্রাকে এখানে রেখে গেছে, চন্দ্রাও আপত্তি করেনি। জহর আর এখন নিয়ে যাবার কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না, চন্দ্রাও কিছু বলতে পারছে না। এখন তবু ভাবটা আছে, খোলাখুলি ঝগড়া নেই—দুজনেই ভয় পাচ্ছে, একটা যদি বিশ্রী রকম মনোমালিন্য হয়ে যায়, সম্পর্কটা আরও বিগড়ে যায়।

অপর্ণা একটু ভেবে মানবকে বলে, আমি এদিকে চন্দ্রার সঙ্গে কথা বলে দেখি, আপনি জহরবাবুর সঙ্গে আলাপ করুন না ? মহেশবাবুকে সব খুলে বলতে জহরের সংকোচ হয়েছে, আপনাকে হয়তো খুলে বলতেও পারেন আসল ব্যাপারটা কী।

চটে গিয়ে চড়িয়েও দিতে পারেন !

সেভাবে বলবেন কেন ? এই বয়সে সংসার এত বোঝেন, একটু কায়দা করে আলাপ করতে পারবেন না ? আপনাদের জানাশোনাও তো কম দিনের নয়। খুলে বলতে না চাইলেও কথাবার্তা থেকে খানিকটা হয়তো বুঝতে পারবেন।

মন্দ্রা কখন এসে চুপচাপ আড়ালে বসে পড়েছিল, কেউ খেয়াল করেনি। হঠাৎ সে ফোঁস করে ওঠে, অনাদর ? অনাদর না ছাই। দিদিই বরং আমল দেয় না জামাইবাবুকে।

মহেশ বলে, তুই এখানে কেন ? এ সব কথায় কেন ?

মন্দ্রা বলে, আমি জানতে বুঝতে চাই। দুদিন বাদে আমারও তো দিদির মতো দশা হবে।

এর পরে আর কথা নেই। মন্দ্রার অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করেই তাদের কথা চলে।

চন্দ্রার সঙ্গে কথা বলে অপর্ণা খানিকটা ধরতে পারে কিন্তু ঠিক কী ব্যাপারটা যে চলছে দুজনের মধ্যে বুঝতে পারে না।

হাসিমুখে একটু তামাশার সুরে সে জিজ্ঞাসা করে, একসঙ্গে শোয়া হত না দুজনের ?

চন্দ্রার মুখ লাল হয়ে যায়।

হত না ? কী যে বলেন !

তুমি জান না ভাই, ওই নিয়েই কত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মন কষাকষি দাঁড়িয়ে যায়—আমার নিজের বেলা ঘটেছিল কিনা, আমি জানি। একটু থেমে একটু হেসে আবার সে জিজ্ঞাসা করে, শুধু ভদ্রতা বজায় একসঙ্গে শোয়া হত না তো ?

ধেৎ !

তবে ? অপর্ণা ভাবনাচিন্তায় কূলকিনারা পায় না। কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেছে মেয়েপুরুষের সম্পর্ক নিয়ে—রক্তমাংসের দুটো মেয়েপুরুষের সম্পর্কের গন্ডগোল বুঝতে তার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে ! কেন তবে এমন অমিল মাথা তুলেছে দুজনের মধ্যে যে, পরস্পরকে ভালোবেসেও দুজনে তফাতে সরে আছে—মন্দ্রার ধমকানি খাওয়ার আগে, শ্বশুরবাড়ি এসে একটা রাত কাটাতেও জহর ছ-সাতমাস রাজি হয়নি ?

আগে জহরবাবু এলে রাত্রে থাকতে চাইতেন না কেন ?

আমি কি জানি ওর কী হয়েছে ?

থাকতে বলতে না ?

বলতাম না ? সবাই বলত, আমিও বলতাম। একটা নাকি বড়ো বই ধরেছে, রাত জেগে লিখছে—মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছে বইটাতে। এটা নাকি ওর সেরা বই হবে।

ছাই হবে। বউয়ের জন্য এদিকে প্রাণ খাঁখাঁ করছে চব্বিশ ঘণ্টা, সেরা বই লেখা হবে !

চন্দ্রা ম্লান হেসে বলে, তাই নাকি হচ্ছে, আমি কাছে না থাকাতেই হচ্ছে। আমার জন্য খুব ব্যাকুলতা জাগে, লিখতে বসলে ওটাই নাকি লেখার ঝোঁক দাঁড়িয়ে যায়, তরতর করে কলম চলে।

হতেও পারে ! লেখকদের কত রকম পাগলামিই যে থাকে। একটু ছিট না থাকলে বোধ হয় লেখক হওয়া যায় না।

আপনিও তো লেখিকা !

আমি তো গল্প-উপন্যাসও লিখি রসালো প্রবন্ধের মতো করে ! কাজের কথা, দরকারি কথা লিখি।

তফাত কী ?

এ তফাতটুকুও বোঝ না ? আমি কি কবিতা লিখি ? আমি লিখি প্রবন্ধ।

মানব ভেবে চিন্তে জহরের সঙ্গে কায়দা করে কথা বলার চেয়ে সরলভাবে সোজাসুজি কথা বলাই ভালো মনে করে।

সুযোগ জোটে কয়েক দিন পরেই। বইয়ের দোকানে জহরের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়।

চা খাওয়াবেন চলুন !

চায়ের দোকানে বসে বলে, আমরা দুজনেই লেখক কবি আমাদের মধ্যে কথার মারপ্যাঁচ চলবে না কিন্তু। সোজাসুজি বলি। মহেশবাবুর বাড়ির সকলে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। আপনার স্ত্রীর মুখে তো কেউ হাসি দেখতেই পায় না। কী রকম রোগা হয়ে গেছে সে তো আপনি মাঝে মাঝে গিয়ে নিজের চোখেই দেখে আসেন।

জহরের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়, সে ঠোঁট কামড়ায়। মানব একটু ভড়কে গিয়ে ভাবে, সেরেছে ! শুরুতেই চটে গেল নাকি !

সে আবার বলে, যদি কিছু হয়ে থাকে— মিটমাট করে নিন না ? চন্দ্রা আমার বোনের মতো, আরও যদি জের টেনে চলেন ও বেচারা ভেঙে পড়বে, সাংঘাতিক কিছু করে বসবে। চোখের সামনে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আর দু একমাসের বেশি টানতে পারবে না, বিশ্রী কিছু করে বসবে। হয়তো খবরের কাগজেও ছাপা হয়ে যাবে।

মানব ভান করেনি, বলতে বলতে তার মুখ এমন ভীষণ রকম গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল যে চেয়ে দেখে জহর হঠাৎ কিছু বলতে পারে না।

মানব বলে, জানেন তো আমি চ্যাংড়ামি পছন্দ করি না ! আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার— তার মধ্যে আমার যে নাক গলানো চলে না সেটা আমি খুব ভালো করে জানি। এত দিন তাই চুপচাপ ছিলাম। কিন্তু চন্দ্রা এবার সাংঘাতিক কিছু করে বসবেই জেনে একেবারে মরিয়া হয়ে নাক গলাতে চাইছি—আপনি নয় দুটো গাল দেবেন, তবু চেষ্টা তো করা যাক বিপদ ঠেকাবার। যাই হয়ে থাক, আমাদের খুলে বলুন, মিটিয়ে দিচ্ছি। গোলমালটা কী নিয়ে ?

জহর মাথা নাড়ে, গোলমাল কিছু নয়, আপনারা বুঝবেন না, মেটাতেও পারবেন না।

চায়ের কাপে একবার চুমুক দিয়ে বলে, আমরা লেখক কবি—সোজাসুজি কথা বলব বলছিলেন ? তাই বলছি। যদি বলেন গোলমাল গোলমালটা আমার স্বভাবের। দোষটা আমার—আমার প্রকৃতির। চন্দ্রাকে কাছে রাখতে আমার ভয় করে—কবে মন ভেঙে দেব, সারাজীবনের মতো সর্বনাশ হয়ে যাবে। নিজের স্বভাবটা একটু শুধরে নেবার চেষ্টা করছি।

কবি কিনা, উঁচুস্তরের প্রেমের কথা লিখি, স্বভাবটা তাই দাঁড়িয়েছে উলটো। সংযমের বালাই নেই, একটু ভদ্র আর সংযত থাকতে প্রাণ বেরিয়ে যায়।

ও !

সবাই ভাবছে, আমিই বুঝি খেয়ালের ঝোঁকে চন্দ্রার মনে কষ্ট দিচ্ছি। আমার দোষ আমি বুঝি — মোটেই এটা খেয়াল বা পাগলামি নয়। মনটা একেবারে বিগড়ে যাওয়ার চেয়ে এ অনেক ভালো। মাঝে মাঝে যাই, চিঠিপত্র লিখি, জানাবার চেষ্টা করি যে আমার ভালোবাসা একটুও কমেনি— ও আমার কাছে না থাকার জন্য বইটা ভালো হচ্ছে, ওর জন্য প্রাণের ছটফটানি লেখার প্রেরণা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আসলে কিন্তু উপন্যাস লিখতেই পারছি না—তবে কয়েকটা গল্প খুব উতরে গেছে। এ রকম গল্প আগে কখনও লিখতে পারিনি।

জহর একটু হাসে।

উতরে গেছে মানে আমার স্ট্যান্ডার্ডে উতরে গেছে। ওকে একটু খুশি রাখার জন্য বড়ো বই লেখার কথা বলে এসে এখন পড়েছি মহা বিপদে। যদি একদিন এসে দেখতে চায় বই কতটা লিখেছি, কী রকম লিখেছি মুশকিলে পড়ে যাব।

মানব তার মুখের ভাব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করছিল, জহরের মুখে উদ্ধত ভাবের চরম নির্বিকারতা। সে যে বিনীত আর সংযতভাবে কথা বলছে, সেটা যেন তারই উদারতা।

মানব ধীরে ধীরে বলে, কিন্তু চন্দ্রাকে তো সে রকম কোল্ড টাইপের স্ত্রী বলে মনে হয় না ! তাছাড়া সংযম নিয়ে কী এত ভাবনা আপনার ? বিয়ের পর কিছুদিন একটু বাড়াবাড়ি হলে কী এসে যায় ? আপনা থেকেই সামঞ্জস্য হয়ে যায়। আমি নিজে অবশ্য বিয়ে করিনি, কিন্তু পাঁচজন বন্ধুর কাছে শুনি তো ব্যাপার সব ! স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারের বিজ্ঞানটা তো পড়েছি তন্নতন্ন করে। অভিজ্ঞতার অভাবও নেই—ঘরসংসার পেতে বসার আয়োজন করিনি—শুধু এইটুকু।

জহর মাথা নাড়ে, আমার ব্যাপার জানেন না।

জানিয়ে দিন না ?

চন্দ্রা কোল্ড নয় -নর্ম্যাল। আমি মানুষটাই নীচ।

নীচ ! প্রেমের ব্যাপারে চন্দ্রার তুলনায় নিজেকে জহর নীচ মনে করে। ব্যাপার তো তবে সহজ নয় !

বিয়ের পর বুঝি নিজেকে অ্যাবনর্ম্যাল মনে হয়েছে—আগে একেবারে কিছুই জানতেন না ?

না —ঝোঁকটা ছিল মানসিক, ভাবতাম এটা আমার তেজি পুরুষত্বের লক্ষণ। অসংমের ঝোঁকটা এত জোরালো জানলে বিয়ের আগেই নিজেকে শুধরে নেবার চেষ্টা করতাম। এ রকম ঝঞ্ঝাট হত না।

চায়ের দোকান—ভিড়ের সময় না হলেও পাশেপাশে দু-চারজন লোক আছে। একটু নিচু গলায় কথা বললেও যেভাবে যে সুরে সে কথা বলে, যেভাবে আবেগে তার গলা কেঁপে যায়, তাতে তার মনের অবস্থা বুঝতে কষ্ট হয় না মানবের।

চন্দ্রাকে খোলাখুলি বললেই পারেন ? একা একা নিজেকে শুধরোবার চেষ্টা না করে দুজনে মিলেমিশে পরামর্শ করে, করলে আরও ভালো হয় না ? স্বামীর যদি কোনো অসুখ থাকে, স্ত্রী নিজের গরজেই সেটা সারাতে প্রাণ দিয়ে সাহায্য করবে।

জহর মাথা নাড়ে--আজ বললে বুঝবে অন্য রকম। নিরুপায় হয়ে হয়তো সয়ে যাবে, সাহায্যও করবে—কিন্তু একবিন্দু শ্রদ্ধা কি আর থাকবে আমার ওপর ? ভদ্রঘরের মেয়ে, একটা রুচিবোধ আছে—আমার প্রকৃতি কী রকম জঘন্য, কী রকম পশুর মতো ওকে চাই--জেনে আর কি আমায় মানুষ ভাবতে পারবে ?

মানব ধীরে ধীরে বলে, বুঝলাম ব্যাপার। আমি যদি বলি এর মধ্যে অনেকটাই আপনার কল্পনা, আপনার কিছুটা দোষ থাকলেও আসল দোষটা আপনার স্ত্রীর—আপনি নিশ্চয় চটে যাবেন ! না, দোষ বলব না—আপনারও দোষ নেই, চন্দ্রারও দোষ নেই। আপনারা শুধু ভুল করেছেন। সামলে নেবার জন্য যে চেষ্টা আপনারা করেছেন তার প্রশংসা করতে হয়, ভুল উপায়ে করলেও সিরিয়াসলি চেষ্টা করাটাই মস্ত বড়ো গুণের কথা। খেয়োখেওযি না করে আপনারা দুজনেই সমাধান খুঁজছেন।

জহর বলে, বিয়ে করলে, আমার মতো ধাত হলে, টের পেতেন। প্রাণপণে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করে এসেছি, তবু যেটুকু টের পেয়েছে তাতেই চন্দ্রা ভড়কে গিয়েছিল। সাধে কি তাড়াতাড়ি ওকে বাপের বাড়ি সরিয়ে দিয়েছি ?

বেশি ড্রিঙ্ক করছেন শুনলাম ?

একটু সামলে নিচ্ছি !

মানব মনে মনে বলে ড্রিঙ্ক করার জন্যই যে ড্রিঙ্ক করে সে নিজেকে সামলাতে পারে না, এ অবস্থায় নিজেকে সামলাবার জন্য ড্রিঙ্ক করে তুমি নিজেকে সামলাবে !

মানব জানে, লেখকের বিশেষ অবস্থার দু-একচুমুক ড্রিঙ্ক দরকাব হয়, ওযুধেব মতো দরকার হয়—সকলের অবশ্য নয়।

এ এমন ধরনের কাজ যে তার সঙ্গে মানুষটার ধরনের একটা যোগাযোগ ঘটলে মাঝে মাঝে স্নায়ুমণ্ডলীর অবস্থা, ব্রেনের অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, ডাক্তাবি শাস্ত্রের হিসাবনিকাশের বাইরের একটা অদ্ভুত কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র সহজ উপায় হল দু-একচুমুক খাওয়া।

এ অবস্থাটা আসে অনিয়মিতভাবে, ওষুধের মতো খেলে অভ্যাস জন্মে যাবার কারণ থাকে না।

লেখার জন্য নেশা দরকার হয়—এটা স্রেফ বাজে কথা। নেশা কোনো কাজেই লাগে না লেখার। কোনো লেখক যদি নিয়মিত নেশা করে--অন্য পাঁচজনের মতো নেশার জন্যই করে।

সারা সপ্তাহ দেহ ক্ষয় করে খেটে হপ্তা পাবাব দিন, কলকারখানার কোনো কোনো নিরক্ষর মজুর যে কারণে দু-একজন সাঙাতের সঙ্গে এক-দেড়টাকার বেশি খেয়ে পরদিন বুকভরা আপশোশ নিয়ে ঘুম থেকে জাগে !

৬

সামান্য সাধারণ তুচ্ছ ছোটো ছোটো বিষয়ে ভুল ধারণাই পিছানো দেশের মানুষের ক্ষতি করে বেশি।

সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে জেনেও মানুষ পরম সুখে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে, কিন্তু শিশুকে টিকা দিতে নেই এ কথা জানার ফলে অনেক ভবিষ্যৎ জীবন আরম্ভ হতে না হতে শেষ হয়ে যায়। বড়ো বড়ো নামকরা রোগে মানুষ যত না ভোগে আর মারা যায়, স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ খুঁটিনাটি ব্যাপার সম্বন্ধে ভুল ধারণার ফলে তার চেয়ে অনেক বেশি লোক, অনেক কাল ধরে অনেক বেশি কষ্ট পায় আর অকারণে অকালমৃত্যুকে বরণ করে নেয়।

জীবনের খুঁটিনাটি ছোটো ছোটো বিষয়ে ভুল ধাবণাই মানুষের জীবনে অশান্তি সৃষ্টির সব চেয়ে বড়ো কারণ।

বড়ো বড়ো ব্যাপারে হাল ধরে আছে বড়ো বড়ো মানুষেরা, ছোটোখাটো সাধারণ মানুষকে বড়ো ভুল করার সুযোগ তারা দেয় না। বড়ো ভুল করাটা তাদেরই একচেটিয়া অধিকার।

বড়ো বড়ো ভুল সংসারে ক-জন মানুষ ক-বার করে ? অসংখ্য দৈনন্দিন ছোটো ছোটো ভুল মানুষ হরদম করে চলেছে। অনেক বড়ো বড়ো ভুলের শোচনীয় জের—অবশ্য বড়োর পিছু-ধরা আধাবুড়ো মানুষকে সারাজীবন টেনে চলতে হয়, আবার অনেক ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে ফলটা মারাত্মক হলেও ধীরে ধীরে মানুষ সামলে উঠতে পারে।

তাছাড়া, ভুল সম্বন্ধে মানুষেব আত্মরক্ষার একটি স্বাভাবিক ধর্ম আছে। সেটা হল তার ভীরুতা। লাভের আশাতেও বড়ো কিছু করতে মানুষ ভয় পায়, ইতস্তত করে। যে সব বৃহৎ ব্যাপারের ফলাফল সুনিশ্চিত সে সমস্ত ব্যাপারেও মানুষ জোরালো অথবা মৃদু দ্বিধার অস্বস্তিবোধ করে, কোনো কারণে ফলাফলটা যদি অন্য রকম হয়ে যায় !

কারণটা খুবই সহজবোধ্য।

বড়ো ব্যাপারের সুফল এবং কুফল দুটোই বড়ো রকমের হয়।

কিন্তু ছোটো ছোটো ব্যাপাবকে মানুষ অতটা গ্রাহ্য করে না, যদিও ফলাফল জমা হতে হতে, একদিন ফলাফলের দিক থেকে বড়ো ব্যাপারকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে !

অল্প পরিমাণে আফিম খেলে উপকার হয় এই ধারণার বশে আফিমের নেশার দাসত্ব মেনে নিয়ে অনেকে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে অকর্মণ্য জীবন কাটিয়ে দেয় ; কিন্তু তিলে তিলে জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখার অভ্যাস সঞ্চয় করে বাস্তব জগতে বেঁচে থাকার পক্ষেই নিজেদের যাবা অনুপযুক্ত করে ফেলে, তাদের তুলনায় আফিমখোরেবা সংখ্যায় অতি নগণ্য। আফিমেব নেশা আজ পর্যন্ত কোনো জাতিকে নষ্ট করেনি, কিন্তু স্বপ্ন দেখার নেশা জাতিব-পর জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

অথচ, মুশকিল এই, জেগে জেগে একটু একটু স্বপ্ন দেখার ক্ষমতাকে মানুষ শিক্ষা ও সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে গণ্য করে নিয়েছে !

স্বপ্ন যে কল্পনা নয়, এ কথাটা অনেকের জানা নেই। কল্পনা মানুষের জীবনধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, প্রগতির জন্য তো বটেই !

কিন্তু স্বপ্ন দেখা একটা রোগমাত্র।

যাদের দেখলেই স্বপ্নবিলাসী বলে চেনা যায়, যারা অলস অকর্মণ্য পরমুখাপেক্ষী হয়ে জীবনের সমস্ত অবস্থাতে দারুণ অশান্তির মধ্যে জীবনযাপন করে এবং দশজনের জীবনকে অশান্তিময় করে তোলে, সংসারের অধিকাংশ বীভৎস পাপই যাদের দ্বারা ঘটে থাকে, যারা চুরি ডাকাতি গুন্ডামিকে জেনে রেখেছে জীবনের রাজকীয় জীবননীতি, তাদের বাদ দিলেও স্বপ্ন-রোগের বহু রোগী জগতে আছে।

ভাব-প্রবণতা স্বপ্ন-রোগের মতো মারাত্মক নয়।

কারণ ভাব-প্রবণতায় আজও আদর্শবাদিতার রসায়ন মেশানো আছে। কোনো আদর্শ না আঁকড়ে এ জগতে কেউ আজও ভাব-প্রবণ হতে পারে না।

যারা ভাব-প্রবণ, অনুভূতির জগতে অসাধারণ ও অতিরিক্ত উত্তেজনা সৃষ্টি আর উপভোগ করার জন্য, চিন্তাশক্তির সাহায্যে কতকগুলি ভুল ধারণাকে নিয়ে তারা নাড়াচাড়া করে, কিন্তু

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সমস্ত ভুল ধারণা সাধারণ বাস্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ বাস্তবতাকে বিশেষ বিকৃত না করে বাস্তবতার সীমা অতিক্রম করলে যে ভুল ধারণা জন্মায়।

যেমন নরনারীর মিলন সম্পর্কে ভাব-প্রবণ নরনারীর কল্পনা। এই কল্পনার মধ্যে অনেক ভুল ধারণা থাকে, অনেক মিথ্যা থাকে, অনেক অসম্ভব প্রত্যাশা থাকে,—তবু নরনারীর মিলনের বাস্তবতাই এই কল্পনার ভিত্তি। এই রকম ভাব-প্রবণতার জন্য নরনারীর মিলিত জীবনে অশান্তির সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু সে অশান্তি কদাচিৎ মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়।

অন্য দিকে যত বড়ো বীভৎস অপরাধই স্বপ্নরোগীরা করুক, আত্মসমর্থনের অজস্র যুক্তি সর্বদাই এদের ভুল ধারণার ভাণ্ডারে মজুত থাকে। এই সব যুক্তি মাখিয়ে কদর্যতাকে এরা মনোহর রূপ দেয়, হীনতাকে দাঁড় করাতে পারে মহত্ত্ব হিসাবে এবং মনেপ্রাণে তাই বিশ্বাসও করে।

কয়েকটা টাকার জন্য মানুষ খুন করেও এরা অনায়াসে ভাবতে পারে যে, বীরত্ব আর পৌরুষের আদর্শের জন্য ফাঁসির বিপদ বরণ করেছে এবং এ কথা ভেবে রীতিমতো গৌরববোধ করতে পারে।

মানুষ খুন করার নামে যার শিহরন জাগবে, রাজার আইন, সমাজ ও ধর্মের আইন, প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে যাওয়ার কল্পনা করাও যার পক্ষে বিচার বিবেচনা করে দেখার ব্যাপার, সেই সব তথাকথিত সাধারণ ভালো মানুষের জীবনে স্বপ্ন-অভিব্যক্তি বড়োই বিচিত্র। হাজার হাজার নরনারীর দৈনন্দিন জীবনযাপনের অসংখ্য খুঁটিনাটির মধ্যে এই বিজাতীয় মারাত্মক রোগের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সচেতন অভিযান, সাধারণ লক্ষণ হিসাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

ধনদাস আর কালাচাঁদের ভাব-প্রবণতার কী আকাশ-পাতাল তফাত দেখা যাচ্ছে ! একজন যেন ভাব-প্রবণতাকে জয় করে চলেছে, আরেকজন স্বপ্ন-প্রবণতা নিয়ে খেলা করছে।

বাইরে যাবার সময় ধনদাস চৌকাঠে হোঁচট খেল।

ধনদাসের ধারণা, কোনো কাজে যাবার সময় হোঁচট খেলে কাজটা সফল হয় না। একটু বসে, স্ত্রীর সঙ্গে দুটো কথা বলে, ছেলেমেয়েকে একটু আদর করে কয়েক মিনিট পরে ধনদাস আবার বাইরে গেল।

কুসংস্কার না বলে ধনদাসের এই ধারণাকে স্বপ্ন রোগের পর্যায়ভুক্ত ভুল ধারণা হিসাবে গণ্য করা চলে। এই একটি ভুল ধারণার সঙ্গে ধনদাসের মনের আরও কত যে ভুল ধারণা একসূত্রে গাঁথা হয়ে আছে !

হোঁচট খাওয়া-না-খাওয়ার সঙ্গে ধনদাসের মনের এই সমস্ত ভুল ধারণার কেবল এইটুকু সম্পর্ক যে, এই উপলক্ষে তার ব্যর্থতার ভীতিটা তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল, নিজের নিরন্তর দুরদৃষ্টের জন্য মানসিক বিষাদ ও অসহায় ভাবটা নাড়া খেল, ইত্যাদি। হোঁচট খাওয়ার ফলে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়নি—স্বপ্ন-রোগে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকার ফলে হোঁচট খাওয়াকে একটু কাজে লাগানো হচ্ছে মাত্র।

কথাটাকে সহজ করা সম্ভব হবে।

ছোটোবড়ো যে কাজেই হাত দিক তাতেই তার সাফল্যলাভ করা শুধু উচিত নয়, সেটাই জগতের অন্যতম অপরিবর্তনীয় নিয়ম—এই স্বপ্ন মনকে বশ না করলে কেউ ভাবতেও পারে না, বেরোবার সময় হোঁচটফোঁচটের বাধা-পড়া ভবিষ্যৎ ব্যর্থতার ইঙ্গিত। আগামী ব্যর্থতার এই অস্বাভাবিক অপ্রমাণিত স্বাভাবিক সম্ভাবনাকে ধনদাস মানে, কিন্তু সাহেবসুবোদের হিসাবমতো তাদের হুকুমে তাকে যে এটা মানতে হয় এটা একেবারেই সে স্বীকার করে না।

ফলে, ন্যায্যত প্রাপ্য সাফল্যের জন্য উপযুক্ত পরিশ্রম করাটা মহেশ, ধনদাস আর তার পেয়ারের আত্মীয়কুটুম্বরা বোকামি মনে করে। সহজে ফাঁকি দিয়ে কার্যোদ্ধারের প্রবৃত্তি দেখা দেয়।

ব্যর্থতা ধনদাসকে বড়ো বেশি কাবু করে দেয়।

ব্যর্থতার ভয়ে বড়ো কাজের প্রেরণা আসে না -ছোটো কাজে আলস্য জাগে, অবহেলা জাগে।

অন্য লোকে কষ্ট পাক আর নিজে সে সুখ ভোগ করুক—ধনদাস এই স্বপ্ন-রোগে ভুগছে।

অর্থাৎ ধনদাস মানুষটা হিংসুক আর স্বার্থপর। যেখানে সাফল্য ও ব্যর্থতার প্রশ্ন আছে সেখানেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকতে বাধ্য। কারণ উদ্দেশ্যসিদ্ধির বিষয়ে একা ধনদাসের কর্তৃত্ব থাকলে ব্যর্থতার প্রশ্নই ওঠে না। যিনি অথবা যাঁরা নিজেদের লাভ-লোকসানের হিসাব করে ধনদাসের লাভের কাজটা হতে দেবেন না, ধনদাস তাঁদের হিংসা করে এবং তাঁদের ক্ষতি করে নিজের লাভ চায়।

সমস্ত বিরোধিতার ক্ষেত্রেই অবশ্য মানুষ প্রতিপক্ষের ব্যর্থতা এবং নিজের সাফল্য কামনা করে, নতুবা বিরোধিতার কোনো অর্থই হয় না।

কিন্তু ধনদাসের কামনার রূপ অন্য রকম। বিরোধীপক্ষের সাফল্য ধনদাসের কাছে অসঙ্গত, এটা যেন দেবতার অন্যায় পক্ষপাতিত্ব। সাফল্যের পথে যে বা যারা বাধাস্বরূপ আসবে ছলে-বলে কৌশলে তাদের নিপাত করা জীবনসংগ্রামের অন্যতম বাস্তব নীতি।

জহরকে সে যে কী রকম ভড়কে দিয়েছিল মানব সেটা টের পায় সকালবেলা তার বস্তির ঘরে জহরের আবির্ভাব ঘটায়।

আস্তি এসে জানায় : একজন ভদ্দরলোক ডাকছেন।

মানব কলম চালিয়ে যেতে যেতে মুখ না তুলেই বলে, ভদ্দরলোককেই এখানে নিয়ে এসো না ? আমার তো খোলা দরজা।

একবার মুখ তুলেও তাকাতে নেই বুঝি !

কলম রেখে মুখ তুলে তাকিয়ে আস্তির আহত অভিমানের মুখভঙ্গি দেখে মানব প্রায় তাজ্জব বনে যায়।

শুধু মুখ না তুলে কথা বলার জন্য আস্তিরও এমন অপমানবোধ হয়, রাগ হয় !

মানব গম্ভীর হয়ে বলে, আমি রাগ করেছি। তোমার দিকে তাকাবও না, তোমার সাথে কথাও বলব না।

আস্তি একটু হেসে চলে যায়।

ভদ্রলোককে ডেকে কাজ নেই আস্তি—আমিই যাচ্ছি।

জহরকে দেখেই মানবের মনে পড়ে যায়, তার মুখে চন্দ্রা এখন ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছেছে এবং যে কোনোদিন সাংঘাতিক কিছু করে বসতে পারে শুনে, জহরের মুখের ভাবটা কী রকম হয়েছিল !

আতঙ্ক জহরকে আজ তার কাছে টেনে এনেছে।

জহরের মুখখানা প্রায় কাঁদো কাঁদো।

কোনো রকম ভূমিকা না করেই সে বলে, চন্দ্রার ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে এসেছি। আপনি মিটমাট করে দেবেন বলেছিলেন !

মানব বলে, আমি একা নই, আমরা—আমরা মিটমাট করে দেব বলেছিলাম। চলুন চায়ের দোকানে গিয়েই বসি।

জহরকে সে রবির দোকানে নিয়ে যায়। এত দামি শাল কাঁধে এমন সুবেশধারী একজনের সঙ্গে মানবকে তার দোকানে ঢুকতে দেখে রবি আশ্চর্য হয়ে চেয়ে থাকে।

জহর বলে, কাল চন্দ্রাদের ওখানেই ছিলাম, ওখান থেকে সোজা আপনার কাছে এসেছি। আপনি বলেছিলেন না যে চন্দ্রার ধৈর্য বেশিদিন টিকবে না, একটা কিছু করে বসবে ? ভেবে-চিন্তে দেখলাম, আপনার কথাই ঠিক। এ দিকটা আমার একেবারে খেয়াল হয়নি।

এ দিকটা খেয়াল করছেন না বুঝেই মনে করিয়ে দিয়েছিলাম। খেয়াল করলে কি আর চুপ করে থাকতেন ?

তাই ঠিক কবলাম নিয়ে আসব—তারপর যা হবার হবে। আমায় নয় অমানুষ বলে ঘেন্নাই করবে।

এটা আপনার ভুল ধারণা। অমানুষ ভাবা ঘেন্না করার প্রশ্নই ওঠে না। প্রশ্ন হল, মানিয়ে নেবার—আপনি যেমন, তেমনিভাবেই চন্দ্রা আপনাকে মানবে ; চন্দ্রা যেমন, তেমনিভাবে ওকে আপনি মানবেন। দুজন মানুষের যেখানে দেহমন কোনোটার ঢাকা থাকছে না, সবকিছু জানাজানি হয়ে যাচ্ছে, সেখানে কি ও সব হিসাব চলে ? দুজনের দোষ-গুণ দুটোই দুজনকে মানতে হবে।

জহর খানিক চুপ করে থেকে বলে, ভুল কবেছি বুঝলাম কিন্তু এ দিকে যে মুশকিল হল। ওকে আনার ব্যবস্থা করার জন্যই কাল গিয়েছিলাম। চন্দ্রা পরিষ্কার বলে দিযেছে এ জীবনে আব কোনোদিন আমার বাড়ি যাবে না।

খানিক আগে দেখা আত্তিব মুখ মনে পড়ে। কাছে এসে দাঁড়িযেছিল কিন্তু সে কথা বলেছিল কাগজের বুক থেকে মুখ না তুলে।

তাতেই কী রাগ আত্তির !

মানব ধীরে ধীরে বলে, চন্দ্রা তো বলবেই ও কথা, কতদিন ফেলে বেখেছেন বাপেব বাড়ি। কতকাল ধরে অভিমানে ঘা দিযে আসছেন, অপমান করে আসছেন ! মেযেদের যে মান অভিমান আছে এটা খেয়াল করতেও ভুলে গেছেন নাকি !

জহর চুপ করে থাকে।

মানব হেসে বলে, ক্ষমা চাইতে হবে, সাধতে হবে, ব্যাকুলতা দেখাতে হবে—আমি হলে চন্দ্রাব পায়ে ধরতাম। মেযেদেব নিজেদের তো কোনো মান নেই—আমরা যেটুকু দেব সেইটুকু।

জহব চুপ করে থাকে।

মানব আবার বলে, তবে হ্যাঁ, চন্দ্রাকেও একটু বোঝানো দরকার। ওব কযেকটা ভুল ধারণাও ভেঙে দিতে হবে। আমার মনে হয়, অপর্ণা পারবে। ওব সঙ্গে কথা বলব।

জহর কৃতজ্ঞভাবে বলে, একটা মিটমাট যদি কবে দিতে পাবেন—

মানব জোর দিয়ে বলে, পারব বইকী ! আপনি মিটমাট চাইছেন মানেই তো মিটমাট হয়ে গেছে। তবে এটাও কিন্তু বলে রাখছি— খিটিমিটি থাকবেই।

এবার জহরের মুখেও হাসি ফোটে।

প্রাক্তন দুটি বিবাহিতা ছাত্রী আর চন্দ্রাকে অপর্ণা তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে।

চন্দ্রা আশ্চর্য হয়ে বলে, হঠাৎ নেমন্তন্ন কেন ?

গেলেই বুঝবে। খাওয়া গৌণ ব্যাপার—আসল নেমন্তন্ন হল আমার কথা শোনার। একটা ভারী মজার গল্প শোনাব।

অপর্ণার কথা শুনে তিনটি মেয়ের মুখই লজ্জায় অল্প লাল হয়ে ওঠে।

তিনজনেই তারা অপর্ণার পুরানো ছাত্রী, বয়সে তারা অপর্ণার ছোটোবোন সন্তানবতী সুমিতাব চেয়ে অনেক ছোটো, তিনজনেরই বিয়ে হয়েছে অনেক দিন। অপর্ণার প্রথম ছেলেটির বয়স হবে সাত-আটবছর, যদিও তাকে দেখে আজও অনুমান করা যায় না বযস তার ত্রিশের দিকে এগিয়ে গেছে এবং বিবাহিত জীবন সে যাপন করছে দশ বছরের বেশি।

অবশ্য অপর্ণার কথা শুনে মুখ যে তাদের আজই প্রথম লাল হল তা নয়। তাদের এবং আরও অনেকের মুখ অনেকবার অপর্ণা এ রকম আরক্ত করে দিয়েছে। মুখের যেন তার আটক নেই। যে কথা সমবয়সি সখির কানে কানে বলতে পর্যন্ত সংকোচ হয়, পাঁচজনের সামনে অপর্ণা অনায়াসে অতি স্পষ্ট ভাষায় তা বলে বসে !

তবু অপর্ণাকে এরা প্রায় সকলেই শ্রদ্ধা করে।

কারণ, যাই বলুক অপর্ণা, অনাবশ্যক বাজে কথা সে কখনও বলে না তার কথা হালকা ইয়ার্কি নয়। জীবনের অতি বাস্তব গুরুতর সমস্যা নিয়ে সে কথা বলে। সংকোচহীন স্পষ্টতার সঙ্গে আলোচনা করার বিকৃত সুখ উপভোগ করাটা যে তার উদ্দেশ্য নয়, সেটাও স্পষ্টই বুঝা যায়। এ সব বিষয়ে সব রকম ন্যাকামিকে সে সবসময় তেজের সঙ্গে এড়িয়ে চলে।

আকারে ইঙ্গিতে, নানারকম হাস্যকর ঢং করে যে সব কথা বলা চলে, স্পষ্ট ভাষায় তা বলে ফেলাই কি সহজ আর সুবিধাজনক নয় ?—অপর্ণা এই মত পোষণ করে।

তাই অপর্ণার কথা শুনে পাড়ার অনেক মেয়ের দেহে অনেকবার রোমাঞ্চ হয়েছে কিন্তু সেই সঙ্গে মানুষের রক্তমাংসের দেহ সম্বন্ধে অনেক কুসংস্কার আর ভুল ধারণাও তাদের কেটে গেছে, অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞানও তারা অর্জন করেছে। অপর্ণার চমকপ্রদ কথাবার্তা শুনেই যে পাড়ার একটি নবদম্পতির অশান্তিময় ভাঙা জীবন আবার জোড়া লেগে সুখে শান্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, এ খবরও অনেকে জানে। কারণ এই দম্পতিটি অপর্ণার একজোড়া অন্ধ ভক্তে পরিণত হয়েছে এবং নিঃসংকোচে নিজেরাই বন্ধু ও বান্ধবীদের কাছে প্রকাশ করেছে যে, কত তুচ্ছ কারণে তাদের জীবন নষ্ট হয়ে যেতে বসেছিল এবং কত সহজে অপর্ণা তাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে।

শুধু তাদের সস্তা ভুলটা বুঝিয়ে দিয়ে !

চন্দ্রা পরদিন স্বামীগৃহে যাবে।

তাকে লক্ষ করেই অপর্ণা কথা বলছিল এবং লজ্জায় সংকোচে সে-ই কাতর হয়ে পড়েছিল সব চেয়ে বেশি। তবু অপর্ণা গ্রাহ্য না করেই বলতে থাকে, তুমি বড়ো বোকা মেয়ে। নিজেকে সস্তা করার ভয়ে নিজের জীবনটা নষ্ট করতে বসেছ। একটিবার মিলনের জন্য জহরকে প্রাণপণে লড়াই করতে হয় ! নিজেকে সস্তাই যে করে ফেলনি তাই বা কে জানে ? হয়তো জহরের মনে ধারণা জন্মে গেছে ভেতরে ভেতরে তোমার কোনো অসুখ-বিসুখ আছে, নইলে এই বয়সে বিয়ের প্রথম বছরে—

অপর্ণা চুপ করে মিনিটখানেক ভাবে। তারপর একটু হেসে বলে, তোমাকে বোকা বলছি, আমিও তোমার মতোই বোকা ছিলাম। শোনো আমার বোকামির গল্প—তাহলে নিজের ভুল বুঝতে পারবে।

বোকামি করে এমন ভুল করেছিলাম যার ফলে জীবনের সব সুখ শান্তি আমার ধ্বংস হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। ভুলটা করেছিলাম তোমারই মতো—নিজেকে সস্তা করব না, স্বামীর কামনাকে সবসময় চড়া পর্দায় চড়িয়ে রেখে তাকে একেবারে আমার গোলাম করে রাখব। অল্প বয়েস, বুদ্ধি কম, তাই স্কুলকলেজে বন্ধুদের কাছে পুরুষ সম্বন্ধে যে সব তত্ত্বকথা শুনতাম তাই মন দিয়ে বিশ্বাস করতাম। বিয়ের রাত্রেও একটি বন্ধু আমার কানে কানে বলে দিয়েছিল, খবর্দার, চাওয়ামাত্র ধরা দিয়ে নিজেকে সস্তা করবি না ! মনে রাখিস, নিজের তুই যত দাম করবি পুরুষ তোকে তত দাম দেবে। আমি শুনে শুধু একটু হেসেছিলাম। কারণ, তখন আমার ধারণা ছিল যে এ সব বিষয়ে জানতে কী আর আমার কিছু বাকি আছে। মানুষের মন যে কী দুর্বোধ্য জটিল জিনিস তা কি তখন জানি ?

তিনজনে গভীর মনোযোগ দিয়ে তার কথা শোনে। চন্দ্রা প্রথমে উশখুশ করছিল, এখন সে হাতে মুখ রেখে সামনে ঝুঁকে স্থির হয়ে বসেছে।

অপর্ণা হাসে, প্রথমেই তোমাদের বলে রাখি, নিজেদের সস্তা না করা মেয়েদের একটি অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সব মেয়েই জানে প্রেমিকের কাছে নিজের দাম কমাতে নেই। জেনে হোক আর না জেনে হোক সব মেয়েই নানাভাবে প্রেমিকের কাছে নিজের আকর্ষণ বাড়াবার জন্য, নিজের প্রভাব বাড়াবার জন্য চেষ্টা করে। এটা দোষের কিছু নয়, এটা প্রকৃতিরই একটা নিয়ম। নিচু স্তরের জীবের মধ্যেও এ নিয়ম দেখতে পাওয়া যায়।

চন্দ্রা প্রশ্ন করে, নিযমটা কেন ?

স্ত্রীপুরুষ দুরকম জীব বলে।

ও !

কিন্তু সব জিনিসের সীমা আছে। আমাদের শিক্ষাদীক্ষা এমন দাঁড়িয়েছে যে প্রস্তুতির কোনো নিয়ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে ভাবি যে খুব বাহাদুরি করছি, কিন্তু সেটা সে প্রকৃতির নিয়মভঙ্গ করা হচ্ছে তা আমাদের মাথায় ঢোকে না।

অপর্ণা একটু থামে।

আমাদের মধ্যে সত্যি ভালোবাসা জন্মেছিল। তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে দুজনে মিলে নীড় বাঁধবার জন্য আমরা দুজনেই পাগল হয়ে উঠেছিলাম। বিয়ের রাত্রে আমরা দুজনেই যেন হাতে স্বর্গ পেলাম। কিন্তু তখন আমার এল পাগলামি। পাছে ভালোবাসার বাঁধন ঢিল হয়ে যায়, ওঁর আগ্রহ ঝিমিয়ে আসে, বেশি পেয়ে আমাকে সস্তা মনে হয়, এই ভয়ে আমি হঠাৎ ভয়ানক সংযত হয়ে গেলাম। সংযম না ছাই, একটা বিপজ্জনক খেলা আরম্ভ করে দিলাম আব কী ! তুমিও খুব সম্ভব জহরের সঙ্গে এই রকম একটা খেলা আরম্ভ করেছিলে চন্দ্রা !

চন্দ্রা চুপ করে থাকে।

উনিও আমার অনিচ্ছার মর্যাদা দিতেন। এমনিভাবে দিনের পর দিন অতৃপ্তি দিয়ে কদাচিৎ ওঁর কাছে ধরা দিতাম। তাও এমন ভাব দেখাতাম যেন কেবল ওঁর মুখ চেয়ে মস্ত একটা কুৎসিত কাণ্ড মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছি। উনিও যেন মস্ত বড়ো একটা অপরাধ করছেন এমনিভাবে কেমন যেন লজ্জিত আর অপরাধী হয়ে পড়তেন। আর এমন মূর্খই আমি তখন ছিলাম যে ওঁর ও রকম ভাব দেখে খুশি হয়ে ভাবতাম, আমি যেন অনেক উঁচুতে উঠে আছি আর উনি নীচে নেমে গেছেন, এটা যখন উনি বুঝতে পারছেন, এবার থেকে ওঁর শ্রদ্ধা ভালোবাসা নিশ্চয় আরও বেড়ে যাবে। তাছাড়া, আমার সঙ্গলাভের জন্য ওঁর ব্যাকুলতাও যে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে সেটাও বেশ বুঝতে পারছিলাম।

আমার প্রতি ওঁর আকর্ষণ বাড়ছে এই সব ভেবে মনকে বুঝালেও তলে তলে কেমন একটা গভীর অতৃপ্তি আমাকেও কিন্তু পীড়ন করত। কাজকর্মে মন বসত না, গল্পগুজব বই পড়া ভালো লাগত না, মাঝে মাঝে ওঁর আদর পর্যন্ত বিস্বাদ লাগত। সব সময় কেমন একটা অস্বস্তি আর অভাব বোধ করতাম। এটা বুঝতে অবশ্য আমার সময় লেগেছিল, কারণ, তখন মনে মনে আমার বিশ্বাস ছিল—আমি পরম সুখী, নিজের চেষ্টায় নিজের দাম্পত্য জীবনকে আদর্শ জীবনে দাঁড় করাতে পেরেছি। নিজের ভেতরের ছটফটানিটা স্পষ্টভাবে বুঝতে আমার বছর খানেক কেটে গেল। তখনও অবশ্য বুঝতে পারলাম না, কী জন্য আমার ও রকম লাগে।

ততদিনে তিনি অনেক বদলে গেছেন। বদলে গেছেন মানে যে আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছেন বা আমাকে অবহেলা করতে আরম্ভ করেছেন, তা নয়। কতকটা যেন আমার মন জুগিয়ে চলবার জন্যই নিজেকে সামলে চলেন, মিলনের জন্য আগের মতো আর ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন না। আমি দেহটা তুচ্ছ করি, তিনিও যেন সেই জন্যই দেহটা তুচ্ছ করতে আরম্ভ করেছেন। রাত্রে ঘরে

এলে খিল দেওয়ামাত্র আগের মতো আর দুহাতে আমাকে বুকে জড়িয়ে হাজার খানেক চুমু খান না, বেশ ভদ্রভাবে সন্তর্পণে আদর করেন। কোনো রকম ঝগড়াঝাঁটি বা সামান্য মনান্তরও কখনও হত না। আগের মতো দরকারের চেয়ে বেশি শাড়ি-ব্লাউজ, সাবান পাউডার-স্নো-ক্রিম এনে দিচ্ছেন, বেড়াতে আর সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন, হাসিমুখে কথা বলছেন, তবু যেন আমার মনে হত মানুষটা কেমন ঝিমিয়ে যাচ্ছে, তফাতে সরে যাচ্ছে।

তাছাড়া বাইরে সময় কাটানোর স্বভাবটাও তাঁর বাড়তে লাগল। শেষে একদিন রাত্রে বাড়িই ফিরলেন না। কৈফিয়ত দিলেন যে বন্ধুর বাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। দোকান থেকে একেবারে চুল ছাঁটিয়ে, দাড়ি কামিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন, তবু মুখখানা বড়ো বেশি শুকনো দেখাতে লাগল। আমার মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল।

কয়েক দিন পরেই আবার রাতে বাড়ি ফিরলেন না। তারপর দু-চারদিন পরে-পরেই, রাত্রিটা বাইরে কাটিয়ে আসতে লাগলেন। আমার যে তখন কী অবস্থা হল বুঝতেই পারছ ! একেবারে যেন হতভম্ব হয়ে গেলাম। কেন এমন হল কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমার মুখের দিকে চেয়ে যিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন, একটা রাত আমায় ছেড়ে থাকতে হলে যাঁর প্রাণ ছটফট করত, তিনি আমায় ফেলে সারারাত বাইরে হইচই করে কাটাতে আরম্ভ করেছেন।

দাম বাড়ার বদলে এতই দাম কমে গেল আমার !

প্রথম কিছুদিন রাত্রিটা বাইরে কাটিয়ে সকালে অথবা বিকালে একেবারে আপিস থেকে বাড়ি ফেরবার সময় নিজেকে ভালো করে মেজেঘষে আসতেন, আমি যাতে চেহারা দেখে কিছু টের না পাই। কিন্তু একদিন রাত প্রায় তিনটার সময় মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফিরলেন। ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আমি কাঁদতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি, তিনিও উঠে বসে দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে আরম্ভ করেছেন। দেখেই আমার কান্না বন্ধ হয়ে গেল। আমি ভাবলাম, মাতাল অবস্থায় আমার কান্না দেখে বুঝি ব্যঙ্গ করছেন।

ধমক দিয়ে বললাম, কী মাতলামি আরম্ভ করেছ ?

তখন তিনি কত কথাই যে বললেন। অবশ্য নেশার ঘোরে জড়িয়ে জড়িয়েই কথাগুলি বললেন, মাতাল অবস্থায় সে রাত্রে বাড়ি না ফিরলে হয়তো কোনোদিন আমায় বলতেন না। সব কথা তোমাদের শুনে কাজ নেই, আসল কথাটা শোনো। তিনি বললেন, আমি সত্যি পশু, অপর্ণা। কিছুতে নিজের পশু প্রবৃত্তি চেপে রাখতে পারি না। কিন্তু তুমি তো আমার বউ, আমার সন্তানের জননী হবে তুমি, তোমায় কী করে নীচে নামাই ? তাই বাইরে একটু হইচই করে আসি, আমায় তুমি মাপ করো।

আরও অনেক কথা বলতে বলতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। বাকি রাতটা আমি জেগেই কাটিয়ে দিলাম। কত কথাই যে ভাবতে লাগলাম তার ঠিকানা নেই। ওঁর এই অবস্থার জন্য কে দায়ি বুঝতে আমার আর বাকি রইল না। সকালে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে প্রথম খেয়াল হল, এতদিন ওঁর ওপর কী অত্যাচারই করেছি। বেঁধে মারার একটা কথা আছে না ? এত দিন তেমনিভাবে মেরেছি ওঁকে। মনের জোর ওঁর কম নয়, আমি যদি তফাতে থাকতাম বা অসুখ হয়ে পড়ে থাকতাম তাহলে কোনো কথা ছিল না, কিন্তু প্রথম যৌবনের লাবণ্যে ঢলঢল শরীর নিয়ে সর্বদা চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কত রকম ভালোবাসার খেলা খেলছি, পাশাপাশি শুয়ে রাত কাটাচ্ছি, সবসময় ওঁকে উত্তেজিত করে তুলছি, অথচ ধরা দেওয়ার বেলায় আমার আসছে পাগলামি !

ভাবতে ভাবতে এ কথাটাও বুঝতে পারলাম, তিনি যাকে নিজের পশুবৃত্তি ভেবে নিজেকে অশ্রদ্ধা করছেন, সেটা এ রকম অবস্থায় এমন প্রচণ্ড না হয়ে উঠলেই বরং ওঁকে অসুস্থ মনে করা চলত। একজন সুস্থ সবল জোয়ান মানুষ, সে যে একটি মেয়েকে ভালোবেসে তাকে বিয়ে করে এনে

যোগী ঋষির মতো ঠান্ডা হয়ে থাকবে, উত্তেজনাবোধ করবে না, পাগল ছাড়া এমন কথা কে ভাববে ? আর দিনের পর দিন সেই উত্তেজনা অতৃপ্ত থাকার ফলে মানুষ যদি বিগড়ে যায়, তাতেই বা আশ্চর্যের কী আছে !

আমি বুঝতে পারলাম, নিজের যা ক্ষতি আমি করেছি, নিজেকেই আমায় তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। ওঁর ঘুম ভাঙতে অনেক বেলা হল। লজ্জায় চোখ তুলে আমার দিকে তাকাতে পারলেন না, যেন অপরাধটা সমস্ত ওঁর, আমার কোনো দোষ নেই।

অনেকক্ষণ পরে বললেন, কাল তোমায় অনেক বাজে কথা বলেছিলাম, না ?

আমি সহজভাবে বললাম, না দামি দামি কথা বলেছ, দরকারি কথা বলেছ, অনেক আগেই তোমার ও সব কথা আমায় বলা উচিত ছিল।

তারপর ওঁকে তিন মাসের ছুটি নেওয়ালাম। পরদিন জিনিসপত্র বেঁধে চলে গেলাম পুরী। সেইখানে আমাদের হনিমুন আরম্ভ হল—বিয়ের এক বছর পরে।

এক বছর ধরে যে অস্বাভাবিক অবস্থায় দুজনের জীবন অশান্তি আর অতৃপ্তিতে ভরে উঠেছিল, তিন মাসেই সেটা কেটে গিয়ে আমাদের জীবন আনন্দে, তৃপ্তিতে ভরে উঠল। ওর ভালোবাসা আর আকর্ষণও যেন মাঝখানের ঝিমানো ভাবটা কাটিয়ে দিন দিন বেড়েই চলতে লাগল। দেখলাম যে প্রেমিককে বঞ্চিত করেই শুধু নিজের দাম বাড়ানো যায় না।

চন্দ্রা মুখ তুলে বলে, নিতে যদি নাও আসে, আমি নিজেই কাল যাব অপর্ণাদি।

৭

নানাস্তরের ছোটোবড়ো নানারকম সাহিত্যিক সভা বৈঠক ও আড্ডায় মানব মাঝে মাঝে যাতায়াত করে—তাকে যেতে হয়।

প্রধানত সাহিত্য করার প্রয়োজনেই। কিন্তু তার খেয়ালও হয় না যে প্রধানত কালাচাঁদের লেখক হবার সাধকে কেন্দ্র করে কীভাবে তারই আস্তানায় গড়ে উঠেছে একটা ঘরোয়া বৈঠক—সে খালেক আর দু-চারজন লিখিয়েদের নিয়ে।

কালাচাঁদ উপস্থিত থাকবার এবং নানারকম প্রশ্ন করবার অনুমতি পেয়েছে। তবে প্রশ্ন সে করে কম, অনেক বেশি মনোযোগ দিয়ে তাদের তর্ক ও আলোচনা শোনে।

নিজের লেখা যখন খুশি পড়ে শোনাবার ঢালাও অনুমতিও তাকে দেওয়া আছে। কিন্তু সুযোগটা সে কাজে লাগায় খুব কম।

মানব জিজ্ঞাসা করে, লেখার চেষ্টা করছ না কালাচাঁদ ?

করছি বইকী ! হবে না জানা কথা, চেষ্টা করে দেখতে ছাড়ব না।

লেখা পড়ে শোনাও না কেন ?

শোনাবার মতো লেখা কি আর হচ্ছে মানুবাবু ?

সেদিন খালেক আর সুরেন এসেছিল একটা গুরুতর পরিকল্পনা নিয়ে দেশভাগ হয়ে গেছে তার আর চারা নেই, কিন্তু একালের হিন্দু-মুসলমানে যে সেকেলে সত্তা অমিল নেই এটা দেখাবার জন্য একটা কাব্য সংকলন বার করলে দোষ কী ?

কতকাল ধরে হিন্দু-মুসলিম কবিরা পাশাপাশি মূলত একই ভাষাভিত্তিক ভাবের ও ধারার কবিতা ও গান রচনা করে এসেছে একই বাংলা মাতৃভাষা বলে তাদের কাব্যে ঐতিহ্যের ছাপ আর পরিবর্তনের ধারা যে মূলত একই সেটা সাজিয়ে গুছিয়ে তুলে ধরা।

এ কাজ যে কত কঠিন এবং কীভাবে এ কাজ যে করা সম্ভব, তাই নিয়ে তিনজনে যখন তর্ক আর আলোচনায় মশগুল, স্কুলবইয়ের মরশুমের সময়কার ডবল শিফ্‌টের হরফ সাজানো আর হরফ সংশোধনের ডিউটি দিয়ে এসে, শুধু হাতটা ধুয়ে নিজের লেখা একটা গল্প তাদের পড়িয়ে শোনাতে এসে কালাচাঁদ আলোচনার গতি পালটে দেয়।

দুর্ভিক্ষের একটা গল্প লিখেছে কালাচাঁদ।

পুতুল মরার আগে উমাকান্তের লেখা একটা গল্প পুতুল মরার পর ছাপা হয়েছে—সেই গল্প পড়ে কালাচাঁদ নিজে একটা গল্প লিখেছে।

গতবারের মহান ভীষণ দুর্ভিক্ষের ব্যাপার নিয়ে লেখা গল্প। উমাকান্ত মাঝে মাঝে মন্বন্তর নিয়ে গল্প লেখে।

গল্পটি ছাপা হয়েছিল রস সাহিত্য পত্রিকায়। কম্পোজ করেছিল কালাচাঁদ নিজে।

একটু ফ্যানের জন্য কাতারে কাতারে লাইন দিয়েও, লাখের হিসাবে মানুষ মরেছে যে দুর্ভিক্ষে—সেই মন্বন্তরকে মহান বলা ! বীভৎস মৃত্যুর আঘাতে জাতির চেতনা জাগিয়ে দিয়েছে বলে !

হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল কালাচাঁদ।

জাতির চেতনা তবে এমনিভাবে মরার ঘায়ে জাগে !

কে জানে লেখকেরা কীভাবে চিন্তা কবে সংসারের ছোটোবড়ো ব্যাপার নিয়ে !

গল্প শুনিয়ে কালাচাঁদ জিজ্ঞাসা কবে ভালো হয়নি জানি, কিন্তু গল্প হয়েছে কি ?

মানব বলে, না গল্প হয়নি। তুমি শুধু তোমাব নিজের প্রাণের জ্বালাটা প্রকাশ কবেছ।

আপনি হলে কীভাবে গল্পটা সাজাতেন মানুবাবু ?

আমাব কত গল্প পড়েই তো দেখছ কী করে সাজাই !

কালাচাঁদ হেসে বলে, তা নয়। আমার এই বিষয়টা নিয়ে লিখতে চাইলে কী লিখবেন, ধরবেন কী কবে ?

খালেক এবং মানবও হাসে।

চাদ্দিকে কী হচ্ছে-না-হচ্ছে দেখে শুনে হদিস পাই, কী নিয়ে কী লিখতে হবে। মানুষ কে আসবে, কী ঘটনা ঘটবে ভেবে সাজিয়ে নিই—খেয়াল রাখি যাতে গল্প হয়।

কালাচাঁদ খালেককে প্রশ্ন করে, কবিতাও তাই ?

খালেক বলে, নিশ্চয় ! কী নিয়ে কবিতা লিখব সেটা আগে ভাবি, তারপর ঠিক করি কী করে ভাবনাটা সাজালে কবিতা হবে।

কালাচাঁদ চিন্তিত হয়ে বলে, গল্পের গল্প হওয়া চাই, কবিতার কবিতা হওয়া চাই—এ তো সোজা কথা বললেন। এটা বুঝতে তো কষ্ট নেই। কিন্তু কী বলবেন আর কী করে সাজিয়ে গল্প কবিতা করবেন—দুটো একসাথে মিলিয়ে ভাবেন কী করে ? ভাবতে গেলে মোর মাথা ঘুরে যায় বাবু !

খালেক মিষ্টিসুবে বলে, আমাদেরও একদিন তোমার মতো মাথা ঘুবে যেত কালাচাঁদ। ব্যাপারটা বুঝেছি কিন্তু ভাবটাকে কী বকম চেহারা দেব ভেবে আজও মাথা ঘুরে যায়। তুমি ভাবছ দুটো বুঝি ভিন্ন—তা কিন্তু নয় কালাচাঁদ। শোনো, তোমায় বুঝিয়ে বলি। গল্প কবিতা লেখার কায়দাই হল—যা বলব অর্থাৎ যেটা হল ভাবনা—সেটাকে গল্প কবিতার চেহারা দিয়ে ভেবে চলা, যেমন তুমি দুর্ভিক্ষ নিয়ে লিখেছ—তোমার ভাবটা হল, না খেয়ে তিলতিল করে মরাটা যে কী ভীষণ ব্যাপার, যারা দুবেলা খায় তারা বুঝতে পারবে না। এই ভাব নিয়ে তুমি যা ভেবেছ সেগুলি গল্পের চেহারায় ভাবা হয়নি।

কালাচাঁদের গোটা গোটা হস্তাক্ষরে লেখা কাগজগুলি তুলে নিয়ে খালেক আবার বলে, তুমি আরম্ভ করেছ : ওই যে ফুটপাথের ধারে ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়া কঙ্কালসার মানুষটা ধুঁকিতেছে

উহার কী যন্ত্রণা হইতেছে আমি কেমন করিয়া বুঝিব ? যেমন হোক দুইবেলা আমি শাকভাত খাইতে পারি। এইভাবে মাঝে মাঝে তুমি লোকটার কথা উল্লেখ করেছ আর নানাভাবে তোমার মূল ভাবটা প্রকাশ করেছ। শেষ করেছ এই বলে যে, তিন দিন পরে লোকটিকে ওখানেই পড়ে পড়ে থাকতে দেখে তুমি ভাবছ—উপোস দিয়ে মরণ না হলে তুমি মরেও ওর যন্ত্রণা বুঝতে পারবে না।

খালেক একটু থামে। কালাচাঁদ যে কী আগ্রহ ও মনোযোগের সঙ্গে তার কথা শুনছে লক্ষ করে সে একটু আশ্চর্য হয়ে যায়।

বলে, ভাবটা সুন্দর, মাঝে মাঝে ঝাঁঝটা ফুটেছে চমৎকার কিন্তু গল্প আছে কতটুকু ? একজন দুর্ভিক্ষপীড়িত লোক ফুটপাতে বসে ধুঁকছিল, তিন দিন পরে দেখা গেল যে সে মরে পড়ে রয়েছে।

মানব খুশি হয়ে বলে, বাঃ, তুই তো চমৎকার বলেছিস খালেক ! আমি ভেবেই পাচ্ছিলাম না কীভাবে ওকে বোঝাব যে কেন এটা গল্প হয়নি, কেন এতে গল্প নেই। বুঝতে পেরেছ তো কালাচাঁদ ? খেতে না পেয়ে একজন ফুটপাতে ধঁকছে, তিন দিন পরে মরে গেল—শুধু এইটুকু নিয়ে কি গল্প হয় ? এ তো সবাই দেখেছে, দেখে সবার প্রাণেই জ্বালা ধরেছে—গল্পে আরও অনেক কিছু দিতে হবে, পড়ে যাতে সকলে বুঝতে পারে যে ফুটপাত ধুঁকতে ধুঁকতে একজনের মরণ দেখে জ্বালা শেষ করাটাই সব নয়, সংসারের আরও অনেক বিরাট ব্যাপার এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে, এ মরণের মানে আরও গভীর।

বুক ফেটে যেতে চেয়েছে কালাচাঁদের। আরেকটুকু যদি লেখাপড়া কেউ তাকে শেখাত !

আরেকটু বিদ্যা যদি তার পেটে পড়ত !

স্কুল থেকে ছিনিয়ে এনে তাকে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল সিসাব অ-আ ক-খ-আকার-ইকার সাজাবার কায়দা শিখতে।

মানব বলে, হাল ছেড়ো না, গল্প লেখাও অনেক চেষ্টা করে শিখতে হয়। তোমার কয়েকটা ভালো ভালো নামকরা গল্প পড়া উচিত। এমনি পড়লে হবে না, কেটে কেটে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে হবে। বিষয় কী, ঘটনা কী, চরিত্র কেমন, কীভাবে গল্প সাজানো হয়েছে—

কালাচাঁদ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, থাক, আর গল্প লিখে কাজ নেই মোর। আমার অনেক ভাগ্যি যে আপনাদের লেখা কোনোমতে পড়তে পারি।

মানব স্থিরদৃষ্টিতে তার রকম-সকম লক্ষ করতে করতে বলে, কী বলতে চাও ঠিক বুঝতে পারছি না ভাই। কথাটা হল লেখাপড়া। লেখা আর পড়া একসাথে চলে—যে ক-খ লেখে সে ক-খ পড়ে। যে বড়ো জ্ঞানের বই লেখে সে বড়ো জ্ঞানের বই পড়ে। কিন্তু ব্যাপারটা কী খোলসা করে বলো তো শুনি ?

ওমনি করে তলিয়ে বুঝে গল্প পড়ার বিদ্যা পেটে আছে ? কে পড়াবে, কে বোঝাবে ?

মানব হেসে ওঠে—আমরা পড়াব—আমরা আছি কী করতে ? ভাবছ কেন—স্কুলের মতো পড়া নয় ! তোমায় আগেই তো বলেছি, আমাদের মতো পণ্ডিতদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লিখতে চাইলে তোমার চলবে না। তোমায় কি আর ও রকম সূক্ষ্মভাবে বিচার করে গল্প পড়তে বলছি ? তুমি গল্প লেখার মোটা মোটা কায়দা বুঝবার চেষ্টা করবে। যা বুঝবে না, আমাদের জিজ্ঞাসা করবে।

কালাচাঁদ খুশি হয়ে বলে, জ্বালাতন হবেন না তো ?

এবারের রস সাহিত্য পত্রিকায় মানব ও খালেকের দুটি লেখা ছাপা হয়েছে। দুর্ভিক্ষ নিয়ে লেখা গল্প এবং কবিতা। লেখক কবিমানুষ, কালাচাঁদের দুর্ভিক্ষের গল্প না হলেও লেখাটার মধ্যে যে প্রাণের জ্বালা প্রকাশ পেয়েছিল সেটা মর্ম স্পর্শ করেছিল। পরামর্শ করে না লিখলেও দুজনেই বোধ হয় তাই দুর্ভিক্ষের গল্প আর কবিতা লিখে ফেলেছে !

মহেশ পড়ে বলেছিল, তোমরা কি পরামর্শ করে লেখো নাকি ? দুজনেই তো এক ছবি এঁকেছ। এক সুর গেয়েছ। একটা গল্প আরেকটা কবিতা—এইটুকু শুধু তফাত।

ছোটোগল্প আর কবিতা খানিকটা সমধর্মী।

এই নিয়ে তুমুল তর্ক বেধে যেতে পারত কিন্তু তর্ক বাধাবাব মতো অন্য কেউ উপস্থিত ছিল না।

মহেশ তর্ক করে না।

মাঝে মাঝে লাগসই মন্তব্য করে, তর্ককে আরও উছলে দেয় কিন্তু নিজে কখনও তর্কে যোগ দেয না—না তার খোলা সম্পাদকীয় দপ্তরে, না নিজের বাড়ির বৈঠকে।

দুর্ভিক্ষ নিয়ে লেখা গল্প-কবিতা।

কবিতাটি আবার একজন মুসলিম তরুণের লেখা। তবে গল্পটি শুধু দুর্ভিক্ষের চিত্র—কবিতাটিও দুর্ভিক্ষেব ক্ষুধাব কাব্যরূপ।

একটু ইতস্তত করে মহেশ গল্প আর কবিতা ছেপে দেয়।

দুটি লেখাই বড়ো সুন্দর হয়েছে। মনকে অভিভূত করে, নাড়া দেয়।

এতকাল পরের কাগজে সম্পাদকত্বের জোযাল ঘাড়ে নিয়ে বুড়ো হতে চলেছে, লেখা দুটো পড়ে তার প্রাণটাও আনচান করে উঠেছে।

কবিতাটি খালেক লিখেছে বিছানায় শুয়ে। শখের শোয়া নয়, রোগের বাধ্যতামূলক শোযা। কী রোগ সেটা সঠিক জানা যায়নি। তবে জানবার জন্য যথানিয়মে পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেই অবশ্য জানা যাবে। কী রোগ হয়েছে সেটা ঠিকভাবে পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা করাও কী সোজা হাঙ্গামা, সহজ দায় এ দেশের গরিব মানুষের পক্ষে।

তবে খালেকেব কী হয়েছে সেটা প্রায় সকলেই অনুমান করতে পেরেছিল, মানবও টের পেয়েছিল। একটা জোয়ান মানুষ কী দিন দিন অকারণে রোগা হযে যায় ? তার অল্প জ্বর হতে শুরু করে ? অকাবণে থেকে থেকে কাশে ?

কেশে কেশে রক্ত তোলার অবস্থায় পৌঁছোতে শুধু বাকি।

খালেকের মতো তারও বিছানা নিতে ক-মাস ক-বছর বাকি আছে কে জানে !

কবিতাটি সেখানেই লেখা—তাকে দেখতে গিয়ে মানব নিজে এসেছিল।

একটা খটকা লেগেছিল মানবের মনে। কোন কাগজে দেবে তার গল্প আর খালেকের কবিতাটি ?

মহেশের কাগজে দেওয়ার কোনো সার্থকতা আছে কী ? ছাপতে মহেশ সাহস পাবে কি ?

হঠাৎ সে ডেকে পাঠিয়েছিল আন্তিকে।

তখন দুপুরবেলা। আন্তির মা যে ঘরে ছিল না, ভোরে উঠেই বোনের বাড়ি গিয়েছিল, এটা মানবের জানা ছিল না।

আন্তিকে ঘরে ডাকা যায় না, কারণ, কাজটা দু-চারমিনিটে শেষ হবে না—আন্তিকে বেশ খানিকক্ষণ থাকতে হবে। বেশির ভাগ পুরুষেরা কাজে গেছে, যার কাজ নেই সেও বেরিয়েছে কাজের চেষ্টায়।

চোখ পাতা আছে মেয়েদের। এই সব মেয়েদের চোখ আর মনকে মানব চেনে। বেচারাদের সে দোষ অবশ্য এতটুকু দেয় না, সে জানে যে মনের এই গড়নের জন্য ওরা নিজেরা দায়ি নয়।

দরজা যে সটান খোলা এটা হয়তো ওদের চোখেই পড়বে না, অথবা চোখে পড়লেও মন সেটা গ্রাহ্য করবে না।

খাঁখাঁ দুপুরে আন্তি অনেকক্ষণ তার ঘরে একলা ছিল এটাই শুধু চোখ দেখবে এবং মন বুঝবে।

রোয়াকে উবু হয়ে বসে অন্দান্তিকে বসতে বলে মানব বলে, একটা গল্প আর একটা কবিতা শোনো দিকি আন্তি—কেমন লাগে বলবে। পড়তে পারো না—তোমায় নিয়ে এই তো হয়েছে মুশকিল।

আত্তি খুশি হয়ে মাটিতে জাঁকিয়ে বসে।

প্রথমে মানব কবিতাটি পড়ে শোনাতে যায়।

তখন কোথা থেকে এসে দাঁড়ায় কুঞ্জর মা। বেঢপ রকমের মোটা প্রৌঢ়বয়সি বিধবা—যেমন ঝগড়াটে তেমনি কড়া মানুষ মেয়েবউদের চালচলনের ব্যাপারে।

কী হচ্ছে বাছা তোমাদের ?

মানব হেসে বলে, ব্যাপার কিছুই হচ্ছে না মাসি, বলি শোনো। কাগজে ছাপাবার জন্য একটা রূপকথা লিখেছি আর একটা ছড়া লিখেছি। লিখেছি গরিব মুখ্যুদের জন্যে। তা ভাবলাম কী, পেটে তো বিদ্যে জমিয়েছি ঢের, অল্পস্বল্প লেখাপড়া শিখেছে যারা, তারা পড়ে বুঝতে পারবে তো কী লিখেছি ? মুখ্যু মেয়েটাকে তাই শোনাচ্ছি রূপকথা আর ছড়াটা। ও যদি না বুঝতে পারে তবে বুঝব ঠিকমতো ফাঁদা হয়নি।

মানব আবার হেসে বলে, তুমিও বসো না মাসি, শুনে বলো না কেমন লাগল ? তোমার পেটেও তো বিদ্যের বালাই নেই, তুমিও যাচাই করতে পারবে কেমন হয়েছে।

কুঞ্জর মা ফোলাফোলা চামড়া-ঝোলা মুখে গালভরা হাসি হাসে।

সামান্য একটুখানি হাসি তার মুখে কোনোদিন দেখেছে কিনা মনে করতে পারে না মানব।

দেঁড়িয়ে দেঁড়িয়েই শুনছি বাবা।

খালেকের কবিতাটি আবৃত্তি করে শুনিয়ে মিনিট খানেক চুপচাপ দুজনের মুখের ভাব লক্ষ করে মানব আত্তিকে জিজ্ঞাসা করে, কেমন লাগল ?

আত্তি বলে, ইস্ ! খিদের জ্বালায় এমন করে মানুষ ! তা সত্যিই তো, করেই তো !

কুঞ্জর মা-কে প্রশ্ন করতে হয় না, সে নিজেই কপাল চাপড়ে বলে, পোড়া পেটের ঝঞ্ঝাট—বাবা রে !

মানব তারপর নিজের গল্পটা পড়ে। আত্তি আর কুঞ্জর মা-র থমথমে মুখের দিকে চেয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না মানবের।

আত্তি ঢোক গিলে কাঁপাকাঁপা জড়ানো গলায় বলে, ছড়াটা আরেকবার শোনাও দিকি ?

মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। তাদের মুখের দিকে চেয়ে কবিতাটি আরেকবার আবৃত্তি শুরু করার পরই দুজনের চোখে জল জমে ঝরে পড়ার প্রক্রিয়াটা দেখতে দেখতে মানবের গলাও কেঁপে যায়।

আবৃত্তি শেষ হওয়ামাত্র দুজনের তারা একভাবে কিন্তু দুরকম ভাষায় যেন ফেটে পড়ে—যার মর্মার্থ হল : কেন ? কেন ? কেন না খেয়ে মরবে মানুষ ?

তারা মরুক, ভিটেয় তাদের শকুনি চড়ুক, সর্বাঙ্গে তাদের কুষ্ঠ হোক যারা মানুষকে খেতে না দিয়ে মারে !

প্রায় হতভম্ব মানব ভাবে, ও বাবা, আমি তো তবে সহজ লেখক হইনি ! খালেক তো সহজ কবি হয়নি !

কালাচাঁদ গল্প লিখতে চায়, তার কাছে গল্প লেখার কায়দা শিখতে চায়—প্রায় গুরুর মতোই তাকে সম্মান করে।

কিন্তু মুখ্যুদের জন্য লেখা গল্প কবিতা তার বয়স্থা মেয়েকে প্রকাশ্যভাবে দাওয়ায় বসে কুঞ্জর মা-র চোখের সামনে লেখা দুটো পড়ে শুনিয়ে যাচাই করবার চেষ্টা করলে কালাচাঁদ যে এমন ভীষণভাবে রেগে যাবে, মানব তার কল্পনাও করতে পারেনি।

কালাচাঁদ যেন অমানুষ হয়ে গেছে।

কী রাগত ভাব কালাচাঁদের ! কী কটাংকটাং কথা !

আবছা ভোরে উঠে দরজা খুলতেই মানব দেখতে পায়, রোয়াকে কালাচাঁদ উবু হয়ে বসে আছে।

কী ব্যাপার ভাই ?

বলে মানব দাঁতনটা চিবোতে শুরু করে।

মেয়েটাকে টানাটানি ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না মানুবাবু ! আত্তির মা বলেছিল সেবারের ব্যাপার, আমিও তোমায় জানি। আমার কোনো ডর নেই। কিন্তু পাঁচজনে তো বুঝবে না !

বুঝেছি ব্যাপার।

ছোটো তো নেই—একলাটি থাকে। এইটুকু মেয়েকে ফুসলাবার জন্য ক-টা বজ্জাত যে উঠে পড়ে লেগেছে কী বলব তোমায় মানুবাবু।

আমি জানি না ? করুক না একটু বাড়াবাড়ি ! আত্তির সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে গেলে ভালো করে টের পাবে যে মানুবাবু শুধু কলম পেষে না, ডান্ডা চালাতেও জানে।

জোরে জোরে মাথা নেড়ে কালাচাঁদ বলে, না না, সে ব্যাপার নয়। তোমায় কেন ডান্ডা চালাতে হবে ? কুঞ্জর মা দেখছে না মেয়েটাকে ? ওর মুখের তোড়ে ভেসে যাবে না বজ্জাত ক-টা ?

কালাচাঁদ আবার সখেদে মাথা নাড়ে।

মানব একটু দমে গিয়ে বলে, কী তবে ব্যাপারটা ? আত্তিকে তো একলা ডেকে লেখা শোনাইনি ? কুঞ্জর মা সাথে ছিল।

ওরা রটাচ্ছে, তুমি উছলে উছলে বিগড়ে দিয়ে মেয়েটাকে বাগাবার চেষ্টা করছ।

ব্যাপারটা তাহলে সত্যিই গুরুতর দাঁড়িয়েছে !

সিসার হরফ সাজানোর কাজে টাইম আর ওভারটাইম মিলিয়ে সারাদিন খাটে যে কালাচাঁদ, তার কথা বলার ভঙ্গি আর ভাষার বাঁধুনি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় মানবের !

আত্তি আর তাকে নিয়ে সস্তা একটা ছ্যাঁচড়ামির পালা শেষ হয়ে চুকেবুকে যাবে দুদিনে—কিন্তু কালাচাঁদের এমন নিখুঁত সুন্দর জীবন্ত ভাষায় কথা বলা তো সম্ভব হয়নি এতকাল—এই অদ্ভুত ব্যাপারের জের তো দু-চারবছরে মেটার নয় !

আত্তির প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায় মানব।

তুমি কদ্দুর পড়েছ কালাচাঁদ ?

এইটে উঠলাম, বাবার হল অসুখ। লেখাপড়া হবে না টের পেয়েছিল নিশ্চয়, স্কুল ছাড়িয়ে বলল, পড়ে তোর ঘোড়া হবে, হাতের কাজ শিখবি যা, খেটে খাবি। আট-নমাস শিখে যেই অ্যাপ্রেন্টিস হলাম আট আনায়, চোখের সামনে বাবা একদিন পুজো সংখ্যার একটা লেখা কম্পোজ করতে করতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে পটল তুলল।

কালাচাঁদকে একটা বিড়ি দিয়ে মানব শেষ বিড়িটা ধরায়। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। যেভাবে এসে থাক, যেভাবে কথা বলে থাক, যতই আপশোশের আওয়াজ করে থাক—কালাচাঁদকে আজ আশ্চর্য রকম তাজা আর জ্যান্ত মনে হচ্ছে।

বিড়িটা কালাচাঁদ শেষ পর্যন্ত টেনে ক্ষয় করে। তারপর গেঞ্জির তলা থেকে বার করে ভাঁজ করা ছোটো খাতাটা।

লেখাটা পড়বে মানুবাবু ?

পড়ব না ? তোমার লেখা পড়ব না তো কার লেখা পড়ব !

বলবে কিন্তু কেমন হয়েছে।

নিশ্চয় বলব !

মানব শব্দ করে হাসে।

শেষ পর্যন্ত আমার সাথে পাল্লা দিলে কালাচাঁদ ?

কালাচাঁদও হাসে।

তোমাব সাথে পাল্লা ? তুমি একলা লেখ নাকি ?

মানব আর খালেকেব দুর্ভিক্ষের ভীষণতা নিয়ে লেখা গল্প আর কবিতা বস সাহিত্যে ছাপানো নিয়ে কী সংঘর্ষই যে হয়ে গেল মহেশ আর ধনদাসের মধ্যে !

সংঘর্ষ ?

কীসেব সংঘর্ষ ? ধনদাসের একটি মুখের কথাই তো যথেষ্ট যে—কাল থেকে আর আসবেন না। বাস। ফুরিয়ে যাবে মহেশের চাকবি।

তবু সংঘর্ষ বইকী !

মহেশকে ওভাবে হঠাৎ লাথি মেরে তাড়ানোর অসুবিধা আর বিপদ ধনদাস জানে।

প্রেসের কম্পোজিটররা পর্যন্ত মানুষটাকে খাতির করে।

অনেক লেখক শুধু তার খাতিরে মজুরি কম নিয়ে রস সাহিত্যে লেখা দেয়।

কয়েকটা বড়ো বড়ো লাইব্রেরি বই কেনার ব্যাপাবে তার পরামর্শ চায। মহেশের এই সব গুণগুলি যতদূর সম্ভব কাজে লাগিয়ে এসেছে—মানুষটার ওই গুণগুলিই যে এমন ঝঞ্ঝাট হয়ে দাঁড়াবে কে জানত !

সে পয়সা দিযে লোক রাখবে, মফতে তো নয়। যাকে খুশি রাখবে—যাকে খুশি তাড়াবে। এটুকু স্বাধীনতাও তাব নেই ? পয়সা দিয়ে লোক রেখে তবে লাভ কী !

কী দিনকাল যে হয়েছে !

মানব আর খালেকের গল্প-কবিতা বুকে নিয়ে রস সাহিত্যের সংখাটা বার হবার প্রায় দু-সপ্তাহ পরে ধনদাসের টনক নড়ে।

ছাপা হবার পর বাঁধাই কবা প্রথম সংখ্যাটি তাকে দেওয়া হয়—কাগজ হয়তো বাজারে বেরোবে পবদিন। পড়ে উঠতে চার-পাঁচদিন সময় লাগে ধনদাসের। তার পড়াব সময় কই ?

রস সাহিত্য তার সাহিত্যচর্চার শখেব কাগজ নয। সাহিত্যের কিছু সে বোঝেও না, সাহিত্য নিয়ে তার কিছুমাত্র মাথাব্যথাও নেই।

কাগজটা বার কবে নগদ লাভও খুব বেশি হয় না। তবে কি না প্রেসের কাজের ফাঁকে ফাঁকে কাগজটা বার করায় লোকের কাছে তার নিজেরও মর্যাদা বেড়েছে।

নানাবকম যোগাযোগের নানারকম কাজও জুটে যায় প্রেসের।

জহরের কবিতার বইটা ছাপিযে দেবার সুযোগ পাওয়া তারই একটা আদর্শ নিদর্শন।

দিন পাঁচেক পরে প্রেসে একপাক দিয়ে মহেশের টেবিলে হাত বেখে দাঁড়িয়ে ধনদাস বলছিল, বাঃ, এবার তো খাসা খাসা লেখা দিয়েছেন কাগজটায়। ক-দিনে একশো কপিব বেশি বিক্রি হয়েছে। পাঁচ কপির বেশি হাজারিমল কোনোবার নেয়নি—এবার আরও পাঁচ কপি বেশি নিয়েছে।

ধনদাস উদারভাবে হাসে, গুণের কদর জানি মশায় আমি ! আমি তেমন লোক নই, কাউকে ঠকাই না।

মহেশ খুব বেশি খুশি হবার ভান না দেখিয়ে বলে, আপনাদের কাছে কদর না থাকলে সেটা কীসের গুণ ? আজ এখানে কাল ওখানে ভেসে বেড়াতাম—আপনার কাছে চোদ্দো-পনেরো বছর কেটে গেল। গুণের কদর জানেন বইকী।

ধনদাসের আগেই ভাবা ছিল, আগেই সিদ্ধান্ত করা ছিল। দ্বিধামাত্র না করে সে বলে, দশ টাকা মাইনে বাড়াবার কথা বলেছিলেন না ? কাজ দেখালে মাইনে বাড়বে এ তো জানা কথাই ! দশ কেন, পনেরো টাকা বেশিই নেবেন সামনের মাস থেকে।

মহেশ ধীরস্বরে বলে, আপনাকে বলিনি আমি—কাগজটা কিছু একেলে করা দরকার ? সময় পালটে গেছে—সেকেলে কাগজ চলে না।

তাই তো পনেরো টাকা বাড়িয়ে দিলাম আপনাব মাইনে। একটু একেলে করুন কাগজটাকে—আমার ইন্টারেস্ট বজায় রেখে করুন। আপনি তা পারবেন—এটাই তো আপনার আসল গুণ।

ইংরেজি মাসের পনেরো তারিখে ধনদাস আইন-মাফিক লিখিত নোটিশ জারি করে মহেশকে বরখাস্ত করে দেয়।

তার মূর্তি অন্য রকম। ব্যবহার অন্য রকম। কথাবার্তার ধরণধারণ অন্য রকম।

পনেরো দিনের নোটিশ পেয়ে মহেশ নোটিশটা হাতে নিয়ে ধীরে সুস্থে বার্নিশ-করা কাঠের তক্তায় ঘেরা আপিসঘরে গিয়ে বলে, ব্যাপারটা তো বুঝলাম না !

ওই লেখা দুটো ছাপলেন কেন ? দুর্ভিক্ষ নিয়ে লেখা গল্প আর কবিতাটা ?

লেখা দুটো ছাপানোর জন্য দুশো কপি বিক্রি বেড়েছে। আপনিই তো গিয়ে আমার পিঠ চাপড়ে এলেন।

বিক্রি বাড়লে আমাব লাভ কী ? চারটে বড়ো বিজ্ঞাপন বন্ধ করতে লিখেছে। আরও বিজ্ঞাপন বন্ধ করা হবে জানিয়েছে। আপনার কাণ্ডজ্ঞান নেই, দায়িত্বজ্ঞান নেই—এই সেদিন পরিষ্কার বলে এলাম আমার চাকরি করতে হলে আমার স্বার্থ দেখতে হবে—সব হদিস হারিয়ে ফেলেছেন। নিজের খামখেয়ালে লেখা ছাপবেন—আমার পাঁচ-ছশো টাকার বিজ্ঞাপন নষ্ট হবে ! আসল ব্যাপার বুঝতে পারিনি ভেবেছেন, আপনি নিজে মতলব করে এ সব করছেন। আপনাকে রেখে ডুবব ?

মহেশ ধীরে ধীরে বলে, পলিসিটা আপনার—আমার নয়। আপনিই আমায় বলেছিলেন যে কাগজের সার্কুলেশন বাড়া দরকার—সার্কুলেশন বাড়ালে আপনি বেশি বিজ্ঞাপন জোগাড় করতে পারবেন। আমি তখন আপনাকে বলেছিলাম যে সার্কুলেশন বাড়াতে হলে কাগজটাতে খানিকটা একালের সুর আনবে হবে, কিছু কিছু কড়া লেখা দিতে হবে। আপনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন, স্পষ্ট বলেছিলেন—আমার দিক বাঁচিয়ে একটু হিসেব করে কড়া করুন না কাগজের সুর। আমি শুধু তাই করেছি—কোনো বিপ্লব করার লেখা ছাপিনি। দুর্ভিক্ষ নিয়ে লেখা পর্যন্ত না ছাপিয়ে কী করে কাগজের সুর কড়া করব ? আপনিই বললেন কাগজের সুর পালটাতে, কাগজের বিক্রি বাড়ায় আপনিই খুশি হয়ে আমার গুণ গাইলেন, পনেরো টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলেন—আজ হঠাৎ উলটো কথা বলে আমায় একেবারে তাড়িয়ে দিচ্ছেন ? আপনি বললেই সামনের মাস থেকে আগের মতো কাগজ বার করব। কাগজ আপনার—আপনি যে নীতি চালাতে বলবেন আমি সেই নীতি চালাব।

ধনদাস খানিকক্ষণ চুপ করে ভাবে, বোধ হয় নতুন সমস্যা নিয়ে নতুন ধরনের চিন্তার কূলকিনারা না পেয়েই বলে, আচ্ছা, নোটিশটা ফেরত দিন। দু-একদিন ভেবে দেখে আপনাকে জানাব।

বরখাস্তের নোটিশ মহেশের হাতেই ছিল—নোটিশটা সে ধনদাসের টেবিলে রাখে।

নাম সই করে আইনসঙ্গতভাবে তাকে নোটিশটা নিতে হয়েছিল, আইনসঙ্গতভাবে নাম সই করে ধনদাস সেটা ফেরত না নিলে যে নোটিশটা ফেরত নেওয়ার কোনো আইনসঙ্গত মানেই হয় না—মহেশ তা ভালোভাবেই জানে।

তবে সে এটাও জানে যে আইন ধনদাসের পক্ষে। তাকে আইন মানতে অনুরোধ করার কোনো মানেই হয় না।

মন্দ্রা বলে, কেন ভাবছ বাবা ? কাল থেকে আমরা শাড়ি তুলে রেখে সায়া-শেমিজ ঘাগরার মতো পরব। কাল থেকে আমরা ছোটো উনুন ধরিয়ে চাল-ডাল লতাপাতা একচড়া রেঁধে খাব। তুমি কিছু ভেবো না। এতবড়ো আস্পর্ধা ব্যাটার, তোমায় চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেয় !

মহেশ হেসে বলে, এখনও তাড়ায়নি—তবে মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত আমায় তাড়াবেই। মাথায় কোনো মতলব ঢুকেছে।

কী মতলব ?

আমি কী জানি মনে মনে কী মতলব ভাঁজছে ? তবে মনে হয় এভাবে বিক্রি না বাড়িয়ে কাগজটাকে সস্তা আর নোংরা করে বিক্রি বাড়াবার কথা ভাবছে।

৮

কালাচাঁদের কাছে মানব খবর শোনে যে মহেশকে ধনদাস তাড়িয়ে দিয়েছে। তাদেরই লেখা ছাপাবার অপরাধে !

আমি যে বছর ঢুকলাম সে বছর ওনার চাকরি হল, কাগজ বেরোল। কী খাটুনিটাই খেটে এসেছেন বললে প্রত্যয় যাবে না মানুবাবু। এদিকে প্রেসের কাজ দেখছেন, ওদিকে কাগজ বার কবার জন্য খাটছেন।

কালাচাঁদ মানবকে একটা বিড়ি দিয়ে নিজে একটা বিড়ি ধরিয়ে টেনে কেশে কফ তুলে থুতু ফেলে বলে, বড়োই বোকাসোকা মানুষ। মজুরি যেমন হোক, মোদের টাইমেব খাটুনি। বাড়তি টাইম খাটালে বাড়তি মজুরি। উনি দিনরাত খেটেই আসছেন বরাবর—টাইম ঘণ্টাব কোনো হিসেব নেই। অ্যাদ্দিন খেটে পনেরো দিনের নোটিশে বরখাস্ত হলেন।

মানব চিন্তিত হয়েও তার কথা শুনে হেসে বলে, ঘণ্টা টাইমের হিসেবে মহেশবাবু বেশি খেটে এসেছেন বলছ ? এ জগতে আজ কারও ও রকম বেহিসেবে খাটিয়ে নেবাব ক্ষমতা কিন্তু আছে কি কালাচাঁদ ? কারও নেই, হিসাবে কিছু কিছু ঠকাতে পারে—একেবারে ক্রীতদাসেব মতো বেহিসেবি বেশি খাটাবার সাধ্য পাবে কোথায় ? মহেশবাবুর মাসিক মজুরির হিসাবটা বাঁধা আছে কিন্তু ওঁর খাটার কোনো ঘণ্টা-ধরা হিসাব—এ রকম কখনও হতে পারে ? এলোমেলো খাটেন তো, খানিক খাটেন কাগজে, খানিক খাটেন প্রেসে। হিসেব করলে দেখতে পাবে ঘণ্টা হিসাবেই উনি খেটে আসছেন—ওঁর মজুরিটা অবশ্য একটু বেশি—সামান্য বেশি বেশি খাটার সুযোগ আছে কি না—দুডবল তিনডবল ওভারটাইম খেটে উনি বেশি পয়সা কামান।

কালাচাঁদ মাথা চুলকে বলে, মোর সাথে তফাত শুধু এই ?

মানব বলে, তবে কী ? মহেশবাবুর অবশ্য অনেক বছরের খাটুনি জমা ছিল আগে থেকে। তুমি সোজাসুজি স্কুল থেকে প্রেসের কাজে ঢুকলে, দু-চারমাস আলগা হাতখরচে খেটে বাঁধা মজুরির কাজে লেগে গেলে। মহেশবাবু আবও সাত-আটবছর বাপ-দাদার পয়সা জলের মতো খরচ করে তারপর পয়সা রোজগারের চেষ্টায় নেমেছিলেন। তারপরেও কিছুকাল হয়তো ছ-মাস এক বছর কাজ করেছেন—ছ-মাস এক বছর বেকার থেকেছেন। অনেক বছর এমনিভাবে কাটিয়ে তারপর তোমাদের ওখানে ঢুকে পড়লেন।

কালাচাঁদের মুখ দেখে মানব বলে, যোগ-বিয়োগের সোজা হিসেবটা জানো তো কালাচাঁদ ? তোমায় লিখিয়ে-পড়িয়ে রোজগেরে করার খরচ আর মহেশবাবুকে রোজগেরে করার খরচটা হিসাব

কষে ফেল না ? দেখবে—মজুরি প্রায় সেই এক রকম। মহেশবাবু শুধু বাড়তি ওভারটাইম খাটার সুযোগ পেয়েছেন।

জরুরি একটা লেখার কাজ ছিল। প্রায় শেষ হয়েও এসেছে লেখাটা। মানসিক চিন্তার হ্রদে আরেকবার অল্পক্ষণের জন্য ডুব দিলেই লেখাটা সম্পূর্ণ করে ফেলা যায়।

কিন্তু কী যেন ঘটেছে দেহমনে, কীভাবে কোথায় যেন বিগড়ে দিয়েছে জীবনের সঙ্গে বাস্তব সম্পর্ক, লিখতে মানবের মন বসে না।

লেখাটায় মন বসানোর জন্যই নগদ পয়সা খরচ করে রবির দোকানে চা খেয়ে এসে ঠিক তিনটি লাইন লিখে মিনিট পনেরো কলম হাতে চুপ করে বসে থেকে মানব উঠে পড়ে, পাট করে রাখা ধোপদুরস্ত ধুতি পরে গায়ে চাপায় তার একমাত্র পাঞ্জাবি।

পাঞ্জাবির নীচে গেঞ্জি পরা নিয়ম কিন্তু একটা গেঞ্জিও তার নেই।

প্রেসের আর কাগজের কাজ চালাবার জন্যই সকাল সকাল চান করে খেয়ে উঠে জামাকাপড় পরে তৈরি হয়ে ভাঙা খাটের বিছানায় বসে মলয়ার এনে দেওয়া ওষুধটা সবে মহেশ গিলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ব্যাপার জানতে মানব গিয়ে হাজির হয়।

ঠোঁটে ঠেকানো ওষুধের গেলাসটা নামিয়ে মহেশ তার চিরন্তন হাসি হেসে রসিকতার সুরে বলে, এক সেকেন্ড কি দু-সেকেন্ডের জন্য বিষম-খাওয়া থেকে বাঁচলাম। এক মিনিট চুপচাপ বসবে কি—ওষুধটা নিশ্চিন্ত মনে গিলে নেব ?

মানব হেসে বলে, আপনাকে তবে সত্যি সত্যি তাড়ায়নি ? প্রেসের কাজেই যাচ্ছেন ?

ওষুধ খেয়ে কোমরটাকে একটু আরাম দেবার জন্য এক মিনিটের জন্য দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে মহেশ বলে, তাড়িয়ে দিয়েছিল রে ভাই—ব্যক্তিত্ব খাটিয়ে কোনোরকমে সামলে নিয়েছি। তবে মন বলছে, আর বেশি দিন চলবে না, বরখাস্ত হবই হব। তোমরা এসে কীভাবে যে বিগড়ে দিলে মনটা আমার, লেখা বাছাই করে করে বুড়ো হয়ে আজ লেখা বাছতে ভুল হয়ে যাচ্ছে !

সত্যি কি ভুল হচ্ছে ? না, ঠিক বাছাই করছেন ?

মহেশ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কোমরের ব্যথায় মুখ বাঁকিয়ে উঠে দাঁড়ায়, তবু হালকা সুরেই বলে, যে বাছাই করে এ বয়সে চাকরি যায় সেটা কী ঠিক বাছাই ? তোমরা আমার মাথা গুলিয়ে দিলে বুড়ো বয়সে।

শেষ পর্যন্ত মহেশের আশঙ্কাই সত্য হয়ে দাঁড়ায়। আশঙ্কা অবশ্য তার আকাশ থেকে জাগেনি, ধনদাসের রকম-সকম দেখেই চাকরি যাবার কথা মনে হয়েছিল।

আইনের হিসাবে ওই পনেরো দিনের নোটিশেই চাকরি তার খতম হয়ে গেছে কিন্তু ধনদাস ওই নোটিশের কথা উল্লেখ করে না, নতুন কোনো নোটিশও দেয় না। মুখে খুব ভদ্রভাবে দুঃখ প্রকাশ করে জানিয়ে দেয় যে পরের মাস থেকে আর তার কাজ করতে হবে না।

মহেশ হাসিমুখেই বলে, আবার কী অপরাধ করলাম ?

ধনদাস তাড়াতাড়ি বলে, না না, অপরাধ কিছুই করেননি। কী জানেন, কাগজটা আমি একটু অন্য রকম করতে চাই !

মহেশ বলে, বলুন না কী রকম কাগজ চান, আমিই করে দিচ্ছি, এতকাল সম্পাদকগিরি করলাম, আপনার মনের মতো কাগজ বার করে দিতে পারব না ! কিন্তু মুখ ফুটে আমায় তো বলতে হবে আপনি ঠিক কী জিনিস চান ?

ধনদাস ইতস্তত করে অস্বস্তির সঙ্গে বলে, আমি একজন কমবয়সি লোক রাখতে চাই।

তাই বলুন ! এ বুড়োকে আর পছন্দ হচ্ছে না ?

লোক ঠিক না করে ধনদাস অবশ্য মহেশকে তাড়ায়নি। পরীক্ষামূলকভাবে তিন মাসের জন্য উমাকান্তকে মহেশের পদে বসিয়ে দিয়েছে।

মহেশের যেদিন থেকে কাজে যাওয়া খতম সেদিন প্রেসের প্রায় সকলেই নির্দিষ্ট সময়ের আধঘণ্টা আগে প্রেসে হাজির হয় এবং একসঙ্গে জড়ো হয়ে বসে জটলা আরম্ভ করে।

মহেশকে এ রকম আচমকা বিদায় করায় তাদের সকলের মনেই প্রচুর অসন্তোষ জেগেছে। কিন্তু ব্যাপারটা তারা ভালোমতো বুঝতে পারেনি।

খারাপ লেখা ছাপিয়ে কাগজের ক্ষতি করার অপরাধে মহেশকে বরখাস্ত করা হয়েছে ?

কোন লেখাটা খারাপ ছাপা হয়েছে তাদের অল্পবিদ্যা নিয়ে তারা বুঝে উঠতে পারে না। এবারও দু-একটা জোরালো লেখা ছাপা হয়েছে। কিন্তু মানব আর খালেকের লেখার মতো তেজি নয়। জোরালো লেখা থাকলে, তেজি লেখা থাকলে, কোন হিসাবে কাগজের ক্ষতি হয়, সে কথাটা একেবারেই তাদের মগজে ঢোকে না।

একজন বলে, এবার বরং আরও ভালো হয়েছে কাগজটা।

কালাচাঁদ বলে, ভাই, লেখা বড়ো কঠিন কাজ। জীবনযৌবন পণ না করলে কেউ ভালো লিখতে পারে না। মানুবাবু আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়ে কোঁচা উড়িয়ে ফুর্তি করে বেড়াতে পারে, কিন্তু কেবল লেখার খাতিরে মোদের বস্তির ঘরে পচছে, মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া জ্বরে অজ্ঞান হচ্ছে। ব্যাপারটা কী বুঝিনে মোটে, কিন্তু জীবনপাত করে তো লিখছে, তার লেখা ছাপিয়ে এতকালের চাকরি যাচ্ছে মহেশবাবুর ! মোর পেটে যদি বিদ্যা থাকত, লিখতে যদি পারতাম—কত্তাব্যাটাকে এক-চোট ঠুকে লিখে দেখিয়ে দিতাম মজা !

ধনদাস আসে এগারোটায়।

মহেশ বরাবর ঠিক টাইমে এসে কাজ শুরু করে দিত, আজ মহেশ আসবে না। সুতরাং জানা কথাই যে ঠিক সময়ে কাজও শুরু হবে না।

যথাসময়ে উমাকান্তকে সঙ্গে করে ধনদাসকে আসতে দেখে তারা থ বনে যায়। দেখেই টের পাওয়া যায় যে উমাকান্ত স্নান করে খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরিয়েছে। ঠিক এই সময়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে প্রেসে আসার মানে বুঝতেও তাদের এক মুহূর্ত বিলম্ব হয় না।

হতভম্ব কালাচাঁদ ভাবে, শেষ পর্যন্ত মহেশের জায়গায় বহাল হল উমাকান্ত ! প্রকারান্তরে তার বউকে এক রকম খুন করবার জন্য যে দায়ি, মহেশকে চাকরি থেকে এক রকম অকারণেই যে তাড়িয়েছে—উমাকান্ত তার কাছে সেই চাকরি পেতে নিতে পারল ! উমাকান্ত যে এই দরের মানুষ এটা তো কোনোদিন সে কল্পনাও করতে পারেনি !

ধনদাস হাসিমুখে অমায়িকভাবে উঁচুগলায় সকলকে শুনিয়ে উমাকান্তকে বলে, আপনাকে তো আর কাগজের কথা বুঝিয়ে বলতে হবে না—সবই আপনার জানা আছে।

মহেশের প্রায় চোদ্দো বছর ব্যবহাব করা টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে উমাকান্ত বলে, মোটামুটি জানা আছে, তবে কিনা কোনোদিন হাতনাতে করিনি—প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হবে।

সে তো বটেই ! আপনি তবে নিজের জায়গায় বসুন, এক-একজন করে ডেকে জেনে-বুঝে নিন কে কী কাজ করছে। কাগজটার ফাইল আর লেখা দেখিয়ে শুনিয়ে ব্যাপার সব হরেন আপনাকে বুঝিয়ে দেবে—

ওর নাম হরেন।

কাগজের ও প্রেসের বহুদিনের প্রুফ রিডারকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিয়ে ধনদাস বলে, একবার ভেবেছিলাম মহেশবাবুকেই বলব আপনাকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে মাইনে নিয়ে যাবেন—সব

আপিসে যেমন নিয়ম। তারপর আপনার দিকটা বিবেচনা করে সেটা আর করলাম না—আপনার চেনা লোক মহেশবাবু, আপনি হয়তো লজ্জা পাবেন।

মহেশের সঙ্গে চাকরির ব্যাপার নিয়ে উমাকান্তের যে অনেক কথা হয়েছে সেটা ধনদাস জানত না, কালাচাঁদও জানত না।

তাই ঘরে ফিরেই মানবকে সবিস্তারে ব্যাপার জানিয়ে উমাকান্তের বিরুদ্ধে প্রায় গালাগালির মতো তীব্র একটা মন্তব্য কবা সত্ত্বেও মানবকে হাসতে দেখে কালাচাঁদ অবাক হয়ে যায়।

আপনি হাসছেন ?

মানব গম্ভীর হয়ে বলে, সে ভাব থেকে হাসছি না কালাচাঁদ—না জেনে না বুঝে কীভাবে একজন মানুষ আরেকজনের সম্পর্কে ভুল বিচার করে বসে, তাই ভেবে হাসছি। তুমি জান না যে উমাবাবু মহেশবাবুর কাছে গিয়েছিলেন, তাঁকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তাঁর চাকরিতে ফিরে যাবার কোনো চান্স আছে কি না, উনি চাকরি নিতে রাজি না হলে মহেশবাবুর কোনো লাভ আছে কি না !

কালাচাঁদ তবু সন্তুষ্ট হয় না, ব্যঙ্গের সুরে বলে, সে তো বুঝলাম—লুকিয়ে-চুরিয়ে তলে তলে কাজটা বাগাননি। কিন্তু বউ মরছে শুনে যে দেড়শো টাকায় বড়ো একটা বইয়ের কপিরাইট কিনতে চায়—স্রেফ টাকার অভাবে বউটা মরার পরেও তার কাছে কোনো মানুষ চাকরি করতে পারে মানুবাবু ?

ত।র ।দকে ধীর চোখে চেয়ে মানব খানিকক্ষণ ভেবে বলে, তোমায় জানি বলেই বলছি কালাচাঁদ। তাছাড়া, এবার থেকে উমাবাবু তোমারও কাজকর্ম দেখবেন—মনে এ রকম বিরাগ থাকলে তোমারও কাজ করতে অসুবিধা হবে। কিন্তু আমাকে কথা দাও—কানে যা শুনবে এখন, মুখে কখনও উচ্চারণ করবে না।

কথা দিলাম মানুবাবু !

উমাবাবু ধনদাসকে খুন করার কথা ভাবছিলেন।

কালাচাঁদ চমৎকৃত হয়ে বলে, বটে !

মানব বলে যায়, কিন্তু লেখক মানুষ তো, ভালো করেই জানেন যে একজনকে খুন করাটা কোনো শাস্তিই নয়। লোকে বলে মরার বাড়া গাল নেই—কিন্তু মরলে তো সব ফুরিয়েই গেল, মরে গেলে আর কীসে কী আসে যায় ? চলতি কথাটা কিন্তু মিথ্যে নয়, সত্যিই মরতে বলার চেয়ে বড়ো গাল, বড়ো শাপমন্যি আর নেই। বাঁচতে চাওয়াটাই মানুষের সব চেয়ে বড়ো ধর্ম কিনা—মরতে বলাটা তাই সব চেয়ে বড়ো গাল। মৃত্যুভয় জাগানো খুব বড়ো শাস্তি—মেরে ফেলাটা কিন্তু কোনো শাস্তিই নয়।

একটু থেমে মানব যোগ দেয়, আমি কিন্তু বক্তৃতা করছি না, তোমায় উমাবাবুর কথাগুলি শোনাচ্ছি কালাচাঁদ।

কালাচাঁদ একটু অভিভূতভাবে বলে, উমাবাবু কি এইভাবে কথাগুলি বলেছিলেন ? না আপনি ওনার কথা নিজে সাজিয়ে-গুছিয়ে বললেন ?

উমাবাবুর মনের অবস্থা বোঝ তো ? এ: ঘণ্টার বেশি একটানা এলোমেলো কথা বলে গিয়েছিলেন। আমি তোমায় মোট কথাটা বললাম। উমাবাবু ব্যাপারটা শুধু অনুভব করেছেন—মাথায় তেমন স্পষ্টভাবে ধরতে পারেননি। তুমি সাফ বুঝতে পারবে। খুন করা ফাঁসি দেওয়ার আসল মানে কী ? যে খুন হল, যে ফাঁসি গেল তার কোনো শাস্তি নয়। যারা বাঁচতে চায় তাদের জানিয়ে দেওয়া যে এ রকম কাজ কোরো না, এ রকম করলে মরতে হবে। বুঝেছ ব্যাপারটা ?

বুঝেছি মানুবাবু !

ধনদাসকে খুন না করে উমাবাবু তাই ওকে ফাঁসিয়ে ফাঁসিয়ে ডুবিয়ে ডুবিয়ে সাজা দেবার সুযোগ হিসাবে চাকরিটা নিয়েছেন।

খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে কালাচাঁদ বলে, পারবেন না। উনি গায়ের জ্বালায় মিথ্যা প্রতিশোধের স্বপন দেখছেন। সবকিছু বড়োকত্তার হাতের মুঠোয়—ওনাকে গোলামের মতো চাকরিই করতে হবে। উনি কিছুই করতে পারবেন না।

মানব খুশি হয়ে বলে, ঠিক ধরেছ। এভাবে চাকরি নিয়ে গোলাম হয়ে কি ধনদাসদের ফাঁসানো যায় ? নিজের মনের জ্বালায় শুধু জ্বলে মরা ! তবু আমি উমাবাবুকে বারণ করিনি। পুতুলদির জন্য প্রাণের জ্বালা তো আছেই—ঘরেই থাকুন আর জ্বালা জুড়োবার সুযোগ খুঁজে চাকরিই করুন—জ্বালা ওঁর নিভবে না। ছ-মাস এক বছর যদি পারেন তো করুন চাকরিটা—ছেলেমেয়েগুলো খেয়ে বাঁচবে।

আস্তি আগের মতোই ঘরে আসে যায়, কথা বলতে বলতে যেন খেলার ছলেই টুকটাক কয়েকটা কাজ সেরে দেয় —সে না করলে যা মানবকেই করতে হত।

কালাচাঁদের লেখার নমুনা এনে শোনায়। বলে, বাবাকে ধমকে দিয়েছি। মা ফিরে এসেছে, কুঞ্জর মা চোখ পেতে রেখেছে, সবাই দেখেছে—কেন আসব না ? বদনাম মোদের দেবেই বদ লোকে—সে ভয়ে কি কুঁকড়ে থাকব ?—আস্তি হাসে।

সবাইকে বলেছি—বেতন নিয়ে তোমার ঘরে ঝি-র কাজ করি। একেবারে মিছে কথা হবে—তাই তোমায় ঘরটা ঝেঁটিয়ে দিই, উনানটা ধরিয়ে দিই—

আমায় বলে কয়ে উনানটা ধরাতে তো হয় ? রাঁধব কি না খাব কি না ঠিক নেই—মিছিমিছি উনান ধরিয়ে কয়লা পুড়িয়ে ছাই করা !

আস্তি রেগে মাথা উঁচু করে দুচোখে অনুশাসন ফুটিয়ে বলে, রাঁধবে কি না ঠিক নেই মানে ? দুবেলা রাঁধবে, দুবেলা পেট ভরে খাবে। না খেয়ে মানুষ বাঁচে ? না খেয়ে মানুষ খাটতে পাবে ? অমন ছাই লেখা দিয়ে কাজ নেই, লেখা চুলোয় দিয়ে সেই চুলোয় ভালো ভালো রান্না বেঁধে পেট ভরে খেলে অনেক ভালো হয়। আরশিতে একবারটি তাকিয়ে দ্যাখো না কী চেহাঁরা হয়েছে নিজের ?

ভালো ভালো জিনিস রেঁধে খাবার পয়সা কে দেবে ?

আদায় করবে। তোমার লেখা যাদের দরকার তারা পয়সা না দিলে লিখবে না !

আস্তির নির্ভয় নিশ্চিন্ত ভাব—আদায় করাটা যেন সংসারে এমনি সহজ ব্যাপার !

তবে হ্যাঁ, লেখকের খামখেয়ালি করতে হওয়ার কুসংস্কারে কতগুলি বাজে ঝোঁকে মানব যে এত কষ্টে রোজগার করা পয়সা নষ্ট করত—আস্তি ও রকম কয়েকটা পাগলামি সামাল দিয়ে সে পয়সাটা দুবেলা পেটে অন্ন দেবার ভোঁতা বিশ্রী একঘেয়ে দরকারে লাগাতে তাকে বাধ্য করেছে। ধোঁয়ার চেয়ে খাদ্য যে ঢের বেশি দামি এই সহজ সত্যটা তার মাথায় ঢোকাবার চেষ্টা করে চলেছে অবিরাম।

হয়তো লিখতে লিখতে মুখ না তুলেই মানব বলে, বেশি বকবক না করে এক প্যাকেট সিগ্রেট আনিয়ে দিলে সত্যিকারের কাজ হত আস্তি। বালিশের নীচে পয়সা আছে।

বালিশের নীচের পয়সার পরিমাণটা দেখে আস্তি হিসাব করে পয়সা নিয়ে যায়—দুটো সিগারেট, এক বান্ডিল বিড়ি আর একজোড়া ডিম নিয়ে আসে !

গনগন করে উনান জ্বলছে। চটপট অল্প তেলে একটা ডিমের মামলেট ভেজে চা করে এনে দিয়ে বলে, বুদ্ধির গোড়ায় খালি ধোঁয়া দিলেই হয় না—পেটের পূজা না করলে বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়।

বেশি খেলে লিখতে পারি না যে !

আস্তি গালে হাত দেয়।

একটা ডিমের মামলেট আর এক কাপ চা তোমার বেশি খাওয়া ? না খেয়ে লিখে লিখে কী ছুঁচিবাইটাই করেছ ! মোদের তুমি আবার ছুঁচিবাইয়ের খোঁচা দাও !

মুখে যাই বলুক মানব সাগ্রহে মামলেট মুখে দিয়ে পরম আয়াসে চা খেতে শুরু করেছে দেখে আত্তি খুশি হয়ে বলে, মা-র ক-টা কাজ সেরে আসি। বাবার একটা লেখা শোনাব।

কালাচাঁদ নতুন নিয়ম করেছে লেখার সাধনা চালাবার।

সারাদিন খেটে এসে সে মানবের ঘরে বাতির আলোয় শুধু পড়ে—আধঘণ্টা পড়ে হাই তুলতে শুরু করে কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় আরও আধঘণ্টা পড়া চালিয়ে যায়।

তারপর কাঁকর-ভরা চালের ভাত বা পচা আটার রুটি এবং ডাল-তরকারি যা আত্তির মা দেয় তাই গোগ্রাসে গিলে বিছানায় চিত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

রোজ একসময়ে না হলেও খানিকটা রাত্রি বাকি থাকতেই সে জাগে এবং আলসেমির অভ্যস্ত মোহ কাটিয়ে গায়ের জোরে উঠে পড়ে মুখে চোখে জল দিয়ে এক জামবাটি জল খেয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে লিখতে বসে যায়। লেখার জন্য মানবের জোর আলোর বড়ো ল্যাম্পের মতোই একটা ছোটো ল্যাম্প সে কিনেছে।

মানবের ল্যাম্পটা সমস্ত ঘর আলোকিত করে—একেবারে লেখার কাগজের মাথার কাছাকাছি বসালে কালাচাঁদের ছোটো ল্যাম্পটা ঘরে আলো ছড়ায় সামান্য—কিন্তু তার লেখার কাগজে প্রায় মানবের বড়ো ল্যাম্পের মতোই আলোকপাত করে।

একটা মানুষ খাটতে যাবে। খেটে যেমন হোক কিছু সে পয়সা আনবে। সারাদিন খাটতে যাওযার জন্য তাকে খাইয়ে পরিয়ে তৈরি করে দিতে হবে বইকী।

কালাচাঁদ খেতে বসলে তার নতুন লেখার নমুনা নিয়ে আত্তি মানবের ঘরে আসে, বলে, শোনো দিকিনি বাবার এ লেখাটা কেমন হয়েছে ?

লেখাটা পড়া চলতে চলতেই কোনোদিন কালাচাঁদ খাওয়া শেষ করে এসে একপাশে বসে, কোনোদিন লেখা পড়ে শেষ হবার পর মানবের মন্তব্য শুরু হওয়ার পর আসে।

সেদিন বড়োই উৎফুল্ল মনে হয় আত্তিকে। ঘরে এসেই চাপা উত্তেজনার সুরে সোৎসাহে বলে, বাবা একটা কবিতা লিখেছে মানুবাবু !

মানব প্রুফ দেখছিল। মুখ তুলে বলে, কবিতা লিখেছে ? হতেই পারে না। কালাচাঁদের কবিতা লেখার ক্ষমতা নেই আত্তি। কালাচাঁদ ছড়া লিখেছে। কবিতার মতো যা কিছু লিখবে, সব ছড়া হয়ে যাবে।

আত্তি ফুঁসে উঠে, বটে নাকি ? তবে শুনে কাজ নেই। কবিতা লিখবে তোমরা আর মোর বাবা কবিতা লিখলে তা হবে শুধু ছড়া ! অত খায় না !

মানব হেসে বলে, ছড়া কি কবিতার চেয়ে ছোটো রে পাগলি ? একটা ছড়া মুখস্থ হয়ে যায় সব মানুষের—হাজার কবিতা শূন্যে মিশে যায়।

আত্তি নম্র হয়ে বলে, তাই বলো— ও সব কী আমরা জানি বুঝি ? কথা শুনে ভাবলাম কবিতা না লিখে ছড়া লেখা মহাপাপ—মোর বাপটা বুঝি পাপ করেছে।

ছড়াটা শোনা না আত্তি, বেশি বকবক না করে ?

ছড়া শুনে মানব অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে।

তার ভাব দেখে আত্তিও মুখ ফুটে তার মতামত জিজ্ঞাসা করতে সাহস পায় না।

শেষে বিরক্ত হয়ে বলে, কী হল ? কিছু বলবে তো ?

কিছু বলতে পারছি না যে ? একবার মনে হচ্ছে অদ্ভুত রকম ভালো হয়েছে—আবার মনে হচ্ছে সবটা ছেলেমানুষি ব্যাপার !

তার এই মন্তব্যে আত্তি কিন্তু খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

উড়িয়ে দিতে পারছ না তো ? বলতে পারছ না তো বাজে হয়েছে ?

মানব মাথা নেড়ে বলে, না—উড়িয়ে দেওয়া যায় না, বাজে বলা যায় না। কালাচাঁদ তোকেও পয়দা করেছে, ছড়াটাও পয়দা করেছে। মনে হচ্ছে, ছড়াটাকে উড়িয়ে দিলে বাজে বললে, তোকেও উড়িয়ে দিতে হয় বাজে বলতে হয় !

আত্তি খুশির হাসি হেসে বলে, এবার যেদিন খুশি যখন খুশি মোকে আদর কোরো। তোমায় জেনে গেছি চিনে গেছি—তোমার আদর সস্তা নয়। তোমার আদর পাওয়া মোর ভাগ্যির কথা।

খালেকের সাম্প্রতিক কবিতার সঙ্গে কালাচাঁদের ছড়ার একটা আশ্চর্য মিল আছে মনে হয়---সরলতার মিল।

খালেকের যায়-যায় অবস্থা। তবু হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে সে কবিতা লিখছে। যখন চলে ফিরে বেড়াত, জীবনের স্তরে স্তরে খোঁজ করত কবিতার প্রাণবস্তু--তখন সে এর সিকি কবিতাও লেখেনি।

জীবনদীপ নিভে আসছে জেনে হাসপাতালে রোগশয্যায় শুয়ে সে যেন তার বক্তব্যকে কাব্যরূপ দিতে ব্যাকুল হয়েছে।

তার কবিতা পড়ে উমাকান্ত মানবকে বলে, এ কবিতা না ছেপে তো পারব না। কেন তুমি ওর কবিতা এনে আমায় শোনাও ? এই কবিতা ছাপিয়ে জেলে গেলে ভালো হবে ?

মানব কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলে, যান না একবার জেলে ! এ দেশে জেল না খেটে অনেক কাল বেঁচেছেন, একবার নয় জেলের অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করবেন। খালেক যে আটাশ বছরে মরছে ?

ওর কবিতাটা তাই ছাপাতেই হবে ? আটাশ বছরে মরছে বলে ?

না না, আপনি সম্পাদক—লেখা ছাপানো না ছাপানো আপনার খুশি। আমরাও কি আপনার ঝঞ্ঝাট জানি না ? এ কবিতা না ছাপতে পারলে কিছুমাত্র দোষ ধরব না।

এ কবিতা না ছাপিয়ে পারব না।

তবেই দেখুন, আমার কোনো দোষ নেই।

উমাকান্ত নিচু গলায় বলে, কবিতাটা এ মাসেই ছাপিয়ে দেব—গল্প বুঝি আর লিখছ না ?

গল্প একটা লেখা আছে—আপনার জন্যেই। এ মাসে খালেকের কবিতাটা যাক—সামনের মাসে আমার গল্পটা যাবে। এক মাসে আমাদের দুজনের লেখা ছাপলে আপনার তো আবার বিপদ ঘটবে !

যা হবার হবে তোমার গল্পটা এনে দাও।

এক সংখ্যায় মানবের কড়া গল্প আর খালেকের বাঘা কবিতা বার হয়, দিন কাটে কিন্তু ধনদাস একটি কথাও বলে না। উমাকান্ত আশ্চর্য হয়ে ভাবে, লেখা দুটো কি তার চোখ এড়িয়ে গেছে ?

মানবের সেদিন হঠাৎ জ্বর এল। সাধারণ সর্দি-জ্বর নয়, একেবারে হাড়কাঁপানো খাঁটি জাতের জ্বর।

শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছিল ক-দিন, দুপুরে সস্তা হোটেলে দু-একটা রুটি আর দু-একআনার আলুর দম খেয়ে আসবে ভেবে সে আর সকালবেলা রান্নার আয়োজন করেনি।

একটা জরুরি লেখা লিখতে বসেছিল।

লেখা কিন্তু কিছুতেই এগোলো না। বেশ শীত শীত করতে লাগল বেলা দশটা নাগাদ।

এগারোটায় দড়ির খাটিয়ায় বিছানো ছেঁড়া শতরঞ্চিতে পুরানো তোশকটা গায়ে চাপিয়ে গুঁড়িমুড়ি হয়ে শুয়েও ভিতরের হাড়কাঁপানো শীতে সে কাঁপতে লাগল ঠকঠক করে।

জ্বর যেন লাফিয়ে লাফিয়ে চড়তে থাকে, মাথার মধ্যে ভাবনা-চিন্তা কেমন গোল পাকিয়ে যায়, একটা আধা-সচেতন অবস্থায় সে আচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকে। কিন্তু তার মধ্যেই সে টের পায় যে আত্তি এসে শিয়রে বসে কপালে জলপটি দিয়ে মাথায় হাওয়া করতে আরম্ভ করেছে। কুঞ্জর মা-র তর্জনগর্জনও তার কানে আসে।

আত্তির তীক্ষ্ণ চিৎকারে চমকে উঠে রক্তবর্ণ চোখ মেলে একবার দেখবার চেষ্টাও করে তার মুখ।

জ্বরে গা আগুন হয়েছে, হুঁশ হারিয়েছে—মরে যাবে না মানুষটা ? চেঁচাসনে। গিয়ে ঘাড় মটকে দিয়ে থামালে ভালো হবে ?

সন্ধ্যার পর কখন কালাচাঁদ আসে, উবু হয়ে থাকে, চুপচাপ বসে। আত্তি বরফ এনে দিতে বললে কখন সে বরফের সঙ্গে দুবছর ডাক্তারি পড়া লাইসেন্সহীন ডাক্তার শশাঙ্ককেও ডেকে আনে—দুবছর ডাক্তারি শেখা বিদ্যা আর চোদ্দো বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে শশাঙ্ক তার গা ফুঁড়ে কী ওষুধ দেয়, কিছুই মানব জানতে পাবে না।

শেষরাত্রে ঘাম দিয়ে তার জ্বর কমে যায়।

কেরোসিনের বড়ো ল্যাম্পটা জ্বালানোই ছিল। নিজের এতকালের চেনা ল্যাম্পের আলোয় জেগেও মানবের মনে হয় কোনো এক অজানা জগতে যেন তার ঘুম ভেঙেছে।

কালাচাঁদ মেঝেতে একটা মাদুরে চিত হয়ে নাক ডাকাচ্ছে। আত্তি বসে আছে শিয়রে।

বেশ খানিকক্ষণ সময় লাগে মানবের সে কোথায় আছে, কেন আছে, কী হচ্ছে, ব্যাপার বুঝতে।

কয়েকবার চোখ খুলে চোখ বুজে আত্তিকে একভাবে শিয়রে নিথর মূর্তির মতো বসে থাকতে দেখে নিয়ে, কয়েকবার এপাশ ওপাশ ফিরে মানব ক্ষীণকণ্ঠে বলে, একটু জল খাব।

দিচ্ছি জল।

তারই কুঁজো থেকে তারই কাচের গেলাসে জল ভরে এনে আত্তি এবার আর শিয়রে বসে না। খাটিয়ায় বিছানার পাশে বসে বাঁ হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে খানিকটা উঁচু করে ধরে ডান হাতে গেলাসটা তার মুখে ধরে বলে, খাও—জল খাও।

কী মিষ্টি লাগে ভাঙা টিউবওয়েলের জল !

কী মধুর লাগে আত্তির গায়ের আলগা আলগা স্পর্শ !

এক গ্লাস জল খেয়ে খাটিয়ায় জোড়াসন হয়ে বসে মানব ক্ষীণ জড়ানো গলায় বলে, সারারাত জেগে আছ বুঝি ?

আত্তি মৃদুস্বরে বলে, কী জ্বরটাই তোমার হয়ে গেল। ডাক্তার বললে এ নাকি এক রকমের ম্যালেরিয়া—তখন স্বস্তি পেলাম।

আমার জ্বর হলে তোমার কীসের অস্বস্তি ?

ডাক্তার আরও কী বলল শুনবে ? এই বয়সে তোমার গায়ে মোটে জোর নেই—জ্বরটা তাই এত কাবু করেছে। ভালো ভালো খাবার খেতে বলেছে ডাক্তার—বুঝলে ?

মুখের কাছে মুখ এনে হাত নেড়ে তার কথা বলার ভঙ্গি দেখে মানব একটু হেসে বলে, বুঝলাম।

মানবের আসল জ্বর ছেড়ে গিয়ে উলটো পালা শুরু হয় কুইনিনের জ্বরবোধ আর নেশার।

যেহেতু ম্যালেরিয়া জ্বর, ঠেসে কুইনিন দাও। হাতুড়ে ডাক্তার শশাঙ্ক সোৎসাহে গা ফুঁড়ে কুইনাইন দিয়ে, দৈনিক তিনবার করে খাবার জন্য কুইনাইন মিকশ্চার দিয়ে সগর্বে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল—দুটাকা দক্ষিণা আদায় করে।

মানবের শরীর কমজোরি বলে জ্বরের প্রতাপ বেশি হয়েছিল এটা ধরতে পেরেও তার খেয়াল হয়নি যে এই রোগীকে একটু হিসেব করে কুইনিন দেওয়া উচিত।

কালাচাঁদের ঘুম ভাঙলে মানব কাতর কণ্ঠে বলে, একবার ডাক্তারের কাছে যাবে কালাচাঁদ ? বলবে যে জ্বর নেই কিন্তু আমার ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছে, গা ঘামছে !

কালাচাঁদ ঘুরে আসে। ডাক্তার আর কী বলবে, সবাই যা জানে সেই চিরকেলে কথা—বেশি করে দুধ খাও !

দুধ !

মানব বালিশের তলাটা হাতড়ায়। বালিশের নীচে গোটা তিনেক টাকা ছিল, সেটা খুঁজে পাওয়া যায় না।

আত্তি কি তার দিকে নজর পেতে রেখেই ঘরের কাজ করছিল ? কোথা থেকে এসে বলে, টাকা নেই—ডাক্তারকে দিয়েছি, ওষুধের দাম লেগেছে। কুলোয়নি ওতে, মোদের কাছে কিছু ধার করেছ।

তবে আর কথা কী !

আত্তি কিন্তু জোগাড়ে মেয়ে। কালাচাঁদের কাছেই বোধ হয় সে ব্যাপার শোনে, পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যে একবাটি দুধ হাতে করে এসে বলে—ধার আরও বাড়ল, সেরে উঠে শোধ দিয়ো।

যে লেখাটা লিখতে লিখতে জ্বর এসে গিয়েছিল সেটা শেষ করলেই ধার শোধ হবে। কিন্তু শশাঙ্কের কুইনিনের এমনি তেজ যে তিন দিনের মধ্যে মানব লিখতে বসতেই পারে না।

আগেকার চেনা একজন ভালো ডাক্তারের কাছে গিয়ে সে সব কথা খুলে বলে, ডাক্তার মন দিয়ে শুনে একটু হাসে।

বলে, ব্যাপারটা বুঝে দেখুন ! কুইনিন দিয়েছে ঠিক তাতে ভুল নেই। কিন্তু অতিরিক্ত রকম বেশি দিয়েছে। জানে না যে তা নয়, আসলে মেশাল দেওয়া কমজোরি ভেজাল ওষুধ বেশি ডোজে দিয়ে থাকে, আপনাকেও তাই দিয়েছে। কোনো কারণে আপনার বেলা পড়েছে খাঁটি ওষুধ।

মানবও হেসে বলে, আমারই সৌভাগ্য !

কুইনিনের নেশা কাটে তিন দিন পরে। জ্বরের নেশা আর ওষুধের নেশা কাটিয়ে উঠে মানব ভোরবেলা খাটিয়ার বিছানায় ছটফট করে—কী দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে তার খাটিয়ার ময়লা বিছানা থেকে !

লেখক হিসাবে খাঁটি থাকার জিদের ফলে তার যেন বেশি রকম দুর্দশা দাঁড়িয়েছে। অনেক দিন পরে প্রাণটা বড়ো জ্বালা করে—যতক্ষণ না খালেককে মনে পড়ে।

৯

প্রেসের ম্যানেজার আর কাগজের সম্পাদক হয়ে ভেতরে ঢুকে ধনদাসকে একেবারে ফাঁসিয়ে দেবার কল্পনা ছিল উমাকান্তের। মুখে আনুগত্য জানাবে, কাজও মোটামুটি ঠিকমতো করে যাবে, এদিকে তাকে তাকে থাকবে আর সুযোগ পেলেই ডুবিয়ে দেবে ধনদাসকে।

মানব কালাচাঁদের কাছে দ্বিধাহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিল যে ধনদাসের কিছুই করতে পারবে না উমাকান্ত—এভাবে ধনদাসদের ফাঁসানোর চেষ্টা নিছক পাগলামি।

তবু তারা পুতুলের শোকে কাতর উমাকান্তের পাগলামিতে সায় দিয়েছিল এই ভেবে যে সে যখন ধনদাসকে নিয়মসঙ্গতভাবে ফাঁসাবার ইচ্ছাই পোষণ করে, হঠাৎ খাপছাড়া কিছু সে যখন করবে না, কারও যখন কোনো ক্ষতি নেই—মহেশের স্থানে করুক সে কিছুদিন চাকরি। ছেলেমেয়েরা বাঁচুক, সে নিজেও একটু সামলে-সুমলে উঠুক।

মানবের ভবিষ্যদ্বাণী শুধু সার্থক প্রমাণিত হয় না—দেখা যায় সে খুব কম করেই বলেছিল।

উমাকান্ত কাজে লেগে ধনদাসকে ফাঁসিয়ে দেবার বদলে তাকে যেন ফাঁপিয়ে দেয়।

রস সাহিত্যের বিক্রি বাড়ে, বিজ্ঞাপন বাড়ে।

প্রেসের কাজ—ভালো ভালো পার্টি থেকে পাওয়া কাজ—এত বেড়ে যায় যে ধনদাসকে কয়েক মন নতুন টাইপ আর কয়েকজন নতুন কম্পোজিটার আমদানি করতে হয়।

উমাকান্তকে ধনদাস প্রায় খাতির করতে আরম্ভ করে জামাইয়ের মতো। তাদের সম্পর্ক যে শুধু মাইনে-দেনেওলা মনিব আর খেটে-খাওয়া চাকুরের—এটা বাতিল করার জন্য উমাকান্তের চেয়ে তারই যেন গরজটা বেশি দেখা যায়।

শরীর ম্যাজম্যাজ করলেই, লেখার কাজে জমে গেলেই, উমাকান্ত কাজে যায় না। মাস হিসাবে নয়, হপ্তায় সে গড়পড়তা দু-একদিন কামাই শুরু করেছে। তবু ধনদাস কিছুই বলে না। শুধু একবার জিজ্ঞাসা করে যে কী হয়েছিল-- উমাকান্ত যে কৈফিয়ত দেয় তাই সে উদারভাবে প্রশান্তমুখে মেনে নেয় !

প্রেসের উন্নতির কার্য-কারণটা বুঝে উঠতে পারেনি, বুঝবার মতো মাথাও ধনদাসের নেই। ও সব জটিল হিসাব বুঝবার সাধও তার নেই। ধনদাস শুধু বোঝে যে মহেশকে তাড়িয়ে উমাকান্তকে সেই পোস্টে এনেই তার ভাগ্য খুলে গেছে।

কাজে এত ফাঁকি দেয় উমাকান্ত, মৃত্যুশয্যাশায়ী খালেকের কবিতা ধনদাসের নিষেধ সত্ত্বেও রস সাহিত্যে ছাপিয়ে দেয়—মানবের একটা ধারাবাহিক উপন্যাস পর্যন্ত তাকে জিজ্ঞাসা না করেই ছাপতে শুরু করে—তবু ধনদাস বছর ঘুরতে না ঘুরতে উমাকান্তকে বিনামূল্যে অফার করে শতকরা পঞ্চমাংশ শেয়ার।

একটু যেন লজ্জিতভাবেই বলে, যা করেছেন তার তুলনা হয় না। মালিকানার সামান্য একটু অংশ দিচ্ছি—আরও বেশি আপনার পাওয়া উচিত ছিল।

আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে চান ?

বাঁধা তো পড়েই গেছেন—আর বাঁধনে ভয় কী ? মাইনে যা আছে তাই রইল—মাসিক কাজের হিসাবে একটা কমিশন পাবেন। সারাবছরের হিসাবে লাভের এই পাঁচ পার্সেন্ট পাবেন।

উমাকান্তের মুখ কেন খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না, ধনদাস বুঝতে পারে না। লেখকেরা খাপছাড়া মানুষ সন্দেহ নেই।

কিছু অবশ্য আসে যায় না তাতে। প্রেস আর কাগজের উন্নতিই তার আসল হিসাব—একমাত্র হিসাব। আবার ধনদাস হেসে বলে, গা লাগিয়ে কাজ করছেন--আরও একটু গা লাগান না ? আমার লাভ বাড়িয়ে দিলে আপনার কোনো লাভ নেই, আপনি কোনো ভাগ পাবেন না, এ ধারণা মনেও স্থান দেবেন না। ফাইভ পার্সেন্ট লাভের মালিকানা এমনিতেই দিলাম—পুরস্কার হিসেবে। চেষ্টা করে যত বাড়াবেন তত আপনার মালিকানার শেয়ার বাড়বে। একদিন হয়তো আমার সমান বখরাদার হয়ে যাবেন।

কালাচাঁদ সবই শুনতে পায়।

উমাকান্ত এ সব কথা মানব, মহেশদের যা বলে তাতে মিথ্যার ছাপ না থাকায়, কিছুই বানিয়ে না বলায়, কী খুশিই যে হয় কালাচাঁদ !

কে কোন দরের লেখক ভগবান জানেন কিন্তু এরা খাঁটি মানুষ, মিথ্যার সঙ্গে এরা কারবার করে না।

উমাকান্ত হঠাৎ প্রাণান্তকর আপশোশের সঙ্গে বলে, কী ভেবে গেলাম, কী দাঁড়াল ! চুটিয়ে চাকরি করছি—কাগজটাকে ফাঁপিয়ে দিচ্ছি।

মানব বলে, করে যান না চাকরি, কী আসে যায় ? একজন জাত-সাহিত্যিক, কাগজটাকে ভালো না করে তাজা না করে কী আপনি পারেন ? ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা নিয়ে মেতে থাকলে কি সাহিত্যিকের চলে উমাদা—সাহিত্যিকের অনেক বড়ো ধর্মপালন করতে হয়। কী রকম জ্যান্ত করে তুলেছেন কাগজটাকে !

ধনদাসকেও ফাঁপিয়ে দিচ্ছি।

দিন না ফাঁপিয়ে—ফাঁপতে ফাঁপতে ফটাস করে ফেটে যাবে।

তার বলার ভঙ্গিতে কালাচাঁদ সশব্দ হাসিতে ফেটে পড়ে অনেক চেষ্টায় নিজেকে সামলে নেয়।

উমাকান্তের চাকরি বছর পার হয়ে গেছে। যে উদ্দেশ্যে চাকরি নিয়েছিল, ফল অবশ্য হয়েছে তার বিপরীত—ধনদাসকে ডুবিয়ে দেবার বদলে তার ছাপাখানা আর কাগজ দুয়েরই অনেক শ্রীবৃদ্ধি স্বেচ্ছায় না হলেও তার জন্যই হয়েছে সন্দেহ নেই।

প্রাণের জ্বালা কি কমে গিয়েছে উমাকান্তের ? পুতুলেব শোচনীয় মরণের স্মৃতি কি মুছে গেছে তার মন থেকে ? নিভে গেছে প্রতিহিংসার আগুন ?

এ আগুন নিভবার নয়। কিন্তু কী করবে—কাজে ফাঁকি দেওয়ার সাধ্য তার নেই। কাজে ছুটকো ফাঁকি দিয়ে ধনদাসের সর্বনাশ করার সাধও অবশ্য তার মিটবে না, দুশো-পাঁচশো টাকা ক্ষতি করিয়ে দিলে কী আসবে যাবে ধনদাসের !

না, ধনদাসকে সুযোগ-সুবিধামতো প্রাণে মেরে ফেলার কথা সে আগেও ভাবেনি, আজও ভাবে না। মাঝে মাঝে সে শুধু ভাবে যে ওকে মারা কত সহজ !

ধনদাস চোখের সামনে এলেই সে তার মুখে মৃত্যুর ছাপ দেখতে পায়,—সদাজাগ্রত মৃত্যু যেন একটা ঘুমন্ত ভাবের ছাপ হয়ে তার মুখে সব সময় সেঁটে আছে।

পুতুলের গলা ছিল মাখনের মতো নরম, শুধু একটা দাড়ি-কামানো ক্ষুরেব ঘায়েই জল বা বাতাস কাটার মতো অনায়াসে তার গলাটা ফাঁক করে দেওযা যেত। কিন্তু ওভাবে পুতুলকে কেউ খুন করেনি।

ধনদাসের শুষ্ক-শীর্ণ কাঠির মতো বিসদৃশ গলাটা দেখে উমাকান্তের মনে হয় যে ওর গলাব জন্য একটা পেনসিল-কাটা সাধারণ ছুরিও দরকার হয় না, খালি হাতে মুঠো করে ধরে মোচড় দিলেই গলাটা মটকে যাবে।

মাঝে মাঝে তার চাউনি দেখে ধনদাস দারুণ অস্বস্তিবোধ করে।

কী দেখছেন হাঁ করে ?

উমাকান্ত চমকে উঠে। দ্রুতবেগে কয়েকবার চোখ বন্ধ করে আর খোলে, মাথায় ঝাঁকি দেয়।

না না, কিছু নয়।

শুনেছেন তো যা বললাম ?

শুনেছি বইকী।

ধনদাসের বিশ্বাস হতে চায় না। কিন্তু জেরা করে দেখা যায় উমাকান্ত সব কথাই মন দিয়ে শুনেছে এবং ভালো করে বুঝেছে। কাজের কথা একটিও তার কান এড়িয়ে যায়নি।

ধনদাস তখন একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে, আপনার ভাব দেখে মনে হচ্ছিল অন্য কোনো জগতে বুঝি চলে গেছেন ! একাই থাকেন নাকি বাড়িতে ?

ছেলেমেয়ে ক-টা আছে।

তা জানি। আপনার ছেলেমেয়ের খবর আর রাখি না মশায় আমি ? আপনি তো আর ডাকবেন না, সেদিন বাড়ি খুঁজে নিজে গিয়ে পরিচয় করে এসেছি।

ওদের কাছে শুনছিলাম।

একা থাকেন মানে জিজ্ঞাসা করছিলাম যে মেয়েছেলে তো কেউ থাকে না ? সংসার দেখবার কেউ নেই ?

না।

ধনদাস একটু চুপ করে থেকে বলে, আর কেন উমাবাবু, এবাব একটা বিয়ে-থা করে ফেলুন। শোক-দুঃখ সব সয়েই বাঁচতে হবে তো মানুষকে, হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন ? একটি ডাগর মেয়ে দেখে বিয়ে করে ফেলুন, ছেলেমেয়েদের দেখাশোনাও করতে পারবে।

বিয়ে ? কী বলছেন আপনি ?

উমাকান্তের ব্যাকুলতা দেখে ধনদাস একটু ভড়কে গিয়ে বড়োই বিবক্ত হয়। কে জানে কী অদ্ভুত মতিগতি হয় লেখক মানুষদের।

ধনদাস চলে যাওয়াব পর উমাকান্ত বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবে। আজ স্পষ্ট রূপ নিয়েছে কিন্তু তার সম্পর্কে ধনদাসের এই আগ্রহ ও মনোযোগের ভাবটা সে কিছুদিন থেকে লক্ষ করছিল।

একটা স্নেহপুষ্ট উদার মনোভাব যেন তার সম্পর্কে গড়ে উঠেছে ধনদাসেব মধ্যে, তার সে মঙ্গল চায়, তাকে সে সুখী কবতে চায়।

চাকরিব সাদামাটা সম্পর্ক ছাড়াও তার সঙ্গে খানিকটা পোষ্য-পোষকের সম্পর্ক গড়ে তোলার সাধ যেন জেগেছে ধনদাসের। মুখের তোষামোদ নয়, পা-চাটা নম্রতা নয়—বয়স্ক তেজস্বী পুত্রের কাছে বাপ যেমন অকৃত্রিম সমাবোহহীন সহজ আনুগত্য পায় তেমনি একটু ব্যক্তিগত আত্মীয়তা এবং নিশ্চিন্ত নির্ভবতার ভাব।

মানুক বা না মানুক তাব কথাগুলি অন্তত নীরবে শুনে যাবার সম্মানটুকু দেখাবে, তার উদারতা এবং উপকার খুশি হয়ে গ্রহণ করবে।

উমাকান্ত বুঝতে পারে, অনেক অপরাধের ক্ষমাই তার জুটবে ধনদাসের কাছে। মহেশের যে ভুলত্রুটি সহ্য করাই সম্ভব হত না, তার সে রকম ভুলত্রুটি হয়তো তাকিয়ে না দেখেই উপেক্ষা করবে ধনদাস।

একটা কথা মনে হওয়ায় হাসবে না কাঁদবে উমাকান্ত ভেবে পায় না। একটু নম্র আর নত হয়ে যদি সে কিছুদিন চলে, একটু যদি খাতির করে চলে তাব প্রতি ধনদাসের পিতৃত্বমূলক পক্ষপাতের সাধটাকে—কিছুদিন পরে আবদার ধবলে তার উপন্যাসের কপিরাইটও হযতো ধনদাস এমনি তাকে ফিবিয়ে দেবে !

অনুতাপ নয়, অনুতাপের ধার ধনদাস ধারে না। সুযোগ পেলেই মানুষের ঘাড় ভেঙে লাভ করা তার স্বভাব এবং পেশা—ওদিকে পুতুল মরছে বলেই উদারভাবে তার তাড়াতাড়ি উমাকান্তকে বেশি টাকা রয়ালটি দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, না দিয়ে সে মহাপাপ করেছে—এ সব কথা আজও ধনদাসের কাছে হাস্যকর ঠেকবে। মানেই সে বুঝতে পারবে না, ও সব হিসাবনিকাশ বিচার-বিবেচনার !

উমাকান্ত বুঝতে পারে ব্যাপাবটা। বছব খানেক তার সঙ্গে কারবার কবে ধনদাস জেনেছে যে সে সাদাসিদে ভাবুক চিন্তাশীল মানুষ, ঠকামি ও জুয়াচুরির সুযোগ-সুবিধা পেলে সেটা কাজে লাগাবার কথা সে কল্পনাও করতে পারে না, কখনও কখনও অলস মনে হলেও যখন কোনো কাজে মন দেয় তখন প্রাণপণে না খেটে সে পারে না।

এটাও ধনদাস টের পেয়েছে যে পক্ষপাত ও উদারতা দেখালেও সে কোনোদিন সেটা নিজের কাজে লাগিয়ে তার অসুবিধা করার চেষ্টা করতে পারবে না। ওটা তার ধাতেই নেই।

ওদিক থেকে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। বরং উমাকান্তের কোনো উপকার করতে ইচ্ছা হলে তাকেই নিজে থেকে যেচে করতে হবে।

সব শুনে মানব হেসে বলে, পছন্দ হয়ে গেছে, বাঁধবার চেষ্টা করছে ? করুক না ! আপনাকে আমাকে বাঁধবার সাধ্য কি ওর আছে ?

তারপর বলে, ঠিক আমার কাকার মতো। আমার জন্য ওই ধরনের এক রকম মনোভাব—মমতা বলব না, জিনিসটা স্নেহ-মমতার মতো কিছু নয়—ঝোঁক আছে বলাই ভালো। উনিও চান যে আমি গিয়ে খুব অনুগত হয়ে থাকি। খুব ভালো ব্যবহার করবেন, স্নেহ দেখাবেন, সবকিছু করবেন—শুধু ওই বোঝাপড়াটুকু চাই যে, আমার ভালো চেয়েই উনি আমায় চালাচ্ছেন, আর উনি যেমন চান আমি তেমনিভাবে চলছি।

বড়োই বিশ্রী লাগছে। ভাবলাম এক রকম, হয়ে যাচ্ছে আরেক রকম।

যদ্দিন পারেন চালিয়ে যান। এদিকে মহেশবাবুর কাগজ গজাচ্ছে, আপনার কদর আরও বাড়বে।

পুতুলের দাদা মনোহর পাটনায় চাকরি করে। পুতুলেব মা এবং ভাইবোনেবা সেখানে তার কাছেই থাকে।

পুতুলের আপনজনদের ভুলে থাকার স্বস্তিবোধ কবার জন্য উমাকান্ত নিজের মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছিল যে ওদের সঙ্গে তার সম্পর্কের সূত্র পুতুলেব সঙ্গেই ছিঁড়ে গেছে। প্রথম দিকে যন্ত্রের মতো দু-একখানা চিঠির জবাব দিয়েছিল, তারপর মানসিক বিপর্যয় চরমে ওঠার পব অন্যান্য চিঠির মতো পাটনার চিঠিও আর খুলে পড়ে দ্যাখেনি।

পরে অনেকের সঙ্গে আবার তার চিঠিপত্রের যোগাযোগ গড়ে উঠেছে, কিন্তু পাটনা থেকে আর কোনো চিঠি আসেনি। তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে, তার ওপর চিঠি লিখে জবাব পায় না—কী এমন তাদের গরজ পড়েছে যে গায়ে পড়ে চিঠি লিখে লিখে একতরফা সম্পর্ক বজায় রাখবে ?

কতগুলি বইপত্রের নীচে না-খোলা না-পড়া চিঠিগুলি চাপা ছিল—একদিন নজর পড়ায় খুলে উমাকান্ত পড়ে দেখেছিল। পুতুল মারা যাওয়ার দুমাস পরে লেখা চিঠিতে পুতুলেব বোন মুকুলেব বিয়ের কথা প্রথম উল্লেখ করা হয়েছিল—তারপর তিন-চারখানা চিঠিতে মনোহর বিশদভাবে জানিয়েছে যে মুকুলের বিয়ের জন্য তারা কী রকম ব্যস্ত হয়ে পড়েছে—চেষ্টা তারাও কবছে, উমাকান্তও যেন চেষ্টার ত্রুটি না করে।

এতই কি বড়ো হয়ে গেছে মুকুল তিন-চারবছরে ? তিন-চারবছর আগে পুতুলকে নিয়ে যখন সে পাটনায় গিয়েছিল তখন তো তেমন বড়ো মনে হয়নি তাকে !

ফাল্গুনের গোড়ায় উমাকান্ত মনোহরের আরেকখানা পত্র পায়। সে তিন মাসের ছুটি নিচ্ছে, সকলকে নিয়ে কলকাতায় এসে ছুটিটা কাটাবে—তার জন্য কম ভাড়ায় ছোটোখাটো একটি বাড়ি যেন উমাকান্ত খুঁজে পেতে ঠিক করে রাখে।

মুকুলের কথা উল্লেখ করেনি কিন্তু আত্মীয়তা-ভরা চিঠি। খবরাখবর আদান-প্রদান না করার জন্য অনুযোগ, ছোটোবড়ো দরকারি সব ব্যবস্থা ঠিক করে রাখার জন্য অকুণ্ঠ দাবি, তার জন্য সকলের গভীর চিন্তায় দিন কাটানোর সংবাদ !

পুতুলের মা নাকি তাকে একবার দেখবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে, তাকে দেখলে নাকি মনে খানিকটা শান্তি পাবে।

তার জন্য শাশুড়ির এ রকম উতলা হবার তাৎপর্য উমাকান্ত একেবারেই বুঝতে পারে না। মরা মেয়ের স্বামীকে দেখে মনে শান্তি পাবে ? মেয়েব জন্য শোক তো আরও উথলে উঠবে !

দার্শনিকের উদারতায় আশেপাশের মানুষগুলিকে জানবার বুঝবার ও আপন করার মধ্যেই পৃথিবীর সকলের সঙ্গে কাল্পনিক কুটুম্বিতা হয়েছিল, আসল কুটুম্বের একখানা চিঠির আঘাতেই সেটা যেন ভেঙে গেল।

পুতুলের জন্য বেদনা বৈরাগ্যে রসালো হওয়ায় ইতিমধ্যে হৃদয় কি তার অনেকটা শান্ত হয়েছিল—যে প্রক্রিয়ায় মানুষ সময়ের সঙ্গে শোক-দুঃখের তীব্রতা ও গভীরতা দুই-ই একদিন ভুলে যায়, তারা বেলাতেও কি, সে প্রক্রিয়া তেমনিভাবে ঘটে চলেছিল ?

অসংখ্য বাস্তব স্মৃতির ঘূর্ণাবর্তে হৃদয় যেন আবার মুচড়ে যায়। পুতুল নেই, পুতুলকে সে খুন হয়ে যেতে দিয়েছে, পুতুলের আপনজনেরা তবু তার কাছে দাবি করেছে আত্মীয়তা। সত্যই তো, পুতুলের সন্তান আছে এবং ওরা তাদেব মামা মাসি দিদিমা হয়—এ কথাটা সে যেন ভুলেই গিয়েছিল।

হৃদয় মুচড়ে যায় কিন্তু উমাকান্ত বুঝতে পারে এই বেদনা নিষ্ফল হয়ে যাবে। ধনদাসের প্রিয়পাত্র হয়ে চাকরি করে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই—এমনিভাবেই সে জড়িয়ে পড়েছে চাকবিতে।

পবদিন সে মনোহরকে জবাব লিখে দেয় যে বাড়ি ভাড়া করার দবকার নেই, তার বাসাতেই সকলে কয়েকটা মাস আরামে থাকতে পারবে। আরামে থাকার কথাটা সে কেন লিখল একবার খেয়ালও হল না উমাকান্তের।

মনোহবদের যেদিন পৌঁছবার কথা সেদিন একটা অভিনব অভিজ্ঞতা জুটে যায় উমাকান্তেব। প্রেসে এসেই ধনদাস তাকে সেদিন দুপুরে তার বাড়ি খাওযাব নিমন্ত্রণ জানায়।

বলে, দুপুরে আজ আপনি আমাব বাড়িতে খাবেন উমাবাবু ! কিছু মনে করবেন না, আগে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। কোন সকালে খেয়ে বেরিয়েছেন, এদিকে খেতে খেতেও বেলা হবে—অসুবিধা হবে না মনে হয় !

হঠাৎ খেতে বললেন ?

আমাব বাড়িতে দূব সম্পর্কের এক পিসি থাকে, তার মেয়ে একটা ব্রত নিয়েছে। এই উপলক্ষ আব কী— বড়ো ব্যাপার কিছু নয। মেয়েটি বড়ো ভালো। এমন ভালো মেয়ে আমি আর দেখিনি।

বেশ তো যাব।

আমি একটু ঘুরে আসছি। আপনাকে তুলে নিয়ে যাব।

স্টেশনে আর যাওয়া গেল না। উপায কী ? স্বযং ধনদাসের নিমন্ত্রণ তো প্রত্যাখ্যান কবা যায় না, পৃথিবী উলটে গেলেও না। ধনদাস চলে গেলে বিস্মিত উমাকান্ত মনে মনে ভাবে যে হঠাৎ এ কীসের নিমন্ত্রণ ? একটি তুচ্ছ আশ্রিতা মহিলার অতিশয় ভালো একটি মেয়ে ব্রত করেছে, সে জন্য ধনদাসের বাড়িতে বিশেষভাবে তার নিমন্ত্রণ ? স্বয়ং ধনদাস তাকে গাড়িতে করে বাড়ি নিয়ে যাবে ?

ভাত খেয়ে উমাকান্ত আপিসে এসেছে। কিন্তু নিজের বাড়িতে পুতুলের ভাইবোনদেব আসন্ন আবির্ভাবের উত্তেজনায পেট ভবে খেতে পারেনি। নিমন্ত্রণের মর্যাদা রাখতে পারবে। কিন্তু কেন এ নিমন্ত্রণ ?

রিকশাগাড়িতে বসে ধনদাসের বাড়ির দিকে এগোতে এগোতেও এই কথাটাই উমাকান্ত ভাবে।

ধনদাস এ কথা ও কথার পর বলে, এই নিয়ম সংসারে, জানেন, এই হল সংসারের নিয়ম। একজন রোজগার করবে, দশজন তার ঘাড়ে বসে খাবে। তবে কী জানেন, মেয়েটি বড়ো ভালো। চোদ্দো পেরিয়ে পনেরোয় পা দিয়েছে—সংসাবের এমন কাজ নেই যা জানে না। সেলাই ফোঁড়াই গান-বাজনা এ সবও জানে।

আজকাল এ সব তো শেখাতেই হয় মেয়েদের।

বড়ো স্নেহ করি মেয়েটাকে। পাত্র খুঁজছি—আমি সেকেলে মানুষ, মেয়েদের অল্পবয়সেই পার করা ভালো মনে করি। পণ-টন বিশেষ দেব না—তবে নাতজামায়ের উন্নতি করিয়ে দেব। ওটা করতেই হবে, ওটা কর্তব্য, কী বলুন ?

তা বইকী।

অল্প মোটা শ্যামবর্ণা ব্রতচারিণী মেয়েটি তাদের দুজনকে পরিবেশন করে। মেয়ে দেখানো নয়, এ নিমন্ত্রণ। ধনদাস কি মেয়ের দালাল না ঘটক যে তাকে বাড়িতে ডেকে মেয়ে দেখাবে ? কিন্তু লজ্জায়, ভয়ে, ঘামে ও অকাল যৌবনের অসীম কৌতূহলে আত্মহারা বেচারি মেয়েটিকে একবার দেখে ঘাড় হেঁট করে উমাকান্ত ভাববার চেষ্টা করে যে ধনদাসের কাছে না জানি সে কত বড়ো অর্থলোভী ভিক্ষুক, লম্পট এবং ছোটোলোক। নতুবা তাকে এভাবে এই বেশে মেয়েটিকে দেখানোর কথা ধনদাস কী করে ভাবতে পারল ?

মেয়েটির গায়ে শেমিজ নেই, ব্লাউজ নেই, পরনের শাড়িখানা প্রায় মশারির কাপড়ের মতো স্বচ্ছ !

এ কী সত্যিই ধনদাসের পরিকল্পনা ? ধনদাস বোকা নয়। সে নিশ্চয় জানে এভাবে মানুষকে উত্তেজিত করা যায় কিছুক্ষণের জন্য, কিন্তু সে উত্তেজনা থেকে সামাজিকভাবে বিয়ে করে কোনো মেয়েকে জীবনসঙ্গিনী করার সুস্থ কামনা মানুষের জাগে না।

ব্যাপার সে বুঝতে পারে, খাওয়ার পর বৈঠকখানার বদলে দোতলার একটি সুন্দর সুসজ্জিত ঘরে বিশ্রামের অনুরোধ পেয়ে।

গড়গড়ায় তামাক আসে—সুগন্ধি তামাক। দু-চারটা টান দিয়ে ধনদাস নলটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, বিশ্রাম করুন। প্রেসে যান তো যাবেন, নইলে ছুটি নিন আজকের দিনটা। আমিও শুইগে একটু।

তারপর আসে মেয়েটি, তার হাতে পানের রেকাবি। ইতিমধ্যে তার বেশ কিন্তু বদল হয়ে গেছে। শায়া-ব্লাউজ গায়ে উঠেছে, তাঁতের একখানা ডুরে শাড়ি পরেছে।

পান নিন।

উমাকান্তের কেমন ভয় করতে থাকে। মেয়েটিকে তার ঘাড়ে চালান করে দিতে এমন মরিয়া হয়ে উঠেছে কেন ধনদাস যে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত তার লোপ পেয়েছে ?

কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান কি কখনও লোপ পায়, ধীর-স্থির চালাক-চতুর ধড়িবাজ ধনদাসের ? মতলব না ছকে সে কোনো কাজ করে না। সস্তায় দূর সম্পর্কের আশ্রিতা মেয়েটির একটি পাত্র জোটানোর মতলবটা সহজেই বোঝা যায়, উমাকান্ত শুধু বুঝতে পারে না তাকে ফাঁদে ফেলবার জন্য বিশেষ কী ফন্দিটা সে এঁটেছে। শুধু মেয়েটিকে এভাবে সামনে ধরার মতো স্থূল উদ্ভট উপায়ের উপরে ধনদাস নির্ভর করেছে এ কথা বিশ্বাস হয় না। অত কাঁচা মানুষ ধনদাস নয়। তাছাড়া মেয়েটিকে পার করার কীসের এত তাগিদ যে, খেলিয়ে তোলার বদলে বর্শায় গাঁথবার মতো এই স্পষ্ট অভদ্র উপায়টা তাকে অবলম্বন করতে হয়েছে।

তোমার নাম কী ?

সুধা।

আচ্ছা সুধা, এবার তুমি যাও। আমার আর কিছু দরকার নেই।

আমায় গল্প করতে বলেছে আপনার সঙ্গে।

আর কী বলেছে ?

বলেছে—সুধা এক মুহূর্ত ইতস্তত করে, তারপর সোজা তার চোখের দিকে চেয়ে বলে, বলেছে আপনি আমার হাত-টাত ধরলে যেন—

চেঁচিয়ে ওঠ ?

না, চুপ করে থাকি।

সুধা পাগল নয়, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি এখন উন্মাদিনীর মতো।

দরজা খোলাই আছে। সেটা কিন্তু কোনো ভবসার কথা নয়। ধনদাসের মতলব সে বুঝে গিয়েছে।

সুধার হাত সে ধরবে কী ধরবে না সেটা তুচ্ছ কথা। খালি ঘরে একলা পেয়ে সুধাকে সে অপমান করেছে, ওতে তার বিয়ে করতেই হবে নইলে তাকে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে আদালতে বিশ্রী মামলা রুজু করা হবে—এ সব হুমকি খাটাবার বুদ্ধি ধনদাস করেনি।

সে আরও নিমন্ত্রণ পাবে, আরও কয়েকবার এমনিভাবেই নিজের হাতে পরিবেশন করে তাকে খাইয়ে নির্জন ঘবে পানের রেকাবি হাতে তার সঙ্গে সুধা গল্প কবতে আসবে। তারপর ধনদাস একদিন আবেদন জানাবে তার বিবেকের কাছে। তাব ভদ্র সভ্য মার্জিত আত্মার কাছে। ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে তাতে বিয়ে না করলে সুধার জীবনটাই নষ্ট হবে যাবে।

বিয়ে করলে দোষই বা কী ? তেমন সুন্দরী নয়, কিন্তু মেয়েটি ভালো ! প্রাণ দিয়ে তার ছেলেমেয়েকে ভালোবাসবে, তার সেবা করবে, বিলাস-ব্যসনের কোনো দায় তার ঘাড়ে চাপাবে না। তাছাড়া ধনদাস তো রইলই দায়িক !

উমাকান্ত মিষ্টিসুরে বলে, বসো। খানিকক্ষণ গল্পই করা যাক।

নিজে খাটেব এক পাশে বসেছিল, অন্য পাশ দেখিয়ে সুধাকে সেখানে বসিয়ে খানিকটা কাছে সরে এসে বলে, আমি বিয়ে কবেছিলাম জানো তো ? ছেলেমেয়ে আছে। বউ মোটে মরেছে বছর খানেক।

জানি।

ছ্যাবলা ছোঁড়া নই। সুযোগ পেয়েছি বলেই হাত-টাত ধরব—সে ভয় কোবো না। বুঝলে ?

সুধাব ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফোটে।

চোখের চাউনি ছিল উন্মাদিনীব মতো, কয়েকবাব উমাকান্তের মুখের দিতে চেয়ে অনেকটা শান্ত আর স্বাভাবিক হয়ে আসে তার চোখ।

ধনদাসবাবু তোমায় খুব ভালোবাসেন—না ?

সুধা চুপ করে থাকে।

মাঝে মাঝে ঝোঁকের মাথায় হাত-টাত ধরেন তো ?

সুধা দুহাতে মুখ ঢাকে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু !

উমাকান্ত অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, একটু চালাক-চতুর হও না ? কেঁদে কোনো লাভ আছে ? ভুল তো তোমার নয়। যে ভুল করেছে সে কাঁদবে ! নষ্ট হয়ে গেছ ভেবো না। নিজেরা নষ্ট না হলে মেয়েদের কেউ নষ্ট করতে পারে না। রামায়ণ মহাভাবত পড়েছ ?

পড়েছি।

তবে অবুঝের মতো ভড়কে গিয়ে কাঁদছ কেন ? কত দৃষ্টান্ত আছে মনে নেই ? শক্ত হও, মনে জোর করো !

সুধা মুখ থেকে হাত সরায় জলে থইথই করছে চোখ কিন্তু আঁচল দিয়ে চোখ সে মোছে না। জড়ানো গলায় জিজ্ঞাসা করে, আপনি রাজি হবেন না তো ? দোজবরে বিয়ে আমি মানব না, ঠিক করেছি। পালিয়ে যাব কিংবা সুইসাইড করব।

সুইসাইড ! লেখাপড়া ভালো শেখেনি কিন্তু সুইসাইড কথাটার উচ্চারণ কী রকম খাঁটি আর চমৎকার !

কোটি কোটি টাকা পেলেও তোমায় আমি বিয়ে করব না সুধা। যার সঙ্গে ভাব হয়েছে তাকে একটু শক্ত হতে বলো, নিজেও একটু শক্ত হও—

কী করে জানলেন ?

এ তো সবাই জানে। দোজবরে বিয়ে মানবে না, সুইসাইড করবে—তার মানেই একবারও বিয়ে করেনি এমন কোনো জোয়ানের সঙ্গে ভাব হয়েছে।

এবার মারাত্মক সমস্যার কথা তোলে সুধা।

উনি যে দুচোখে দেখতে পারেন না তাকে ? পুলিশে ধরিয়ে জেলে দিতে চান !

উমাকান্ত হাসে।

জেলে দেবেন ? তুমি জেলের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবে—বলবে যে দুজনকে একসঙ্গে জেলে না দিলে তুমি গেট ছাড়বে না।

এক দিন ছুটি নেবার কথা নিজে থেকে ধনদাস যাই বলে থাক, নিমন্ত্রণ খেয়ে ফেরার পথে প্রেসে গিয়ে কাজকর্মের মোটামুটি হিসাব জেনে নিয়ে উমাকান্ত বাড়ি ফেরে।

আত্মীয় মানুষদের ভিড় করা জমজমাট বাড়িতে বসার এবং লেখার ঘরেই মুকুল সাজিয়ে রাখছিল তার বই, তার খাতাপত্র—দেখে মনে হয় অবিকল যেন প্রথম বয়সের পুতুল !

কখন এলে ?

মুকুল মুখ ফেরায় না।

তা দিয়ে কী দরকার ? একবার স্টেশনেও যেতে পারলেন না লাটসায়েব ! আপনাকে খাতির করার জন্য ঘর সাজাচ্ছি গোছাচ্ছি ভাববেন না কিন্তু। নিজের খুশিতেই করছি।

অবিকল পুতুল !

চেহারা ! কথা ! দাঁড়ানোর ভঙ্গি !

সাজসজ্জার কায়দা পর্যন্ত। পুতুল মরেনি মনে করলে, পুতুল তার ছড়ানো বইগুলি সাজিয়ে রাখছে মনে করলে শুধু এইটুকু ভুল হয় যে, এ মেয়েটা সত্যি সত্যি পুতুল নয়, যে পুতুল মরে গেছে এ মেয়েটা তার বোন মুকুল। আত্মীয়তা টানতে হয় রাত এগারোটা অবধি, কিন্তু উমাকান্তের খারাপ লাগে না।

পুতুলের মতোই তার রাত্রের শয্যা রচনা করতে আসে মুকুল। বিছানা পেতে মুকুল ঠিক পুতুলের মতো সুর ও কথা বলার ভঙ্গিতে বলে, দয়া করে এবার খাবেন মহারাজ ?

স্বেচ্ছায় নয়, আপনা থেকেই মুকুল নকল করছে পুতুলকে। উমাকান্ত পুরানো জীবন নকল করে বলে, আগে তোকে খাব।

খান। বাগে পেলেই খাওয়ার জন্যই আপনাদের জন্ম। পুরুষদের এমন ঘেন্না করে আমার !

সুধাকে স্মরণ করে উমাকান্ত হেসে বলে, তাহলে তো মুশকিল, খাওয়া চলবে না। পুরুষ জাতটার ওপর ঘেন্না ! এ মেয়ে কোন পুরুষের হজম হবে ?

বলতে বলতে সে গম্ভীর হয়ে যায়, তোকে দেখে পুতুলের জন্য মনটা বিগড়ে গেল মুকুল। ঠিক পুতুলের মতো দেখাচ্ছে তোকে। পুতুলও ঠিক এমনিভাবে শাড়ি পড়ত। পুতুল ঠিক এমনিভাবে আমায় ডেকে খেতে দিত।

নীরবে সে ভাত-ডাল মাছ-রুটি খেয়ে যায়। রেঁধেছে নাকি মুকুল, অবিকল যেন পুতুলের রান্না !

হঠাৎ সে বলে, পেট ভরালে হবে না। প্রাণ ভরাতে হবে।

মুকুল হঠাৎ কেঁদে ফেলে।

প্রাণ তো ভরাবই। ক-দিন পেট ভরে খেয়ে চেহারাটা ঠিক করুন, কলিতে অন্নই প্রাণ জানেন তো ?

১০

আত্তির মা-র অসুখের কথা বলে কালাচাঁদ দুদিন আগে কিছু টাকা আগাম চেয়ে নিয়েছিল, উমাকান্ত জিজ্ঞাসা করে জেনেছিল আত্তির মা-র জ্বর হয়েছে।

ধনদাস উমাকান্তকে ডেকে বলে দেয়, কালাচাঁদকে এক মাস কাজে আসতে বারণ করবেন। ওর বউয়ের বসন্ত হয়েছে। সামনের মাসের পূর্ণিমার পরদিন থেকে যেন কাজে আসে।

পূর্ণিমার পর কেন ?

আছে আছে, কারণ আছে। এ রোগ হবার পর একটা অমাবস্যা ও একটা পূর্ণিমা কেটে গেলে ছোঁয়াচ লাগে না।

ধনদাস একবার শিউরে ওঠে !

ব্যাটার কী কাণ্ড জানেন মশায় ? একেবারে বাড়িতে গিয়ে হাজিব—বউয়ের ওপর মা-র দয়া হয়েছে, কিছু টাকা দিতে হবে ! সটান বৈঠকখানায় ঢুকে পড়েছে, বললেও কি নড়তে চায় ? শেষে ধমক দিতে রাস্তায় নেমে গেল।

কালাচাঁদকে সে টাকা দিয়েছে কি না এ প্রশ্ন উমাকান্ত জিজ্ঞাসা করে না, অবিকল পুতুলের মতো চেহারা নিয়ে মুকুল এবং মনোহরেরা আসবার পর থেকে ক-দিন মনটা তোলপাড় করছিল, লোকটার উপর তীব্র আক্রোশ আবার নাড়া খেয়ে জেগে উঠেছিল।

ধনদাস হঠাৎ তাকে জিজ্ঞাসা করে, কী ব্যাপার, মুখ এত শুকনো কেন ? চেহাবা এমন হচ্ছে কেন ?

কী হয়েছে চেহারায় ?

রোগা হয়ে শুকিয়ে যাচ্ছেন যে দিন দিন !

ধনদাসের সরু গলাটার দিকে চেয়ে অনেক দিন পরে আবার উমাকান্তের হাত নিশপিশ করতে থাকে।

কালাচাঁদ দুদিন কাজে আসে না। পরদিন সে আসতেই উমাকান্ত তাকে ডেকে ধনদাসের হুকুম শুনিয়ে দেয়।

ছুটি কী রকম বাবু ? মজুরি পাব তো ?

কাজ করবে না মজুরি পাবে কী হে ! ধনদাসবাবু ও রকম মজুরি কাউকে দেয় ? তবে তোমায় বরখাস্ত করা হচ্ছে না, এক মাস পরে এসে যেমন কাজ করছিলে তেমনি করে যাবে।

কালাচাঁদ তবু প্রতিবাদ জানায়—বাড়িতে রোগ, এখনই আমার রোজের দরকার বেশি, এখন বলছেন বিনে মাইনেয় ছুটি নিতে !

কালাচাঁদ উমাকান্তকে বোঝাতে চায় যে ঘরে বোগব্যারাম থাকলে টাকার দরকারটা বেশি হয়। উমাকান্তের জানতে যেন বাকি আছে ! সে বলে, আমি বরং নিজের দায়িত্বেই আবও ক-টা টাকা তোমায় আগাম দিচ্ছি। মানুষটাকে তো চেনো কালাচাঁদ, আমার কী করার আছে বলো ?

তিন দিন পরে কালাচাঁদ আবার এসে দাঁড়ায়।

উমাকান্ত দম নেয়। কালাচাঁদ ঢোঁক গেলে।

আবার তুমি কেন এলে কালাচাঁদ ? বাবুর স্পষ্ট হুকুম তোমায় এক মাস প্রেসে ঢুকতে দেওয়া হবে না। ছোঁয়াচে রোগ কিনা !—ওনাব ভয়ানক আতঙ্ক, তোমার দূরে থাকাই ভালো কিছুদিন।

স্তিরি আজ মারা গেছে বাবু ! ভোরবেলা।

মারা গেছে ? ওঃ !—

উমাকান্ত স্তব্ধ হয়ে থাকে।

কিছু টাকা নিতে এসেছিলাম বাবু ! স্তিরির সৎকাবে লাগবে। ও মাসে কেটে নেবেন। আর ছুটিফুটি দেবেন না বাবু, ছুটি চাইনে ! ছুটি নিলে কি মোদেব চলে ?

কী করা যায় ! কী করে একে বুঝানো যায় যে, বাড়িতে এ সব রোগ হলে বরখাস্ত করার বদলে বিনা বেতনে এক মাস ছুটি দেওয়া ধনদাস বিশেষ অনুগ্রহ বলে মনে করে !

গভীর বিতৃষ্ণায় উমাকান্তের দেহমনে কেমন একটা অস্থিরতা ঘনিযে আসে। ধনদাস হুকুম দিযেই খালাস—এদের সঙ্গে সরাসরি খারাপ ব্যবহার করার দায়টা চাপিযে দেওয়া হয় তার ঘাড়ে।

যার স্ত্রী আজ সকালে মারা গেছে, অমানুষ দানবের মতো কী কবে তাকে বলা যায যে, আব আগাম টাকা হবে না, অবিলম্বে তুমি প্রেস থেকে বেরিযে যাও !

অথচ না বলেও উপায় নেই।

খেদেব সঙ্গে সে বলে, টাকা তো হবে না কালাচাঁদ।

ঘবে মড়া পচবে বাবু ?

উমাকান্ত চোখ বোজে। বলে, ধার-টার করে জোগাড় করে নাও।

কে আর ধার দেবে বাবু ?

কালাচাঁদ যেন হন্যে কুকুরের মতো ঘেউঘেউ করে কথা বলে, যদিও কথাগুলি বলে অতি সাধারণ—স্তিরি, আর পিসিকে ধরেছেন শেতলা ! অ্যাদ্দিন চিকিৎসে হল কীসে ? ধার করতে বাকি বেখেছি কোথাও ? আপনিই তবে ধার দেন বাবু ক-টা টাকা। ও মাসে ঘটিবাটি বেচে শোধ কবে দেব।

উমাকান্ত ধাব দেবে ? টাকা কই তার কাছে ! পুতুলেব আপনজনদের আবামের ব্যবস্থা কবতে নিজেকেই তাব টাকা ধার করতে হয়েছে মাসেব মাঝামাঝি—বেতনেব টাকায কুলায়নি।

তবে সামনেব মাস থেকে ওদের খবচ হবে আলাদা।

আমার হাত একেবাবে খালি।

জানি বাবু, জানি !

কালাচাঁদ খেঁকিয়ে ওঠে। নিরীহ গোবেচাবি কালাচাঁদ যেন সব জানে তাই তার আব কিছু বলবার নেই ! সে যেন জানে যে, উমাকান্তরা নিজেদের স্ত্রীদের খুন হতেও দেয় আবার কালাচাঁদের স্ত্রীরা মরে গেলেও দশটা টাকা ধার দেওয়া কর্তব্য মনে কবে না।

ব্লটিংয়ে আঁচড় কাটে উমাকান্ত। নিজেকে সত্যই তার অপরাধী মনে হয়—বউ মরে গেলে তাকে পোড়াবার জন্য টাকার খোঁজে হন্যে হয়ে বার হতে হয় কালাচাঁদের—এ অবস্থার জন্য সে-ই যেন দায়ি।

মুখ তুলে সে ধীরে ধীরে বলে, আমার কাছে টাকা থাকে না জানো তো ? একটু অপেক্ষা করো, বাবু আসুন। উনি অবশ্য স্পষ্টই বলে দিয়েছেন তোমায় আব আগাম টাকা দেওয়া হবে না। তবু একবার বলে-কয়ে চেষ্টা করে দেখি।

কালাচাঁদ সহকর্মীদের কাছে যায়। সকলেই কাজ বন্ধ করে তাদের কথা শুনছিল।

কুড়ি-বাইশবছরের ভুবন হরফ সাজানোর কাজ শিখছে। কালাচাঁদকে ইশারায় কাছে ডেকেও সে গলা চড়িয়ে সকলকে শুনিয়ে বলে, তা হবে না। ক-টা টাকার অভাবে কালাদার বউ মরে গিয়ে ঘরে পচবে—আমরা তা হতে দেব না।

কোণের দিক থেকে বুড়ো নকুড় আরও জোরে চেঁচিয়ে বলে, নিশ্চয় হতে দেব না। টাকা না দিলে সবাই মিলে টাইপের কেসগুলো নিয়ে গিয়ে আত্তির মা কে পোড়াব।

কুঞ্জ অত জোরে চেঁচায় না কিন্তু জোরের সঙ্গে বলে, দেবে দেবে—টাকা দেবে। এত বছর খাটছে-- বউকে পোড়াবার জন্য ক-টা টাকা আগাম দেবে না, ইয়ার্কি নাকি !

উমাকান্ত ব্লটিংয়ে আঁচড় কেটেই চলেছিল—হঠাৎ সে মুখ তুলে বলে, চেঁচামেচি হইচই করছ কেন তোমরা ? কাজ চালিয়ে যাও। কালাচাঁদ টাকা পাবে—ব্যবস্থা করে দেখি। টাকা না দিলে আমিও আজকেই ইস্তফা দেব কাজে।

সকলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কালাচাঁদকে টাকা দেওয়া না হলে একেবারে চাকরি ছেড়ে চলে যাবে- -তার কাছে এমন কথা কেউ প্রত্যাশা করেনি। সকলেই কাজ শুরু করে দেয়।

ধনদাস এসে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে নিজের কামরায় চলে যায়—কালাচাঁদ যে তার নজরে পড়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সবাই নিজের নিজের জায়গায় বসে কাজ করেছে, একটা গেঞ্জি গায়ে কালাচাঁদ শুধু দাঁড়িয়ে আছে উদ্‌ভ্রান্ত একটা মূর্তির মতো।

উমাকান্ত ধনদাসের কামরায় যায়।

ধনদাস আপশোশের সুরে বলে, এত করে বললাম, তবু ওকে প্রেসে ঢুকতে দিয়েছেন ?

উমাকান্ত বলে, ওর স্ত্রী আজ সকালে মারা গেছে। পোড়াবার টাকা নেই—ক-টা টাকার জন্য মরিয়া হয়ে এসেছে।

উমাকান্তের মুখের গম্ভীর ভাব দেখে মৃদু হেসে ধনদাস বলে, বাজে কথা। একটা মানুষকে পোড়াতে কত টাকা লাগে ? দরকার হলে পাড়া প্রতিবেশীরাই ওই সামান্য টাকা জুটিয়ে দেয়। আসলে ওদের হল সুযোগ পেলেই আদায়ের মতলব। যাকগে, গোটা পনেরো টাকা দিয়ে দিন।

উমাকান্ত কাঠের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে .

অত্যন্ত বিচলিতভাবে ধনদাস কয়েক মুহূর্ত তার ভাব লক্ষ করে। তারপর সেও গম্ভীর হয়ে যায়।

ও, ঠিক কথা, একদম খেয়াল ছিল না। একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি—এবার থেকে আপনার কাছে একশো টাকার মতো সব সময় জমা থাকবে। আমারই ভুল হয়েছে, এ সব ছুটকো ব্যাপার মেটাবার জন্য আপনার কাছে কিছু টাকা রাখা উচিত ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে একশো টাকার নোট বার করে গুনে উমাকান্তের হাতে দিয়ে, তাকে দিয়ে আরেকবার গুনিয়ে লিখিত রসিদ নিয়ে ধনদাস হেসে বলে. আপনার রাগ হবার কথাই। এ সব ছুটকো ব্যাপারেও যদি কিছু করার স্বাধীনতা না থাকে, একজন পুরানো লোককে পনেরো-বিশটা টাকা পাইয়ে দিতে আমার কাছে আসতে হয়—আপনি তাহলে কাজ চালাবেন কী করে ?

উমাকান্ত প্রায় গলে গিয়ে বলে, হ্যাঁ আমিও জ্বালাতন হই, আপনিও জ্বালাতন হন।

ধনদাস বলে, একশো টাকা সব সময় পুরো করে রাখবেন। কাকে কী দিলেন রসিদ নিয়ে হিসেবটা পাঠাবেন—টাকাটা রোজ পূরণ করে দেব। তবে একটা কথা মনে রাখবেন—

এবার কড়া শোনায়, ধনদাসের গলা।

চাইলেই যেন টাকা দিয়ে বসবেন না। কালাচাঁদের বউ মরেছে, পোড়াতে হবে—এ রকম সিরিয়াস ব্যাপারেই শুধু দেবেন।

কালাচাঁদ চলে যাবার পর ভিতরে একটা তোলপাড় চলতে থাকে উমাকান্তের।

কালাচাঁদের বউকেও মরতে হল টাকার অভাবে ঠিকমতো চিকিৎসা না হওয়ার জন্য ? পুতুলের মতোই মৃত্যুবরণ করতে হল আত্তির মা-কে—তারই মতো নিরুপায় কালাচাঁদকেও যেন মেনে নিতে হল সেই মরণ ?

চোখের সম্মুখ থেকে একটা কালো পর্দা যেন সরে যায় উমাকান্তের। এইখানে চেয়ারে বসে চারিদিকে সে দেখতে পায় এই রকম অজস্র ও বিচিত্র প্রক্রিয়ার হত্যাকাণ্ড।

চিকিৎসার অভাবে যারা মরে, রোগ তো তাদের মৃত্যুর কাবণ নয় ! ডাক্তাব থাকতে, দোকান-ভবা ওষুধ থাকতে সেরে ওঠার বদলে যে মরে যায়, হত্যাই তো করা হয় তাকে। পুষ্টির অভাবে যাদের দেহ রোগ ঠেকানোর ক্ষমতা হারায়, আলো-বাতাসহীন নোংরা আবর্জনাময় রোগের ডিপোতে যাদের রোগের সঙ্গে বসবাস করতে হয়, আত্মরক্ষার সহজ রীতিনীতি যাবা জানবার সুযোগ বা মানবার মনোভাব পায় না, তাদের অকালমৃত্যু, হত্যা ছাড়া আব কী ? দেশজুড়ে অনিবার্য গতিতে চলেছে মানুষের এই খুন হবার একটানা ব্যাপক প্রক্রিয়া—কারও বেলা আকস্মিক, কারও বেলা দ্রুতবেগে, কারও বেলা তিলে তিলে মন্থর গতিতে।

উমাকান্ত শিউরে ওঠে, তার মাথা ঘুবে যায়।

এই প্রকাশ্য ও বিরাট হত্যালীলার মধ্যে এতকাল বেঁচে থেকে এটা সে খেয়াল করেনি, মুখে মুখে অপমৃত্যুর যে অদৃশ্য নোটিশ লাগানো থাকে সেটা চোখে পড়েনি ! শুধু কি তাব একাব ?

ক-জনের এ কথা মনে হয়েছে যে আইনের সংজ্ঞার দু-দশটা খুন ছাড়াও জগতে অগণ্য খুন চলছে অনিয়মের ?

উমাকান্ত বসে বসে ভাবে।

প্রেসের কর্মব্যস্ত মানুষগুলিকে দেখতে দেখতে ধনদাসের প্রতি এক অভূতপূর্ব তীব্র ঘৃণায তার হৃদয় ভরে যায়। এমন ঘৃণা সে জীবনে কখনও অনুভব করেনি, পুতুলের অপমৃত্যুর পবেও নয়। মৃদু হোক, জোরালো হোক, ঘৃণার সঙ্গে চিরদিন সে অবজ্ঞা আর কেমন একটা অস্থিরতার কষ্ট অনুভব করেছে। আজ এমন প্রচণ্ড ঘৃণায় হৃদয়মন ভরে গেলেও ও সবকিছুই সে বোধ কবে না, এক অসাধারণ ধৈর্য ও দৃঢ়তার অনুভূতির মধ্যে নিজেকে মহৎ ও শক্তিশালী মনে হতে থাকে।

সে যেন সত্য দর্শন করে আজ ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত ঘৃণা-বিদ্বেষের বহু উর্ধ্বে উঠে গিয়েছে। ধনদাস যেমন লক্ষ লক্ষ মানুষের খুনেদের প্রতীক, সে তেমনি তাকে ঘৃণা করছে—তাদের সকলেব প্রতিনিধি হিসাবে—যারা খুন হয়েছে এবং হচ্ছে। সে নিজেও ওদেবই দলে।

১১

উমাকান্ত মনেপ্রাণে বিশ্বাস কবে যে ধনদাসকে খুন করা এক অর্থহীন অবান্তর চিন্তা। ওকে প্রাণে মেরে তার বা কালাচাঁদদের কোনো লাভ নেই—প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার লাভটুকু পর্যন্ত নয় !

পুতুলের মতো ওর যদি কোনো প্রেয়সী বউ থাকত, ছেলেমেয়ের মা থাকত—তাকে মারলেও বরং নিজেকে ভোলানো গেলেও যেতে পারত যে প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে।

বউ অবশ্য আছে ধনদাসের—ছেলেমেয়ের মা-ও সে বটে। কিন্তু ধনদাসেব অত্যাচারে সে বেচারাই হয়তো ভগবানের কাছে দিবারাত্রি নিজের মৃত্যু কামনা করছে !

ধনদাসও হয়তো চায় পুরানো সেকেলে রোগজীর্ণ গিন্নিটা এবার তার গত হোক—আরেকটি বেশ টুকটুকে বউ সে ঘবে আনতে পারুক।

সে তার বউ মেরে তাকে কাঁদিয়ে জ্বালিয়ে প্রতিশোধ নিতে চায় জানলে, ধনদাস নিজেই হয়তো তাকে সব রকমে সাহায্য করবে, তার যাতে কোনো শাস্তি না হয় সে ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেবে—বড়ো রকম পুরস্কারও দেবে !

এত জটিল মানুষের জীবন ! এই জীবনের মর্ম অনুভব করা—জীবন-সত্য ধরতে পারা—তবে লেখক হওয়া ?

এবং লেখক হয়েও জীবন-সত্য আবিষ্কার করে করে চলা—আরও সহজভাবে জীবনকে জেনে, আরও সোজা ভাষায় জানাটুকু দশজনকে জানিয়ে দেবার একটানা চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া !

মা-র জন্য আত্তি বেশি কাঁদেনি।

কালাচাঁদও খুব বেশি মুষড়ে যায়নি। মাস খানেকের বাধ্যতামূলক ছুটিটা ঘরে বসে কাটাবার সাধ তার ছিল না। এদিক-ওদিক আলগা কাজ খুঁজছিল।

জহর আর মহেশের সঙ্গে কথা বলে মানব তাকে একটা দায়িত্বপূর্ণ সাময়িক কাজ জুটিয়ে দেয়। এক লাইন কম্পোজ করতে হবে না। জহর ও মহেশের নতুন প্রেসটা চালু করার খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলি সব সে ঠিকঠাক করে দেবে। উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা, পরিদর্শক হিসাবে সে কাজ করবে !

কালাচাঁদ গোমড়া মুখে বলে, একেবারে নিয়ে নিলে হত না ? এ সব খুঁটিনাটিও দেখতাম, কম্পোজও চালিয়ে যেতাম ?

মানব বলে, ওখানে কাজটা যখন বজায় আছে ছাড়বে কেন ? চাদ্দিকে কত যে বেকার কালাচাঁদ ! এ প্রেসে যারা খাটবে তাবা মজুরি কম পাবে, পরে লাভের ভাগ পাবে। দু-চারবছর ওভাবে চালানো কি পোষাবে তোমার ?

কালাচাঁদ বলে, বউটাকে খুন করল। ওর প্রেসে গিয়েই খাটব আবার !

তখন আত্তির মা-র মরণের জন্য ধনদাসের দায়িত্ব নিয়ে দুজনের কথা হয়। মানব তাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করে যে পুতুলকে প্রকারান্তরে খুন করেছে বলা গেলেও আত্তির মাকে খুন করার প্রধান দায়টা খাটুয়েদের জন্য চলতি অব্যবস্থায়, ধনদাসের একার দায় নয়।

কালাচাঁদ রেগে আগুন হয়ে বলে, কী বলছেন মানুবাবু ? আপনিও শেষে ও ব্যাটার দিকে টানছেন ? দেহপাত করে কত বছর খেটে এলাম, ব্যাংকেও ব্যাটার টাকা পচে যাচ্ছে। ছ-মাসে শোধ করে দেব বলে একশোটা টাকা ধার চাইলাম—যদ্দিন না টাকা শোধ হয় গোলাম হয়ে খাটার খত লিখে দেব বললাম—তবু টাকা দিলে না !

কালাচাঁদ একটা বিড়ি ধরায়।

টাকাটা পেলে বাঁচাতে পারতাম আত্তির মাকে। টাকাটা না দিয়ে উমাবাবুর বউয়ের মতো আমার বউকেও ও ব্যাটা খুন করেছে। সোজা কথা আপনি আজকাল জড়িয়ে ফেলছেন মানুবাবু, ব্যাপারটা কী ?

মানব তার কাছ থেকে একটা বিড়ি চেয়ে নিয়ে ধরিয়ে বলে, ব্যাপার খুব সোজা। পুতুলদিরা, আত্তির মায়েরা খুন হবেই—সে জন্য আমরা দিশেহারা হব না। আমরা বুঝব ব্যাপারটা কী, কার দায় কতখানি, বুঝে ব্যবস্থা করব।

কালাচাঁদ বলে, বটে নাকি !

মানব বলে, নিশ্চয়। হৃদয় নিয়ে অনেক হাজার বছর মেতে থেকেছি। এবার আর হৃদয় নয়—নেশা নয় ! এবার শুধু হিসাব।

একেবারে বিনা চিকিৎসায় না হলেও আত্তির মা-ও ভালো চিকিৎসার অভাবেই মারা গেছে। তবে পুতুলের মরণের মতো সোজাসুজি আত্তির মা-র মরণের দায়টা একা ধনদাসের উপর চাপানো যায় না।

অন্য অবস্থায় উমাকান্ত একটা নতুন উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নিয়ে এলে ধনদাস খুশি হয়ে দরদস্তুর করে আরও কিছু বেশি দাম দিতে রাজি হয়ে প্রথম সংস্করণের রাইটটাই কিনে নিত সন্দেহ নেই। এবং চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করার সময় শ-দেড়েক টাকা নগদ দিতেও আপত্তি করত না।

পুতুল মরণাপন্ন জেনেই, উমাকান্তকে নিরুপায় জেনেই, সে সামান্য টাকায় একেবারে বইটার কপিরাইট কিনে নেবার দাঁও মারতে চেয়েছিল। পুতুলের মরণের জন্য সেই তাই প্রধান দায়িক।

কিন্তু চলতি নিয়ম আর নীতি অনুসারে তার কাছে কোনো পাওনা ছিল না কালাচাঁদের। যে রকম চিকিৎসা আব সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা হলে আত্তির মা হয়তো বেঁচে যেত, আত্তির মায়েদের জন্য সে রকম চিকিৎসা আর সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা বর্তমান অবস্থায় অসম্ভব। ধনদাসের উদারতার প্রশ্ন তোলাও মূর্খামি। একজনের উদারতায় লাখ লাখ আত্তির মায়েদের রোগ সারাবার উপায় হয় না !

কালাচাঁদ নীরবে মানবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুনে যায়। আর কোনো মন্তব্য করে না বা প্রতিবাদ জানায় না।

আত্তির মা-র মরণ কালাচাঁদের জীবনে একটা বিপর্যয় এনে দেবে জানাই ছিল। সেই সঙ্গে একঘেয়ে কাজ থেকে কিছুদিনের বিরাম !

কালাচাঁদ একটা অদ্ভুত রকম তাজা গল্প লিখে ফেলে—নাম দেয়, হরফ।

ধনদাসকে ঘৃণা করে লেখা গল্প—পড়লেই বোঝা যায়। সেই সঙ্গে চাঁছাছোলা ব্যঙ্গ মেশানো থাকায় আঘাতটা হয়েছে তীব্র !

মানব বলে, তোমার এই লেখাটা আমি নামকবা বড়ো কাগজে ছাপাতে পাবব না কালাচাঁদ। এ রকম লেখা ওদের কাছে বিষের মতো। ছোটো নতুন কাগজে ছাপিয়ে দেব—পয়সাকড়ি কিন্তু পাবে না কিছু।

কালাচাঁদ হাত বাড়িয়ে বলে, থাকগে তবে, লেখা ছাপিয়ে দিয়ে কাজ নেই। হাড়কালি করে খাটব, মজুরি পাব না, ও ব্যাপারে আমি নেই মানুবাবু !

আমার আর খালেকের লেখা ছাপিয়ে মহেশবাবুর চাকবি গেল দেখলে না ?

চাকরি তো অমন কত শত লোকের যাচ্ছে, কত শত লোক চাকরি পাচ্ছে না। তার সাথে মোর লেখা ছাপানোর সম্পর্ক কী ? যে কাগজে ছাপিয়ে দেবেন লেখাটা, সে কাগজটা বিনি পয়সায় বিলি হবে নাকি ? বিজ্ঞাপনের জন্য পয়সা নেওয়া হবে না। শুধু মোব লেখাব খাটুনির মজুরি হবে না !

প্রায় কথকতার ভাষায় লেখা অদ্ভুত রকম সতেজ আর মর্মস্পর্শী গল্পটা পড়েই, প্রায় উত্তেজিত হয়ে মানব যেভাবে হোক যে কোনো মাসিকে হোক গল্পটা ছাপিযে দেবে বলেছিল।

ভেবেছিল প্রথম গল্প ছাপা হবে, কালাচাঁদ নিশ্চয় ধন্য হয়ে যাবে ! কিন্তু বিনা মজুরিতে প্রথম লেখা ছাপতে দিতে কোনোমতেই রাজি নয় কালাচাঁদ।

মানব তাকে লেখা ছাপানোর ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করে। বলে, সামান্য ক-টা টাকার জন্যে কেন বোকামি করছ কালাচাঁদ ? নতুন লেখক কাউকে লেখার জন্য টাকা দেয় না, তোমার জন্য কী করে টাকা চাইব বলো ?

খেটেছি—মজুরি চাই।

তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না ব্যাপারটা। এই লেখাটা ছাপিয়ে একটা হইচই সৃষ্টি করে আমি তোমায় তাড়াতাড়ি তুলে দিতে চাই। আমি নিজে একটা ভূমিকা লিখে তোমার লেখাটা ছাপাব। একজন অল্পশিক্ষিত শ্রমিক যে নিজের চেষ্টায় এমন জোরালো গল্প লিখতে পেরেছে এটা তুলে ধরব, তোমার গল্পের আসল গুণ কী ধরিয়ে দেব। তারপর সকলকে লেখাটা পড়াব, সাহিত্য বৈঠকে লেখাটা নিয়ে আলোচনা করব। নাম হলে যেচে তোমার লেখা নেবে, টাকাও দেবে। নামের জন্য লেখকেরা প্রথমে কত ত্যাগ স্বীকার করে, তুমি সামান্য ক-টা টাকার মায়া ছাড়তে পারছ না ?

একগুঁয়ে কালাচাঁদ তবু সতেজে মাথা নাড়ে, মাপ করবেন মানুবাবু। বিনা মজুরিতে খাটুনি বেচব না। আপনাদের বিচারবিবেচনা মাথায় ঢোকে না মোটে। পয়সা দিয়ে কাগজ কিনবেন, পয়সা দিয়ে ছাপাবেন, সম্পাদককে পয়সা দেবেন, এজেন্টদের কমিশন দেবেন, নামকরা লেখককে পয়সা দেবেন, লোক পাঠিয়ে পাঠিয়ে পয়সা দিয়ে লেখা ভিক্ষে চাইবেন—নতুন লেখকের লেখা ছাপবেন বিনা পয়সায় ?

কালাচাঁদ জ্বালাভরা হাসি হাসে।

চটবেন না মানুবাবু, এত খেটে লিখে বিনা পয়সায় লেখা দিয়ে নাম করে মোর কাজ নেই। সবাই খাটুনির মজুরি পাবে, নতুন লেখক পাবে না ? এ উদ্ভট নিয়ম চলবে কেন গো মানুবাবু ? অ্যাপ্রেন্টিসও কিছু পায়—নতুন লেখক খাতিরে লিখবে কেন ?

নতুন লেখক খেটেও মজুরি পায় না—এ অবস্থা পালটাবার জন্য যে কাগজ লড়ছে—সে কাগজে জোরালো লিখবে।

কালাচাঁদ হেসে বলে, সে তো আলাদা কথা হল মানুবাবু ! খাটুয়েদের লড়ায়ে কাগজেও বিনা মজুরিতে কেউ লেখে কি ? খেটে লিখেছি, মজুরি পাওনা হবেই—তবে কি না নগদ না পেয়ে ওটা জমা হল ফান্ডে। অমনি কোনো কাগজে ছাপবেন কি লেখাটা, যে কাগজে কোনো লেখার নগদ মজুরি দেয় না ?

মানব খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলে, এদিকটা তো খেয়াল করিনি কালাচাঁদ !

কালাচাঁদ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, নিয়ম-অনিয়ম খেয়াল করতে ভুলে যান বলেই তো মোদের এই দুর্দশা। খেয়াল হয়নি বলে আপশোশ করলেন, ফুরিয়ে গেল। খেয়াল না হওয়ার জন্য কানমলার কেউ তো নেই !

মানব বলে, তোমায় আজ বড়ো গরম দেখছি কালাচাঁদ ?

কালাচাঁদ মাথা নাড়ে।

গরম মোটেই নই মানুবাবু। আপনাদের কত জ্ঞান, কত বিদ্যা, কত পড়াশোনা। মোদের ওভারটাইমের ঝগড়া নিয়ে জেল খেটে এলেন। তবু আপনার সোজা কথাটা খেয়াল নেই যে খাটালে মজুরি দিতে হয় !

লেখাটা আমার কাছে থাক। দেখি কী করা যায়।

মহেশকেই গল্পটা পড়তে দেয় মানব। প্রেস চালু হবার পর মহেশের সম্পাদনায় একটা মাসিকও বার করা হবে।

মহেশ গল্পটা লুফে নেয়।

বলে, শুধু মজুরি দিয়ে ছাপব ! এই গল্পের নামে কাগজের নাম হবে। লাগসই একটা নাম খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

পড়তে পড়তে মনে হয় সে যেন লেখার জন্য লেখেনি, লেখক হবার জন্য লেখেনি, তার মতো সকল মানুষের প্রাণের তারে সুর মিলিয়ে লেখায় একটি মর্মান্তিক অভিশাপ-বর্ষণ ঝরেছে, ধনদাসের মতো জগতে যত মানুষ আছে, তাদের উপর।

লেখাটা ছাপাবার আগে মানবকে দিয়ে কালাচাঁদকে মহেশ তার নতুন সম্পাদকীয় দপ্তরে সন্ধ্যার পর চা খাবার নেমন্তন্ন জানিয়েছিল।

মানব আর কালাচাঁদ আসে প্রায় একসঙ্গে—দু-চারমিনিট আগে পরে।

কালাচাঁদকে রীতিমতো সমাদর করে বসিয়ে মহেশ বলে, কম্পোজিটার হিসাবে নয়—তোমায় চা খেতে ডেকেছি লেখক হিসাবে। কাজেই চেয়ারে জাঁকিয়ে বসো—ভুলে যাও যে তুমি কম্পোজিটার। তোমার লেখার নামে কাগজের নাম হবে ঠিক করেছি, তোমার লেখাটা প্রথম ছাপাব ঠিক করেছি।

চেয়ারে কালাচাঁদ জাঁকিয়েই বসে, কিন্তু শান্ত নম্রসুরে বলে, আমি কম্পোজিটার এটা ভুলতে হবে কেন, মহেশবাবু ?

তুমি লেখক হিসাবে এসেছ বলে !

কম্পোজিটার বুঝি লেখক হয় না ? বারণ আছে ?

মহেশ লজ্জা পায়—খুশিও হয়। বলে, তুমি ঠিক বলেছ, আমারই ভুল হয়েছে, ও কথা বলে তোমায় তুলতে গিয়ে নামিয়ে দিয়েছি।

ততক্ষণে মানব এসে গেছে।

মহেশ তখন বলে, একটা গুরুতর কথা বলতে তোমায় ডেকেছি কালাচাঁদ ! তোমার লেখাটা অন্য কাগজে ছাপা হলে এমনিতে ধনদাসের চোখেও পড়বে না—ব্যাটা প্রেস করেছে, কাগজ বার করে, কিন্তু সাহিত্যের দিকে তাকায় না।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে একটু হেসে কালাচাঁদ বলে, তাকালে কি ব্যাটা নিজের সর্বনাশ টেনে আনত ? আপনাকে বরখাস্ত করত ?

মহেশ বলে, আমার কাগজ বলে ধনদাস নিজেই কিন্তু কাগজটা পড়বে কিংবা অন্যেবা এ লেখাটা দেখাবে ধনদাসকে। লেখাটা পড়ে ধনদাস যদি তোমায় তাড়িয়ে দেয় ?

কালাচাঁদ ফুঁসে ওঠে, ইস্ ! তাড়িয়ে দেবে ! একটা লেখা ছাপার জন্য তাড়িয়ে দেবে ! প্রেস বন্ধ হয়ে যাবে না সঙ্গে সঙ্গে ?

মানব বলে, লেখাটা আপনাকে দেওয়ার আগে একটা বৈঠক করিয়েছিল প্রেসের লোকেদের নিয়ে। আমিও হাজির ছিলাম। কালাচাঁদ লেখাটা পড়ল—তারপর আমি সকলকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ লেখা ছাপালে যদি কালাচাঁদের কাজ যায় তবে কী উপায় হবে ?

মহেশ হেসে বলে, আটঘাট বেঁধেই তবে সব করেছ।

মানব বলে, আটঘাট না বেঁধে কি কাজ হয় ? সব কাজে আটঘাট বাঁধতে হয়। এই যে প্রেস করলেন, কাগজ বার করবেন—এ সব কি আটঘাট না বেঁধে হচ্ছে ?

জহর প্রশ্ন করে, বৈঠকে কী ঠিক হল বলুন না ?

মানবকে মুখ খুলতে হয় না ! কালাচাঁদ বলে, সবাই বলল, এ লেখা ছাপালে যদি আমায় তাড়ায়, সবাই কাজে গিয়ে জায়গায় বসে শুরু থেকে শেষতক হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। এক লাইন হরফ সাজাবে না।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটে।

মহেশ বলে, তোমার লেখার নামে আমাদের পত্রিকার নাম দিলে তোমার কোনো আপত্তি নেই তো ?

জহর বলে, নামটা আমাদের সকলের পছন্দ হয়েছে।

মানব তামাশা করে খেদের সুরে বলে, ইস্ ! আমার যদি একবার খেয়াল হত ! এই নাম দিয়ে কাগজ বার করে আমিই লাখ টাকা কামিয়ে নিতে পারতাম !

কালাচাঁদ বলে, মানুবাবু, ফাঁকতালে যারা লাখ টাকা কামাতে চায়, তাদের হাতের লেখা দেখেও হরফ সাজিয়েছি অনেক বছর। প্রত্যেকটি অক্ষর গাঁথি, কমা-সেমিকোলনের হিসেব রাখি—কে কেন লেখে টের পেতে কি বাকি থাকে মানুবাবু ?

মহেশ গম্ভীর হয়ে বলে, ধনদাস কিন্তু তোমাকে তাড়াবেই। প্রেসে সবাই তোমার জন্য হাত গুটিয়ে থাকলে একটা আপস করবে--তোমাকে আবার কাজে ফিরিয়ে নেবে। কিছুদিনের মধ্যে তোমায় চোর কিংবা খুনি বানিয়ে শেষ করে দেবে।

দেবে ? দিলেই হল ? সবাই চুপচাপ মেনে নেবে বজ্জাতিটা ? কী যে ভাবেন, কী রকম যে হিসাব করেন আপনারা—

গোড়াতেই কালাচাঁদের হরফ গল্প বুকে নিয়ে নতুন বাংলা বছরেব বৈশাখের মাঝামাঝি হরফ পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

নতুন প্রেস, নতুন কাগজ, নতুন ব্যবস্থা বলে কাগজ বার করতে পয়লা দোসবার বদলে মাসের মাঝামাঝি হয়ে যায়নি, মহেশের নীতি অনুসারেই এই সময় কাগজটা বার করা হয়েছে।

লোক মাইনে পায় ইংরাজি মাসের গোড়াতে--বাংলা মাসের কোনো হিসাব ধরাই হয় না।

মাসকাবারি মাইনে পেয়ে যারা কাগজ কিনবে তাদের হিসাব না কষে বাংলাদেশে কাগজ বার করারও নাকি কোনো মানে হয় না !

মানব প্রতিবাদের সুরে বলেছিল, কেন ? বাংলা পনেরো-ষোলো তারিখে ইংরেজি পয়লা হয়। এমন কাগজ বার করবেন যা পনেরো-ষোলো দিনেই বাসি হয়ে যাবে, লোকে কিনবে না ?

এ দেশে তাই হয। মাসিকপত্র হল ভাজা মাছের মতো। যত ভালো করেই ভাজ, জুড়িয়ে গেলে কেউ কিনবে না।

কথাটা মানলাম না কিন্তু প্রতিবাদ ফিরিয়ে নিলাম। যে বিষয়ে জানি না, যে বিষয়ে ভাবিনি, সে বিষয়ে কথা বলা বোকামি।

কোনো খবরই অজানা ছিল না ধনদাসের। হরফ যে বেরোচ্ছে, সে খবর সে ভালোভাবেই জানত।

নিজের কাগজ পড়া শুরু করতে তাব হপ্তা খানেক সময় লাগে, হরফ বাজারে বার হওয়ামাত্র একখানা কাগজ আনিয়ে অন্য সব কাজ ফেলে পাতা ওলটাতে শুরু করে।

কভারটা পবীক্ষা করতে তার বিশেষ কৌতূহল জাগে না—কভারে এক লাইন বিজ্ঞাপন নেই।

কভাবের পর বিজ্ঞাপনের তিনটি পাতা সযত্নে উলটিয়ে দেখে সে প্রথম পাতায় ঠেকে যায়।

প্রথম পাতায় ভণিতা নেই, মুখপত্র নেই, নিবেদন নেই, হরফ-এর জন্মের কোনো কৈফিয়ত নেই—শুধু আছে কালাচাঁদ নামে একজনের লেখা হবফ নামে একটা গল্প। নতুন মাসিক বার করার এ কোন নতুন কায়দা ?

গল্পটাতেই অনেকক্ষণ আটকে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ গল্পটা ঘেঁটে পাতা উলটে মাসিকপত্রে গল্পের পর সম্পাদকীয় ছাপার নতুনত্ব চাক্ষুষ করে তার মনে প্রশ্ন জাগে যে, গল্পটা কি কাগজের নাম নিয়ে বিশেষভাবে লেখা ?

গল্পটা পড়তে শুরু করে আর থামতে পাবে না, পড়া শেষ করে বুকটা ধড়াস করে ওঠে ধনদাসের !

মহেশের সম্পাদকীয়ের আগে তাকে খোঁচা দিয়ে লেখা কালাচাঁদ এই ছদ্মনামের লেখকের গল্প ছাপিয়ে নতুন কাগজ বার করেছে মহেশেরা, তার কাগজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ? বরখাস্ত হবার রাগে মহেশ তার সঙ্গে শত্রুতা চালিয়ে যাওয়া, কাগজের একটা নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছে !

দুপুর পর্যন্ত ধনদাস গুম হয়ে ভাবে। তারপর উমাকান্তকে ঘরে না ডাকিয়ে নিজেই তার কাছে গিয়ে একটা চেয়ারে মুখোমুখি বসে বলে, কাগজ চালানো বড়ো দায় উমাবাবু !

দায় বইকী ! দশজন যারা যেমন ভাবছে তাদের মনের মতো করে না চালালে কাগজ চালানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

উমাকান্তের কাছে এ রকম জবাবই ধনদাস আশা করেছিল। নিজের বিচলিত ভাব যথাসাধ্য গোপন রেখে সে জিজ্ঞাসা করে, হরফ দেখেছেন নাকি ?

দেখেছি বইকী !

আগাগোড়া উলটিয়ে-পালটিয়ে দুমড়িয়ে-মুচড়িয়ে পড়া মাসিকটা উমাকান্ত তার সামনে এগিয়ে দেয়।

পাল্লা দিতে পারবেন ?

কেন পারব না ? পাল্লা দেওয়া কঠিন কিছুই নয়, আমাকে পাল্লা দেবার সুযোগ দিলেই পাল্লা দিতে পারব !

ধনদাস প্রথম লেখাটা বার করে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে, এ লেখাটা কার জানেন--ভদ্দরলোককে চেনেন ? কাগজের নামে লেখা গল্প---একেবারে প্রথমে ছেপে দেওয়া হয়েছে !

উমাকান্ত বলে, কাগজের নামে লেখা গল্প নয়—গল্পের নামেই কাগজের নাম হয়েছে। লেখক খুব গরিব, এই লাইনেই আছেন।

বলতে বলতে উমাকান্ত ধনদাসের মুখের ভাব লক্ষ করে। ধনদাসের অবশ্য একবার মনেও পড়বে না তার ছাপাখানাতেই একজন কালাচাঁদ কাজ করে, বলে দিলেও হয়তো বিশ্বাস করবে না যে তার প্রেসের কম্পোজিটার ওই কালাচাঁদই গল্পটির লেখক !

ধনদাস জিজ্ঞাসা করে, কোথায় থাকেন ? আসল নামটা কী ? কোন কাগজে কাজ করেন ?

উমাকান্ত সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হয়ে যায়,—তার মনে পড়ে যায় যে হরফ গল্পে ধনদাসের চরিত্রের একটা দিক আছে এবং তাকে মর্মান্তিক ব্যঙ্গের আঘাত করা হয়েছে।

সে বলে, অত কে খবর রাখে বলুন ? কোনো সাহিত্য সভা-টভায় আলাপ হয়েছিল—ওই পর্যন্তই পরিচয়। নতুন লেখক—কোথায় থাকে কী করে জিজ্ঞাসাও করিনি।

ধনদাস বলে, অ !

১২

অপর্ণার উপদেশ ও ব্যাখ্যা নিদারুণ আতঙ্ক জাগালেও চন্দ্রা ভেবেছিল যে, এখনও যখন সর্বনাশ হয়নি এবং জহর নিজে থেকেই তাকে নিতে এসেছে এবার নিশ্চয় সামলে নেওয়া যাবে।

ব্যাপার যখন বুঝে গিয়েছে ভুল তো আর সে করবে না, সুতরাং ভয়েরও আর কারণ নেই।

কিন্তু দেখা যায় দুপক্ষ দীর্ঘদিন ধরে বিষম একটা ভুল করে এলে তার জের অত সহজে মিটে যায় না, হঠাৎ সমস্ত বোঝাপড়া হয়ে গিয়ে সব গোলমাল চুকে যায় না।

বিশেষত ভুল বোঝার ধাক্কায় একজন যখন রাত্রে ঘুমের জন্য মদ খাবার অবস্থায় গিয়ে পৌঁছোয়।

সে আসবার পর থেকে জহর অবশ্য অনেক সংযত হয়েই ও জিনিসটা খেতে আরম্ভ করে কিন্তু পদার্থটা খানিক পেটে যাবার পর কী রকম অদ্ভুতভাবেই যে বদলে যায় মানুষটা !

কোনোদিন তার জন্য দরদ জাগে অস্বাভাবিক, কোনোদিন হৃদয়হীনতার অন্ত থাকে না।

কোনোদিন অতিরিক্ত দরদ বা নিষ্ঠুরতার, একটা নিয়ে আরম্ভ হয়ে অন্যটায় গিয়ে পৌঁছোয়।

চন্দ্রা মিনতি করে বলে, কেন গিলছ, বাদ দাও না ? ওটা বাদ দিলে যখনই ডাকবে, দেখবে আরও কত খুশিতে গদগদ হয়ে বুকে যাব।

যখন তখন বুকে ডেকেছি তোমায় কখনও ?

ডাকোনি বলেই তো ঝঞ্ঝাট হল। ডাকতে চাও—ভদ্রতার খাতিরে ডাকবে না। পুরুষ মানুষ—জোর করে ডেকে দেখতে হয় না ? ভাগ্যে বিগড়ে যাওনি তুমি !

জহর ভাবে, ন্যাকামি ! বাপের চাকরি গেছে। তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাপ উঠবার চেষ্টা করছে--তাই এই ন্যাকামি ?

জহর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তার চাউনি দেখে এমন অস্বস্তিবোধ হয় চন্দ্রার !

তারপর জহর বলে, কাগজ আর প্রেসটা যদি না চলে তুমিও মরবে আমিও মরব।

জানি না ? একশোবার জানি। কিন্তু হঠাৎ প্রেস আর কাগজের কথা তুললে কেন ?

জহর চুপ করে থাকে। চন্দ্রা যেন একটু রেগে যায়।

ভয় পাচ্ছ কেন ? আমি তো তোমার পক্ষেই আছি ! এসো না দুজনে মিলেমিশে চেষ্টা করে নেশাটা কাটান দিই ? আমায় যা বলবে আমি তাই করব।

ধীরে ধীরে জহর একটা সিগারেট ধরায়।

সম্পাদক বাবার চাকরি গেল। বড়োই মুশকিল হল খাওয়াপরার। বাড়ি বাঁধা রেখে ধার করে প্রেস আর কাগজের ব্যবস্থা করতেই ভালোবাসা যেন উথলে উঠল তোমার বুকে !

চন্দ্রা কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে - বিচারবিবেচনা করে স্থির করে নেয় রাগ করবে কি না।

উথলে উঠবে না ? এতকাল তো ছিলে ভীরু কাপুরুষ, আমার একটা বিশ্রী ভুল ধারণার তোষামোদ করতে। তুমি কী ভাবছিলে আমি আগেই টের পেয়েছি। ভাগ্যে মুখ ফুটে বললে, নইলে কথাটা খোলসা করতে সাহস পেতাম না।

কত বড়ো অপমানের কথা বলেছে জহর, তবু চন্দ্রার মুখে হাসি ফোটে।

বাপের বিপদে স্বামী উপকার করলে মেয়ে খুশি হবে না স্বামীর ওপর ? ওতে কোনো দোষ আছে নাকি ! ওটাই তো সংসারের সাধারণ নিয়ম। তবে সত্যি সত্যি ভালোবাসাটা কিন্তু সে জন্য উথলে ওঠেনি। ভালোবাসা আগেই ছিল, ভুল করে বোকার মতো চেপে রেখেছিলাম। অপর্ণাদি আমার ভুল ভেঙে দিয়েছে। অপর্ণাদিও আমার মতো ভুল করে ডুবতে বসেছিল।

জহর চেয়ে থাকে।

চন্দ্রা বলে, চায়ের দোকানে বসে মানুদার কাছে কী কাঁদুনি গেয়েছিলে মনে নেই বুঝি ? অপর্ণাদির পরামর্শে মানুদা তোমার সঙ্গে কথা বলেছিল। আমায় কেন নাও না, রাত্রে এলে কেন থাক না, আমি কি তার মানে জানতাম ? আমায় জিজ্ঞেস করে অপর্ণাদিও বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা। তোমার সঙ্গে কথা কয়ে মানুদা যখন এসে সব বলল—তখন অপর্ণাদি ব্যাপার বুঝল, আমাকেও বুঝিয়ে দিল।

বটে !

তবে কী ? দোষ তোমার ছিল না--সব দোষ আমার। আমি ভাবতাম, যদ্দুর পারা যায় দেহটা ছাঁটাই করে মনের প্রেমকে বড়ো করলে তোমার কাছে আমার দাম বাড়বে। নইলে আমি ছোটো হয়ে যাব তোমার চোখে।

একটু আগে হেসেছিল, এবার চোখে জল এসে যায়।

নিজে ভেতরে ছটফট করছি, ভাবছি যে চুলোয় যাক মানসিক ছাঁকা ভালোবাসা—তবু কীভাবে তোমায় ঠেকিয়েছি, মার্জিত রুচির ঢং আর ভান করে তোমার ভালোবাসার গলা টিপে ধরেছি !

চন্দ্রা এবার কেঁদে ফেলে। অবাধ কান্না !

এ সব মিথ্যে কথা নয়। প্রমাণ তো দিয়েছি আগেই। বিপদের সময় বাবার পাশে দাঁড়িয়েছ বলে ? ছাই বুঝেছ তুমি ! কেন, সেদিন যে গেলে, রাত্রে না থাকলে সুইসাইড করব বলে তোমায় যে আমি জোর করে রাখলাম—তখন কি বাবার চাকরি গিয়েছিল ? সেদিন প্রমাণ দিইনি ?

কিন্তু জহর কি আর তখন এ সব মানবার মুডে আছে ! সে একটু নরমও হয় না, নীরস গলায় বলে, ভালোবাসার আবাব প্রমাণ দিতে হয় নাকি ? কথাটা বলেই প্রমাণ দিলে, তোমার শুধু হিসাব কষা ভালোবাসা। যাকগে, কেঁদো না, এভাবে কাঁদলে মনে হবে তোমার বুঝি হিস্টিরিয়া হয়েছে !

জহর সেদিন বেশি মদ খায়। চন্দ্রার অনুরোধ-উপরোধ অগ্রাহ্য করে কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়ে।

চন্দ্রা মিনতি করে বলে, কিছু একটু খাও। খালি পেটে ওগুলি গিলে কিছু না খেয়ে ঘুমোলে পরদিন কী রকম শরীর খারাপ হয় মনে নেই ?

জহর তাকে এক ধমকে থামিয়ে দেয়।

মাঝরাত্রে চন্দ্রার ঘুম কিন্তু ভাঙে জহরের নিবিড় আলিঙ্গনে ও পাগলের মতো আদর করার চোটে।

গভীর অনুতাপের সুরে জহর বলে, তোমায় আজ অনেক যা-তা কথা বলেছি, না ? লক্ষ্মীটি, ও সব কথা ধরো না, রাগ কোরো না। মাথাটা কী রকম গবম হয়ে বিগড়ে গিয়েছিল।

অত মদ খেলে বিগড়ে যাবে না মাথা ?

কাল থেকে আর খাব না।

একটু কিছু খেয়ে নেবে ? সেই দুপুরে অল্প চাট্টি ভাত খেয়েছিলে, তারপব কিছুই পেটে পড়েনি—ওই জিনিসটা ছাড়া।

এতরাতে খাব ?

সামান্য কিছু খাও।

চন্দ্রা গরম করে খাবার এনে দেয। খেয়ে উঠে জহবের ঘুম আসে না, শুযে শুযে সে চন্দ্রার সঙ্গে জল্পনা-কল্পনা চালিয়ে যায়—কী করে মদ খাওয়াব অভ্যাসটা একেবারে ত্যাগ কবা সম্ভব।

জল্পনা-কল্পনা থেকেই বুঝতে পারা যায়, পরদিন থেকে জহব যে আব মদ খাবে না বলেছিল এ কথাটা সে রাখতে পারবে না।

জামাইয়ের সর্বস্ব, তাব নিজেব সর্বস্ব, অনেকেব সহানুভূতি, সদিচ্ছা এবং সহযোগিতা মূলধন।

জহর চাকরি করছে, তার দবকাব নেই। কিন্তু মহেশেব মাসে মাসে যেমন হোক একটা বেতন চাই।

নূতন প্রেস, কাগজটাও নতুন।

এত টাকা ঢেলে প্রেসটা চালু কবে অনেক চেষ্টাতেও চলতি খরচেব টাকাটা মাসে মাসে তোলা যায় না। প্রায় বিজ্ঞাপনহীন কাগজটায় মাসে মাসে লোকসান দিতে হয !

এটা জানাই ছিল। হিসাব করাই ছিল। নানাপার্টির সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলে কাজ বাড়াতে হবে, বিজ্ঞাপন আনাতে হবে—তাবপর হয়তো দেখা যাবে লাভের মুখ। বেশ কিছুদিন লোকসান দিয়ে চালাতেই হবে ছাপাখানা এবং মাসিকটা।

হিসাব করা থাকলেও চিন্তা-ভাবনার অন্ত থাকে না।

মহেশ ও জহর দুজনেই মানবের কাছে এক বিষযে কৃতজ্ঞতাবোধ করে। সে জোর করে বলেছিল বলেই এবং অনেকটা তারই খাতিরে, কালাচাঁদের বাধ্যতামূলক বেকারত্বের এক মাস সময়, প্রেসটা গড়ে তোলার খুঁটিনাটি ব্যাপার দেখার বিশেষ কাজটা তাকে দেওয়া হয়েছিল।

কত অপব্যয় যে কালাচাঁদ বাঁচিয়ে দিয়েছে।

কোনো একটা মোটা খরচ বাঁচানো নয়—অনেক রকম অনেকগুলি টুকরো খরচ। এতকাল একটা প্রেসের কাজ চালিয়ে এসেছে কিন্তু মহেশও হয়তো খেয়াল করত না অনেক টুকিটাকি অপব্যয়ের মোট কষলে কেমন একটা মোটা অঙ্ক দাঁড়িয়ে যায়।

মহেশ বলেছিল, লেগেই যাক না কালাচাঁদ ?

মানব বলেছিল, না। নীতিটা ঠিক রাখতে হবে। এখানে নেওয়া হয়েছে শুধু বেকারদের—যদ্দিন প্রেস আর কাগজটা না দাঁড়িয়ে যায় ওরা কম পয়সায় বেশি খাটবে। এক মাস বেকার ছিল, খেটে গেল—ওকে এ লড়ায়ে টেনে লাভ কী ? বউটা মারা গেল, বড়ো একটা মেয়ে আছে—মেয়েটার বিয়ে এবার দিতেই হবে। যেখানে খেটেছে সেখানেই খেটে যাক যতদিন পারে।

মহেশ ও জহর দুজনেই মানবকে হরফ কাগজের সহকারী সম্পাদকের চাকরি নিতে বলেছিল।

বেতন কম কিন্তু প্রেস আর কাগজের ভবিষ্যতের সঙ্গে গাঁথা হয়ে থাকবে তার চাকরি আর বেতন বাড়া।

প্রেস আর কাগজটার আয় যেমন বাড়বে তারই এক নির্দিষ্ট অনুপাতে তার বেতন বাড়বে। মুখের কথায় নয়, লিখিত চুক্তিপত্রে তাকে চাকরিতে বহাল করা হবে। হরফ বেঁচে থাকলে তার চাকরিও বজায় থাকবে। কোনো বিশেষ অপরাধ করলে প্রকাশ্য আদালতে বিচার হবার পর আদালতের নির্দেশ নিয়ে তবেই তাকে বরখাস্ত করা চলবে।

মানব কিন্তু চাকরি নিতে রাজি হয়নি। বলেছিল, বাঁধা টাইমে বাঁধা নিয়মে খাটতে পারব না। ধাতে সইবে না। তার চেয়ে এককাজ করুন—আমায় ছুটকো মজুর হিসেবে রাখুন। আমার নিজের লেখা যা ছাপা হবে কলম হিসেবে মজুরি দেবেন—প্রুফ যা দেখে দেব ফর্মা হিসেবে মজুরি দেবেন।

জহর রাজি হয়েছিল কিন্তু মহেশ আপত্তি করে বলেছিল, গাদা গাদা লেখা আসবে, সেগুলো যে পড়তে হবে তোমায় ! কয়েকটা লেখা ঘষে মেজে ঠিক করেও দিতে হবে। এর মজুরি কষা হবে কী হিসেবে ?

মানব হেসে বলেছিল, হিসেব খুব সোজা। বিনা পয়সায় হরফে কারও লেখা তো যাবে না—কবিতাও যেমন হোক কিছু দাম পাবে। ঘষামাজা করে যার লেখা ছাপতে হবে তার সঙ্গে আমার থাকবে একটা বখরা। কতটা ঘষামাজা দরকার হিসেব করে বখরা ঠিক হবে—লেখক রাজি না হলে সে লেখা যাবে না।

বাঁধা বেতনে বাঁধা টাইমের চাকরি নেয়নি—কিন্তু এই নিয়মে ক্রমে ক্রমে বাঁধা বেতনের সহ-সম্পাদকের চেয়ে ঢের বেশি খাটছে মানব।

লেখা পড়তে হয় অজস্র। কয়েকটা লেখা বেছে সংশোধন করে দিতে হয়। নামকরা লেখকের যে লেখা ছাপা হবেই, সে লেখারও অনেক বানান ভুল ব্যাকরণ ভুল, তাকে শুদ্ধ করে নিতে হয়।

নিজেকে নানারকম লেখা লিখেও দিতে হয় নানাবিষয়ে।

চুক্তিমাফিক চাকরি নিলে মানবকে সাড়ে দশটায় হরফের আপিসে পৌঁছে পাঁচটায় বেরিয়ে যাওয়া চলত।

যেমন খাটুনি তেমন মজুরির নিয়মে নিজেকে বহাল করে তাকে সকালে চা-খাবার খেয়ে যেতে হচ্ছে হরফের আপিসে—বস্তির ঘরে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাচ্ছে !

মহেশ বলে, সত্যি তুমি চালাক ছেলে। যে চাকরি নিলে ষাট-সত্তর টাকা মাইনে পেতে, সে চাকরি না নিয়ে মাসে ঢের বেশি কামাচ্ছ।

মানব হেসে বলে, আপনারও এ বিভ্রম হল ? লাভ করছি ভাবলেন ? চাকরি নিলে ক-ঘণ্টা কীভাবে খাটতাম আর এখন কীভাবে খাটছি হিসেব কষলেন না ? খাটুনির তুলনায় কিছুই তো পাচ্ছি না !

একলা মানুষ, টাকা দিয়ে কী করবে মানব ?

একলা মানুষ কী দোকলা মানুষ সে ভাবনা আপনার কেন ? টাকা নিয়ে ফুর্তি করব, টাকা উড়িয়ে দেব ! খেটেই তো রোজগার করছি টাকা ! দয়ার দান তো নিচ্ছি না !

মহেশ একটু হেসে বলে, আমি লক্ষ করেছি কয়েকটা বিষয়ে সাধারণভাবে—এমনকী তামাশা করে তোমায় কিছু বললেও তোমার মেজাজ গরম হয়ে ওঠে।

মানব লজ্জা পেয়ে বলে, না না, মেজাজ গরম হয়নি, তবে আপনিও যখন বলেন লেখকের টাকার কী দরকার—প্রাণে তখন লাগে।

সাত টাকা ভাড়ার একখানা ঘরে থাকে। নিজের মনে লেখে। কারও তোয়াক্কা রাখে না। তবু কেন তাকে বাঁধা পড়ে যেতে হল হরফের স্বার্থে ? সব দায় যেন তার ! সম্পাদক মহেশের নির্বাচিত লেখা বাতিল করার দায় পর্যন্ত তার ঘাড়ে চেপেছে !

তার অগোচরেই কম্পোজ হয়ে গিয়েছিল লেখাটা। প্রুফ দেখে সে ছাপাবার অর্ডার দেবে।

লেখাটা পড়ে মহেশের টেবিলের সামনে সাজানো একটা চেয়ারে বসে সে বলে, ভীমরতি ধরে থাকলে হাসপাতালে যেতে পারতেন, হরফের কেন সর্বনাশ করছেন ?

মহেশ রাগ করে না, হেসেই বলে, আমায় হাসপাতালে পাঠিয়ে তুমি বুঝি হরফের সম্পাদক হতে চাও ?

আজ্ঞে না। সম্পাদক হবার মোটেই শখ নেই। কিন্তু এ লেখাটা কি ছাপা চলে ? এ লেখাটা ছাপালে বলতেই হবে হরফের লেখা বাছাই করার কোনো নিয়ম-নীতি নেই, বিচারবিবেচনা নেই, হরফ একটা বাজে কাগজ।

বটে ! দেখি তো কোন লেখাটা ?

ছাপা লেখাটায় চোখ বুলিয়ে মহেশ প্রুফের কাগজ ক-টা কয়েক ফালা করে ছিঁড়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দেয়। বলে, সত্যিই বলেছ, হরফে এ লেখা ছাপা যায় না।

জহর রেগে যাবে না ?

রেগে গেলে উপায় কী ? কাগজের মালিক আর আমার জামাই বলে কি এ লেখা ছাপা যায় ? জহরের লেখা আবার কী দেখব ভেবে আমিই অবশ্য না পড়ে লেখাটা ছাপতে দিয়েছিলাম—জহর এমন বাজে লিখবে ভাবতেও পারিনি। এখন বুঝতে পারছি মদের ঝোঁকে লিখেছিল, নিজে আরেকবার না পড়েই দিয়ে গেছে।

জহর এলে হাতে-লেখা কপিটা তাকে ফেরত দিয়ে মহেশ বলে, লেখা শেষ করে আরেকবার পড়ে দেখেছিলে ? পড়ে দেখো !

মনে মনে জহর রাগে কি না টের পাওয়া যায় না, মানব তবু ব্যাপারটা হালকা করে দেবার জন্য হেসে বলে, আপনার নিজের কাগজ—এখান থেকে লেখা ফেরত গেলে আপনার কিন্তু কোনো অপমান হয় না। বেশি রকম কড়া হয়েছে বলে আমার একটা লেখাও মহেশবাবু ফেরত দিয়েছেন।

শুধু লেখা ছাপিয়ে নয় লেখাটার নামে কাগজের নামকরণ করে কালাচাঁদকে এমনি উছলে দেওয়া হয়েছে যে, প্রথম সংখ্যা কাগজ বার হবার পর সে আরেকটা গল্প এনে দেয়।

দ্বিতীয় সংখ্যায় উমাকান্তেরও একটা লেখা বার হবে।

হরফে সব লেখার উপরে স্পষ্টভাবে লেখার পরিচয় ছাপিয়ে দেওয়া হয় যে সেটা গল্প অথবা প্রবন্ধ অথবা কবিতা—কালাচাঁদের লেখাটার কোনো পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে না !

এটা কোন লেখার পর্যায়ে পড়ে ভেবে-চিন্তে পরামর্শ করে ঠিক করতে পারেনি মহেশ, মানব আর জহর।

খানিকটা যেন গল্প, খানিকটা আত্মজীবনী খানিকটা ব্যঙ্গরচনা, খানিকটা প্রবন্ধ, খানিকটা আগুনের শিখার মতো লেলিহান ঘৃণা ও জ্বালার উচ্ছ্বাস !

বেশ বড়ো লেখা—কাবুকার্যহীন, সাদামাটা খানিকটা সেকেলে ধাঁচেব গদ্যে কোনো বকম কাযদা খাটাবাব চেষ্টা না কবে সোজাসুজি গল্পটা বলে যাওযা—পড়ে কিন্তু প্রাণটা বিশেষভাবে নাড়া খায়।

এ গল্পেও সে ধনদাসকে একচোট নিযেছে।

লেখাটাব আবম্ভ হল

একজন নামকবা লেখক ছিলেন, তাহাব নাম ছিল দুর্গানাথ। কেবল লেখাব কাজ কবিতেন বলিয়া দুর্গানাথেব দাবিদ্রেব সীমা ছিল না।

সুন্দবী পত্নীকে তিনি বড়োই ভালোবাসিতেন—বাসিবেন না ? অমন বূপবতী গুণবতী স্ত্রীকে ভালো না বাসিযা কোনো স্বামী পাবেন ! গবিব বলিয়া কোনো সাধ পূর্ণ কবিতে না পাবিলেও মাঝে মাঝে একটু ঝগড়াঝাঁটি কবিযাই তিনি ক্ষান্ত হইতেন এবং কর্মক্লান্ত স্বামীব শবীব ও মনকে তাজা বাখিতে হাসিমুখে প্রাণপণে চেষ্টা কবিতেন।

স্বামীব সেবা কবাব সঙ্গে তিনটি সন্তানকে জীবনপাত কবিয়া লালনপালন কবিতেন

লেখক দুর্গানাথ স্ত্রীকে আদব কবিযা খেলনা বলিয়া ডাকিতেন—বলিতেন, তুমি সত্যি দামি খেলনা। এমন গুবুতব কাজ কবি, এমন সব ভাবনায মেতে থাকি, তুমি একটু খেলা দিযে না সামলালে অনেক আগেই শেষ হযে যেতাম।

খেলনা হাসিত, বলিত, নিজেব স্বার্থ না দেখলে চলে ? তুমিই আমাব স্বার্থ—কাজেই তোমাকে দেখতে হয।

দুর্গানাথ হাসিযা উঠিয়া বলিতেন, ও, তুমি তবে নিজেব স্বার্থে সব কব, তুমি এমন স্বার্থপব !

ঘবেব কাজ কবিতে কবিতে মুখ তুলিয়া হাসিমুখে খেলনা বলিতেন, স্বার্থ না দেখে কী কবে পবার্থ দেখব ? তুমিই আমাব একমাত্র পবার্থ—তোমায দেখা স্বার্থ দেখায তফাত কীসেব ?

এমনিভাবে শুদ্ধ ও চলতি ভাষা খানিকটা জড়িযে দুর্গানাথ ও খেলনাব ঘবোযা জীবনেব একটি সবস মধুব চিত্র দিযে কালাচাঁদ আমদানি কবেছে ধনেশকে

কিছুদিন একসাথে পড়িযাছিলেন বলিযা ধনেশ নামে একজনেব সঙ্গে দুর্গানাথেব ভাব ছিল। ধনেশ একটি ছাপাখানাব অংশীদাব ও ম্যানেজাব ছিলেন।

পুবাতন বন্ধু যে কীবূপ অর্থপিশাচ হইয়া উঠিযাছিল এবং ছাপাখানাব লোকেদেব সহিত কীবূপ দুর্ব্যবহাব কবিতেন দুর্গানাথ তাহা জানতেন না। ধনেশেব অনুবোধে প্রকাশককে বলিযা দুর্গানাথ তাহাব বইগুলি ওই ছাপাখানায় ছাপিতে দিতেন এবং প্রুফ দেখিবাব জন্য প্রাযই প্রেসে গিযা বন্ধুব সহিত গল্প কবিতেন। তিনি উপস্থিত থাকিলে ধনেশ ভিজা বিড়ালটিব মতো ভালো মানুষ সাজিযা থাকিত।

ধনদাসেব চেহাবা এবং তাব প্রকৃতিব কিছু বর্ণনা আছে।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, কিন্তু ধনদাসেব সবু গলা থেকে কটা চোখ পর্যন্ত চেহাবাব এবং লুকিযে কর্মীদেব কথাবার্তা শোনা, বাইবেব লোকেব সামনে দু-একটা সিগাবেট ও অন্য সময বিড়ি টানা পর্যন্ত চালচলনেব এমন কযেকটা বৈশিষ্ট্য কালাচাঁদ বেছে নিযেছে যে ধনদাসকে যাবা জানে বর্ণনাটা পড়তে পড়তে তাদেব মানসচোখে ধনদাসই বূপগ্রহণ কববে।

তাবপব কালাচাঁদ দবিদ্র কিন্তু সুখী দুর্গানাথেব জীবনে বিপদ এনেছে—খেলনাব কঠিন অসুখ। তাব চিকিৎসাব জন্য প্রকাশকদেব কাছে ধন্না দিযে কিছু পাওনা টাকা এবং নতুন একটা বইযেব জন্য কিছু আগাম টাকা জোগাড় করে বাড়ি ফেবাব পথে দুর্গানাথ ধনেশেব প্রেসে যায। বাড়ি ফেবাব জন্য প্রাণ আকুল, কিন্তু দায না সাবলেও উপায নেই। প্রুফ দেখে ছেড়ে দিলে বইটা তাড়াতাড়ি বাজাবে বেবোবে এবং তাবও টাকা পাওনা হবে।

একটা সুযোগ সৃষ্টি করিযে ধনেশকে দিযে দুর্গানাথেব ওই টাকাটা কালাচাঁদ চুবি কবিযেছে।

চমৎকার জমেছে গল্পেব ক্লাইম্যাক্সটা। ধনদাসেব উপব ঘৃণায সর্বাঙ্গ যেন বিবি কবতে থাকে। সুযোগ পেয়ে লোভ সামলাতে না পেবে বন্ধুব মৃতপ্রায বুগ্ণা স্ত্রীব চিকিৎসার জন্য এত কষ্টে সংগ্রহ

কবা টাকাটা চুবি কবে ধনেশেব মধ্যে লোভ ও পাপ কবাব ভযেব স্থূল বিবোধ বর্ণনা কবে, টাকা খোযা গেছে জেনে হতভম্ব দুর্গানাথেব মুখে খেলনাকে তবে মবতে হবেই উক্তি শুনে—টাকা ঠিক আছে, তোমাব সঙ্গে একটু তামাশা কবছিলাম বলে অনাযাসে নোটগুলি ফিবিযে দেওযা যায খেযাল কবে, ফিবিযে দেবাব ইচ্ছা জাগলেও পাপীব মনেব ভয আব লোভ, কীভাবে ইচ্ছাটা কার্যে পবিণত কবতে ছিল না, তাব সহজ সবল বর্ণনা দিযে কালাচাঁদ লিখেছে—

বুকটা ধড়ফড় কবিতে থাকে, প্রাণটা আঁকুপাঁকু কবিতে থাকে, বন্ধুব গ্রাসকবা টাকাটা উগবাইযা দিবাব জন্য ধনেশেব অন্তবে ছটফটানি জাগে। কিন্তু গ্রাসকবা টাকাপযসা উগবাইযা দেওযা তাব প্রকৃতিবিবুদ্ধ কাজ। নিজেব প্রকৃতিব বিবুদ্ধে সে কেমন কবিযা যাইবে। চোব ডাকাত খুনিদেব কি আব সাধুপুবুষ মহাপুবুষ হইবাব সাধ জাগে না ? কিন্তু অন্যবূপ সাধ জাগিলে কী হইবে, স্বভাব তাহাদেব চুবি কবায়, ডাকাতি কবায়, খুন কবায়।

পবিহাস কবিযাছে বলিয়া চুবিকবা টাকাটা ফেবত দিতে পাবে জানিযাও এবং ফেবত দিতে চাহিযাও মহেশ বলে, ভাই, তোমবা লেখকবা বড়োই কাছাখোলা লোক। কলকাতাব পথেঘাটে হবদম পকেট থেকে টাকা মাবা যাচ্ছে জানো না ?

বিহ্বল দুর্গানাথ বলে, বাস থেকে নেমে একবাব হাত দিযে দেখেছিলাম ব্যাগটা ঠিক আছে।

ধনেশেব বুকটা কাঁপিয়া ওঠে। দুর্গানাথেব সামান্য টাকাটা চুবি কবিযা কী বোকামিই কবিযাছে। এই কথাটাই হযতো দুর্গানাথেব মনে তোলপাড় কবিবে যে বাস হইতে নামিযা পকেটে হাত দিযা দেখিযাছিল পকেটে টাকা ঠিক আছে—তাব প্রেসে ঢুকিবাব পব শূন্যে মিলাইযা গিযাছে নোটগুলি।

হয়তো আব তাব প্রেসে আসিবে না দুর্গানাথ। হযতো আব সে তাকে কোনো কাজ দিবে না।

হযতো সকলেব কাছে তাহাব নিন্দা কবিযা বেড়াইবে।

এবূপ চিন্তা দুর্গানাথেব মনেব কোণেও উঁকি মাবে নাই। কিন্তু পাপীব মন সর্বদাই ভীত হইযা থাকে যে, তাহাব পাপকর্ম জানিবাব বুঝিবাব জন্য জগৎ সংসাবে সকলেই ওত পাতিযা আছে।

ধনেশ হাসিযা বলে, লেখক মানুষ, তোমাদেব ব্যাপাব আলাদা। বাসে উঠবাব আগে না বাস থেকে নেমে পকেটে টাকা ঠিক আছে জেনেছিলে ভাই ?

দুর্গানাথ মাথায ঝাঁকি দিযা বলে, কী জানি আমাব মাথা ঘুবছে।

একটা নিশ্বাস ফেলিযা ধনেশ বলে, আমাবও এমন অবস্থা দাঁড়িযেছে যে তোমাকে সাহায্য কবাব ক্ষমতা নেই। গোটা কুড়ি ধাব দিচ্ছি, যখন পাববে শোধ দিযো।

বন্ধুব স্ত্রীব চিকিৎসা কবাব টাকা চুবি কবিয়া ধনেশেব মাথাও এলোমেলো হইযা গিযাছিল।

দুর্গানাথেব যে টাকা চুবি কবিযাছিল তাহা হইতেই দুইটি দশ টাকাব নোট সে দুর্গানাথকে দেয।

সব নোটই এক বকম। দুর্গানাথ বুঝিতে পাবে না যে, বক্ত জলকবা পবিশ্রমেব চুবি যাওযা মজুবিব নোটগুলি হইতেই সে দুটি দশ টাকাব নোট বন্ধুব কাছে ঋণ হিসাবে ফেবত পাইযাছে।

মানব বলে, না, সত্যি লেখক হযে উঠেছে কালাচাঁদ। খেলনাব জন্য দুশ্চিন্তা, বাড়ি ফেবাব জন্য ব্যাকুলতা, প্রুফ দেখাব সময অন্যমনস্কতা—এ সব বর্ণনা না দিলে চুবিটা একটু বেখাপ্পা হযে যেত।

ধনদাস উমাকান্তকে মহেশেব কাগজটাব সঙ্গে পাল্লা দেবাব কথা বলেছিল। প্রকৃতপক্ষে হবফেব সঙ্গে বস সাহিত্যেব প্রায কোনো প্রতিযোগিতা নেই—দুটি একেবাবে দু-স্তবেব দুবকম পাঠকেব জন্য আলাদা বকম মাসিকপত্র। কিন্তু সে কথা ধনদাসকে বলে কোনো লাভ নেই জেনে উমাকান্ত অনর্থক বাক্যব্যয কবেনি। ধনদাসেব কাছে মহেশেব কাগজ বাব কবাব একমাত্র উদ্দেশ্য হল তাব কাগজেব সঙ্গে পাল্লা দেওযা, তাব কাগজকে হটিযে দিযে প্রতিশোধ নেওযা।

মহেশেব বদলে অন্য কেউ সম্পাদক হযে মাসিকটা বাব কবলে দু-একবছব চলবাব পবেও হযতো ধনদাসেব চোখে পড়ত না, চোখে পড়লেও পাতা উলটে দেখাব শখ হযতো জাগত না কোনোদিন।

তার কাগজ থেকে বিতাড়িত মহেশকে কেন্দ্র করে বার হয়েছে বলেই হরফ সম্পর্কে তার এত কৌতূহল। দ্বিতীয় সংখ্যা হরফ বার হবার সময় হলে প্রতিদিন সে স্টলে খোঁজ নেয়, প্রকাশিত হওয়ামাত্র একটা সংখ্যা কিনে নেয় এবং নিজের কাগজটার চেয়েও বেশি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বেশি সময় খরচ করে সেটা মন দিয়ে পড়ে।

এ সংখ্যাতেও কালাচাঁদের হরফ নামে আরেকটি লেখা ছাপা হয়েছে দেখে সর্বাগ্রে সে ওই লেখাটি পড়ে নেয়।

ধনদাসের বুকটা আবার ধড়াস করে ওঠে। প্রথম সংখ্যা হরফ কাগজে কালাচাঁদের প্রথম লেখা হরফ পড়ে যেমন ধড়াস করে উঠেছিল।

এবার আরও স্পষ্ট—আরও সাংঘাতিক আক্রমণ !

দুর্গানাথ অর্থাৎ উমাকান্তের স্ত্রী খেলনা অর্থাৎ পুতুলের কঠিন রোগের চিকিৎসার জন্য অতি কষ্টে সংগ্রহ করা টাকা ধনেশ অর্থাৎ সে চুরি করে বন্ধুর স্ত্রীকে খুন করেছে।

কারও কি বুঝতে বাকি থাকবে কোন ব্যাপার নিয়ে কাকে এ গল্পে ঠোকা হয়েছে ?

কে এই গল্পের লেখক ? স্বয়ং উমাকান্ত কি ? কাউকে ফরমাশ করে টাকা দিয়ে ওটা লিখিয়ে নেওয়া হয়ে থাকলে লেখককে নিয়ে ধনদাস মাথা ঘামাবে না। কিন্তু উমাকান্ত নিজেই যদি ওটা ছদ্মনামে লিখে থাকে, তার মাসিকের মুদ্রাকর হবার সম্মান পেয়েও তাকে এভাবে আঘাত করে যে লেখা ছাপাতে পারে, তাকে শুধু তাড়াবে না—ঘা মেরে ওকে সে কাঁদিয়ে ছাড়বে—চুরমার করে দেবে ! ভালো করে বুঝিয়ে দেবে যে পিঁপড়ের পাখা গজালে ফলটা কী হয়।

সে জন্য এখন মাথা ঘামাবার দরকার নেই। উমাকান্তের মতো একটা মানুষকে জব্দ করার উপায়ের তার অভাব হবে না। আগে জানতে হবে সত্যই উমাকান্ত লেখাটার জন্য দায়ি কি না।

একটু বিরক্তির ভাবও দেখাবে না। এবং সদয় ব্যবহারে উমাকান্তকে নির্ভয় নিশ্চিন্ত করে রাখবে।

আসল ব্যাপারটা নিয়ে একটু মাথা ঘামানো দরকার।

মহেশকে বরখাস্ত করায় এবং উমাকান্তের বইটার কপিরাইট দেড়শো টাকায় কিনে ফেলায় তার যে ভারী বদনাম হয়েছে এটা ভালো করেই ধনদাস টের পেয়েছে।

কিন্তু আজও সে বুঝে উঠতে পারে না তার অপরাধটা কী, কী মারাত্মক দোষটা সে করেছিল !

মহেশ ঠিকমতো সার্ভিস দিতে পারছে না, রস সাহিত্য ঠিকমতো চালাতে পারছে না, তবু মাসে মাসে মাইনে দিয়ে ওকে রেখে তাকে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে ?

মহেশ যে ঠিকমতো চালাতে পারছিল না কাগজটা, উমাকান্তই তো তার জীবন্ত প্রমাণ ! একযুগেরও বেশি সময় ধরে সম্পাদক হয়ে থেকে মহেশ যা পারেনি, কত অল্প সময়ে উমাকান্ত সেটা সম্ভব করেছে—বর্ষার লতার মতো ফনফনিয়ে বেড়ে গেছে রস সাহিত্যের বিক্রি, বিজ্ঞাপন আর লাভ। উমাকান্তকে পুরস্কার না দিয়ে সে পারেনি।

মহেশকে তাড়ানো তবু কেন দোষনীয় ? একজন অকর্মাকে লোকসান দিয়ে দিয়ে পোষাই কি তার কর্ম—তার ধর্ম—তার কর্তব্য ?

উমাকান্তের বেলাতেও সে কী অপরাধ করেছিল ?

বলামাত্র দুশো টাকা দিতে তো সে রাজি হয়েছিল হাতে লেখা দিস্তা কয়েক কাগজের জন্য ! ওই টাকায় তো অনায়াসে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যেত পুতুলের !

নিজেকে মস্ত বড়ো মনে করে অহংকারে উমাকান্ত যদি না গ্রহণ করে থাকে তার উদারতা, ব্যাবসাদারের মতোই যদি যাচাই করে আসতে গিয়ে থাকে বাজারটা, কোথাও সুবিধা করতে না পেরে যদি আবার তার কাছেই ফিরে এসে থাকে, তার অসদ্ব্যবহারে চটে গিয়ে সে যদি দুশো টাকার বদলে

দেড়শো টাকায় কিনে নেয় তার বইয়ের কপিরাইট—তাতে উমাকান্তের বউকে মেরে ফেলার দায়টা তার ঘাড়ে চাপে কোন যুক্তিতে ? অন্য যে সব প্রকাশকদের কাছে উমাকান্ত চেষ্টা করতে গিয়েছিল, তারাও সমানভাবে দাযি নয় কেন ?

দুশো টাকা দিতে চেয়েছিল, নগদ নোট গুনে দিতে চেয়েছিল, চটপট ওই টাকাটা নিয়ে ডাক্তার ডাকিয়ে চিকিৎসা করালে বউটা তার নিশ্চয় বেঁচে যেত।

এ কী রকম পাগলামি যে বউ মরে মরুক তবু আমি সস্তায় কপিবাইট বেচব না ?

বিপদে পড়ে মানুষ কাবুলিওয়ালাব স্মরণ নেয়---নগদ শোধ দিতে পাববে না শুধু সুদ গুনে গুনে জীবন কাটানো কবুল করে ফেলে।

বইটা চলবে কি চলবে না, ছাপিয়ে লাভ হবে কি লোকসান যাবে, কিছুই ঠিক নেই। এ অবস্থায় দুশো টাকা নগদ দিয়ে কপিরাইট কেনা অপরাধ হবে কেন তাব ?

কেন তার বদনাম হবে ? কেন হরফ এমন লেখা বার কবার সুযোগ পাবে যা পড়েই উমাকান্তের কপিরাইট বিক্রির ব্যাপার যারা জানে তারা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবে কাকে আঘাত করা হয়েছে ?

আরও কম টাকাতেও সে কপিরাইট কিনেছে, অবশ্য উমাকান্তেব মতো ওই লেখকদেব নাম ছিল না।

মানবের একেবারেই নাম ছিল না, তার প্রথম বইয়ের কপিরাইট কিনেছিল একান্ন টাকায় ! বইটি খুব বিক্রি হযেছে, ইতিমধ্যে পাঁচটা সংস্করণ হয়েছে এবং ওই একখানা বই থেকে মানবেরও নাম ছড়িয়েছে লেখক হিসেবে।

তার কাছে ধনদাস আরেকখানা বই চেয়ে চিঠি লিখেছিল কিন্তু তাব তিন-চাবখানা চিঠিব জবাবও সে দেয়নি। রস সাহিত্যে লিখেও দশ-পনেরো টাকা দক্ষিণা পায়। অন্য কাগজেও লেখে, অন্য প্রকাশক বইও প্রকাশ করেছে কয়েকখানা।

এমনি নেমকহারাম হয় বটে মানুষ ! প্রথম বই সাহস করে ছাপিয়ে বাজারে ছড়িয়ে নাম করে দিল—এখন তার চিঠির জবাব পর্যন্ত দেয় না !

ভেবে-চিন্তে ধনদাস একদিন সকালে মানবের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয। হাত তুলে নমস্কার কবে অমায়িক হাসির সঙ্গে বলে, কেমন আছেন মানববাবু ? আপনাবা তো আর যাবেন না, নিজেই একবার দেখা কবতে এলাম।

অল্পক্ষণ সাধারণ আলাপের পরেই ধনদাস বলে, আমাকে আব বই দেবেন না ?

মানব জ্বালাভরা হাসিব সঙ্গে বলে, আপনাকে বই ? পঞ্চাশ টাকায কপিরাইট কিনে পাঁচটা এডিশন করেছেন—আপনাকে আবার বই ?

ধনদাস জাঁকিয়ে বসে বলে, অপরাধ করেছিলাম বলতে চান ?

মানব জ্বালার সঙ্গেই বলে, অপরাধ নয় ? লেখককে বাগে পেয়ে ঠকানো কি পুণ্য কাজ ?

ধনদাস বলে, তখন আপনার একখানাও বই বার হয়নি এটা ভুলে যাবেন না দয়া করে। প্রকাশকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছিলেন সেটাও মনে রাখবেন। আমি সাহস করে কপাল ঠুকে বইটা ছেপেছিলাম বলেই আজ নাম করেছেন—লিখে টাকা কামাচ্ছেন।

মানব ব্যঙ্গের সুরে বলে, কপালটা ঠুকে দিয়েছিলেন আমার। ক-টা টাকার জন্য বিপদে না পড়লে কপিরাইট বেচতাম ভেবেছেন ? আপনি এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন কতই দয়া করেছিলেন ! বই আমার ছাপা হত, নামও হতই—দুদিন আগে আর পরে। বই ভালো হলে ছাপা কি আটকে থাকে ? ভালো পাবলিশারও অনেক আছেন যারা ভালো বইয়ের কদর বোঝেন, লেখককেও ঠকান না। সবাই আপনার মতো ডাকাত নয় !

একটু থেমে মানব বলে, দু-একদিনের মধ্যে টাকাটা না চাইলে, বিপাকে পড়েছি টের না পেলে, আপনিই কি পঞ্চাশ টাকায় কপিরাইট চাইতে সাহস পেতেন ? রিস্কের কথাই বা বলছেন কোন মুখে ? ম্যানুস্ক্রিপ্ট দুদিন আপনার কাছে ছিল—বইটা যাচাই করেননি বলতে চান ? ভালো বই জেনেই লেখকের গলা কাটার সুযোগ নিয়েছিলেন। নতুন লেখক তো কী হয়েছে ? সব লেখকই একদিন নতুন থাকেন !

ধনদাস বলে, আমরা ব্যবসায়ী মানুষ—

মানব বলে, এর নাম কি ব্যাবসা ? কায়দায় পেয়ে লেখকের ন্যায্য পাওনা মেরে দেওয়া ? সাধারণভাবে যদি যেতাম, ম্যানুস্ক্রিপ্ট পড়ার সময় দিতাম—নিজে কিছু বুঝুন না বুঝুন, কোনো লেখককে দিয়ে পড়িয়ে তার মত নিয়ে অন্য রকম চুক্তিতে ছাপতেন। নতুন লেখক বলে, রিস্ক আছে বলে, প্রথম এডিশনে রয়ালটির সাধারণ রেটের চেয়ে অবশ্য কিছু কম পেতাম। সেটা হত ব্যাবসা।

মহেশ গোমড়া মুখে বলে, কে জানে মশায়--আপনাদের ন্যায়নীতি যুক্তিতর্ক মাথায় ঢোকে না। হলই বা বই—ব্যাপার তো সেই বেচাকেনার ? বেচার গরজ বেশি হলে সস্তায় মাল ছাড়তেই হয়-- সেটাই তো নিয়ম। দরকার হলে লোকসান দিয়েও ছাড়তে হয়। সবটা লোকসান যাবে—যেটুকু পাওয়া যায় সেটুকুই তখন লাভ। যে বই একদম কাটছে না সে বই আমরা মোটা কমিশন দিয়ে কাটিয়ে দিই—আদ্দেক দাম পেলে তাই সই, সিকি পেলে তাই সই। তাও না পেলে ওজনদরে ছেড়ে দিই।

মহেশ সখেদে মাথা নাড়ে, না মশায়, আপনাদের যুক্তি একদম মাথায় ঢোকে না। কই, আমাদের তো কেউ বেয়াত করে না !

তার আন্তরিকতা সম্পর্কে এতক্ষণে সচেতন হয়ে মানব প্রথমে বিস্মিত তারপর স্তম্ভিত হয়ে যায়। ধনদাসের আন্তরিকতা ?

আন্তরিকতা বইকী ?

মারাত্মক রকমের আন্তরিকতা। ধনদাস মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে দুনিয়ায় লেনদেন বেচাকেনার নীতিই এই—যেখানে সুবিধা পাবে, যখন যাকে বাগে পাবে !

সবাই ওত পেতে আছে, তাকে বাগে পেলেই তার ঘাড় ভাঙবে—সুতরাং তারও পরিপূর্ণ অধিকার আছে যাকে যখন যেভাবে বাগে পাবে তারই ঘাড় ভাঙার !

মানব ভেবে পায় না কী করে আসল কথাটা তাকে বোঝাবে, বিশ্বাস করতে পারে না যে জলের মতো সহজ করে বুঝিয়ে দিলেও সে বুঝবে।

সে বেচাকেনার শুধু লাভ-লোকসানের চলতি হিসাবটা জানে বোঝে। সাহিত্য বলো আর সংস্কৃতি বলো আর সভ্যতা বলো, ও সব কোনো কিছুর ধার সে ধারে না।

মানব খুব নরম সুরে বলে, কথাটা কী জানেন, লেখকেরা ব্যবসায়ী নন, তারা সমাজের সেবক। লেখকরা প্রকাশকের সঙ্গে ব্যাবসা করেন না, লেখকের সঙ্গে পার্টনারশিপে লেখকের বই নিয়ে প্রকাশকেরা ব্যাবসা করেন। প্রকাশকের সঙ্গে ছাপাখানা, কাগজওলা এদের ব্যাবসার সম্পর্ক—লেখকের সঙ্গে সে সম্পর্ক নয়। তাছাড়া, লেখকেরা অনেক ত্যাগস্বীকার করেন। সেই জন্য তারা আপনাদের কাছে সহযোগিতা, সহানুভূতি, ন্যায্য ব্যবহার আশা করেন।

ধনদাস খানিকক্ষণ গুম খেয়ে থেকে বলে, অন্যায্য ব্যবহারটা কী করেছি বুঝিয়ে বলুন না ? বেশ, আপনার কথাই মানছি, আমি না ছাপলেও আপনার বইটা ছাপা হত ! ধরুন আরও দু-তিনবছর ঘোরাফিরা করতেন—তারপর নাম হত। একটু দাঁও মেরে থাকলেও আমি বইটা ছাপিয়ে দিতে চটপট আপনার নাম হয়ে গেল। ওই দু-তিনবছরে পাঁচ ছটা বই লিখে ভালো টাকা পেলেন। বইটা নিয়ে আমি লাভ করেছি—আমি বইটা নিয়েছিলাম বলে আপনিও তো লাভ করেছেন !

মানব এবার বিরক্ত হয়ে বলে, আপনার খালি লাভের হিসাব। লেখক কি শুধু লাভের জন্য লেখেন ? টাকার জন্য লেখেন ?

ধনদাস বিরক্ত হয়ে বলে, লেখার জন্য লেখকরা তবে টাকা চান কেন ? যত বেশি পারেন টাকা আদায়ের চেষ্টা করেন কেন ?

মানব এবার সশব্দে হেসে উঠে বলে, লেখককেও বাঁচতে হবে বলে !

কতকাল আর ধনদাসের কাছে গোপন থাকা সম্ভব যে, হরফের শ্রীহীন উপাধিহীন লেখক কালাচাঁদ তারই প্রেসের কম্পোজিটার ?

লেখকদের ছদ্মনামে লেখার বাসনার খবরটা ধনদাসের অজানা ছিল না। সে ধরে নিয়েছিল যে হরফের শ্রীহীন উপাধিহীন কালাচাঁদ কোনো নামকরা লেখকেব ছদ্মনাম—মহেশ হওয়াও আশ্চর্য নয়, মানব বা খালেক হওয়াও আশ্চর্য নয়। উমাকান্তও হতে পারে।

নানাভাবে ধনদাস জানবাব চেষ্টা করছিল হরফের লেখক কালাচাঁদেব আসল নামটা কী।

লেখাটা নিয়ে যে রকম হইচই তাতে অধিকাংশ লেখকেরই ইতিমধ্যে জেনে যাবার কথা— আসল মানুষটা কে। কিন্তু আশ্চর্য, এই, যাকে জিজ্ঞাসা কবে সে-ই বলে জানে না ! লেখকদের মধ্যে এমন একতা ? এমনভাবে সবাই জোট বেঁধেছে ! তাব কাছে কালাচাঁদেব আসল পরিচয় ফাঁস কবা হবে না !

সুহৃদ চৌধুরী অত্যন্ত বাজে লেখে, কিন্তু ধনদাসের সে স্তাবকের মতো অনুগত। প্রতি সংখ্যা রস সাহিত্যে তার লেখা ছাপা হয় এবং সেই লেখাব জন্য সে সত্যিকাবেব লেখকেব ভালো লেখাব সমান মজুরি পায়। সুহৃদ যা লিখত নিরুপায মহেশ তাই ছাপিযে দিত।

তার লেখা না ছাপিয়ে উপায় নেই জেনে উমাকান্ত একটু কৌশল খাটিযে তার লেখা কনট্রোলেব ব্যবস্থা করেছে। সুহৃদকে সে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, রস সাহিত্যের রকমফেব হচ্ছে, নানা রকম নতুন লেখা দিতে হচ্ছে, খুব ছোটো ছোটো লেখা না দিলে হয়তো সুহৃদের লেখা সব সংখ্যায় ছাপা যাবে না।

ছোটো লেখা লিখুন না, যত ছোটো পারেন ! ছোটো লেখাতেই আপনার কলম ভালো খোলে। লেখা ছোটো হলেও দক্ষিণা ঠিক থাকবে—সে জন্য ভাববেন না।

কৃতজ্ঞ সুহৃদ ছোটো ছোটো লেখা দেয়, উমাকান্ত সেটা এমন জায়গায গুঁজে দেয় যে বস সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকারা বাজে লেখাটা অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারে।

ধনদাস একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কতটুকু করে লিখছ সুহৃদ ? ফাঁকেফোকরে তোমার লেখা ছাপা হচ্ছে কেন ?

সুহৃদ বলেছিল, আমার ছোটো লেখাই ভালো জমে। উমাবাবু জায়গামতোই ছাপছেন।

একদিন ধনদাস একটু রাগের ভাব দেখিয়ে সুহৃদকে বলে, এত দিন ধরে বলছি, হরফের ওই কালাচাঁদ লেখকটা কে, খবর জানতে পারলে না ? তুমি কেমন লেখক হে ?

সুহৃদ সবিনয়ে বলে, কী করব বলুন ? অসম্ভব কি সম্ভব করতে পারি ? কারও সাধ্য নেই ওই লেখকের আসল পরিচয় বার করে। ব্যাপারটা বুঝছেন না ? মহেশবাবু কাউকে দিয়ে লেখাচ্ছেন, হাতের লেখা চেনা যাবে বলেও হয়তো কপি করিয়ে প্রেসে দিচ্ছেন।

অকাট্য মনে করলেও যুক্তিটা পছন্দ হয় না ধনদাসের। কেন পছন্দ হয় না সে অবশ্য বুঝতে পারে না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে এ রকম লুকোচুরি জুয়াচুরির ব্যাপার চলে না, লেখকদের মধ্যে যতই মতবিরোধ ঈর্ষা আর বিদ্বেষ থাক, লুকিয়ে থেকে কোনো ব্যক্তিকে ঘা দিয়ে ব্যক্তিগত গায়ের ঝাল ঝাড়ার নীতি সাহিত্যে অচল। জীবনের নীতিকে তুলে ধরাই সাহিত্যের মূলনীতি।

সাহিত্য বিজ্ঞানকেও কনট্রোল করে। হাইড্রোজেন বোমা পর্যন্ত স্বাধীনতার জন্য সাহিত্যের মুখ চেয়ে থাকে !

ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য সাহিত্য নয়, ব্যক্তিগত আক্রমণ বাতিল নয়, সাহিত্যে সে আক্রমণ খিস্তিও হতে পারে কিন্তু বেনামিতে চলবে না।

লেখকদের নিজের নাম থাকলে সে কাগজ গরম গরম ব্যাপারে পড়তে না পড়তে বিকিয়ে যাবে। কারণ, সবাই বুঝতে চাইবে রক্তমাংসের মানুষটার বা মানুষগুলির এমন গায়ের জ্বালার কারণ কী।

আত্মগোপন করে ছদ্মনামে লেখাগুলি ছাপালে কাগজটা বিশ-পঁচিশ কপি বিক্রি হবে কি না সন্দেহ।

সবাই ভাববে, কে জানে কোন চোর ছ্যাঁচড় চোরাবাজারি বজ্জাতের মাথায় খিস্তি ছেপে গরিবের পকেট মারার মতলব জেগেছে !

কালাচাঁদও ছদ্মনামে লেখাটা ছাপালে অনেকেই একটু বিস্মিত এবং বিচলিত হয়ে ভাবত এটা কার লেখা, কী রকম লেখা !

গুণীমহলের কাছ থেকে খবর দাবি করত।

কারণ, সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ না রেখে তাদের স্বীকৃতি না পেয়ে কেউ গুণী হয় না– হতেই পারে না।

বিচলিত গুণীমহল, যেমন একজন কম্পোজিটার স্বনামে লেখাটা প্রকাশ করেছে জেনে, এমন লেখা সে কেন লিখেছে জেনে দশজনকে খবরটা জানিয়ে দিয়েছে, কালাচাঁদের নাম পরিচয় গোপন রাখলে সে খবরটাও দশজনকে জানিয়ে দিত।

লেখকের পরিচয় এবং লেখার মানে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ায় হুহু করে বিক্রি হয়ে গেছে হরফের কপিগুলি। অজানা লেখক আড়াল থেকে খামখেয়ালি খিস্তি করছে জানলে গুণীমহল বিচলিত হত না--ওই মহলে সাড়া না জাগায় খবরটাও ছড়িয়ে পড়ত না দশজনের মধ্যে।

এ খবরও সকলেই জানে যে কালাচাঁদের পরিচয় প্রকাশ করা হবে কি হবে না তাই নিয়ে একটা ঝড় বয়ে গিয়েছিল হরফের আপিসে।

মহেশ আর জহর ছিল গোপনতার পক্ষে, মানব ছিল বিরোধী। রাগারাগি তর্কবিতর্কের পর মানব প্রায় স্কুলমাস্টারের মতো গম্ভীর হয়ে ছাত্রদের পড়া শেখানোর মতো তাদের বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল মূল নীতিটা—এই সোজা কথাটা কেন বুঝতে চাইছেন না আপনারা ? লেখককে বাদ দিয়ে লেখার কোনো মানে হয় না। এ জগতে আজ পর্যন্ত কোনো লেখক নিজেকে আড়ালে লুকিয়ে রেখে খ্যাতিলাভ করতে পারেনি। সেটা অসম্ভব। রক্তমাংসের জানা-চেনা মানুষকেই মানুষ খাতির করে, খ্যাতি দেয়। দশজনের জন্য লেখা। জানতে চাইবে কে এই মহাজন—কেমন ধারা এ মানুষটা, যে এতকাল পরে আমার মনের কথা লিখল ?

ছদ্মনামে লিখে থাকলেও নিজের নামধাম বংশ পরিচয় এবং নিজের রীতিনীতি রুচি প্রকৃতি স্বচ্ছলতা দরিদ্রতা সবকিছু নিয়ে অন্তত সাহিত্যের জগতে সকলের সামনে এসে দাঁড়াতে হবে লেখককে— তবেই সকলে দাম দেবে তার লেখার।

কালাচাঁদ কি একজন বড়ো লেখকের ছদ্মনাম ? এই নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হতে না হতে প্রচারিত হয়ে হয়ে গেল যে কালাচাঁদ লেখকের আসল নাম—অন্যায়-অত্যাচারের দানবীয় প্রতীককে আঘাত হেনে লেখা হলেও লেখক আত্মগোপন করে লুকিয়ে আঘাত হানেননি। নিজের নামেই তিনি লিখেছেন লেখাটা।

একদিন অল্পবয়সি একটি প্রাণোজ্জ্বল তরুণ একেবারে ধনদাসের দপ্তরে গিয়ে হাজির হয়ে চাপা আগ্রহ আর উত্তেজনায় কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করে, আপনিই কি এ প্রেসের মালিক ? আপনারই প্রেসের কম্পোজিটর কালাচাঁদবাবু অদ্ভুত রকম নতুন ধরনের গল্প লিখছেন হরফে ?

ধনদাস চমকায় না, ভড়কায় না, ধাতছাড়া হয়ে যায় না। অদ্ভুত, উদ্ভট এবং বীভৎস ঘটনার সঙ্গে তার প্রায় নিত্যকার পরিচয়।

সে ধীরভাবে বলে, বসুন না, বসে বলুন না কী চাইছেন !

ছেলেটি সংযত হয়ে বসে, ধীরে ধীরে বলে, আমার নাম অমূল্য বসাক, আমিও একজন নতুন লেখক—

ধনদাস বলে, তাই নাকি ! রস সাহিত্যে লেখেন না কেন ?

অমূল্য একটু বিব্রত হয়ে বলে, রস সাহিত্য ? রস সাহিত্যের নাম তো শুনিনি !

ধনদাস হেসে বলে, নামও শোনেননি রস সাহিত্যের ? রস সাহিত্য বলে একটা মাসিক আছে না জেনেই লেখক হয়েছেন ?

অমূল্যও হেসে বলে, বাংলা মাসিকের কথা আর বলবেন না, আনাচকানাচ ঝোপঝাড় থেকে গন্ডায় গন্ডায় মাসিক বেরোয়। কে অত হিসাব রাখে বলুন ?

ধনদাস সায় দিয়ে বলে, ঠিক কথা। কতকাল প্রেস চালাচ্ছি—আমার কি আর জানতে বাকি আছে ! আর কিছু করার নাই—চালাও একটা মাসিক ! যাকগে—কালাচাঁদের কথা কী বলছিলেন ?

ওনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই। একজন কম্পোজিটার এ রকম চমৎকার গল্প লেখেন—ভাবলেও অবাক হয়ে যেতে হয়।

একমুহূর্ত চিন্তা করে ধনদাস কালাচাঁদকে ডেকে পাঠায়।

সে এলে হাই তুলে বলে, এই ভদ্দরলোক তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন কালাচাঁদ ! ইনিও তোমার মতোই নতুন লেখক। তবে কিনা তুমি বিশ বছর ধরে রস সাহিত্যের পাতা কম্পোজ করছ—উনি কাগজটার নামও শোনেননি !

অমূল্য চেয়ার ছেড়ে উঠে কালাচাঁদের হাত চেপে ধরে বলে, আপনিই লিখেছেন হরফের গল্প দুটো ? আপনাকে একদিন আমাদের সঙ্গে যেতে হবে—আমরা আপনাকে মালা দেব আর আপনার সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করব।

নিজের চোখ আর কানকে ধনদাস কোনোদিন অবিশ্বাস করেনি। আজ সন্দেহ জাগে চোখ-কান তার ঠিক আছে তো !

কালাচাঁদদের তাড়াতে নোটিশ লাগে না—সোজা বলে দেওয়া যে কাল থেকে আর খাটতে এসো না !

সঙ্গে সঙ্গে প্রেসের কাজ মন্থর হয়ে আসার সঙ্গে একটা গুঞ্জনধ্বনি ওঠে—কিছুক্ষণের মধ্যে কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়ে সেটা পরিণত হয় কলরবে। হইচই চেঁচামেচি নয়—স্বাভাবিক গলাতেই অনেকের একসঙ্গে কথা বলার আওয়াজ।

সবাই হাত গুটিয়ে নিজের জায়গায় বসে আছে।

উমাকান্ত উঠে গিয়ে কালাচাঁদকে জিজ্ঞাসা করে, কারণটা কী বললেন ?

কালাচাঁদ বলে, কিছু না। জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ তাড়িয়ে দিচ্ছেন কেন বাবু, কী দোষ করলাম ? জবাব দিলেন, তুমি বড়ো পাজি লোক, তোমায় রাখব না।

উমাকান্ত ভেবে-চিন্তে ধনদাসের কামরায় গিয়ে বলে, একটা কথা বলব ভাবছিলাম—কিন্তু বললেই তো আপনি চটে যাবেন।

কালাচাঁদকে বরখাস্তের হুকুম দেবার পরেই সমস্ত প্রেস মুখরিত হয়ে ওঠায় ধনদাস প্রমাদ গুনছিল।

ধনদাস মিষ্টিসুরে বলে, না না, চটব না। আপনার কথা শুনে কোনোদিন চটেছি উমাবাবু ? আমি জানি, আপনি আমার পক্ষ টেনে কথা বলবেন, আমার ভুলচুক দেখিয়ে দেবেন।

উমাকান্ত বলে, কালাচাঁদকে এ রকম হঠাৎ তাড়ানো উচিত হবে না। মহেশবাবুকে ছাড়িয়ে দিয়ে আপনার বড়ো বদনাম হয়েছে।

ধনদাস কিছুক্ষণ একদৃষ্টে উমাকান্তের মুখের দিকে চেয়ে থাকে, তারপর শান্তকণ্ঠে বলে, আমি কি কালাচাঁদকে তাড়াতে চাই ? সবাইকে তাড়ালে কাজ চালাব কাদের নিয়ে ! তবে কিনা, আমার এখানে কাজ করবে, লেখা ছাপাবে হরফে ! কেন, আমার একটা কাগজ বেরোয় না ? সে কাগজে লিখতে দোষ আছে কিছু ?

উমাকান্ত কথা বলে না। একটা সস্তা চুরুট ধরিয়ে খানিকক্ষণ নীরবে ধোঁয়া টেনে ধনদাস বলে, কে এটা সহ্য করবে বলুন ? আমার কাছে খেটে পয়সা লুটবে, লিখবে শত্রুর কাগজে !

শত্রুর কাগজ ?

না তো কী ? মহেশবাবু এত দিন আমার কাগজের সম্পাদক ছিলেন, ছেড়ে গিয়ে নতুন কাগজ বার করলেন। তার মানে কি আমার কাগজের সঙ্গে শত্রুতা করতে নামা নয় ?

বলতে বলতে বিষম কাশি আসে ধনদাসের। চুরুটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে কাশির ধমক সামলায়।

যাকগে, যাকগে। কালাচাঁদকে রইয়ে-সইয়ে তাড়াতে বলছেন ? তাই হোক। আরও দু-একমাস কাজ করুক। হরফের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবে না কথা দিলে যেমন কাজ করছে তেমনি করে যাবে।

উমাকান্তের ওকালতির ফলে কালাচাঁদের কাজটা টিকে যায়। খবরটা শুনে কিন্তু তার মুখে কোনো রকম ভাবপরিবর্তন দেখা যায় না।

সম্প্রতি যে একটা অদ্ভুত কাঠিন্যের ছাপ সর্বদাই তার মুখে দেখা যাচ্ছিল সেটা তেমনি বজায় থাকে।

সে শুধু বলে, তাড়ালে তাড়াতেন ! প্রাণপাত করে কাজ শিখেছি, খেটে খাই—মোদের কি কাজের অভাব ঘটে মানুবাবু ?

ধনদাস ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেনি যে কালাচাঁদের লেখার তাৎপর্য সে টের পেয়েছে। সে জানে তাকে ব্যঙ্গ করে আঘাত দিয়ে গল্প লিখেছে বলে একটু বিচলিত হওয়াও বোকামি হবে, রাগারাগি করার তো প্রশ্নই ওঠে না।

শত্রুর কাগজে লেখার জন্য তেড়েমেড়ে যাকে দূর করাব হুকুম দিয়েছিল কয়েকদিন পরে তারই সঙ্গে ধনদাসকে সদয়ভাবে উদারভাবে কথা বলতে দেখে উমাকান্ত আশ্চর্য হয়ে যায়।

পুরো প্রায় পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধনদাস কালাচাঁদের সঙ্গে কথা বলে। কিছুই যেন তার জানা ছিল না এমনিভাবে তার বউয়ের রোগ ও মৃত্যুর খবর জিজ্ঞাসা করে, সহানুভূতি জানায়—ছেলেমেয়ে ক-টি, কে এখন তার সংসার চালাচ্ছে এ সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে।

ভাবতে ভাবতে সুহৃদের এ রহস্যের সমাধান হঠাৎ পেয়ে যায় উমাকান্ত—রস সাহিত্যের শেষ ফর্মার প্রুফ দেখতে দেখতে শেষ পাতার নীচে মোটা একটা সরাসরি টানা লাইনের তলে সম্পাদক হিসাবে ছাপা তার নামের পরেই মুদ্রাকর হিসাবে কালাচাঁদের নামটা দেখতে পেয়ে।

তাই বটে। সম্পাদক মহেশের নামের সঙ্গে মুদ্রাকর কালাচাঁদের নামটা ছাপা হয়ে আসছিল কাগজটার প্রথম সংখ্যা থেকে। সুহৃদের বদলে এবার কালাচাঁদের নাম ছাপা হয়েছে। মুদ্রাকর বলে নাম ছাপা হওয়া কতবড়ো সম্মান—সামান্য একজন কম্পোজিটার, রস সাহিত্যের মুদ্রাকর !

কালাচাঁদের পক্ষ নিয়ে তার ওকালতির যুক্তি সত্যই ভড়কে দিয়েছে ধনদাসকে।

মহেশকে তাড়িয়ে সৎ ও গুণীলোকের মহলে তার যে বদনাম রটেছে উমাকান্তের মুখ থেকে না শুনলে ধনদাস হয়তো কোনোদিন খেয়ালও করত না, একটা মাসিক সাহিত্যপত্রিকা চালালে যে এ রকম সুনাম দুর্নামের হিসাব রাখতে হয় এটাও কস্মিনকালে তার মাথায় আসত না।

খেয়াল করে টনক নড়েছে। এতকালের সম্পাদককে তাড়িয়ে জুটেছে বদনাম। এতকালের মুদ্রাকরকেও তাড়িয়েছে জানাজানি হলে বদনাম আরও বেড়ে যাবে নিশ্চয় !

তার কাগজের মুদ্রাকর কালাচাঁদ যে তাকেই খোঁচা দিয়ে হরফে লেখা ছাপায় এটাও অনেকে কল্পনা করতে পারবে না—ভাববে ওগুলি বানানো গল্প। এদিক থেকেও কালাচাঁদকে রেখে লাভ আছে।

হিসাবনিকাশ তাই পালটে দিয়েছে ধনদাস। কালাচাঁদ তার ছাপাখানায় কাজ করে তার শত্রুর কাগজে লিখুক—সে আর তাকিয়েও দেখবে না। কালাচাঁদকে তাড়ানোর ইচ্ছা তার নেই—মুদ্রাকর হিসাবে ওর নামটাই সে রস সাহিত্যের শেষ পাতায় ছাপিয়ে যেতে চায় !

বোনের তিনটি ছেলেমেয়ের দায় নিয়ে মুকুল নাকি পুতুলদির অভাবটা সামলে নেবে। বড়ো হয়ে কেমন হয়েছে অন্তত একবার চোখে দেখে আসা উচিত। কিন্তু হরফের কাজের উপবে বড়ো একটা লেখা নিয়ে মশগুল হয়ে মানব উচিত কাজটা ক্রমাগতই পিছিয়ে দিতে থাকে।

কয়েকদিন পরে হরফের জন্য উমাকান্তের কাছে একটা লেখা আনতে গিয়ে মানব মুকুলকে দেখে আসে। লেখার জন্য লোক পাঠালেই চলত—মুকুলকে দেখার জন্য মানব নিজেই যায়।

উমাকান্ত একমনে কলম পিষছিল। পুতুলের গয়না বাঁধা রেখে তার সেই নতুন কেনা কলমটা !

পুতুলের সঙ্গে শেষ কলহের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে কলমটা তার তুলে রাখার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু আরেকটা কলম না কিনলে সেটা তো আর সম্ভব নয় !

লিখতে লিখতে পুরানো হয়ে ক্ষয়ে গিয়ে শেষ হয়ে যাবার পব স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে তুলে রাখতে হবে। উপায় কী ?

মানবকে সে বলে, তোমার লেখাটাতে একটু চোখ বুলিয়ে দেব—ভেতরে বসে ওদের সঙ্গে গল্প করো গিয়ে।

মুকুলের মা-কে বিধবাব বেশে সে এই প্রথম দেখল, কিন্তু পুতুলের মতো দেখতে মুকুলের দিকেই সে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

মুকুল বলে, এতদিনে বুঝি সময় হল দেখা করতে আসাব ?

মানব আরও অভিভূত হয়ে লক্ষ করে যে পুতুলের মতোই মুকুলেরও মুক্তার মতো দাঁতগুলি ঝকঝক করছে।

মুকুলের মা মানবকে আদর করে বসিয়ে বলে, বই লিখে খুব নাম করেছ শুনেছি। তোমার চেয়ে ঢের বেশি বই লিখে কতজনে তোমার মতো নাম করতে পাবেনি। প্রতি চিঠিতে তোমাব পুতুলদি তোমার কথা লিখত।

মুকুলের মা আঁচল দিয়ে চোখ মোছে।

তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মানব বারবার মুকুলের দিকে তাকাচ্ছিল, হঠাৎ নিজের মনে সে খাপছাড়া মন্তব্য করে বসে—কিন্তু যমজও তো নয় !

লিখে নাম করলেও তার চেহারা যে খুব খারাপ হয়ে গেছে—মা-র এই কথার মাঝখানে তার মন্তব্য শুনে মুকুল একটু হেসে বলে, কীসের যমজ নয় ?

মানব বলে, অবিকল পুতুলদির মতো দেখতে, কথা থেকে হাসিটা পর্যন্ত। পুতুলদির চেয়ে তুমি পাঁচ ছবছরের ছোটো। ওই তফাতটাই শুধু ধরা যায়—বয়সে কাঁচা।

মুকুলের মা বলে, যমজ না হলে কি বোনে বোনে মিল থাকে না ? মিলটাই তোমরা দেখছ—তফাতও অনেক আছে। কয়েকবার যাওয়া আসা করো, নজর পড়বে। প্রথম দেখে উমাও বলেছিল, অবিকল বিয়ের সময়কার পুতুল। এখন আর বলে না।

সুধাকে উমাকান্ত শক্ত হতে বলেছিল, সুধা কীভাবে শক্ত হয়েছে কী কবেছে সেই জানে। ধনদাস আব উমাকান্তকে টানাটানি কবে না।

সব চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপাব এই যে ধনদাসকে অসন্তুষ্ট মনে হযনি। জালজাল শাড়ি পবে পবিবেশন কবে তাকে খাইযে সভ্যজগতেব ভদ্রবেশ ধবে নির্জন ঘবে তাব সঙ্গে গল্প কবতে এলে, সুধাকে সে গল্পচ্ছলেই সাংঘাতিক বিদ্রোহেব উপদেশ দিযে এসেছিল—সেদিন ভাবতেও পাবেনি ফলাফল কী হবে। একেবাবেই কোনো ফল হবে কি না।

দু-চাবদিন একটু গম্ভীব ও চিন্তিত মনে হয়েছিল ধনদাসকে।

কিন্তু বাগেব ভাব প্রকাশ পাওযাব বদলে একটু যেন শ্রদ্ধাব ভাবই প্রকাশ পেযেছিল তাব কথা ও ব্যবহাব।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেও ফেলেছিল- আপনাবা লেখকেবা আশ্চর্য মানুষ। এদিকে এমন উদাসীন ভাবুক মনে হয, ঠিক যেন স্বপ্নবাজ্যে বাস কবেন, অথচ আসল কথাটা চট কবে ধবতে পাবেন। আমবা হাজাব মাথা ঘামিযেও কূলকিনাবা পাই না।

সুধাব কী গতি হল জানবাব জন্য মাঝে মাঝে উমাকান্তেব জোবালো কৌতূহল জাগে কিন্তু মুখ ফুটে তাব সম্পর্কে ধনদাসকে কিছু জিজ্ঞাসা কবতে ভবসা পায না।

এমনি চুপচাপ আছে কিন্তু সে যেচে সুধাব কথা তুললে হযতো একেবাবে বিযেব প্রস্তাব কবে বসবে।

পায দুমাস কেটে গেছে কিন্তু আবাব নিমন্ত্রণ পাওযাব আশঙ্কা উমাকান্তেব একেবাবে ঘুচে যাযনি। ধনদাস যে কোনো একটা ব্যবস্থা কবাব জন্য পাগল হযে ওঠেনি এটাই তাব অদ্ভুত মনে হয।

তবে কি কোনো জঘন্য উপাযে বিপদ কাটিযে সমস্যাব সমাধান কবে ধনদাস নিশ্চিত হয়েছে?

হঠাৎ একদিন কিন্তু আবাব উমাকান্ত নিমন্ত্রণ পায। একেবাবে সুধাব বিয়েতে ভোজ খাবাব নিমন্ত্রণ।

ধনদাস বলে, ছেলেটি যে আমাব খুব বেশি পছন্দ হয়েছে তা নয—তবে কিনা জানাশোনাব মধ্যে। দেখা যাক মেয়েটাব অদৃষ্টে কী আছে।

উমাকান্ত পবম স্বস্তিবোধ কবে। একটা কথা ভেবে সে খুশিও হয। ধনদাস বলেছে ছেলেটি জানাশোনা—তাহলে এ নিশ্চয সুধাব চেনা সেই জোযান ছেলেটি।

ওই দিন আবেকটা বিযেব ভোজেও তাব নিমন্ত্রণ ছিল—নিজে না লিখলেও লেখকগোষ্ঠীব সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাহিত্যবসিক একজন বড়ো সবকাবি চাকুবেব বাড়িতে।

সুধাব বিযেব ভোজ খেতে যাওযাই উমাকান্ত ঠিক কবে—অন্য নিমন্ত্রণে শুধু হাজিবা দিতে যাবে।

ছেলেটিকে দেখবাব আগ্রহে একটু সকাল সকাল ধনদাসেব বাড়ি গিযে উমাকান্ত বিযেব আসবে বসে আছে, একটি ছেলে এসে জানায যে তাকে একবাব অন্দবে যেতে হবে।

তাকে অন্দবে ডেকেছে? উমাকান্ত একটু আশ্চর্য হযেই ভিতবে যায। সেদিন দুপুবে নিমন্ত্রণ খাইয়ে যে ঘবে তাকে বিশ্রাম কবতে দেওযা হয়েছিল ছেলেটি সেই ঘবে নিযে গিযে তাকে বসায। খানিক পবেই কনেব সাজে সুধা এসে হাঁটু পেতে বসে, তাব পাযে মাথা ঠেকিযে প্রণাম কবে।

উমাকান্ত হাসিমুখে জিজ্ঞাসা কবে, সুধা, পাত্র তোমাব সেই জোযান মানুষটিই তো?

সুধা মৃদুস্ববে বলে, হ্যাঁ। আপনিই আমায বাঁচিযে দিলেন, আপনাব ঋণ জীবনে ভুলব না।

আমাব ঋণ? আমি তো কিছুই কবিনি।

আপনিই সব দিক বক্ষা কবেছেন। আপনি যদি সেদিন আমায না বোঝাতেন, শক্ত হবাব বুদ্ধি না দিতেন—কে জানে আমাব কী দশা হত। হযতো সুইসাইড কবা ছাড়া উপায থাকত না।

আজও সেদিনের মতো সুইসাইড কথাটা সে স্পষ্ট উচ্চারণ করে।

উমাকান্ত প্রশ্ন করে, কীভাবে শক্ত হয়েছিলে ? কী করেছিলে ?

সুধার কাছ থেকে কী মারাত্মক জবাব পাবে জানা থাকলে এমন অনায়াসে সহজভাবে প্রশ্নটা উচ্চারণ করতে উমাকান্ত ভরসা পেত না ! সুধা খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে থেকে ধীরে ধীরে বলে, না, আপনার কাছে লুকোব না, আপনাকে লজ্জা করব না। কথাটা আগেও ভেবেছিলাম কিন্তু সাহস পাইনি। কে জানে রাঙাদাদু কী কাণ্ড করবেন, আমাদের হয়তো মেরেই ফেলবেন।

ধনদাসের বিশ্রী রকম ফরসা রঙের কথা উমাকান্তের মনে পড়ে যায়। সুধার রাঙাদাদু যে কে—জিজ্ঞাসা করা দরকার হয় না।

সুধা বলে, আপনার কথা শুনে মনটা শক্ত করলাম, ওই জোয়ানটাকে রাঙাদাদুর কাছে পাঠিয়ে দিলাম—আমার অবস্থা বলবে, তাড়াতাড়ি আমাদের বিয়ে ঠিক করতে বলবে।

উমাকান্ত শুধু বলে, ও !

সুধা বলে, একেবারে উলটো রকম বুঝে মিছিমিছি ভেবে মরছিলাম—রাঙাদাদু খেপে যাবে ! রাঙাদাদু বেঁচে গেছে। আপনি না বললে কোনোদিন মনটা শক্ত করতে পারতাম না।

অন্য বিয়েবাড়িতে মানবেরও নিমন্ত্রণ ছিল। ধনদাসের বাড়ি থেকে উমাকান্ত যখন সেখানে পৌঁছায়, মানব সবে ফেলে ছড়িয়ে খেয়ে উঠেছে। খানিকক্ষণ বসে মানব আর উমাকান্ত একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে তার বাসার দিকে চলে। তার বাড়ির কাছাকাছি মোড় থেকে মানব বাস ধরবে।

উমাকান্তের কাছে সুধার ব্যাপার শুনে মানব বলে, কতকাল ধরে গল্প-উপন্যাসে কতভাবেই যে এই জটিলতা হাজির করা হয়েছে ! শুরু সেই পুরাণে কিংবা তারও আগে। মহাভারতের কুন্তীদেবীকেই ধরুন। দেবতা মানুষ হয়ে এলেন, উপায় নেই, কুমারী কুন্তীর কর্ণকে জন্ম দিতে হল। মোট কথাটা সবক্ষেত্রে এক—মেয়েরা অসহায়, নিরুপায়। কাহিনি যেমন হোক, মূল সূত্রটা হল ওই। ক্ষমতাবান পুরুষ, নিরুপায় মেয়ে, অসামাজিকভাবে তার মা হবার বিপদ বা সমস্যা।

উমাকান্ত বলে, সুধা কিন্তু মা হবে ওর স্বামীর সন্তানের।

মানব বলে, জানাই ছিল। ধনদাসের ক্ষমতা আছে কোনো মেয়েকে মা করবার ?

তুমি বড়ো ভালগার মানব।

জগতের কত বৈজ্ঞানিককে ভালগার বললে খেয়াল করেছেন—উমাদা ? সুধার ব্যাপার থেকে আপনি যদি প্লট বানিয়ে গল্প-উপন্যাস লেখেন—লোকে বলবে রাম রাম, উমাবাবু শেষে সেই পচা পুরোনো একঘেয়ে গল্প লিখলেন ?—উমাবাবুর হয়ে এসেছে ! আমি লিখলে কিন্তু লোকে প্রশংসা করবে—বলবে, পুরানো পচা ব্যাপারটাকে নতুনভাবে তুলে ধরেছে বটে !

কী রকম !

মানব একটা ঢেঁকুর তোলে। বলে, খাওয়াটা বেশি হয়ে গেল মনে হচ্ছে। ম্যালেরিয়ায় কাবু করে দিয়েছে শরীরটা, খেতে পারি না।

একটা বড়ি খেয়ে যাও, ঠিক হয়ে যাবে।

বাড়ির দরজায় পৌঁছে কড়া নাড়তে হয় না, মুকুল দরজা খুলে দেয়।

মুকুল আর মা-কে রেখে পুতুলের দাদা অন্য সকলকে নিয়ে পাটনা ফিরে গেছে। উমাকান্তের বাড়ি ফেরার পথে সে যে চোখ পেতে রেখেছিল বিবাহিতা সতীসাধ্বী স্ত্রীর মতো—এটা উমাকান্তের সাথি মানবকে জানতে দিতে তার যেন আপত্তি নেই, লজ্জা নেই !

উমাকান্ত বলে, আমরা একটা গুরুতর ব্যাপার নিয়ে এ ঘরে বসে কথাবার্তা চালাব—ও সব কথা তোমার শোনা উচিত হবে না।

ফোঁস করে ওঠার জন্যই মুখ তুলেছিল মুকুল কিন্তু মানবের চোখের ইশারা নজরে পড়ায় সে ফুলে ওঠার বদলে মুখ বাঁকিয়ে বলে, আমার কী গরজ পড়েছে তোমাদের গুরুতর কথা শোনার ! ভোজ খেয়ে রাতদুপুরে বাড়ি ফিরলেন, ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে না ?

গটগট করে ও ঘরে চলে গিয়ে এঁটো বাসনপত্রে ইচ্ছা করে হোঁচট খেয়ে বনবন আওয়াজ তুলে যেন একেবারে ভেঙে ফেলতে চায়, এমনি জোরের সঙ্গে ও দিকের দরজা-জানালা বন্ধ করে সে আলো নিভিয়ে দেয়।

মানব উমাকান্তের কানে কানে বলে, ঠিক পুতুলদির মতো না ?

অবিকল !

শুয়ে পড়েনি। পুতুলদির মতো দরজার আড়ালে কান পেতে দাঁড়িয়ে আছে। একটু লজ্জা দেব উমাদা ?

থাক না ! যা বলছিলে বলো।

কিন্তু মানব কি তা পারে ? সে গলা চড়িয়ে বলে, অয়ি দরজার আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়ানো মুকুলদি—এক গেলাস জল দেবে ?

কোনো সাড়াশব্দ আসে না। মানব নিজে ও ঘরে গিয়ে আলো জ্বালায়। মুকুল ঘরে নেই। দরজার আড়ালেও নেই, মশারির তলে বিছানাতেও নেই।

মুকুলের মা গোটাকয়েক আলু-বেগুন-কাঁচকলা সিদ্ধ, আর ছটাক খানেক দুধ দিয়ে সবে একথালা পচাটে আতপ চালের ভাত গিলতে বসেছিল। মুখের কাছে নেওয়া গ্রাসটা নামিয়ে সে যেন একটু রাগতভাবেই বলে, মুকুল কলঘরে গেছে। ওর পেট ভালো না, সারাদিন কিছু খায়নি। তুমি বাবা এবার আমাদের পাটনা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা কর। এখানকার জলহাওয়া মেয়েটার সইছে না।

ভিজে কাপড়ে মুকুল এসে দাঁড়ায়, রেগে বলে, এত বাজে কথা কেন বলো মা ? বিশ্রী স্বভাব তোমার আবোল-তাবোল কথা বলার। পাটনাতেই বরং রোজ মাথা ধরত, এখানে এসে মাথা-টাথা ধরে না, বেশ ভালোই তো আছি !

উমাকান্তের লেখার ঘরে ফিরে গিয়ে মানব বলে, না, সব ব্যাপার ঠিক পুতুলদির মতো নয়। আমারই ভুল হয়েছিল।

উমাকান্ত বলে, পুতুলদির মতো নয় মানে ? তোমার পুতুলদিও ঠিক এ রকম করত। আমায় খোঁচা দিয়ে কেউ কিছু বললে সইতে পারত না—বাপ-মা আত্মীয়বন্ধু যেই বলুক। নিজে আমায় নিন্দা করত কিন্তু অন্যে আমার নামে কিছু বললে রাগে ফেটে পড়ত।

একটু রোগা ছিল মুকুল—ক-মাসে শরীরটা ফিরেছে। পুতুলের সঙ্গে চেহারার ওই তফাতটুকুই বোধ হয় ছিল, সেটাও ঘুচে গেছে।

বিদায় নেবার সময় সদর দরজায় দাঁড়িয়ে মানব বলে, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, খ্রিস্টের মতো, আরেক নতুন অবতার হতে পারবেন না—হয়ে দরকারও নেই। নিজেকে রক্তমাংসের লড়ায়ে মানুষ বলে ভাবুন না ? দেখছেন তো পুতুলদিকে খুন করেও ব্যাটারা আপনাকে উদাসী সন্ন্যাসী করতে পারে না। মুকুলদি এসে পুতুলদির স্থান পূর্ণ করে।

হে মহামানব, রাতদুপুরে উপদেশ ঝেড়ো না।

১৩

বছর খানেক অপর্ণার কোনো পাত্তা ছিল না। সুদূর দিল্লিতে একটা চাকরি বাগিয়ে চন্দ্রাদের স্কুলের মাস্টারি ছেড়ে দিয়ে আচমকা সে উধাও হয়ে গিয়েছিল।

আপনজনের কাছেও চিঠিপত্র সে লিখেছে খুব কম। ছোটোবড়ো কয়েকটা কাগজে তাব লেখা কিন্তু বেরিয়েছে অনেক। পড়েই বোঝা যায় লেখার ধরন সে একেবারে পালটে দিয়েছে।

বেশির ভাগ লেখাই বাংলার মেয়েদের সামাজিক অবস্থা আর ঘর-সংসারের ব্যাপার নিয়ে—যৌন বিষয়ে যে ক-টা প্রবন্ধ লিখেছে তাব মধ্যে সহজ বৈজ্ঞানিক সরলতার বদলে, রম্যতা ও সরসতা আনার দিকে ঝোঁক পড়েছে বেশি।

মহেশের সম্পাদনায় নূতন কাগজ বাব হয়েছে খবর শুনেই মহেশকে একটি পত্রাঘাত করে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে একটি লেখা পাঠিয়ে দেয়। লেখাটির নাম সব মেয়ে পরাধীন।

মানব লেখাটা চেপে দেয়।

অপর্ণাকে মিষ্টি করে একখানা চিঠি লেখে। সোজাসুজি মিথ্যা কথা লিখে দেয় যে তার লেখাটি দু-একজন সাহিত্যিক বন্ধুকে পড়তে দেওয়ার ফলে এক উদ্ভট অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, লেখাটি নিয়ে লেখক-লেখিকা মহলে প্রচণ্ড একটা তর্কবিতর্কের সাড়া পড়ে গিয়েছে—চারিদিকে বিষম উত্তেজনা !

অপর্ণার লেখাটা পড়েই মানব তার মানসিক অবস্থা টের পেয়েছিল।

এক্ষেত্রে মিথ্যা কথা লেখায় দোষ হয় না। বানানো গল্প শুনিয়ে অসুস্থ শিশুব মন ভোলানোর মতো এ ক্ষেত্রেও লেখাটা ফেরত দেবার আঘাত হানার বদলে, বানানো কথা লিখে অপর্ণাকে খুশি করা অত্যন্ত উচিত কাজ। মহেশের কাগজ থেকে লেখা ফেরত যাবার অপমানটুকুই হয়তো চূড়ান্ত বিকারের মারাত্মক অবস্থায় ঠেলে দেবে অপর্ণাকে। কিছুই বলা যায় না। মিথ্যা হলেও মিষ্টিকথায় মন ভুলিয়ে কয়েক মাস কাটিয়ে দেওয়া যাবে। সেই অবসরে খোঁজখবব নিয়ে জানাও হয়তো সম্ভব হবে যে অপর্ণার কী হয়েছে।

হরফের কাজে দিন কেটে যায়। সন্ধ্যার আগে সময় হয় না। অপর্ণার স্বামী প্রিয়নাথেব বাড়িতে পৌঁছতে রাত আটটা বেজে যায়।

বড়ো চাকুরে নয়, কিন্তু উপরি আয় প্রচুর। তাকে কিছু পাইয়ে দিয়ে নিজে কিছু পাবার জন্য এত লোক তার বাড়িতে যাতায়াত করে যে বড়ো বড়ো পদস্থ মানুষদের মতো সে ছাপানো স্লিপের ব্যবস্থা চালু করেছে—নাম লিখে চাকবকে দিয়ে ভেতরে পাঠিয়ে তাব সঙ্গে দেখা করতে হয়।

মানবের স্লিপ পেয়েই প্রিয়নাথ স্বয়ং নেমে এসে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তাকে ভেতবে নিয়ে যায়।

অপর্ণাব সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল, কিন্তু তার স্বামীর বাড়িতে মানবেব এই প্রথম পদার্পণ—ভুল করে যে স্বামীর সঙ্গে কয়েক বছরের জন্য বিচ্ছেদ ঘটেছিল অপর্ণার—এবং নিজের ভুল বুঝতে পেরে ভুল সংশোধন করে বছর দুই যে স্বামীর সঙ্গে বসবাস করে হঠাৎ অপর্ণা দিল্লিতে উধাও হয়ে গেছে।

সেকেলে দোতলা বাড়ি। মানুষ যেন গিজগিজ করছে বাড়িতে। দোতলায় উঠতে উঠতেই মানব টের পায় যে বাড়িতে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি করা মানুষের ভিড়। প্রিয়নাথের ঘরে খাট আছে, সিন্দুক আছে, ভারী আলমারি থেকে শ্বেতপাথরের একটা ছোটোখাটো ডাইনিং টেবিলও আছ।

ওই টেবিলে সাজানো হচ্ছিল তার রাত্রির আহার—সাজাচ্ছিল একটি বিশ-বাইশবছরের বিধবা মেয়ে।

হৃষ্টপুষ্ট রম্যকান্তি প্রিয়নাথ বলে, খিদের সময় খেতে না পেলে শরীর বিগড়ে যায় ভাই। বড়ো ব্যাপারে এসেছেন নিশ্চয়, নইলে কি আর এই বাজে মুখ্যু লোকের ঘরে আপনার মতো নামকরা লেখকের পায়ের ধুলো পড়ে ! একসঙ্গে বসে যাই আসুন। খেতে খেতে কথাবার্তা চালিয়ে যাব।

মানব একটু দ্বিধার সঙ্গে বলে, হঠাৎ খাওয়ার সময় এলাম, খেলে টান পড়বে তো—আবার মেয়েদের রাঁধতে হবে। বাড়িতে সব তৈরি আছে, ফিরে গিয়েই খাবখন।

প্রিয়নাথ সশব্দে হেসে ওঠে !

খাবারের টান পড়বে ? চার গন্ডা বড়োমানুষ আর সাড়ে চার গন্ডা ছেলেপুলেব খ্যাট দুবেলা এ বাড়িতে তৈবি হয়। আপনি একটা মানুষ খেলেই টান পড়বে ? পাশে রুটি-মাংসেব দোকান নেই ?

মানব হেসে বলে, তবে বসি। বাড়িতে কখনও আসিনি বটে কিন্তু আপনি তো আর অজানা অচেনা মানুষ নন !

আমার খাওয়া দেখে কিছু মনে করবেন না কিন্তু। আপনারা খাওয়ার সুখ ছেড়ে লেখার সুখে মজেছেন। দুটো ভালো সন্দেশ খেলে আপনাদের চোঁয়া ঢেকুর ওঠে।

এক টেবিলে সামনাসামনি বসে গোড়ার দিকে প্রিয়নাথেব তুলনায় নিজের খাওয়া মিলিয়ে সত্যই মানব লজ্জা বোধ করে। লজ্জা তার কেটে যায় প্রিয়নাথের খাওযার বহর দেখে। প্রচুর তেল-ঘি দিয়ে রাঁধা কত রকমের ব্যঞ্জন, কত রকমের আমিষ আর কত রকমের মিষ্টান্নই যে, সে প্রায় রসে গিয়ে ভস্ম গিয়ে পেটে বোঝাই দেয় !

প্রথম দিকে থালায় যা পৌঁছেছিল তাই ভেঙে খেয়েই মানবেব পেট ভরে গিয়েছিল। আর কিছু খাওয়া মানেই আত্মনির্যাতন।

তার প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করেই নতুন নতুন খাদ্য তাব পাতে দেওয়া হয়—সে খুঁটে খুঁটে শুধু চেখে দ্যাখে। প্রিয়নাথ গোগ্রাসে চালিযে যায় তাব রাত্রির আহাব।

হৃষ্টপুষ্ট ভুঁড়িমোটা প্রিযনাথকে দেখে, তার খাওয়াব রকম দেখে একটা চাকরি বাগিয়েই অপর্ণার দিল্লি উধাও হওয়া এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেব নামে আবোল-তাবোল রম্যবচনা লিখে যাওয়াব ব্যাপাবে কিছুই আর বুঝতে বাকি ছিল না মানবের।

আঁচিয়েই সে বলে, এবার আমি যাই !

প্রিয়নাথ ব্যস্ত হয়ে বলে, পাঁচ মিনিট বসুন না—আসল কথা কী বলতে এসেছিলেন বলে যান !

মানব বলে, আসল কথা গুরুতব কিছু নয়। অনেক দিন অপর্ণাদিব খোঁজখবর পাই না, তাই জানতে এসেছিলাম ব্যাপার কী। অপর্ণাদি হঠাৎ দিল্লি পালিয়ে গেলেন কেন ?

প্রিয়নাথও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, আমার ভয়ে।

আপনাদেব না সমস্ত ভুল বোঝার মীমাংসা হয়েছিল ? সমস্ত অমিল দূব হয়ে নাকি মিল হয়েছিল ?

কচুপোড়া হয়েছিল ! অত বেশি রকম মিল না হলেই বরং ভালো ছিল। নিজেব ভাবেই গদগদ, এমন ভাব করলেন যেন উনিই মস্ত ভুল করেছিলেন, সব ঝঞ্ঝাটেব দায় ওনার। তাই নিয়ে কাগজে আর্টিকেল পর্যন্ত লিখে ফেললেন। আমি ভাবলাম তাই বুঝি বা হবে--সাদাসিধে মুখ্যু মানুষ, আমি কি অত মনস্তত্ত্ব বুঝি ? ওনারই মত অনুসারে চলতে চেষ্টা করছিলাম—ও বাবা, তার কী রেজাল্ট! তলে তলে চেষ্টা করে দিল্লির চাকরিটা বাগিয়েই তল্পিতল্পা গুছিয়ে বিদায় নিলেন, যাবার সময় বলে গেলেন—তুমি একটা পশু, তোমার সঙ্গে ভদ্র মেয়ের ঘর করা পোষায় না।

প্রিয়নাথ হোহো করে হাসে।

হাকিমের কেমন বিচার দেখুন। নিজে রায় দিলেন, আমি বেচারা প্রাণপণে চেষ্টা করলাম সেই রায় মানতে—আর যাতে না ভুল হয়, আর যাতে না অমিল ঘটে। হাকিমের হুকুম মানতে গিয়ে হাকিমের কাছেই আমি হলাম পশু !

মুখখানা গম্ভীর ও বিষণ্ণ করে প্রিয়নাথ বলে, আরে ভাই, কত পুরুষ ধরে শিক্ষা পেয়ে এসেছি সংযম সেরা ধর্ম—রক্তে মিশে গেছে। উনি একেবারে কাগজে আর্টিকল লিখে ঘোষণা করলেন, ও সব ভুল ধারণা। আমিও ভাবলাম, তাই বুঝি হবে, উনি বুঝি আমার কাছে একটু অসংযম চান। সেটাই হয়ে গেল বোকামি—মেয়েদের কথা কি ব্যাটাছেলের কানে তুলতে আছে ? মেয়েলোকেরা মুখে এক রকম কাজে এক রকম।

প্রিয়নাথের আহারের দৃশ্য স্মরণ করে মানব মনে মনে ভাবে, এ মানুষটাও সংযমের গুণ গায় !

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কয়েকদিন মনটা বিষণ্ণ হয়ে থাকে মানবের, মেজাজটাও বিগড়ে যায়।

বেনাবনে মুক্তা ছড়ানোর এ কী উদ্ভট সাধ অপর্ণাদিদির ?

যে ক্ষেত্রে আপস ছাড়া গতি নেই, ছোটোবড়ো অনেক অমিল যে ক্ষেত্রে একেবারে স্বকীয়তায় নিহিত এবং অপরিহার্য—সে ক্ষেত্রে পরম প্রেমের চরম মিল ঘটানোর অসাধ্যসাধনের চেষ্টা করার কোনো মানে হয় ?

আগেই তার জানা উচিত ছিল এটা। পাঠশালার পড়ুয়ার মতোই জীবন যেন নিত্য নতুন পাঠ শেখাচ্ছে তাকে।

যতই বিকার আর বীভৎস বিভ্রান্তি থাক—চিরদিনের মতো আজও রক্তমাংসের দেহসর্বস্ব মানবতা শুদ্ধ ও পবিত্র। এই বিশ্বাস এই চেতনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর হবার জনাই সে ঘরে ফিরে স্নান করে দেহটাকে শুদ্ধ ও শীতল করে নেয়। কিন্তু এক লাইন লিখতে পারে না।

মাস খানেক আগে শুরু করা একটা গল্প শেষ করার জোরালো সংকল্প নিয়ে ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে কলম হাতে নিয়ে বসে সে শুধু চিন্তা করে যায় চেনা মানুষদের কথা—তার গল্পে ফাঁদা চাষির বউটি যেন কিছুতেই রক্তমাংসের জীব হয়ে কল্পনার রূপ নিতে চায় না !

কেন এত অনিয়ম ? কোন নিয়মে তার জানা চেনা জগতে এত অনিয়ম ঘটে চলেছে, কীভাবে কোন পথে তার প্রতিকার সম্ভব ?

নিজের ঘরের রান্না বেলাবেলি শেষ করে, মানব ঘরে ফিরলে, আভি তার রান্না শুরু করে।

তাকে চিন্তামগ্ন দেখে আভি মুখ বুজে থাকে। ভাত নামিয়ে তরকারি দেওয়া মাছের ঝোল রেঁধে সে প্রথম মুখ খোলে—ডিম সেদ্ধ করব একটা ? না মামলেট ভাজব ?

না, খিদে নেই।

আভি উঠে এসে বলে, কী হয়েছে শুনি ? ক-দিন ধরে কাগজে একটা আঁচড় কাটছ না, কলমটি হাতে ধরে চুপচাপ শুধু ভেবেই চলেছ ?

মানব একটু হেসে বলে, জোয়ান বয়েস, একলাটি আছি, কাজে মন বসছে না তো কী করব !

আভি হাসে না।—কই একলাটি আছ ? দোকলাই তো আছ দেখতে পাচ্ছি। না, আমি মানুষ নই ?

একটা জোয়ান মানুষের সঙ্গে এভাবে কথা বলিস, একদিন বিপদে পড়ে যাবি আভি !

আভি অত বিপদকে ডরায় না !

যেমন আচমকা নতুন চাকরি নিয়ে দিল্লি চলে গিয়েছিল তেমনই আচমকাই সে যে আবার চাকরি খুইয়ে দেশে ফিরে আসবে কেউ ভাবতে পারেনি।

এ কথাও কেউ ভাবতে পারেনি যে প্রিয়নাথের বাড়িতে না উঠে সে মহেশের বাড়িতে এসে আশ্রয় নেবে।

এই শহরেই তার ভাইয়ের বাসা আছে। ভাইয়ের বউয়ের খুব অসুখ—আজ মবে কাল মরে অবস্থা।

দিল্লি থেকে এসে সরাসরি ওখানে উঠলে লোকে অনায়াসে মনে করতে পারত যে গন্ডগোল কিছুই হয়নি—ভাইয়ের বিপদের সময় বোন সরাসরি ভাইয়ের কাছে গেছে।

কোনো খবর না দিয়ে মালপত্র নিয়ে একেবারে মহেশের বাড়িতে এসে ডেরা বাঁধা !

বলে কয়েই অবশ্য উঠেছে। কিন্তু বলা কওয়ার কী ধরন !

মালপত্র সমেত ট্যাক্সি বাড়ির সামনে থামিয়ে নিজে নেমে ভেতরে এসে বলে, কয়েকদিন থাকব ভেবে এলাম। আপনাদের অবস্থাও সুবিধের নয় জানি—দু-একদিনের বেশি বিনা খরচায় রাখতে চাইলে কিন্তু কেটে পড়ব। ছাঁটাই হয়েই এসেছি কিন্তু হাতে কিছু জমেছে—খরচপত্র নিতে হবে।

মন্দ্রা রেগে বলে, গেট আউট—এখুনি আপনি গেট আউট অপর্ণাদি। আপনি জানেন না যদ্দিন ইচ্ছা এ বাড়িতে থাকতে পারেন, আমরা খুশিই হব ? বাড়িতে ঢুকে এভাবে কথা কইছেন !

কী ভাগ্য যে মানব সে সময় হাজির ছিল ! মহেশের কোমরে চোট লাগার ব্যথাটা বাতের বেদনায় পরিণত হয়েছে, মাঝে মাঝে দু-একদিন সে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না এবং হরফের কাজের জন্য মানবকে তার বাড়িতে এসে অনেকক্ষণ কাটাতে হয়।

মানব না থাকলে মন্দ্রাই হয়তো অপর্ণাকে অপমান করে রাগিয়ে হোটেলে চালান করে দিত।

মানব প্রায় ধমকের সুরে বলে, সব ব্যাপারে ছেলেমানুষের ছ্যাবলামি করা উচিত নয় মন্দ্রা। উনি তো ঠিক কথাই বলেছেন ! সে সব দিনকাল কি আর আছে ! এ রকম সেকেলে ছেলেমানুষি করার জন্যই আজকাল আত্মীয়বন্ধুর মধ্যে ক্রমাগত বিচ্ছেদ ঘটছে দেখতে পাও না ?

অপর্ণা যেন প্রাণ ফিরে পায়। খুশি হয়ে বলে, শুনুন তো মেয়ের কথা ! আমি তিন-চারমাস থাকব বলে এসেছি, মহেশবাবুর এতকালেব চাকরিটা গেছে জানি, খবচ নেবেন কি না স্পষ্টাস্পষ্টি কথা না কয়ে আমি উঠতে পারি ওনার বাড়িতে ? খরচ নেবার কথা বলে আমি যেন ওদের অপমান করেছি !

মন্দ্রা কেঁদে ফেলতেই অপর্ণা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে—কাঁদিস নে। তিন মাস কেন, হয়তো ছ-মাস এক বছরও থেকে যেতে পারি।

পথের বেশ ছেড়ে একেবারে নেয়ে এসে মলয়ার নিরামিষ সস্তা ঘিয়ে ভাজা গরম গরম লুচি বেগুন ভাজা দিয়ে খেতে খেতে অপর্ণা নিজে থেকেই তার ব্যাপার বলে, পার্মানেন্ট পোস্ট, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ! একবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলে কাজ থেকে তাড়ানো কঠিন ব্যাপার' বড়ো বড়ো কয়েকজনের কথার ভাবে বুঝলাম, আমার মতো শিক্ষিতা নামকরা লেখিকা পাওয়াই যায় না—ঠিকমতো কাজ করে গেলে হয়তো একদিন আমার হাজার টাকা মাইনে হবে, ডিপার্টমেন্টটা আমিই চালাব। কয়েকটা মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে পট করে খেদিয়ে দিলে !

মানব বেগুন ভাজা বাতিল করে কয়েক চামচ ডাল দিয়ে মোটে দুখানা লুচি খেয়ে হাত গুটিয়ে বসেছিল।

অপর্ণার বলার ভঙ্গিতে সে সশব্দে হেসে ওঠে।

কাজের অভাব ঠেকা দেবাব জন্যই রস সাহিত্য ছাপা। কেমন যেন এলোমেলো উলটো-পালটা ভাব এসেছে এ মাসেব রস সাহিত্যের হরফ সাজিয়ে ছাপানোর ব্যাপারে। প্রেসের এখন সব চেয়ে খারাপ সময়—একটা ছাপার কাজ পেলে প্রেস যেন বর্তে যায়। বস সাহিত্যের কাজটাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু কী যেন একটা ব্যাপার চলছে তলায় তলায়।

সমস্ত হরফ সাজিয়েদের কেমন যেন রকমসকম।

উমাকান্ত ব্যাপাবটা ঠিক বুঝতে পারে না, ধরতে পাবে না. প্রেসেব কাজ দেখা আর সম্পাদকীয় দায়িত্ব নিয়ে চেয়ারে বসে তার অস্বস্তির সীমা থাকে না।

যথানিয়মে প্রথমে শুধু লাইন আর ফাঁক ঠিক রেখে সাজানো হরফের লম্বা লম্বা গেলি প্রুফ তৈরি হয়। ওই প্রুফ সংশোধন করা শেষ হলে তৈরি হয় পাতায় পাতায় ভাগ কবা মেকআপ -নাম পৃষ্ঠাসংখ্যা ইত্যাদি যোগ হয়. মেকআপ, প্রুফ সংশোধন শেষ হলে তবেই সাজানো সিসার হবফগুলি মেশিনে ওঠে।

কাগজের এক পৃষ্ঠায় ছাপা আরম্ভ হতেই একটা শিট চলে যায় উমাকান্তের কাছে। সে চোখ বুলিয়ে দেখতে থাকে যদি কোনো মারাত্মক ভুল চোখ এড়িয়ে গিয়ে থাকে, যদি কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি ঘটে থাকে।

সঙ্গে সঙ্গে মেশিন বন্ধ করে সেটা সংশোধন করে ফেলা হবে।

শিটগুলির অন্য পৃষ্ঠা ছাপাবার বেলাতেও একই নিয়ম। মেশিনে চড়া রস সাহিত্যেব ছাপা পাতার নমুনা পরীক্ষা করে উমাকান্ত দ্যাখে যে সব ঠিকই আছে।

তবু তার মন খুঁতখুঁত করে। তবু তাব সন্দেহ ঘনীভূত হয়।

শুধু রস সাহিত্যের ফর্মাগুলি মেশিনে ওঠা আর ছাপা হওয়ার ব্যাপাবে কেমন যেন একটা অভিনবত্ব এসে গিয়েছে।

ফাঁকে ফাঁকে রস সাহিত্য ছাপিয়ে নেবার নিয়মের গোলমালটাকে কেন্দ্র করেই যেন প্রেসেব সমস্ত কাজের নিযম-শৃঙ্খলায় একটা অদ্ভুত রকম এলোমেলো ভাব দেখা দিয়েছে।

উমাকান্ত উদ্‌বেগের সঙ্গে বলে, ব্যাপার কী কালাচাঁদ ?

কালাচাঁদ ধীরভাবে বলে, গোলমাল তো কিছুই হচ্ছে না বাবু !

শঙ্করবাবুর অঙ্কের বইয়ের ফর্মাটা মেশিনে না তুলে মাসিকের ফর্মা ছাপছ কেন ?

শঙ্করবাবুর ফর্মাটা ছাপা যাবে না, অনেক ভুল রয়ে গেছে।

উমাকান্ত আশ্চর্য হয়ে বলে, সে কী ! উনি নিজে এসে প্রুফ দেখে প্রিন্ট অর্ডাব দিয়ে গেলেন না ?

কালাচাঁদ ডাকতেই প্রুফটা নিয়ে এসে ভুবন বলে, প্রিন্ট অর্ডার তো দিয়ে গেলেন। কিন্তু এত ভুল নিয়ে ছাপলে উনিই আবার গোলমাল করবেন—প্রেসেব বদনাম হবে। বলেন তো যেমন আছে ছেপে দিতে পারি।

উমাকান্ত এক মুহূর্তের জন্য ভোলে না যে তাদের প্রতিটি কথা ধনদাস কান পেতে শুনছে। প্রেসের সুনামের জন্য ভুবন ও কালাচাঁদের দরদ থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়—প্রেসের বদনাম হলে. কাজ না পেলে তাদেরই খেটে খাওয়ার পথ বন্ধ হবে !

তবু সমস্ত ব্যাপারটা তার অস্বাভাবিক মনে হয়।

ভুবন প্রুফের কয়েকটা ভুল দেখিয়ে দিলে তার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। এই ভুলগুলি শঙ্করবাবুর চোখ এড়িয়ে গেল ?

অথচ এটা যে তারই দেখা প্রুফ তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। প্রুফের মাথায় ইংরাজিতে সযত্নে 'সংশোধন করে ছাপো' লিখে তলায় শঙ্কর নাম স্বাক্ষর করেছে।

উমাকান্ত অগত্যা বলে, তাইতো দেখছি। না, ওঁকে একবাব না দেখিযে এটা ছাপা যায না।

প্রুফটা আগাগোড়া পড়ে উমাকন্ত প্রায হতভম্ব হযে যায। শিক্ষক মানুষ, পণ্ডিত ব্যক্তি, এই নাকি তাব নিজেব লেখা সংশোধন কবাব নমুনা ? এই সহজ সাধাবণ ভুলগুলি তাব নজব এড়িযে গেল ?

স্কুলেব ছুটিব পব টিউশনি কবতে যাবাব পথে শঙ্কব প্রেসে আসে।

উমাকান্তেব কথা শুনে এবং প্রুফে ভুলেব নমুনা দেখে সেও খানিকক্ষণ হতভম্ব হযে থাকে। তাবপব নিশ্বাস ফেলে বলে, তা আব আশ্চর্য কী। দিনবাত যে খাটুনি চলছে, পাগল যে হয়ে যাইনি তাই ঢেব।

আবাব সযত্নে প্রুফটা সংশোধন কবে শঙ্কব চলে যাবাব পব সংশোধনগুলি দেখতে দেখতে হঠাৎ যেন উমাকান্তেব চমক ভাঙে। সে হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায না।

একবাব খেযাল কবাব পব পবীক্ষা কবে দেখে ব্যাপাব বুঝতে আব দেবি হয না। যে ভুলগুলিব জন্য ফর্মাটা মেশিনে আটা যাযনি, তাব প্রত্যেকটি শঙ্কবেব দেখা প্রুফে প্রেসেব সৃষ্টি কবা ভুল।

সোজা ব্যাপাব।

সুবিধামতো স্থানে আলগা হবফেব ছাপ দিযে শুদ্ধ শব্দকে অশুদ্ধ কবা হযেছে,- এখন কে 'ত্রিখনা' কবতে দবকাব শুধু গোড়ায আব শেষে ই কাব ও আকাবেব ছাপ লাগিযে দেওযা। প্যাবাব শেষে ছোটো লাইনেব দাড়িটা একটা হবফে পবিণত কবে একটি বাড়তি ও অনাবশ্যক শব্দেব ছাপ দেওযাও কঠিন নয।

কিন্তু মানে কী এ ব্যাপাবেব ? কী উদ্দেশ্য, মেশিনে আটা বন্ধ বাখাব অজুহাত সৃষ্টি কবতে, সংশোধিত প্রুফে ভুল সৃষ্টি কবাব ? সকলে মিলে পবামর্শ কবে না কবলে তো এ কাজ সম্ভব নয।

ওদিকে ঘটাং ঘটাং শব্দে চলেছে মুদ্রাযন্ত্র, এদিকে মানুষগুলি নিঃশব্দে সাজিযে বা সংশোধন কবে চলেছে হবফ।

উমাকান্তেব মনে হয কী একটা বহস্য যেন তাকে ঘিবে আছে। সমস্ত কাজেব হিসাব তাব জানা, তবু তাব মনে হয তাব অগোচবে অতিবিক্ত একটা কাজ চালিযে, বেশি বকম ব্যস্ত আব মনোযোগী হযে উঠেছে প্রেসেব মানুষগুলি।

চাবিদিকে একটু চোখ বুলিযে আসাব উদ্দেশ্যে উমাকান্ত ওঠে, একে ওকে দু একটা কথা জিজ্ঞাসা কবতে কবতে, মেশিনঘবে গিযে বস সাহিত্যেব একখানা ছাপা শিট তুলে নিযে চেযাবে ফিবে আসে।

খেযালেব বশে নয, কিছু ভেবেও নয। গতবাব বস সাহিত্যেব দুটি ফর্মা ছাপতে ছাপতে শেষেব দিকে কালিব গোলমালে ছাপা ভালো হযনি।

ওই দোষটা ঘটছে কি না দেখবাব জন্যই সে ছাপা শিটটা হাতে তুলে নিযেছিল, লেখাব দিকে এক নজব তাকিযেই নিঃশব্দে নিজেব চেযাবে ফিবে এসেছে। শঙ্কবেব এই ভুল সৃষ্টি কবাব চেযে সাংঘাতিক আবেকটা ভৌতিক ব্যাপাবেব নমুনা দেখবাব জন্য।

একনজব তাকিযেই সে টেব পেযেছে যে এটা তাব সংশোধিত এবং অনুমোদিত বস সাহিত্যের ফর্মা নয।

চেযাবে ফিবে এসে সে আগাগোড়া ফর্মাটা পড়ে। নামকবা লেখকদেব একটা উপন্যাসেব অংশ, একটা ছোটো গল্প এবং নামকবা কবিদেব তিনটে কবিতা যাওযাব কথা এই ফর্মায।

একটা লেখাও নেই।

রস সাহিত্যের নাম, মাস, বছর ও পৃষ্ঠা-সংখ্যাটাই শুধু বজায় আছে, অন্য লেখা ছাপা হয়েছে অজানা লেখকের ! এবং যা ছাপা হয়েছে সেগুলি ভয়ংকর।

উমাকান্ত ভাবে এবং আরেকবার ফর্মাটা পড়ে।

সে টের পায় যে সমস্ত প্রেসটা প্রায় শ্বাসরোধ করে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সে আরেকবার মেশিনঘরে যায়।

ঘটাংঘটাং শব্দে মেশিন চলছে ঠিকই—কিন্তু কাগজ আর জোগান দেওয়া হচ্ছে না যন্ত্রটায়। ধনদাসের কানে আওয়াজ দেওয়া হচ্ছে যে যন্ত্র ঠিকই চলছে।

ছাপা বন্ধ হয়েছে তার জন্য। তার সম্পাদিত রস সাহিত্যের পালটিয়ে দেওয়া ফর্মা সে নিয়ে গেছে, পড়ে দেখে এখন সে কী বলে কী করে !

উমাকান্ত দ্বিধা করে না, শান্তকণ্ঠে বলে উঠে, মিছিমিছি চালাচ্ছ কেন মেশিনটা ? ছাপিয়ে যাও না ?

সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রে কাগজ দেওয়া শুরু হয়। ছাপা কাগজ বেরিয়ে এসে জমতে থাকে।

শুধু অন্য রকম পরিবর্তন হয়, কালাচাঁদের মধ্যে যে একটা শান্ত নির্ভয় মরিয়া ভাব এসেছে, তারও নানা লক্ষণ প্রকাশ পায়।

আত্তি অনুযোগ দিয়ে বলে, বাবার ব্যাপারটা কী ? লেখক করতে চেয়ে বাবাকে পাগল করে দিতে চাইছ নাকি মানুবাবু ?

মানব বলে, ওর ভাব-সাব আমারও যেন কেমন কেমন লাগছে আত্তি। রাত্রিতে আমার এখানে এসে পড়ছে না, সকালে নিজের ল্যাম্প জ্বেলে লিখছে না। কেমন একটা গুমগুম ভাব।

বিড়ির দোকানের মন্টার সাথে মোকে লটকে দেবার ফিকিরে ছিল। গাঁজা চরস খেয়ে ব্যাটার যক্ষ্মা কাশি হবে। সোজা বললাম, বেরিয়ে যাব। গালে চড় যা একটা কষিয়ে দিলে মানুবাবু—

চড়ের দাগ পড়েছে গালে। একটু ফুলেছে গালটা।

হাসিটা অদ্ভুত দেখায় আত্তির। বাপের এমন চড় খেয়েও সে যে হাসতে পারে সেটাও অদ্ভুত ব্যাপার বইকী !

যার তার সাথে লটকে দেবার কথা কিন্তু বলছে না আর।

মানব বলে, ভাবিস কেন, বাজে লোকের কাছে দিতে চাইলে আমিই তোকে বিয়ে করে ফেলব। কিছু রোজগার করছি, তোকে খাইয়ে পরিয়ে পুষতে পারব।

মাথা প্রায় মেঝের কাছে নত করে স্থির গলায় আত্তি আবার বলে, প্রাণ থেকে যদি চেয়েই থাকো মোকে, দুমাস, এক বছর নিয়ে নাও। সাধ মিটিয়ে ছেড়ে দিয়ো।

মানব বলে, তোর একটা গালে কালশিটে পড়েছে, তোর বাপের চেয়ে বড়ো চাপড়ে এ গালটার কালশিটে ফুটিয়ে দিই ?

দাও। তুমিও তো বাবার মতোই অবুঝ !

কুঞ্জর মা-র ভাইঝি পদ্মার বয়স চোদ্দো হলেও হতে পারে। কাজ সেরে ঘরে ফিরে কালচাঁদ আত্তির সেঁকা রুটি খেয়ে মানবের ঘরে আধঘণ্টা পড়া চালিয়ে কুঞ্জর মা-র কুঁড়েয় যায়।

একখানা ঘর কুঞ্জর মা-র। দাওয়ায় একটু বসেই কালাচাঁদ প্রকাশ্যভাবে ঘরে যায়। সারারাত ওই ঘরেই থাকে। কুঞ্জর মা রোয়াকে কাঁথা বিছিয়ে শুয়ে খানিকক্ষণ মশার কামড়ে ছটফট করেও অচেতন হয়ে ঘুমায়।

মশার কামড় অবশ্য ঘরেই বেশি। তিন বাড়ি ঝি খেটে এসে কুঞ্জর মা চিরদিনই দাওয়ায় শোয়।

প্রাণটা জ্বলে যায মানবেব, মেয়েবা কেন এত সস্তা এ দেশে ? প্রাণেব জ্বালা বাডতে বাডতে একসময লেখা শুবু কবে দেয চাসি বউযেব গল্পটা।

আত্তি এসে বলে, খাবে ?

সে মুখ না তুলেই বলে, না।

বাত গভীব হযে আসে। পাডা নিঝুম হযে গেছে বহুক্ষণ। মাঝে মাঝে চিৎকাব খনখনিযে উঠছে খেঁকি কুকুবগুলিব। আত্তি আবাব একটু ভযে ভযে বলে, এবাব খাও ? এবাব শুযে পড়ো ? সকাল থেকে খাটছ তো ! কাগজ থেকে মুখ না তুলেই মানব বলে, একটু দাঁডা।

লেখা পৃষ্ঠায একবাব চোখ বুলিযে, ডগা থেকে তলা পর্যন্ত কলমেব আঁচড টেনে সবটা বাতিল করে দিযে মুখ তুলে মানব বলে, এবাব টেব পেযেছি। খেটেখুটে বেশ কিছু পযসা কামাচ্ছি বলেই তো এই দবদ ?

আত্তি বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হযে বলে, দোষটা কী হযেছে তাতে ? মেযেবা কি বোজগেবে ? নিজেদেব ভাতকাপড কি তাবা কামায ?

যে পুরুষ বোজগাব কবে, তাকে দবদ কবেই মেযেবা ভাতকাপড কামায।

শুধু দবদ ?

বাবাবে বাবা -এমন ছেলেমানুষ কি জগতে গজায ? বলেই তো দিযেছি শুধু দবদে সাধ না মেটে, দু-এক ঘা মাবলেও সযে যাব। সবাই সইছে না ? মোব বেলা কি অন্য নিযম হবে ! তবে কি না, কথাটা কী—

আত্তি মাথা নিচু কবে একটু হেসে বলে, শখ মিটলে ছেড়ে দিযো, তিতো কবে দিযো না। ছাডতে হবে বলে সম্পোক্কটা বিচ্ছিবি কবে তুলো না।

আমায এমন ছোটোলোক ভাবতে পাবিস আত্তি ?

ভদ্দব ঘবেব ছেলে কি না তাই জন্যেই ভয। ঝোঁকেব মাথায ছোটোলোকেব মধ্যি এসে দিন কাটাচ্ছ। মোবা ছোটোলোকেবাও নিযমকানুন মেনে চলি তো এক বকমেব ? তোমাদেব ঝোঁকেব জন্য তাই তোমাদেব ভয পাই। এত বাতে খেতে বলতে দবদ দেখাতে এযেছি ছোটোলোক মেযেলোক— কিছু না বুঝেই কি এযেছি ?

সকালবেলা কালাচাঁদ তাব তিন নম্বব গল্পটি মানবেব '৩তে তুলে দেয। এ গল্পেব নামও হবফ।

মানব আশ্চর্য হযে জিজ্ঞাসা কবে, কখন লিখলে ? ভোববাত্রে আলো তো জ্বলতে দেখি না তোমাব ?

কালাচাঁদ মাথা নেডে বলে, ভোববাত্রে উঠি না আব—ভোবেই উঠি। অত নিযম কবে মোদেব লেখা পোযায না মানুবাবু। ফাঁকফোকবে লেখাই মোদেব সুবিধে। ববিব দোকানে চা খেতে গিযে বসলাম, আধঘণ্টা লিখে ফেললাম—

আত্তিব মা মাবা যাবাব পব কালাচাঁদেব মধ্যে যে অদ্ভুত বকম পবিবর্তন ঘটছে টেব পাওযা যাচ্ছিল, এখন অনেক বেশি স্পষ্ট হযেছে।

মবিযা ভাব এসেছে সত্যই কিন্তু তাব চেযেও স্পষ্ট হযে উঠেছে একটা কঠোব নির্বিকাব ভাব। ঠিক শোক বা বৈবাগ্য নয, সব ব্যাপারেঃ তাব একটা কঠিন সংকল্পগত উদাসীনতা—সে যেন ইচ্ছা কবে চেষ্টা কবে সব কিছু অগ্রাহ্য কবে নিশ্চিন্ত হযে থাকে। শুধু কথাবার্তা বলাব ধবন আব চালচলন থেকেই ধবা পডে না, তাব মুখেও একটা কঠিন আত্মপ্রত্যযেব ছাপ পডেছে।

বলে, ফুটপাতে ভিডেব মধ্যে বসে আমি লিখতে পাবি।

এমন সহজ দৃঢতাব সঙ্গেই সে কথাটা বলে যে, মানব সত্যই আশ্চর্য হযে যায।

মানব বলে, তুমি এমন লেখক হযে উঠেছ কালাচাঁদ ?

কালাচাঁদ সগর্বে বলে, আপনারাই তালিম দিয়ে তৈরি করেছেন।

আরও কয়েকটা কথার পর মানব তাকে জিজ্ঞাসা করে, আত্তির বিষয় কী ভাবছ কালাচাঁদ ?

কিছুই ভাবছি না মানুবাবু ! আমার ভাবার দরকার নেই।

বাপ হয়ে এ কথা বলতে পারলে ? একটা হিল্লে তো করে দিতে হবে---না এভাবে তোমার ভাত রেঁধে জীবন কাটিয়ে দেবে ?

কালাচাঁদ শান্তভাবে বলে, যা করার নিজেই করে নেবে। বড়ো বেশি সেযানা হয়ে গেছে, স্বাধীন হয়ে গেছে। যা করতে যাব তাতেই মন্দ হবে—তার চেয়ে মোর কিছু না ভাবা, না করা ভালো।

তুমি না একদিন আমাকে ওর সঙ্গে বেশি কথাবার্তা কইতে বারণ করেছিলে ?

সেদিন কি আর আছে মানুবাবু ? টের পেয়েছি সেয়ানা মেয়ে, নিজের ভালো মোর চেয়ে ঢের বেশি বুঝবে। যেমন-তেমন একটা বিয়ে দিয়েই বা কী হবে বলুন ? একটা রোগে ধরবে আর মায়ের মতো বিনা চিকিচ্ছেয় পটল তুলবে। বিয়ে বসতে চায় বিয়ে দেব— না বসতে চায় দেব না। এমনি কারও সাথে থাকতে চায় থাকবে—বারণ করব না। ছোটো থাকলে কথা ছিল, এখন ওর ভালো, ওর চাইতে কেউ ভালো বুঝবে না-- ওর বাপও না !

কী দাঁড়িয়েছে সেই কালাচাঁদের চিন্তা করা কথা বলার ধরন !

পদ্মর সর্বাঙ্গে মাতৃত্বের ছাপ মানবেরও চোখে পড়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, নিজেদের মধ্যে কানাকানি করা বা টিটকারি দেওয়া দূরে থাক---তেমনভাবে হাসাহাসিও কেউ করছে না। এ যেন সাধারণ স্বাভাবিক ব্যাপার।

খুব খারাপ লাগছে আত্তি ?

না না, খারাপ লাগবে কেন ? মেয়েটা বোকাসোকা—কিন্তু ভালো। সৎমা হয়ে এলে কী আসবে যাবে মোর ? মোকে না খেদিয়ে ওকে ঘরে আনবে না গোঁ ধরেছে কিনা, সেঁটাই হয়েছে মুশকিল !

মানব কলম রাখে। আত্তির সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে গম্ভীর সুরে বলে, চিরকাল বাপের ঘাড়ে থাকবি ভেবেছিস নাকি ? এবার চটপট তোকে খেদাতেই হবে।

ঘাড়ে নেবার জন্য কতজন পাগল। কিন্তু পছন্দমতো একজনার ঘাড়ে চাপব তো ? বাবা চাইছে বুড়ো ভোলানাথের খপ্পরে সঁপে দিতে।

বুঝেছি। তোকে নেবে ভোলানাথ, পদ্মকে নেবে কালাচাঁদ। তা পদ্ম তো একটা বাচ্চা বিইয়ে কালাচাঁদের ঘরে আসছে—তুইও একটা বাচ্চার মা হয়ে ভোলানাথের ঘরে যা !

সর্বাঙ্গ টান হয়ে যায় আত্তির।

বিয়ে না করে মা করার সাহস আছে নাকি ব্যাটাছেলে তোমাদের ? তোমাদের শুধু আলগা আদর, গা বাঁচিয়ে চলা !

মানব নীরবে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

আত্তির সম্পর্কেই একটা চাঞ্চল্যকর প্রশ্ন মনে জেগেছে।

সত্যই কি তার সঙ্গে দু-একবছর বসবাস করার সাধ জেগেছে আত্তির ? হিসাবনিকাশ করে সে কী দেখেছে যে, প্রাণের সাধটা কোনো কিছুর খাতিরে অপূর্ণ রাখা বোকামি ? চিরকাল বইবার দায় মানবের ঘাড়ে চাপানো যায় না, অনেক দিক দিয়েই সেটা অসম্ভব।

অসম্ভবের খাতিরে সম্ভবটুকু বিসর্জন দিয়ে লাভ কী ?

আত্তি জানে মানব তাকে চায়—চিরজীবনের সাথি হিসাবে নয়, কোনো রকম বাধ্যবাধকতার মধ্যে নয়, কিন্তু তাকে চায়। চিরকালের জীবনসঙ্গিনী করতে পারবে না বলেই, বাধ্যবাধকতা

স্বীকার করা যাবে না বলেই সেদিন সর্দিজ্বরের সময় আদা-চা দিতে এলে, ঝোঁকের মাথায় তাকে জড়িয়ে ধরে তার কাছে থেকে মৌখিক একটু প্রতিবাদ পর্যন্ত না পেলেও, নিজেই তাকে ছেড়ে দিয়েছিল।

সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরে তার কাছে ক্ষমা পর্যন্ত চেয়েছিল !

আভাষে ইঙ্গিতে এবং ব্যবহারেই শুধু নয়, আভি প্রায় স্পষ্ট ভাষায় মুখ ফুটেই তাকে জানিয়ে দিয়েছে . চিরজীবনেব জন্য নয় গো নয়, সাধ হলে দু-একবছরের জন্যই আমায় নাও—খুশি হলেই ছেড়ে যেয়ো !

আভির হিসাব মানব বোঝে। অতি সহজ আর বাস্তব হিসাব। গতি তার একটা হবেই। কালাচাঁদ মরিয়া হয়ে যার-তার হাতে তাকে সঁপে দিলে যে গতি হবে, মানবের সঙ্গে কিছুদিন বসবাস করার পরের গতিটা তার চেয়ে মোটেই কিছু মন্দ হবে না। তাছাড়া অনেকেই ধরেই নিয়েছে যে মানবের সঙ্গে সে নষ্ট হয়েই গেছে। প্রকাশ্যে একসাথে বসবাস করলে ক্ষতিটা কী হবে ? এই বাড়িরই একটা ঘবে সাত বছর ওভাবে বসবাস করছে না, বটুক আর গঙ্গা ?

পদ্মকে যথাবিধি ঘরে আনা জরুরি হয়ে পড়েছে। কালাচাঁদ কবে তাকে গায়ের জোরে কার সঙ্গে লটকে দেয় ঠিক নেই।

মানবের সঙ্গে এখন নষ্ট হলেই সব দিক দিয়ে মঙ্গল আভির। মানব কিন্তু আঁকড়ে আছে তার নীতিজ্ঞান। আভিকে নষ্ট করার ঝোঁক আছে জোরালো, কিন্তু সাহস নেই।

সে যে ভাবী অন্যায় কাজ হবে ! বিয়ে করতে না চাইলে, আজীবন নিজের ভোগ দখলের খাস তালুকেব মতো নিতে না পারলে, কোনো মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকানোই যে যুবকের পক্ষে মহাপাপ !

আভি তাই সোজাসুজি মুখের ওপর তাকে ভীরু কাপুরুষ বলে গাল দিয়েছে।

পদ্ম মা হবে। তবু সবাই নিশ্চিন্ত যে আতুড়ে যাবার দু-চারদিন আগেও অন্তত কালাচাঁদ তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে, সামাজিকভাবে বউ করে ফেলার ব্যবস্থা করে ফেলবে।

আভি তাকে প্রায় স্পষ্ট ভাষায় অভয় দিয়েছে যে মা হতেও সে পিছপা নয়, সে মা হলেও মানবের কোনো দায় নেই। বিনা শর্তে সে পিরিত করতে রাজি, মা হবার ঝুঁকি নিতেও রাজি—পিরিত করার সাধ নিয়েও তাকে এড়িয়ে চলা ভীরুতা, কাপুরুষতা !

সন্ধ্যার পর ঘরে ফিবে মানব দ্যাখে, তার ঘবটুকুতে ঝাঁট পড়েনি, বাঁশের খাটিয়ার তার বিছানাটা পাতা হয়নি, কুঁজোতে জল তুলে রাখা হয়নি, ছোট্ট তোলা উনুনটিতে আঁচ পড়েনি।

তার বালিশের তলা থেকে তারই পয়সা নিয়ে কয়েকটা আলু, পেঁয়াজ, একজোড়া ডিম, ছটাক খানেক তেল, ছোটো একটা পাউরুটি—এ সবও কেউ এনে রাখেনি।

বাতিটাতে তেল ভরা হয়নি। ঘণ্টা খানেকের বেশি জ্বলবে না। বোতলে তেল নেই।

জামাকাপড় ছেড়ে নারকেল-দড়ি বেঁধে ঝুলানো বাঁশের আলনায় সেগুলি রেখে মানব লুঙ্গি পরে ভাবছে আগে সওদা করতে যাবে না আগে বালতিতে তোলা জলে কাকস্নানের বিলাসিতাটা চুকিয়ে নেবে—

বালতির দিকে তাকিয়ে দ্যাখে এক ফোঁটা জলও নেই !

রোজের মতো কলতলায় ঝগড়াঝাঁটি মারামারি করে এক বালতি জলও কেউ আজ তার জন্য তুলে রাখেনি।

এটা আভির স্পষ্টতম বিদ্রোহাত্মক ঘোষণা : আর চলবে না টালবাহানা ! এতকাল আমি তো সত্যিকারের দাসীগিরি করিনি—করব না আর কাজ ! দাওনি এক পয়সা। গা বাঁচিয়ে অত খাতির আব চলবে না !

মানব বিচলিত হয় না, মনে মনে হাসেও না। শাড়িজামা কিনে এনে সে ফেলে রাখে তার খাটিয়ায়—তার জিনিসপত্র আনতে তাকে জিজ্ঞাসা না করে বালিশের তলা থেকে টাকাপয়সা নেওয়ার মতো শাড়িজামাও আত্তি তুলে নিয়ে যায়। কিনে নিয়ে আসে দু-চারসের বাড়তি চাল। চালের ঠোঙাও আত্তি জিজ্ঞাসা না করেই তুলে নিয়ে যায়।

মানবকে তার বলাই আছে যে নিজের দরকারে দু-চার আনা দু-একটাকা সে নেবে—তবে মাসে চার-পাঁচটাকার বেশি যাতে না হয় সেটা খেয়াল রাখবে।

আজ আত্তি জানিয়ে দিয়েছে, এও তো এক রকম মাইনে নিয়ে ঝি-গিবি করা ! ঝিয়েব কাজ সে করবে না মানবের। শুধু এইটুকু দায় নিয়ে আর চলবে না। এবার তাকে আশ্রয়, খাওয়াপরা, সব কিছু দিতে হবে, নইলে চুকে যাক এই ফাঁকির সম্পর্ক !

মানব ভেবে-চিন্তে একবার উমাকান্তের বাড়িতে যায়। উদ্দেশ্য —কালাচাঁদের মরিয়া একরোখা ভাবটার জন্য কোনো লক্ষণ তার নজরে পড়েছে কি না জেনে আসা।

উমাকান্ত বলে, কালাচাঁদ ? ওর ভাবসাব সাংঘাতিক ! যা কাণ্ড আরম্ভ করেছে বলার নয়।

মানব গম্ভীর হয়ে বলে, তাই নাকি ! কী রকম ব্যাপার ?

তোমায় বলে আবার ব্যাপার কী দাঁড়াবে কে জানে !

আমায় ও রকম চ্যাংড়া ভাবেন ?

চ্যাংড়া তোমায় কোনোদিন ভাবিনি, মিছে কথা বোলো না। মুশকিল হল কী জানো ? তুমি হৃদয়টাকে মানো না—প্রাণের আবেগে কেউ কিছু কাণ্ড করে নিজের ক্ষতি করতে চাইলে প্রাণপণে সামাল দেবার চেষ্টা করো। কালাচাঁদকেও হয়তো বাঁচাবার চেষ্টা করবে !

মানব জাঁকিয়ে বসে। পুতুলকে যেভাবে ডাকত তেমনিভাবে গলা চড়িয়ে মুকুলকে ডেকে বলে, মুকুলদি, চা দিয়ে যাও। ব্যাপার তবে সত্যি গুরুতর ? তাহলে অবশ্য ব্যাপার না জেনে উঠব না।

কালাচাঁদের ভাবান্তর, নিজের মেয়ের সম্পর্কে তার বেপরোয়া উদাসীনভাব, তার তিন নম্বর হরফ গল্প লেখা—কালাচাঁদ সম্পর্কে এ সব বিবরণ সে ধীরে ধীরে উমাকান্তকে শুনিয়ে যায়।

মুকুল চা এনে দিয়ে বলে, এ সব কী শুনছি ? বস্তির মেয়েদের সঙ্গে নাকি খুব ভাব জমেছে ?

মানব বলে, বাস করব বস্তিতে—তোমার সঙ্গে ভাব করতে আসব নাকি মুকুলদি ?

আপনি আমায় মুকুলদি বলবেন না তো ! আপনার চেয়ে আমি আট-দশবছরের ছোটো।

ছোটো হলে কী হবে ? বুড়ো বাপ দশ বছরের সৎমা ঘরে আনলে ত্রিশ বছরের ছেলে তাকে মা বলবে না ? একদিন তো মুকুলদি বলতেই হবে—এখন থেকে অভ্যাস করে রাখছি।

মুকুল প্রায় ছুটে পালিয়ে যায়।

উমাকান্ত আশ্চর্য হয়ে বলে, তোমার তো সাংঘাতিক অনুমান শক্তি ! কেউ যা জানে না, ঘুণাক্ষরে যা প্রকাশ করা হয়নি, তুমি দিব্যি তা অনুমান করে ফেললে !

মানব সস্মিতভাবে বলে, চল্লিশে পা দিলে কী হবে—আপনি এখনও ছেলেমানুষ রয়ে গেছেন। এই সোজা ব্যাপারটা অনুমান করা কি কঠিন হয় কারও পক্ষে ? শুধু মা আর মুকুলদিকে আপনার কাছে রেখে মনোহরবাবু সবাইকে নিয়ে পাটনা ফিরে গেলেন। আপনি অনুমতি না দিলে এটা সম্ভব হত ?

উমাকান্ত একটু ভেবে বলে, যাকগে, তোমার কাছে গোপন করব না। কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেছে, আমিই শুধু ছ-মাস আট মাস দেরি করে অনুষ্ঠানটা করতে বলেছি। বউ মরার এক বছরের মধ্যে আমার বিয়ে করলে লোকে নিন্দে করে।

এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে মানব বলে, কালাচাঁদের ব্যাপারটা বলুন !

উমাকান্ত তার দিকে একটু ঝুঁকে নিচু গলায় বলে, ধনদাসের ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়বার জন্য কালাচাঁদ ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে।

ষড়যন্ত্র !

রীতিমতো ষড়যন্ত্র। প্রেসের অন্য লোকেরাও ওর সঙ্গে আছে। আমি যে টের পেয়েছি এটা সবাই জানে। চুপ করে আছি দেখে ওরাও কিছু বলছে না। ধরে নিয়েছে যে আমি জেনেও কিছু বলব না।

মানব চুপ করে শুনে যায়। এ সব ভূমিকা না করে আগে আসল ব্যাপারটা বলে নিলে কথাগুলির মানে বোঝা যে তার পক্ষে সহজ হত—উমাকান্তকে সেটা জানিয়ে কোনো লাভ নেই। এটাই হল তার গল্প-উপন্যাস লেখারও কায়দা ! আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়ে আগে সে কৌতূহল সৃষ্টি করে নেয়, তারপর আসল ঘটনার বিবরণ দাখিল করে।

উমাকান্ত ধীরে ধীরে বলে যায়, এ মতলব কী করে ওর মাথায় এল। কীভাবে প্রেসের অন্য লোকদের দলে টানল, ভেবে পাই না। কী কাণ্ড করছে জানো ? এই সংখ্যার রস সাহিত্যের জন্য যে সব লেখা বেছে দিচ্ছি সেগুলি কম্পোজ করছে ঠিকমতো, প্রিন্ট অর্ডার দিলে মেশিনে প্রথম ছাপা ফর্মাও দেখাচ্ছে ঠিকমতো—কিন্তু চল্লিশ-পঞ্চাশ শিটের বেশি ওই ম্যাটারটা আর ছাপছে না। ওটা নামিয়ে মেশিনে অন্য ম্যাটার ছাপিয়ে বাকি শিটগুলি ছাপছে।

মানব তাজ্জব বনে বলে, এ যে রীতিমতো রহস্যময় ব্যাপার !

উমাকান্ত বলে, শুধু রহস্যময় ? সাংঘাতিক ব্যাপার, রোমাঞ্চকর ব্যাপার। বাছাই বাছাই দু-একটা লেখা বেখে ধনদাসের মুণ্ডপাত করা লেখা ছাপিয়ে যাচ্ছে। কে যে ও সব লিখল, কখন যে কম্পোজ করল টেরও পাইনি। এবারের রস সাহিত্য বাজারে বেরোলে যে কী কাণ্ড হবে—

কী ছাপছে দেখেছেন ?

দেখেছি বইকী ! নমুনাও এনে রাখছি। সেই জন্যই তো বলছিলাম, আমি যে ব্যাপার জানি সেটা ওরা টের পেয়ে গেছে।

একটা নমুনা দেখাবেন ?

চাবিবদ্ধ ড্রয়ার খুলে উমাকান্ত পরের মাসের রস সাহিত্যের প্রথম ফর্মাটা বার করে মানবের হাতে দেয়।

প্রথম পাতায় পাইকা হরফে খালেকের কবিতা—দুর্জনেরে আঘাত হানো।

মানব মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করে কবিতাটা আপনার দেওয়া না ওরা জোগাড় করে এনেছে ?

ওটা আমার দেওয়া। তুমিই তো এনে দিলে আমাকে ?

মানব পাতা ওলটায়। পরের পাতায় ছাপা হয়েছে গল্প—সন্তানের মা ইস্তিরি না কপিরাইট ?

মানব মুখ তুলে বলে, পরে পড়ব—ব্যাপারটা আগে সব শুনেনি। এ গল্পের বিষয় কী ?

আত্তির মা-কে খুন করা। নাম-টাম সব বজায় রেখেছে। হরফ গল্পের কায়দায় নয়—সোজাসুজি ধনদাসের মুণ্ডপাত করা। লেখকের নামও গোপন করেনি—কালাচাঁদ নিজের নাম দিয়েছে।

একবার তাকিয়ে দেখে মানব বলে, তাহলে ষড়যন্ত্র নয়। ফলাফলের জন্য কালাচাঁদ তৈরিই আছে।

উমাকান্ত বলে, শুধু কালাচাঁদ নয়, প্রেসের আরও দু-তিনজন নিজের নামে ধনদাসের কেচ্ছা লিখেছে। এখনও দুফর্মা ছাপা বাকি কিন্তু ধনদাসের কেচ্ছা গাওয়ার রীতিটা বুঝতে পেরেছি। পুতুলের ব্যাপার নিয়ে আরম্ভ হল—ওর বাপ-ঠাকুদ্দার কয়েকটা কীর্তির কথা বলে ধনদাস পনেরো-ষোলোবছর ধরে কত কী কাণ্ড করেছে তার বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

মানব অনেকক্ষণ গুম খেয়ে থেকে প্রথম ফর্মাটা আগাগোড়া পড়ে বলে, এটা উচিত হচ্ছে না। কালাচাঁদ বিষম ভুল করছে। একজন মানুষকে ঘা দিয়ে কী লাভ হবে ? ধনদাস লজ্জা পেলেই সব অন্যায় অব্যবস্থা শেষ হয়ে যাবে ?

উমাকান্ত ফুঁসে ওঠে, তুমি যদি এ ব্যাপারে নাক গলাও মানব—

আমি কেন নাক গলাতে যাব ?

হ্যাঁ, নাক গলিও না। তোমার উচিত-অনুচিতের উপদেশ পরে শুনব, পরে বুঝব। আমি যা করতে চেয়ে চাকরিটা নিয়ে করতে পারিনি, কালাচাঁদ তাই করছে। একটা ঘা তো অন্তত দেবে !

মানব জোর গলায় বলে, কথা কইলেই ভয় পান কেন ? কে কোথায় কাকে ঘা দেবার প্ল্যান কষছে, তার মধ্যে নাক গলানো কি আমার পেশা ? আমি শুধু বলছিলাম এ রকম এলোমোলো ঘা দিয়ে কোনো লাভ হয় না। জগৎটা নিয়মে চলে।

পৈতৃক পুরানো টেবিলটাতে একটা ঘুঁষি মেরে উমাকান্ত বলে, আমরা নিয়মেই ঘা হানছি।

ঘরে ফিরে মানব কালাচাঁদকে বলে, তোমায় একটা কথা বলব বলব ভাবছিলাম—কেবল ভুলে যাই। রস সাহিত্যে তোমার নাম মুদ্রাকর হিসাবে ছাপা হয়, তোমার দায়িত্ব কী জানো তো ? আপত্তিকর কিছু ছাপা হলে তুমি দায়ি হবে। তেমন মারাত্মক কিছু ছাপা হলে তোমার জেলও হতে পারে !

কালাচাঁদ তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তার দিকে তাকায় কিন্তু নির্বিকার কণ্ঠেই বলে, নিজের দায়িত্ব জানি বইকী !

জানা থাকলেও এ দিকটা যে তার একেবারেই খেয়াল ছিল না কাগজ দেখে খেপে গিয়ে ধনদাস তাকে এবং আরও কয়েকজনকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে এইটুকুই সে যে শুধু ভেবেছিল, পরদিনই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আত্তি এসে জানায় দুদিন পরেই পদ্মর সঙ্গে কালাচাঁদের বিয়ে হবে। সব ঠিক হয়ে গেছে।

এ মাসের রস সাহিত্য বার হবে দু-তিনদিনের মধ্যে—বিয়েটা চুকিয়ে দিতে আর দেরি করা উচিত নয়। পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে কালাচাঁদকে যদি তারা জেলে ঠুকে দেয় কয়েক মাসের জন্য, একেবারে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।

বিয়ে হবেই জেনে সবাই চুপ করে আছে, বিয়ের দু-চারমাসের মধ্যে বাচ্চা বিয়োক পদ্ম, স্বামীর সন্তানই বিয়োবে। কিন্তু কোনো কারণে বিয়ের অনুষ্ঠানটা ছাড়াই যদি পদ্মকে মা হতে হয়—সবাই ছিছি করবে।

পদ্মকেও করবে, কালাচাঁদকেও করবে।

এতদিন গড়িমসি করে এসে হঠাৎ বিয়েটা সেরে ফেলার জন্য কালাচাঁদের ব্যগ্রতা দেখে সকলেই আশ্চর্য হয়ে যায়।

আত্তি মানবকে বলে, বাবার মাথা বেঠিক হয়ে গেছে। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ লাফিয়ে উঠল—লাগাও পরশু দিন বিয়ে !

মানব হেসে বলে, মাথা বেঠিক হয়নি, কারণ আছে। কালাচাঁদ একটা মানুষকে খুন করবে। খুন করলে ফাঁসি না হোক জেল হবে তো ? বিয়েটা তাই সেরে ফেলছে।

তামাশা কোরো না, মানুবাবু। সত্যি বলো না কারণটা কী ?

বলিস না কাউকে—প্রেসে বোধ হয় হাঙ্গামা হবে।

আত্তির মুখ ছোটো হয়ে যায়।—তবেই সেরেছে ! বাবা যা একগুঁয়ে রাগী মানুষ !

মানব বলে, ডরাস কেন এত ? পুরুষ মানুষ লড়াই-টড়াই করবে না একটু ? শুধু সয়েই যাবে ?

আত্তি ঝংকার দিয়ে বলে, আহা, লড়াই যেন পুরুষ মানুষের একচেটিয়া কাববার, মোরা যেন লড়তে জানি না। সে কথা বলছি নাকি ? বলছি যে বাবার বড়ো মাথা গরম, বড্ড বেশি গোঁ—কী করতে কী করে বসে !

মানব বলে, তুই ভুল বুঝেছিস নিজের বাপকে। কালাচাঁদ খুব হিসেবি লোক, ওর অনেক ধৈর্য।

বিনা সমারোহে বিয়ে হয়ে গেল কালাচাঁদের

বিনা নিমন্ত্রণে অযাচিতভাবে এসে গাঁটের পয়সা খরচ করে বস্তির জন ত্রিশেক মেয়ে-পুরুষ আর কালাচাঁদের অধিকাংশ সহকর্মীরা অবশ্য হইচই করে যায় অনেক, কিন্তু সেটাকে কি আর বিয়ের সমারোহ বলা যায় ?

মানব পদ্মকে দিল একটা অভিনব উপহার—নন্তু গোয়ালার টিপসই দেওয়া কয়েকখানা স্লিপ।

বিয়েতে কাগজের টুকরো উপহার ? সবাই বলে, ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন মানুবাবু ?

মানব বলে, ব্যাপার খুব সোজা। নন্তু গোয়ালা ছ-মাস আধপো করে দুধ দেবে—হিসেব করে টাকা জমা দিয়ে দিয়েছি। আত্তিকে বলে দিয়েছি, দুধটুকু যাতে সমস্তটা সংমার পেটে যায় সে দিকে নজর রাখবে।

একজন বলে, আগেই গয়লাকে ছ-মাসের টাকা বুঝিয়ে দিয়েছ ? দুধ দেবে না পাউডার গোলা ফিকে জল দেবে ঠিক নেই—দুদিন দিয়ে হয়তো তাও বন্ধ করে দেবে।

মানব হেসে বলে, আমার পয়সা হজম করতে পারবে ? গয়লাকে বোঝাবারও কায়দা আছে। মানুষকে অত হাবা ভাবতে নেই। নন্তু কি জানে না আধপো দুধে জল আর পাউডার মিশিয়ে কত লাভ করা যায় ? ওইটুকু লাভের জন্য সবার কাছে হীন হবার ঝুঁকি নেবে, ও কি এতই বেহিসেবি বোকা ? আর কেউ না পাক, পদ্ম ঠিক খাঁটি দুধ পাবে।

প্রুফ রিডার ভুবনও এসেছিল। খানিকক্ষণ মনে মনে হিসাব কষে সে প্রায় লাফিয়ে উঠে বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলে, এ যে প্রায় অ্যারিস্টোক্রেটিক উপহার হল ! আমি ভেবেছিলাম, রোজ আধ পো দুধে কী হয় ? তার চেয়ে একটা ছ-সাতটাকা দামের শাড়ি দিলে বেশ মানাত ! রোজ আধ পো দুধের ছ-মাসের দাম হিসেব করতে গিয়ে দেখি, ও বাবা, এ তো ছ-সাতটাকার ব্যাপার নয়। আধপো দুধের দাম দুআনা। তিরিশ দিনে মাস ধরলে ষাট আনা—ছ-মাসে মোটমাট সাড়ে বাইশ টাকা।

মানব বলে, নন্তুকে সাড়ে বাইশ টাকা নয়, বিশ টাকা দিয়েছি। সোজাসুজি বললাম যে ধার দিলে টাকায় মাসে মাসে দুপয়সা সুদ কষতে হয়—ছ-মাসের দাম আগাম দিলে কিছু ছাড় পাব না ? নন্তু কী বলেছিল জানো ? আপনি তো আসল হিসেব বড়োই বোঝেন বাবু—একটা কারবার দিলে তো রাজা হয়ে যেতেন !

বস্তিবাসী উদ্‌বাস্তু বাঙাল মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে, আপনে জবাবে কী কইলেন ?

মানব জবাব দেয়, আমি কইলাম, রাজাগো যখন মরণ দশা, রাজা হইয়া করুম কী ?

তার খাঁটি বাঙাল উচ্চারণে কথা বলায় সবাই আশ্চর্য হয়ে হেসে ওঠে।

রস সাহিত্যের এই সংখ্যাটি বাজারে আত্মপ্রকাশ করার পরেও সাত সাত রাত্রি কালাচাঁদ পদ্মকে নিয়ে ঘর করার সুযোগ পায়।

ছাপা বাঁধাই শেষ হওয়ামাত্র রস সাহিত্যের যে কপিটা ধনদাসকে দেওয়া হয় দুদিন পরে শুধু পাতা উলটিয়ে চোখ বুলিয়ে দেখে সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল—সব ঠিক আছে।

উমাকান্ত সত্যিই পাল্লা দিতে কোমর বেঁধেছে হরফের সঙ্গে।

প্রচ্ছদপটটা কী সুন্দর করেছে এবার উমাকান্ত ! কতজন নামকরা লেখকের লেখা এবার ছাপিয়েছে। তার রস সাহিত্যের সঙ্গে পাল্লা দেবে হরফ—ইস !

আত্মীয়বন্ধু বা কেউ কেউ এসে জানতে চায় এবারের রস সাহিত্য এ রকম করলেন কেন ?

হরফ পত্রিকা ঘাঁটতে ঘাঁটতে, কালাচাঁদের তিন নম্বর গল্প পড়তে পড়তে ধনদাস মৃদুস্বরে বলে, রস সাহিত্য পছন্দ না হয়, অন্য মাসিক কিনে পড়ুন। হরফ কিনে পড়ুন।

ধনদাসের বুড়ো বাপ হরকান্ত বছর দশেক সংসার নিয়ে মাথা ঘামানো প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। এক সাধুর আশ্রমেই দিন কাটায়, দু-একমাস অন্তর দু-একদিনের জন্য সে শুধু হালচালটা বুঝে যায়, শুধু জেনে যায় মোটামুটি সব ঠিক আছে কি না।

বাড়ির বাঁধা ডাক্তারের মাঝে মাঝে এসে জন্ম-রোগীর নাড়ি পরীক্ষা করে যাওয়ার মতো !

কাঁপতে কাঁপতে হরকান্ত প্রেসে এসে ধনদাসের টেবিলের সামনে দাঁড়ায়। এমনিতেই দেহ আজকাল কাঁপে, এখন কিন্তু সর্বাঙ্গ তার কাঁপছে রাগে।

হ্যাঁ রে, এ তোর কী মতিগতি হয়েছে ? নিজেকে ডাকাত গুন্ডা নচ্ছার বলে ঘোষণা করে, বাপ-পিতেমোর কেচ্ছা রটিয়ে তুই উঠতে চাস ? তোর মতলবটা কী ?

ধনদাস উঠে দাঁড়িয়েছিল, সে ধীর কণ্ঠেই বলে, হরফের কথা বলছ তো ? শত্রুতা করছে। আমিও দেখিয়ে দেব, শোধ নেব।

হরকান্তের রাগ আরও চড়ে যায়।—হরফ কী, হরফ ? নিজের কাগজে নিজেকে গাল দিয়ে, বাপঠাকুর্দার জোয়ান বয়সের কেচ্ছা লিখে এ কী কাণ্ড শুরু করেছিস ? তুই উচ্ছন্ন যাবি, তিলে তিলে জ্বলে জ্বলে, পুড়ে পুড়ে, তুই মরবি !

হরকান্ত হাতে করেই এনেছিল রস সাহিত্যের দুমড়ানো মুচড়ানো বর্তমান সংখ্যাটা, ধনদাসের মুখের উপর সেটা ছুঁড়ে দিয়ে সে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে যায়।

হতভম্ব ধনদাস কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে আনমনে পাতা ওলটাতে ওলটাতেই হঠাৎ খেয়াল করে যে এ তো তার রস সাহিত্য কাগজ নয় !

এক ঘণ্টা পরে উমাকান্তকে ডেকে সে বলে, কাগজটার এ মাসের ফাইল কপিটা আমায় একটু দিন তো উমাবাবু ?

আরও এক ঘণ্টা পরে সে প্রেস থেকে বেরিয়ে মোড়ে মাধবের বুকস্টলটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তিন কপি রস সাহিত্য অবশিষ্ট ছিল। একখানা তুলে নিয়ে সে পাতা ওলটায়।

মাধব বলে, আপনার এ মাসের কাগজ নিয়ে হইচই পড়ে গেছে। দশ কপি পড়তে পেল না। বারোটা নাগাদ আরও পঁচিশ কপি আনলাম—মোটে তিনখানা বাকি আছে। আমাকে আরও পঁচিশ কপি দিতে হবে কিন্তু !

ধনদাস নীরবে তার রস সাহিত্যের পাতা উলটে যায়।

শেষরাত্রে মারতে মারতে ধরে নিয়ে যায় কালাচাঁদকে।

টাইপ চুরি করা থেকে আপত্তিকর গোপন ইস্তাহার ছাপিয়ে পয়সা রোজগার ইত্যাদি কয়েক দফা অপরাধে।

বস্তি আর ঘুমায় না। উত্তেজনা ঝিমিয়ে আসতে আসতে ভোর হয়ে যায়। কাজের মানুষ যায় কাজে, বেকার মানুষ যায় কাজের খোঁজে, ঘরের মানুষ লেগে যায় ঘরের কাজে।

মানব ঠায় বসেছিল কালাচাঁদের দাওয়ায়। মাথা হেঁট করে বসে মৃদু এবং মিহি সুরে পদ্ম একটানা কেঁদে চলেছিল। খুঁটিতে ঠেস দিয়ে আত্তি বসেছিল চুপচাপ।

ঘরের চালে সোনালি রোদ এসে পড়েছে খেয়াল করে মানব যেন চেতনা ফিরে পায়। পদ্মকে বলে, কাঁদছ কেন ? প্রাণের জ্বালা জুড়োতে গেছে, ফিরে তো আসবে মানুষটা ! কেঁদো না।

আত্তিকে বলে, আমি বলি কী আত্তি, মিছিমিছি কেন ঘরের ভাড়া গুনবি ? দুজায়গায় দুবার করে রাঁধবি ? আমার ওখানেই তোর আর সৎমা-টার খ্যাঁট একসঙ্গেই রেঁধে নিস। বড়ো একটা ভাতের হাঁড়ি কিনতে হবে, না ?

আত্তি বলে, আহা, তিনটে পেটের জন্য বড়ো ভাতের হাঁড়ি ! নিজে তো খাও একমুঠো ভাত।

মানব বলে, বড়ো একটা খাটিয়া কিন্তু আনতে হবে, নইলে মেঝেতে বিছানা পাততে হবে। ওইটুকু খাটিয়ায় দুজনে শোয়া যায় না। কুঞ্জর মা-কে জানিয়ো পদ্ম, এমনি ঘরে থাকবে না, ভাড়ার একটা ভাগও তুমি দেবে। কালাচাঁদের মালপত্রও কিছু থাকবে তো ওখানে !

আত্তি প্রশ্ন করে, একেবারে ছেড়ে দেবে ঘরটা ? বাবা ফিরে এলে তখন ?

পদ্মর কান্না থেমেছিল। এবারে সে মুখ খোলে।—ঘর বুঝি আর মিলবে না ?

মানব হেসে আত্তিকে বলে, ঘর না মেলে, আমাদের ঘরটা ছেড়ে দেব। তুই আর আমি একটু বেড়িয়ে আসব এদিক-ওদিক—কতকাল বেরোইনি, মন কেমন করছে।

হরষ উপন্যাসের খসড়া

গ্রন্থপরিচয়

বর্তমান রচনাসমগ্রের অন্তর্গত গল্প উপন্যাস ও অন্যান্য গ্রন্থের ক্ষেত্রে শিরোনামসহ মূলপাঠের সর্বত্র পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সম্মত বানান অনুসৃত হয়েছে। গল্প উপন্যাস ইত্যাদির অন্তর্গত চরিত্রনামের ক্ষেত্রে অবশ্য আদি বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। কেবল গ্রন্থপরিচয় অংশের আলোচনাক্ষেত্রে, গ্রন্থসমূহ এবং অন্তর্গত রচনাবলির শিরোনাম প্রথম প্রকাশকালে যেমন ছিল, তেমনই রক্ষা করা হয়েছে।

মূলে কোনো লিখিত জবানিতে (যেমন ৫ম খণ্ডে 'চিন্তামণি' উপন্যাসে চিন্তামণির দিদির লেখা পত্রাদির ক্ষেত্রে) লেখকের ইচ্ছাকৃত ও আরোপিত বিকৃতি বা অশুদ্ধ ব্যবহৃত হয়ে থাকলে সেগুলি যথাযথ রেখে দেওয়া হয়েছে।

লেখকের একাধিক গ্রন্থে সংলাপের ক্ষেত্রে উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহারে অভিন্ন রীতি লক্ষিত হয় না। এমনকী স্বহস্ত-লিখিত পাণ্ডুলিপির সংলাপেও কোথাও উদ্ধৃতিচিহ্ন আছে, কোথাও নেই। চিহ্নহীন সংলাপ নির্দেশই সংখ্যায় সব চেয়ে বেশি দেখা যায়। মানিক রচনাসমগ্রে একটি অভিন্ন রীতি অনুসরণের প্রয়োজনে সংলাপ নির্দেশে উদ্ধৃতিচিহ্ন বা ঊর্ধ্বকমা [' ' / " "] ব্যবহৃত হয়নি।

ফেরিওলা

'ফেরিওলা' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্বিংশ সংখ্যক মুদ্রিত গ্রন্থ এবং পঞ্চদশতম গল্প সংকলন। এই তালিকায় অবশ্য লেখকের শ্রেষ্ঠ গল্প, স্বনির্বাচিত গল্প অথবা অন্যান্য সংকলন গ্রন্থকে ধরা হয়নি

ফেরিওলা-র প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৬০ অর্থাৎ এপ্রিল-মে ১৯৫৩ প্রকাশক ক্যালকাটা পাবলিশার্স, কলকাতা , পৃ ৬ + ১৪৩ মূল্য আড়াই টাকা , প্রচ্ছদশিল্পী অজিত গুপ্ত। পূর্ববর্তী গল্পগ্রন্থ 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী' প্রকাশের প্রায় চার বছর পরে এই গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। আশ্বিন ১৩৬২ (১৯৫৫) তে ফেরিওলা-র দ্বিতীয় সংস্করণ হয় প্রকাশক এবং মূল্য অপরিবর্তিত ছিল প্রচ্ছদও পূর্ববৎ। ফেরিওলা সংকলনে মোট তেরোটি গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়। গল্পগুলি যথাক্রমে ফেরিওলা, সখি, সংঘাত, সর্তা, লেভেল ক্রসিং, ধাত, ঠাঁই নাই ঠাঁই চাই, চুরিচামারী, দায়িক, মহাকর্কট বটিকা, আর না কান্না, মরব না সস্তায়, এক বাড়িতে।

মানিক রচনাসমগ্রের বর্তমান খণ্ডে ফেরিওলা-র দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে।

ফেরিওলা সংকলন ভুক্ত গল্পগুলির প্রায় সবগুলিরই পত্রপত্রিকায় পূর্বপ্রকাশ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। কালানুক্রমিকভাবে তা নিম্নরূপ

সখি	পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা	শ্রাবণ ১৩[illegible]
ঠাঁই নাই ঠাঁই চাই	দেশ	শ্রাবণ ১৩৫৫
এক বাড়িতে	যুগান্তর	শ্রাবণ ১৩৫৭
সংঘাত	চতুষ্কোণ	ঐ ১৩৫৭
আর না কান্না	পরিচয়	জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮
ফেরিওলা	যুগান্তর	শ্রাবণ ১৩৫৮
সর্তা	পরিচয়	শ্রাবণ ১৩৫৮
মহাকর্কট বটিকা	[illegible] স্বপ্ন	শ্রাবণ ১৩৫৮
লেভেল ক্রসিং	যুগান্তর	শ্রাবণ ১৩৫৯
চুরিচামারী	সূচীপত্র	শ্রাবণ ১৩৫৯
মরব না সস্তায়	মধ্যাহ্ন	শ্রাবণ ১৩৫৯
ধাত	গল্প ভারতী	মাঘ ১৩৫৯
দায়িক	?	?

তালিকাভুক্ত 'সখি' গল্পটিকে লেখক প্রথমে তাঁর ছোটবকুলপুরের যাত্রী (আষাঢ় ১৩৫৬) গল্পসংকলনের অন্তর্ভুক্ত করেন। মানিক রচনাসমগ্রের ৬ষ্ঠ খণ্ডে ছোটবকুলপুরেব যাত্রী অংশে (পৃ ২৯৭-৩০২) সেটি মুদ্রিত হয়েছে। তাই মানিক বচনাসমগ্রের বর্তমান খণ্ডে ফেরিওলা সংকলনে সেটি আর পুনর্মুদ্রিত হয়নি। একবার একটি সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পুনর্বার আর একটি সংকলনে একই গল্পের অন্তর্ভুক্তির একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায় আলোচ্য গ্রন্থে লেখকের ভূমিকায় :

> গত দু'তিন বছব ধবে গল্পগুলি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা, কিন্তু গল্পগুলিব মধ্যে সমসাময়িক সামাজিক জীবনেব মূলসূত্রেব একটা যোগাযোগ আছে বলেই আমাব বিশ্বাস।

সতী গল্পটি পরিচয় পত্রিকায় প্রথম প্রকাশকালে সূচিপত্রে 'ব্যঙ্গচিত্র' নামে উল্লিখিত হয। আর না কান্না গল্পের প্রারম্ভে উল্লিখিত কান্না গল্পটি পরিচয় পত্রিকায় (চৈত্র-বৈশাখ ১৩৫৭-৫৮) প্রকাশিত জ্যোতি দাশগুপ্তের লেখা কান্না আর কান্না গল্পের ইঙ্গিত মাত্র। প্রাসঙ্গিক প্রেরণা ব্যতীত উক্ত গল্পটিব সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর না কান্নার কোনো সম্পর্ক আপাতদৃষ্টিতে লক্ষিত হয় না। (দ্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত, ভাদ্র ১৪০৫ সং, পৃ ১৬৬, পরিশিষ্ট অংশ)। ঠাঁই নাই ঠাঁই চাই গল্পটির পত্রিকায় প্রকাশকালে নাম ছিল 'ঠাঁই চাই ঠাঁই নাই'।

'ঠাঁই নাই ঠাঁই চাই' গল্পের পত্রিকায় প্রকাশকালে শিরোনামচিত্র

লেভেল ক্রসিং গল্পটির সঙ্গে সমকালীন আরোগ্য (মে-জুন ১৯৫৩) উপন্যাসেব আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে স্বয়ং লেখকের কিছু মূল্যবান স্বীকৃতি পাওয়া যায় ১৩৬০ বঙ্গাব্দেব শারদীয় দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশিত 'সাহিত্যের কানমলা' নামক একটি প্রবন্ধে :

> . "গত বছবেব কথা। 'আবোগ্য' উপন্যাসটি লিখছিলাম। পূজা আসছে। বইটা লিখতে লিখতে খেয়াল হল, এই উপন্যাসটিতেই তো সুন্দব কযেকটি গল্প রয়েছে। প্রায় একেবাবে তৈবি গল্প—একটু অদল বদল ঘষা-মাজা কবলেই সত্যিকাবের গল্প হয়ে যাবে। প্রায়-তৈবি দু'তিনটি গল্প ছাডাও গল্প আছে, তবে একটাকে নতুন করে ঢেলে সেজে নিতে হবে—নইলে উপন্যাসেব গন্ধ ছাড়বে গা থেকে।
>
> উপন্যাস থেকে দু'একটি গল্প আগেও চয়ন কবেছি। অসম্পূর্ণ ও অপ্রকাশিত উপন্যাস থেকে চয়ন করা এবকম গল্প 'মাসিক বসুমতী'তেও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে গল্পেব উপাদানটুকুই উপন্যাস থেকে সংগ্রহ করেছি, নতুন করে লিখে তাকে গল্পের রূপ দিতে হয়েছে। প্রত্যেক উপন্যাসেই একাধিক গল্পেব উপাদান এবং সঙ্কেত কম-বেশি থাকে।

কোন কোন গল্পেও আবার উপন্যাসের বীজ থাকে। গল্প লিখে উপন্যাসের ইঙ্গিত পেয়ে উপন্যাসও আমি লিখেছি—গল্পটি না লিখলে উপন্যাসের পরিকল্পনা হয়তো কোনোদিনই আমার মনে আসত না।" .

.."গল্প কেমন হবে সেটা আলাদা প্রশ্ন। আলাদা ভাবে গল্প ভেবে নিয়ে লিখলেই যে গল্প উৎরে যাবে, এমন তো কোন নিয়ম নেই।".

. "গতবারের 'শারদীয়া যুগান্তরে'র 'লেভেল ক্রসিং', পরিচয়ের 'শিল্পী' ইত্যাদি গল্প 'আরোগ্য' উপন্যাস থেকে নেওয়া, কিছু অদল-বদল কাটা ছেঁড়া জোড়া দেওয়া ঘষা-মাজা করতে হয়েছিল।

গল্পগুলি কেমন হয়েছে বলার অধিকারী আমি নই। কিন্তু ওগুলি যে গল্প হয়েছে এবং আমার আর দশটা সাধারণ গল্পের চেয়ে বাজে হয়নি একথা জোর গলাতেই বলতে পারি। সুতরাং ফাঁকি দিয়েছি এ অভিযোগ তোলা যাবে না।"..

উক্ত অংশের মধ্যে গল্প উপন্যাসের আঙ্গিক সম্পর্কে লেখকের নতুন ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

লেখকের ডায়েরিতে ফেরিওলা গল্পের প্লট বা পরিকল্পনাসূত্র পাওয়া যায়। যথা: Aug '51-তারিখ সংবলিত ডায়েরির প্রাসঙ্গিক অংশ—

ফিরিওলা

বর্ষা পুলিশ -

ফিরিওলা বাড়ী বাড়ী কত রকমের বৌ মেয়ে দ্যাখে—তার নিজের ঘরের বৌ অন্য ফেরিওলার কাছে বৌ অন্য জিনিষ কেনে

(অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় . ডায়েরি ও চিঠিপত্র . ভূমিকা, টীকাভাষ্য ও সম্পাদনা যুগান্তর চক্রবর্তী, দে'জ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, পৃ ১৫৫)

১৪.৯.১৯৫১ তারিখের ডায়েরিতে ১৯৫১ শারদীয় যুগান্তরে প্রকাশিত ফেরিওলা গল্পের জন্য ৭৫ টাকা প্রাপ্তির উল্লেখ আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, লেখক একাধিকবার ফেরিওলা ব্যতীত ফিরিওলা, ফিরিযালা বানান দুটিও ব্যবহার করেছেন।

মরব না সস্তায় গল্পটির পত্রিকায় প্রকাশকালে নাম ছিল মরতে পারবো না। অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থের যুগান্তর চক্রবর্তী লিখিত সম্পাদকীয় টীকাভাষ্য থেকে জানা যায়, লেখকের ১৯৫১ সালের ডায়েরিতে ফেরিওলা গ্রন্থের একটি সম্ভাব্য সূচিপত্রে গল্পটির নামকরণ করা হয়েছিল সস্তা মরণ মরব না (দ্র অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৪২০)।

মরব না সস্তায় গল্পটি মধ্যবিত্ত শারদ ১৩৫৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত পত্রিকার সম্পাদককে লেখা লেখকের একটি পত্রে আলোচ্য গল্পটির সূত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য-বিষয়ক অভিমত পাওয়া যায়, যা লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যভাবনা বিশ্লেষণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে। তবে 'অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সম্পাদক যুগান্তর চক্রবর্তীর অভিমত, '১৯৫২ সালের পুজোর পর চিঠিটি লেখা হয়। লেখকের স্বাক্ষরহীন অসম্পূর্ণ চিঠি এবং লেখার ধরন ও কাগজ দেখে বোঝা যায় শেষ পর্যন্ত পাঠানো হয়নি।' (দ্র তদেব, পৃ ৪২০)

১৮৬-এ গোপাললাল ঠাকুর রোড
আলমবাজার
কলিকাতা-৩৫

মধ্যবিত্ত সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

কিছুদিন আগে একজন বন্ধু ফুচিকের 'ফাঁসির মঞ্চ থেকে' বইখানার নাম করে প্রশ্ন করেছিলেন, আমি কি এই মৃত্যুকে মহান মনে করি না? আদর্শের জন্য প্রাণ দেওয়া কি ভুল আদর্শ? কোনরকমে বেঁচে থাকাটাই কি সব?

প্রশ্ন শুনে সত্যই ভড়কে গিয়েছিলাম। অনেক জেরা করেও কিন্তু জানতে পারি নি আমার কোন লেখা বা বক্তৃতা বন্ধুটির মনে এ প্রশ্ন জাগিয়েছে। প্রশ্নটিকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করে আমায় চেপে ধরলে সুস্পষ্ট ও

লেভেল ক্রসিং

শারদীয় যুগান্তর (১৩৫৯) এ প্রকাশিত 'লেভেল ক্রসিং' গল্পের শিরোনামচিত্র

খুব তো বিশ্বাস করেছিলে অনিলবাবুকে ?
শারদীয় যুগান্তর, ১৩৫৯, পৃ ১৩

খুব তো বিশ্বাস করেছিলে অনিলবাবুকে ?
মা রচনাসমগ্র ৯ পৃ ৩৩

তাকে যেতেই হবে।
পৃ ২৩

যথাসময়ে যথাস্থানে তাকে গিয়ে পৌঁছাতেই হবে।
পৃ ৩৩

ললনা অনায়াসেই বাড়ী চলে যেতে পারত
পৃ ২৩

গাড়ির ব্যবস্থা করার দায় কেশবের ঘাড়ে চাপিয়ে ললনা অনায়াসেই বাড়ি চলে যেতে পারত
পৃ ৩৩

তার নিজের সম্পর্কে, তার আপনজনদের সম্পর্কে ললনার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানবার কৌতূহল গোড়ায় বড়ই বিব্রত করত কেশবকে।
পৃ ১৩

তার নিজের সম্পর্কে তার আপনজনদের সম্পর্কে ললনার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা বিবরণ জানবার কৌতূহল গোড়ার দিকে বড়োই বিব্রত করত কেশবকে। মনে মনে বিরক্ত হত, রেগেও যেত।
পৃ ৩৩

ঘুমানোর জন্য ফিরে যাওয়া।
পৃ ২৩

ঘুমানোর জন্য ফিরে যাওয়া। তার কি কোনো মানে হয়।
পৃ ৩৪

খেয়ে দেয়ে খাটিয়ায় শুয়ে নাক ডাকাও।
পৃ ২৪

খেয়ে দেয়ে খাটিয়ায় শুয়ে নাক ডাকাও।
কেশব মুখ বাঁকায়।
পৃ ৩৬

দালানের ভিতরে না গিয়ে বাগান দিয়ে কেশব রান্নাঘরে যায়।
পৃ ২৪

দালানের ভিতরে না গিয়ে বাগান দিয়ে রান্নাঘরে যাওয়া যায়।
পৃ ৩৭

বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা কইলে দিদি আবার ঝাড়বে।
পৃ ২৫

বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা কইলে দিদি আবার ঝাড়বে।
কেশব বাগান দিয়ে ঘুরে রান্নাঘরে এসেছিল, এবার সে দালানের ভিতর দিয়ে ফিরে যায়।
পৃ ৩৮

লণ্ঠনের আলোয় বিবর্ণ মুখ দেখা যায়। থেকে থেকে তার মুখ দিয়ে ভয়ার্ত আওয়াজ বার হয়।
পৃ ১৯৩

লণ্ঠনের আলোয় বিবর্ণ মুখ দিয়ে অস্ফুট ভয়ের আওয়াজ বার হয়।
পৃ ৩৯

খাত

নগদ টাকা নেওয়া যায় না।

গল্পভাবতী, মাঘ ১৩৫৯, পৃ ১০৮৩

নগদ টাকা নেওয়া যায় না।

মুখোশটা তারা দুজনেই বজায় রেখেছে নিজে নিজের সুবিধার জন্য। মা রচনাসমগ্র-৯ পৃ ৪১

কিন্তু অমলার কথা ভিন্ন।

পৃ ১০৮৩

কিন্তু অমলার কথা ভিন্ন।

ভালো মালমশলা আর ভালো মিস্ত্রি দিয়ে বাড়িটা না করে দিলে অমলা অভিমানের ছলনায় ঝঞ্ঝাট বাড়াবে।

পৃ ৪১

কিছুতে তুমি কথা শুনবে না। ক'বছর বাদে বাড়ী ধ্বসে পড়লে পড়বে, তোমার কি এল গেল? পৃ ১০৮৪

কিছুতে তুমি কথা শুনবে না।

পৃ ৪১

মাথায় বাশিকৃত চুলের মস্ত খোঁপা, হাতে মোটা মোটা রূপার বালা, এবং নারীদেহের যতটা অগত্যা ঢেকে রাখতে হয় সেখানে ছাড়া সর্বাঙ্গে উল্কি। পৃ ১০৮৫

টিকিনের মাথায় বাশিকৃত চুলের মস্ত খোঁপা, হাতে মোটা রূপার বালা এবং সারা দেহে নানা প্যাটার্নের উল্কির নকশা কাটা। পৃ ৪২

বিনোদ কার্তিককে বিনামূল্যে আশ্রয় দেয় না— খাওয়া পরা মাথা গুঁজে থাকার ভাড়া সব কিছুর অনেক বেশি দাম খাটিয়ে তুলে নেয়। পৃ ১০৮৭

সম্পর্কের হিসাবেই সে বিনোদের আশ্রয়ে থাকে কিন্তু বিনোদ বাউকে বিনামূল্যে আশ্রয় দেওয়ার মানুষ মোটেই নয়,—খাওয়াপরা মাথা গুঁজে থাকার ভাড়া সব কিছুর অনেক বেশি দাম কার্তিককে খাটিয়ে তুলে নেয়।

পৃ ৪৩

মুখ বাঁকালে কার্তিকের মুখটা আরও কুৎসিত দেখায়।

পৃ ১০৮৯

কার্তিক কোনো কথা না বলে শুধু মুখ বাঁকায়। মুখ বাঁকালে মুখটা আরও কুৎসিত দেখায়। পৃ ৪৪

ঠাঁই নাই ঠাঁই চাই

সে না শোভার মামা?

সম্পর্কে শোভার মামাই হয় লোকটা। কিন্তু বাব তের বছর মামার মুখ দেখার ভাগ্য শোভার হয়নি। ওর কবল থেকে তাদের বাঁচাতে হবে।

শারদীয় দেশ ১৩৫৭, পৃ ৪৫ ৪৬

সে না শোভার মামা?

[বাকি অংশ বর্জিত]

মা রচনাসমগ্র-৯ পৃ ৪৭

পাটা শক্তই আছে।

স্টীমারে ও রেলে অসম্ভব ভীড়, অবর্ণনীয় কষ্ট। কিন্তু সহ্যের সীমাও তেমনি আবার কল্পনার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। মানুষ সে মরণজয়ী জগত জয়ী করেছে নিজেকে, উদ্বাস্তুরা তার আরও একটা প্রমাণ।

পৃ ৪৬

পাটা শক্তই আছে।

[বাকি অংশ বর্জিত] পৃ ৪৭

গাদাগাদি করে দিনরাত কাটাতে পারে, এমন নিরুপায় আশ্রয়হীনতার দুর্গন্ধ নোংরামিতে এত মানুষের ভিড়ে মুখ গুঁজে দিতে পারে, চোখে দেখার আগে এটা কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। পৃ ৪৬

গাদাগাদি করে দিনরাত কাটাতে পারে, চোখে দেখার আগে এটা কল্পনা করা সম্ভব ছিল না।

পৃ ৪৭

অল্প দূরে দাঁড়িয়ে একজন ভদ্রলোক তাদের লক্ষ্য করছিল, ধীরে ধীরে সামনে এসে দাঁড়ায়। সৌম্য মূর্তি, পোষাক এবং চেহারা দুয়েই সম্ভ্রান্ত। বয়স প্রায় পঞ্চাশ হবে, চুলে কিছু কিছু পাক ধরেছে।

একটা গাড়ি ভাড়া করে তারা রওনা দেয়।

বাড়িটা শহরের এক ঘিঞ্জি নোংরা প্রান্তে।

কলকাতায় বাড়ি করার আসল দরকারটা ছিল ঘনশ্যামেরই। শহরেই তার স্থায়ী বসবাস। একটু বুদ্ধি

কত পড়বে ?

দুখানা ঘর মাসে চল্লিশ টাকা।

দেবানন্দ তৎক্ষনাৎ রাজী হয়ে যায়। কিন্তু দেখা যায়, বড় বড় দু'খানা ঘররূপ স্বর্গ কলকাতা সহরে অত সহজে ভাড়া মেলে না। তিন মাসের অগাম ভাড়াটা এইখানে জ্ঞানেন্দ্রর হাতে দিতে হবে নগদ। সে অবশ্য যথারীতি রসিদ দেবে।

শোভার মা নীচু গলায় জোরের সঙ্গে বলে, এই কি একটা কথা হইল ? বাড়ীটা চোখে পর্যন্ত না দেইখা -

দেবানন্দ বলে, আমিও তাই কই। বাড়িটা দেখান—

জ্ঞানেন্দ্র হাসিমুখে বলে, ভাবছেন, লোকটা কলকাতার চোর না জুয়াচোর, টাকাটা হাতে পেলে ভাগবে। তা সেটা মনে হওয়া অন্যায় নয়—আমিও তা বুঝি মশায়। তবে আসল ব্যাপারটা খুলে বলি শুনুন। আমি যেমন আপনাদের অচেনা, আপনারাও তেমনি আমার অজানা। আপনাদের বিষয় কিছুই জানি না।

তার সরল সহজ কথাগুলি তাদের ভাল লাগে। সে একটু থেমে বলে, বাড়ী ভাড়ার আইনটা জানেন তো ? ভাড়াটে [illegible] ঘরে ঢুকলে দখল করে বসতে পারলে আর কথা নেই। বাড়ীওলার সাধ্য নেই তাকে তাড়ায়। আপনারা ঘর দখল করে যদি বলেন তিন মাসের ভাড়া আগাম হবে না, আমি যাব কোথা ? সেইজন্য আগে টাকাটা চাইছি। তাছাড়া, আপনাদের ভয় পাবার কি আছে ? আমি তো আপনাদের সঙ্গে রইলাম। চোখের আড়াল হতে দেবেন না, ফুরিয়ে গেল।

শোভার মা তেমনি নীচু গলায় জোরের সঙ্গে দেবানন্দকে বলে, কিন্তু বাইর থেইকা বাড়ীটা একবার চোখে না দেইখা ভাড়া দিবেন ক্যামনে ? বাড়ীতে নয় ঢুকবেন না, বাড়ির সামনে ভাড়ার টাকা দিয়া—

জ্ঞানেন্দ্র উৎসাহিত হয়ে বলে, আমার কোন আপত্তি নেই। চলুন আপনারা। আগাম ভাড়াটা না পেয়ে কিন্তু ভেতরে ঢুকতে দিতে পারব না মশায়। এইটুকুই মশায় আমার দিকের একমাত্র প্রোটেকশন। বাড়ীর দরজায় গিয়ে দাঁড়াবেন ভেতরে ঢুকতে পারেন না—সেটা বড় বিশ্রী ব্যাপার হয়। তাই লেনদেনটা এখানে চুকিয়ে নিতে বলছিলাম। তা আপনারা যদি চান, চলুন যাই।

দেবানন্দ শোভার মাকে বলে, তোমাগো আগে দিয়া আসুম ?

না, মা বইনরে ঘরে বসাইয়া আমাগো দিয়া আসনে।

জনাকীর্ণ রাজপথের পাশে একটি তিনতলা বাড়ীর সামনে তাদের গাড়ী দাঁড়ায়। পায়ে হাঁটা মানুষের স্রোত আর ট্রাম বাস গাড়ী ঘোড়া বয়ে চলেছে পথ দিয়ে।

এই বাড়ী। তেতালা য় ওই কোণের দিকের দু'খানা ঘর আপনাদের। এখন যা বিবেচনা করেন।

প্রকাণ্ড একটা হাঁ করে হাই তুলে কৃষ্ণদাস বলে, ভুলে হয়তো যাননি, ইচ্ছা করেই ঠিকানা জানাননি। মানুষটার বড়ো দুরবস্থা।

ঘনশ্যামের দুরবস্থার বিবরণ শুনতে শুনতে দেবানন্দ ও শোভার মা আবার মুখ চাওয়া চাওয়ি করে।

কাজ নেই। রোজগার নেই। রোগে ভুগছে। দেনায় বিকিয়ে গেছে এই বাড়ি। ঘনশ্যামকেও উদবাস্তু হতে হয়েছে। ওইখানে উঠে গেছেন—হাত বাড়িয়ে আঙুলের সংকেতে কৃষ্ণদাস গলির আরও ভিতরের দিকে বাঁকের ও পাশে খোলার চালাগুলি দেখিয়ে দেয়। দুটো পাকা বাড়ির ফাঁকে দু তিনটে খোলার চালাই শুধু দেখা যাচ্ছিল।

শোভার মা সেদিকে পা বাড়াতেই দেবানন্দ বলে, রও, রও। গাড়িটারে ছাইড়া দিয়া আসি। বেশি দেরি হইলে ব্যাটা তিনগুণ ভাড়া আদায় করব।

রাস্তার শুধু একদিকে দুহাত চওড়া ফুটপাত, তার গা ঘেঁষে উপরে মাথা তুলেছে শীর্ণ রুগণ অজানা গাছটা।

ওই গাছের তলে ফুটপাতে জিনিসপত্র নামিয়ে সকলকে বসিয়ে গাড়ির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে দেবানন্দ আর শোভার মা আবার গলিতে ঢোকে।

খোলার বাড়ি খোলার ঘর হলেই নোংরা হয় না। খোলার ঘরের গরিব বাসিন্দারাও ঝাঁট দিয়ে লেপে পুঁছে ঘরদুয়ার সাফ রাখতে জানে—এ রকম সাফ রাখাটা প্রায় শুচিবাইয়ের পর্যায়ে উঠে যায়। কিন্তু খোলার ঘরের সামান্য আশ্রয়েও এমন গিজগিজে ভিড় জমেছে মানুষের যে সাফ সুতুত রাখার চেষ্টা অসম্ভব হয়ে গেছে।

মানুষ জাতীয় জীবের খাটালে পরিণত হয়েছে বাড়িগুলি।

দুর্গন্ধে অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠে আসবে, আজও যাদের অন্নপ্রাশন হয়।

দুজনের কোনোরকমে থাকবার মতো আঁধারে একটা সাঁতসাঁতে ঘর।

সেই ঘরে ঠাঁই জুটেছে ঘনশ্যামের পরিবারের ছোটোবড়ো মোট আটজন মানুষের। এককোণে ঘনশ্যাম পড়েছিল চাদর মুড়ি দিয়ে। ঘনশ্যাম অথবা তার কঙ্কাল চেনাই মুশকিল।

শোভার মা-কে দেখে ঘনশ্যাম কাতরাতে কাতরাতে বলে, বারণ করলাম, তবু আইলা ? এখন সামলাও।

দুজনকে বসতে দেওয়া হয় দু-টুকরো তক্তায়। বোঝা যায়, তক্তার টুকরো দুটো সংগ্রহ করে আনা—ছেলেমেয়েদের দ্বারা। কাছেই কোথাও কংক্রিটের গাঁথনি উঠছে বোধ হয়।

আমাগো যে জানান নাই ?

জানার ভাবছিলাম। তোমাগো কী অবস্থা কে জানে। তারপর চিঠি পাইলাম, বারণ কইরা লিখলাম আইসো না। এখন মজা বোঝ।

দেবানন্দ মুখ ফিরিয়ে শোভার মাকে জিজ্ঞাসা করে, মাইয়া কি কও ?

শোভার মা তিনতলা বাড়ীটির সর্বাঙ্গে চোখ বুলাচ্ছিল। এত বড় বাড়ীতে মোটে দশখানা কোঠা ? সামনেই প্রত্যেক তালায় তিনখানা করে ঘর—ভিতরের দিকে ঘর নেই ? কে জানে শহরের বাড়ী কিভাবে তোলে ?

আপনে ওনার লগে ভিতরে গিয়া ঘর দেইখা লেনদেন চুকাইয়া আসেন।

দেবানন্দ বলে, চলেন যাই।

জ্ঞানেন্দ্র এবার চটে বলে, আগেই বলেছিলাম বাড়িতে ঢুকতে দিতে পারব না। এখন আবার এসব কি বলছেন ?

পিছনের সিট থেকে শোভার মা বলে, উনি একলা যাইবেন—আমরা মালপত্র নিয়া গাড়িতে থাকুম।

জ্ঞানেন্দ্র আরও চটে বলে, ওসব হবে না। ভাড়া দেবেন তো দিন, নইলে পথ দেখুন।

শোভার মা এবার সোজাসুজি তার সঙ্গে কথা বলে চটেন ক্যান ? ঘর ভাড়া দ্যাওন তো চুরি চামারি গোপন ব্যাপার না ? পাঁচজনের নিয়া কারবার। আপনার বলেন, আমি ভিতরে গিয়া দুই চারজনেরে ডাইকা আনি। তাগো সামনে লেনদেন হইব।

আগে এসব কথা বললেই হত ? মিছামিছি এত হাঙ্গামা করার দরকার কি ছিল ?

বলতে বলতে গাড়ীর দরজা খুলে জ্ঞানেন্দ্র নেমে যায়।

আপনাদের ঘর ভাড়া দেব না। যে চুলোয় খুশি যান।

বলতে বলতে সে লম্বা লম্বা পা ফেলে ফুটপাতে হাঁটতে শুরু করে—নিজের বাড়ীতে ঢোকে না।

শোভার মা গাড়ীর বাইরে মুখ বার করে বলে শোনেন, শোনেন ? শুইনা যান ?

পাশে গলি পেয়ে জ্ঞানেন্দ্র তার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

গাড়ীর সামনে ফুটপাতের পথিক কয়েকজন দাঁড়িয়ে যায়। তিনতলা বাড়ীর নীচের দোকান থেকে দুতিনজন বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে, ব্যাপার কি ? কি হয়েছে ?

দেবানন্দকে একান্তভাবে ভড়কে যেতে দেখে শোভার মা তাদের প্রশ্নের জবাবে স্পষ্ট স্বাভাবিক গলায় বলে, কিছু হয় নাই। একটা ঠিকানা খুঁজিতেছি আমরা। এইডা কি জ্ঞানেন্দ্রবাবুর বাড়ি ?

তিনতলা বাড়ীর নীচের দোকান ঘরের একটি যুবক কর্মচারী বলে, না। এটা শেঠ জগৎশ্যামের বাড়ী। তবে এখানে অনেক ভাড়াটে থাকে—তাদের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্র হয়তো থাকতে পারেন কেউ। আপনারা যদি একটু অপেক্ষা করেন—

শোভার মা মফস্বলের তেজে ফোঁস করে ওঠে, মজা কীসের ? এত বড়ো পৃথিবীতে মাথা গোঁজনের ঠাঁই পামু না ? ঠাঁই আদায় কইরা নিমু।

পৃ ৪৮ ৫০

তাদের সাহায্য করার জন্য শ্রমক্লিষ্ট রোগা ছেলেটির আন্তরিক আগ্রহ শোভার মার দুচোখে গভীর স্নেহ ঘনিয়ে আনে।

না বাবা, আমাগো ঠিকানা ভুল হইছে।

দেবানন্দকে সে বলে আমার বাড়ীর ঠিকানায় যাইতে কন ড্রাইবভারবে। এহানে দাড়াইয়া ভীড় বাড়াইয়া কাম নাই।

আমার বাড়ী! এক যুগ চোখে না দেখলে কি আসে যায়, শোভার মা কলকাতার একটা বাড়ির অন্ততঃ অর্ধেকটার মালিক।

বাড়ীটা গলির মধ্যে। ট্রামও চলে না, বাসও চলে না। মোটরের ভীড় নেই। তবে মানুষ চলে দু'মুখী স্রোতের মত। খালে যেমন টের পাওয়া যায় নদীতে কেমন বন্যা, গলিতেও তেমনি টের পাওয়া যায় শহরে মানুষের কেমন ভীড়।

আশেপাশে কয়েকটা বাড়ীতে রেডিও বাজছে, কিছু তফাতে একটা চায়ের দোকানে লাউড স্পীকার। সঙ্গীত ও সজ্জাতে সমস্ত পাড়াটা যেন গম গম করছে। গেঁয়ো কীর্তনের আসর যেন শহুরে বিরাটত্বের কাঁপন পেয়েছে, সুস্থ মানুষের মাথা ধরে যায়। মাথা যাদের ধরবেই থাকে বার মাস তাদের মাথার রোগ সারে কিনা বলা শক্ত।

সদর দুয়ার খোলাই ছিল। মালপত্র নিয়ে তাদের গাড়ীটা সবে বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়েছে এবং দেবানন্দ গাড়ী থেকে নেমেছে, শোভার মার অচেনা একজন লোক খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে এক নজরে তাদের দেখে ভেতর থেকে দরাম করে দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

দেবানন্দ কড়া নাড়ে। কেউ সাড়া দেয় না।

শোভার মা গাড়ী থেকে নেমে বলে, নাম ধইরা ডাকেন।

দেবানন্দ গলা ছেড়ে হাঁকে, গজেনবাবু! ও গজেনবাবু!

খানিক ডাকাডাকির পর শোভার জ্যাঠা বেরিয়ে আসে—দরজার একটি পাট যতটা দরকার ঠিক ততটুকু ফাঁক করে। বাইরে এসে হাত দিয়ে দরজার পাটটি সে সযত্নে বন্ধ করে দেয়। বয়স তার ষাটের কাছাকাছি, তবু দেহটি বেশ মজবুত।

ভাইঝি ও তার মাকে অভ্যর্থনা জানায়, অপরূপ, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, কি ব্যাপার? তোমাগো না আইতে বারণ করছি?

শোভার মা বলে, না আইসা আমাগো উপায় ছিল না।

এখন কি উপায় করবা? বাড়ীতে যায়গা নাই।

কি কথা কন, যায়গা নাই? এতকাল নিজেরা ভোগ দখল করছেন, আইজ বিপদে পইড়া আইছি, আমাগো ঘরে উঠতে দিবেন না?

সাধ কইরা দিমু না ? উঠবা কই ? একখান—আধখান—সিকিখান ঘব খালি নাই ! বাবান্দাটুকু ঘিরা নিয়া আমরা মাথা গুঁইজা আছি সাতজনে।

ওই সরু বারান্দায় ?

শোভার মা বোধ হয কি বলবে ভেবে পায় না। তাই চুপ করে থাকে। দেবানন্দ জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু ব্যাপারটা কি ? ঘর নিছে কারা ?

গজেন বলে, ঘর কারা নেয় ? ভাড়াটেরা নিছে।

জোর কইরা নিছে ?

গজেন কথা কয় না। মাথা চুলকাতে চুলকাতে এদিক ওদিক তাকায়।

শোভাব মা বলে, কি কন ? ব্যাপারটা খুইলা কন ? মাথামুন্ডু বুঝলাম না কিছু।

ব্যাপাবটা তাদের বুঝিয়ে দেবার জন্যই যেন বাড়ীর সদর দরজা খুলে জন দশেক লোক ভীড় কবে পথ বন্ধ করে দাঁড়ায।

একজন বলে, গজেনবাবু, কি মতলব ? মতলবটা কি আপনার ? আরেকজন বলে, আবও যদি ভাডাটে ঢোকান বাড়ীতে, আপনাকে আস্ত বাখব না বলে দিচ্ছি।

গজেন কাতবকণ্ঠে বলে, ভাড়াটে না, আমাব ভাইযেব বৌ আর ভাইঝি। এই ভদ্রলোক ওদের দুজনেবে পৌঁছাইয়া দিতে আসছেন।

দরজা থেকে একজন বলে, ওসব চালাকি চলবে না মশায়। আত্মীয় হোক ভাডাটে হোক একটা মানুষকে আমবা বাড়ীতে ঢোকাতে দেব না। ইযার্কি পেয়েছেন ? দম আটকে অসুখ করিয়ে আমাদের সবাইকে মাববাব ফিকিবে আছেন ?

আরেকজন বলে, কি মানুষরে বাবা ! এইটুকু বাড়ীতে এতগুলি ভাডাটে বসিয়েছে, সিঁড়িব নীচেটা পর্যন্ত ভাডা দিয়েছে, আবও ভাড়া ঢোকাতে চায় !

শোভার মা খানিকক্ষণ থ' হয়ে থেকে ঝাঁঝালো সুবে প্রশ্ন করে, এত ভাড়াটে বসাইছেন ক্যান ?

গজেন মাথায হাত বুলাতে বুলাতে বলে, ক্যান বসাইছি ? কি কমু কও ? শুধু পোলাটার বোজগার ছিল, কাম থেইকা ছাটাই কবছে। ভাডাটে না বসাইয়া ভাতকাপড পামু কই ? কে দিব ?

পৃ ৪৭-৪৮

আর না কান্না

দাশগুপ্ত জ্যোতিবাবুর সাত বছবের ছিঁচকাঁদুনে মেযেটা মাইরি আমায় অবাক করেছে। যেমন মা-বাবা তেমনি মেয়ে। হ্যাঁ মশাই হ্যাঁ, ওই যে পরিচয় নামে কাগজটা মরেও মরে না, মর মর হয়েও ফের ভোল বদলে নতুন হয়ে বেরোয়, তাতে যে গল্পটা ছাপা হয়েছে, সেই গল্পের কান্না গল্পেব সাত বছরের ছিঁচকাঁদুনে মেয়েটা মাইরি আমায় অবাক করেছে। যেমন মা-বাবা, তেমনি মেয়ে। শুধু কান্না আর কান্না।

মা রচনাসমগ্র-৯ পৃ ৬৬

ওই আহ্লাদী মেয়েটাব কথা বলছি- -যার শুধু কান্না আর কান্না। পবিচয, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮, পৃ ৫৫	
যেন বৃটি কাউকে মেরে.. পৃ ৫৫	যেন এক দিস্তে বৃটি গবিবদের মেরে... পৃ ৬৬
নাঃ, এবেলা রুটি হবে না। শুধু এবেলা নয়, এ হপ্তাব বাকী কটা দিন আর রুটি পাবে না কেউ, পৃ ৫৬	শুধু এ বেলা নয, এ হপ্তার বাকি ক-টা দিন আর রুটি পাবে না কেউ, পৃ ৬৬
তারা এখনো ভাবজগতের চিকন থিয়োরিব মানে বোঝেনি। এক ধমকে তারা থেমে যায়। পৃ ৫৬	তাবা এখনও ভাবজগতের মায়া একেবারে কাটিয়ে উঠে বাস্তব জগতেব কঠোরতা সম্পূর্ণ মানতে পারেনি। এখনও বুকে আশা নিয়েই আবদার করে। তবে এক ধমকে তারা থেমে যায়। পৃ ৬৭
খাদ্যে মেটে না ক্ষয়ের পূরণ... পৃ ৫৭	খাদ্যে মেটে ক্ষয়ের পূরণ.. পৃ ৬৭
..মা হওয়া কি মুখের কথা ! পৃ ৫৮	. .মা হওয়া কি মুখের কথা ! বাপ হওয়া কি সহজ কাজ ! পৃ ৬৮
...বাড়তি শক্তি ক্ষয় করা নয়। যে ঝিমোতে চায় না পিছোতে চায় না সে ছাই বোঝে লড়ায়ের কায়দা ? পৃ ৫৯	..বাড়তি শক্তিক্ষয় করা নয় পৃ ৬৮
.. সুমিষ্ট আদব। পৃ ৫৯	...সুমিষ্ট আদর। অবশ্য অবস্থাটা এ বকম বলে। পৃ ৬৮

'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বনির্বাচিত গল্প' বা লেখকের জীবিতকালে প্রকাশিত জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত শ্রেষ্ঠ গল্পে ফেরিওলা-র কোনো গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়নি। পরে যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত ১৩৬৩ সালের জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থের নতুন সংস্করণে আর না কান্না গল্পটি অন্তর্ভুক্ত হয়।

আরোগ্য

'আরোগ্য' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুশ্চত্বারিংশ সংখ্যক মুদ্রিত গ্রন্থ এবং ষড়্‌বিংশতিতম উপন্যাস। উপন্যাসটির প্রকাশকাল জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০, [মে-জুন ১৯৫৩] প্রকাশক ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিঃ, কলকাতা ; পৃ ৪ + ১৮৪, মূল্য তিন টাকা। প্রচ্ছদশিল্পী মণীন্দ্র মিত্র।

লেখকের জীবনাবসানের (১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৬৩) অব্যবহিত পরেই পৌষ ১৩৬৩-তে আরোগ্য-র দ্বিতীয় সংস্করণ বা পরবর্তী মুদ্রণ প্রকাশিত হয়, প্রকাশক ক্যালকাটা বুক ক্লাব প্রাইভেট লিঃ, পৃষ্ঠা, মূল্য ও প্রচ্ছদ অপরিবর্তিত। এই সংস্করণে আখ্যাপত্রের পূর্বপৃষ্ঠার উপরে দক্ষিণ দিকে লেখকের একটি চিত্র সংযোজিত হয়, তার নিম্নে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭—অগ্রহায়ণ ১৩৬৩, জন্ম-মৃত্যুর এই মাস বৎসরের উল্লেখ আছে। উপন্যাসটির পরবর্তী নব সংস্করণের প্রকাশকাল শ্রাবণ ১৩৬৩, প্রকাশক বুক সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, কলকাতা। এই সংস্করণের পৃষ্ঠা ৪ + ১৩৬, মূল্য সাড়ে তিন টাকা, প্রচ্ছদশিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, অলংকরণ করেন পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়।

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে আরোগ্য কোনো সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায় না। ১৯৫২ সালের প্রথম দিকে লিখিত ডায়েরিতে আরোগ্য উপন্যাসের প্লট সম্পর্কে লেখকের কিছু পূর্ব প্রস্তুতিবাচক তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা :

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরিতে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তিনি উপন্যাসটি ক্যালকাটা পাবলিশার্সের ক্ষিতীশ সরকারের অনুরোধে ১৯৫৩ সালের পুজোর আগেই সম্পূর্ণ করে ছাপার জন্য তাঁকে দিয়ে দেন। যদিও লেখকের অভিপ্রায় ছিল পুজোর পরে সেটি সম্পূর্ণ কবার। দারিদ্র্য ও অসুস্থতার আক্রমণের মধ্যেই উপন্যাসটি লিখে শেষ করেন তিনি। ১৯২৯ সালে (ভাদ্র ১৩৩৬) বিচিত্রা পত্রিকায় ব্যথার পূজা নামে তাঁর একটি ছোটোগল্প প্রকাশিত হয়। উক্ত ঘটনার তেইশ বছর পরে উপন্যাসের নতুন এক সূত্রপাতের ফলেই তেইশ বছর আগে পরে শীর্ষক এই গ্রন্থ লিখিত হয়। সুতরাং ব্যথার পূজা গল্পটিই বর্তমান উপন্যাসের উৎস ও উপকরণ। ১৯৩৫ সালে প্রথম গল্পগ্রন্থ অতসী মামী প্রকাশের সময়ে ব্যথার পূজা-কে কেন তিনি বাদ বেখেছিলেন, উপন্যাস সূচনায় লেখক তার কৈফিয়ত স্বরূপ বলেছেন :

> তেইশ বছব আগে ছাত্রজীবনে একটি কবুণ কাহিনি বচনা কবেছিলাম। 'অতসীমামী' নিয়ে গল্প লেখা শুবু কবাব পব এটি আমাব দ্বিতীয় লেখা। কাহিনিটি প্রকাশিত হয়েছিল বিচিত্রায। সম্পাদকেবা নূতন লেখকেব বসালো গল্পও স্বেচ্ছায খুশি হয়ে ছাপেন বন্ধুদেব সঙ্গে বাজি বেখে এটা প্রমাণ কবাব জন্য লেখা 'অতসীমামী' বাব হবার পব বিচিত্রা-সম্পাদক শ্রদ্ধেয উপেনদাব তাগিদ আব উৎসাহেই দুনম্বব কাহিনিটি লেখা হয়। 'অতসীমামী'ও কবুণ বসে ফেনানো কাহিনি। পবে এই কাহিনিটিব নাম দিয়ে গল্পসংকলন বাব কবতে আমাব দ্বিধা হয়নি। কাবণ, বস যাই থাক, যতই বোমান্টিক হোক, ওটা ছিল সম্পূর্ণ গল্প। ওই কাহিনি সংকলনেব মধ্যে 'অতসীমামী'ব পবেই 'ব্যথাব পূজা'কে ঠাঁই দেবাব লোভ সামলাতে নিজেব সঙ্গে কী লড়াইটাই কবতে হয়েছিল অনভিজ্ঞ তবুণ লেখক আমাকে। এ তো গল্প নয়। এ যে অসম্পূর্ণ কাহিনি। মাসিকেব পাতায জীবনেব খণ্ডিত একপেশে অসম্পূর্ণ কাহিনি ছাপানোব ছেলেমানুষিব জেব তো গল্পসংকলনে টানা চলে না। কাহিনিটিকে সম্পূর্ণতা দেবাব দায়িত্বই কেবল নয়, বাস্তবকে ফাঁকি দিয়ে আব সত্যকে আড়ালে বেখে কীভাবে ফেনিল ভাবালুতাব গল্প লেখা যায সেটা দেখিয়ে দিয়ে সাহিত্যে 'ব্যথাব পূজা'ব নজিব বাতিল কবাব দাযিত্বও আজ তেইশ বছব পবে পালন কবছি।
>
> দু-একটি সামান্য ভুল-ত্রুটি সংশোধন কবে বিচিত্রায প্রকাশিত অসম্পূর্ণ কাহিনিটি অবিকল তুলে দিয়ে আমাদেব উপন্যাস আবম্ভ কবা যাক
>
> মা বচনাসমগ্র ৯ পৃ ২২৯

এইভাবে ব্যথার পূজা গল্পটিকে প্রায় অপরিবর্তিত রেখেই তেইশ বছব আগে পবে উপন্যাসেব সূত্রপাত। তাবপর গল্পটির মধ্যে নিহিত সূত্রগুলির সম্প্রসারণে কাহিনিব পুনর্বিন্যাস ঘটানো হয়েছে। এই অভিনব শৈলীর পরীক্ষাগত কারণেই উপন্যাসটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। লেখকেব অন্যান্য একাধিক বচনায যেমন, এই উপন্যাসেও ধর্ম ও নেশা এতদুভয় বিষয়ে লেখকের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ দেখা যায়।

উপরিউদ্ধৃত সূচনা-অনুচ্ছেদে অতসী মামী নিয়ে গল্প শুবু কবার পব বিচিত্রায় প্রকাশিত ব্যথাব পূজা গল্পটিকে লেখক 'এটি আমার দ্বিতীয় লেখা' বলেছেন। তথ্যগতভাবে অবশ্য মন্তব্যটি নির্ভুল নয়। অতসী মামী ও পরবর্তী গল্পগুলির প্রকাশকালীন তথ্য নিম্নবূপ :

অতসী মামী	বিচিত্রা	পৌষ	১৩৩৫	(অতসী মামী গল্পসংকলন)
শেষ মুহূর্তে	গল্পগুচ্ছ (মাসিক পত্রিকা)	মাঘ	১৩৩৫	(অগ্রন্থিত)
বকমাবি	মানসী ও মর্মবাণী	বৈশাখ	১৩৩৬	(মিহি ও মোটা কাহিনি গল্পসংকলন)
নেকী	বিচিত্রা	আষাঢ়	১৩৩৬	(অতসী মামী গল্পসংকলন)
ব্যথাব পূজা	বিচিত্রা	ভাদ্র	১৩৩৬	(অগ্রন্থিত)

আরোগ্য উপন্যাসের উপাদান থেকে লেখক যেমন একাধিক ছোটোগল্প নির্মাণ করেছেন (আরোগ্য উপন্যাসের গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য), তেমনই তেইশ বছর আগে পরে উপন্যাস থেকেও দুটি গল্পের উপাদান পেয়েছিলেন লেখক। দুটি গল্পই অগ্রন্থিত। কোনো সংকলনে এ যাবৎ অন্তর্ভুক্ত হয়নি। প্রথমটির নাম অগ্নিশুদ্ধি, প্রকাশিত হয় গল্পভারতী ১৩৬০ শারদীয় সংখ্যায় এবং দ্বিতীয়টি রত্নাকর, প্রকাশিত হয় মুখপত্র নামক একটি পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ ১৩৬০ শারদীয় সংখ্যায়। মানিক রচনাসমগ্রের পরবর্তী সংযোজন খণ্ডে উক্ত অগ্রন্থিত গল্পগুলি অন্তর্ভুক্ত হবে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক রচনায় পাত্রপাত্রীর নাম বা বর্ণনার ক্ষেত্রে লেখকের কিছু অনবধানতাজনিত অসংগতির প্রতি কোনো কোনো সমালোচক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তেইশ বছর আগে পরে উপন্যাসেও এই জাতীয় কয়েকটি অসংগতির উল্লেখ করেছেন সরোজ দত্ত তাঁর ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থে। যেমন কাহিনির শুরুতে জগদীশ সম্পর্কে লেখক লিখেছেন, 'জন্মেই মা-কে হারিয়েছিল'। অথচ কিছু পরে জগদীশের শৈশব-বর্ণনায় বলা হয়েছে 'মা-কে জড়িয়ে ধরে শুত জগদীশ। মা-ও তাকে জড়িয়ে ধরে শুত' এবং 'শুধু এভাবে শোওয়া নয়, ঘুমের ভান করে সে মা-বাবার কথোপকথন শুনত, যা থেকে রসদ সংগ্রহ করে পরবর্তীকালে জগদীশ পিতৃচরিত্র ব্যাখ্যা করেছে' (দ্র ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৯৫)। অধ্যাপক দত্ত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, জগদীশের পিতা ধূর্জটির যে সম্পত্তি-প্রাচুর্যের উল্লেখ করেছেন লেখক উপন্যাসের নানা স্থানে, তার সঙ্গে 'ধূর্জটির ঋণ পাহাড়প্রমাণ' এই বিবৃতির সামঞ্জস্য মেলে না। অধ্যাপক দত্ত সঠিকভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন, এত সম্পদের অধিকারী হয়েও পিতৃশ্রাদ্ধে জগদীশকে তালুক বিক্রি করতে এবং বন্ধক দিতে হল কেন (দ্র তদেব, পৃ ৯৫) ? আবার ধূর্জটির শ্রাদ্ধের দিন জগদীশ তার 'যথাসর্বস্ব দান করেছে' বলে লেখক জানিয়েছেন। এই 'যথাসর্বস্ব' দানের পরেও তার আছে লাখ টাকা দামের বাড়িঘর বিষয়-আশয়, পঞ্চাশ-ষাট হাজার লগ্নি-করা টাকা, লাখ দেড়েক টাকার বিমা এবং তার মায়ের ত্রিশ হাজার টাকার অলংকার। তাই অধ্যাপক দত্ত সংগতভাবে প্রশ্ন করেছেন, 'যথাসর্বস্ব কথাটার মানে কী' (দ্র তদেব, পৃ ৯৫)।

এই জাতীয় আরও কিছু তথ্যগত বা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ অসংগতি মনোযোগী পাঠকের নজরে আসতে পারে। অধ্যাপক সরোজ দত্ত তাঁর ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থে এরকম আরও কয়েকটি উদাহরণের উল্লেখ করেছেন (দ্র তদেব, পৃ ৯৪-৯৭)।

লাজুকলতা

'লাজুকলতা' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সপ্তচত্বারিংশ সংখ্যক মুদ্রিত গ্রন্থ এবং ষোড়শতম ও সর্বশেষ গল্পসংকলন।

লাজুকলতা-র প্রকাশকাল কোজাগরী পূর্ণিমা ১৩৬০, [অক্টোবর ১৯৫৩], প্রকাশক রীডার্স কর্নার, কলকাতা ; পৃ ৪ + ১৬০, মূল্য আড়াই টাকা ; প্রচ্ছদশিল্পী শ্রীসুমুখ মিত্র।

লাজুকলতা গল্পগ্রন্থের মনীষা গ্রন্থালয়-কৃত পেপারব্যাক সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র
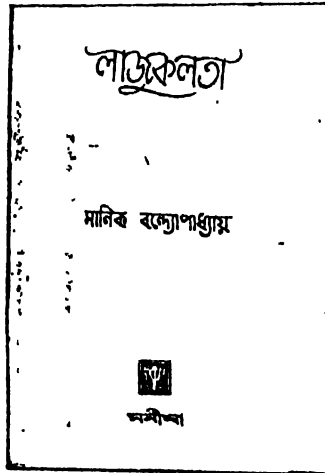
প্রথম সংস্করণের কিছু অবিক্রিত কপি, নতুন আখ্যাপত্র এবং প্রচ্ছদসহ, শক্ত মলাটের পরিবর্তে পেপারব্যাক সংস্করণরূপে মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা-র পরিবেশনায় বিক্রয়ার্থে প্রকাশ করা হয়েছিল। বইটির বর্ধিত মূল্য হয় ছয় টাকা—প্রকাশকাল একই ; প্রচ্ছদশিল্পীর কোনো উল্লেখ নেই।

লাজুকলতা সংকলনে প্রথম সংস্করণে মোট ষোলোটি গল্প ছিল। গল্পগুলি যথাক্রমে : লাজুকলতা, উপদলীয়, এদিক ওদিক, এপিঠ ওপিঠ, পাশ ফেল, কলহান্তরিত, গুন্ডা, বাহিরে ঘবে, চিকিৎসা, মীমাংসা, সুবালা, অসহযোগী, আপদ, স্বাধীনতা, নিরুদ্দেশ এবং পাষণ্ড।

এতাবৎ-প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী গ্রন্থভুক্ত কয়েকটি গল্পের পত্রপত্রিকায় পূর্ব-প্রকাশেব সূত্র পাওয়া গেছে :

অসহযোগী	সপ্তডিঙা (ছোটোদেব বার্ষিক সংকলন)		১৯৪৬
উপদলীয়	ইস্পাত	(?)	১৩৫৭
পাশ ফেল	আজকেব ছোটগল্প	শাবদ	১৩৫৮
পাষণ্ড	শাবদশ্রী	শাবদ	১৩৫৮
কলহান্তবিত	চতুষ্কোণ	(?)	১৩৫৮
বাহিরে ঘবে	গল্প-ভাবতী	জ্যৈষ্ঠ	১৩৫৯
লাজুকলতা	হিমাদ্রি	শাবদ	১৩৫৯
এদিক ওদিক	সত্যযুগ	শাবদ	১৩৫৯
চিকিৎসা	সচিত্র ভারত (সাপ্তাহিক)	শাবদ	১৩৫৯
মীমাংসা	দেশ	শাবদ	১৩৫৯
সুবালা	চতুষ্কোণ	শাবদ	১৩৫৯
এপিঠ ওপিঠ	মঞ্জবী	(?)	১৩৫৯
নিবুদ্দেশ	মঞ্জবী	(?)	১৩৫৯
গুণ্ডা	(?)	(?)	
আপদ	(?)	(?)	
স্বাধীনতা	(?)	(?)	

ফেরিওলা গ্রন্থেব আলোচনায় ইতিপূর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধজাতীয় লেখার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হয়েছে, যেখানে লেখক বলেছিলেন, 'প্রত্যেক উপন্যাসেই একাধিক গল্পের উপাদান এবং সংকেত কম বেশি থাকে'। সেই সূত্রানুযায়ী লাজুকলতা সংকলন-ভুক্ত মীমাংসা পাশাপাশি উপন্যাস থেকে, চিকিৎসা আরোগ্য উপন্যাস থেকে, বাহিরে ঘবে এবং পাষণ্ড সার্বজনীন উপন্যাস থেকে গৃহীত।

'উপন্যাস থেকে গৃহীত' অর্থে গল্পগুলি সংশ্লিষ্ট উপন্যাসের অংশবিশেষের পুনর্মুদ্রণ নয়। সার্বজনীন উপন্যাসের প্রথম পর্বের সঙ্গে 'বাহিরে ঘরে' গল্পের ঘটনা ও সংলাপে অংশত মিল থাকলেও গল্পটি সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র গল্প হয়ে উঠেছে। উক্ত উপন্যাসে বর্ণিত পরমেশ্বর ও সুরঞ্জন চরিত্রদ্বয় গল্পে সদনন্দ ও রঞ্জন নামে উল্লিখিত। গল্পের পরিণতি ও আবেদন উপন্যাসের তুলনায় ভিন্ন। লাজুকলতা-র পাষণ্ড অবশ্য সার্বজনীন উপন্যাস থেকেই বহুল পরিমাণে গৃহীত। মানিক রচনাসমগ্রের অষ্টম খণ্ডে মুদ্রিত সার্বজনীন উপন্যাসের ১৮২-১৮৯ পৃষ্ঠাভুক্ত সমীরের কাহিনিই এখানে গল্পরূপ লাভ করেছে। কেবল উপন্যাসের সুরমা চরিত্রের নামকরণ গল্পে হয়েছে রাধা। ঘটনার বিবরণ সংহততর হয়েছে মাত্র, কিন্তু মৌলিক পরিবর্তন নেই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পসম্ভারে একই নামে একাধিক গল্পের সাক্ষাৎ মেলে। লাজুকলতা-য় গুণ্ডা নামে একটি গল্প আছে। সমুদ্রের স্বাদ সংকলনেও একই নামে আর একটি গল্প আছে (দ্র মা রচনাসমগ্র-৪ পৃ ১১৫-১৯)। কিন্তু দুটিই স্বতন্ত্র গল্প। অনুরূপ লাজুকলতা সংকলন-ভুক্ত

আপদ গল্পটিব নামে মাটিব মাশুল গ্রন্থেও (দ্র মা বচনাসমগ্র-৬ পৃ ২৫০-৫৩) একটি গল্প আছে। গল্পদ্বযেব প্রথমাংশ প্রায এক হলেও শেষাংশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এতদভিন্ন পবিচ্ছেদ বিভাজন ও পবিণাম ভেদে আবেদনেব সুস্পষ্ট পার্থক্য ঘটেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যাযেব ডাযেবি তে Aug '51 চিহ্নিত পৃষ্ঠায উল্লিখিত কযেকটি গল্পেব প্লট-সংক্রান্ত তথ্য-সংকেতে লাজুকলতা ভুক্ত কযেকটি গল্পেব উল্লেখ আছে

Aug 51

পাশ ফেল

একটি মেযে—সে ছেলেব সঙ্গে ভাব সে ফেল কবল আব পড়তে পাবে না—তাব ভাই পাশ কবল কিন্তু বাপেব পড়াবাব সঙ্গতি নেই পাশ কবা ছেলেটি মনেব দুঃখে আত্মহত্যা কবল –

প্লট পাষণ্ড

পাষণ্ড জামাই দেখা কবতে এল শ্বশুববাড়ী—স্ত্রী দেখা কবল না—কিছুদিন পবে চিঠি—সব অন্যায ক্ষমা কবিও—ষ্টেশনে পডিযা আছি

Plot

লাজুকলতা

লাজুক বৌ- স্বামী ছাঁটাই—বাপেব বাড়ীব বদলে আপিসেব কর্তাব বাড়ীতে—চাকবী না দিলে তাদেব পুষতে হবে।

বাক্স বিছানা ছেলে নিয়ে যাবে

তোমাব স্বামীকে পাঠিযে দাও গিযে ?

আপনাব লোক নেই ? লোক দিযে ডেকে পাঠান

(দ্র অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায পৃ ১৫৪ ৫৫)

এছাড়া লেখকেব বিভিন্ন ডাযেবিব একাধিক পৃষ্ঠায লাজুকলতা ব গ্রন্থপ্রকাশ সংক্রান্ত চুক্তিবাবদ এবং কযেকটি গল্পেব পত্রিকায প্রথম-প্রকাশকালীন সম্মান দক্ষিণা প্রাপ্তি ইত্যাদি সংক্রান্ত কিছু তথ্য এবং প্রাসঙ্গিক সম্পাদকীয নির্দেশপঞ্জিব জন্য অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায দ্রষ্টব্য (দ্র তদেব পৃ ১৪৬, ১৬৯, ১৭৫, ১৮৯, ১৯০, ১৯৩, ৩৮৪, ৩৮৭, ৩৮৮ ৩৯৩, ৩৯৫)।

লাজুকলতা-ব কযেকটি গল্পেব সামযিক পত্রিকায প্রকাশিত পাঠেব সঙ্গে গ্রন্থেব পাঠেব যথেষ্ট পবিবর্তন লক্ষিত হয। যে কযেকটি গল্পেব পত্রিকায প্রকাশিত পাঠ পাওযা সম্ভবপব হযেছে, সেগুলিব সঙ্গে গ্রন্থভুক্ত পাঠেব পবিবর্তন-পবিবর্জনেব কিছু নমুনা সংকলিত হল। এছাড়াও ছোটোখাটো শব্দগত পবিমার্জনা আবও বহুক্ষেত্রে লক্ষ কবা যায, কিন্তু সেগুলি উল্লিখিত হযনি।

বাহিরে ঘরে

পত্রিকাব পাঠ	গ্রন্থধৃত পাঠ
বিলাতী ব্রাশেব সাহায্যে দাঁত মাজতে মাজতে বূপক প্রায সকালে সামনে এসে পথ আটকে দাঁড়ায। গল্পভাবতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯, পৃ ১৫৩৫	বিলাতি ব্রাশেব সাহায্যে দাঁত মাজতে মাজতে সে সামনে এসে পথ আটকে দাঁড়ায। মা বচনাসমগ্র-৯ পৃ ৩৬৩
কিন্তু চটবাব উপায তো তাব নেই। সে কখনো তাব গাযেব জ্বালা প্রকাশ পায না বলে, অনোব বিপদ আপদ পর্যান্ত হাসিমুখে উদাস নিবপেক্ষ সর্বত্যাগীব মত উড়িযে	কিন্তু চটবাব তো তাব উপায নেই। সে কখনও চটে না বলে, সব সময হালকা হাসি তামাশা নিযে সকলেব সঙ্গে ইযাবকি ফাজলামি কবে জীবনে দুঃখদুর্দশাব দিকটা তুড়ি

দিতে পাবে বলে, লোকে তাকে এত পছন্দ কবে। তাকে দেখেই খুসী হয়।

কোনদিন কেউ তাকে চিন্তিত দেখেছে স্মবণ কবতে পাবে না। শোক-দুঃখ দুশ্চিন্তাব ধাব যেন সে ধাবে না, মানেও যেন সে বোঝে না বিষাদ বেদনাব। চল্লিশ বছব সংসাবে বেঁচে থেকে কি কবে মুখ ভাব কবতে হয় এটা সে যেন শেখেনি। দুঃখেব মেঘেব ছায়াটুকু কখনো মুখে সঞ্চাব কবা যেন তাব পক্ষে অসাধ্য কাজ।

কতগুলি জড পদার্থ বিদ্যুৎ তাপ এসবেব চলাচল সম্পূর্ণ প্রতিবোধ কবে। কতগুলি পদার্থ আবাব চল্লিশ বছব জলে ভিজিয়ে বাখলেও একটু সেঁতসেঁতে পর্যন্ত হয় না —সাধাবণ জলেব বদলে খাঁটি চোখেব জল প্রযোগ কবলেও নয।

তাব ধাতটা যেন গডে উঠেছে দুঃখ শোক ব্যথা বেদনাব প্রতিবোধক মাল মশলা দিযে। সব সময হাসি আনন্দ তামাসা ভাঁডামিব ওযাটাব প্রুফধর্মী আ . নে এমনভাবেই যেন তাব হৃদয ঢাকা যে জগতে নিবানন্দেব বর্ষা আছে এটা সে টেবও পায না।

হৃদয় মন নয ওভাবে ঢাকা আছে—দেহটা ? শবীবে আঘাত পেলে অথবা খুব যন্ত্রণাদাযক ব্যাবাম হলে সে কি কবে জানতে এমন ইচ্ছা হয চেনা মানুষগুলিব।

তাবা বলাবলি কবে একদিন পাযে একটা মোটা ছুঁচ ঢুকিযে নয তো ছুবি দিযে একটা আঙুল কাটাব চেষ্টা কবে দেখলে হয লোকটা খাঁটি না আমাদেব ভাঁডাচ্ছে।

বুদ্ধিমানেবা বলে, কি বুদ্ধি তোমাদেব।

পৃ ১৫৩৬

মেবে উডিযে দেয বলে অনেকে তাকে বীতিমতো হিংসা কবে। এ তো সহজ ক্ষমতা নয আজকেব দিনে একটা সংসাবি মানুষেব পক্ষে।

সে তাই ভাঁডামিব সুবেই বলে, সহজে কি হতে পেবেছি যে ভাই। ভাঁডামিব পবীক্ষায ফেল কবতে কবতে বেটাব ভাঁড হযেছি।

গোপালেব মুখ লাল হযে যায কিন্তু অন্য সকলে হাসে।

লোকে সত্যই আশ্চয হযে যায। যে দিনকাল, যে অবস্থা মানুষেব সামান্য উপার্জনে সংসাব চালিযেও কী কবে সদানন্দ জীবনটা এমন হালকাভাবে নিতে পাবে। কেউ কেউ বলে, পাযে একদিন ছুঁচ ফুটিযে দেখলে হত ব্যথায মুখ বাঁকায কি না।

বুদ্ধিমানেবা বলে, কী বুদ্ধি তোমাদেব।

পৃ ৩৬৩

সদানন্দ গম্ভীব হযে বলে, এখানে আবও মহিলা উপস্থিত আছেন, তাবা কিন্তু বাগ কবেন নি।

সদানন্দ শুধু হাসায না, দবকাব হলে খোঁচাও দিতে পাবে।

পৃ ১৫৪০

সদানন্দ গম্ভীব হযে বলে এখানে আবও মহিলা উপস্থিত আছেন তাবা কিন্তু বাগ কবেননি।

পৃ ৩৬৫

দেখেই বোঝা যায পেট চালাবাব জন্য তাবা ঝি গিবি ধবণেব কাজ কবে।

পৃ ১৫৪০

দেখেই বোঝা যায পেট চালাবাব জন্য তাবা ঝি গিবি ধবনেব কাজ কবে।

এবাব কেউ শব্দ কবে হাসে না, নীবব হাসিই সকলেব মুখে খেলে যায। রেণুকাব মুখ হযে যায আবও লাল।

পৃ ৩৬৫

নেশা ছেডে গেলে প্রায়ই সে বাডীতে একটা হৈ চৈ হট্টগোল সৃষ্টি কবে।

পৃ ১৫৪১

নেশা বেডে গেলে প্রাযই সে বাডিতে একটা হইচই হট্টগোল সৃষ্টি কবে।

সদানন্দ নিজেব মুখে হাত চাপা দেবাব ভঙ্গি কবে বলে, আর না, এবাব এই মুখ বন্ধ কবলাম, একেবাবে বাডি গিয়ে খুলব। আব একটি কথা নয়। একটা শব্দ যদি আব উচ্চাবণ কবি, নিজেব মাথা খাব।

একটু পরেই বলে, দেখলেন তো মশাইরা, ভদ্রলোকের এক কথা। বলেছি মুখ বন্ধ, আর কি আমি কথা কই।

মুখ থেকে হাত সরিয়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, দুত্তোর! কত কথা বলে ফেললাম। ভদ্রলোকের এক কথা নিজের মাথাটা এখন আমি খাই কী করে? নাগাল পাব না যে!

পৃ ৩৬৫-৩৬৬

শুনলাম দু'মাসের ভাড়া বাকী পড়েছে আপনার। আপনি যদি বাজী থাকেন, দু'মাসের ভাড়াটা দিয়ে আমি ঘর দু'টো নিয়ে নিতে পারি।

পৃ ১৫৪৩

শুনলাম দুমাসের ভাড়াটা দিয়ে আমি ঘর দুটো নিতে পারি।

পৃ ৩৬৬

চিকিৎসা

নইলে [illegible] তার তেমন বিশেষ কিছু লাগেনি। কোথাও কাটেনি, রক্তপাত ঘটেনি।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি কেন জ্ঞান হারিয়েছেন বোঝাই যায় না। বোধ হয় ব্লাড প্রেসার আছে। অ্যাকসিডেন্টে কেউ এভাবে অচেতন হয় না।

রক্তপড়া চাই। মাথার পিছন দিকটা অবশ্য দেখতে দেখতে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে ভদ্রলোকের।

শারদীয় সচিত্র ভারত, ১৩৫৯, পৃ ৯৭

নইলে আঘাত তার তেমন মারাত্মক কিছু লাগেনি। কোথাও কাটেনি, রক্তপাত ঘটেনি।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি কেন জ্ঞান হারিয়েছে বোঝাই যায় না। বোধ হয় দেহযন্ত্রে কোনো বিকৃতি আছে। হঠাৎ আঁতকে উঠলেই অজ্ঞান হয়ে যায়। নইলে এত সামান্য একটু ঝাঁকানিতে কেউ এভাবে অচেতন হয় না।

ওই গাড়ির ড্রাইভারের চোট লেগেছে বরং বেশি। কপালের পাশের দিকটা অবশ্য দেখতে দেখতে ঢোল হয়ে গেছে ভদ্রলোকের।

মা রচনাসমগ্র ৯ পৃ ৩৬৮

সেলুন গাড়ীটার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল যে লরিটা পুরানো গাড়ীটা তার ড্রাইভার জীবন ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানে।

পৃ ৯৭ ৯৮

সামনে খানিকটা ফাঁক পাওয়ায় পিছনের যে গাড়িটা ব্রেক কষে থামবার সুযোগ পেয়েছিল, কারও এতটুকু চোট লাগেনি তার ড্রাইভার জীবন ফুটপাথে চুপচাপ দাঁড়িয়ে বিড়ি টানে। পৃ ৩৬৮

তবু বাড়ীর মেয়েদের সিনেমায় নেবার জন্য গাড়ি বার করার সময় তার বুক কাঁপে দাঁতে দাঁত লাগিয়ে গ্যারেজে গিয়ে গাড়ীতে উঠতে হয়।

পৃ ৯৯

তবু বাড়ির মেয়েদের সিনেমায় নেবার জন্য গাড়ি বার করার সময় তার বুক কেঁপে কেঁপে ওঠে, সবাঙ্গ কেমন অবশ হয়ে আসে। দাঁতে দাঁত লাগিয়ে গ্যারেজে গিয়ে গাড়িতে উঠতে হয়। পৃ ৩৬৯

ভাবে, ভূপেশ যে সন্ধ্যাকে শুধু বাড়ী থেকে তুলে নিজের সঙ্গে আপিসে নিয়ে যায়না, ভাড়া বাড়ীতে, সিনেমা হোটেলেও নিয়ে যায়, এটা জানলেও কি তুমি এরকম সেজে গুজে হাসিমুখে সিনেমায় যেতে পারতে?

পৃ ৯৯

ভাবে, ভূপেশ যে সন্ধ্যাকে শুধু তার বাড়ি থেকে তুলে নিজের আপিসে নিয়ে যায় না, সিনেমা হোটেলেও নিয়ে যায়, ফিরিঙ্গি পাড়ায় ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া করা সাজানো ঘরেও নিয়ে যায়, এটা জানলেও কি তুমি এরকম সেজেগুজে হাসিমুখে সিনেমায় যেতে পারতে?

পৃ ৩৬৯

প্রায়ই কেশবের মাথা ঘোরে। পৃ ৯৯

জীবনের মাথা ঘোরে। পৃ ৩৬৯

শঙ্কর জোর দিয়ে বলেছে, ওকে আমি অনেকদিন থেকে জানি, মানুষটা সত্যি অনেস্ট, আপনার পাওনা একপয়সা মারা যাবে না।

পৃ ১০২

শঙ্কর জোর দিয়ে কুমুদকে বলেছে, একবারে সব টাকা দিতে হলে সে চিকিৎসা চালাতে পারবে না। ওকে আমি অনেক দিন থেকে জানি, মানুষটা সত্যি অনেস্ট। আপনার পাওনা এক পয়সা মারা যাবে না।

পৃ ৩৭০

কিন্তু কুমুদের আগ্রহ সে টের পায়।

পৃ ১০৩

কিন্তু ভালো করে তার রোগটা বুঝবার জন্য কুমুদের আগ্রহ সে টের পায়। পৃ ৩৭০

তারপর কেমন বিচলিত মনে হয়েছে কুমুদকে।

পৃ ১০৩

এইখানেই কিন্তু থেমে গেছে উন্নতি। আগের মতো কষ্টকর না হলেও অসুখটা তার রয়ে গেছে।

কেমন বিচলিত মনে হয়েছে কুমুদকে।

পৃ ৩৭০

জীবন হাঁ করে চেয়ে থেকেছে। তার জীবনের একটা বড়ো গোপন দিক আছে, অথচ সে নিজেই তার কোনো খবর রাখে না।

পৃ ১০৫

জীবন হাঁ করে চেয়ে থাকে। তার জীবনের একটা বড়ো গোপন দিক আছে। মানুষ খুন করার মতো সাংঘাতিক দিক অথচ সে নিজেই তার কোনো খবর রাখে না।

পৃ ৩৭১

আমি তোমায় শুধু এটুকু বোঝাতে চাইছি যে খুন করে থাকলেও আমার যেটুকু জানা দরকার সেটুকু জানালে আমি তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারব না।

পৃ ১০৬

আমি তোমায় শুধু এটুকু বোঝাতে চাইছি যে খুন করে থাকলেও আমায় যেটুকু জানালে আমি তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারব না— আমায় সেইটুকু শুধু জানাও।

পৃ ৩৭১

আমাকে সেটা ধরে নিতেই হবে। আমার হিসাবে পাপ নয়, তোমার কাছে পাপ। এই বিকারটা তোমার মধ্যে আছে। ওটার চিকিৎসাই আমাকে করতে হবে।

পৃ ১০৬

আমাকে সেটা ধরে নিতেই হবে। নইলে চিকিৎসাশাস্ত্রটা মিথ্যা হয়ে যায়। আমার হিসাবে পাপ নয়, তোমার কাছে পাপ। এই বিকারটা তোমার মধ্যে আছে। তা না হলে এরকম অসুখ তোমার হতেই পারে না। ওটার চিকিৎসাই আমাকে করতে হবে। পৃ ৩৭১

জীবনে বিশেষ কোনো অন্যায় কোনো দিন না করে থাকলেও পায়ের জোরে দাঁড় করায় যে গুরুতর অন্যায় করার জন্যই তার এই রোগ,

পৃ ১০৬

জীবনে বিশেষ কোনো অন্যায় কোনোদিন না করে থাকলেও পায়ের জোরে দাঁড় করায় যে কোনো গুরুতর অন্যায় করার জন্যই তার এই রোগ,

পৃ ৩৭১ ৩৭২

কাল একটা ঘটনা হয়ে আমাকে কাজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন বুঝতে পারছি ওদের অত বজ্জাতি আমার সইছিল না।

পৃ ১১৪ ১১৫

কাল একটা ব্যাপার ঘটায় আমাকে কাজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কী উপকারটাই যে করেছে তাড়িয়ে দিয়ে। এখন বুঝতে পারছি ওদের অত বজ্জাতি আমার সইছিল না।

পৃ ৩৭৪

মীমাংসা

কাল গেলেও চলবে। জরুরী হলে কি বিপদ, সেট খুলে লিখত।

চিঠিতে লেখা যায় না, এমন বিপদ হতে পারে তো।

মেয়েদের কত কি হয়।

পঙ্কজ বোনের মুখের ভাব দেখে একটু হেসে বলে, মেয়েরা আবার সামান্য কারণে উতলাও হয়।

শারদীয় দেশ পত্রিকা ১৩৫৯, পৃ ৬৫

কাল গেলেও চলবে। তেমন জরুরি ব্যাপার হলে কী বিপদ, সেটা খুলে লিখত।

চিঠিতে লেখা যায় না এমন হতে পারে তো।

মেয়েদের কত কী হয়।

পঙ্কজ বোনের মুখের ভাব দেখে একটু হেসে বলে, মেয়েরা আবার সামান্য কারণে পাগলও হয়।

মা রচনাসমগ্র ৯ পৃ ৩৭৫

সুবালা

মাসে দশ বারো টাকার দুধ বেশী দিয়ে খুসী থাকত চার পাঁচটা টাকা পেয়ে। কে জানে অন্য বাবুদের সঙ্গেও এরকম বন্দোবস্ত ছিল কিনা। শারদীয় চতুরঙ্গ ১৩৫০, পৃ ১৭	মাসে দশ বারো টাকার দুধ বেশি দিয়ে খুশি থাকত চার পাঁচটা টাকা পেয়ে। যা পায় তাই তার লাভ। কে জানে অন্য বাবুদের সঙ্গেও এরকম বন্দোবস্ত ছিল কি না। মা রচনাসমগ্র ৯ পৃ ৩৮১
ভদ্রলোকেদেরও বলিহারি যাই ভুবন বলে ঝংকার দিয়ে, সোয়ামীকে বাগিয়ে সোয়ামীকে দিয়ে ইস্ত্রির ঘরে চুরি করাতে পিরিত্তিও হয়। অঘোরের সামনেই সে বলে। পৃ ১৫	ভদ্রলোকেদেরও বলিহারি যাই, ভুবন বলে ঝংকার দিয়ে সোয়ামিকে দিয়ে ইস্ত্রির ঘরে চুরি করতে পিরিতি হয়। অঘোরের সামনেই সে বলে। অঘোর কখনও মুখ বাঁকায় কখনও মুচকে একটু হাসে। পৃ ৩৮১
পারুম না আমার নাইয়ারে তোমার পোলারে দুধ দিতে। আমারে মাছ ভাত দাও তবে পারুম। পৃ ১৮ ১৯	আমার নাইয়ারে নাইরা তোমার পোলারে দুধ দিতে পারুম না। আমারে মাছ ভাত খাওয়াও পেট ভইরা তবে পারুম। পৃ ৩৮৫

অসহযোগী

সারাক্ষণই প্রায় তিড়িং বিড়িং করে লাফাত এমনি সে চঞ্চল ছিল এবং এক আধ অকাজের পর অকাজ না করলে তার স্বস্তি ছিল না। সপ্তডিঙা (বার্ষিক সংকলন) ১৯৪৬	পুতুলের মতো চেহারা নিয়ে সারাদিন টোটো করে ঘুরে বেড়াত খেলা আর মারপিট নিয়ে মেতে থাকত এমনি সে চঞ্চল ছিল এক বছর আগে অকাজের পর অকাজ না করলে তার স্বস্তি ছিল না। মা রচনাসমগ্র ৯ পৃ ৩৮৭
রমেশ বলে। আমি ওদের সাতদিন পেট ভরে খাওয়ার কথা বলেছি বাবা।	আঁধার নেমে এল রমেশের মুখে। সে বলল আমি ওদের সাত দিন পেট ভরে খাওয়ার কথা বলেছি বাবা প ৩৮৭
চুপ কর বেয়াদপ কোথাকার।	চুপ কর বেয়াদপ কোথাকার। সাত দিন ধরে খাওয়াবে। আমাকে ফতুর করার মতলব। প ৩৮৭

অসহযোগী গল্পটি সপ্তডিঙা নামক যে বার্ষিক সংকলনে প্রথম প্রকাশিত হয়, সেটি সম্পাদনা করেছিলেন খগেন্দ্রনাথ মিত্র। লেখকের জীবনাবসানের পর ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত ১২টি নির্বাচিত গল্পের সংকলন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প' (ভূমিকা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়) গ্রন্থে অসহযোগী গল্পটির পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ গৃহীত হয়, কিন্তু গল্পটির নাম দেওয়া হয় অসহযোগ। লাজুকলতা সংকলন-ভুক্ত কোনো গল্প স্বনির্বাচিত গল্প বা শ্রেষ্ঠ গল্পে গৃহীত হয়নি।

লাজুকলতা গল্পটি চিনা ভাষায় শ্রীযুক্তা Shih Zen অনূদিত লেখকের ১৪টি গল্পের নির্বাচিত সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রকাশক Shan Xi People's Publishing Society, Tai Yuan.

হরফ

'হরফ' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অষ্টচত্বারিংশ সংখ্যক মুদ্রিত গ্রন্থ এবং উনত্রিংশতম উপন্যাস। উপন্যাসটির প্রকাশকাল বুদ্ধ পূর্ণিমা ১৩৬১, [১৭ মে ১৯৫৪], প্রকাশক সাহিত্য জগৎ, কলকাতা,

পৃ ৪ + ২৪৪, মূল্য চাব টাকা, প্রচ্ছদশিল্পী আশু বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাসটিব পববর্তী সংস্কবণ প্রকাশিত হয় ১৩৬৯ শ্রাবণে, দাম বেড়ে হয় পাঁচ টাকা, পৃ ৪ + ২২৫, প্রচ্ছদ ও প্রকাশক পূর্ববৎ।

গ্রন্থাকাবে প্রকাশিত হওযাব পূর্বে উপন্যাসটিব সাময়িক পত্রিকায অখণ্ড বা ধাবাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়া বিষযে কোনো তথ্য পাওয়া যাযনি। তাঁব ডায়েবি থেকে জানা যায, ১৯৫৩ ব জুলাই মাসে তিনি *হবফ*-এব জন্য প্রকাশকেব কাছ থেকে অগ্রিম সম্মানদক্ষিণা গ্রহণ কবেছেন এবং ওই বৎসব নভেম্ববেব ২৯ তাবিখে উপন্যাসেব কিয়দংশ পাণ্ডুলিপি হস্তান্তবিত কবেছেন। অতঃপব প্রকাশিত হতে হতে ১৯৫৪-ব মে মাস হয। জুন মাসে *হবফ*-এব জন্য সাম্মানিক প্রাপ্তিব কথাও আছে (দ্র *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায*, পৃ ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ২০৪, ৩৯৯)। ১৯৫৪ ব ২৭ জানুযাবি লেখকেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাব কাছে লিখিত লেখকেব পত্র থেকে জানা যায *হবফ* এব 'ছাপা চলিতেছে'। সম্ভবত এপ্রিল-মে •'গাদ শেষ ফর্মা সংশোধন কবে দিযেছেন (দ্র তদেব পৃ ৩১৬, ৩১৮, ৪২১)।

উপন্যাসেব কাহিনি থেকে গল্পেব উপাদান গ্রহণেব উদাহবণ *হবফ* প্রসঙ্গেও আছে। গল্পটি 'কলমে হবফে'। প্রকাশিত হয় *গল্পভাবতী* পত্রিকাব পৌষ ১৩৬০ সংখ্যায। এই তথ্যটি জানিয়েছেন অধ্যাপক সবোজমোহন মিত্র তাঁব *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায জীবন ও সাহিত্য* গ্রন্থে (১৯৯৯ সং, পৃ ২১১)। গল্পটি লেখকেব জীবিতকালে কোনো গ্রন্থভুক্ত হযনি।

দাবিদ্র্য ও বোগভোগে পর্যুদস্ত মানসিকতাব মধ্যে লিখিত লেখকেব জীবনসাযাহ্নেব এই উপন্যাসে সাহিত্যিকেব জীবনসত্য সন্ধানেব এক তীব্র অভীপ্সা প্রকাশিত হযেছে। সেই কাবণে উপন্যাসটিব বিশেষ গুবুত্ব আছে বলে সমালোচকগণ মনে কবেন।

পূর্বালোচিত একাধিক উপন্যাসেব মতো *হবফ* উপন্যাসেও লেখকেব কিছু অনিচ্ছাকৃত তথ্য অনবধানতাজনিত অসংগতিব প্রতি পাঠকেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছেন অধ্যাপক সবোজ দত্ত (গ্রন্থালয প্রকাশিত *মানিক গ্রন্থাবলী* ব ১৩শ খণ্ডেব পৃষ্ঠাব উল্লেখসহ)

> উপন্যাসেব সূচনায় (পৃ ৬১) অলি নামটিব সঙ্গে পাঠক পবিচিত হয় —বাকি আখ্যানে কখনো আব কোনো উল্লেখ নেই তাব। অথচ, অলিকে পর্যন্ত ভাগ না দিযে মানব চাব পযসাব মুড়িমুড়কি চিবিযে চিবিযে বসিযে খেযেছে—কথাটি খুব জোবেব সঙ্গে বলেছেন লেখক। মানবেব সঙ্গে কালাচাঁদেব মেযে আত্তিব যে ঘনিষ্ঠতা দেখা যায তাতে অলিব বদলে আত্তি হলেই বেশ মানিযে যায উক্তিটি। এখানে কি তবে আত্তিই হবে ?
>
> আত্তিব বাবা কালাচাদ খুব বেশি লেখাপড়া কবে নি। তাব শিক্ষাগত যোগ্যতাব কথা মানব জানতে চাইলে আত্তি বলে—'হ্যা জানি বৈ কি। বাবা কতবাব গল্প শুনিযেছে। ইস্কুল থেকে বেবোনোব পবীক্ষাটা না ? সেটাতে ফেল মেবেছিল।' (পৃ ৬৩) কালাচাদ নিজে যদিও ১১৮ পৃষ্ঠায মানবকে জানায—'এইট এ উঠলাম বাবাব হল অসুখ। লেখাপড়া হবে না টেব পেযেছিল নিশ্চয, স্কুল ছাড়িযে বলল, পড়ে তোব ঘোড়া হবে হাতেব কাজ শিখবি যা, খেটে খাবি।'--কাব উক্তিকে সত্য বলে মানব ?
>
> আত্তি নিজেই কি লেখাপড়া জানে ? বেশ অস্বস্তিতে পড়তে হয পবস্পববিবোধী উক্তিতে। যাদেব নিযে লেখা, তাদেব মতামতেব গুবুত্ব আছে মানবেব কাছে। তাই দুটি লেখা এনে মানব আত্তিকে বলে – একটা গল্প আব একটা কবিতা শোন দেখি আত্তি —কেমন লাগে বলবে। পড়তে পাব না —তোমায নিযে এই তো হযেছে মুস্কিল।' (পৃ ১১৬) আত্তি শোনে এবং মতামতও দেয। তাব পড়তে না-পাবাব কথাটা একবকম প্রতিষ্ঠিত। ফলে ১২৫ পৃষ্ঠায পৌঁছে বেশ বিব্রত হতে হয, কাবণ আত্তি সেখানে মানবকে জানায়, কালাচাঁদেব একটা লেখা সে মানবকে শোনাবে। শুধু বলা নয, কালাচাঁদ খেতে বসলে তাব লেখাব নমুনা নিযে আত্তি মানবেব ঘবে এসে মানবকে পড়ে শোনায তাব মতামতও দাবি কবে। দেখা যাচ্ছে আত্তি পড়তে পাবে।
>
> আত্তিকে নিযে, বিশেষ তাব বিযেব ব্যাপাবে কালাচাঁদ একেবাবেই ভাবে না, সে মনে কবে আত্তি বড় বেশি সেযানা, যা কববাব নিজেই কববে। (পৃ ১৭০) তাব পবেব পৃষ্ঠাতেই আছে সে আত্তিকে জোব কবেই কাবো সঙ্গে বিযে দিতে চায। তবে এ-ও ঠিক যে এব পিছনে কালাচাঁদেব নিজস্ব একটি উদ্দেশ্য সক্রিয। কাব সঙ্গে যুক্ত হবে আত্তিব জীবন ? ১৬৮ পৃষ্ঠায আসে বিড়িব দোকানেব গাঁজাখোব মণ্টাব নাম। আবাব ১৭০ পৃষ্ঠায আসে মণ্টা নয, বুড়ো ভোলানাথেব কথা। আবাব ঐ একই পৃষ্ঠায পাওযা যায কালাচাঁদেব আব এক ইচ্ছাব

কথা —আমি কারো সঙ্গে নিছক বসবাস করতে চাইলেও কালাচাঁদের আপত্তি নেই। কিন্তু এর আগে ১১৭ পৃষ্ঠায় কালাচাঁদ বেশ চড়া সুরে মানবকে শুনিয়েছিল —আমি এখন আর 'ছোট তো নেই', সুতরাং মেয়েটাকে টানাটানি ঘাটাঘাটি কোরো না মানুবাবু।'

কুঞ্জর মায়ের ভাইঝি পদ্মকে ঘরে আনা মিলিতে দরকার কালাচাঁদের, কারণ এই কুমারী মেয়েটি ইতিমধ্যেই কালাচাঁদের সন্তান পেটে ধারণ ক'রে আছে। খুব গোপনে হয় নি এটা। রাত্রে কালাচাঁদ কুঞ্জর মায়ের ঘরে পদ্মকে নিয়ে রাত কাটিয়েছে আর কুঞ্জর মা বোনঝিকে কাঁথা বিছিয়ে শুয়ে খানিকক্ষণ মশার কামড়ে ছটফট করেও অচেতন হয়ে ঘুমিয়েছে। (পৃ ১৬৯) যদিও ১১৬ পৃষ্ঠায় লেখক জানিয়ে রেখেছিলেন কুঞ্জর মা 'সেরূপ রকমের প্রৌঢ় বয়সী বিধবা যেমন ঝগড়াটে তেমনি কড়া মানুষ মেয়ে-বৌদের চালচলনের ব্যাপারে। অথচ তারই ভাইঝি তার নীরব অনুমোদনক্রমে কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী।'

৭৮ পৃষ্ঠায় উমাপদকে দেখা যায় মদনদাসের প্রেসে মহেশের মুখোমুখি। সেখানে উমাপদ সময়মত প্রুফ ফিরিয়ে না দিতে পারার কারণ হিসেবে মহেশকে বলেছে—'কি বলি বলুন ? বৌটা ছিল পোয়াতি —হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেল।' অথচ ৭৫ পৃষ্ঠায় আমরা চটের বিছানায় উমাপদর স্ত্রী পুতুলের পাশে সদ্যোজাত শিশুটিকে সজীবই দেখেছি 'ট্যাঁ ট্যাঁ করে চেঁচাচ্ছে সদ্যোজাত রক্তমাখা বাচ্চাটা।' বাচ্চাটা নয়, নষ্ট হল উপন্যাসের শৃঙ্খলা।

মানবের বয়স একুশ বছর। তার দুটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমটির গ্রন্থস্বত্ব সে এক প্রকাশককে দিয়েছে একশো টাকায় দ্বিতীয়টি বিক্রি করেছে আরেকজনকে দেড়শোতে। (পৃ ৬৪) নিজের উক্তিকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না ক'রে লেখক ১৫৩ পৃষ্ঠায় খবর দিলেন মানব তার প্রথম বইয়ের কপিরাইট মদনদাসকে বিক্রী করেছে মাত্র একশ টাকায়।

(ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৯৭ ৯৮)

বর্তমান খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে গ্রন্থালয় প্রকাশিত ১৩শ খণ্ড মানিক গ্রন্থাবলী ভুক্ত কয়েকটি উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। সেইগুলির পাঠ নির্ণয়ের জন্য মানিক রচনাসমগ্রের বর্তমান খণ্ডের পৃষ্ঠাসূচক নিম্নরূপ

গ্রন্থালয় সংস্করণ ১৩শ খণ্ড	মানিক রচনাসমগ্র ৯
পৃ ৬১	পৃ ৪১৩ ৪১৪
৬৩ ৬৪	৪১৫-৪১৭
৭৫	৪২৭ ৪২৮
৭৮	৪৩১
১১৬	৪৭১ ৪৭২
১১৭	৪৭২ ৪৭৩
১১৮	৪৭৩ ৪৭৪
১২৫	৪৮০ ৪৮১
১৫৩	৫০৯ ৫১০
১৬৮	৫২৫ ৫২৬
১৬৯	৫২৬-৫২৭
১৭০	৫২৭ ৫২৮

সম্পাদকমণ্ডলী

কলহান্তরিত

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

লাজুকলতা গল্পগ্রন্থভুক্ত 'কলহান্তরিত' গল্পের পাণ্ডুলিপি চিত্র

পরিশিষ্ট

পাণ্ডুলিপি-পরিচয়

ফেরিওলা	:	'ফেরিওলা' গল্পের খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির দুটি পৃষ্ঠা
চালচলন	:	খণ্ডিত পাণ্ডুলিপির দুটি পৃষ্ঠা
লাজুকলতা	:	'কলহান্তরিত' গল্পের পাণ্ডুলিপির দুটি পৃষ্ঠা

সেটা হিসেব করেই কেনা-দাম। একে পড়তা বলে গো, পড়তা।

মাল আনার খরচের কথাটাও খেয়ালে আসছে নীণার। এতই টিপে টিপে হিসেব করে চলতে হয়।

[অসম্পূর্ণ]

[দ্র মা রচনাসমগ্র-৯ পৃ ১৪]

চালচলন

[ক] 'চালচলন' উপন্যাসের ৩৮ পৃষ্ঠাঙ্ক সংবলিত একটি বিচ্ছিন্ন এবং অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠা

৩৮

পথের ধারে সরে গিয়ে তারা দাঁড়ায়। কাছেই বটগাছের গোড়াটা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো— কয়েক খণ্ড জলে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মসৃণ হওয়া কালো পাথরের মধ্যে গোঁজা রয়েছে সিঁদুর মাখানো একটি ত্রিশূল।

মিলনী বলে, কদিন আগে বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেছে--তারপর আর আসে না।

—আসে না মানে ?

—আসে না। টাকাটা পেয়েই আসা বন্ধ করেছে।

—টাকা তো আগে দেবার কথাই ছিল ?

—তা ছিল, কিন্তু টাকাটা বাগিয়েই আসা যাওয়া বন্ধ করার কথা তো ছিল না। মিলনী ঢোঁক গেলে।

—আগে টাকা নেবার প্রস্তাবটাও ছিল ওর। কি সব আরম্ভ করবে, কিছু কিছু উপার্জন হতে থাকবে তখন বিয়ে হবে। ঠিক কথা, বিদ্যা দিয়ে তো পেট ভরবে না। বাবা হিসেবী মানুষ, রাজী হয়ে গেলেন। কিন্তু কি কাণ্ড দেখুন তো মানুষটার। এতদিন প্রায় রোজ অন্ততঃ একবার এসেছে, টাকাটা পেয়েই আর আসে না।

সুনীল বলে ব্যস্ত আছে কিম্বা অন্য কারণ

[অসম্পূর্ণ]

[দ্র মা রচনাসমগ্র ৯ পৃ ২১০]

[খ] 'চালচলন' উপন্যাসের অপর একটি বিচ্ছিন্ন পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা লেখক পরিবারের সৌজন্যে উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়েছে। 'মিলনী ধীরে ধীরে বলে, টাকাটা হাতে পেয়েই এমন ব্যস্ত হয়ে পড়ল ? —আমি ব্যবসাদারের মেয়ে।'—উপন্যাসের এই অংশটি উক্ত পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠায় যথাযথ [দ্র মা রচনাসমগ্র ৯ পৃ ২১০ ২১১]। তবে উক্ত অংশের পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠায় একটি অনুচ্ছেদের শুরুতে, 'মিলনী একটু থামে।' এই বাক্যটির পরে একটি অতিরিক্ত তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য লিখিত আছে। বাক্যটি হল 'খোঁড়া পা'টা একটু সামনে এগিয়ে দেয়।' এ ভিন্ন মাত্র দু-একটি স্থানে সামান্য শব্দগত ভিন্নতা ব্যতীত অন্য কোনো পার্থক্য লক্ষ করা যায়নি। এই পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠার উপরে '৩৯' পৃষ্ঠাঙ্ক লিখিত।

[গ] 'চালচলন' উপন্যাসের ৪১ পৃষ্ঠাঙ্ক সংবলিত অপর একটি পৃষ্ঠা

৪১

[ইংরেজিতে স্পেস কথাটি এই অংশে লিখিত]

স্পষ্ট বাস্তব ঘটনা।

তবু যেন বিশ্বাস হতে চায় না সত্যই এটা ঘটেছে। টাকার জন্য অনাদি এমনভাবে খেলা করতে পারে একটি মেয়ের সঙ্গে, এমন কুৎসিতভাবে তাকে ঠকাতে পারে ?

ওকে সে ভেবে রেখেছিল তেজী শক্ত মানুষ হিসাবে, জীবনের নিয়মনীতি যারা কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে তাদের দলের মানুষ বলে।
ধারণাটা একেবারে বদলে ফেলতে হবে তার সম্বন্ধে? ফন্দিবাজ ধূর্ত বলে ভাবতে হবে তাকে?

বিদ্যা [অস্পষ্ট] তার ধাপ্পা দিয়ে লোক ঠকানোর বুদ্ধিটা ধারাল করেছে?

কিছুতেই যেন বিশ্বাস হতে চায় না সুনীলের।

বিশেষ অবস্থায় সাময়িক দুর্বলতার বশে মহৎ মানুষও অন্যায় কাজ করে বসে--জীবনে সাধারণ নিয়মের ওলোটপালোট ঘটিয়ে দেয়। তেমন কিছু গুরুতর ব্যাপার কি ঘটেছে অনাদির জীবনে?

বাধ্য হয়ে ছোটোলোকামি করার লজ্জা দুঃখে সে আর মিলনীর সঙ্গে আগের মত ব্যবহার করতে পারছে না?

দু'দিন ভেবে সুনীল অনাদির কাছে যায়।
হয় তো জানা যাবে না কিছুই।
কিন্তু নতুন আলোয় অনাদিকে তো খানিক চিনে আসা যাবে।
হাসিমুখে না হলেও অমায়িকভাবেই অনাদি বলে, আসুন সুনীলবাবু, বসুন। খবর কি?

সুনীল একটু বিপন্ন বোধ করে। আত্মীয় নয় বন্ধু নয়—মিলনীর মাইনে করা মাস্টার। সে এসেছে অনাদির ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে।

কথা পাড়লেই অনাদি রেগে যেতে পারে অপমান করে গালাগালি দিয়ে তাকে বার করে দিতে পারে বাড়ী থেকে।

তার কিছুই বলার থাকবে না। অনাদিকে দোষও দিতে পারবে না।

– একেবারে সোজাসুজি খোলাখুলি কথা বলি অনাদিবাবু?

অনাদি নীরবে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। স্থিরস্থির গম্ভীর অনাদি।

সুনীল বলে, কেন এসেছি বুঝতেই পারছেন। যদি পছন্দ না করেন, আগেই বলুন— আমি কথা না তুলেই বিদায় নেব।

আমার কিছু জিজ্ঞাসা করার অধিকার নেই। তবে সরলভাবে আমি বুঝতে এসেছি—সমালোচনা করতে নয়।

[দ্র মা রচনাসমগ্র-৯ পৃ ২১৯ ২২১]

লাজুকলতা

[ক] 'লাজুকলতা' গল্পগ্রন্থ-ভুক্ত 'কলহান্তরিত' গল্পের একটি বিচ্ছিন্ন পাণ্ডুলিপি-পৃষ্ঠা

কলহান্তরিত

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা মেয়েলি কলহের এমন পরিণাম! এ যেন কল্পনা করা যায় না।

তিন শ' খাটুয়ে মানুষ ভাগ হয়ে ছিল ৷৲ ভাগে তিনটে ইউনিয়নে। এতকাল পরে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তিনটে ইউনিয়নের এক হয়ে যাবার। দু'জন স্ত্রীলোকের ঝগড়া বুঝি তা ভেস্তে দিল আবার।
তিনটির মধ্যে গোকুল আর দীনেশের ইউনিয়ন দু'টি বেসরকারী। তাদের এই দু'টি বেসরকারী ইউনিয়নের জন্যই সম্ভব হয়েছে কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রিত সরকারী ইউনিয়নটির অস্তিত্ব।

সকলেই জানে যে এ দু'টি ইউনিয়ন কোনরকম মিলে যেতে পারলেই তিনটির যাগায় দাঁড়িয়ে যায় একটিমাত্র ইউনিয়ন, আইনসঙ্গতভাবে স্বীকৃত ইউনিয়ন অথচ কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বের কবল থেকে মুক্ত।

আসলে সত্যই কি মুক্ত ? সবার উপরের কর্তারা বদল না হলে কি আর সে মুক্তি জুটছে কোন ইউনিয়নের !
তবে এখন যে প্রকাশ্যভাবে
আইনসঙ্গতভাবে কর্তারা যা চান যেমন চান তাই পাশ হচ্ছে খাটুয়েদের দাবীদাওয়া পূরণ করার হিসাবে, অন্তত
যে বাঁকা ভাঁওতায় অভিনয়টা শেষ হবে।
দীনেশ মিল চায় কিন্তু মিলতে রাজী হয় না।
সে বলে, বেশ তো, তোমাদের ইউনিয়নটা ভেঙ্গে দাও। আমাদের সঙ্গে ভিড়ে পড়।

খাটুয়েদের লাভ থাকলে তাতে আপত্তি হত না গোকুলের। কিন্তু ফলটা হবে অন্যরকম। ইউনিয়নটা হবে দীনেশের।
কর্তাদের কিছুমাত্র আপত্তি হবে না। দীনেশের ইউনিয়ন মানেই তো প্রায় একরকম তাদেরই বশম্বদ ইউনিয়ন।
সোজাসুজি বশে রাখার চেয়ে এই রকম দীনেশদের ইউনিয়ন মারফৎ খাটুয়েদের বশে রাখাই বরং ভাল।
যে দিনকাল !

[খ] 'কলহান্তরিত' গল্পের ২ পৃষ্ঠাঙ্ক সংবলিত অপর একটি বিচ্ছিন্ন পৃষ্ঠা

দীনেশ কাঁচাপাকা চুলে হাত বুলোতো আর মুচকে মুচকে হেসে লখীন্দরকে বলতো, গোকুল শালা ধরে নিয়েছে এ দেশটা সোভিয়েট হয়ে গেছে। এদেশে যে করে খেতে হয় ব্যাটার তা খেয়াল নেই। তুই নিজে যদি না বাঁচলি তোর ক'দের নাম কিসে থাকে রে হারামজাদা ?

লখীন্দরের সঙ্গে মুচকে মুচকে হেসে কথা কওয়াটা দীনেশের বন্ধ হয়ে গেছে মাস ছয়েক। কাঁচাপাকা চুলে এখনো সে হাত বুলোয় মতলব আঁটবার সময় এবং মতলব সে আঁটে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যত ঘন্টা জেগে পারে আর কষ্টসাধ্য ঘুমের মধ্যেও যেটুকু সময় স্বপ্ন দ্যাখে—কিন্তু লখীন্দরের সঙ্গে সে কথা কয় না দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

মাঝে মাঝে আতঙ্কে বুক কেঁপে উঠলে অবশ্য লখীন্দরকেই ডেকে পাঠিয়ে বলে, একটু সাবধান। তোকে বিগড়ে দিয়ে বাগে আনছে ওরা বুঝিসনে ? তোর সর্বনাশ করে ছাড়বে। বরঞ্চ আমি তোকে দশবিশটাকায় আরেকটা প্রমোশন বাগিয়ে দিচ্ছি।

লখীন্দর রাগে টং হয়েও লখীন্দর শান্ত ধীর গলায় বলে, তোমার হল কি দীনেশদা ? আমাকে ডেকে এনে তুই তোকারি করছ ? বেশী তো খাও নি এখনো !

[দ্র মা রচনাসমগ্র ৯ পৃ ৩৫৪ ৩৫৯]
[মূল গল্পের সঙ্গে উদ্ধৃতাংশের বিশেষ কোনো সাদৃশ্য নেই।]

বাইরে ঘরে

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible]

লাজুকলতা গল্পগ্রন্থ-ভুক্ত 'বাহিরে-ঘরে' গল্পের পাণ্ডুলিপি চিত্র

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনপঞ্জি

১৯০৮ জন্ম, ১৯ মে মঙ্গলবার। বঙ্গাব্দ ১৩১৫, ৬ জ্যৈষ্ঠ। জন্মস্থান সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত দুমকা শহর। পৈতৃক নিবাস বর্তমান বাংলাদেশে, ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত মালপদিয়া গ্রাম।

পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা নীরদা দেবী। পিতামাতার পঞ্চম পুত্র পিতৃদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাকনাম মানিক।

পিতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের গ্র্যাজুয়েট। সেটেলমেন্ট বিভাগের কানুনগো এবং শেষ পর্যন্ত সাব ডেপুটি কালেকটর পদে পিতার চাকরির সূত্রে লেখকের বাল্য-কৈশোর ও ইস্কুলের শিক্ষাজীবন বিক্ষিপ্তভাবে অতিবাহিত হয় উড়িষ্যা, বিহার ও অখণ্ড বাংলার এক বিস্তৃত অঞ্চলে—প্রধানত দুমকা, আড়া, সাসারাম সমগ্র মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অংশ, কুমিল্লার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবেড়িয়া বারাসত কলকাতা, ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানে।

১৯২৪ ২৮ মে, টাঙ্গাইলে মাতৃবিয়োগ।

১৯২৬ মেদিনীপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় গণিতে বিশেষ কৃতিত্বসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

১৯২৮ বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি এসসি ক্লাসে ভর্তি হন। এই বছরেই কলেজের সহপাঠীদের সঙ্গে তর্কে বাজি ধরে প্রথম গল্প 'অতসী মামী' রচনা করেন এবং বঙ্গাব্দ ১৩৩৫ এর পৌষ সংখ্যা (ডিসেম্বর ১৯২৮) 'বিচিত্রা' পত্রিকায় তা ছাপা হয়। প্রথম গল্পের লেখক হিসাবে ডাকনাম 'মানিক' ব্যবহারের কাহিনী নিজেই পরবর্তীকালে 'গল্প লেখার গল্প' নামক রচনায় বলেছেন।

তবে আকস্মিকভাবে প্রথম গল্প লেখার আগেই লিখিত, কৈশোরক কবিতাচর্চার নিদর্শনস্বরূপ প্রায় একশোটি কাব্য লেখা সম্পূর্ণ একটি খাতা লেখকের ব্যক্তিগত কাগজপত্রের ভিতর পাওয়া গেছে।

১৯২৯ 'বিচিত্রা' পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় গল্প 'নেশা' (আষাঢ় ১৩৩৬) ও 'বৃথার পূজা' (ভাদ্র ১৩৩৬)। প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য'র আদি রচনা এই বছরেই শুরু হয়। ক্রমে সাহিত্যচর্চায় অগ্রহ পারিবারিক মতবিরোধের কারণ হয়ে ওঠে- শেষ পর্যন্ত কলেজের শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে সাহিত্যকর্মেই সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৩৪ বঙ্গাব্দ ১৩৪১ এর বৈশাখ সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় 'একটি দিন' নামক বড়োগল্পের আকারে প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' শুরু হয় , ক্রমে 'একটি সন্ধ্যা', রাত্রি', এবং শেষ পর্যন্ত 'দিবারাত্রির কাব্য' নামে ধারাবাহিক প্রকাশের পর পৌষ ১৩৪১ এ উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হয়। একই বছরে 'পূর্বাশা'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে শুরু হয় 'পদ্মানদীর মাঝি', কিন্তু পূর্বাশা র প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ হওয়ায় উপন্যাসটির ধারাবাহিক প্রকাশ অসম্পূর্ণ থাকে।

১৯৩৫ পূর্ববর্তী বছরের ডিসেম্বর কিংবা বর্তমান বছরের জানুয়ারি বঙ্গাব্দ ১৩৪১ এর পৌষ সংখ্যা থেকে, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় শুরু হয় 'পুতুলনাচের ইতিকথা'। এই বছরেই গ্রন্থকার হিসাবে লেখকের প্রথম আবির্ভাব। উপন্যাস 'জননী , প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অতসী মামী', এবং গ্রন্থরূপে পরিমার্জিত ও রূপান্তরিত দিবারাত্রির কাব্য', পর পর প্রকাশিত হয় যথাক্রমে মার্চ, আগস্ট ও ডিসেম্বর মাসে।

বর্তমান বছরেরই কোনো-এক সময়ে লেখক মৃগীরোগ বা Epilepsy র আক্রমণে প্রথম আক্রান্ত হন— চিকিৎসার অতীত এই ব্যাধি ছিল তাঁর আমৃত্যু সঙ্গী।

১৯৩৬ একই বছরে প্রকাশিত হয় তিনটি উপন্যাস – পদ্মানদীর মাঝি' 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ও 'জীবনের জটিলতা'।

১৯৩৭ একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ 'প্রাগৈতিহাসিক , লেখকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ। মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড এর পরিচালনাধীন মাসিক ও সাপ্তাহিক 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক-পদে যোগদান , 'বঙ্গশ্রী'-র তৎকালীন সম্পাদক ছিলেন কিরণকুমার রায়।

বর্তমান বছরের শেষভাগে টালিগঞ্জ, দিগম্বরী লার পৈতৃক বাড়িতে বসবাস শুরু , পরবর্তী এগারো বছর, পিতা ও অপর তিন ভ্রাতার একান্নবর্তী সংসারে, উক্ত বাড়িতেই বাস করেন।

১৯৩৮ ১১ মে, ২৮ বৈশাখ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, ময়মনসিংহ গবর্নমেন্ট গুরুট্রেনিং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং বিক্রমপুর পঞ্চসার নিবাসী, প্রয়াত সুরেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় কন্যা শ্রীযুক্তা কমলা দেবীর সঙ্গে বিবাহ। জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে উপন্যাস 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' ও গল্পগ্রন্থ 'মিহি ও মোটা কাহিনী'।

১৯৩৯ ১ জানুয়ারি থেকে 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের চাকরিতে ইস্তফা। প্রায় একই সময়ে, পরবর্তী ভ্রাতা সুবোধকুমারের সহযোগিতায়, 'উদয়াচল প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস' নামে ছাপাখানা ও প্রকাশনালয় স্থাপন।

বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ মাঘ সংখ্যা (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) 'পরিচয়'-পত্রিকায় 'অহিংসা' উপন্যাসের ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু (সমাপ্তি পৌষ ১৩৪৭)। অগাস্ট মাসে প্রকাশিত হয় চতুর্থ গল্পগ্রন্থ 'সরীসৃপ'।

বর্তমান বছরের শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পূর্ণ উপন্যাস 'সহরতলী'—'সহরতলী' প্রকাশের মধ্য দিয়েই উক্ত পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় সম্পূর্ণ উপন্যাস প্রকাশের রীতি প্রবর্তিত হয়।

১৯৪০ বর্তমান বছরের গোড়ার দিকে লেখকের নিজস্ব প্রকাশনালয় থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর পঞ্চম গল্পগ্রন্থ 'বৌ' , সম্ভবত এর পরেই প্রতিষ্ঠানটি উঠে যায়।

জুলাই মাসে প্রকাশিত হয় গ্রন্থাকারে 'সহরতলী' ১ম পর্ব। বঙ্গাব্দ ১৩৪৭ কার্তিক সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকায় লেখক-সম্পর্কে প্রথম স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

১৯৪১ প্রকাশিত গ্রন্থ 'সহরতলী' ২য় পর্ব, 'অহিংসা' ও 'ধরাবাঁধা জীবন'--তিনটি উপন্যাস।

১৯৪২ শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পূর্ণ উপন্যাস 'সহরবাসের ইতিকথা'। ১৫ মে তারিখে প্রকাশিত উপন্যাস 'চতুষ্কোণ', একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ।

১৯৪৩ 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকা থেকে পদত্যাগের পর লেখকের দ্বিতীয় এবং শেষ চাকরিজীবন শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কোনো-এক সময়ে—তৎকালীন ভারত সরকারের ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের প্রভিন্সিয়াল অরগানাইজার, বেঙ্গল দপ্তরে পাবলিসিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে তিনি যোগদান করেন এবং অন্তত বর্তমান বছরের শেষভাগ পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই সময় থেকেই অল ইন্ডিয়া রেডিও র কলকাতা কেন্দ্র থেকে যুদ্ধ বিষয়ক প্রচার ও আরও নানাবিধ বেতার-অনুষ্ঠানে লেখক অংশ নেন।

সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় ষষ্ঠ গল্পগ্রন্থ 'সমুদ্রের স্বাদ'।

বঙ্গাব্দ ১৩৫০ শারদীয় যুগান্তর পত্রিকায় 'প্রতিবিম্ব' নামক ছোটো একটি উপন্যাস—সম্ভবত একই বছরে, বা পরবর্তী বছর, উপন্যাসটি গ্রন্থরূপেও প্রকাশিত হয়।

১৯৪৪ ১৫-১৭ জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। ক্রমে এ-দেশের প্রগতি লেখক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং বর্তমান বছরেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। কমিউনিস্ট পার্টি ও পার্টির সাহিত্য ফ্রন্টের সঙ্গে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন। ২৫-২৭ অগাস্টে অনুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে সাধারণ অধিবেশনের অন্যতম সভাপতি। একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ, গল্পসংকলন 'ভেজাল'।

১৯৪৫ ৩ ৮ মার্চে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। বর্তমান সম্মেলনে পুনরায় সর্বভারতীয় সংস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংঘের বাংলা শাখার নাম হয় 'প্রগতি লেখক সংঘ' এবং এই সম্মেলন থেকে লেখক উক্ত সংঘের পরবর্তী বছরের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১২ মে তারিখে কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে 'গল্প লেখার গল্প' পর্যায়ে ভাষণদান।

অক্টোবর ডিসেম্বরের বিভিন্ন দিনে, আঠারো-উনিশ শতকীয় বাঙালী সঙ্গীতকার বিষয়ে পর্যায়ক্রমিক বেতার ভাষণ। প্রকাশিত গ্রন্থ গল্পগ্রন্থ 'হলুদপোড়া' এবং উপন্যাস 'দর্পণ'।

১৯৪৬ পর-পর প্রকাশিত হয় পাঁচখানি গ্রন্থ ,

ফেব্রুয়ারি-মার্চ, 'সহরবাসের ইতিকথা', উপন্যাস।

এপ্রিল-মে, 'ভিটেমাটি', নাটক।

মে-জুন, 'আজ কাল পরশুর গল্প', গল্পগ্রন্থ।

জুলাই-অগাস্ট, 'চিন্তামণি', উপন্যাস।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, 'পরিস্থিতি', গল্পগ্রন্থ।

১৬ অগাস্ট ও পরবর্তী কয়েকটি দিনের ঐতিহাসিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, দাঙ্গা বিধ্বস্ত টালিগঞ্জ অঞ্চলে, জীবন বিপন্ন করে সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও মৈত্রী প্রয়াসে সক্রিয় অংশগ্রহণ।

১৯৪৭ প্রকাশিত গ্রন্থ তিনটি উপন্যাস 'চিহ্ন' ও 'আদায়ের ইতিহাস' এবং গল্পগ্রন্থ 'খতিয়ান'।

ডিসেম্বরের শেষভাগে বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্যসম্মেলনে গণসাহিত্য শাখার সভাপতি।

১৯৪৮ দুটি গ্রন্থের প্রকাশ গল্পগ্রন্থ 'ছোটবড়' ও 'মাটির মাশুল'।

১৯৪৯ ৫ ফেব্রুয়ারি, টালিগঞ্জ-দিগম্বরীতলার পৈতৃক বাড়ি থেকে বরানগর, গোপাললাল ঠাকুর রোড-এর ভাড়াবাড়িতে উঠে আসেন এবং অবশিষ্ট জীবন সেখানেই বাস করেন।

৭ ফেব্রুয়ারি, লেখকের পিতা তাঁর টালিগঞ্জের নিজস্ব বাড়ি বিক্রয় করে দেন এবং ৪ ডিসেম্বর তারিখে স্থায়ীভাবে লেখকের কাছে চলে আসেন। আমৃত্যু তিনি লেখকের সঙ্গেই বরানগরের ভাড়াবাড়িতে বাস করেন—পুত্রের মৃত্যুর দুবছর পর মুমূর্ষু পিতা মারা যান।

এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক সংঘের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতি। সংঘের পূর্বতন সমিতির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক হিসাবে লেখক এই সম্মেলনে সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন- 'প্রগতি সাহিত্য'-নামক প্রবন্ধরূপে এই রিপোর্ট লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ 'লেখকের কথা'য় (১৯৫৭) সংকলিত হয়েছে। চলচ্চিত্রে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'- ২৮ জুলাই মুক্তি পায়।

একমাত্র গ্রন্থ, 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী' গল্পগ্রন্থ।

১৯৫০ জুন থেকে অগাস্টের মধ্যে প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'জীয়ন্ত' 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' এবং বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত 'মানিক গ্রন্থাবলী' ১ম ভাগ।

১৯৫১ বর্তমান বছরের প্রায় শুরু থেকেই দারিদ্র্য এবং অসুস্থতায় ক্রমাগত আক্রান্ত হতে থাকেন।

'পেশা', 'সোনার চেয়ে দামী' (১ম খণ্ড। বেকার), 'স্বাধীনতার স্বাদ ও 'ছন্দপতন'—চারখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

১৯৫২ আর্থিক সংকট চরমে ওঠে তিন মাসের মধ্যে 'অন্তত পাঁচশত টাকা' সঞ্চয়ের লক্ষ্য নিয়ে সংসার-চালনার 'ত্রৈমাসিক প্ল্যান' নেন মে জুলাই মাসে, যদিও তা 'প্ল্যান'ই থেকে যায়।

ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবরের মধ্যে পাঁচখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'সোনার চেয়ে দামী' (২য় খণ্ড। আপোস), 'ইতিকথার পরের কথা', 'পাশাপাশি' ও 'সার্বজনীন' – চারখানি উপন্যাস এবং বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক 'মানিক গ্রন্থাবলী' ২য় ভাগ।

১৯৫৩ দারিদ্র্য এবং অসুস্থতার আক্রমণ অব্যাহত থাকে।

১১ ১৫ এপ্রিল লেখকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় প্রগতি লেখক সংঘের পঞ্চম বা শেষ বার্ষিক সম্মেলন।

প্রকাশিত গ্রন্থ 'নাগপাশ, 'আরোগ্য', 'চালচলন, 'তেইশ বছর আগে পরে'– চারখানি উপন্যাস এবং দুটি গল্পগ্রন্থ, 'ফেরিওলা' ও 'লাজুকলতা'।

১৯৫৪ দারিদ্র্য, এবং অসুখ ও আসক্তির বিরুদ্ধে প্রাণপণ আত্মরক্ষার সংগ্রাম আত্মরক্ষা এবং আত্মহনন ক্রমেই একাকার হয়ে যায়।

বর্তমান বছরের একেবারে গোড়া থেকেই লেখকের ব্যক্তিগত ডায়েরির লেখায় ঘুরে ফিরে দেখা দেয় একপ্রকার অতিপ্রাকৃত বা অতিলৌকিক প্রসঙ্গ।

প্রকাশিত গ্রন্থ দুটি উপন্যাস 'হরফ' ও 'শুভাশুভ'।

১৯৫৫ স্বেচ্ছানির্বাচিত দারিদ্র্য এবং চিকিৎসাতীত ব্যাধির যুগপৎ আক্রমণে অস্তিত্বসুদ্ধ বিপন্ন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত শুভানুধ্যায়ী লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই, স্থায়ী চিকিৎসার জন্য ইসলামিয়া হাসপাতালে ভর্তি হন ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে। মাসাধিককাল চিকিৎসাধীন থাকার পর ২৭ মার্চ, চিকিৎসকদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করেই নিজ দায়িত্বে হাসপাতাল ত্যাগ করে বাড়ি চলে আসেন।

বিপর্যস্ত শরীর মনের শেষ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা হয় লুম্বিনি পার্ক মানসিক চিকিৎসালয়ে– ২০ অগাস্ট সেখানে ভর্তি হন এবং দুমাস চিকিৎসাধীন থাকার পর ২১ অক্টোবর বাড়ি ফেরেন।

একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ 'পরাধীন প্রেম', উপন্যাস।

১৯৫৬ জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় উপন্যাস হলুদ নদী সবুজ বন। বর্তমান বছরের গোড়া থেকেই ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রির আক্রমণে একাধিকবার আক্রান্ত হন এবং ২৫ জুন তারিখে প্রায় মরণাপন্ন হয়ে পড়েন। জুন মাসেই প্রকাশিত হয় জীবিতকালের শেষ গল্প সংকলন 'স্বনির্বাচিত গল্প'। সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে, লেখকের জীবিতকালে সবশেষ প্রকাশিত উপন্যাস, 'মাশুল'।

২ ডিসেম্বর, সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নীলরতন সরকার হাসপাতালে নীত হন।

৩ ডিসেম্বর (বঙ্গাব্দ ১৩৬৩, ১৭ অগ্রহায়ণ), সোমবার অতি প্রত্যূষে উক্ত হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। নিমতলা শ্মশানঘাটে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

মানিক রচনাসমগ্র

প্রথম খণ্ডের সূচি

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচি

তৃতীয় খণ্ডের সূচি

চতুর্থ খণ্ডের সূচি

পঞ্চম খণ্ডের সূচি

ষষ্ঠ খণ্ডের সূচি

সপ্তম খণ্ডের সূচি

অষ্টম খণ্ডের সূচি